এডগার অ্যালান পো

রচনা সংগ্রহ

১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড একত্রে

(৭২টি কাহিনী)

মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা—৭৫৫

দাম ঃ ১৫০ টাকা

সম্পূর্ণ সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

অদ্রীশ বর্ধন অনূদিত

এডগার অ্যালান পো রচনাসংগ্রহ

ভয়াল রসের গল্প-উপন্যাস

আজও বিশ্বশ্রেষ্ঠ

১

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারি, ১৯৪৯

প্রকাশক

ফ্যানট্যাসটিক

৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন, কলকাতা-১৪

মুদ্রণ

ডায়নামিক প্রিন্টার্স

২৪এ, বাগমারি রোড, কলকাতা

প্রচ্ছদ

ধুনজী রানা

ক্ষণজন্মা লেখক প্রসঙ্গে

এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-৪৯) জন্মেছিলেন আমেরিকার বোস্টন শহরে। বাবা আর মা দুজনেই মঞ্চে অভিনয় করতেন। পো-র বয়স যখন মোটে তিন বছর (কেউ বলেন দু'বছর), মারা যান দুজনেই।

ওইটুকু বয়স থেকেই পো ছিলেন ভয়ানক আবেগপ্রবণ আর নার্ভাস প্রকৃতির। মা-বাপ মরা শিশুকে পালক-পিতা হিসেবে তখন বুকে তুলে নিয়েছিলেন ভার্জিনিয়ার রিচমণ্ড শহরের জন অ্যালান। সম্পর্কে ছিলেন পো-এর কাকা। তামাকের ব্যবসা করতেন।

অ্যালান সাহেব নাকি 'আদর দিয়ে বাঁদর' করে তুলেছিলেন পো-কে। ইংল্যাণ্ডে থাকার সময়ে পো-কে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন লণ্ডনের ম্যানর স্কুলে। ১৮২০তে ফিরে যান যুক্তরাষ্ট্রে। ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে টিকতে পারেন নি, পড়াশোনার চেয়ে বেশি মদ খেতেন আর জুয়ো খেলতেন বলে। ১৮৩৬ সালে বিয়ে করেন তাঁর তেরো বছরের সম্পর্কিত বোন ভার্জিনিয়া ক্লেম-কে। বড় কষ্টে জীবন কেটেছে মেয়েটার। কেননা, লিখে তেমন রোজগার করতে পারেন নি পো।

ওয়েষ্ট পয়েণ্ট-এর মিলিটারি অ্যাকাডেমি থেকে বিতাড়িত হন ১৮৩৪ সালে ঔদ্ধত্য আর ক্রমাগত নিয়ম শৃঙ্খলা ভাঙার জন্যে। ওই বছরেই পো-এর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখলেন না পালক-পিতা। মারাও গেলেন একই বছরে। পো-এর পকেটে তখন কানাকড়িও নেই। আর ঠিক তখনি আবিষ্কার করলেন ওঁর লেখক প্রতিভাকে। তখনকার আমলের পয়লা সারির বহু পত্রিকায় ভাল ভাল আসন দখল করেও কোনোখানেই বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারেননি ইন্দ্রিয়পরবশ স্বভাব চরিত্রের জন্যে।

পো লিখেছেন মনে রেখে দেওয়ার মত কবিতা, ফ্যানট্যাসটিক প্লটের গল্প। তাঁর মৌলিকতা হীরক-উজ্জ্বল, রচনাশৈলী মনের

গোড়া পর্যন্ত নাড়িয়ে দেওয়ার মত। বিদগ্ধ সমালোচকও ছিলেন। 'দ্য র‍্যাভেন' কবিতা (১৮৪৫) সালে তাঁকে প্রকৃত খ্যাতি এনে দেয়। কিন্তু এর পরেই ট্র্যাজেডির পর ট্র্যাজেডি ঘটতে থাকে। স্ত্রী মারা গেলেন স্মরণীয় এই কবিতা লেখার ঠিক দু'বছর পরে। নিজে মারা গেলেন তারও দু'বছর পরে। শেষের দু'বছরে ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়ে অমিতাচারী পো কোনো সংযমের ধার ধারেননি, আরও বেশি মদ খেয়েছেন, আরও বেশি জুয়ো খেলেছেন-দিন কেটেছে নিদারুণ দৈন্যদশায়। শেষ অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায় বাল্টিমোরের এক নর্দমায়-মৃত্যু তখন দোরগোড়ায়।

আমেরিকার সাহিত্য-ইতিহাসের কোনো কবি বা গল্প লেখকের জীবন এত অন্ধকারাচ্ছন্ন, এত বিপর্যয়-ভরা নয়। চরিত্রের দোষ আর শৈশবের শিক্ষার অভাবধ্বংসকরেছিল এই সূক্ষ্ম আর মৌলিক বহুমুখী প্রতিভাকে। সারা জীবন মাথা খারাপের পূর্ব লক্ষণ অবস্থা নিয়ে কাটিয়েছেন পো। এই সঙ্গে জুটেছিল বিরামবিহীন মদ্যপান-নিজেও ভয় পেতেন-এই বুঝি পুরো পাগল হয়ে গেলেন।

সাসপেন্স আর শিহরণ, রোমাঞ্চ আর বিভীষিকা সৃষ্টির জন্যে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন পো। *'দ্য র‍্যাভেন'* বা *'দাঁড়কাক'* কবিতাটা প্রেরণা জুগিয়েছিল ফরাসি কবি বদেলেয়ার-কে। পো মর্ডান ডিটেকটিভ গল্পেরও পথিকৃৎ। তাঁর তৈরী গোয়েন্দা অগাস্ত দুপিঁ ডয়ালের শার্লক হোমস চরিত্রের অগ্রগামী দূত। ১৮৪১ সালে *'দ্য মার্ডাস ইন দ্য রু মর্গ'* লিখে তাঁকে পো আবির্ভূত করেছিলেন সাহিত্যের মঞ্চে। শার্লক হোমস প্রথম আবির্ভূত হন *'এ স্টাডি ইন স্কারলেট'* উপন্যাসে-ছাপা হয় ১৮৮৭ সালে *'বীটন্‌স্'* পত্রিকার ক্রীস্টমাস বার্ষিকীতে। দুপিঁকে গল্পের আঙিনায় নামানোর ৮ বছর পর যদি পো মারা না যেতেন, তাহলে হয়তো '৪১ থেকে '৮৭-এই ছাব্বিশ বছরে শার্লক হোমসের চাইতেও বড় গোয়েন্দাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারতেন। মেরি রোজার্স নামে নিউইয়র্কের এক মহিলার অমীমাংসিত মৃত্যুরহস্য কাগজে পড়ে, সেই তথ্যের ভিত্তিতে লেখেন গল্প-বহু বছর পরে তাঁর সমাধান প্রায় হুবহু সঠিক বলে প্রমাণিত হয় (দ্য মিস্ট্রি অফ মেরি রোজেট)।

বেঁচে থাকার সময়ে পো-কে কেউ সঠিক বুঝে ওঠেনি বরং ভুলই বুঝেছে। অথচ তিনি ছিলেন আমেরিকার সবচেয়ে বড় ছোট গল্প লেখক। একটাই উপন্যাস লিখেছেন মাত্র চল্লিশ বছরে ক্ষণজন্মা এই পুরুষ। তার নাম *'Narrative of A. Gordon Pym'*-যে উপন্যাস পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বের বহু কথাশিল্পী অনেক ধরনের উপসংহার-কাহিনী রচনা করেন; জুল ভের্ণ নিজে লেখেন আশ্চর্য এক আলেখ্য: *'তুহিন তেপান্তরের স্ফিংক্স দানবী'*।

পো-র এই রচনাসংগ্রহে মল্যবান এই উপন্যাসটি রইল মূল আকর্ষণ হিসেবে।

এই উপন্যাস ছাড়াও পো ১৮৩৪ থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মাত্র পনেরো বছরের মধ্যে লিখেছেন ৭২ টা গল্প আর নিবন্ধ।

গোটা আমেরিকায় এত ক্ষমতা নিয়ে খুব কম কবি গল্পকার সম্পাদক জন্মেছেন। অথচ তাঁর গোটা জীবনটাই শোচনীয়। এত বড় সম্পাদক ওই সময়ে আর ছিল না, প্রতিটি লেখার মধ্যে পাণ্ডিত্যের ফুলকি ছিটকে বেরোলেও লিখতেন বেশ গুছিয়ে আর টিয়ে-অথচ রূঢ় বাস্তবকে সামাল দেওয়ার মত স্নায়ুর ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ফলে ক্রমাগত টাল খেয়েছেন ব্যক্তিত্ব আর সৃষ্টির অন্তর্দ্বন্দ্বে। সত্যিই ফাটা কপাল নিয়ে জন্মেছিলেন পো। সুনামের চেয়ে কুনাম অর্জন করেছেন বেশি-শেষে মবতে বসেছেন নর্দমার পাঁকে।

মৃত্যুর পরেই দুর্নামকে আরও ঢাক পিটিয়ে জানিয়ে ছিলেন এমন এক ভদ্রলোক -যাঁকে পো সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছিলেন। তাঁর নাম রুফুস ডবলিউ গ্রিসওল্ড। পো-র সাহিত্য-সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। অথচ পো-র মৃতদেহ ঠাণ্ডা-বরফ হওয়ার আগেই এই ভদ্রলোকই আদাজল খেয়ে কাগজে কাগজে শোক-নিবন্ধ লেখার নামে পো-র মুণ্ডপাত করতে শুরু করেন। ভদ্রলোক নিজে ছিলেন প্রতিভাধর-কিন্তু ঈর্ষার ফণা তাঁর প্রতিভাকেও ডিঙে গেছিল-তাই জিনিয়াস পো-কে ছোবলের পর ছোবল মেরেছিলেন পো মারা যাওয়ার পর থেকেই। যথেষ্ট কাদা ছিটিয়ে ছিলেন পো-র চরিত্রে। লেখার অপবাদও করেছিলেন। সমগ্র সাহিত্য একেবারে প্রকাশ না করে নিজের পছন্দমত লেখা বের করেছিলেন। এমনিতেই শেষের কয়েকটা বছর পো আর গুছোনি থাকতে পারেননি। নানা পুস্তিকা, পত্রিকা এবং হাবিজাবি জায়গায় লিখে গেছিলেন বলে সে সব লেখা জোগাড় করতেও কালঘাম ছুটে গেছিল। তার ওপর সাহিত্য তত্ত্বাবধায়কের এহেন বিশ্বাসঘাতকতা। মরেও নিশ্চয় শান্তি পাননি পো।

এই ভাবে রেখে ঢেকে বেছে বেছে লেখা প্রকাশ করারও একদিন অবসান ঘটেছিল। লেখার মধ্যে দিয়ে লেখককে চিনুন-এই নীতি অনুসরণ করে তাঁর সমস্ত লেখা প্রকাশের উদ্যোগপর্ব যেদিন থেকে শুরু হয়েছিল আমেরিকায়-সেইদিন থেকে জানা গেল, পো কি ছিলেন।

মজা হচ্ছে, পো-র প্রতিভা আমেরিকায় প্রথম স্বীকৃতি না পেলেও পেয়েছিল ইউরোপে। ইউরোপ থেকে পো-ফুলকি আমেরিকায় ঢুকতেই টনক নড়ে মার্কিনীদের।

এ কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন দুই ফরাসী কবি-বদেলেয়ার আর ম্যালারমি। বিশেষ করে বদেলেয়ার পো-অনুবাদ করতে গিয়ে

নিজেই প্রভাবিত হয়ে পড়েন। আধ-পাগল (!) পো তাঁকে এমনই আচ্ছন্ন করেছিল যে তাঁর ফরাসী অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রে মূল পো-কেও ছাড়িয়ে গেছিল-একথা বলেন সাহিত্য বোদ্ধারা।

বাংলায় পো-এর কিছু অনুবাদ বেরিয়েছে। যে লেখাগুলোর নামও শোনা যায়নি-অথচ অসাধারণ -সেগুলোকেই আনা হল এই গ্রন্থে।

অদ্রীশ বর্ধন

সূচিপত্র

বক্তা

দুপিঁ

নাবিক

মন জিনিসটা বড়ই অদ্ভুত। মন দিয়ে অনেক কিছুই বিশ্লেষণ করা যায়, মনের অনেক ক্ষমতার মধ্যে এটা একটা ক্ষমতা। কিন্তু যে-ক্ষমতা বিশ্লেষণ করছে, সবার চক্ষু চড়কগাছ করে ছাড়ছে-বিশেষ সেই বিশ্লেষণী ক্ষমতাটাকে কিন্তু কেউ বিশ্লেষণ করতে পারে না। সে একেবারেই ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ব্যায়ামবীর যেমন হাতের গুলি ফুলিয়ে তড়পায়, ঠিক তেমনি তাকেই মগজবীর সমস্যার জট ছাড়িয়ে পাঁচ জনের চোখ কপালে তুলে দিতে পারে। নিজে আনন্দ পায় বলেই বুদ্ধির কেরামতি না

দেখিয়ে পারে না। দুনিয়ার যেখানে যত প্রহেলিকা আর হেঁয়ালি আছে, দুর্বোধ্য সাঙ্কেতিক চিত্রলেখ অথবা আরও দুরূহ ধাঁধা আর বুদ্ধির খেলা আছে-সব কিছুই তাকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করে। এ যেন একটা নেশা। জট ছাড়ানোর নেশা। হেঁয়ালির কুয়াশাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে উড়িয়ে অপার আনন্দ পায় মগজবীর মানুষটা। আর এই সব কিছুর মূলেই কাজ করে তার মন-যে মন মেনে চলে বিশেষ কয়েকটা পদ্ধতি এবং যে পদ্ধতিগুলো জন্ম নেয় তার সহজাত অনুভূতি থেকে।

অঙ্ক-টঙ্ক ভালো জানা থাকলে, অঙ্কর মতই ধাপে ধাপে জট খুলে নেওয়া যায়-বুদ্ধিবৃত্তির এই বিশেষ শাখাটাকেই একটা গালভরা নাম আমরা দিয়েছি ; বিশ্লেষণ। কিন্তু অঙ্কের হিসেবকে কি আর বিশ্লেষণ বলা যায় ? কক্ষনো না। যেমন, একজন দাবা খেলুড়ে অঙ্কের ছকে মাথা খাটিয়ে যায়-সে কি বিশ্লেষণ করে খেলতে বসে ? দাবা খেলায় মনের কেরদানি প্রকাশ পায় ঠিকই, তবুও তাকে বুঝতে ভুল করে অনেকেই। আমি এখন যে রচনাটা লিখতে বসেছি, এটা পড়লেই বোঝা যাবে-মনের উচ্চভূমিতে মাঝে মাঝে তুফান ওঠে-দাবা খেলার মতো গ্যাঁট হয়ে গুছিয়ে বসার মতো তা নয়। দাবা খেলায় একগাদা ঘুঁটির চলাফেরার দিকে খর নজর রাখতে হয়-নজর ফসকালেই হয় জখম হতে হবে, না হয় হেরে ভূত হতে হবে। এ খেলায় তাই গোটা মনটাকে দাবার ছকের ওপরে ফোকাস করে রাখতে হয়-খেলুড়ে যদি ভয়ানক দুঁদে হয়-এই ফোকাসিং না করলে তাকেও লাট খেতে হবেই। কিন্তু মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যখন বুদ্ধিবৃত্তির তুফান ওঠে, তখন অন্যমনস্ক হলেও কিস্সু এসে যায় না-উচ্চভূমির প্রভঞ্জন মগজের শক্তিকে ধেয়ে নিয়ে যায় সঠিক লক্ষ্যে।

হিসেবের এ হেন ক্ষমতার ওপর দারুণভাবে প্রভাব ফেলে যায় মনের উচ্চভূমির এই দামাল ঝোড়ো শক্তি-যাঁরা নিদারুণ ধীমান ব্যক্তি-তাঁরা টের পান এই ঝোড়ো শক্তির অস্তিত্বের। শুধু টের পান বললে কম বলা হবে-বিলক্ষণ হর্ষ লাভ করেন অব্যাখ্যাত এই মহাশক্তির আবির্ভাব ঘটলেই। দাবা খেলায় প্রকাশ পায় তার ছিঁটে ফোঁটা ; তাস খেলাতেও ঘটে একই ব্যাপার। খেলুড়েদের মধ্যে যে মানুষটা হেলায় সবাইকে হারিয়ে বারবার বিজয়মালা গলায় পরে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বোকা বানিয়ে উঠে যান, তিনি কিন্তু মগজের এই প্রচণ্ড শক্তিকে বিয়োগের কাজে লাগান নানান ভাবে। তাস বা দাবায় মনে রাখাটা একটা মস্ত ব্যাপার। প্রতিটি চাল এবং দান মনে রাখতে হবে-তা থেকে পরপর চাল হিসেব করে মাথায় আনতে হবে। প্রকৃত শক্তিধর মানুষটি কিন্তু নিছক এই নিয়মে হৃষ্ট বা আবিষ্ট থাকেন না-তিনি একই সঙ্গে চর্মচক্ষু দিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যান এবং মর্মচক্ষু দিয়ে অনড় সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান। পার্টনারের মুখের দিকে লক্ষ্য রাখেন, অন্য খেলুড়েদের

মুখের ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে নেন। দাবার ঘুঁটি অথবা হাতের তাসের চুলচেরা হিসেব মাথায় মধ্যে রেখে দেন এবং একটু একটু করে মোক্ষম কোপ মারার জন্যে তৈরী হন। মনে হয় যেন একটা আদিম ক্ষমতা এই সব মানুষদের বিশেষ গড়নের করোটির মধ্যে বিরাজ করে-সচরাচর যাঁদের আহাম্মক বলে মনে হয়-ক্ষুরের মতো ধারালো বিশ্লেষণের খেলা দেখিয়ে তারাই চমকে দেন তথাকথিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের। এটাও দেখা গেছে, এরা বাঁধা গৎ ছেড়ে কল্পনার স্রোতে গা ঢেলে দিতে পারেন-মৌলিক ভাবনা চিন্তা তাঁদের মাথাতেই গজায়। আর এটাও ঠিক যে, খাঁটি কল্পনাবিলাসী মানুষরাই সত্যিকারের বিশ্লেষক হতে পারেন।

এইবার যে কাহিনী শুরু করবো, সেটা পড়লেই বুঝবেন-এতক্ষণ যে গৌরচন্দ্রিকা রচনা করলাম, তা কতটা খাঁটি।

১৮-সালের মনোরম গ্রীষ্ম আর বসন্তকালে প্যারিসে থাকার সময়ে মঁসিয়ে সি আগস্ট দুর্পি নামে এক যুবাপুরুষের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। খুবই নামী বংশে জন্মালেও ঘটনাচক্রে টাকা পয়সার অভাবে বড় কষ্টে দিন কাটাচ্ছিল বেচারা। পাওনাদাররা ওঁকে ধরলেও পৈতৃক টাকা পয়সার কিছু বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল বলেই সেই টাকায় কোন মতে দিন গুজরান করে চলেছিল নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে। নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসটা ছিল অবশ্য বই। বই ছিল ওর প্রাণের জিনিস-এক মাত্র বিলাসিতা-প্যারিস শহরে পর্বত প্রমাণ বইয়ের গাদায় নাক ডুবিয়ে তাই পরম সুখেই দিন কাটাছিল দুর্পি.........অথবা বলা যায় রোজকার জীবনের একগাদা অভাবের কষ্ট ম্লান হয়ে গিয়েছিল ওর বই পড়ার সুখের কাছে।

আর এই রকম একটা বই ঘরেই ওর সঙ্গে আমার প্রথম মোলাকাত ঘটে। লাইব্রেরির অভাব নেই এই প্যারিস শহরে। কিছু কিছু লাইব্রেরির নামও অনেকে জানে না। এই রকমই একটা একেবারে অনামী গ্রন্থাগারে আমি গিয়েছিলাম অতিশয় দুষ্প্রাপ্য এবং অতিশয় অসাধারণ একটা বইয়ের সন্ধানে। গিয়ে দেখি আমারই মতো আর এক বই-পাগল সেই একই দুষ্প্রাপ্য বইটার সন্ধানে সেখানে হাজির হয়েছে। এর পর দুই পাগলের কাছাকাছি চলে আসাটাই উচিত এবং আমাদের দুজনের মধ্যে তার অন্যথা ঘটেনি।

বিশেষ সেই বইয়ের পাট চুকে গেলেও আমাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয়েই চললো মাঝেমধ্যে। দুর্পির পরিবারের আদ্যোপান্ত জানতে খুবই ব্যগ্র হয়েছিলাম বলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্তই সে

বলে গেছিল আমার কাছে। ফরাসিদের এই এক রোগ। নিজেদের কথা বলার সুযোগ পেলে হয়-হাঁড়ির খবর পর্যন্ত বলতে থাকবে। সেই সব কথা শুনতে গিয়ে যখন জানলাম ওর বই পড়ার বিশাল পরিধির বৃত্তান্ত, তখন সত্যিই আমার দুচোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল। আরও জেনেছিলাম ওর জীবন্ত কল্পনাশক্তি'র বিস্তারিত খবর। তা শোনবার পর আমার নিজের কল্পনা-প্রদীপও জ্বলে উঠেছিল। প্যারিসের মতো জায়গায় এরকম একটা মানুষের সান্নিধ্যে থাকা খুবই ভাগ্যের ব্যাপার এবং আমার মনের এই ইচ্ছেটা দুপিঁর কাছে ব্যক্ত করতে তিলমাত্র দ্বিধা করিনি। তারপরেই ঠিক হয়েছিল, প্যারিসে যদ্দিন আমি আছি, তদ্দিন দুজনেই থাকবো একই ছাদের তলায় একই সঙ্গে। যেহেতুদুপিঁরতুলনায় আমি কিঞ্চিত সচ্ছল অবস্থায় ছিলাম, তাই ঠিক হয়েছিল মাথা গোঁজবার জায়গাটা যোগাড় করবো আমি আমারই টাকায়-সেই নিবাসকে মনের মতো ফার্নিচার দিয়ে সাজাবোও আমি। এমনভাবে এই দুটি জিনিস করতে হবে অর্থাৎ বাড়ি আর ফার্নিচার এমন হওয়া চাই যাতে আমাদের দুজনেরই গুম মেরে থাকা মন মেজাজে তা বিলক্ষণ খাপ খেয়ে যায়। অবশেষে পেয়েছিলাম একটা পোড়োবাড়ি। ছমছমে সেই পরিবেশে কেউ থাকতে চায় না অনেক লোমহর্ষক কাহিনী শোনবার পর। জরাজীর্ণ কিম্ভূতকিমাকার সেই পরিত্যক্ত প্রাসাদের একটা ভাঙা অংশ আরও বেশি পছন্দ হলো আমাদের দুই বন্ধুর। তারপর দুই পাগল আস্তানা নিলাম সেখানে।

আমাদের তখনকার কাজকারবারের রিপোর্ট শুনলে কিন্তু পাগল ছাড়া আর কিছু মনেও হতো না। তবে হ্যাঁ, নিতান্ত নিরীহ পাগল-কারও অনিষ্ট তো করিনি। পাণ্ডব বর্জিত এমন একখানা আস্তানায় বড় সুখে দিন কাটতে লাগলো দুই বন্ধুর। লোকজন কেউ আসে না-এলেও ঢুকতে দিই না। এতদিন ধরে যাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি-তাদের কাউকেই জানাইনি অজ্ঞাতবাসের ঠিকানা। দুপিঁর পক্ষে কাজটা সহজতর হয়েছিল। অনেক বছর ধরেই প্যারিসের মানুষ ভুলেই গিয়েছিল যে দুপিঁ নামে একটা বই-পাগল সৃষ্টিছাড়া জীব বাস করে এই বিরাট শহরে। সুতরাং নিরালা আলয়ে একই ধাতের আমরা দুটি প্রাণী কি সুখে যে দিন কাটাতে লাগলাম, তা বলে বোঝাতে পারবো না।

ছিটগ্রস্ত দুপিঁ রাতের বেলাটাকে বড় ভালোবাসতো। রজনী চিরকালই মোহময়ী-সূর্যাস্তের পর থেকেই এই মাদকতার শুরু। দুপিঁর মন মেতে উঠতো ঠিক তখন থেকেই। পাঠক পাঠিকার কাছে গোপন করে লাভ নেই-বন্ধুবরের এই খ্যাপাটে নেশায় ডুব দিয়েছিলাম আমিও। কালো স্বর্গ যখন তখন তো আর পাওয়া যায় না-আমরা কিন্তু তার নকল বানিয়ে নিতাম। ভোরের

আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই ভাঙা বাড়ির সবকটা নড়বড়ে খড়খড়ি টেনে বন্ধ করে দিতাম। জ্বালিয়ে নিতাম খান দুই মোমবাতি-সুগন্ধি মোমবাতি অবশ্যই-কড়া গন্ধে ঘরের পরিবেশটাই অন্য রকম হয়ে যেতো। দিনের আলোর সামান্যতম আভাসটুকুকেও গলা টিপে মেরে ফেলা হতো এইভাবে। সেই মুহূর্তে সূর্যের ক্ষীণতম প্রভাকেও মনে হতো অতিশয় কদর্য। ঘর যখন মোমের আলোয় বেশ নরম, বেশ রহস্যমদির হয়ে উঠতো, সুগন্ধির মাদক-প্রভাবে মনমেজাজ যখন রীতিমত আবিল হয়ে উঠতো-তখন শুরু হতো আমাদের পড়াশুনো, লেখালেখি আর কথাবার্তা-এইভাবে চালিয়ে যেতাম ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনিতে প্রকৃত অন্ধকার-জগতের সূচনা ঘটা না পর্যন্ত।

আর তারপরেই হাত ধরাধরি করে দুজনেই বেরিয়ে পড়তাম রাস্তায়। সারাদিনের কথার জের টেনে নিয়ে যেতাম পথে ঘাটে জনারণ্যের মধ্যে দিয়ে, বিপুল আলোর মালায় ঝলকিত শহরের উদ্দাম দ্যুতি স্পন্দিত পরিবেশেও বিভোর হয়ে থাকতাম নিজেদের কথায়-টো টো করে ঘুরতাম আর ঘুরতাম, মানসিক উত্তেজনার প্রশমন ঘটতো না কিছুতেই।

আর, এই এই সময়গুলিতেই প্রিয়বন্ধু দুপিঁর অসাধারণ বিশ্লেষণী ক্ষমতা আমার টনক নাড়িয়ে ছেড়েছিল। তবে হ্যাঁ, ওর মনের খনির যে উৎকট চেহারা আমি দেখেছিলাম-তাতে এইরকম একটা আশ্চর্য ক্ষমতা যে ওর মধ্যে থাকতে পারে, সে আশা আমারও মনের মধ্যে ছিল বইকি। বিশ্লেষণের খেল দেখিয়ে আমাকে তাজ্জব করে দিয়ে ও যে বিপুল আনন্দে নেচে নেচে উঠতো, মোটেই তা নয়; এই কর্মটি করতো ও নিজের ভালো লাগতো বলে। বিশ্লেষণ শক্তিকে পাটে পাটে মেলে ধরে যে কি বিশাল হর্ষলাভ করতো, তা আমি হাজার লিখেও বোঝাতে পারবো না, দুপিঁ নিজেই তা বলেছে আমাকে। আরও বলতো-বলবার সময়ে অবশ্য খুক্ খুক্ করে হাসতো চাপা গলায়-যাকে বলা যায় সত্যিকারের নির্জলা কাষ্ঠ এবং শুষ্ক হাসি-সব মানুষেরই মধ্যে আছে একটা জানলা। দুপিঁর নিজের যেমন আছে-তেমনি আছে আমারও এবং দুপিঁ সে খবর রাখে আমার হাঁড়ির খবর রাখে বলেই। এই সব কথা বলবার সময়ে ওর কথাবার্তা আচার আচরণ হাবভাব সব পালটে যেতো। এমনিতে চড়া গলায় কথা বলা ওর স্বভাব। কিন্তু বিভোর অবস্থায় (অথবা সমাধিস্থ অবস্থায়) কথা বলার সময় গলার আওয়াজ উঠে যেতো আরও তিন ধাপ উঁচুতে। দুই চোখের চাহনি কী যে খুঁজে বেড়াতো অসীমের মধ্যে-তা ঈশ্বর জানেন। সারা শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে যেত-যেন নিজের মধ্যে আর নেই-শরীরটা যেন ধার করা-ফেলে রেখে মালিক হয়েছে উধাও। দুপিঁর আর একটা সত্তাকে এত কাছে পেয়ে এতো ভালো লাগতো

আর এত মজা পেতাম যে তা বলবার নয়। বলেও বোঝাতে পারব না বলে সে চেষ্টা করছি না। একটা কথাই শুধু বলবো। আর এক দুর্পি যখনি এইভাবেই মেলে ধরতো আমার একান্ত সান্নিধ্যে, তখনি লক্ষ্য করেছি-এই দুর্পিই আসল দুর্পি। সৃজনীক্ষমতায় দীপ্যমান, সিদ্ধান্ত নিতে তৎপর-এবং সেই সিদ্ধান্তে ভুলচুক থাকে না এতটুকু।

এই পর্যন্ত পড়বার পর সুধী পাঠক আর পাঠিকারা যেন ভাববেন না যে আমি একটা রগরগে রহস্য গল্প বলবার জন্যে জমি তৈরী করছি, অথবা প্রেম রসে টলমলে রোমাণ্টিক কাহিনী বলবার জন্যে কোমর বাঁধছি। ফরাসি বন্ধুর এই সব উদ্ভট আচরণ আর কথাবার্তা হয়তো ওর বিপুল উত্তেজনার ফল, অথবা অসুস্থ প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। এই সময়কার কথাবার্তাগুলোই তার উদাহরণ।

একটা রাতের কথা বলা যাক। টানা লম্বা রাস্তা বেয়ে ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ করে হেঁটে চলেছি দুই বন্ধু। দুজনেই চিন্তা প্লাবিত অবস্থায় রয়েছি বলেই গত পনেরো মিনিটে কেউ একখানা অক্ষরও মুখ দিয়ে বের করিনি। আচমকা যে কথাগুলো হড় হড় করে বেরিয়ে এলো দুর্পির মুখ দিয়ে, তা এই ;

'লোকটা কিন্তু খাসা। বিচিত্রানুষ্ঠানের উপযুক্ত।'

'নিঃসন্দেহে', আমার মনের মধ্যে তখন যে চিন্তার ধারা ছুটছিল, তারই ঝলক তৎক্ষণাৎ ছিটকে এসেছিল মুখ দিয়ে দুর্পির আচমকা মন্তব্যের জবাবে। তারপরেই যেন আকাশ থেকে আছাড় খেলাম মর্ত্যে। আমার মনের মধ্যে যে চিন্তার তুফান ছুটেছে, তা নিয়ে দুর্পির এই ব্যারফট্রাই সম্ভব হলো কী করে ?

রীতিমত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েও জিজ্ঞেস করলাম উৎকট গম্ভীর গলায়-'আশ্চর্য ! আশ্চর্য ! খুবই আশ্চর্য ! আমার মনের ভাবনা তোমার মুখ দিয়ে বেরয় কী করে ? আমি যার কথা ভাবছি, সে যে-' এই পর্যন্ত বলেই সামলে নিলাম নিজেকে-সত্যিই ও আমার মনের কথা জানতে পেরেছে কিনা সেটা তো যাচাই করা দরকার।

'চ্যানটিলি' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো দুর্পি। 'থামলে কেন ? চ্যানটিলি-র কথাই তো ভাবছিলে এতক্ষণ। ভাবছিলে ওই চেহারা নিয়ে ওকে বিয়োগান্তক দৃশ্যে মানায় না মোটেই।'

সাত্যই তো ! ঠিক এই ব্যাপারটাই তো এতক্ষণ বন্ বন্ করে ঘুরছিল আমার মাথার মধ্যে। চ্যানটিলি এই শহরের এক মুচি। মঞ্চে নামবার পাগলামি ঢুকেছিল মাথায়, কাঠখড় পুড়িয়ে ম্যানেজও করেছিল। চান্স পেয়েছিল একটা ট্র্যাজেডি নাটকে। হাড়ে হাড়ে বুঝেছে ট্র্যাজেডি অভিনয়ের যন্ত্রণা।

ভীষণ অবাক হয়ে গলার স্বর চড়িয়ে ফেলেছিলাম নিমেষে–'দুর্পি তুমি তা জানলে কি করে? আমার মনের গহনে উকিঝুঁকি মারলে কী করে?' যতটা চমকে অথবা আঁতকে উঠেছিলাম–অনেক কষ্টে গলার আওয়াজে তা যাতে পুরোপুরি প্রকাশ না পায়, সে চেষ্টায় অবশ্য কসুর করিনি।

আমার প্রাণের বন্ধুটি তখন বলেছিল ঠিক এইভাবে–'আরে ভায়া, ফলওয়ালাই তো দেখিয়ে দিলে তোমার ভাবনা–স্রোতের মোল লাগানোয় পোক্ত মানুষটার খাটো হাইট-ই বেচারাকে বেমানান করে তুলেছে অমন একটা দৃশ্যে।'

'ফলওয়ালা! বলছো কী? জীবনে কোনো ফলওয়ালার সঙ্গে দোস্তি পাতাইনি।'

'যাচ্চলে! এই তো মিনিট পনেরো আগে এই রাস্তায় ঢোকবার সময়ে গা ঘসে এলে একটা ফলওয়ালার সঙ্গে–দৌড়ে এসে আছড়ে পড়ল না তোমার ওপর? তার কথাই বলছি আমি?'

তাই তো বটে! মস্ত একটা ঝুড়ি বোঝাই আপেল মাথায় চাপিয়ে হন্ হন্ করে মোড় ঘুরতে গিয়ে আর একটু হলেই এক ফলওয়ালা আমাকে ঠিকরে ফেলে দিত রাস্তায়–জবর ধাক্কা খেয়েও তাল সামলে নিয়েছি কোনমতে। কিন্তু তার সঙ্গে চ্যানটিলির কি সম্পর্ক?

হাতুড়েগিরি ব্যাপারটা দুর্পির চরিত্রে একদম নেই। তাই সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে দিলো জলের মতো–'আগে বলবো কি কি নিয়ে ভাবছিলে–ফলওয়ালার সঙ্গে সংঘর্ষ লাগবার মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়েছিল তোমার ভাবনার ট্রেনের ছুটে চলা। যে কটা কম্পার্টমেণ্ট ছিল তোমার ভাবনা ট্রেনে, তাদের নাম চ্যানটিলি, ওরিয়ন, ডক্টর নিকোল্‌স, এপিকিউরাস, স্টেরেকটমি, রাস্তার পাথর, ফলওয়ালা।'

ভাবনার পরিণতি থেকে পিছু হটে গিয়ে ভাবনার শুরুতে পৌঁছোনোর মতো মজাদার ব্যাপারে মজা পান নি, এমন মানুষ পৃথিবীতে বিরল। বিশেষ করে যখন শুরু আর শেষের মধ্যে ফারাক থাকে বিরাট ও অবাক লাগে এক ভাবনা থেকে শুরু করে মন পবনের নাও এতটা পথ উড়ে এসে আর এক ভাবনায় পৌঁছোয় কি করে। ফরাসি বন্ধুর কথা শুনে আমার মনের অবস্থাটা হলো অবিকল তাই। অক্ষরে অক্ষরে সত্যি বলেছে দুর্পি। ফলওয়ালা ধাক্কা মারার পর থেকে বাস্তবিকই এইসব নামগুলোই ঝড়ের বেগে মগজের মধ্যে দিয়ে ছুটে গেছে পনেরোটা মিনিট ধরে।

প্রথম ব্যাখ্যাতেই আমাকে প্রায় ধরাশায়ী করে দেওয়ার পর বললে দুর্পি–'ঘোড়া নিয়ে কথা হচ্ছিল দুজনে, মনে আছে? তারপর দুজনে আর কথা হয়নি। মোড় ঘুরতেই ফলওয়ালা আছড়ে পড়লো তোমার ওপর–তুমি আর একটু হলে মুখ থুবড়ে পড়তে রাস্তার ধারে জড়ো করা পাথরগুলোর ওপর–রাস্তার

মেরামতি চলছে ঠিক সেইখানে। নড়বড়ে একটা পাথরে পা দিয়েই তুমি টলে গিয়েছিলে, সামলে নিলে বটে, কিন্তু মচকে গেল গোড়ালি। রেগেমেগে হেঁটে চললে নিঃশব্দে। ভেবো না আমি শুধু তোমার কাণ্ডই দেখছিলাম-তবে ইদানিং দেখছি সব কিছুই নিষ্প্রয়োজনে পর্যবেক্ষণ করে যাওয়াটা বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে আমার স্বভাবে।

'রাস্তার পাথরের দিকে চোখ নামিয়েই হেঁটে চললে তুমি-তাই দেখেই বুঝলাম এখনো মাথায় ঘুরছে পাথর প্রসঙ্গ-ফুটপাতের ভাঙাচোরা ফুটোফাটা কিছুই চোখ এড়াচ্ছে না তোমার। তারপরেই ঢুকলে ল্যামারটাইন গলিতে। এখানকার পথ পাথর দিয়ে ছাওয়া হয়েছে নতুন এক কায়দায়, মানে, নতুন এক এক্সপেরিমেণ্ট করা হয়েছে গলিতে। দেখেই তোমার মুখ উজ্জ্বল হয়েছিল, ঠোঁট নড়ে উঠেছিল, ঠোঁটের নড়াচড়া দেখেই আন্দাজ করে নিয়েছিলাম-বিড়বিড় করে বলছো একটাই শব্দ-স্টেরিওটমি-শব্দটার সঙ্গে এই ধরনের ফুটপাতের সম্পর্ক আছে। স্টেরিওটমির সঙ্গে এপিকিউরাস-এর থিয়োরির সম্পর্কও আছে। একটু আগেই এই প্রসঙ্গেই যখন কথা বলেছি দুজনে, তখন নিশ্চয় সেই মহান গ্রীক পণ্ডিতেরও মহাকাশ-তত্ত্ব নিয়েও এবার ভাবতে শুরু করবে-মহাকাশের নীহারিকা প্রসঙ্গে এপিকিউরাসের আগ্রহ ছিল অপরিসীম-আমিই তা কথাচ্ছলে ছুঁয়ে গিয়েছিলাম একটু আগেই। অতএব এবার নিশ্চয় আকাশের দিকে তাকাবে। অনুমান মিথ্যে হলো না-তুমি চোখ তুলে তাকালে ওরিয়ন নীহারিকার দিকে। দেখে নিশ্চিন্ত হলাম -ভুল হচ্ছে না আমার অনুমান-সিদ্ধান্তে। সঙ্গে সঙ্গে ভেবে নিলাম, ওরিয়ন-এর দিকে যখন চেয়েছো, তাহলে এবার চ্যানটিলি-র কথা না ভেবে পারবে না। কেন না, বিয়োগান্তক দৃশ্যে চ্যানটিলি একটা ল্যাটিন লাইন আওড়াতে গিয়ে গুবলেট করে ফেলেছিল। তোমাকেই বলেছিলাম, বিশেষ এই লাইনটার সঙ্গে ওরিয়ন-এর সম্পর্ক আছে। আগে এই শব্দটাকেই লেখা হতো 'ইউরিয়ন' নামে। এ নিয়ে কথা কাটাকাটিও হয়েছে দুজনের মধ্যে-সুতরাং তোমার তা ভুলে যাওয়ার কথা নয়। সেই কারণে ওরিয়ান থেকে এসে যাবে চ্যানটিলি-র চিন্তায়। তোমার ঠোঁটে যে চরিত্রের হাসিটা তখন ভেসে উঠলো, সেই হাসির বিচার করে বুঝে নিলাম, চ্যানটিলির শোচনীয় পরিণাম ভাবতে গিয়ে হাসি আর চাপতে পারছো না। এতক্ষণ চলছিলে ঢিলেঢালা গজেন্দ্র গমনে, বিচিত্র হাসি হাসবার পর থেকেই হাঁটতে লাগলে বুক চিতিয়ে-একদম সোজা হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিলাম, চ্যানটিলি বেচারার খর্বাকৃতি তোমার মাথায় এখন ঘুরছে। আর ঠিক তখনি তোমার ভাবনার ট্রেনকে এক হ্যাঁচকায় থামিয়ে দিয়ে বলেছিলাম-লোকটা কিন্তু খাসা। বিচিত্রানুষ্ঠানের উপযুক্ত।'

এই ঘটনার কিছু দিন পরেই একটা সান্ধ্য দৈনিকের পাতা ওল্টাতে গিয়ে দুই বন্ধুর চোখ আটকে গেল নিচের এই খবরটায়।

অসাধারণ নরহত্যা : আজ রাত তিনটের সময়ে কোয়ার্টার সেন্ট রক অঞ্চলের সমস্ত মানুষের ঘুম ছুটে গিয়েছিল পর পর কয়েকটা রক্ত-জল-করা বিকট আর্তনাদে। আর্তনাদের উৎস রু মর্গ নামে একটা বাড়ির চারতলায়। সেখানে থাকেন শুধু এক বিধবা ভদ্রমহিলা তাঁর একমাত্র মেয়েকে নিয়ে। এঁদের নাম যথাক্রমে শ্রীমতী এল এসপানেয়া এবং কুমারী ক্যামিলি। ধাক্কার পর ধাক্কা মারা হয়েছিল সামনের দরজায়-অনেক হাঁকডাকও করা হয়েছিল-কিন্তু কেউ দরজা খুলে দেয়নি ভেতর থেকে। তখন শাবল দিয়ে দরজা ভাঙতে বাধ্য হয়েছিল প্রতিবেশীরা-সঙ্গে ছিল দুজন চৌকিদার। ততক্ষণে কিন্তু ভয়াল আর্তনাদের অবসান ঘটেছে। তবে সিঁড়ি বেয়ে ধেয়ে উঠে যাওয়ার সময়ে শোনা গেছে দুই বা তারও বেশি রাগত স্বরের বচসা এবং কথা কাটাকাটির আওয়াজ ভেসে আসছিল ওপর তলার কোথাও থেকে। প্রথম চাতাল পেরিয়ে দ্বিতীয় চাতালে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে রাগী গলার ঝগড়াও বন্ধ হয়ে গেছিল-থমথমে নৈঃশব্দ নেমে এসেছিল চারতলায়। প্রতিবেশীরা দুই চৌকিদারকে নিয়ে ভাগ ভাগ হয়ে গিয়ে দেখে গিয়েছিল একটার পর একটা ঘর। পেছনদিকের একটা বড় ঘরের সামনে গিয়ে দেখা গিয়েছিল, দরজা বন্ধ ভেতর থেকে-চাবিও রয়েছে ভেতরে। গায়ের জোরে পাল্লা দুহাট করে ভেতরে ঢোকবার পর যে দৃশ্য চোখে পড়েছিল, তা যেমনি ভয়াবহ, তেমনই বিস্ময়কর।

তছনছ হয়ে রয়েছে গোটা ফ্ল্যাট। ফার্নিচার ভেঙেচুরে ছত্রাখান এবং এলোমেলোভাবে নিক্ষিপ্ত যেদিকে খুশি। খাট রয়েছে একটাই-যে খাটের তোষক টেনে এনে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে ঘরের মাঝখানে। রক্তমাখা একটা খোলা ক্ষুর পড়ে রয়েছে একটা চেয়ারে। কার্পেটে পড়ে দু তিন গোছা লম্বা পাকা চুল-মানুষের চুল-রক্তে মাখামাখি-প্রতিটি চুলকে উপড়ে আনা হয়েছে গোড়া সমেত। মেঝের ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছে নেপোলিয়ন, পোখরাজ পাথর বসানো একটা কানের দুল, তিনটে বড় সাইজের রুপোর চামচ, তিনটে জার্মান সিলভারের ছোট চামচ, দুটো ব্যাগ-যার মধ্যে রয়েছে প্রায় চার হাজার সোনার ফ্রাঁ মুদ্রা। ঘরের কোণে রাখা দেরাজের সব কটা ড্রয়ার টেনে এনে যেন তোলপাড় করা হয়েছে ভেতরকার জিনিসপত্র-কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে মেঝেতে, কিছু রয়ে গেছে ড্রয়ারেই। খাটের তলায় পাওয়া গেছে একটা লোহার সিন্দুক (তোষকের তলায় নয়)। সিন্দুকের পাল্লা খোলা হয়েছে চাবি ঘুরিয়ে-চাবি ঝুলছে খোলা পাল্লায়। খান

কয়েক পুরনো পত্র আর তুচ্ছ কিছু কাগজপত্র ছাড়া সিন্দুকে নেই আর কিছুই।

শ্রীমতী এল এসপানেয়ার ছায়াও দেখা গেল না ঘরের কোথাও। কিন্তু চুল্লির মধ্যে অস্বাভাবিক পরিমাণে ভুসো পড়ে রয়েছে দেখে তল্লাশি চালানো হয়েছিল চিমনির মধ্যে এবং তখন যে দৃশ্যটা দেখা গেছিল, তা লিখতে গিয়েও কলম কেঁপে যাচ্ছে। মেয়েকে ঠুসে দেওয়া হয়েছে চিমনির মধ্যে। তার মাথা রয়েছে নীচের দিকে-সেই অবস্থায় সংকীর্ণ চিমনির অনেকখানি ভেতর দিকে তাকে অমানুষিক শক্তি প্রয়োগে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক কষ্টে তাকে টেনে নামানোর পর দেখা গেছিল, শরীর তখনো উষ্ণ। ছাল চামড়া উঠে গেছে অনেক জায়গায়-আসুরিক শক্তিতে ঠেলে তোলার সময়ে ঘটেছে নিশ্চয়-টেনে নামানোর সময়ও উঠেছে কিছু ছাল চামড়া। গোটা মুখ জুড়ে অজস্র জঘন্য আঁচড়ের চিহ্ন, গলায় পড়েছে নীলচে কালো কালসিটে-সেইসঙ্গে রয়েছে নখ বসে যাওয়ার গভীর ক্ষত-নিঃসন্দেহে গলা টিপে মারা হয়েছে হতভাগিনীকে। গোটা বাড়ি তন্নতন্ন করে খোঁজার পর সবাই বেরিয়ে গিয়েছিলেন পেছনকার পাথর বাঁধানো উঠোনে এবং সেখানে পাওয়া গিয়েছিল বৃদ্ধার মৃতদেহ। দেহটাকে তুলতে গিয়ে মুণ্ড গড়িয়ে গেছিল পাথরে-অর্থাৎ, অতিশয় নিপুণভাবে গলাটা পুরোপুরি কেটে অভাগিনীকে ফেলে রাখা হয়েছিল পাথর শয্যায়। মাথা আর মুখ জঘন্যভাবে থ্যাতলানো বিশেষ করে মুখখানা। মানুষের মুখ বলে চেনা মুসকিল।

লোমহর্ষক এই রহস্যের কোনো সমাধান সূত্র এখনো পর্যন্ত পাওয়া গেছে বলে খবর আসেনি।

পরের দিন কাগজে বেরলো আরও কিছু খবর :

রু মর্গের ট্রাজেডী : অতি সাধারণ এবং অতি ভয়ানক এই ঘটনা প্রসঙ্গে অনেককেই জেরা করা হয়েছে। কিন্তু রহস্য তিমিরে আলোকপাত ঘটানোর মতো কোনো তথ্য মেলেনি। যাবতীয় জেরার সারমর্ম দেওয়া হলো নীচে।

ধোপানি পোলিন ডুবর্গ গত তিন বছর ধরে মা-মেয়ের সমস্ত কাচাকুচি করে এসেছে এবং সেই সূত্রেই মা মেয়েকে চেনে গত তিন বছর ধরে। বুড়ি মা আর মেয়ের মধ্যে গভীর স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্ক ধোপানির চোখে পড়েছে দীর্ঘ এই তিন বছরে। পয়সাকড়ি বাকি ফেলতো না কক্ষনো। কিন্তু খরচের টাকা আসত কোত্থেকে, ধোপানির তা জানা নেই। বুড়ি মা একবার যেন বলেছিলেন সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়ার মতো টাকাকড়ি তাঁর আছে। হিসেব করে টাকাপয়সা খরচের বিলক্ষণ সুনাম ছিল তাঁর। জামাকাপড় নিয়ে যাওয়ার সময়ে আর দিয়ে যাওয়ার সময়ে অন্য কোনো মানুষকে বাড়ির মধ্যে কখনো

দেখেনি। না, বাড়িতে চাকর-চাকরানির বালাই ছিল না। একমাত্র চার তলায় ছাড়া, গোটা বাড়ির আর কোথাও ফার্নিচার আছে বলে মনে হয়নি।

তামাকওলা পিয়েরী গোরের জবানিতে জানা গেছে, গত চার বছর ধরে অল্প অল্প তামাক আর নস্যি বেঁচে এসেছে বুড়ি মাকে। জন্ম তার এই অঞ্চলে-আজন্ম নিবাসও এইখানে। বছর ছয়েক হলো এই বাড়িতে এসে উঠেছিলেন বুড়ি মা তাঁর একমাত্র মেয়েকে নিয়ে। আগে এখানে থাকতেন এক জহুরি ; তিনি ওপর তলার ঘরগুলি ভাড়া দিয়েছিলেন অনেক রকমের লোককে। বাড়িটা বুড়ি-মা-য়ের নিজের। ভাড়াটের নষ্টামিতে উত্যক্ত হয়ে নিজেই এসে উঠেছিলেন চারতলায়-সব ভাড়াটেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। রীতিমত অবসর জীবন যাপন করতেন মা আর মেয়ে-টাকার পাহাড়ে বসে আছেন, এমন গুজব শোনা গেছে। প্রতিবেশীরা বলেছে, বুড়ি মা নাকি যখের ধন আগলে রেখেছে-বিশ্বাস হয়নি যদিও। গত ছ বছরে আট থেকে দশবার একজন ডাক্তার ঢুকেছে বাড়িতে, দু-একবার ঢুকেছে একজন কুলি-এ ছাড়া আর কাউকে চৌকাঠ পেরোতে দেখেনি তামাকওয়ালা। নির্বান্ধব চারতলা বাড়িতে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত থেকেছে শুধু দুটি প্রাণী-মা আর মেয়ে।

প্রতিবেশীরাও বলেছে এই একই কথা। এ বাড়িতে পাঁচজনের যাতায়াত আছে, এমন কথা শোনা যায়নি কারোর মুখে। মা-মেয়ের আত্মীয়স্বজন কেউ বেঁচে আছে কিনা, তাও জানা যায়নি। সামনের জানলাগুলোর খড়খড়ি নামানো থাকত বারমাসই-খোলা হতো কালে ভদ্রে। পেছনদিকটার প্রতিটি জানলার খড়খড়ি নামানোই রয়েছে এই ছ-বছর-চারতলার মস্ত কালো ঘরটার জানলাগুলোর কথা আলাদা। এ ঘরের খড়খড়ি খোলা হতো মাঝে মধ্যে। বাড়িটা ভালো-খুব পুরানো নয়।

চৌকিদার ইসিদোর মুশে-কে রাত তিনটের সময়ে ডেকে আনা হয়েছিল এই বাড়িতে। এসে দেখেছিল বিশ তিরিশজন মানুষ সদর দরজার ওপর ঝাঁপ বাড়াচ্ছে-কিন্তু কপাট আর খুলছে না। চৌকিদার তখন তার বেয়োনেট দিয়ে পাল্লা দু-হাট করেছিল-শাবল দিয়ে নয়। খুব বেগ পেতে হয়নি পাল্লা খসাতে-কেননা, দরজাটা ফোল্ডিং কপাট দিয়ে তৈরী, ওপরে অথবা নীচে ছিটকিনি লাগানোও ছিল না। দরজা দু-হাট না হওয়া পর্যন্ত ওপরতলার গগন বিদারী আর্ত চিৎকারের বিরতি ছিল না-কিন্তু কপাট ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড় হিম করা সেই ভয়ানক চিৎকারগুলোও অকস্মাৎ থেমে গেছিল। একজন বা একাধিক ব্যক্তি যেন গলা চিরে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল অকথ্য যন্ত্রণা সইতে না পেরে-দম ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অকাশবাতাস চিরে ফালা ফালা করে দিচ্ছিল অবর্ণনীয় ভয়াল আর্তনাদে-খুদ্‌খুদ্‌

খুচরো চিৎকার তাকে বলা যায় না মোটেই। সাক্ষী দুদ্দাড় করে উঠে গিয়েছিল সিঁড়ি বেয়ে-প্রতিবেশীরা এসেছিল পেছন পেছন। প্রথম চাতালে পৌঁছেই শুনেছিল তুমুল তর্ক চলছে দুই ব্যক্তির মধ্যে-খুবই জোরালো আর রাগত গলায়-একজনের গলা ভারী ঘষঘষে, আর একজনের গলা ভীষণ তীক্ষ্ণ আর চড়া-ভারি অদ্ভুত সেই কণ্ঠস্বর এখনও চৌকিদারের কানে ঝনঝনিয়ে চলেছে। প্রথম ব্যক্তির, দু-চারটে বুকনি বুঝতে পেরেছিল-ফরাসি আদমি অবশ্যই, কথা বলছিল ফরাসি ভাষায়। এই ব্যক্তি যে স্ত্রীলোক নয়, চৌকিদার সে বিষয়ে বিলকুল নিশ্চিত। দুটো শব্দ বিশেষ করে বুঝতে পেরেছে- Sacre আর diable। তীক্ষ্ণ গলাবাজিটা পুরুষের না মহিলার-তা বলতে পারছে না চৌকিদার। ভাষাটা কোন দেশের, তাও বলতে পারছে না- তবে স্প্যানিশ হলেও হতে পারে। ঘরের লণ্ডভণ্ড অবস্থা আর লাশ দুটোর যে বিবরণ আমরা গতকাল যা জানিয়েছি-চৌকিদারের জবানীর সঙ্গে তা মিলে যায়।

হেনরি ডুভাল ভদ্রলোক একই পাড়ার মানুষ। পেশায় রুপোর জিনিসপত্রের কারিগর। বাড়িতে প্রথম যারা ঢুকেছিল, এই ভদ্রলোক ছিল তাদের মধ্যে। চৌকিদার মুখে যা-যা বলেছে, তাতে সায় দিয়ে গেছে। দরজা ভেঙে ভেতরে পা দিয়েই ফের দরজা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল জনতা ঠেকিয়ে রাখার জন্যে। অত রাতেও কাতারে কাতারে লোক জমে গিয়েছিল। আরও লোক ছুটে আসছিল। তীক্ষ্ণ গলাবাজিটা খুব সম্ভব ইতালিয়ান গলা থেকে বেরিয়েছে বলেই মনে করে এই সাক্ষী। ফরাসি যে নয়, সে বিষয়ে তামাতুলসী হাতে নিয়ে দিব্যি গেলে বলতে পারে। তবে হ্যাঁ, পুরুষের গলা কিনা, সেই ব্যাপারটায় জোর দিয়ে বলতে পারছে না। নারীকণ্ঠ হলেও হতে পারে। ইতালিয়ান ভাষার সঙ্গে জান পহচান মোটেই নেই। শব্দগুলো আলাদাভাবে বুঝতে না পারলেও কথার টান আর উচ্চারণভঙ্গি শুনে নিশ্চিতভাবে বুঝেছে-কণ্ঠস্বরের অধিকারী অবশ্যই ইতালির মানুষ। শ্রীমতী এল এবং তাঁর দুহিতাকে চেনে দীর্ঘদিন ধরে। প্রায়ই সাত-পাঁচ কথা হতো দেখা হলেই। তীক্ষ্ণ গলাবাজিটা যে মা অথবা মেয়ের গলা থেকে বেরয়নি -সে বিষয়ে নেই কোনো সন্দেহ।

হোটেল নিবাসী এক ভদ্রলোক আকাশফাটা আর্ত চিৎকারের সময়ে বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এঁর নাম ওডেন হিমার। নিবাস আমস্টারডামে। ফরাসি জানেন না বলে দোভাষীর সাহায্যে নিজে থেকেই বলে যান যা শুনেছেন, যা দেখেছেন। বিকট চিৎকারের পর চিৎকার শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দু-পা অচল হয়ে গিয়েছিল। যদ্দুর মনে পড়ে, মিনিট দশেক ধরে চলেছিল সেই পরিত্রাহি চিৎকার পরম্পরা। এক-একটা চিৎকার

চলছিল তো চলছিলই-বেদম না হওয়া পর্যন্ত তার নিবৃত্তি ঘটছিল না। কলজে ফাটিয়ে সেই চিৎকার শুনলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়-বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়তে থাকে-স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। প্রথম যে ক'জন চৌকাঠ পেরিয়েছিল, ছিলেন তাঁদের মধ্যে। পূর্ববর্তী সাক্ষীদের জবানবন্দী সবই সঠিক বলে গেলেন-শুধু একটি বিষয় ছাড়া। তীক্ষ্ণ গলাটা অবশ্যই কোনো ফরাসি পুরুষের-তিলমাত্র সংশয় নেই এ ব্যাপারে। উচ্চারিত শব্দগুলোর একটাও বুঝতে পারেননি। ভয়ানক চড়া গলায় আর ঝড়ের বেগে কথা বলছিল লোকটা-কথার মধ্যে ছন্দ ছিল না-ছেড়ে ছেড়ে, টেনে টেনে থেমে থেমে-খানিকটা ভয়ে, খানিকটা রাগে চলছিল ফরাসি বুকনিবাজি। খুবই কর্কশ কণ্ঠস্বর-যতটা না তীক্ষ্ণ, তার চাইতেও বেশি কর্কশ। তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর বলা যায় না মোটেই। কর্কশ কণ্ঠ বলছিল বারবার-Scre, diable, একবার বলেছিলmon Dieu।

মিগনড এই অঞ্চলের ব্যাঙ্কের মালিক। শ্রীমতী এল এসপানেয়ারের কিছু সম্পত্তির খবর ইনি রাখেন। অ্যাকাউণ্ট খুলেছিলেন ব্যাঙ্কে। মাঝে মাঝে এসে টাকা জমা দিয়ে যেতেন। অ্যাকাউণ্ট খোলা হয়েছিল আট বছর আগে। মৃত্যুর তিনদিন আগে নিজে এসেছিলেন চার হাজার ফ্রাঁ নিয়ে যাওয়ার জন্যে। নগদ সোনার মুদ্রায় দেওয়া হয়েছিল চার হাজার ফ্রাঁ-ব্যাঙ্কের এক ক্লার্ক তাঁর সঙ্গে গিয়ে মোহরের থলি পৌঁছে দিয়েছিল বাড়িতে।

এই ক্লার্কের নাম অ্যাডলফ লা বন। দু থলি মোহর নিয়ে রু মর্গের বাড়িতে সে এসেছিল বৃদ্ধার সঙ্গে। দরজা খুলে দিয়েছিল তাঁর মেয়ে। হাত বাড়িয়ে নিয়েছিল একটা থলি-আরেকটা থলি বৃদ্ধা নিজে নিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। রাস্তায় তখন কেউ ছিল না। এমনিতেই রাস্তাটা বড় নির্জন-গলি তো।

উইলিয়াম বার্ড এই অঞ্চলের দরজি। প্রথম যারা চৌকাঠ পেরিয়েছিল, ছিল তাদের মধ্যে। জাতে ইংরেজ। প্যারিসে আছে দুবছর। সিঁড়ির ধাপ টপকে টপকে প্রথম যে কজন ছিটকে গিয়েছিল চারতলায়-ছিল তাদের মধ্যে। কথা কাটাকাটি সেও শুনেছে। কর্কশ গলার অধিকারী নিঃসন্দেহে একজন ফরাসি পুঙ্গব। কয়েকটা শব্দ স্পষ্ট শুনেছিল-কিন্তু সবগুলোকে মনে করতে পারছে না। Sacre আর mon Dieu শব্দ দুটো এখনও কানে লেগে রয়েছে। একই সঙ্গে অনেক লোকের ধস্তাধস্তি, টানাটানির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। তীক্ষ্ণ গলাটা ভয়ানক চড়া-কর্কশ গলাবাজি হচ্ছিল সে তুলনায় অনেক নীচের খাদে। সে গলা যে ইংরেজের গলা নয়, সে বিষয়ে হলফ করতে

প্যারে। জার্মান বলেই মনে হয়েছে। নারীকণ্ঠ হলেও হতে পারে। জার্মান বোঝে না এই সাক্ষী।

ওপরের চার সাক্ষীকে ফের জিজ্ঞাসা করা হলে বলে গিয়েছিল একই কথা বিশেষ একটি ব্যাপারে। কুমারী ক্যামিলির বীভৎসভাবে ছালচামড়া উঠে যাওয়া মৃতদেহটা যে ঘরে পাওয়া গেছে, সে ঘরের দরজা বন্ধ ছিল ভেতর থেকে। শ্মশান নৈঃশব্দ বিরাজ করছিল ভেতরে-কারও কাতরানি, কারও সঘন নিঃশ্বাস, কোনোরকম ক্ষীণতম আওয়াজও শোনা যায়নি। পেছনের আর সামনের ঘরের সব কটা জানলার খড়খড়ি টেনে নামানো ছিল ভেতর থেকে। দুই ঘরের মাঝের দরজাটা বন্ধ ছিল বটে, তবে তালাবন্ধ ছিল না। সামনের ঘর থেকে যে দরজা দিয়ে প্যাসেজে যাওয়া যায়, সে ঘর কিন্তু তালাবন্ধ ছিল-চাবি ঝুলছিল ঘরের ভেতরে। প্যাসেজের শেষ প্রান্তে, চারতলায়, একটা ছোট্ট ঘর আছে-যে ঘরে যাওয়া যায় সামনের ঘর থেকে-এ ঘরের দরজা খোলা ছিল হাট করে। এ ঘরে গাদাগাদি অবস্থায় রাখা হয়েছে পুরনো তোষক, বাক্স আর বিস্তর হাবিজাবি জিনিস। প্রতিটি জিনিসকে সন্তর্পণে সরিয়ে তল্লাসি চালানো হয়েছিল-এমনকি ঝাঁটা গলিয়ে চিমনির ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত ঝেড়েঝুড়ে দেখাও হয়েছিল। চারতলার ছাদে একটা চিলেকোঠা ঘর আছে। মেঝেতে-পাতা ছাদের দরজা পেরেক ঠুকে আচ্ছাসে লাগানো এবং মনে তো হয়নি কয়েক বছরের মধ্যে খোলা হয়েছে সেই দরজা। দুই কণ্ঠস্বরের বচসা শোনার পর থেকে দরজা ভাঙার সময় পর্যন্ত-মোট কতটা সময় গেছে, এই বিষয়টায় কিন্তু সাক্ষীরা কেউই একমত হতে পারেননি-এক-একজনের হিসেবে এক-একটা সময় পাওয়া গেছে। কেউ বলেছেন তিন মিনিট-কেউ বলেছেন পাঁচ মিনিট। দরজা খুলতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

আলফোনজো গারসিও নামে ভদ্রলোকের কাজ মৃতদেহ কবরস্থ করা। ভীতু মানুষ। থাকেন রু মর্গে-জন্ম স্পেনে। বাড়িতে অন্যান্যদের সঙ্গে ঢুকলেও ওপরে ওঠেননি ভয়ের চোটে। এত চেঁচামেচি গায়ের রক্ত জল করে দিয়েছিল। দুই কণ্ঠস্বরের কথা কাটাকাটি তিনি স্বকর্ণে শুনেছেন নিচতলা থেকেই। খসখসে গলা যার, নিশ্চয় সে ফরাসি আদমী। কি যে ছাই বলছিল চাপা রাগী গলায়-এক বর্ণও বুঝতে পারেনি। তীক্ষ্ণ চিল-চেঁচানিটা নিঃসন্দেহে একজন ইংলিশম্যানের। ইংরেজী যদিও একদম বোঝেন না-স্বরভঙ্গি শুনে সে রকমই মনে হয়েছে।

মিঠাইওলা আলবার্তো মোনতানি প্রথম দলের মধ্যে থেকে টপাটপ করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গিয়েছিলেন। দুই মানুষের বিষম বচসা ইনিও শুনেছেন। কতকগুলো শব্দ আলাদাভাবে বুঝতেও পেরেছেন। ঘষঘষে গলাবাজি বেরিয়েছে ফরাসি গলা থেকে। খুব যেন বকাবকি করছিল। চিল-চেঁচানির তীক্ষ্ণ

গলাবাজির একটা শব্দও বুঝতে পারেননি। কথা বলে যাচ্ছিল পটাপট করে-কিন্তু ছন্দহীন ভাবে-তাল কেটে কেটে। রাশিয়ান মানুষের গলা বলেই তো মনে হয়। আর সব সাক্ষীরা যা যা বলেছেন-সব কিছুতেই সায় দিয়ে গেলেন। নিজে ইতালিয়ান। জীবনে কোনো রাশিয়ানের সঙ্গে কথা বলেননি।

সব সাক্ষীই একটা ব্যাপারে একই কথা বলে গেছেন। চারতলার প্রতিটি ঘরে প্রতিটি চিমনি এতই সরু আর সরু পরিসর যে কোন মানুষই তাদের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে পারে না। লম্বা ডাণ্ডাওলা বুরুশ দিয়ে এইসব চিমনির ঝুল আর ভুসো সাফ করতে হয়। সাক্ষীরা যখন তেড়েমেড়ে সিঁড়ি বেয়ে ধেয়ে যাচ্ছিল চারতলায়-তখন যে আততায়ীরা পেছনের কোন পথে চারতলা থেকে নেমে যাবে-সে রকম কোনো খিড়কি-পথও পাওয়া যায়নি। কুমারী ক্যামেলিকে যেভাবে জ্যামপ্যাক করে রাখা হয়েছিল একটা চিমনির মাঝামাঝি জায়গায়-জনা চার পাঁচ হিম্মতবান পুরুষকে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়েছে ডেডবডিকে টেনে নামাতে গিয়ে। চার পাঁচ জন মানুষ একই সঙ্গে হেঁইও টান না দিলে ডেডবডি নামানো যেতো না কিছুতেই। অর্থাৎ চার পাঁচজন বলবান পুরুষের জড়ো করা শক্তি অজ্ঞাত সেই আততায়ীর শক্তির সমান-একথা বলা যায় অনায়াসেই।

ডাক্তার বাবুর নাম পল ডুমাস। ভোরের দিকে তাঁর তলব পড়ে ডেডবডি দেখার জন্যে। কুমারী ক্যামেলিকে যে ঘরে পাওয়া গিয়েছিল, সেই ঘরেই মেঝেতে তোষক পেতে শুইয়ে রাখা হয়েছিল দুটো মৃতদেহকেই। বেশি থেঁতলেছে আর ছালচামড়া উঠেছে ক্যামেলির দেহ থেকে। চিমনিতে ঠেসে দেওয়ার পরিণাম তো বটেই। গলা ফুলে ওল হয়ে গেছিল। চিবুকের ঠিক নিচেই দেখা গেছিল বেশ কয়েকটা সুগভীর আঁচড়ের দাগ-আশপাশে আঙুল চেপে বসার লালচে ফুলো চিহ্ন। মুখমণ্ডল আতঙ্কজনকভাবে বিকৃত এবং বিরঙ-ঠেলে বেরিয়ে এসেছে দুই চক্ষুগোলক। জিভের অর্ধেক কেটে ঝুলছে নিজেরই দু-পাটি দাঁতের কামড়ে। পেটের নাভিমূলে একটা মস্ত কালসিটের দাগ রয়েছে-নিশ্চয় হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারার ফল। ডাক্তার বলছেন, কুমারী ক্যামেলিকে এক বা একাধিক নর পিশাচ গলা টিপে খতম করেছে। তার মায়ের শরীরটাকে বীভৎসভাবে বিকৃত করেছে। ডান বাহু আর পায়ের সব কটা হাড় কমবেশি টুকরো টুকরো হয়েছে। কুচি কুচি হয়েছে বাঁ পায়ের নিচের দিকের 'টিবিয়া' হাড়-বাঁদিকের একটা পাঁজরাও আস্ত নেই। গোটা শরীরটায় বীভৎসভাবে কালসিটে পড়েছে, থেঁতলে গেছে এবং বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিভাবে যে এত রকমের চোট লাগতে পারে একটি মাত্র শরীরে-ডাক্তারের পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়। যদি ভীষণ শক্তিমান পুরুষ কাঠের মুগুর, অথবা লোহার ডাণ্ডা, অথবা চেয়ার, অথবা যে কোন বিরাট, ভারি অথবা

ভোঁতা জিনিস দিয়ে দমাদম করে পিটিয়ে যায়-তবেই এমন চোট সৃষ্টি হতে পারে। না, কোন স্ত্রী লোকের কম্ম নয় এভাবে পিটিয়ে এই ধরনের হাড়গোড় ভাঙা থেঁতলানো শরীর তৈরী করা। ডাক্তার যখন দেখেছিলেন বুড়িকে, তখনই তো তাঁর মুণ্ডটা একেবারে আলাদা হয়ে রয়েছে ধড় থেকে-এক কোপে এই ভাবে গলা উড়িয়ে দেওয়া সোজা কথা নয়। খুব সম্ভব ক্ষুর, বা ওই জাতীয় কোনো ভয়ানক ধারালো অস্ত্র দিয়ে দু-টুকরো করা হয়েছে বৃদ্ধার কণ্ঠদেশ।

শল্য চিকিৎসক আলেকজাণ্ডার ইটিনি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ডেডবডি দুটোকে দেখে একই কথা বলে গেছেন।

আরও কয়েকজনকে জেরা করেও এর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই জানা যায়নি। প্যারিস শহরে খুন জখম বড় একটা হয় না-হলেও এ হেন রহস্যময় কিম্ভূতকিমাকার নর হত্যা আজ পর্যন্ত এই শহরে ঘটেনি। পুলিস হালে পানি পাচ্ছে না, রহস্য সমাধানের কোনো সূত্র এখনো হাতে আসেনি।

সান্ধ্য দৈনিকে খবরে জানা গেল, গোটা তল্লাট থমথম করছে ভয়াবহ এই ডবল খুনের সংবাদ ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়ায়। চারতলা বাড়িটার আগাগোড়া ফের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে-কিন্তু অপদার্থ পুলিস বাহিনী দলবদ্ধভাবে মোটা মাথাগুলো চুলকেই চলেছে। অ্যাডলফি লা বন-কে গ্রেপ্তার করে খাঁচায় পুরে দেওয়া হয়েছে বটে-কিন্তু তার বিরুদ্ধে নতুন কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় নি-আগে যা লেখা হয়েছে, তা ছাড়া নেই আর জবর খবর।

পুরো ব্যাপারটায় নিদারুণ আগ্রহ দেখিয়ে গেল প্রিয়বন্ধু দুপিঁ। তিলমাত্র মন্তব্য প্রকাশ না করায় বুঝলাম, পুরোপুরি নিমগ্ন হয়ে গেছে আশ্চর্য এই হত্যারহস্য বিবরণীর ছত্রে ছত্রে। লা বন-কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে শুনেই সেই প্রথম মুখ খুললো বন্ধুবর। জিজ্ঞেস করলো, এ বিষয়ে আমার কি অভিমত।

গোটা প্যারিস যা ভাবছে, আমিও সেই ভাবনায় ভিড়ে গিয়ে বললাম, 'দুরূহ সমস্যা। এর সমাধান অসম্ভব। হত্যাকারীদেরও টিকি ধরা যাবে না।'

দুপিঁ তখন বললো, 'কে কী জেরা করেছে-তার বাইরের খোলস দিয়ে এ ঘটনাকে বিচার করা সঙ্গত হবে না। প্যারিস পুলিস প্রশংসা পেয়েছে দুটো মস্ত গুণের জন্যে। এক, সূক্ষ্মভাবে দেখার ক্ষমতা; দুই, ভীষণ ধূর্ত। তার বেশি তো কিছু নয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী মাথা খাটিয়ে নতুন নতুন তদন্ত পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারে না। মাঝে মাঝে দু-একটা চমক দেখিয়ে ফেলে স্রেফ হাড়ভাঙা পরিশ্রম আর বিরাম বিহীন নিষ্ঠা থাকে বলে। কিন্তু এ দুটি সহজ গুণেরও যখন অভাব দেখা যায়, তখন

ল্যাজেগোবরে হতে হয় পুলিস পুঙ্গবদের। যেমন ধরো, ভিডক-এর ব্যাপারটা ; অনুমান-টনুমান করতে পারে ভালোই-ছিনেজোঁকের মতো লেগেও থাকতে পারে , কিন্তু চিন্তা ভাবনার মধ্যে শিক্ষার তুলসী পাতা না থাকার ফলে হোঁচট খায় প্রত্যেকটা তদন্তে। চোখের খুব কাছে রাখলে সেই জিনিসটাকে কি স্পষ্ট দেখা যায় ? যায় না। ও ঠিক তাই করে। দু-একটা ব্যাপার, হয়তো দেখতে পায় ভালই, কিন্তু গোটা ব্যাপারটার বেশির ভাগই থেকে যায় দৃষ্টির বাইরে। কোনো সমস্যাকেই একেবারে চোখের সামনে এনে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকলে গভীরে প্রবেশ করা যায় না-আবার ভীষণ উদ্যম নিয়ে একদম গভীরে ঢুকে গেলেও তল খুঁজে আর পাওয়া যায় না। বোঝাতে পারলাম কি ? ধরো আকাশে তারা দেখছো। চোখের কোণ দিয়ে যখন দেখছো, নক্ষত্র-মহিমা আর বিশালতা তোমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কিন্তু যেই সোজা তারাটার দিকে তাকালে, জলুস তোমার চোখ ধাঁধিয়ে দেবেই। প্রথম ক্ষেত্রে, নক্ষত্র থেকে আসা আলোর সবটুকু তোমার চোখের পর্দায় পড়ছে না বলে তুমি আন্দাজ করতে পারছো-দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নক্ষত্র কিরণ পুরোপুরি তোমার চোখের পর্দাকে ছেয়ে ফেলেছে বলে আন্দাজ-অনুমানের আর সুযোগ থাকছে না। বেশি ছড়িয়ে গেলে চিন্তার জোর কমে যায়, নিজেরই সব গোলমাল হয়ে যায়। শুক্র গ্রহও চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে যদি প্যাট প্যাট করে শুধু শুক্রের দিকে তাকিয়ে থাকো।

এবার এই খুনের ব্যাপারে আসা যাক। তদন্তে নামতে চাই আমরা দুজনে। তার আগে অভিমত তৈরী করা ঠিক হবে না। তদন্ত করতে গিয়ে দেখবে বেশ মজাও পাবে। তাছাড়া কি জানো, লা বন এককালে আমার কিছু উপকারও করেছিল। অকৃতজ্ঞ যখন নই, তখন তার জন্যে কিছু করা দরকার। রু মর্গের বাড়িতে যাবো, নিজেদের চোখে সব দেখবো। পুলিস প্রিফেক্টকে আমি চিনি এবং জানি-সেদিক দিয়ে কোন ঝাগড়া পড়বে না।

পারমিশন এসে যেতেই তক্ষুনি দুই বন্ধু রওনা হলাম রু মর্গ অভিমুখে। আমরা যেখানে থাকতাম, সেখান থেকে রু মর্গ অনেক দূরে তাই বিকেল গড়িয়ে গেল সেথায় পৌছতে। বাড়ি চিনতে অসুবিধে হলো না। বহু লোক তখনও দুই চোখে উৎকট কৌতূহল ভাসিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে বন্ধ খড়খড়িগুলোর দিকে। মামুলি বাড়ি-প্যারিসে এরকম বাড়ি বিস্তর রয়েছে। চৌকাঠ পেরোনোর আগে এ-গলি ও-গলি দিয়ে পুরো বাড়িটাকে চক্কর মেরে এলো দুপিঁ-বাড়ির পেছনেও চলে গেল পায়ে পায়ে। নজর কিন্তু প্রখর হয়ে রইলো প্রতি মুহূর্তে-সুমস্ত সত্তা যেন উন্মুখ হয়ে রয়েছে সেই চাহনির মধ্যে। এই মুহূর্তে এত খুঁটিয়ে দেখাটা

একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছিল আমার কাছে।

বাড়ির সামনে এসে পুলিস প্রিফেক্টের অনুমতি পত্র দেখিয়ে ঢুকলাম ভেতরে এবং সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গিয়ে ঢুকলাম বৃদ্ধার ঘরে। দুটো মৃতদেহই তখনও শোয়ানো রয়েছে মেঝেতে। ঘরের সব কিছুর ওপর দিয়ে যেন মত্ত প্রভঞ্জন বয়ে গেছে। কাগজে যা কিছু পড়েছি, তার বেশি কিছু নজরে এলো না। দুপিঁ চুলচেরা চোখে দেখে গেল প্রতিটি বস্তু-বাদ দিল না মৃতদেহ দুটোকেও। সেখান থেকে গেলাম পাশের ঘরগুলোয়-তারপর পেছনের উঠোনে। আগাগোড়া একজন চৌকিদার রইলো সঙ্গে। সন্ধে না হওয়া পর্যন্ত রইলাম। তারপর বাড়ি চলে এলাম। ফেরার পথে দুপিঁ মিনিট কয়েকের জন্যে ঢুকলো একটা স্থানীয় দৈনিকের অফিসঘরে।

খেয়ালি বন্ধুর নাড়ি নক্ষত্র জানা হয়ে গিয়েছিল বলে আমি এ প্রসঙ্গে একটি কথাও আর বলিনি-কারণ ও নিজেই বলতে চাইছে না বলে। পরের দিন ঠিক দুপুর বেলা খুন সম্পর্কে প্রথম মুখ খুলল দুপিঁ। জিজ্ঞেস করলো আচমকা, ঘটনাস্থলে অদ্ভুত কিছু কি দেখতে পেয়েছি?

'অদ্ভুত' শব্দটা এমন অদ্ভুতভাবে উচ্চারণ করে গেল দুপিঁ যে শোনামাত্র গা ছমছম করে গেল আমার। বুঝলাম না কেন।

বললাম, 'কিচ্ছু না। কাগজে যা পড়েছি, তার বেশি কিচ্ছু না।'

দুপিঁ বললে, 'গোটা ব্যাপারটায় একটা অসাধারণ বীভৎসতা রয়েছে। দুঃখের বিষয়, খবরের কাগজ সে জায়গায় ঢুকতে পারেনি। যাক গে, ছাপার অক্ষরে কী বেরিয়েছে আর কী বেরয়নি-তা নিয়ে সময় নষ্ট করতে চাই না। আমার যা মনে হয়েছে, তা এই; এই হত্যা রহস্যের সমাধান নেই-এটা যেমন সত্যি বলে মনে হচ্ছে, ঠিক তেমনি বিশ্বাস করি-রু মর্গ হত্যা কাণ্ডের সমাধান একটা আছে-বাহ্যিক ব্যাপার-স্যাপারগুলো বিলক্ষণ ধোঁয়াটে বলেই রহস্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছনোর সোজা পথটা একটু যা চোখের আড়ালে থেকে যাচ্ছে। খুনের মোটিভ না থাকায় প্যারিস পুলিস চোখে ধোঁয়া দেখছে-খুন হতে পারে, কিন্তু এমন পৈশাচিক খুন হলো কেন? পুলিস আরও গোলমালে পড়েছে, চারতলার ঘরে দুই ব্যক্তির বচসার সমাধান করতে না পেরে। কাউকে ওপর থেকে নীচে নামতে দেখা যায়নি-নামবার পথও নেই-অথচ তাদের কথাকাটাকাটি শোনা গেছে, কিন্তু তিন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তারা বাতাসে মিলিয়ে গেছে। ঘরের লণ্ডভণ্ড দৃশ্য, মৃতদেহের মুণ্ড নীচের দিকে রেখে চিমনির ভেতরে ঠেলে ঢুকিয়ে ওপরে তুলে দেওয়া, বুড়ির প্রায় সারা শরীরের হাড়গোড় ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেওয়া-এই সবই পুলিস মহারথীদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছে। সূক্ষ্মদর্শিতার দম্ভ ধুলোয়

লুটিয়েছে-ধূর্ততার বড়াই মুখ দিয়ে আর বেরুচ্ছে না। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বলেই মনে করছে এ কেস নিদারুণ নিগূঢ়, ভয়ানক দুর্বোধ্য, বিষম জটিল-ফলে মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে আরও বেশি। সহজ এই ভুলটা করে বেশির ভাগ মানুষ। যা স্বাভাবিক স্তরে নেই, সহজবুদ্ধি বলে, তাকে খুঁজতে হবে স্বাভাবিক স্তরের বাইরে। ফলে পুলিস যে অনুপাতে হেদিয়ে মরছে সমাধানের নাগাল না পেয়ে-সেই একই অনুপাতে আমি চলে এসেছি সমাধানের একদম কাছে-একটু পরেই ধরে ফেলবো সম্পূর্ণ সমাধানকে।'

বিষম অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম বক্তার পানে।

ঘরের দরজার দিকে চোখ ফিরিয়ে রেখে বলে চললো দুর্পিঁ, 'যে মানুষটা খুব সম্ভব নির্দোষ হয়েও এই হত্যাকাণ্ডের যত নষ্টের মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে-তার পথ চেয়েই বসে আছি। সে আসতে পারে-নাও আসতে পারে-তবে আসার সম্ভাবনাটাই খুব বেশি। যে কোন মুহূর্তে চৌকাঠ মাড়িয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেই তাকে ঘরে আটকে রাখতে হবে। ধরো পিস্তল। আমার পিস্তল রইল আমার কাছে। প্রয়োজন হলে এই অস্ত্র প্রয়োগের শিক্ষা আমাদের দুজনেরই আছে।'

হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা নিলাম বটে, কিন্তু কেন যে নিলাম-তা মাথায় ঢুকলো না। কী যে ছাই শুনে গেলাম, তা কানে ঢুকলেও মগজের কোষগুলোয় পৌঁছলো না। দুর্পিঁ যেন এতক্ষণ আপন মনেই কথার জাল বুনে গেল; আমি রইলাম আচ্ছন্নের মতো। কলের পুতুলের মতো হাত বাড়িয়ে নিলাম পিস্তল এবং চেয়ে রইলাম আশ্চর্য বন্ধুর মুখের দিকে। আগেই বলেছি, মাঝেমাঝেই দুর্পিঁ এরকম উদাসী বাবার মতো কথা বলে যায়-কথাগুলো বলে নিজের সঙ্গেই। এইবার কিন্তু ঝড়ের মতো কথার পর কথা নিক্ষেপ করে গেল বটে আমার দিকে-অথচ মনে হলো, শ্রোতা রয়েছে অনেক.........অনেক দূরে। শূন্যগর্ভ দুই চক্ষু স্থির হয়ে রইলো ঘরের দেওয়ালের ওপর-এই মুহূর্তে চুনকাম করা দেওয়ালটাই যেন একটা দেখবার জিনিস।

পিস্তলটা আমার হাতে গুঁজে দিয়েই আবার শুরু হলো আপন মনে কথা বলে যাওয়া, 'সাক্ষীদের কথা থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে-সিঁড়ি বেয়ে ওঠবার সময়ে চারতলার ঘরে দুই ঝগড়াটে ব্যক্তির দুজনের কেউই স্ত্রীলোক নয়। ফলে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম আরও একটা সিদ্ধান্তে-বুড়ি প্রথমে মেয়েকে খুন করে তারপরে নিজে আত্মহত্যা করেনি। মেয়েকে ওইরকম আসুরিক শক্তি প্রয়োগে চিমনির মধ্যে গুঁজে দেওয়া বুড়ির পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব তৃতীয় কোনো একটা দল ডবল মার্ডারের জন্যে দায়ী। এই দলের কথা কাটাকাটিই শোনা গেছে সিঁড়ি থেকে। সাক্ষীদের জবানবন্দীর মধ্যে অদ্ভুত বিষয়টা

তোমার নজরে আসেনি ? খুবই অদ্ভুত। বলো তো কী ?

যা বুঝেছিলাম তাই বললাম। সব সাক্ষীই মেনে নিয়েছে, একটা কণ্ঠ খুব ঘষঘষে-জাতে সে ফরাসি, তীক্ষ্ণ গলাবাজিটা নিয়েই মতের গরমিল দেখা যাচ্ছে।

দুর্পিঁ বললে, 'তাহলে বলবো তুমি সবচেয়ে খটকা লাগার মতো ব্যাপারটাকে নজরে আনতে পারনি। আরে ভায়া, ঘষঘষে গলাবাজি নিয়ে সব শেয়ালেরই এক ডাক শোনা গেছে-দ্বিমত নেই কারো মধ্যে। তীক্ষ্ণ গলাবাজিটা যে সত্যিই বিচ্ছিরি তীক্ষ্ণ-চিলের চেঁচানিকেও হার মানিয়ে দেয়-সে ব্যাপারেও সব সাক্ষীই একমত হয়েছে-হতে পারছে না কেবল একটি ব্যাপারে। আর সেইটাই হচ্ছে এই কেসের সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার-এতক্ষণে যা তুমি বুঝলে না। ভাষা.........ভাষা.........কী ভাষায় কথা বলছিল চিল-চেঁচানি লোকটা ? ইউরোপের পাঁচ অঞ্চলের মানুষরা বলছে, সে ভাষাকে চিনতে পারেনি ! প্রত্যেকেই বলছে, ভাষাটা নিশ্চয় অমুক দেশের-কোন্ দেশের ? যে দেশের ভাষা সে নিজেই জানে না··· কখনো শোনেওনি-স্রেফ স্বরভঙ্গি শুনে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে যাচ্ছে। ফরাসি বলছে স্পেনের ভাষা, ওলন্দাজ বলছে ফরাসি ভাষা, ইংরেজ বলছে জার্মান ভাষা, স্পানিয়ার্ড বলছে ইংরিজি ভাষা, ইতালিয়ান বলছে রাশিয়ান ভাষা, আর একজন ফরাসি বলছে ভাষাটা ইটালিয়ান। মজাটা এই যে, প্রত্যেকেই অদ্ভুত এই ভাষাকে মাতৃভাষায় খুঁজে না পেয়ে অন্য ভাষা বলে ধরে নিচ্ছে। তবে হ্যাঁ, অদ্ভুত এই ভাষায় যে ছন্দ নেই, ভাষাটা যে তাল কাটা, খুবই হুড়বড় করে বলা হয়েছে, এবং যত না তীক্ষ্ণ তার চেয়ে বেশি চোয়াড়ে-এমন সব কথা মোটামুটি মিলে যাচ্ছে। কিন্তু সেই ভাষার একটা শব্দও কেউ সঠিক ধরতে পারেনি-এমনকি আশ্চর্য সেই আওয়াজ আদৌ শব্দ কিনা-তাও হলফ করে কেউ বলতে পারেনি। তাহলে কি সেই শব্দ আফ্রিকার অথবা এশিয়ান মানুষের ? এই দুই মহাদেশের মানুষ কিন্তু গিজগিজ করছে না প্যারিস শহরে।

যুক্তির সিঁড়ি ভেঙে এই থেকেই আসা যায় একটা সন্দেহে-এবং সেই সন্দেহটা এই রহস্যের আসল চাবিকাঠি। আবার বলছি, ঘষঘষে গলা আর তীক্ষ্ণ গলা-এই সূত্র ধরেই আমি সমাধানে পৌঁছেছি। সমাধানটা কি এখন তা বলবো না।

কল্পনার রথে চড়ে ফিরে যাওয়া যাক অকুস্থলে। হত্যাকারীরা অশরীরী অবশ্যই নয়-মা আর মেয়েকে অদৃশ্য আততায়ীরা অকথ্য যন্ত্রণা দিয়ে প্রাণশূন্য করে যায়নি। যারা এসেছিল সামনের দুই [illegible], মা আর মেয়ের মতোই তাদের দেহ রক্ত মাংস দিয়ে গড়া। তারা ছিল ঘরের মধ্যে-সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময়ে তাদের গলাবাজি তার প্রমাণ। তারপর তিন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তারা নিশ্চয় শূন্যে মিলিয়ে

যায়নি-পালিয়েছে ঘর দুটো থেকে। কিন্তু কিভাবে ? কোন পথ দিয়ে ? চিমনিগুলো চুল্লি থেকে আট দশ ফুট উঁচুতে-বড় বেড়ালও তার মধ্যে ঢুকতে পারে না-মানুষ তো পারেই না। চিলেকোঠার পাল্লাও পেরেক ঠুকে বন্ধ করা। সামনের জানলা দিয়ে পালাতে গেলে রাস্তার লোক তাদের দেখে ফেলতো-তাহলে কি তারা পেছনের ঘরের বন্ধ জানলা ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে ? অসম্ভব সম্ভাবনা। বাস্তবতার বিচারে অসম্ভব বলে উড়িয়ে না দিয়ে এই সম্ভাবনা নিয়ে একটু ভাবা যাক।

পেছনের ঘরটায় জানলা আছে দুটো। একটার সামনে নেই কোনো ফার্নিচার-তাই সহজেই চোখে পড়ে; আর একটার সামনে আছে বেমক্কা খাটটা-তাই তলার দিকটা চোখের আড়ালে থাকে।

যে জানলার সামনে ফার্নিচার নেই, তার কাঁচের শার্সি নীচে নামানো এবং শার্সির ওপরে একটা পেরেক ঠুকে ঢুকিয়ে দেওয়ায়, শার্সি ওপরে ওঠানো যায় না। পুলিসও তাই দেখে ধরে নিয়েছে, শার্সি বন্ধ থাকে বারোমাস। পাশের জানলাতেও দেখলাম, হুবহু ওইরকম একটা পেরেক শার্সির মাথায় কাঠের ফ্রেমে ঢোকানো রয়েছে, অর্থাৎ এ শার্সিও ওপরে ওঠানো যায় না।

যা অসম্ভব তাই নিয়েই তখন ভাবতে শুরু করেছি। অসম্ভব বিচার করেই পুলিস এই জানলা দুটো নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু এই দুটো জানলা ছাড়া লোকের চোখে ধুলো দিয়ে পালানোও তো সম্ভব নয়। তবে কি জানলা খোলা যায় না ভেতর থেকে ?

প্রথম জানলাটার তলায় ছিটকিনি লাগানো ভেতর দিক থেকে। খুনীরা যদি এই জানলা খুলেচম্পটঅদেয়, বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ভেতরের ছিটকিনি লাগিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তাহলে বাকি থাকে দ্বিতীয় জানলা।

প্রথম জানলার ছিটকিনি খোলবার পরেও শার্সি তুলতে পারছিলাম না কিছুতেই। পেরেকটা আসলে স্প্রিং নয়তো ? চাপ মারলাম পেরেকে-স্প্রিং সরে গেল-শার্সি উঠে গেল সাঁ করে। পেরেক চেপে ধরে শার্সি নামিয়ে আনলাম নিচেতে।

চলে এলাম দ্বিতীয় জানলায়-যে জানলা রয়েছে খাটের আড়ালে। এর নিচে ছিটকিনি লাগানো নেই বটে-কিন্তু মাথায় পেরেক তো রয়েছে। পেরেকে হাত বুলোতে গিয়ে দেখি, তার অর্ধেক ভেতরে ভেঙে ঢুকে আটকে রয়েছে এবং ভাঙা জায়গায় মরচে ধরে রয়েছে। ভাঙাটা তাহলে অনেক আগের। এখন দেখা যাক স্প্রিং আছে কিনা। চাপ দিলাম ভাঙা পেরেকের মাথায়। চাপ পড়লো স্প্রিংয়ে-সাঁ করে উঠে গেল শার্সি। ছেড়ে

দিতেই নেমে এল যথাস্থানে। ভাঙা পেরেক রইলো নিজের গর্তে মাথা বাড়িয়ে।

বুঝলাম। প্রথম জানলার ছিটকিনি দেখে প্রথমে হতাশ হয়েছিল পুলিস। তারপর ছিটকিনি খুলেও শার্সি খুলতে পারেনি-পেরেক দেখে হাল ছেড়ে দিয়েছে। পেরেকে চাপ দিলে যে স্প্রিং সরে যায়-সে গবেষণার মধ্যে আর যায়নি। দুই জানলায় একই গোদা পেরেকের মাথা দেখে ধরে নিয়েছে, শার্সি যাতে না ওঠানো যায়, তারই ব্যবস্থা করা হয়েছে পেরেক ঠুকে। কিন্তু দুটো পেরেকই যে দুটো স্প্রিংয়ে চাপ দেওয়ার বোতাম-সেটা আর আবিষ্কার করার চেষ্টা করেনি।

প্রথম জানলার পেরেক ভাঙা নয় বলে, শার্সি নামাতে হলে পেরেক টিপে থাকতে হয়। দ্বিতীয় জানলার পেরেক ভেঙে গিয়ে ভেতরে ঢুকে চাপ মেরে আছে বলে, শার্সি নামানোর সময়ে শার্সিকে উপর থেকে ছেড়ে দিলে আপনিই নেমে আসে-ভেতর থেকে পেরেক টিপে থাকতে হয় না।

খুনীরা তাহলে এই দ্বিতীয় জানলার শার্সি তুলে বাইরে বেরিয়েছে, শার্সি ছেড়ে দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে।

তারপর ? চারতলা থেকে কি ডানা মেলে উড়ে গেল ?

বাড়ির পেছনে গিয়ে দেখলাম, দ্বিতীয় জানলার সাড়ে পাঁচ ফুট দূরে রয়েছে লাইটনিং রড-বাজ পড়লে যেন বিদ্যুৎ তার মধ্যে দিয়ে মাটিতে চলে যায়। প্যারিসের অনেক বাড়িতেই থাকে। এ বাড়িতেও আছে। কিন্তু জানলার গোবরাট থেকে সাড়ে পাঁচ ফুট দূরের লাইটনিং রড ধরা কি সম্ভব ?

আবার সেই সম্ভব-অসম্ভবের বিচার এসে গেল। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলেই তো হাল ছেড়ে দিয়েছে পুলিস, আমি কিন্তু এই অসম্ভবের মধ্যেই সম্ভাব্য পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করে গেলাম। পেয়েও গেলাম। এ বাড়ির খড়খড়ি এক পাল্লার-দু-পাল্লার নয়। তলায় খাঁজকাটা বলে খামচে ধরা যায়। চওড়ায় সাড়ে তিন ফুট-সেকেলে বাড়িতে যেরকম থাকে। খড়খড়ির এই চওড়া পাল্লা যদি পুরো খুলে গিয়ে দমাস করে দেওয়ালে আছড়ে লেপটে যায়, তাহলে লাইটনিং রড থাকে আর মাত্র দু-ফুট দূরে। অতি-তৎপর, অসম্ভব অ্যাকটিভ কারও পক্ষে ঝুলন্ত খড়খড়ি থেকে দু-ফুট টপকে লাইটনিং রড ধরে ফেলা অসম্ভব নয়। তারপর লাথি মেরে অথবা ছিটকে যাওয়ার সময়ে পায়ে লাথি লেগে খড়খড়ি ফের ফিরে আসবে জানলার ফ্রেমে-বন্ধ থাকবে আগের মতোই। আমি অবশ্য প্রথম যখন দেখেছিলাম এই খড়খড়ি-তখন তা জানলা থেকে সমকোণে খুলেছিল। অর্থাৎ পলাতকের পলায়নের পদাঘাতে খড়খড়ি জানলা পর্যন্ত ফিরে আসেনি।

এইবার আসছি আর একটা অসম্ভব সম্ভাবনার খতিয়ানে। অত্যন্ত অস্বাভাবিক অ্যাকটিভিটির সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছি আরো একটা অস্বাভ্যবিক ব্যাপার-মানে, সেই চিল চেঁচানি-যার একটা শব্দও কেউ ধরতে পারেনি, মাথা মুণ্ড বোঝা দূরে থাকুক-শব্দটা কোন দেশের-সে বিষয়ে দুই সাক্ষী কখনোও একমত হতে পারেনি-অদ্ভুত সেই চিল-চিৎকার শুধু কানের পর্দা ছিঁড়ে ফেলার মতোই নয়-ভয়ানক হড়বড়ে আর এলোমেলো, ভীষণ ছন্দহীন আর তালকাটা।-কী বুঝলে ?

কিছুই বুঝলাম না। মানে, সেরকম স্পষ্ট কোনো ধারণা মাথায় এল না। তবে একটা অস্পষ্ট ছায়া ছায়া ভাব মাথার কোষে কোষে সঞ্চারিত হতে শুরু করলো। এরকম অনুভূতির অভিজ্ঞতা অনেকের নিশ্চয় ঘটেছে-একটা অবোধ অব্যাখ্যাত অবাঙমানসগোচর ধারণা তমসা-কুয়াশার মধ্যে যেন চাপা আভা সৃষ্টি করেই মিলিয়ে যাচ্ছে। ধরি ধরি করেও ধরতে পারছি না। দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে চেয়ে রইলাম আশ্চর্য বন্ধু দুর্পির দিকে।

নির্বিকারভাবে সাদা দেওয়াল দেখতে দেখতে তখনো বহুদূরের কোনো শ্রোতার উদ্দেশে বাক্যলহরী নিক্ষেপ করে চলেছে দুর্পি একই রকম স্বগতোক্তির সুরে, 'দুটো অস্বাভাবিক ব্যাপার তোমাকে শোনালাম। এবার শোন তৃতীয় অস্বাভাবিক কাণ্ড। পুলিসও বলছে, খুন করে কি লাভ হলো খুনীদের ? কেন ঘরময় দামি দামি জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে এমনকি চার হাজার সোনার টাকাও ফেলে রেখে চলে গেল ? টাকা প্রাপ্তির পরেই খুন হওয়া-এরকম ঘটনা নতুন নয়, নতুন হচ্ছে টাকা প্রাপ্তির পরেই খুন হওয়া এবংসেই টাকা ফেলে রেখে খুনীদের চলে যাওয়া। অস্বাভাবিক তাই না ?

'তিনটে অস্বাভাবিক ব্যাপারের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছি চার নম্বর অস্বাভাবিক কাণ্ডকারখানা। মেয়েটাকে অমানুষিক শক্তি দিয়ে চিমনির মধ্যে গুঁজে দেওয়া হয়েছিল। সেই শক্তির পরিমাণটা টের পাওয়া যায় তখনি, যখন চার পাঁচ জন পালোয়ান টাইপের পুরুষের কালঘাম ছুটে গিয়েছে বডিটাকে টেনে নামাতে গিয়ে। তাহলে চার পাঁচ জনের সমান যায় সেই অমানুষিক শক্তি ? অস্বাভাবিক ! অস্বাভাবিক !

এবার আসছি পাঁচ নম্বর অস্বাভাবিকতায়-খুবই বীভৎস অস্বাভাবিক শক্তির নমুনা রেখে গেছে রহস্যময় আগন্তুক একই সঙ্গে অনেকগুলো চুল গোড়া সমেত উপড়ে নিয়ে। মনে পড়ে, মাংস পর্যন্ত উঠে এসেছিল রক্তমাখা সাদা চুলের গোড়ায়, বিশ তিরিশটা চুলকে মুঠোয় ধরে একসঙ্গে টেনে ছিঁড়তে যে কি বিরাট শক্তির দরকার হয়, তা তোমার অজানা নয়। বুড়ির মাথা থেকে কিন্তু ছেঁড়া হয়েছে কম করেও আধ-মিলিয়ন চুল ! পশুশক্তি

নাকি ? গলাটা কিভাবে কাটা হয়েছে মনে পড়ে ? এক কোপেই ধড় থেকে মুণ্ড আলাদা। হাড়গোড় টুকরো টুকরো করা হয়েছে ভোঁতা জিনিসের চোট মেরে-দুই ডাক্তার এক রায় দিয়েছেন। খুবই খাঁটি কথা। ভোঁতা জিনিসটা দেখেছি সব্বাই। পেছনের উঠোনের পাথর। চারতলা থেকে ছুঁড়ে আছড়ে বুড়িকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল সেই পাথরে। জানলার ব্যাপারটা নিয়ে পুলিস হতবুদ্ধি হয়ে না গেলে এই রহস্যটা অন্তত ধরতে পারতো। এত নৃশংসতা, এত অমানবিক পৈশাচিকতা আর এমন আসুরিক শক্তি'র খেলা কার দ্বারা সম্ভব হতে পারে বলে মনে হয় তোমার ? এতগুলো অস্বাভাবিক কাণ্ড কে করতে পারে অনায়াসে অত্যন্ত স্বাভাবিকভবে ?'

'পাগল,' দুর্পিঁর কথায় গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছিল বলেই বলে দিলাম ঝট করে। 'পাশের পাগলা গারদ থেকে নিশ্চয় কোনো বদ্ধ উন্মাদ পালিয়ে এসেছিল।'

'পাগলের কথাও তো বোঝা যেত ? যে দেশের মানুষই হোক না কেন, যত জড়িয়েই কথা বলুক না কেন, শব্দ উচ্চারণগুলো তো হবে তালে তাল রেখে ? শব্দের অংশগুলোও তো স্পষ্ট হবে ? তাছাড়া, বুড়ির মুঠো থেকে এই যে চুলটা উদ্ধার করেছি, এটা দেখে তোমার কী মনে হয় ?'

'দুর্পিঁ। এ তো মানুষের চুল নয়।' বলতে বলতে গায়ের রক্ত আমার জল হয়ে এলো।

'আমিও জানি। মানুষের গায়ে এরকম চুল কখনো গজায় না। থাক এই প্রসঙ্গ। এবার দেখাই তোমাকে একটা স্কেচ। ডাক্তারদের কথা মতো এই স্কেচ আমি এঁকেছি। মেয়েটাকে গলা টিপে মারা হয়েছিল। খুনির আঙুল গলা ঘিরে চেপে বসে গিয়েছিল। আঙুলের নখ মাংস ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। তোমার হাতের আঙুল বসাও এই আঁকা আঙুলগুলোর ওপর।'

'পারছি না।'

'পারবে না। ফ্ল্যাট পেপারে আঁকা যে। আচ্ছা, এবার কাগজটা জড়িয়ে দিচ্ছি এই কাঠের সিলিণ্ডারে-মানুষের গলা যেরকম হয়। এবার নরঘাতকের আঙুলে মেলাও তোমার আঙুল।'

'অসম্ভব। এ আঙুল মানুষের আঙুল নয়। এ হাত মানুষের হাত নয়।'

'এবার পড়ো বিশ্বকোষের এই পাতাটা।'

বলে দুর্পিঁ যে পাতাটা মেলে ধরলো আমার চোখের সামনে, তাতে আঁকা রয়েছে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের এক প্রকাণ্ড ওরাংওটাংয়ের ছবি। পড়বার দরকার হলো না। বিরাটদেহী

এই নরবানরের বিপুল শক্তি, বিদ্যুৎগতি তৎপরতা, ভয়ানক নৃশংসতা আর কৌতুকাবহ অনুকরণপ্রিয়তার সংবাদ আমাদের কারোর অজানা নয়।

ভয়াল হত্যারহস্যও নিমেষে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে।

বিশেষ কয়েকটা জায়গা ছাড়া।

তাই বললাম, 'ওরাংওটাং-এর আঙুলের ছাপ এইভাবেই পড়ে মানুষের গলায় যদিও এই প্রথম শুনছি মানুষের গলা টিপেছে ওরাংওটাং। যে চুলটা দেখালে, তার হুবহু বর্ণনাও রয়েছে এই বিশ্বকোষে। বুঝলাম! বুঝলাম! শুধু বুঝলাম না, সিঁড়ি থেকে দুজনের কথা কাটাকাটি শোনা গেছিল কেন? দুজনের একজন তো ফরাসি?'

'ঠিকই তো। ফরাসি ভাষায় সে তো বলেছিল 'mon Dieu!' ওরাংওটাংয়ের কাণ্ড দেখে অনুতপ্ত আর বিচলিত না হলে এভাবে কথা বলতে পারতো না। এই একটা কথা থেকেই এই কেসের সমাধান আমি ছকে ফেলেছি। পোষা ওরাংওটাং পালিয়েছিল নিশ্চয়-এখনো হয়তো পালিয়েই রয়েছে-মরুক গে। ফরাসি লোকটা তার খোঁজে এসে বীভৎস কাণ্ডকারখানা দেখে ভয়ানক ভেঙে পড়ে-তারপরেই সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পেয়ে পালায়। এই গেল আমার অনুমান।আসলে কী কী ঘটেছে তা তার মুখেই শুনবো বলে কাল বাড়ি ফেরার পথে এই বিজ্ঞাপনটা কাগজে দিয়ে এসেছিলাম। দেখো।'

দুপিঁর হাত থেকে নিলাম কাগজটা। এ কাগজ নাবিক, খালাসি আর জাহাজিদের জন্যে ছাপা হয়। তাতে বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে এইভাবে: ধরা পড়েছে: অমুক তারিখে। (যে দিন খুন হয় সেই তারিখ) বোর্নিজ প্রজাতির একটা মস্ত ওরাংওটাং ধরা পড়েছে বোলন পাড়ায়। জানা গেছে, মালিক কোনো এক মালটিজ জাহাজের খালাসি। সে এসে নিয়ে যেতে পারে ওরাংওটাংকে। ধরবার জন্যে আর রেখে দেওয়ার জন্যে, যা খরচ পড়েছে-তা দিয়ে যেতে হবে। অমুক ঠিকানায় অমুক বাড়িতে আসতে হবে বিজ্ঞাপন পড়েই।

বললাম, 'লোকটা যে খালাসির কাজ করে মালটিজ জাহাজে, তা আঁচ করলে কি করে?'

'আঁচ করতে যাবো কেন? আমি তো জানি লোকটা পেশায় খালাসির কাজ করে মালটিজ জাহাজেই। এই যে ছোট্ট ফিতেটা দেখছো, এ ফিতে আমি কুড়িয়ে পেয়েছি লাইটনিং রডের তলায়-পুলিসের চোখ এড়িয়ে গেছে-কিন্তু আমার চোখ তো তুচ্ছ জিনিসগুলোকেই বেশি করে দেখে। তুচ্ছ হলেও জিনিসটা যে নেহাৎ তুচ্ছ নয়, এখুনি তা বুঝিয়ে দিচ্ছি। প্রথমেই বলে রাখি, এ ফিতে মা অথবা মেয়ের কারোর হতে পারে না-চাল্লতলায় যাদের

জেরা, তাদের মাথার ফিতে একতলায় পড়ে থাকতে যাবে কেন? যদিও বা থাকে, এরকম গিঁট আর ফাঁস তো মা-মেয়ের কারোর দ্বারা সম্ভব নয়। তেল মাখানো ফিতের এই গিঁট আর এই ফাঁস বাঁধতে জানে শুধু খালাসিরাই-বিশেষ করে এই গিঁট ঠিক এইভাবে বাঁধে মালটিজ জাহাজের খালাসিরা। তাহলেই দেখলে, ফিতে দেখেই জেনে ফেলেছি ফরাসি আগন্তুক মালটিজ জাহাজের খালাসি-আঁচ করতে যাবো কেন?'

'আমার ঘাট হয়েছে।' অবরুদ্ধ স্বরে বললাম আমি, দুপি কুহকবিদ্যার অধিকারী নয়-কিন্তু এরকম খাসা বিশ্লেষণী ব্রেন তো সাধারণ মানুষের করোটির মধ্যে বিরাজ করে না!

দুপি কিন্তু থেমে নেই, বলেই চলেছে স্বগতোক্তির সুরে-'জেনেশুনেই বিজ্ঞাপন দিলাম কাগজে মালটিজ জাহাজের সেই খালাসিকে পত্রপাঠ চলে আসার জন্যে। ধরা যাক আমার ভুল হয়েছে, ফিতে থেকে সিদ্ধান্ত নিতে আগাগোড়া ভুল করেছি-হয়তো সে খালাসি নয়, মালটিজ জাহাজেরও লোক নয়-তাহলেও বিজ্ঞাপনে যা লিখেছি, তাতে তার ক্ষতি হচ্ছে না। কেউ হয়তো আমাকে ভুল বুঝিয়ে বিজ্ঞাপন দিইয়েছে, সুতরাং আমার ভুল ভাঙানোর মেহনতের মধ্যে সে যাবে না। আর যদি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি, তাহলে মস্ত জিত আমার। লোকটা খুন করেনি, কিন্তু খুনের সমস্ত বৃত্তান্ত সে জানে। ওরাংওটাং ফিরিয়ে নিয়ে যাবে কি যাবে না-এই নিয়ে পড়বে দ্বিধায়। ভাববে এইভাবে; আমি নির্দোষ, আমি গরিব। ওরাংওটাং-এর দাম অনেক-আমার কাছে কুবেরের সম্পদ বললেই চলে-একটুখানি ঝুঁকি নেওয়ার ভয়ে পেছিয়ে গেলে ক্ষতি তো আমারই। বিপদ একটু আছে বটে, সেই বিপদকে রুখে দাঁড়ালে ওরাংওটাং আবার চলে আসবে আমার জিম্মায়। বোলন পাড়া রু মর্গ পাড়া থেকে অনেক দূরে-কসাইগিরি যেখানে হয়েছে, সেখান থেকে এতদূরে যখন নচ্ছার ওরাংওটাংকে পাকড়াও করা হয়েছে, তখন পুলিস কিছুতেই আঁচ করতে পারবে না যে, ওরাংওটাংই এই নরমেধ যজ্ঞ করে গেছে। তাছাড়া পুলিস তো নাকানি চোবানি খাচ্ছে-ক্ষীণতম সূত্র উদ্ধারও করতে না পেরে নিতান্ত নিরীহ একজন ব্যাঙ্ক-ক্লার্ককে খাঁচায় পুরে চাকরি রক্ষে করছে। ওরাংওটাং যে খুনের নায়ক, এটাও যদি পুলিস ধরে নেয়-তাহলেও খুনের চার্জে আমাকে তো ফেলতে পারবে না। কে খুন করেছে, এটা জানি মানেই যে আমিই খুন করেছি-তা তো হয় না। তার চেয়ে বড় কথা, আমি তো ধরা পড়ে গেছি বিজ্ঞাপনদাতার কাছে। ওরাংওটাং ব্যাটাচ্ছেলে যে আমারই সম্পত্তি, এটা জেনেই তো তিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। আর কী জেনে ফেলেছেন, তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। এখন যদি আমি আমার সম্পত্তির দখল নিতে না যাই বুক ঠুকে, তাতে সমস্ত

সন্দেহটা গিয়ে পড়বে হারামজাদা ওরাংওটাংটার ওপর। আমি তা চাই না। আমাকে অথবা আমার ওরাংওটাংকে নিয়ে কেউ ঢাক পিটে বেড়াক, মোটেই তা চাই না। সুতরাং চুপচাপ গিয়ে আমার ওরাংওটাংকে এনে আমার কাছে রেখে দিলেই কিছুদিন পরে সব ধামাচাপা পড়ে যাবে।'

ঠিক এই সময়ে পায়ের আওয়াজ ভেসে এলো সিঁড়ি থেকে।

দুপিঁ বললে, 'পিস্তল ঠিক রাখো। কিন্তু আমার সঙ্কেত না পেলে চালাবে না।'

বাড়ির সদর দরজা খোলাই ছিল। তাই ঘণ্টা না বাজিয়েই দর্শনার্থী ঢুকেছে বাড়িতে, সিঁড়ি বেয়ে উঠেও আসছে। আচমকা দ্বিধায় পড়েছে বোঝা গেল। থমকে গেছে পায়ের আওয়াজ। তারপরেই শব্দ শুনে বুঝলাম, পায়ের মালিক নিচে নামছে। বিদ্যুৎগতিতে দরজার দিকে ছিটকে যাচ্ছিল দুপিঁ-আর ঠিক তখনি আবার পায়ের আওয়াজ উঠে আসতে লাগলো ওপর দিকে, এবার আর দ্বিধা নয়, ফিরে যাওয়া নয়, গট গট করে উঠে এসে খটখট করে টোকা মারলো দরজায়।

'ভেতরে আসুন,' গলায় মধু ঢেলে আন্তরিক স্বাগতম জানালো দুপিঁ।

ঘরে ঢুকলো যে পুরুষ পুঙ্গবটি, নিঃসন্দেহে সে জাহাজের খালাসি। গালপাট্টা আর গোঁফের জঙ্গলে আধখানা মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। যেমন লম্বা, তেমনি গাঁট্টাগোট্টা বিশাল বপু। ঘাড়ে গর্দানে হাতে বুকে ডুমোডুমো পেশি। চোখমুখে বেপরোয়া ভাব-তার অনেকটা বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করার পূর্বপ্রস্তুতি নিশ্চয়। মুখের যেটুকু দেখা যাচ্ছে, সেটুকু রোদে জ্বলে তামাটে মেরে গেছে। একহাতে একটা বিরাট কাঠের গদা-এছাড়া একেবারেই নিরস্ত্র। ঘরে ঢুকেই আড়ষ্টভাবে বাতাসে মাথা ঠুকে বললে, 'গুড ইভিনিং।' বললো বটে ইংরেজিতে, কিন্তু তাতে ফরাসি টান সুস্পষ্ট।

দুপিঁ বললো, 'সিট ডাউন, মাই ফ্রেণ্ড। ওরাংওটাং নিতে এসেছো তো ? অপূর্ব জীব কিন্তু ? ঈর্ষা হচ্ছে এমন একটা প্রাণীর মালিক হতে পেরেছো বলে। বয়স কত ?'

'আমার ?'

'না, না। তোমার ওরাংওটাং-এর।'

'বছর চার-পাঁচ,' বলতে বলতে অনেক সহজ হয়ে এলো খালাসি লোকটা। চোখমুখের টান-টান ভাব চলে গেল। বুক ভরা নিঃশ্বেস বিষম উৎকণ্ঠার অবসান ঘটালো এক নিমেষে। 'কোথায় সে ?'

'এখানে তো নেই। এখানে রাখার ব্যবস্থাও নেই। পাশেই আছে-বেশি দূরে নয়। কাল সকালে ফেরত পাবে। ভালো কথা,

জিনিসটা যে তোমারই, তা চিনবে কী করে ?'

'না চিনে থাকা যায় ? আমার ওরাংওটাং আমি চিনবো না ?'

'বেশ, বেশ। কিন্তু আমার যে হাতছাড়া করতে মন চাইছে না।'

'তাহলে খামোকা এত কষ্ট দিলেন কেন ? অন্যায়, খুব অন্যায়। পুরস্কার চান তো বলুন, দিয়ে দিচ্ছি-আমার জিনিস আমাকে দিন।'

'পুরস্কার পেলে অবশ্য ফিরিয়ে তো দেবোই । কিন্তু পুরস্কারটা কী হবে, সেইটাই হচ্ছে ভাববার ব্যাপার।' বলতে বলতে দুপিঁ উঠে গেল দরজার কাছে খুব শান্ত চরণে। দরজায় চাবি দিয়ে চাবি রাখালো পকেটে। পকেট থেকে রিভলভার বের করে রাখলো পাশের টেবিলে। বললে খুব আস্তে, 'পুরস্কার তো একটাই। রু মর্গের খুন-টুনগুলো সম্বন্ধে যা জানো, সব বলো।'

যেন দম আটকে এলো ফরাসি খালাসির। টকটকে লাল হয়ে গেল মুখ। গদা খামচে চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়েও বসে পড়লো ধপাস করে। থরথর করে কাঁপতে লাগলো পা থেকে মাথা পর্যন্ত। ফ্যাকাশে মেরে গেল মড়ার মতন। কোনো আওয়াজই বেরলো না মুখ দিয়ে-কথা তো নয়ই। অবস্থা দেখে বড় মায়া হলো আমার।

নরম গলায় বললো দুপিঁ, 'মাই ফ্রেণ্ড, খামোকা ভয় পাচ্ছো। অনিষ্ট করবো বলে তো ডেকে আনিনি। সে ইচ্ছে থাকলে অনেক আগেই করতাম-কেন না, এটা তো বুঝেছো অনেক খবরই রাখি আমি। এটাও জানি, রু মর্গের পৈশাচিক খুনখারাপিতে তোমার হাত নেই-অথচ নির্দোষ হয়েও তুমি জড়িয়ে পড়েছো। সুতরাং চুপ করে থাকলে বিপদ কেটে বেরবে কী করে ? কোনো দোষ নেই তোমার। খুন তো নয়ই, চুরি ডাকাতির অপরাধও তুমি করোনি-অথচ করলেও করতে পারতে- সে সুযোগও তুমি পেয়েছিলে। তুমি যেমন নিরপরাধ, ঠিক তেমনি নিরপরাধ আর একটি লোক-যাকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে। এখন যদি সব কথা খুলে না বলো, তাহলে তো তার সাজা হবেই।'

দুপিঁর কথা শুনতে শুনতে অনেকটা সামলে নিলেও, খালাসির সেই বেপরোয়া মুখচ্ছবি আর ফিরে এলো না। যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে তাগড়াই লোকটা দুপিঁর নিরীহ নাটকের চরম চোটে।

'বলবো, বলবো,' দম নিয়ে বললে সে একটু পরে, 'সবই বলবো। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, তবুও বলবো। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার কোনো দোষ নেই।'

'করছি।' বললে দুপিঁ।

খালাসি তখন যা বলে গেল তা সংক্ষেপে এই: কিছুদিন আগে

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে দলবল নিয়ে সে বোর্নিও-র ভেতরে গিয়েছিল স্রেফ বেড়ানোর মজায়। তখন পেয়েছিল একটা ওরাংওটাং। পাকড়াও করেছিল এক বন্ধুর সাহায্য নিয়ে। তারপর সেই বন্ধুর হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় ওরাংওটাং এসেছিল তারই দখলে। জাহাজে করে আনতে গিয়ে বিষম বেগ পেতে হয়েছে। অনেক কষ্টে প্যারিসে এনে রেখে দিয়েছিল নিজের বাড়িতে। মতলব ছিল বেচে দেবে পায়ের ঘা-টা সেরে গেলেই। জাহাজে দাপাদাপি আর দামালিপনা করতে গিয়ে ভাঙা কাঠ পায়ে ঢুকিয়ে নিজেই নিজেকে জখম করে ফেলেছিল হতচ্ছাড়া ওরাংওটাং।

অত্যন্ত বদমেজাজী এই ওরাংওটাংকে স্রেফ চাবুক মেরে শায়েস্তা করতো খালাসি। প্যারিসের বাড়িতে তাকে আটকে রেখেছিল একটা ছোট্ট ঘরে। রু মর্গে যেদিন ডবল খুন হয়ে যায়, সেইদিন গভীর রাতে বাড়ি ফিরে দেখেছিল, তারই খোলা ক্ষুর নিয়ে আয়নার সামনে বসে দাড়ি কামাচ্ছে শয়তান, ওরাংওটাং। নিশ্চয় চাবির ফোকর দিয়ে মালিককে দেখেছিল ক্ষুর খুলে দাড়ি কামাতে। ধারালো সেই ক্ষুর নিয়ে অবলীলাক্রমে গাল চাঁচছে দেখেই ভয়ে কাঠ হয়ে গেছিল খালাসি। হাতের কাছেই পেয়েছিল চাবুকটা। চাবুক খামচে ধরতেই একলাফে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে, খোলা একটা জানলা দিয়ে অন্ধকার রাস্তায় মিলিয়ে গেছিল পাজির পাঝাড়া-হাতে খোলা ক্ষুর নিয়ে।

খালাসি ছুটেছিল পেছন পেছন। বিটলে ওরাংওটাং হাতে খোলা ক্ষুর নিয়ে একটু গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল, দেখছিল মালিক কতটা কাছে এলো-কাছাকাছি এলেই আবার দে-ছুট ! দে-ছুট ! এইভাবে অন্ধকার প্যারিসের এ-রাস্তা সে-রাস্তা দিয়ে এসে গেছিল রু মর্গের একটা বাড়ির পেছন দিকে।

তখন রাত প্রায় তিনটে। চারতলার ঘরে আলো জ্বলছে দেখেই উল্লুক ওরাংওটাং তিনলাফে ঠিকরে গেছিল লাইটনিং রডের সামনে। আর অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় উঠে গিয়েছিল ওপরে। চারতলার জানলার খড়খড়ি তখন পুরো খোলা-লেপটে রয়েছে দেওয়ালে। হারামজাদা লাইটনিং রড ছেড়ে সেই খড়খড়ি ধরে বোঁ-করে ঘুরে গিয়ে খোলা শার্সি দিয়ে সুরুৎ করে ঢুকে যেতেই খড়খড়িটা পায়ের ধাক্কায় আবার ফিরে এসেছিল দেওয়ালের গায়ে।

এই দেখেই ভয় পেয়েছিল খালাসি। খুশিও হয়েছিল। ঘরের মধ্যে যখন সেঁধিয়েছে, এবার কোণঠাসা করা যাবে রাস্কেলটাকে-পালাবার পথ তো বন্ধ-সেখানে চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে খালাসি।

ভয়টা হয়েছিল, ঘরের মধ্যে ওই মূর্তিমান আতঙ্ক খোলা ক্ষুর

হাতে যদি কিছু ঘটিয়ে বসে-এই ভেবে। গেরস্থ বাড়ি। ঘরে আলো জ্বলছে। নিশ্চয় লোক রয়েছে। সেই ঘরেই কিনা ঝড়ের মতো ঢুকলো ভয়ানক ওই আপদ।

বিপদের আঁচ করেই খালাসি তৎক্ষণাৎ চাবুক হাতে লাইটনিং রড বেয়ে উঠে গিয়েছিল চারতলায়-খালাসির কাছে একাজ স্রেফ ছেলেখেলা। তারপরের কাজটা খালাসির পেশায় মানায় না-গেরস্থ ঘরে তো আর জানলা গলে ঢোকা যায় না। খুব জোর উঁকি মারা যায়।

উঁকি মারতে গিয়েই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল খালাসির। খাটের মাথায় খোলা শার্সি দিয়ে দেখা যাচ্ছিল ভেতরের দৃশ্য। খাটের তলা থেকে চাকা লাগানো লোহার সিন্দুক ঘরের মাঝখানে টেনে এনে নিশ্চয় খুলে বসেছিল মা আর মেয়ে। মেঝেতে রয়েছে দলিলপত্র। জানলার দিকে পিঠ করেছিল বলেই দেখতে পায়নি করাল ওরাংওটাংকে। খড়খড়ি আছড়ে পড়ার আওয়াজকে মনে করেছে হাওয়ার কীর্তি।

তারপরেই নিশ্চয় শুরু হয়েছে তাণ্ডবলীলা। খোলা ক্ষুর হাতে খাটের ওপর পেল্লায় দানবের মতো লোমশ ওই বিকট ওরাংওটাং-এর দাঁত খিঁচুনি দেখেই বুকফাটা চিৎকার করতে করতে জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে মেয়ে। ভড়কে গিয়ে নিশ্চয় অবস্থা শান্ত করার জন্যে মায়ের চুলের মুঠি ধরে মুখের সামনে ক্ষুর নেড়ে ভয় কাটানোর চেষ্টা করছিল হারামজাদা নরবানর। খালাসি যখন উঁকি দিচ্ছে, ঠিক তখনই বুড়ির দু-গালের সামনে দাড়ি কামানোর ভঙ্গিমায় ক্ষুরের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে-বুড়ির মন তাতে কি ভয়শূন্য হয়? আতঙ্কে আরও চেঁচিয়ে যাচ্ছে.........নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে-নরবানরের লৌহমুষ্টি আরও শক্ত হচ্ছে-আচমকা পড়্‌পড়িয়ে মাংসসমেত চুলের গোছা উঠে এলো ওরাংওটাং-এর হাতে।

পাশবিক ক্রোধ জাগ্রত হয় তৎক্ষণাৎ। ক্ষুর চালায় এবার গলা লক্ষ্য করে। এক কোপেই প্রায় দু-টুকরো হয়ে যায় গলা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে তখন। আর এই রক্তই তাকে পুরোপুরি ক্ষিপ্ত করে তোলে। উন্মত্ত হিংস্রতায় তখন সে করাল কুটিল। নজর যায় অজ্ঞান মেয়েটার দিকে। ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। দু-হাতে চিপে ধরে গলা-নখ বসে যায় চামড়ায়-প্রাণ বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বন্য নৃশংসতায় গলা নিষ্পেষণ করেই যেতে থাকে। গজরাতে গজরাতে ঠিক তখনি চেয়েছিল জানলার দিকে-দেখেছিল সেখানে ভাসছে মালিকের আতঙ্ক বিস্ফারিত দুই চক্ষু আর মড়ার মতো ফ্যাকাশে মুখ!

এই দেখেই ওরাংওটাং-এর মনে রাগের বদলে এসে গেছিল বিষম ভয়। ভয় সেই চাবুকের-যে চাবুক হাতে নিয়ে এতক্ষণ

তাড়া করে এসেছে খালাসি। চাবুক মানেই শাস্তি। ঘাবড়ে গিয়ে অপকর্ম ঢাকবার জন্যে তক্ষুনি দাপাদাপি শুরু করেছিল ঘরময়। হ্যাঁচকা টানে খাটটাকে নিয়ে এসেছিল ঘরের মাঝখানে। লাফালাফি করতে গিয়ে ঘরের কোনো ফার্নিচার আস্ত রাখেনি। তারপরেই কুকর্ম লুকনোর প্রয়াসে মেয়ের মৃতদেহ তুলে নিয়ে গিয়ে ঠুসে ঢুকিয়ে দিয়েছে চিমনির ভেতরে-পর মুহূর্তেই বুড়ির দেহ তুলে নিয়ে জানলা গলিয়ে আছড়ে ফেলেছে নিচের পাথুরে উঠোনে। চাবুকের ভয়ে ওরাংওটাং-এর নিজের মাথারই তখন ঠিক নেই।

খালাসির আর সহ্য হয়নি। সড়সড় করে নেমে এসেছে লাইটনিং রড বেয়ে। ওরাংওটাং চুলোয় যাক-আগে নিজে বাঁচা যাক। সিঁড়ি বেয়ে ওঠবার সময়ে পাড়াপড়শিরা শুনেছিল এই খালাসিরই আতঙ্কঘন কণ্ঠস্বর আর ওরাংওটাং-এর পাশবিক হুঙ্কার আর গজরানি। তারপর আর কোনো শব্দ শোনা যায়নি।

আর বিশেষ কিছু লেখবার নেই। দরজা ভেঙে পড়ার আগেই নিশ্চয় পৈশাচিক কাণ্ডের নায়ক খুনে ওরাংওটাং জানলা গলে চম্পট দিয়েছিল বলেই ঘরে ঢুকে কাকপক্ষীকেও আর দেখা যায়নি। মালিক তাকে পরে পাকড়াও করেছিল। চড়া দামে বেচতেও পেরেছিল। আমাদের সব কথা শুনে পুলিস প্রিফেক্ট ছেড়ে দিয়েছিলেন নিরপরাধ লা বন-কে। তবে একটু দেঁতো হেসে দুপিঁকে শুধু বলেছিলেন, যে-যার নিজের চরকায় তেল দিলে বড় ভালো হয়।

জবাব না দিয়ে বাইরে এসে দুপিঁ আমাকে বলেছিল, 'বলুক গে। ওর কেল্লায় বসে ওকেই তো গোহারান হারিয়ে এলাম। তাতেও যদি চৈতন্য হয়। হবে না যদিও। বেশি ধূর্ত লোকরা এই বস্তুটা থেকে বঞ্চিত থাকে চিরকাল। পুলিস প্রিফেক্ট যে এই জাতেরই মানষ।'

ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি

(ন্যারেটিভ অফ আর্থার গর্ডন পিম)

দক্ষিণ সমুদ্র অঞ্চলে অসাধারণ অ্যাডভেঞ্চারের পর অ্যাডভেঞ্চার করে আসার পর যুক্তরাষ্ট্রে যখন ফিরে এলাম মাস কয়েক আগে, রিচমণ্ডে কয়েকজন ভদ্রলোকের সান্নিধ্যে আসি দৈবাৎ। তাঁরাই ধরে বসলেন লিখতেই হবে আমার এই দুঃসাহসিক অভিযান লহরী। জনগণের সামনে ঐসব অঞ্চলের ছবির বর্ণনা তুলে ধরা নাকি আমার কর্তব্য। আমার কাহিনী তাঁদের অন্তরে বিপুল আগ্রহের সঞ্চার করেছিল বলেই বিরামহীন তাগিদ দিয়ে চলেছিলেন। আমি কিন্তু অমত করেছিলাম বেশ কয়েকটা কারণে। তার মধ্যে একটা কারণ নিতান্তই ব্যক্তিগত—আমি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির আপত্তি তাতে নেই। অন্যান্য কারণগুলিও আমাকে নিরুৎসাহ করার পক্ষে যথেষ্ট। বেশিরভাগ কাণ্ডকারখানার ধারাবিবরণী ডাইরির আকারে লিখে তো রাখিনি। স্মৃতির ভাঁড়ার থেকে উদ্ধার করে খুঁটিয়ে লেখাও সম্ভব হবে না। অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিতেই হবে। যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করার পক্ষে যথেষ্টও বটে। সোজা কথায়, মনে করে করে লিখতে গেলেই ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে লেখা হয়ে যাবেই—রোধ করা যাবে না—রঙ চড়ানোর ইচ্ছে না থাকলেও কল্পনার রঙের ভেজাল মিশে যাবেই—প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে। নিখাদ সত্য আর থাকবে না। আরও একটা কারণ উপেক্ষা করা যায় না। ঘটনাপঞ্জী এমনই চমকপ্রদ এবং অত্যাশ্চর্য যে আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব—যাঁরা আমাকে চেনেন ভাল করেই—তাঁরা

ছাড়া এসব ঘটনা কেউই বিশ্বাস করবে না-সাধারণ মানুষ মনে করবে অলীক উপন্যাস ফেঁদে বসেছি। ঘটনাবলীর সত্যতা যাচাই করার মত ব্যক্তি বলতে তো আমি একা (আরও একজন অবশ্য আছে-একজন দো-আঁশলা ভারতীয়)। সবচেয়ে বড় কারণটা, লেখার ব্যাপারে আমার অক্ষমতা। লেখা-টেখা আমার আসে না-কোন আস্থাই নেই নিজের ওপর। মূল কারণ কিন্তু এইটাই। এই জন্যেই বন্ধুবর্গের নিরন্তর উপদেশে কর্ণপাত করিনি।

আমার অদ্ভুত অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন মিস্টার পো। বিশেষ করে কুমেরু সমুদ্র অঞ্চলে আমার শিহরণ জাগান অ্যাডভেঞ্চার তাঁকে তাজ্জব করেছিল সবচেয়ে বেশি। ভদ্রলোক থাকেন ভার্জিনিয়ায়। রিচমণ্ড শহর থেকে প্রকাশিত (প্রকাশকের নাম মিস্টার টমাস ডব্লিউ হোয়াইট) 'সাদার্ন লিটারারি মেসেনজার'-এর অধুনা সম্পাদক। সবচেয়ে বেশি চেপে ধরেছিলেন ইনিই। কালবিলম্ব না করে যেন যা কিছু দেখেছি শুনেছি-সমস্ত খুঁটিয়ে বিশদভাবে লিখে ফেলি। লেখা যতই হতকুচ্ছিৎ হোক না কেন ঘটনার সত্যতা আর জলুস পাঠকের মন কেড়ে নেবেই। পাঠকমহলে এ বই সমাদৃত হবেই।

বিলক্ষণ পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও মনস্থির করতে পারিনি আমি। কিছুতেই যখন উদ্বুদ্ধ করতে পারলেন না আমাকে, তখন নিজেই একদিন প্রস্তাব করলেন, আমার আপত্তি না থাকলে অ্যাডভেঞ্চারের গোড়ার দিকের অংশটা লিখবেন উনি নিজেই-আমারই দেওয়া তথ্যপঞ্জীর ভিত্তিতে এবং প্রকাশ করবেন 'সাদার্ন মেসেঞ্জার' পত্রিকায়-উপন্যাসের খোলস পরিয়ে। প্রস্তাবটায় মত দিয়েছিলাম কেবলমাত্র একটি সর্তে-উপন্যাসের ঢঙে লিখলেও আমার আসল নামটা তাতে দিতে হবে। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি মাসে ছদ্মবেশী এই উপন্যাসের দুটো কিস্তি বেরিয়েছিল 'মেসেঞ্জার' পত্রিকায়। কাহিনীটা যে বাস্তবিকই উপন্যাস, এই ধারণা এনে দেওয়ার জন্যে পত্রিকার বিষয়সূচীতে রাখা হয়েছিল মিস্টার পো-এরই নাম।

ধাপ্পাটা কার্যকর হয়েছিল এমনভাবে যে পরবর্তীকালে আমি ঠিক করলাম অ্যাডভেঞ্চার পর্বের বাদবাকী অংশ গুছিয়ে লিখে প্রকাশ করব আমি নিজেই। মূল ঘটনার কোন অংশই না পালটে বা বিকৃতি না করে অলীক কাহিনীর কায়দায় লেখা সত্ত্বেও পাঠক-পাঠিকাদের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছিল সব সত্যি, সব সত্যি-একটা কথাও মনগড়া নয়। এমনকি চিঠি লিখেও তাঁরা তা জানালেন মিস্টার পো-কে। এই কারণেই ঠিক করলাম, আমি নিজে যদি সত্যি ঘটনাকে হুবহু সেইভাবেই লিখে যাই,

পাঠক-পাঠিকার অবিশ্বাস অন্তত কুড়োতে হবে না।

কাহিনীর কতখানি মিস্টার পো-র লেখা এবং কতখানি আমার কলম থেকে বেরিয়েছে-তা পড়লেই বোঝা যাবে। 'মেসেঞ্জার' পত্রিকা যাঁরা পড়েননি, তাঁরাও বুঝতে পারবেন, মিস্টার পো-এর পাকা হাতের লেখা শেষ হল ঠিক কোন খানে এবং আমার কাঁচা হাতের লেখা শুরু হল কোথায়।

এউ জিউ পিম

১

আমার নাম আর্থার গর্ডন পিম। জন্ম নানটাকেট-এ। সমুদ্রসংক্রান্ত সামগ্রীর ব্যবসায়ে নামী কারবারী ছিলেন আমার বাবা এই শহরেই। আমার দাদামশাই ছিলেন দঁ দেআইনজীবি। শুধু পেশার জমিয়েই তাঁর ভাগ্য খুলে যায়নি। এডগারটন নিউ ব্যাঙ্কের শেয়ার কিনেও বেশ দুপয়সা করেছিলেন। দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন আমাকে। জানতাম, তাঁর মৃত্যুর পর বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হব আমিই। ছ বছর বয়সে আমাকে পাঠিয়েছিলেন মিস্টার রিকেট্স্-এর স্কুলে। নিউ বেডফোর্ডে সবাই চিনত এই বৃদ্ধকে। ক্ষ্যাপাটে স্বভাব, একটামাত্র হাত। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত ছিলাম তাঁর স্কুলে। তারপর গেলাম পাহাড়ের ওপর মিস্টার ই রোন্যাল্ডের অ্যাকাডেমিতে। এইখানে ঘনিষ্ঠ হলাম সমুদ্রগামী জাহাজের ক্যাপ্টেন মিস্টার বারনার্ডের ছেলের সঙ্গে। মিস্টার বারনার্ডকেও সবাই চিনত বেডফোর্ডে-এডগারটনে ছিল তাঁর অনেক আত্মীয়স্বজন। তাঁর ছেলের নাম অগাস্টাস-আমার চেয়ে প্রায় দু বছরের বড়। বাবার সঙ্গে তিমি শিকারের অভিযানে বেরিয়ে ফিরে আসার পর দক্ষিণ সমুদ্র অঞ্চলের বিবিধ অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শোনাত আমাকে। প্রায় যেতাম তার বাড়ি-সারাদিন থাকতাম, কখনো কখনো সারা রাতও। শুতাম এক খাটে। ভোর না হওয়া পর্যন্ত ঘুমোতে দিত না। একনাগাড়ে বলে যেত তিনিয়ান দ্বীপের জংলীদের গল্প এবং সমুদ্র পর্যটনের আরও অনেক বিচিত্র কাহিনী। শুনতে শুনতে এমন আগ্রহ জাগ্রত হয়েছিল আমার মনের মধ্যেও যে ঠিক করেছিলাম আমিও যাব সমুদ্র অভিযানে। একটা পালতোলা নৌকা ছিল আমার। নাম, এরিয়েল, দাম প্রায় পঁচাত্তর ডলার। জনা দশেকের মতো জায়গা হত স্বচ্ছন্দে। এই নৌকোয় চেপে দুজনে প্রায়ই পাড়ি জমাতাম সমুদ্রে। সে সব দুঃস্বপ্নসম ডানপিটেমির কথা মনে পড়লে আজও গায়ে কাঁটা দেয়-তারপরেও যে বেঁচে আছি, এটাই একটা বিস্ময়।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি লেখবার আগে ভূমিকা স্বরূপ এইসব অ্যাডভেঞ্চারেরই একটি আগে উপহার

দেওয়া যাক। মিস্টার বারনার্ডের বাড়িতে একরাতে খানাপিনার পর বেশ মত্ত হয়েছিলাম দুই বন্ধু। যথারীতি শুয়ে পড়লাম অগাস্টাসের খাটে। বাড়ি ফেরার নাম না করে। শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল অগাস্টাস–নেশা জমে ওঠায় অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শোনানর মতো অবস্থায় ছিল না। তখন রাত প্রায় একটা। আধঘণ্টা পর আমারও ঝিমুনি এল। ঠিক তখনি ঘুমের মধ্যে আচমকা চমকে উঠল অগাস্টাস। ভীষণ শপথ নিয়ে বলে উঠল, 'চুলোয় যাক ঘুম! দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে এমন সুন্দর বাতাসে আর্থার পিমকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্র অভিযানে বেরোতে হবে এখুনি।' জীবনে এত অবাক হইনি। ভাবলাম মদের নেশায় মাথার ঠিক নেই। অগাস্টাস কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা মাথায় বললে–'মাতলামি করছি ভেব না–এমন চমৎকার বাতাস বইলে বিছানায় শুয়ে থাকা যায়? মাথা আমার খুবই ঠাণ্ডা–এত ঠাণ্ডা জীবনে থাকেনি। কিন্তু এখুনি জামাকাপড় পরে নিয়ে নৌকোয় চেপে চলো বেরিয়ে পড়া যাক।' শুনেই রোমাঞ্চ দেখা দিয়েছিল আমার সর্বাঙ্গে। তখন অক্টোবরের শেষ। বেশ ঠাণ্ডা। হাওয়া তো নয়, যেন ঝড় বইছে। তা সত্ত্বেও ওর পাগলামিতে মন নেচে উঠেছিল আমার। লাফিয়ে নেমেছিলাম খাট থেকে।

চকিতে গায়ে জামা কাপড় চাপিয়ে দুই বন্ধু দৌড়েছিলাম জেটি অভিমুখে। জল উঠে পড়েছিল নৌকোয়। ছেঁচে বার করে দিয়েছিল অগাস্টাস। তারপর পাল তুলে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে বার দরিয়ায়।

আগেই বলেছি জোরালো হাওয়া বইছিল দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে। কনকনে শীত। আকাশ পরিষ্কার। হাল ধরল অগাস্টাস, আমি দাঁড়ালাম মাস্তুলের পাশে। মুখে কথা নেই কারোরই–বেগে ছুটে চলল নৌকো। বেশ কিছুদূর আসার পর জিজ্ঞেস করেছিলাম বন্ধুকে, যাচ্ছি কোথায় এবং ফিরব কখন? সঙ্গে সঙ্গে জবাব না দিয়ে শিস দিয়ে গেল অগাস্টাস। তারপর বললে–'আমি যাচ্ছি সমুদ্রে, তোমার ইচ্ছে হলে বাড়ি ফিরে যেতে পার।' মুখ দেখেই বুঝলাম উত্তেজিত হয়েছে ভীষণভাবে–যদিও শান্ত থাকার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সাদা মার্বেল পাথরের চাইতেও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখটা–হাত কাঁপছে হালের ওপর। এত জোরে কাঁপছে যে হালের ওপর হাত রাখতেও পারছে না। বেশ ভয় পেলাম। সে সময়ে নৌকা চালনায় আনাড়ি ছিলাম। ভরসা একমাত্র অগাস্টাসের ওপর। হাওয়ার জোরও হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় হু হু করে সরে গেলাম ডাঙা থেকে আরও দূরে। তা সত্ত্বেও নির্বিকার রইলাম আধঘণ্টার মতো। মনের ভয় মুখে ফুটিয়ে তুলতেও লজ্জা হচ্ছিল।

কাঁহাতক মুখ বুজে থাকা যায় এইভাবে? উৎকণ্ঠায় কাঠ

হয়ে থাকা কি সম্ভব কি মুখে চাবি দিয়ে ? কথা বলাতেই হল অগাস্টাসের সঙ্গে। ফিরে যাওয়ায় সমীচীন নয় কি ?-বলেছিলাম মিনমিন করে।

আগের মতই সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়নি অগাস্টাস। চুপ করে রইল মিনিট খানেকের মতো। এমনকি আমার কথা কানে ঢুকেছে বলেও মনে হল না।

তারপর বললে-'ফিরলেই হল যখন খুশি-সময় তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না।'

মনে মনে জানতাম, এই ধরনের জবাবই দেবে অগাস্টাস। কিন্তু প্রতিটি শব্দের মধ্যে এমন একটা সুরধ্বনিতছেল যা অবর্ণনীয় আতঙ্কে ভরিয়ে তুলল আমার সারা মন।

নির্নিমেষে আবার চাইলাম অগাস্টাসের পানে। ঠোঁট টকটকে লাল। হাঁটু কাঁপছে ঠকঠক করে-এত জোরে কাঁপছে যে সিধে হয়ে দাঁড়াতেও পারছে না।

চিৎকার করে উঠেছিলাম আতীক্ষ্ণ স্বরে-'অগাস্টাস ! হল কি তোমার ? মতলব কি বল তো ?' বলতে লজ্জা নেই, বিষম ত্রাসে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল আমার গলার আওয়াজ।

'মতলব ? কিসের মতলব ?' তোৎলাতে তোৎলাতে বলেই সবেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ল নৌকোর তলার দিকে-হাত থেকে ছিটকে গেল হাল।

নিমেষে বুঝলাম ব্যাপারটা।

লাফিয়ে গিয়ে তুলে ধরেছিলাম। দেখেছিলাম, মদের নেশায় মাতাল হয়ে রয়েছে পুরোপুরি। এমনই মত্ত যে নিজে থেকে দাঁড়ান তো দূরের কথা, কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না-চক্ষু প্রত্যঙ্গ দিয়ে দেখতেও পাচ্ছে না। ঘষা কাঁচের মতোই চোখের মণিকায় প্রাণের স্পন্দন আছে কি নেই বোঝাও যাচ্ছে না। নিঃসীম নৈরাশ্যে ভেঙে পড়েছিলাম আমি নিজেও। কতক্ষণ আর এভাবে জোর করে খাড়া রাখা যায় একটা ডাহা মাতালকে ? গা থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছিলাম সেই কারণেই। সঙ্গে সঙ্গে ধপাস করে ফের আছড়ে পড়ল ও নৌকোর তলায় জমা জলের মধ্যে। ঠিক যেন কাটা গাছের গুঁড়ি-সাড়া নেই একেবারে !

বেশ বুঝলাম, সন্ধে থেকেই আকণ্ঠ মদ গেলার পরিমাণটা এখন ফলেছে। তখন দেখেও বুঝিনি চুর চুর হয়ে রয়েছে মদের নেশায়। জানতামও না অত মদ গিলেছে কখন। শয্যা গ্রহণের পর আচমকা চেঁচিয়ে ওঠার কারণটাও এবার স্পষ্ট হয়ে গেল। মদের নেশায় যারা একেবারেই বেহুঁশ হয়ে যায়, তারা কিন্তু বাইরে ঠিক এইরকম ভাবেই দেখায়-যেন মদকেই গিলে বসে আছে, মদ তাদের গিলতে পারেনি ! বুদ্ধিশুদ্ধি কাণ্ডজ্ঞান দিব্বি টনটনে রয়েছে-আর পাঁচটা সুস্থ মানুষের মতই !

কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়ায় ছুটে যাচ্ছে পাগলাগি। যে মানসিক শক্তি

এতক্ষণ চাঙা রেখেছিল ওকে-তেড়েফুঁড়ে ছুটিয়ে এনেছিল ঘরের বাইরে নৌকোর ওপর-আস্তে আস্তে তা ঝিমিয়ে পড়ছে সুরার প্রচণ্ডতর শক্তির প্রকোপে। এখন তো দেখছি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে একেবারেই। বেশ কয়েক ঘণ্টা থাকবেও এইভাবে।

আমার নিজের আতঙ্ক যে সেই মুহূর্তে কি চরম অবস্থায় পৌঁছেছিল, তা অনুমান করাও কঠিন। কিছুক্ষণ আগে উদরস্থ সুরা একেবারেই উবে যাওয়ায় দ্বিগুণ ভীতু আর অক্ষম লাগছিল নিজেকে। নৌকো চালাতে জানি না একেবারেই। ভয়ঙ্কর বাতাস আর জোরাল স্রোতের টানে এগিয়ে চলেছি নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। বেশ বুঝছি, পেছনেই জড়ো হচ্ছে ঝড়ের মেঘ। নৌকোয় কম্পাস নেই, খাবার-দাবারও নেই। এইভাবে কক্ষচ্যুত উল্কার মত নৌকো যদি ধেয়ে যায় আরও কিছুক্ষণ, ভোরের আলো ফোটবার আগেই চোখের আড়ালে চলে যাবে ডাঙার রেখা।

এইসব চিন্তা এবং তার সঙ্গে আরও অনেক ভয়াবহ দুশ্চিন্তা বিদ্যুৎবেগে ঝলসে দিয়ে গেল মস্তিষ্কের কোষগুলিকে। অসাড় করে দিয়ে গেল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেশ কিছুক্ষণের জন্যে। ভীষণ বেগে ছুটছে নৌকো প্রচণ্ড হাওয়ার ঠেলায়। এত জোরে ছুটছে যে সামনের গলুই একেবারেই ডুবে রয়েছে ফেনার মধ্যে। হাল ধরে এ অবস্থায় নৌকো সামাল দেওয়ার মত কেউ না থাকা সত্ত্বেও নৌকো যে তলিয়ে যায় নি কেন এতক্ষণে-এটাও একটা বিরাট বিস্ময়। নেহাৎ কপালের জোর ছিল বলেই ডুবু ডুবু হয়েও নক্ষত্রবেগে ধেয়েই চলল নৌকো-একটু একটু করে ধাতস্থ হলাম আমি নিজেও ; ফিরে এল উপস্থিত বুদ্ধি। মাথার ঠিক ছিল না অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়েছিলাম বলে-এখন ফিরে এল চিন্তা করার ক্ষমতা। বাতাস তখনও বইছে ভয়ানক বেগে। ঢেউয়ের ওপর দিয়ে এক-একবার ছিটকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে সমুদ্রের জল ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে নৌকো। হাত পা এমনই অসাড় হয়ে যাচ্ছিল যে অনুভূতি লোপ পেয়েছিল একেবারেই। শেষকালে কিন্তু সাহসে বুক বাঁধলাম, মনের জোরে এগিয়ে গিয়ে মূল মাস্তুল থেকে পাল খুলে দিলাম। ফল যা হবার, হল ঠিক তাই। পাল আছড়ে পড়ল সামনের জলে এবং জলে ভিজে ভারি হয়ে গিয়ে মড় মড় করে ভেঙে উপড়ে নিয়ে গেল জলের মধ্যে। নৌকো বায়ুবেগে ছুটে চলল বটে, মাঝে মাঝে লবণ জলও ঢুকল পেটে-কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেলাম। আতঙ্কের নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারলাম অবশেষে। ধরলাম হাল এবং কিছুক্ষণ কসরৎ করার পর এইটুকু অন্তত বুঝলাম যে পরিত্রাণের পথ এখনো আছে। অগাস্টাস তখনো কিন্তু জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে রয়েছে নৌকোর তলদেশে। প্রায় এক ফুট জল দাঁড়িয়ে গেছে সেখানে।

ডুবে মারা যাবে দেখছি! তাড়াতাড়ি টেনে হিঁচড়ে নিস্পন্দ দেহটাকে বসিয়ে দিলাম সোজা করে এবং কোমরে দড়ি পেঁচিয়ে সেই দড়ি বাঁধলাম নৌকোর একটা আংটার সঙ্গে। শীতে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে এবং তখনকার বর্ণনাতীত উৎকণ্ঠিত অবস্থায় এর বেশি আর কিছু করার ক্ষমতা আমার ছিল না। সঁপে দিলাম নিজেকে ভাগ্যের হাতে। দেখা যাক, নিয়তি কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলেন আমাকে।

ঠিক তখনি নৌকোর আশপাশের এবং মাথার ওপরকার বাতাস যেন চৌচির হয়ে গেল হাজার দানবের সম্মিলিত আর্তনাদে অথবা অট্টহাসিতে। সে কী ভীষণ গর্জন! রক্ত হিম হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। জীবনে ভুলব না সেই মুহূর্তের আতঙ্কবোধকে। শিউরে উঠেছিল অন্তরাত্মা-খাড়া হয়ে গিয়েছিল মাথার চুল। হৃৎপিণ্ডও মনে হল যেন আর চলছে না-কোত্থেকে এই দানবিক গজরানি আছড়ে পড়ল কানের পর্দায়-তা দেখার জন্যে মাথা তোলবার মত মানসিক অবস্থাও আর ছিল না-আছড়ে পড়েছিলাম সামনের দিকে.........পড়েছিলাম জ্ঞান হারিয়ে অগাস্টাসের অসাড় দেহের ওপর।

জ্ঞান ফিরে আসার পর দেখেছিলাম শুয়ে আছি একটা মস্ত তিমি-শিকারী জাহাজের (পেঙ্গুইন) কেবিনে। জাহাজ চলেছে নানটাকেটের দিকে। বেশ কয়েকজন লোক ঘিরে রয়েছে আমাকে। অগাস্টাসও ঝুঁকে পড়েছে আমার ওপর। মুখের রঙ মড়ার মুখের চাইতেও ফ্যাকাশে। প্রাণপণে হাত ঘষছে আমার। আমি চোখ মেলতেই সে কী চিৎকার অগাস্টাসের। উল্লাস আর আনন্দ সংক্রামিত হল পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলির মধ্যেও। কর্কশ আকৃতি প্রত্যেকেরই। তা সত্ত্বেও আমি না মরে বেঁচে উঠেছি দেখে হেসে উঠলো হো হো করে, কেউ কেঁদে ফেলল হাউ-হাউ করে। হাসি আর কান্নার সে এক বিচিত্র সংমিশ্রণ!

কিভাবে বেঁচে আছি এখনো দুজনে, অচিরেই উদঘাটিত হল সেই রহস্য। ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছিল তিমি শিকারী জাহাজটা। চাপা পড়েছিলাম পেল্লায় জাহাজের তলায়। সবকটা পাল মেলে দিয়ে পুরোদমে জাহাজ ছুটছিল নানটাকেট-এর দিকে। ফলে, আমাদের নৌকো তেড়েমেড়ে ছুটছিল যেদিকে, ঠিক তার সমকোণে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছিল 'পেঙ্গুইন' জাহাজ। যদিও ডেকে দাঁড়িয়ে সামনে চোখ রেখেছিল অনেকেই, কিন্তু ঝড়ের ঘনঘটায় আমাদের পুঁচকে নৌকোকে দেখতে পায়নি কেউই। দেখা যখন গেল, তখন আর সময় নেই। ভয়েমমে একযোগে বিকট চিৎকার করে উঠেছিল অতগুলো লোক একসঙ্গে। সম্মিলিত আতঙ্ক-নিনাদ দানবিক গর্জনের মতই আছড়ে পড়েছিল আমার কানের পর্দায়। নিদারুণ ভয়ে

আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়েছিল-হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হওয়ার অবস্থায় পৌঁছেছিল-জ্ঞান হারিয়েছিলাম সঙ্গে সঙ্গে।

এ অবস্থা ঘটেছিল, জাহাজ নৌকোর ওপর চেপে বসার ঠিক আগে। পরক্ষণেই সটান নৌকোর ওপর দিয়েই চলে গিয়েছিল অতবড় জাহাজখানা-ঝড়জলের তুমুল হুহুঙ্কারে ডুবে গিয়েছিল পলকা নৌকো টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার মড় মড় আওয়াজ। হাল্কা একটা পাখির পালকের ওপর দিয়ে আমাদের নৌকো চলে গেলে যে অবস্থাটা দাঁড়ায়-এও যেন ঠিক তাই। খান খান হয়ে যাওয়া নৌকো থেকে কারোরই মরণ-আর্তনাদ শোনা যায়নি বলেই ক্যাপ্টেন ই টি ভি বলক ভেবেছিলেন-মাস্তুলহীন নৌকোখানা আরোহীশূন্য অবস্থাতেই ভেসে চলেছে ঝড় আর জলের দাপটে। কাজেই জাহাজ নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই মনস্থ করেছিলেন।

কিন্তু আমাদের বরাত জোর বলেই ডেকে দাঁড়িয়ে দুজন দেখেছিল ক্ষুদে নৌকোর মধ্যে অন্তত একটা মানুষও যেন রয়েছে। চেষ্টা করলে এখনো তাকে বাঁচানো যাবে।

দারুণ কথাকাটাকাটি চলেছিল খোদ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। রেগে আগুন হয়ে ক্যাপ্টেন নাকি বলেছিলেন-ডিমের খোলায় চেপে কেউ যদি মরতে বেরোয়, তাকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদের নয়। দুর্ঘটনা যদি ঘটিয়ে থাকে, দোষটা নৌকোয় যারা আছে, তাদেরই। এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে গেছে। কাজেই-

ক্ষেপে গিয়েছিলেন সেকেণ্ড অফিসার হ্যানডারসন। জাহাজশুদ্ধ লোক রুখে দাঁড়িয়েছিল ক্যাপ্টেনের এই ধরনের হৃদয়হীন কথাবার্তায়। চড়া গলায় মুখের ওপর জবাবটা শুনিয়ে দিয়েছিলেন হ্যানডারসন। ক্যাপ্টেনের মর্জি হলে ডাঙায় নামার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ফাঁসি দিতে পারেন। কিন্তু এই মুহূর্তে জাহাজ পরিচালনার ভার নিচ্ছেন তিনি নিজে। বলেই, ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেনকে। হাল ধরেছিলেন দু-হাতে।

ক্যাপ্টেন বলক সহকারী অফিসারের খোলাখুলি অবাধ্যতায় এমনই ফ্যাকাসে মেরে গিয়েছিলেন যে গলা দিয়ে আওয়াজ বার করতেও পারেননি। হ্যানডারসনের হুকুম শুনেই নাবিকরা দৌড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যে যার জায়গায়।

এত কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল বড় জোর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে। দক্ষ হাতে জাহাজ চালিত হলেও ভাঙা নৌকোর কোন আরোহীকে বাঁচানোর সম্ভাবনা প্রায় ছিল না বললেই চলে। সত্যিই কেউ ছিল কিনা নৌকোর মধ্যে, তাও তো সঠিক জানা নেই কারোরই।

তা সত্ত্বেও পাঠক-পাঠিকারা দেখতে পাচ্ছেন, প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম আমি আর অগাস্টাস দুজনেই। অসম্ভবকে সম্ভব

করে তুলেছিল জাহাজের লোকজন-দৈব সহায় না হলে এমন অত্যাশ্চর্য কাণ্ড ঘটতেই পারে না।

যে দুজন দেখতে পেয়েছিল আমাকে, সেই দুজনকে নিয়েই ছোট নৌকো জলে ভাসিয়েছিলেন হ্যানডারসন-নিজেও উঠে বসেছিলেন তাতে। পরক্ষণেই চিৎকার করে নৌকো নিয়ে যেতে বলেছিলেন জাহাজের পেছন দিকে! জাহাজ তখনো দুলে উঠে হেলে পড়ায় ঝকঝকে চাঁদের আলোয় উনি দেখতে পেয়েছিলেন অদ্ভুতভাবে একটা দেহ গেঁথে আছে পেঙ্গুইন জাহাজের চকচকে তামার প্লেটের গায়ে। জলের ধাক্কায় আছড়ে আছড়ে পড়ছে দেহটা-কিন্তু ঠিকরে বেরিয়ে যাচ্ছে না। অতি কষ্টে নৌকো নিয়ে গিয়ে শেকল চেপে ধরে হ্যানডারসন উদ্ধার করেছিলেন দেহটাকে।

সে দেহ আমার দেহ। জাহাজ যখন মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়, তখন একটা তক্তা ভেঙে গিয়ে ঢুকে যায় আমার কানের তলা দিয়ে জামার কলারের মধ্যে এবং সেই অবস্থাতেই গেঁথে যায় জাহাজের তামার প্লেট ফুটো করে।

যাই হোক, মরণাপন্ন অবস্থায় আমাকে তুলে আনা হয়েছিল কেবিনে। জীবনের কোনো চিহ্ন দেখা যায়নি। তা সত্ত্বেও প্রাণপণে সেবা করে গিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন নিজেই। এতক্ষণ আগে যে হৃদয়হীনতা দেখিয়েছিলেন-লোকজনের স্মৃতি থেকে সম্ভবত সেই নিষ্ঠুর ছবি মুছে ফেলার অভিপ্রায়ে।

হ্যানডারসন কিন্তু নৌকো নিয়ে আবার খুঁজতে বেরিয়েছিলেন ভাঙাচোরা নৌকোর টুকরোগুলো। ঝড় তখন আরো বেড়েছে-হারিকেন ঝড়ের আকার নিয়েছে। মিনিট কয়েক যেতে না যেতেই এসে পড়েছিল ভাঙা নৌকোর একটা টুকরোর ওপর। সঙ্গী দুজনের একজন বলেছিল, ঝড়জলের দানবিক অট্টহাসি ছাপিয়েও কে যেন 'বাঁচাও, বাঁচাও' করে আর্তনাদ করে যাচ্ছে মুহুর্মুহু। এই শুনেই আরো আধঘণ্টা ধরে চীৎকারটা যেদিক থেকে আসছে, সেইদিকে গিয়ে মুমূর্ষু মানুষটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন হ্যানডারসন। এদিকে ডেক থেকে সমানে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে গেছেন ক্যাপ্টেন বলক আর দেরি না করে জাহাজে ফিরে আসার জন্যে। সমুদ্রের তখন যা রুদ্র অবস্থা, পলকা নৌকো টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে। তা সত্ত্বেও নৌকো যে খান্ খান্ হয়ে যায়নি, সেটাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার। নৌকোটা অবশ্য তিমি-শিকারী জাহাজে নিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত করে তৈরী হয়েছিল। নিশ্চয় বাতাস-ভর্তি বাক্স ছিল ভেতরে-ওয়েলস-এর উপকূলে জীবন-তরী নির্মিত হয় কিন্তু এই কায়দায়।

আধঘণ্টা বৃথাই তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিলেন শঙ্কাহীন মানুষ তিনজন। ব্যর্থ হয়ে ঠিক করলেন, এবার ফিরে যাওয়া যাক

জাহাজে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ক্ষীণ আর্তধ্বনি ভেসে এসেছিল খুব কাছ থেকে। চকিতে সেইদিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন, কালো মতো একটা বস্তু দ্রুতবেগে ভেসে যাচ্ছে পাশ দিয়ে-চিৎকারটা আসছে সেখান থেকেই। তৎক্ষণাৎ ধাওয়া করে নাগালও ধরে ফেলেছিলেন। পাওয়া গিয়েছিল 'এরিয়েল' নৌকোর ডেকের ওপরকার ছোট কামরাখানা-একেবারে আস্ত অবস্থায়। এই কামরার গায়ে আংটার সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলাম অগাস্টাসকে। বাঁধা অবস্থাতেই চেঁচিয়ে গেছে এতক্ষণ-যন্ত্রণা যখন চরমে পৌছেছে-শেষবারের মত সর্বশক্তি দিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে যখন চেঁচিয়ে উঠেছে-ঠিক সেই চিৎকারটাই পাশ থেকে শুনেছে হ্যানডারসনের নৌকোর লোক। একেই বলে দৈব।

অগাস্টাস কিন্তু প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল বলতে গেলে আমার জন্যেই। কোমরে দড়ি পেঁচিয়ে ওকে সিধে করে বসিয়ে রেখেছিলাম বলেই জাহজের সঙ্গে সংঘাতে 'এরিয়েল' টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও ছোট্ট কামরাটা ভেসে থেকেছিল জলের ওপর-অন্যান্য অংশ তলিয়ে গিয়ে অগাস্টাসকে তুলে ধরেছিল জলের ওপর। নির্মম মৃত্যুর করাল খপ্পর থেকে বেঁচে গিয়েছিল স্রেফ সেই কারণেই।

'পেঙ্গুইন' জাহাজে অগাস্টাসকে তুলে আনার পর এক ঘণ্টারও বেশি সময় বেহুঁশ থেকেছে সে। তারপর বলেছে তার দুর্দৈবের ইতিবৃত্ত। কি ধরনের দুর্ঘটনায় খান খান হয়ে গিয়েছিল 'এরিয়েল' নৌকোখানা-তা জানা গিয়েছিল ওর মুখের কথা থেকেই। সংঘাতের প্রথম চোটেই জ্ঞান ফিরে এসেছিল-মাথা পুরোপুরি সাফ হয়েছিল জলের তলায় তলিয়ে যাওয়ার পর। ধারণায় আনা যায় না এমনি গতিবেগে লাট্টুর মতো পাক খাচ্ছিল বন বন করে-ঐ অবস্থাতেই শুধু বুঝেছিল একটা দড়ি তিন-চার পাক পেঁচিয়ে কষে বাঁধা রয়েছে ঘাড়ের ওপর দিয়ে। পরমুহূর্তেই মনে হয়েছিল নক্ষত্রবেগে ধেয়ে যাচ্ছে ওপর দিকে। ঠিক তার পরেই দমাস করে মাথা ঠুকে গিয়েছিল একটা কঠিন বস্তুতে। জ্ঞান হারিয়েছিল আবার।

আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল ফের জ্ঞান ফিরে আসার পর। চিন্তাভাবনার ক্ষমতা পেয়েও যেন পায়নি-সবই তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল মাথার মধ্যে। এইটুকু শুধু বুঝেছিল যে সাংঘাতিক একটা অ্যাকসিডেণ্ট ঘটে গেছে-নিজে তলিয়ে রয়েছে জলের মধ্যে-মুখখানা কেবল জেগে রয়েছে জলের ওপর-নিঃশ্বাস নিতে পারছে কেবল সেই কারণেই।

খুব সম্ভব ঠিক এই সময়েই বাতাসের টানে চিৎ হয়ে ভেসে উঠেছিল অগাস্টাস। বুঝেছিল, এই অবস্থাটা কোনমতে টিকিয়ে রাখতে পারলে জলে ডুবে অন্তত মারা যাবে না। তারপরেই একটা মস্ত ঢেউয়ের ধাক্কায় ডেকটা পুরোপুরি ভেসে উঠতেই

সমানে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে গেছে। হ্যানডারসনের চোখে পড়ার আগেই কোন মতে দড়ির বাঁধন খুলে ঠিকরে পড়েছিল জলে। ভেবেছিল-এইবার বুঝি গেল প্রাণটা। এতক্ষণ ধস্তাধস্তির সময়ে একবারও কিন্তু মনে পড়েনি 'এরিয়েল' নৌকোর কথা। বিপর্যয়টা ঘটল কিভাবে, সেসবও চিন্তাভাবনার অবসর পায়নি। আবছা আতঙ্কবোধ আর নৈরাশ্য অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়েছিল চৈতন্য। জল থেকে তুলে আনার পর একেবারেই অসাড় হয়ে গিয়েছিল মন। এক ঘণ্টারও বেশি সময় নিয়েছে ধাতস্থ হতে। আমাকে চাঙ্গা করতে লেগেছে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা। মরতেই বসে ছিলাম বলা চলে। প্রাণের কোন চিহ্ন প্রায় ছিল না। অগাস্টাসই বলেছিল জোরে জোরে আমার হাত ঘষা হোক গরম তেলে ফ্লানেল ভিজিয়ে নিয়ে। ঘাড়ের দগদগে ক্ষতটা বীভৎস হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলাম অগাস্টাসের প্রাণপণ সেবাযত্নে।

পরের দিন সকাল নটা নাগাদ জাহাজঘাটায় ফিরে এসেছিল 'পেঙ্গুইন'। ন্যানটাকেট থেকে রওনা হয়ে এ ধরনের ভয়ঙ্কর ঝড়ে নাকি এর আগে কখনো পড়েনি তিমিশিকারীদের সেই জাহাজ। একটু দেরিতে হলেও মিঃ বারনার্ডের সামনে প্রাতরাশ খেতে বসেছিলাম আমি আর অগাস্টাস দুজনেই। দুজনের মুখ চোখের অবস্থা তখন রীতিমত শোচনীয়। পরের দিন খালাসিদের মুখে মুখে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল শহরময়। ধাক্কা মেরে টুকরো টুকরো করে দিয়ে একখানা ভাঙা নৌকো থেকে নাকি তিরিশ-চল্লিশজন ছোঁড়াকে প্রাণে বাঁচান হয়েছে। আমরা দুজনেই কিন্তু মুখে চাবি দিয়ে থেকেছি। স্কুলের ছেলেরা মনে করলে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে যেতে পারে অবলীলাক্রমে। কেউই জানতে পারেনি-বিধ্বস্ত নৌকোটা 'এরিয়েল'-প্রাতরাশ খেতে বসেও আমাদের ফ্যাকাসে মুখচ্ছবি দেখে কেউ আঁচ করতে পারেনি কি কাণ্ড করে এসেছি মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে। পরেও এই নিয়ে দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হয়নি খুব বেশি-গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেছে কথায় কথায় প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটলেই। একবারই শুধু মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছিল অগাস্টাস-নৌকোর ওপর যখন টের পেয়েছিল মদের নেশায় লোপ পাচ্ছে চেতনা, তখনকার সর্ব-অবয়ব-আচ্ছন্ন-করা নৈরাশ্যবোধের মতো অভিজ্ঞতা এর আগে কখনো তাকে অর্জন করতে হয়নি।

২

পূর্ব ধারণা নিয়ে কখনোই কোনো নিশ্চিত্ত সিদ্ধান্তে আসা যায় না। যে বিপর্যয় কাহিনী বিবৃত করলাম একটু আগেই, তারপর সমুদ্রে ডানপিটেমি করার নেশা আমার মাথা থেকে একেবারেই উড়ে যাওয়ার কথা। প্রকৃতপক্ষে ঘটল কিন্তু ঠিক তার উল্টো।

অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়ার পর সাতদিন যেতে না যেতেই নাবিকদের মতো সাত সমুদ্রে বেপরোয়া দুরন্ত অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় যেন উন্মাদ হয়ে গেলাম। সাতদিন আগেকার প্রাণ নিয়ে টানাটানির সেই দৃশ্যের নিকষকালো ছায়াটুকু স্মৃতি থেকে মুছে গেল সাতদিনেই-দুর্ঘটনার উত্তেজনাসঞ্চারী ছবির মতো সুন্দর বর্ণসমারোহ মাতিয়ে তুলল আমাকে। অগাস্টাসের সঙ্গে আমার কথাবার্তা রোজই বাড়তে লাগল একটু একটু করে এবং প্রতিটি কথাই আত্যন্তিক আগ্রহের উষ্ণতায় আমাদের দুজনকেই তাতিয়ে তুলল প্রতিদিনই। সমুদ্রের গল্প বলত অগাস্টাস। আমি গিলতাম গোগ্রাসে। বেশ বুঝতাম, যা বলছে, তার অর্ধেক বানানো। কিন্তু বলার ঢঙটা এমনই অপূর্ব যে আমার অ্যাডভেঞ্চার-পিয়াসী মনের মূল পর্যন্ত নাড়া দিয়ে যেত প্রতিটা উপাখ্যান। সে সব গল্পের মধ্যে বিপদ আর মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য মনের মধ্যে চমক আর আতঙ্ক সৃষ্টি করে যেত ঠিকই, কিন্তু কল্পনার আলোয় আলোকিত থাকায় আমি যেন সুস্পষ্ট দেখতে পেতাম প্রতিটি ঘটনা, রোমাঞ্চিত হতাম মুহুর্মুহু। আমি যে মনে মনে দুরন্ত নাবিক জীবনের স্বপ্ন দেখছি, অদ্ভুতভাবে ও কিন্তু তা ধরে ফেলেছিল। দুর্দৈব আর নৈরাশ্যের ভয়ঙ্করতম মুহূর্তগুলো ছবির মত বলে যাওয়ার সময়ে আমাকেও যেন সমুদ্রবিহারী মৃত্যুভয়হীন মানুষদেরই একজন বলে মনে করত। আমার কল্পনার ছবির সঙ্গে আশ্চর্যভাবে তাই খাপ খেয়ে যেত ওর প্রতিটি কল্পনা-সমুজ্জল ছবি-বিপদটুকুই গ্রহণ করত আমার বিপদবুভুক্ষু অন্তর-ছবির তমিস্রার দিকেই ঝুঁকতাম বেশি করে-বাদ দিতাম আলো ঝলমলে অংশটুকু। আমার মানস পটে ভাসত কেবল জাহাজের ধ্বংসদৃশ্য আর খাদ্যাভাবে মৃত্যুর দৃশ্য ; বর্বরদের হাতে বন্দী হয়ে অসীম যন্ত্রণার মধ্যে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হওয়ার দৃশ্য ; অজানা দুর্গম সমুদ্রের ধূসর পরিত্যক্ত পাহাড়ে সারাজীবন দুঃখ আর অশ্রুর মধ্যে কাটিয়ে দেওয়ার হৃদয়বিদারক দৃশ্য। বিষাদ যাদের ঘিরে থাকে, শুনেছি এমনি কল্পনাদৃশ্য বা আত্যন্তিক ইচ্ছে প্রবলতর হয় তাদেরই মধ্যে। আমার নিয়তি যে ঐদিকেই আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে, কাহিনীর পর কাহিনী শুনতে শুনতে অজান্তেই আমি কিন্তু তা বুঝতে পারতাম। এই কারণেই অগাস্টাস অসম্ভবের কাহিনীর জাল বিস্তার করে একেবারেই ঢুকে পড়তে পেরেছিল আমার মনের মধ্যে। জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে অজানার উজানে ভেসে যাওয়ার এই যে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, তা ছিল আমাদের দুজনেরই চরিত্র। পরস্পরের মধ্যে এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটুকু বিনিময়ের ফলেই মনের আদানপ্রদানও সম্ভব হয়েছিল এত নিবিড়ভাবে।

'এরিয়েল' নৌকোর বিপর্যয়ের আঠারো মাস পরে লয়েড অ্যাণ্ড ভ্রেডেনবার্গ কোম্পানীকে নিযুক্ত করা হয় গ্র্যামপাস

জাহাজের মেরামতির কাজে। তিমিশিকারের অভিযানে রওনা হবে এই জাহাজ। মেরামতি ছাড়াও এ ধরনের অভিযানের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার ভারও ছিল কোম্পানীর ওপর। গ্র্যামপাস জাহাজকে বয়সের দিক দিয়ে বৃদ্ধই বলা যায়। বৃদ্ধকে যতটুকু জোয়ান করা যায়, ততটুকুই করতে পেরেছিল এই কোম্পানী। সমুদ্রযাত্রার উপযুক্ত হতে পারেনি গ্র্যামপাস এই কারণে এত মেরামতি এবং ব্যবস্থাদির পরেও। জাহাজ কোম্পানীর তো আরও অনেক জাহাজ ছিল। সেই সব মজবুত জাহাজ ছেড়ে কেন যে গ্র্যামপাসকে বেছে নেওয়া হয়েছিল, আমার তা জানা নেই। জাহাজ পরিচালনার ভার দেওয়া হল মিঃ বারনার্ডকে। অগাস্টাসও যাবে তাঁর সঙ্গে। গ্র্যামপাসকে যখন সমুদ্রযাত্রার-উপযোগী করে তোলা হচ্ছে, তখন থেকেই অগাস্টাস খুঁচিয়ে চলেছিল আমাকে। সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার আমার ঐকান্তিক বাসনাটাকে মিটিয়ে নেওয়ার এই তো সুবর্ণ সুযোগ। সাগ্রহে শুনে যেতাম-কিন্তু বাসনাটাকে যে সহজে মেটানো যাবে না, হাড়ে হাড়ে তা বুঝতাম। আমার বাবা সরাসরি বাধা না দিলেও আমার মা হাত পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে মেচিয়ে বাড়ি মাথায় করে তুলত পরিকল্পনার আভাস টুকু শুনলেই। সবচেয়ে বড় বাধা এসেছিল আমার দাদামশাইয়ের দিক থেকে। সাফ বলে দিয়েছিলেন, এ প্রসঙ্গ ফের যদি উত্থাপন করি তাঁর কাছে, সম্পত্তির কাণাকড়িও আর দেবেন না আমাকে। অথচ তাঁর কাছেই বড় মুখ করে চিরকাল সব চেয়েছি আমি-পেয়েওছি। এত বাধা পড়া সত্ত্বেও আমার অন্তরের বাসনা দূরীভূত হয়নি-বরং বেড়েছে। আগুনে ঘি পড়লে যা হয়, প্রতিটি বাগড়া আমার ঐকান্তিক কামনাকে আরো প্রজ্বলিত করেছে। প্রতিজ্ঞা করলাম, যত দুর্বিপাকই আসুক না কেন জীবনে, অগাস্টাসের সঙ্গে আমি যাবোই যাবো। মনোভাবটা ওর কাছে ব্যক্ত করার পর তোড়জোড় শুরু করে দিলাম দুজনে। পরিকল্পনা সম্পর্কে বিন্দু বিসর্গ আলোচনাও আর করলাম না আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে। উল্টে পড়াশুনো নিয়ে এমন তন্ময় হয়ে রইলাম যে সবার ধারণা হয়ে গেল সমুদ্রে যাওয়ার পাগলামি উবে গেছে মাথা থেকে। কপটতর আবরণে ঢেকে রেখে দিয়েছিলাম আমার প্রতিটি কথা, প্রতিটি আচরণ। ভেতরে ভেতরে প্রজ্বলন্ত ছিল কিন্তু বহুদিনের বাসনা-অনল। আজও অবাক হয়ে যাই দীর্ঘকাল ধরে এইভাবে অতজনের চোখে ধুলো দিয়ে এসেছিলাম কিভাবে।

সবার চোখে ধুলো দেওয়ার ফিকির নিয়ে চলতে গিয়ে অগাস্টাসের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল সবথেকে বেশি। বেশিরভাগ সময় ওকে থাকতে হত গ্র্যামপাস জাহাজে। বাবার সঙ্গে কেবিনের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হত সারাদিন। রাত্রে বসতাম শলাপরামর্শ করতে। এইভাবেই গেল প্রায় একটা

মাস। ঠিক কি ধরনের ফন্দি আঁটলে সাফল্য আসবেই আসবে, কিছুতেই তা ঠিক করে উঠতে পারলাম না। শেষকালে ওর মুখেই শুনলাম, যা কিছু দরকার, তার সব ব্যবস্থাই নাকি সাঙ্গ করে ফেলেছে অগাস্টাস। নিউ বেডফোর্ডে আমার এক আত্মীয় থাকতেন। নাম তাঁর মিঃ রস। মাঝে মাঝে এঁর বাড়িতে দু-তিন হপ্তা কাটিয়ে আসতাম একনাগাড়ে। জাহাজ ছাড়ার কথা ছিল ১৮২৭ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি। ঠিক হয়েছিল, জাহাজছাড়ার দু-একদিন আগে যথারীতি মিঃ রস একটা চিঠি লিখবেন বাবাকে। অনুরোধ জানাবেন, আমি যেন তাঁর দুই ছেলে রবার্ট আর এমেমর্টের সঙ্গে দিন পনেরো থেকে যাই। অগাস্টাস ভার নিল চিঠি যাতে লেখা হয় এবং বাবার হাতে যথাসময়ে পৌঁছোয়। নিউ বেডফোর্ড অভিমুখে রওনা হবার নাম করে আমি কিন্তু গিয়ে উঠব গ্র্যামপাস জাহাজে-লুকিয়ে থাকব এমন একটা জায়গায় যেখানকার সন্ধান কেউ রাখে না। লুকোনোর জায়গার বন্দোবস্ত করে রাখবে অগাস্টাস। বেশ আরামেই বেশ কয়েক দিন সেখানে ঘাপটি মেরে থাকার মত সবরকমের ব্যবস্থা করবে অগাস্টাস-জাহাজের কাউকে যেন মুখ না দেখাই এ-কদিন। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর জাহাজের ফিরে আসার প্রশ্নই যখন আর উঠবে না, তখন আমাকে পাকাপাকিভাবে কেবিনে থাকার ব্যবস্থা করে দেবে অগাস্টাস। অগাস্টাসের বাবা এ নিয়ে রাগারাগি তো করবেনই না, বরং হেসে গড়িয়ে পড়বেন আমাদের দুষ্ট বুদ্ধি দেখে। আশপাশ দিয়ে জাহাজ যাবেই, যেকোন একটা জাহাজের লোককে একখানা চিঠি দিয়ে বাড়িতে বাবা মাকে জানিয়ে দিলেই হল-কাউকে না জানিয়ে বেরিয়েছি সামুদ্রিক অ্যাডভেঞ্চারে।

জুন মাসের মাঝামাঝি সাঙ্গ হল সব ব্যবস্থা। চিঠি লেখা হল এবং বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। নিউ বেডফোর্ড অভিমুখে যেদিন রওনা হলাম, সেদিনটা ছিল সোমবার। আসলে গেলাম কিন্তু সটান অগাস্টাসের কাছে। আমার পথ চেয়ে ও দাঁড়িয়েছিল রাস্তার মোড়ে। আগে ঠিক হয়েছিল রাতের আঁধার না হওয়া পর্যন্ত ঘাপটি মেরে থাকবে কোথাও, অন্ধকারে চুপিসাড়ে উঠে পড়ব জাহাজে। কিন্তু সেদিন দিনের বেলাতেই ঘন কুয়াসা থাকায় খামোকা সারাদিন লুকিয়ে থাকার দরকার হয়নি। জেটির দিকে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল অগাস্টাস। বেশ খানিকটা তফাতে পেছন পেছন গেলাম আমি। নাবিকের জামাকাপড়ে ঢেকে নিয়েছিলাম সর্বাঙ্গ। যাতে কেউ দেখেও চিনতে না পারে আমাকে, তাই অগাস্টাসই বুদ্ধি করে পোশাকটা জুটিয়ে দিয়েছিল আমাকে। মোড় ঘুরতেই পড়লাম একেবারে দাদামশাইয়ের সামনে।

'গর্ডন নাকি? জঘন্য ঐ নোংরা জামাটা পরেছিস কেন?'

বেগতিক দেখে ভীষণ অবাক হওয়ার ভান করে এবং গলার স্বর বিকৃত করে বলেছিলাম ঝাঁঝালো স্বরে-'গর্ডন কাকে বলছেন মশায় ? আমার জামাটাকেই বা নোংরা বলছেন কি সাহসে জানতে পারি ? অন্ধ নাকি ?'

ধমক খেয়ে মুখ লাল করে ফেলেছিলেন দাদামশায়। কি কষ্টে যে হাসি চেপেছিলাম, তা আমিই জানি। চশমাটা নাকে এঁটে কটমট করে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়েছিলেন। পরক্ষণেই চশমা নামিয়ে ছাতা তুলে রাগে কাঁপতে কাঁপতে এবং গজগজ করতে করতে চম্পট দিয়েছিলেন মোড় ঘুরে। গজগজানি শুনতে পেয়েছিলাম পেছন থেকেই-'গর্ডন বলেই তো মনে হলো.........কিন্তু.........কিন্তু.........!'

এক চুলের জন্য রক্ষা পেয়ে গেলাম এইভাবে। আরো হুঁশিয়ার হয়ে পৌছোলাম জেটিতে। ডেকে তখন দু-একজন মাল্লা দূরে দূরে হাতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ক্যাপ্টেন বারনার্ড তখনো জাহাজ কোম্পানীতেই আছেন জানতাম-সন্ধ্যের আগে জাহাজে আসবেন না। ডেকে আগে উঠল অগাস্টাস-পেছন পেছন আমি। কাজ নিয়ে যারা ব্যস্ত তারা ফিরেও তাকাল না-দেখতেও পেল না দুজনের কাউকেই। সোজা গেলাম কেবিন ঘরে। কাউকে দেখতে পেলাম না সেখানে। চমৎকার সাজানো গোছানো ঘর। তিমি শিকারী জাহাজে এইভাবে কেবিনঘর সাজিয়ে রাখে না কেউ। বড় বড় চার খানা ঘরে দেখলাম বিস্তর বার্থ-আরামে শোয়ার ব্যবস্থা। চোখে পড়ল একটা বিরাট স্টোভ। কেবিন আর বড় ঘর চারখানার মেঝে পুরু কার্পেট দিয়ে ঢাকা। সাত ফুট উঁচুতে রয়েছে ঘরের শিলিং। বেশ প্রশস্ত ঘর। আরামপ্রদ। যেমনটি ভেবেছিলাম, ঠিক তেমনি। ভাল করে দেখবার সময়ও কিন্তু দিল না অগাস্টাস। ঝটপট আমাকে লুকিয়ে রাখার জন্যে এমন ছটপট করতে লাগল যে নাচার হয়ে গেলাম ওর পেছন পেছন। প্রথমে আমাকে নিয়ে গেল ওর নিজের স্টেট রুমে। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিলে ভেতর থেকে। ভারি চমৎকার ঘর। ছোট্ট অথচ সাজানো গোছানো। লম্বায় দশ ফুট, শোবার জন্যে বার্থ আছে মোটে একটা। একদিকে চার বর্গ ফুট পরিমিত জায়গায় রয়েছে একটা টেবিল, একটা চেয়ার, ঝুলন্ত বইয়ের তাক। বইগুলো সবই সমুদ্রে পর্যটন সংক্রান্ত। এক কোণে ফ্রীজভর্তি খাবার-দাবার এবং পানীয়।

চার বর্গফুট জায়গাটার এক কোণে আঙুলের চাপ দিল অগাস্টাস। দেখলাম, ষোল বর্গ ইঞ্চি জায়গার কার্পেট পরিষ্কারভাবে কেটে রাখা হয়েছে। হঠাৎ দেখলে কাটা দাগটা চোখেই পড়ে না। আঙুলের চাপ দিতেই চৌকোণা জায়গাটার একদিক ঠেলে উঠল ওপর দিকে-আঙুল ঢুকে গেল তলায়। খোলের ভেতরে ঢোকার দরজাটা দেখলাম তার পরেই। একটু

একটু করে সরু হয়ে যাওয়া একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে নিল অগাস্টাস, রাখল ঢাকা লণ্ঠনের মধ্যে। আমাকে পেছনে নিয়ে নেমে গেল চোরা দরজা দিয়ে খোলের ভেতরে। চোরা দরজার পাল্লা টেনে নামিয়ে দিল মাথার ওপর, এঁটে দিল একটা পেরেক দিয়ে। ওপরকার কার্পেট যথাস্থানেই.........লেপটে থাকায় চোরা দরজা আর কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা রইল না।

চোরা লণ্ঠনের আলো এতই ক্ষীণ যে আশপাশের রাশিকৃত কাঠের বরগাগুলো ভাল করে দেখতেও পাচ্ছি না। চোখ সয়ে এল একটু একটু করে। পাছে পথ হারিয়ে ফেলি, এই ভয়ে আমি কিন্তু অগাস্টাসের জামার প্রান্ত ধরে রইলাম হাতের মুঠোর মধ্যে। গোলকধাঁধার মতো বহু পথ ঘুরে অবশেষে পৌঁছোলাম একটা লোহাদিয়ে বাঁধানো বাক্সের সামনে। দেখে মনে হল, ম্যাটির বাসনপত্র রাখা হত বাক্সের মধ্যে এককালে। চার ফুট উঁচু, ছ ফুট লম্বা। চওড়ায় খুবই কম। দুটো খালি তেলের পিপে বসানো বাক্সের ওপর। পিপের ওপর তাগাড় করা খড়ের মাদুর-কেবিনের মেঝেতে গিয়ে ঠেকেছে। চারপাশে হাবিজাবি নানা ধরনের জিনিস। পিপে, বাক্স, গাঁটরি। এত জিনিসের মধ্যে দিয়ে পথ চিনে যে বাক্সের সামনে পৌঁছোতে পেরেছি, এটাই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। জাহাজী আসবাসপত্র যে কত রয়েছে, তার বর্ণনা দেওয়াও সম্ভব নয়। পরে জেনেছিলাম, অগাস্টাস ইচ্ছে করেই এইরকম জায়গা বেছে নিয়েছে আমাকে লুকিয়ে রাখার জন্যে।

বাক্সের একটা দিক টেনে খুলে ফেলল অগাস্টাস। অবাক হয়ে গেলাম ভেতরকার ব্যবস্থা দেখে। কেবিনের বার্থে যে মাদুর থাকে, সেই রকমই একটা মাদুর পাতা রয়েছে বাক্সের মেঝেতে। বেশ পর্দাওয়ালা মাদুর। থরে থরে সাজানো রয়েছে আরামে থাকার যাবতীয় জিনিসপত্র। এত জিনিস রাখা সত্ত্বেও আমার সটান শুয়ে থাকার অথবা আরামে বসে থাকার জায়গা রয়েছে যথেষ্ট। রয়েছে বই, কলম, কালি, কাগজ, তিনটে কম্বল, এক জগ জল, এক বয়েম সমুদ্র-বিস্কুট, তিন চারটে বড় সসেজ, বিরাট এক টুকরো শূকর মাংস, একটা আগুনে সেঁকা ঠাণ্ডা ভেড়ার পা, আধডজন বোতল ভর্তি পানীয়। ছোট্ট প্রকোষ্ঠটাকে মনে হল যেন ছোটখাট একটা রাজপ্রাসাদ।

বাক্সের খোলা দিকটা বন্ধ করতে হয় কি করে, অগাস্টাস তা দেখিয়ে দিল আমাকে। তারপর সরু মোমবাতি নামিয়ে ধরল ডেকের কাছে। চোখে পড়ল একটা সরু দড়ি। কালচে রঙের। শুনলাম, এই দড়িই নাকি রাশি রাশি মালপত্রের মধ্যে দিয়ে গোলকধাঁধার পথ ঘুরে পৌঁছেছে স্টেটরুমের মেঝেতে চোরা দরজার নীচে-যে দরজা নিচের দিক থেকে আটকানো আছে পেরেক দিয়ে। যদি কখনো প্রয়োজন হয়, তাহলে এই দড়ি ধরেই

পৌঁছোতে পারব স্টেটরুমে। সব বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় নিল অগাস্টাস, রেখে গেল বেশ কিছু মোমবাতি আর ফসফরাস দেশলাই। আশ্বাস দিয়ে গেল কাকপক্ষীকে না জানিয়ে মাঝে মধ্যে এসে দেখে যাবে আমাকে। সতেরোই জুন ছিল সেদিন। যদ্দুর মনে পড়ে, সেইদিন থেকে তিনদিন তিন রাত্রি বাক্সের মধ্যেই কাটিয়েছি। বার দুয়েক কেবল বেরিয়েছিলাম সামনের দুটো কাঠের প্যাকিং বাক্সের মাঝে দাঁড়িয়ে হাত-পা সিধে করার জন্যে। এই তিন দিন তিন রাত্রি টিকি দেখা যায়নি অগাস্টাসের। তা নিয়ে বিচলিতও হইনি। কেন না, যে কোনো মুহূর্তে সমুদ্রে পাড়ি জমাতে পারে জাহাজ-এ খবরটা জানা ছিল। যাত্রা শুরুর হট্টগোলে নিচে নেমে আমাকে দেখে যাওয়ার সুযোগ নাও পেতে পারে অগাস্টাস্।

তারপর শুনলাম চোরা দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার আওয়াজ। কানে ভেসে এল ওর চাপা স্বর। জানতে চাইছে সব ঠিকঠাক আছে কিনা-জিনিসপত্র কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা।

বললাম-'কিস্সু প্রয়োজন নেই। শুধু বলো, জাহাজ ছাড়ছে কখন।'

ও বললে-'আধঘণ্টার মধ্যে। গর্ডন, তিন চারদিন, কি, তারও বেশি আর আসতে পারব না। চোরা-দরজার নিচে পেরেকের কাছে রইল আমার ঘড়ি। দড়ি ধরে এসে সময় দেখে যেও। গিয়ে দিয়ে আসতে পারলাম না পাছে আমার খোঁজ পড়ে ওপরে-তাই। অন্ধকারে তোমার নিশ্চয় খেয়াল নেই কদিন ক রাত কাটালে বাক্সের মধ্যে। মোটে তিন দিন। আজ কুড়ি তারিখ। চললাম।'

আধঘণ্টা যেতে না যেতেই বেশ টের পেলাম জাহাজ চলতে শুরু করে দিয়েছে। উৎফুল্ল হয়ে উঠল মনটা। যাক, দিন কয়েক এইভাবে কষ্টেসৃষ্টে কাটিয়ে দিতে পারলেই কেবিনের আরাম পাওয়া যাবে। দড়ি ধরে গেলাম চোরা দরজার নীচে। ঘড়ি নিয়ে ফিরে এলাম শোবার বাক্সে। মোমবাতির আলোয় কিছুক্ষণ পড়লাম লুই অ্যাণ্ড ক্লার্কের কোলাম্বিয়া অভিযান কাহিনী। তারপর খুব সাবধানে আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম অকাতরে।

ঘুম ভাঙার পর বেশ কিছুক্ষণ সব গোলমাল হয়ে রইল মাথার ভেতরটা। কি অবস্থায় আছি, তা মনে করতেই গেল বেশ খানিকটা সময়। একটু একটু করে মনে পড়ল সবই। আলো জ্বালালাম। ঘড়ি দেখলাম। কিন্তু সময় জানতে পারলাম না-বন্ধ হয়ে গেছে ঘড়ি। কাজেই বুঝতে পারলাম না ঘুমিয়েছি কতক্ষণ। হাত-পা আড়ষ্ট লাগছিল। তাই উঠে গিয়ে আড়মোড়া ভাঙলাম সামনের প্যাকিং বাক্স দুটোর মাঝে দাঁড়িয়ে। খিদেয় পেট জ্বলে

যাচ্ছিল–ঠাণ্ডা মেষ মাংস কিছুটা আহার করে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এখন চেটেপুটে খেলাম বাকিটা। খিদের চোটে অমৃতসমান মনে হলেও অবাক হলাম মাংসের অবস্থা দেখে। রীতিমত বাসি হয়ে গিয়ে গন্ধ ছাড়ছে! তবে কি অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম? ঘুম ভাঙার পর তাই মাথার মধ্যে সব যেন জট পাকিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছিল? বদ্ধ আবহাওয়ার দরুন নিশ্চয়। মাথার মধ্যেও বেশ দপদপ করছে। নিঃশ্বেস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। দমিয়ে দেওয়া অজস্র অনুভূতি মনের ওপর চেপে বসছে। তা সত্ত্বেও চোরা-দরজা খুলে বাইরে বেরোতে সাহস হল না। ঘড়িতে দম দিয়ে বসে রইলাম চুপচাপ।

বড় একঘেয়ে কাটল পরের চব্বিশটা ঘণ্টা। কেউ এসে দুটো কথাও বলে গেল না। ভীষণ রাগ হয়ে গেল অগাস্টাসের ওপর। এদিকে উদ্বেগ বেড়েই চলেছে খাবার জলের পরিমাণ দেখে। ছিল এক বোতল–এখন দাঁড়িয়েছে আধবোতল। তেষ্টায় গলা কাঠ। মেষমাংস ফুরিয়ে যাওয়ায় খাচ্ছি কেবল সসেজমাংস। অস্বস্তি একটু একটু করে বেড়ে যাওয়ায় বই পড়ায় মন দিতে পারলাম না। দারুণ ঘুম পাচ্ছিল। অথচ ভয়ের চোটে ঘুমোতে পারছি না। বদ্ধ জায়গায় পোড়া কাঠকয়লার প্রভাব যে কি মারাত্মক, তা তো জানি। জাহাজের দুলুনি থেকে টের পেলাম এসে পড়েছি খোলা সমুদ্রে। অনেকদূর থেকে একটা চাপা গুম গুম শব্দ ভেসে এল কানে। ঝড়ের আওয়াজ। কিন্তু মামুলি ঝড় নয়। প্রলয়ঙ্কর প্রভঞ্জন। অগাস্টাস কেন যে একবারও নীচে এল না, কিছুতেই তা ভেবে বার করতে পারলাম না। নিশ্চয় জাহাজঘাটা ছাড়িয়ে চলে এসেছি অনেক দূরে–এখন তো অনায়াসেই উঠে যেতে পারি ওপরের ডেকে। নিশ্চয় কোন দুর্ঘটনায় পড়েছে অগাস্টাস, নিচে আসতে পারছে না সেই কারণেই। জলে পড়ে যায় নি তো? হঠাৎ মারা যায় নি তো? ভাবতে পারলাম না সম্ভাবনাটা অস্থির হয়ে পড়লাম। এমনও হতে পারে, উল্টো হাওয়ার ধাক্কায় এখনো নানটাকেট ছাড়িয়ে বেশিদূর যেতে পারেনি জাহাজ। কিন্তু তাই বা কি করে হয়? জাহাজ দিব্বি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে। ঝড়ের মাতনের সঙ্গে টক্কর দিলে জাহাজ কখনোই এ অবস্থায় এগিয়ে যেতে পারত না–হেলেদুলে অস্থির হয়ে যেত। তাছাড়া নানটাকেট-এর কাছাকাছিই যদি থাকি তো অগাস্টাস নিজে এসে সে খবরটা জানিয়ে যাচ্ছে না কেন? দেখাই যাক না আরও চব্বিশটা ঘণ্টা। তারপর না হয় চোরা-দরজা খুলে বেরিয়ে যাব বাইরে। অগাস্টাসের দেখা না পাওয়া গেলেও স্টেট রুম থেকে আবার জল তো আনা যাবে। এইসব ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম অকাতরে। দেখেছিলাম একটার পর একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। শেষ দুঃস্বপ্নটা একটা বিকটাকৃতি সিংহের। সাহেরা মরুভূমির পশুরাজ। আমাকে মাটিতে আছড়ে ফেলে

হিংস্র গর্জন করে যেই দাঁত বসাতে যাচ্ছে টুঁটিতে—অমনি ঘুমটা গেল ভেঙে। টের পেলাম, সত্যিই একটা দানবের থাবা চেপে বসেছে বুকের ওপর—তপ্ত নিঃশ্বাসে যেন পুড়ে যাচ্ছে কান—ভয়াবহ সাদা ছুঁচোলো দাঁত ঝকঝক করছে অন্ধকারে।

একটা আঙুল পর্যন্ত নাড়াতে পারলাম না—মুখ দিয়ে বেরলো না কোন শব্দ। যে পশুভায়ার দেহভারে আমার এহেন অবস্থা, তার দিক দিয়েও তক্ষুনি আমাকে দাঁতে কেটে নখে ছিঁড়ে ফেলার কোনো প্রচেষ্টা দেখা গেল না। নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়ে রইলাম তার ভারী শরীরের তলায়। বেশ বুঝলাম, শরীর আর মন থেকে শক্তি লোপ পাচ্ছে একটু একটু করে—প্রাণটা যেতে বসেছে স্রেফ ভয়ে—বিষম আতঙ্কে। মাথা ঘুরতে লাগল। চোখে অন্ধকার দেখলাম। চোখের ঠিক সামনেই ধকধকে চক্ষু গোলক দুটোও আবছা হয়ে এল। অনেক চেষ্টায় ইষ্টনাম জপ করে প্রস্তুত হলাম মৃত্যুর জন্যে।

জানোয়ারটার ঘুমিয়ে থাকা জিঘাংসা জাগ্রত হল যেন আমার গলার আওয়াজটা কানে যেতেই। জাঁকিয়ে শুয়ে পড়ল আমার গোটা শরীরটার ওপর।

পরক্ষণেই তাজ্জব হয়ে গেলাম তার কাণ্ড দেখে!

আনন্দে আটখানা হয়ে বিষম আগ্রহে লম্বা উষ্ণ জিভ বার করে চাটতে লাগল আমার মুখ আর হাত! সেই সঙ্গে দীর্ঘ টানা কুঁই কুঁই ডাক।

বিলকুল হতভম্ব হয়ে গেলেও মনে পড়ে গেল ঠিক এইভাবেই তো আদর জানায় আমার অতি অনুরক্ত নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুরটা—নাম যার টাইগার, ঠিক এই ভাবেই কুঁই কুঁই করে গা চেটে দেয় সোহাগ জানানর সময়ে!

টাইগার! টাইগারই বটে!

তৎক্ষণাৎ রক্তস্রোত ছুটে গেল মাথায়। পুনর্জীবনের উন্মাদনায় যেন নতুন শক্তি ফিরে এল হাতে-পায়ে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে গলা জড়িয়ে ধরলাম টাইগারের এবং দীর্ঘকাল একলা থাকার যন্ত্রণাভোগের পর বিশ্বস্ত বন্ধুকে পেয়ে কেঁদে ফেললাম ঝরঝর করে।

টাইগার যে আমার কতবড় বন্ধু, তা বলে বোঝাতে পারব না। প্রিয় কুকুরকে ভালোবাসে সকলেই। কিন্তু টাইগারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তার চাইতেও নিবিড়। বাচ্ছা অবস্থায় ওকে বাঁচিয়েছিলাম জলে ডুবে মৃত্যু থেকে। কশাই প্রকৃতির একটা বদ লোক ওর গলায় দড়ি বেঁধে নানটাকেটের রাস্তা দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ডুবিয়ে মারবে বলে। প্রাণটা বাঁচাই আমি। বিনিময়ে আমাকে বাঁচায় টাইগার। মুগুরের ঘায়ে মাথা ছাতু হয়ে যেত সেদিন টাইগার না থাকলে।

আমার চরম দোস্ত সেই টাইগার যে কি করে জাহাজের

অন্ধকার খোলে ঢুকে একেবারে আমার গায়ের ওপর এসে শুয়ে পড়ল, কিছুতেই তা ভেবে পেলাম না। আগের মতই বুদ্ধি শুদ্ধি গুলিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

কানে ঘড়ি লাগিয়ে টের পেলাম, দম না দেওয়ার ফলে আবার বন্ধ হয়ে গেছে ঘড়ি যন্ত্র। নিশ্চয় ফের লম্বা ঘুম ঘুমিয়েছি। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, তেষ্টা আর সইতে পারছি না, অন্ধকারেই অবশিষ্ট জলটুকু হাতড়ে খুঁজতে লাগলাম। মোমবাতিটা কোন কালে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। ফসফরাস দেশলাইও হাতে ঠেকল না। জলের জগ পেলাম বটে-একফোঁটা জল নেই তাতে। টাইগার নিশ্চয় চেটেপুটে মেরে দিয়েছে। মেষমাংসের হাড়টাও খুঁটে খুঁটে খেয়েছে-ফেলে রেখেছে বাক্সের সামনেই। দুর্গন্ধ মাংস নিয়ে চিন্তিত হলাম না-দুশ্চিন্তায় পড়লাম জলের অভাবে। খুব কাহিল বোধ করছিলাম। সামান্য নড়াচড়াতেই গা-হাত পা থরথর করে কাঁপছিল। গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মত ঠিক এই সময়ে এমন দুলছিল জাহাজ যে বাক্সর ওপর রাখা তেলের পিপেগুলোও মনে হল যে কোনো মুহূর্তে গড়িয়ে পড়ে বাক্স থেকে বেরোবার বা ঢোকার পথ বন্ধ করে দেবে। সমুদ্রপীড়াতেও আক্রান্ত হয়েছি বুঝলাম। গা-পাক দিচ্ছে। অতি কষ্টে বমি আটকে রেখেছি।

এহেন পরিস্থিতিতে, ঠিক করলাম, আর দেরী করা সমীচীন হবে না। এক্ষুনি চোরা-দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। নড়বার ক্ষমতাও যে লোপ পাবে এর পর।

মনস্থির করার সঙ্গে সঙ্গে আবার হাতড়ে দেখলাম দেশলাই আর মোমবাতি পাওয়া যায় কিনা। প্রথমটা হাতে ঠেকল বটে-দ্বিতীয়টার বাণ্ডিল কিছুতেই খুঁজে পেলাম না। অগত্যা টাইগারকে চুপচাপ শুয়ে থাকতে হুকুম দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম চোরা-দরজার দিকে।

বেরিয়েই বুঝলাম কি পরিমাণ দুর্বল হয়ে পড়েছি। হামাগুড়ি দিতে তো হয়েছেই, বহুবার ঐ অবস্থাতেই হাত-পা শক্তির অভাবে দুমড়ে যাওয়ায় মুখ থুবড়ে শুয়ে থেকেছি বেশ কিছুক্ষণ। তা সত্ত্বেও এগিয়েছি গুটিগুটি। না এগোলে প্রাণহীন দেহটাই তো পড়ে থাকবে রাশি রাশি মালপত্রের এই গোলকধাঁধায়।

আচমকা মাথা ঘুরে গেল লোহা বাঁধাই একটা বাক্সের কোণে মাথা ঠুকে যাওয়ায়। জাহাজের দুলুনিতে বাক্স হড়কে এসে পড়েছে দড়িটার ওপর-যে দড়ি ধরে আমি গুটিগুটি চলেছি চোরা-দরজার দিকে নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে।

কি করি এখন? দুটো উপায় আছে। বিরাট বাক্সটাকে ঘুরে ওপাশে গিয়ে দড়ির নাগাল ধরা যায়। অথবা, বাক্সর ওপর দিয়ে গিয়ে ওপাশে নেমে পড়া যায়।

প্রথম উপায়টা বিপজ্জনক। পিচের মত কালো তমিস্রায় যদি

পথ হারিয়ে ফেলি। দড়ির সন্ধান আর না পাই? তার চাইতে বরং বাক্স টপকে ওপাশে নামাই ভাল।

সেই চেষ্টায় করলাম। করতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে বুঝলাম, কাজটা যতটা সোজা ভেবেছিলাম, ততটা সোজা নয়। সিধে হয়ে দাঁড়িয়েও বাক্সর মাথায় হাত পৌঁছল না। তেলতেলে গা বেয়ে টিকটিকির মত ওঠাও সম্ভব নয়। আমার দুপাশে নানা ধরনের বাক্স এবং পিপে জড়ো হওয়ায় বেশি ঠেলাঠেলি করতে গেলেও মালপত্র গড়িয়ে এসে আমাকে চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে দিতে পারে।

মরিয়া হয়ে মাথা দিয়ে গুঁতিয়ে বাক্সটাকে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করেছিলাম। তখন বুঝলাম তক্তা কাঁপছে। পকেট ছুরি বার করে অতিকষ্টে একটা তক্তা আলগা করে ঢুকে পড়লাম ফাঁক দিয়ে বাক্সের ভেতরে।

আনন্দে নেচে উঠল মনটা। ওদিকে আর তক্তা নেই-বাক্সর ডালাই নেই। ডালাহীন খালি একটা বাক্সর তলার দিক দিয়ে ঢুকেছি বলেই সুট করে বেরিয়ে এলাম খোলামুখ দিয়ে। পথনির্দেশক দড়িটাতেও হাত লেগে গেল তৎক্ষণাৎ। অতিকষ্টে দড়ি ধরে পৌঁছলাম চোরা-দরজার তলায়। হাত ঠেকলো পেরেকে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পেরেক সরানোর পরেও, চোরা-দরজার পাল্লা ঠেলে ওপরে তুলতে পারলাম না।

সর্বনাশ! তাহলে চোরা-দরজার অস্তিত্ব কেউ জেনে ফেলে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে পেরেক ঠুকে? নাকি, কোন ভারি জিনিস চাপানো রয়েছে পাল্লার ওপর?

দমে গেলাম খুবই। বসে পড়লাম মেঝের ওপর। অনাহারে এবং দম আটকে মৃত্যুর চিন্তায় অবশ হয়ে এল সর্বাঙ্গ।

অনেকক্ষণ এইভাবে নিঝুম হয়ে বসে থাকার পর আবার শেষ চেষ্টা করলাম মরিয়া হয়ে। দাঁড়িয়ে উঠে ছুরির ফলাটা ঢুকিয়ে দিলাম চোরা-দরজার পাল্লার ফাঁকে। ফাঁক দিয়ে আলো-টালো কিছুই দেখতে পেলাম না বটে, তবে ছুরির ফলা ঠেকে গেল কঠিন একটা বস্তুর ওপর গিয়ে। ঢেউ খেলানো বস্তু। জাহাজের শেকল নিশ্চয়। তাগাড় করা হয়েছে চোরা-দরজার ওপর।

বৃথা চেষ্টা। ধুঁকতে ধুঁকতে ফিরে এলাম বাক্সের মধ্যে। টাইগার তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। সর্বাঙ্গ চেঁটে যেন সান্ত্বনা দিয়ে গেল নিদারুণ নৈরাশ্যের মধ্যে।

কিন্তু ওর আচরণটা কিরকম যেন অদ্ভুত ঠেকল। বারবার চিৎ হয়ে শুয়ে চার পা শূন্যে তুলে কেন যে অমনভাবে কুঁই কুঁই করছে বুঝলাম না। খিদে পেয়েছে নাকি? দিলাম শূকর মাংসটা। গোগ্রাসে খেয়ে নিল তৎক্ষণাৎ। আবার শুরু হয়ে গেল চার পা শূন্যে তুলে কুঁই কুঁই চিৎকার। তেষ্টায় কষ্ট পাচ্ছে না তো? খুবই স্বাভাবিক।

হঠাৎ মনে হল চোট পায় নি তো ? একটা একটা করে থাবা হাতের মধ্যে নিয়ে দেখলাম। না, কোথাও চোট লাগেনি। তবে ? মাথায় বা শরীরের অন্য কোথাও জখম হয়েছে নিশ্চয়। মাথায় হাত বুলোলাম। কোন ক্ষত নেই। মাথা থেকে হাত সরিয়ে ঘাড়ে হাত বুলোতেই হাতে ঠেকল একটা সরু সুতো। সুতোটা গলা ঘিরে রয়েছে। গলার বাঁদিকে সুতোর সঙ্গে বাঁধা রয়েছে ছোট্ট একটা চিঠির কাগজ !

৩

চিরকুটটা এসেছে অগাস্টাসের কাছ থেকে, বুঝলাম তা তৎক্ষণাৎ। নিশ্চয় কোন দুর্ঘটনায় পড়েছে বেচারী। এমনই কোন ঘটনা যার ফলে আমার খোঁজ নিতে পারেনি-খাঁচা থেকে মুক্তি দিতে পারেনি। তাই চিরকুট লিখে প্রকৃত ব্যাপারটা আমার গোচরে আনার অভিনব এই পন্থাটা বার করেছে মাথা খাটিয়ে।

বিষম আগ্রহে পা থেকে মাথা পর্যন্ত থরথর করে কাঁপতে লাগল আমার। আর একবার অন্ধকার হাতড়ে দেখলাম ফসফরাস দেশলাই আর মোমবাতি-বাণ্ডিল পাওয়া যায় কিনা। মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে থাকলেও এইটুকু অন্তত মনে ছিল যে ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগেই দেশলাই আর মোমবাতি রেখেছিলাম পাশাপাশি। চোরা-দরজার খোঁজে যাওয়ার আগেও দেশলাইটাকে সন্তর্পণে সরিয়ে রেখেছিলাম একপাশে। কোথায় রেখেছিলাম, তাও মনে করতে পারলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যাওয়ায় সব যেন ঘোঁট পাকিয়ে যেতে লাগল মাথার মধ্যে। ঘণ্টাখানেক বৃথাই অন্বেষণ করে গেলাম হারানো বস্তু দুটোর। এরকম প্রত্যাশা কণ্টকিত উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় জীবনে পড়তে হয়নি আমাকে।

বেশ কিছুক্ষণ এই ধরনের অসহ্য সাসপেন্সের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর বাক্সর খোলা দিকে মাথা বাড়াতেই কয়েক ফুট দূরেই চোখে পড়ল খুব ক্ষীণ একটা আলোর দ্যুতি। ভীষণ অবাক হয়ে গুটিগুটি যেই এগিয়েছি সেইদিকে, অমনি দ্যুতি ফুস করে হারিয়ে গেল জমাট কালো অন্ধকারের মধ্যেই। হাতড়ে হাতড়ে আবার ফিরে এলাম যেখানে ছিলাম ঠিক সেইখানে। আলোর দ্যুতিটা এবার চোখে পড়ল যেদিকে যাচ্ছিলাম ঠিক তার উল্টোদিকে। আবার এগুলাম গুটিগুটি-বিষম আতঙ্কে প্রাণটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে। এবার পৌঁছলাম আলোককণার সমীপে।

হাতে নিয়ে দেখলাম খানকয়েক ফসফরাস দেশলাই আর ভাঙাচোরা পিণ্ডিপাকানো কয়েকটা মোমবাতি পড়ে রয়েছে একটা পিপের ওপর।

এ আবার কি রহস্য ! দেশলাই আর মোমবাতি এখানে এল কি

করে ? নিশ্চয় টাইগারের কাণ্ড। খিদের জ্বালায় চিবিয়ে পিণ্ডি পাকিয়েছে মোমবাতির বাণ্ডিলগুলোকে। এমন দশা করে ছেড়েছে যে মোমবাতি জ্বালিয়ে আলোর মুখ দেখা সম্ভব নয় কোনমতেই।

কি আর করা যায়। ফসফরাসের খানকয়েক টুকরো আর ভাঙা মোমবাতি কিছু নিয়ে সন্তর্পণে ফিরে এলাম বাক্সর খাঁচায়। হাত বুলিয়ে টের পেলাম, টাইগার বাধ্য বালকের মত টানটান হয়ে শুয়ে রয়েছে একই জায়গায়।

ভেবে পেলাম না এর পর আমার কি করা উচিত। এরকম অন্ধকার আমি জীবনে দেখিনি। মুখের কাছে হাত এনেও হাত দেখতে পাচ্ছি না। অগাস্টাসের চিরকুটের পাঠোদ্ধারের আশা জলাঞ্জলি দিতে হল নিরুপায় হয়ে। অবস্থাটা আরো শোচনীয় হয়ে উঠল। বন্ধুবর চিঠি লিখে খবর পাঠিয়েছে-খবরটা রয়েছে হাতের মুঠোয়-অথচ তা পড়তে পারছি না।

আফিং খাওয়া মানুষের মত মাথার অবস্থা দাঁড়াল আমার। ঘোরের মাথায় উল্টোপাল্টা কত কি চিন্তা করে গেলাম-বিষম এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের কত উদ্ভট পন্থাই না মাথার মধ্যে এনে নাড়াচাড়া করে গেলাম।

অকস্মাৎ একটা উপায় খটাং করে লেগে গেল মস্তিষ্কের কোষে কোষে। অতি সহজ উপায়। কেন যে এতক্ষণ মাথায় আসেনি, ভেবে অবাক হলাম খুবই।

ফসফরাস দেশলাইয়ের কুচিগুলো হাতের মুঠোতেই ছিল। চিরকুটটা মেলে ধরলাম একটা বইয়ের মলাটের ওপর। তার ওপর ছড়িয়ে দিলাম ফসফরাসের কুচিগুলো। তারপর হাত দিয়ে জোরে জোরে ঘষতেই একটা আবছা দ্যুতিতে আলোকিত হল চিরকুটের ওপর দিক। সামান্যই দ্যুতি। কিন্তু অবর্ণনীয় ঐ তমিস্রার মধ্যে তা কম নয়। চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইলাম চিরকুটের দিকে। কিন্তু ক্ষণিকের প্রভায় চিরকুটে কোনো লেখাই দেখতে পেলাম না। বিলকুল সাদা কাগজ। মনে হল যেন গতি স্তব্ধ হয়ে আসছে আমার হৃৎপিণ্ডের। এমন নৈরাশ্য যন্ত্রণা আমাকে জীবনে ভোগ করতে হয়নি।

আগেই বলেছি, উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছিল একেবারেই। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল যেন পাগল হতে আর দেরী নেই। বেশ কয়েকদিন তিমিশিকারী জাহাজের বন্ধ খোলে থাকতে হয়েছে। দূষিত বাতাস ফুসফুসে গেছে। দশ পনেরো ঘণ্টা কিছু খেতে পাইনি-ঘুমোতেও পারিনি। বিস্কুট খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না-তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে-জল তো নেই এক ফোঁটাও। এহেন মানসিক এবং শারীরিক অবস্থায় জ্বরে পোড়া শরীরে অ্যাডভেঞ্চার করে কোনমতে ফসফরাসের

টুকরো কুড়িয়ে এনে ঘষে জ্বালিয়ে দেখেছিলাম চিরকুটের একটা দিক.........

কী সর্বনাশ ! দেখেছি তো মাত্র একটা দিক ! আর একটা দিক তো উল্টে দেখা হয়নি ! সীমাহীন ক্রোধে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে গেল আমার। মূর্খ ! মূর্খ ! আকাট মূর্খ আমি ! চিরকুটের আর একটা দিক দেখবার কোন উপায়ই তো আর রাখিনি। ধিকিধিকি ক্রোধ অনেকক্ষণ থেকেই নৃত্য করে চলেছিল লণ্ডভণ্ড মস্তিষ্কের মধ্যে। চিরকুটের একদিকে কিছু লেখা নেই দেখে বিষম রাগে তৎক্ষণাৎ কুচিকুচি করে ছিঁড়ে দিয়েছি চিঠিটা !

কুড়ুল মেরেছি নিজের পায়ে।

এখন উপায় ? কোথায় গিয়ে পড়ে আছে চিঠির টুকরোগুলো এই অন্ধকারে তা জানা তো সম্ভব নয়।

ভয়াবহ এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পেলাম কিন্তু টাইগারের দৌলতে। কুচিকুচি কাগজের কোন টুকরোটাই খুঁজে পাব না জেনেও হন্যে হয়ে হাতড়ে ছিলাম অন্ধকারের মধ্যে। হাতে ঠেকেছিল একটা টুকরো। তুলে এনে ধরেছিলাম টাইগারের নাকের সামনে। পিঠ চাপড়ে আদর করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এরপর কি করতে হবে, অর্থাৎ, গন্ধ শুঁকে কাগজের বাকি টুকরোগুলো উদ্ধার করে এনে দিতে হবে।

সত্যিই তাজ্জব করে দিল টাইগার আমাকে। এ জাতের কুকুরের পক্ষে যা যা সম্ভব, তার কোনটাই কোনদিন ওকে শেখাইনি। গন্ধ শুঁকে হারোনো জিনিস খুঁজে আনার ট্রেনিং কোনদিন পায়নি আমার কাছে। সেদিন কিন্তু ও যেন বুঝে ফেলল আমার প্রাণ নির্ভর করছে ওর সহজাত এই ক্ষমতাটার ওপরে। তৎক্ষণাৎ ছুটে গেল অন্ধকারের মধ্যে। ভূতের মতো বসে রইলাম আমি উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে।

টাইগার ফিরে এল একটু পরেই। মুখে একটা কাগজ, হাতের ছেঁড়া কাগজটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম। চিঠির টুকরোই বটে। কাগজটা আমার হাতে গছিয়ে দিয়ে মুখ ঘষে একটু বাহবা আদায় করে নিয়ে গুঁতো খেয়ে আবার ছুটে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

এবার নিয়ে এল একটা বড়সড় টুকরো। পেলাম মোট তিনটে টুকরো। মিলিয়ে দেখলাম, পুরো চিটিটাই পাওয়া গেছে। রেগেমেগে তাহলে তিন টুকরোই করেছিলাম চিরকুটটা–তার বেশি নয়।

গোটা চিঠিটাই তাহলে পাওয়া গেল। এবার বুঝবো কি করে কোন টুকরোর কোন দিকে চিঠি লেখা আছে ?

ফসফরাসের কুচি আছে সামান্যই। একবার জ্বালালেই শেষ হয়ে যাবে। তৃতীয়বার এক্সপেরিমেণ্ট করার আর সুযোগ পাওয়া যাবে না। সুতরাং চুপচাপ বসে ভাবতে লাগলাম কি করা উচিত। লেখার দিকটা নিশ্চয় খসখসে হবে। হাত বুলোলেই লেখা আছে

টের পাওয়া যাবে। সুতরাং খসখসে দিকগুলো ওপর দিকে করে হাত বুলোলাম তৎক্ষণাৎ। সেরকম কিছুই হাতে টের পেলাম না। কাগজগুলো উল্টে রাখলাম বইয়ের ওপর। এবার একটা অতিশয় ক্ষীণ আভা চোখে পড়ল কাগজ তিনটের ওপর।

ফসফরাসের প্রভা। একটু আগেই এই দিকেই ফসফরাস রেখে ঘষেছিলাম। তারই দ্যুতি।

লেখাটা তাহলে হয়েছে উল্টোদিকে। আবার উল্টে রাখলাম কাগজ তিনটে। খান দুই ফসফরাস কুচি পেলাম কুড়িয়ে বাড়িয়ে। রাখলাম কাগজের ওপর। উদ্বেগে কাঠ হয়ে ঘষলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখের স্নায়ুগুলোর সমস্ত শক্তি জড়ো করে চাইলাম, কি লেখা আছে দেখবার জন্যে।

উত্তেজনায় অস্থির না হলে সব লেখাটাই দেখতে পেতাম। হুটোপুটি করে এক ঝলকের আলোয় সব লেখা পড়তে গিয়ে চোখে ঠেকলো মোট তিনটে লাইন। পড়তে পারলাম কিন্তু কেবল শেষের সাতটা শব্দ-'রক্ত-কাছাকাছি থাকবে, নইলে প্রাণে বাঁচবে না।'

পুরো লেখাটা দেখতে পেলেও যে আতঙ্ক সঞ্চারিত হত আমার অণুপরমাণুতে, তার চাইতেও বেশি আতঙ্কবোধে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম শুধু 'রক্ত' শব্দটা দেখে। এ শব্দের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে অনেক রহস্য, অনেক বিভীষিকা। না জানি কি বিভীষিকা-বার্তা পাঠিয়ে আমাকে হুঁশিয়ার করতে চেয়েছিল বন্ধুবর। নারকীয় আঁধারের করাল পরিবেশে ঐ শব্দটা তাই অবর্ণনীয় ভয়ের সঞ্চার ঘটিয়ে অবশ করে তুলল আমার সর্বাঙ্গ।

টাইগারের বিদঘুটে আচরণে আমার মন আকৃষ্ট হওয়ার আগে ভেবে রেখেছিলাম, চোরা দরজার নিচে গিয়ে চেঁচিয়ে ওপরে লোক জড়ো করব। তাতেও যদি কিছু না হয় তো ডেকের তক্তা কেটে ওপরে উঠে যাবো। অসহ্য এই বন্দী জীবনের অবসান ঘটাব এই দুটোর একটা পন্থায়। কিন্তু 'রক্ত' শব্দটা দেখেই হাড় হিম হয়ে গেল আমার। দুটো পন্থার কোনটাকেই কার্যকর করা যে আর সম্ভব নয়, হাড়ে হাড়ে তা উপলব্ধি করলাম। আচ্ছন্নের মত মাদুরের ওপর পড়ে রইলাম পুরো একটা দিন আর রাত্রি। বেহুঁশ হয়েছিলাম প্রায় সর্বক্ষণই-মাঝে মাঝে যুক্তি আর স্মৃতির ঝলকে প্রদীপ্ত হয়েছিল নৈরাশ্য তমিস্রায় নিমজ্জিত মস্তিষ্ক কোষগুলো।

তারপর উঠে বসলাম আবার। বড় জোর আর চব্বিশঘণ্টা জলাভাবে টিঁকে থাকতে পারব-তার বেশি নয়। বন্দীদশার প্রথম দিকে অগাস্টাসের দেওয়া সুরাপান করেছিলাম ইচ্ছামত। তাতে তেষ্টা মেটেনি-বরং বেড়েছে। জ্বরভাবও বৃদ্ধি পেয়েছে। এক বোতল কড়া মদ এখনো আছে-কিন্তু তা খাওয়া সমীচীন নয়।

সসেজ ফুরিয়েছে। শূকর মাংসের চামড়াটুকুই বলতে গেলে কেবল পড়ে আছে। বিস্কুট সাবাড় করেছে টাইগার-সামান্য গুঁড়ো ছাড়া কিচ্ছু নেই। এদিকে মাথার যন্ত্রণা বেড়েই চলেছে। প্রলাপের ঝোঁক পেয়ে বসছে। বেশ কয়েকঘণ্টা ধরে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল-এখন বেশ চাপ অনুভব করছি বুকের মধ্যে। এত সব কষ্ট ছাপিয়ে উঠেছে প্রবলতর একটা দুশ্চিন্তা।

দুশ্চিন্তাটা টাইগারের সৃষ্টিছাড়া আচরণ নিয়ে। বিচিত্র ব্যাপারটা প্রথম লক্ষ্য করেছিলাম ফসফরাস ঘষার সময়ে। চাপা গলায় গর্জে উঠেছিল টাইগার-নাক ঘষেছিল আমার হাতে। ভীষণ উত্তেজিত ছিলাম বলে অত মাথা ঘামাইনি। তারপরেই আছড়ে পড়েছিলাম মাদুরের ওপর। আচ্ছন্নের মত পড়েছিলাম পুরো একটা দিন আর রাত। সেই সময়ে মাঝে মাঝে ঘোর কেটে যাচ্ছিল টাইগারের ফোঁসফোঁসানির আর চাপা গজরানিতে-একেবারে কানের কাছেই। বার তিন-চার বার এই কাণ্ড ঘটবার পর ভয়ানক ভয় হল আমার। ভয়ের চোটেই ঘোর কেটে গেল একেবারেই। টাইগার তখন লম্বা হয়ে শুয়ে বাক্সর দরজার সামনে। চাপা গলায় হাড় হিম করা গর্জন করে চলেছে। সেইসঙ্গে এমনভাবে দাঁতে দাঁত ঘসছে যেন প্রবল খিঁচুনিতে আক্রান্ত হয়েছে।

বেশ বুঝলাম, বদ্ধ দূষিত বাতাসে আটক থাকায় অথবা জলাভাবে পাগল হয়ে গেছে টাইগার। ভেবে পেলাম না কি করা উচিত। খুন করব? ইচ্ছে মোটেই নেই। কিন্তু নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে হয় তো তাই করতে হবে।

একদৃষ্টে কিন্তু টাইগার চেয়ে আছে আমার দিকেই। অন্ধকারে জলন্ত দুটো চোখে পলক পড়ছে না। ঝকঝকে দংষ্ট্রাও দেখা যাচ্ছে। জান্তব জিঘাংসা প্রকটিত দাঁতে আর চোখে। যে কোন মুহূর্তে লাফিয়ে পড়তে পারে আমার ওপর।

কাঁহাতক এহেন ভয়ানক অবস্থায় বসে থাকা যায়? আর সহ্য করতে পারলাম না। ঠিক করলাম, বেরিয়ে পড়া যাক বাক্সর মধ্যে থেকে। টাইগার যদি বাধা দেয়, খতম করব তৎক্ষণাৎ!

কিন্তু বাক্স থেকে বেরুতে গেলে তো ওর লম্বমান দেহটাকেই টপকে যেতে হবে। মাদুরের ওপর উঠে বসতেই ও যেন আঁচ করেছিল আমার অভিপ্রায়। উঠে বসেছিল শোয়া অবস্থা থেকে। অন্ধকারে জলন্ত চোখ দুটো ওপরে উঠে স্থির হয়ে যাওয়ায় তা বুঝেছিলাম। দেখেছিলাম আরো বিকট হয়েছে ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি।

শূকর মাংসের যেটুকু পড়েছিল, গুঁজে নিলাম বেল্টে-সেই সঙ্গে কড়া মদের বোতলটা। সারা গায়ে জড়ালাম আলখাল্লা। অগাস্টাসের দেওয়া বাঁকানো বড় ছুরিটাও রাখলাম সঙ্গে।

যেই নড়েছি বাক্সর দরজার দিকে যাব বলে, সঙ্গে সঙ্গে রক্ত জলকরা গর্জন ছেড়ে আমার টুঁটি লক্ষ্য করে লাফ দিল টাইগার।

পুরো দেহটা এসে পড়ল আমার ডান কাঁধে-আমি ঠিকরে গেলাম বাঁদিকে। ঘাড়ের ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল টাইগারের দেহ।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে কম্বলে মুখ মুড়ে নিয়েছিলাম বলেই রুখে দিলাম দ্বিতীয় আক্রমণটা। দাঁত বসে গেল কম্বলের ওপর-মাংস পর্যন্ত পৌঁছোল না।

টাইগার তখন আমার দেহের ওপর-আমি রয়েছি নিচে-আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ছিন্ন হবে আমার টুঁটি।

হতাশাই অমিত শক্তি জোগালো আমাকে। এক ঝটকায় ঠিকরে ফেলে দিলাম টাইগারকে। কম্বলগুলো হাতে নিয়েই বেরিয়ে এলাম বাক্সর বাইরে এবং পরক্ষণেই টাইগারের ওপর তা ছুঁড়ে দিয়েই বাক্সর দরজা বন্ধ করে দিলাম বাইরে থেকে। কম্বলের ভেতর থেকে বেরোনোর সময়ও দিইনি।

ঝটাপটিতে শূকর মাংসটুকু পড়ে গেছিল বাক্সর ভেতরে। বেরিয়ে এসেছিলাম কেবল কড়া মদের বোতলটা নিয়ে। রাগে হতাশায় উন্মাদের মত ঢকঢক করে এক নিঃশ্বাসে তা সাবাড় করে দিলাম। আছড়ে চুরমার করে দিলাম খালি বোতল।

ঝন্‌ঝন্ শব্দটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই শুনলাম চাপা গলায় বিষম উৎকণ্ঠায় কে যেন ডাকছে আমার নাম ধরে।

অগাস্টাস! নিশ্চয় অগাস্টাস এসেছে! বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিতে এসেছে! টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম দুটো কাঠের বাক্সে দু-হাত রেখে। নিরতিসীম আবেগে কিন্তু গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বার করতে পারিনি সেই মুহূর্তে। অগাস্টাস ডাকতে ডাকতে কাছে আসছে বুঝতে পারলাম-ফিরেও যাচ্ছে টের পেলাম-কিছুতেই কিন্তু ওর ডাকের জবাবে একটা শব্দও বার করতে পারলাম না গলা দিয়ে।

অগাস্টাস! অগাস্টাস! নিশ্চিন্ত মৃত্যুর মধ্যে থেকে আমাকে বার করে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে নিয়ে এসেও ফিরে যাচ্ছে আমার দিক থেকে একটিমাত্র শব্দধ্বনিনা পেয়ে! মৃত্যুর দশ হাজার গুণ অধিক যন্ত্রণায় মাথা ঘুরে গেল আমার। দড়াম করে আছড়ে পড়লাম বাক্সের তলায়।

পতনের সময়ে বাঁকানো ছুরিখানা ঠিকরে গিয়েছিল কোমর থেকে-ঠক ঠক ঠকাস শব্দে গড়িয়ে গিয়েছিল মেঝের ওপর। সে কি মধুর শব্দ! উৎকর্ণ হয়ে ছিলাম সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড-এ আওয়াজ নিশ্চয় কানে যাবে অগাস্টাসের।

বেশ কিছুক্ষণ নিঃসীম নৈঃশব্দ্য। তারপরেই আবার শুনলাম ওর ডাক-'আর্থার!'

দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে চাপা গলায় অগাস্টাসই ডাকছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অগাস্টাস-আর কেউ নয়-অগাস্টাস ফিরে যেতে যেতেও থমকে দাঁড়িয়েছে ছুরি পড়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনে।

মৃত্যুগহ্বর টপকে আসার যে বর্ণনাতীত আনন্দ-সেই আনন্দই

বিপুল শক্তির বন্যা বইয়ে দিলে আমার অসাড় কণ্ঠস্বরে নিতান্তই অকস্মাৎ।

ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠেছিলাম হাহাকারের স্বরে-'অগাস্টাস! অগাস্টাস! অগাস্টাস!'

'চুপ! চেঁচিও না! আমি আসছি। খুঁজে খুঁজে যেতে যেটুকু সময় লাগে। চুপচাপ থাক।'

এক-একটা সেকেণ্ড মনে হল এক-একটা বছরের মত লম্বা। পদশব্দ ক্রমে এগিয়ে এল কাছে। আমার কাঁধ খামচে ধরেই মুখের ওপর জলের বোতল ঠেকিয়ে ধরল অগাস্টাস।

কবরের মধ্যে থেকে যেন বেরিয়ে এলাম সেই জল পান করে-এক নিঃশ্বাসে শেষ করে দিলাম জলের বোতল। প্রেত হয়ে যাচ্ছিলাম আর একটু দেরি হলেই-মানুষই রয়ে গেলাম ঐ জলের কল্যাণে।

তৃষ্ণার নিবারণ ঘটতেই পকেট থেকে তিন-চারটে সেদ্ধ আলু বের করল অগাস্টাস-খেলাম কোঁৎ কোঁৎ করে। সঙ্গে একটা চোরা লণ্ঠনও এনেছিল-ম্যাড়মেড়ে আলোর চাইতেও বেশি ভালো লাগল জল আর খাবার।

তারপরেই শুনতে বসলাম ওর কাহিনী। রীতিমত ভয়ঙ্কর, রীতিমত রোমাঞ্চকর কাহিনী। আমার পুনর্জীবনের আগে কি কি ঘটেছিল জাহাজে এবং কেনই বা সে আসতে পারেনি আমার কাছে-তা শুনতে শুনতে লোম খাড়া হয়ে গেল আমার।

৪

অগাস্টাস ঘড়িটা রেখে যাওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নোঙর তুলে রওনা হয়েছিল জাহাজ। সেদিন ছিল বিশে জুন। মনে আছে নিশ্চয়, খোলের মধ্যে ছিলাম আমি পুরো তিনটে দিন। ঐ তিন দিনে জাহাজের ডেকে, কেবিনে, স্টেটরুমে এত ছুটোছুটি, লোকজনের আনাগোনা, কর্মব্যস্ততা ছিল যে পাছে চোরা-দরজা কারো চোখে পড়ে যায় এবং আমি ধরা পড়ে যাই, এই ভয়ে অগাস্টাস আসতে পারেনি আমার কাছে। তিন দিন পরে এসে যখন শুনে গেল বহাল তবিয়তে আছি আমি, পরের দুটো দিন মোটামুটি নিশ্চিন্ত ছিল-যদিও তক্কে তক্কে ছিল সুযোগ পেলেই আবার দেখে যাবে আছি কিরকম।

সুযোগটা এসেছিল চতুর্থদিনে। এর আগে বেশ কয়েকবার অগাস্টাস ভেবেছিল, বাবাকে বলবে আমি লুকিয়ে আছি খোলের অন্ধকারে। তাঁর অনুমতি নিয়ে আমাকে তুলে আনবে কেবিনের আরামপ্রদ পরিবেশে। কিন্তু বাবার ভাবগতিক সুবিধের ঠেকেনি। ন্যানটাকেটও বেশি দূরে নেই। যদি রেগে মেগে জাহাজ ঘুরিয়ে ফের ফিরে যান আমাকে নামিয়ে দিতে, এই ভয়ে মুখে চাবি এঁটে থেকেছে অগাস্টাস। দুশ্চিন্তা ছিল না আমার ব্যাপারেও।

তাই ঠিক করেছিল, অপেক্ষাই করা যাক। সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত চুপিসাড়ে আমাকে আর দেখতেও আসবে না।

সুযোগ এল চতুর্থ দিনে। জল বা খাবার না নিয়েই এসেছিল অগাস্টাস আমার খোঁজ নিয়ে যেতে। এসে শুনেছিল অঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছি। তিমিশিকারী জাহাজের খোলে মাছের তেলের গন্ধেই নিশ্চয় কালঘুমে পেয়েছিল আমাকে। পুরো তিন দিন তিন রাত ঘুমিয়েছি একটানা-ঘড়িও চলেছে তিন দিন তিন রাত-তারপর দম ফুরিয়ে যেতেই বন্ধ হয়ে গেছে।

চোরা-দরজার পাল্লা খুলে নিচে নেমেই আমার নাকডাকার আওয়াজ শুনে চাপা গলায় প্রথমে নাম ধরে ডেকেছিল অগাস্টাস। নাক ডাকা থামেনি-জবাবও পায়নি। আবার ডেকেছিল আরও জোর গলায়-তবুও আমার নাকডাকা স্তব্ধ হয়নি। মালপত্রের গোলকধাঁধা ঘুরে আমার কাছে আসার মত সময় ছিল না হাতে। ক্যাপ্টেন বারনার্ড তখন মিনিটে মিনিটে ওকে ডাকছেন। নানা ধরনের কাজ করাচ্ছেন। আমি যখন মড়ার মত ঘুমোচ্ছি, তখন নিশ্চয় তোফা আরামেই আছি-এই ধারণা নিয়ে চোরা-দরজা দিয়ে যেই ওপরে উঠে গেছে, অমনি কানে ভেসে এসেছে কেবিনের দিক থেকে একটা অস্বাভাবিক রকমের হট্টগোলের শব্দ। তাড়াহুড়ো করে চোরা-দরজা বন্ধ করে স্টেটরুমের দরজা খোলা রেখে বাইরে ছুটে বেরতে না বেরতেই দড়াম করে মুখের সামনেই গুলি বর্ষিত হয়েছে একটা পিস্তল থেকে-একই সঙ্গে মাথার ওপর পড়েছে ডাণ্ডা। লুটিয়ে পড়েছে অগাস্টাস।

ঐ অবস্থাতেই নির্মমহাতে একজন ওকে চেপে ধরে রেখেছিল কেবিনের মেঝেতে, আর একজন চেপে ধরেছিল গলা। চোখ খোলা ছিল বলেই অগাস্টাস দেখতে পেয়েছিল বাবাকে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছেন একটু দূরে। কপালে গভীর ক্ষত। দরদর করে রক্ত পড়ছে। মুখ দেখেই বোঝা গেল মারা যাচ্ছেন। কথা পর্যন্ত বলতে পারছেন না। নৃশংস মুখভাব নিয়ে পাশেই দাঁড়িয়ে ফার্স্টমেট। হেঁট হয়ে বসে ক্যাপ্টেনের পকেট খুঁজে বার করল একটা বড় মানিব্যাগ আর একটা ক্রনোমিটার। স্টেটরুম তছনছ করছে সাতজন খালাসী-নিগ্রো পাচকও রয়েছে তাদের মধ্যে। খুঁজছে বন্দুক আর গোলাবারুদ। ক্যাপ্টেন আর অগাস্টাস ছাড়া মোট নজন পুরুষ রয়েছে কেবিনে-জাহাজের সবচেয়ে পিশাচ প্রকৃতির নটি লোক।

অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এই নজন লোক উঠে গেল ডেকে। গেল জাহাজের সামনের দিকে। হ্যাচ বন্ধ করা ছিল। দুজন বিদ্রোহী কুঠার নিয়ে দাঁড়াল পাশে। তারপর হ্যাচ খুলে ফার্স্টমেট একে একে উঠে আসতে বললে ভেতরে যারা ছিল, তাদেরকে। কাঁপতে কাঁপতে এবং হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে প্রথমেই বেরিয়ে এল একজন ইংরেজ ছোকরা। জাহাজের কাজে নতুন এসেছে।

প্রাণভিক্ষা চাইল ফার্স্টমেটের কাছে। জবাব পেল কুঠারের ঘায়ে। দু-ফাঁক হয়ে গেল খুলি। নিগ্রো পাচক দেহটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল জলে।

ঝপাস শব্দ শুনেই খোলের মধ্যে যারা ছিল, তারা বুঝলে কি ঘটে গেল এইমাত্র। আর কি কেউ বেরোয়? শেষে ধোঁয়া ছাড়া হল ভেতরে। হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল ছ'জন। বেশি লোক বেরিয়ে এলে পাছে ন'জন বিদ্রোহীকে কাবু করে ফেলে, তাই তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেওয়া হল হ্যাচ। ছ'জনকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলা হল সামান্য ধস্তাধস্তির পর। তারপর বাকি কজনকেও ভয় দেখিয়ে বার করে এনে বেঁধে ফেলা হল একইভাবে। মোট সাতাশজনকে এইভাবে বেঁধে ফেলে রাখা হল ডেকের ওপর।

এর পরেই শুরু হল ভয়াবহ নরমেধ যজ্ঞ। কৃষ্ণকায় নিগ্রো পাচক কুঠারের এক-এক কোপে দু'ফাঁক করে দিলে পর পর বাইশজনের খুলি—পর পর বাইশটা লাশকে সোল্লাসে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে বিদ্রোহীরা।

বাকী চারজন, অগাস্টাসও ছিল তাদের মধ্যে, দেখেশুনে বুঝলে প্রাণের আশা আর নেই। কিন্তু বাইশটা খুলি দু-ফাঁক করে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পর বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বিদ্রোহীরা।

তাই শুরু হল মদ খেয়ে হল্লোড়। চলল সন্ধ্যে পর্যন্ত। কয়েক ফুট দূরেই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মৃত্যু পথের যাত্রী চারজনে শুনে গেল তাদের প্রতিটি কথা। মদের নেশায় বেশ কয়েকজনের মেজাজ তখন বিলকুল শরিফ। চারজনকে প্রাণে বাঁচিয়ে দলে ভিড়িয়ে নিতে চাইছে তারা—লুঠের বখরাও দেওয়া যাবে। বাকি কয়েকজনে চাইছে চারজনকেই নিকেশ করা হোক এখুনি। নিকেশ করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখা গেল নিগ্রো পাচকের। কিন্তু দলে ভারি না হওয়ায় শেষকালে নরমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারেনি শয়তানটা।

চারজনকে যারা প্রাণে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিল লাইন-ম্যানেজার ডার্ক পিটার্স। মা ভারতের মেয়ে—মুসৌরীর কাছে কালো পাহাড়ের উপসারোকা সম্প্রদায়ভুক্ত। বাবা লুইস নদীর কাছে পশুচর্মের ব্যবসা করে।

ডার্ক পিটার্স মাথায় খাটো। চার ফুট আট ইঞ্চির বেশি নয়। ঘাড়ে গর্দানে ঠাসা। পেশীর পাহাড়। গায়ে অসুরের মত শক্তি। পা দুখানা ধনুকের মত বাঁকানো। রেগে গেলে নাকি দানব-সমান। ন্যানটাকেটে তাকে যমের মত ভয় করত সবাই এই কারণেই। জাহাজের কাজে কিন্তু তার জুড়ি নেই। বয়স বেশি না হলেও মাথায় একদম চুল নেই। তেলতেলে মাথার মাঝখানে নিগ্রোদের মাথার মত একটা খোঁদল। বিচিত্র টাক মাথাকে অষ্টপ্রহর ঢেকে রেখে দিত পশুচর্ম দিয়ে। সেদিন পড়েছিল

ভাল্লুকের চামড়ার টুপি। ফলে অতিশয় বীভৎস দেখাচ্ছিল মুখখানা। বিশেষ করে দাঁতের বাহারের জন্যে। ডার্ক পিটার্সের পাতলা ঠোঁট এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকলেও লম্বা লম্বা মুলোর মত দাঁতগুলোকে পুরোপুরি ঢেকে রাখতে পারত না কখনোই। দেখে মনে হত যেন হাসছে। কিন্তু একটু ভাল করে দেখলেই হাসির ধরনটা গায়ের রক্ত হিম করে ছাড়ত।

ডার্ক পিটার্সের বর্ণনা বিশেষ করে দিলাম এই কারণে যে এই লোকটাই প্রাণে বাঁচিয়েছিল অগাস্টাসকে। আমার এই কাহিনীতে তার প্রসঙ্গ আসবে বহুবার। ভয়ের এই বিচিত্র চলচ্ছবি কারোরই বিশ্বাস হবে না জানি, কাউকে বিশ্বাস করাতেও চাই না। তবুও সব বলব, তা সে যত অবিশ্বাস্যই হোক না কেন।

অনেক কথাকাটাকাটি এবং বার দুই তিন দারুণ ঝগড়ার পর ঠিক হল নৌকোয় চাপিয়ে জীবিত কয়েকজনকে ভাসিয়ে দেওয়া হবে সমুদ্রে। অট্টহেসে ডার্ক পিটার্স শুধু অগাস্টাসকে রেখে দিতে চাইলে জাহাজে তার কেরানির কাজ করার জন্যে।

সঙ্গে সঙ্গে নৌকো নামানো হল জলে। মেট নিয়ে এল ক্যাপ্টেন বারনার্ডকে। ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি বললেন, তাঁকে যেন নৌকোয় চাপানো না হয়। বিদ্রোহের জন্যে কাউকেউ সাজা দেওয়া হবে না। কাছাকাছি কোন দ্বীপে সবাইকে নামিয়ে দেবেন।

প্রত্যুত্তরে পিশাচ নিগ্রো পাচক তাঁকে বাঁধা অবস্থাতেই ছুঁড়ে ফেলে দিলে নৌকোর মধ্যে। বাকি কজনের বাঁধন খুলে দিতেই সুড় সুড় করে নিজেরাই নেমে গেল নৌকোয়। কিছু বিস্কুট দেওয়া হল সঙ্গে-দাঁড়, মাস্তুল, পাল, কম্পাস-এগুলোর কোনটাই নামানো হল না নৌকোয়। কিছুক্ষণ জাহাজে দড়ি বাঁধা নৌকো ভেসে চলল পেছন পেছন-তারপর দড়ি কেটে দিতেই নৌকো হারিয়ে গেল তারকাহীন রাতের অন্ধকারে।

অগাস্টাসের হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দেওয়া হয়েছিল। তিন দিন তক্কে তক্কে থেকেছে খোলে নেমে আমার অবস্থাটা দেখে আসার সুযোগে। বেশ কয়েকবার ভেবেছে, বিদ্রোহীদের জানিয়ে দেয় আমার কথা। কিন্তু পৈশাচিক ঐ নৃশংসতা স্বচক্ষে দেখার পর ভরসা পায়নি। এই তিন দিনে মদে চুর চুর অবস্থায় বিদ্রোহীরা তার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহারও করেনি। তাদের মর্জির ওপরেই নির্ভর করেছে আয়ু। যে কোন মুহূর্তে ঝোঁকের মাথায় খতম করে দিতে পারত। একবার তো করাল প্রকৃতির নিগ্রো পাচকের খপ্পর থেকে ডার্ক পিটার্সই তাকে বাঁচায়। অগাস্টাসের ওপর গোড়া থেকেই ভাল ব্যবহার করে এসেছে এই ডার্ক পিটার্স। আরও একবার ফার্স্টমেটের খপ্পর থেকে তাকে বাঁচায় খর্বকায় ডার্ক পিটার্স। তিনদিনের দিন আমার জন্যে উদ্বেগে ছটফট করতে করতে সামান্য সুযোগ পেয়েই স্টেটরুমে এসেছিল অগাস্টাস। দেখেছিল চোরা-দরজার ওপর পাহাড় করে রাখা হয়েছে একগাদা

শেকল। আরো অনেক আসবাবপত্র টেনে এনে ঠেসে রাখা হয়েছে ঘরের মধ্যে। শেকল সরালেই চোরা-দরজার অস্তিত্ব সবাই জেনে যাবে, এই ভয়ে তৎক্ষণাৎ ভেকে ফিরে গিয়েছিল অগাস্টাস। ঝুঁটি খামচে ধরেছিল ফার্স্টমেট। জানতে চেয়েছিল, যাওয়া হয়েছিল কোথায় ?

নির্ঘাৎ তাকে সেই মুহূর্তেই জলে ছুঁড়ে ফেলে দিত নৃশংস ফার্স্টমেট-ডার্ক পিটার্স বাধা না দিলে। হাতে হাতকড়া পরিয়ে, পা দুটো দড়ি দিয়ে বেঁধে অগাস্টাসকে নিগ্রো পাচক ছুঁড়ে ফেলে রেখে যায় নিচের তলার একটা বার্থে। শাসিয়ে গেছিল যাওয়ার সময়ে-এই অবস্থায় থাকতে হবে অগাস্টাসকে 'যতক্ষণ জাহাজ আর জাহাজ না থাকছে'।

কথাটার মানে বোঝেনি অগাস্টাস। এই তিনদিনের কথাবার্তা থেকে শুধু জেনেছিল-গ্র্যামপাস জাহাজকে বোম্বেটে জাহাজ বানাতে চলেছে বিদ্রোহীরা। আশপাশ দিয়ে জাহাজ গেলেই চালাবে লুঠতরাজ।

অগাস্টাসের এই পরিস্থিতি কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমারই অনুকূলে গেছিল-কিভাবে, তা পরের অধ্যায় পড়লেই বোঝা যাবে।

৫

পাচক বিদেয় হওয়ার পর হতাশায় ভেঙে পড়েছিল অগাস্টাস। বার্থ থেকে প্রাণ নিয়ে যে আর নামতে পারবে না, বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল ধারণাটা মনের মধ্যে।

বেশ কিছুক্ষণ এই অবস্থায় কাটানোর পর ঠিক করেছিল দশ-দশটা দিন আমি যে জাহাজের খোলে একা পড়ে রয়েছি মাত্র এক বোতল জল সম্বল করে এবং সে জলও নিশ্চয় এই দশ দিনে শেষ হয়ে গেছে-এই খবরটা জানাবে প্রথমেই যে বিদ্রোহী তার কাছে আসবে, তাকে। তার পরেই খেয়াল হয়েছিল, সরাসরি আমাকে খবর পাঠানোর একটা ব্যবস্থা করলেই তো হয়। নিজের প্রাণটা যখন যেতেই বসেছে, তখন না হয় একটু ঝুঁকি নেওয়াই গেল।

প্রথমেই হাতকড়া থেকে হাত গলিয়ে বার করে আনল একটু চেষ্টা করতেই। এ ধরনের হাতকড়া মোটা মোটা হাড়েই চেপে বসে থাকে। অগাস্টাসের বয়স কম, হাড় সরু। তাই হাত গলে বেরিয়ে এল অনায়াসেই। বার করল শুধু ডান হাতটা। তারপর খুলল পায়ের বাঁধন। ফাঁস দেওয়া দড়িটা রেখে দিল পাশে। কেউ এলেই আবার যেন পায়ে গলিয়ে শুয়ে থাকতে পারে।

তারপর দেখলে বার্থের পাশে কাঠের পার্টিশনটা এক ইঞ্চি পুরু নরম পাইন কাঠ দিয়ে তৈরী। এইটুকু দেখতে না দেখতেই-পায়ের আওয়াজ শোনা গেল বাইরে। তক্ষুনি ডান হাত

হাতকড়ায় আর পা দুটো ফাঁসির দড়িতে পড়িয়ে শুয়ে রইল আগের মত।

ঘরে ঢুকল ডার্ক পিটার্স-সঙ্গে টাইগার।

এক লাফে বার্থে উঠে এসে অগাস্টাসের পাশে শুয়ে পড়ল টাইগার। ল্যাজ নাড়তে লাগল পরমানন্দে।

টাইগারকে জাহাজে এনে তুলেছিল অগাস্টাসই। আমাকে জানায়নি ঘড়ি রেখে যাওয়ার সময়ে। খোলের মধ্যে আমাকে রেখে যাওয়ার পর বাড়ি গিয়ে নিয়ে এসেছিল টাইগারকে-ও জানত টাইগারকে আমি ভালবাসি প্রাণ দিয়ে-তাই।

বিদ্রোহ শুরু হয়ে যেতেই টাইগারের আর ল্যাজের ডগাটুকুও দেখা যায়নি বলে ধরে নিয়েছিল পিশাচ প্রকৃতির খালাসিরা নিশ্চয় তাকেও খতম করেছে, অথবা জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। দুটোর কোনটাই কিন্তু ঘটেনি। চেঁচামিচি রক্তারক্তি দেখেই টাইগার গিয়ে লুকিয়েছিল একটা নৌকোর পেছনকার সরু জায়গায়। ফাঁকটা এতই সঙ্কীর্ণ যে শেষকালে নিজে থেকে আর বেরতে পারেনি।

ডার্ক পিটার্স তাকে টেনে বার করে। লোকটার প্রাণে মায়া মমতা ছিল। অগাস্টাসের ওপরেও দুর্বলতা ছিল। একা একা শুয়ে রয়েছে অগাস্টাস, এই ভেবে টাইগারকে রেখে গিয়েছিল তার কাছে। সেই সঙ্গে কিছু নুন, সেদ্ধ আলু আর জল। বলেছিল, পরের দিন আবার আসবে খাবার আর জল নিয়ে।

ডার্ক পিটার্স যেতে না যেতেই হাত আর পায়ের বাঁধন খসিয়ে তোষকটা সরিয়ে ছুরি বার করে পার্টিশনের একটা তক্তা তলার দিক থেকে কাটতে আরম্ভ করেছিল অগাস্টাস। বার্থের গা ঘেঁষে কাটছিল এই কারণে যে হঠাৎ কেউ এসে পড়লে তোষকের মাথার দিকটা একটু তুলে দিয়ে কাটা জায়গাটা ঢেকে রাখবে তৎক্ষণাৎ।

সারাদিন গেল তক্তার তলার দিক কাটতে। আরও কিছুক্ষণ পরে এক ফুট ওপরে ওপরের দিকটাও কেটে ফেলল অগাস্টাস। তখন রাত হয়েছে। ছোট্ট ফোকরটা দিয়ে বাইরের ডেকে বেরিয়ে গিয়েছিল তক্ষুনি। বিদ্রোহীরা মদ খেয়ে তখন ভাল ভাল খাবার গিলতে ব্যস্ত। তাই কারোরই সামনে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

হ্যাচটা খুলে টাইগারকে নিয়ে খোলের ভেতরে নামতে গিয়েও নামেনি অগাস্টাস। খোলের ভেতরে নামলে, বেরিয়ে আসতে বেশ কিছুক্ষণ সময় তো লাগবেই। কেউ যদি এসে পড়ে সেই সময়ে? এসে যদি দেখে বার্থ শূন্য, অগাস্টাস উধাও? প্রাণ যাবে দুজনেরই।

তাই ফিরে আসতে যাচ্ছে, এমন সময়ে হ্যাচের ফাঁকে নাক ঠেকিয়ে করুণ স্বরে কুঁই কুঁই করে উঠেছিল টাইগার-অগাস্টাসের

পেছন পেছন পিপের ফাঁক দিয়ে এসে পেছনেই দাঁড়িয়েছিল সে এতক্ষণ।

অগাস্টাস বুঝেছিল, আমার অস্তিত্ব টের পেয়ে গেছে টাইগার। বায়না ধরেছে আমার কাছে যাওয়ার জন্যে। মতলবটা মাথায় এসেছিল সেই মুহূর্তে। নিজে না যেতে পারলেও, টাইগারকে দিয়ে চিঠি পাঠালেই তো হয়।

খুব বুদ্ধির কাজ করেছিল অগাস্টাস। ও তো জানত না, ডেক কেটে আমিও বেরিয়ে আসবার ফন্দী এঁটেছিলাম। চিঠি না পেলে করতামও তাই। ফলে, প্রাণটা আর ধড়ে থাকত না। দুজনেই জবাই হয়ে যেতাম তৎক্ষণাৎ।

মতলবটা মাথায় আসতেই অগাস্টাস কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় অন্ধকারেই। মেঝে হাতড়ে পেয়েছিল একটা দাঁতখোঁটা–কলমের কাজ চালাবে তাই দিয়ে। কালির অভাব মিটিয়ে আঙুলের ডগা চিরে–দরদর করে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল ডগা থেকে। কাগজের টুকরো বার করেছিল পকেট থেকে। মিঃ রসকে জাল চিঠি লিখবার সময়ে হাতের লেখার নকলটা প্রথমবারে ঠিকমত না হওয়ায় চিঠিখানা পকেটে গুঁজে রেখেছিল অগাস্টাস-দ্বিতীয় চিঠি লিখে পাঠিয়েছিল মিঃ রসকে। বাতিল এই চিঠির কাগজটাই কাজে দিল এখন। রক্ত দিয়ে অন্ধকারে যা লিখল তার শেষের লাইনটা ছিল এই : 'এ লেখায় রইল আমার রক্ত-কাছাকাছি থাকবে, নইলে প্রাণে বাঁচবে না।'

সুতো দিয়ে চিরকুটটা টাইগারের গলায় বেঁধে দিয়ে হ্যাচ খুলে তাকে নামিয়ে দিয়েছিল অগাস্টাস। ফিরে এসেছিল বার্থে। পার্টিশনের কাটা কাঠ যথাস্থানে লাগিয়ে ওপরের ফাঁকে গুঁজে রেখেছিল ছুরিটা। বার্থ থেকে একটা জামা নিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল ছুরিতে যাতে কাটা জায়গাটা কারো চোখে না পড়ে। তারপর হাতে হাতকড়া আর পায়ে দড়ি লাগিয়ে ফের শুয়ে পড়েছিল বার্থে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসেছিল ডার্ক পিটার্স–পূর্ণ মত্ত অবস্থায়। সঙ্গে খান পাঁচ ছয় বড় সাইজের সিদ্ধ আইরিস আলু আর এক মগ জল। বলেছিল, পরের দিন আবার আসবে পেট ভর্তি ডিনার নিয়ে। কিন্তু চলে যায়নি সঙ্গে সঙ্গে। বার্থের পাশে একটা সিন্দুকে বসে বকর বকর করে গিয়েছিল আপন মনে। একটু পরে দুজন হারপুনবাজ খালাসীও এসেছিল একেবারে মত্ত অবস্থায়। মাতাল হওয়ার ফলেই অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল তিনজনে। শুনে অগাস্টাস জানতে পেরেছিল বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটেছিল কিভাবে। ক্যাপ্টেন বার্নার্ডের সঙ্গে আদা-কাঁচকলা সম্পর্ক ছিল ফার্স্টমেটের। সেই রাগেই জাহাজ দখল করা হয়েছে। তারপর দুটো দল হয়ে গেছে বিদ্রোহীদের মধ্যে। প্রথম দলে আছে ফার্স্টমেট। তার ইচ্ছে কেপ ভার্ড দ্বীপপুঞ্জ থেকে যে জাহাজ

যাওয়ার কথা পাশ দিয়ে, তা দখল করা হোক। তারপর যাওয়া হোক ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বীপগুলোয় বোম্বেটেগিরি চালানর জন্যে।

দ্বিতীয় দলটার নেতৃত্ব দিচ্ছে নিগ্রো পাচক। ডার্ক পিটার্সও আছে এই দলে। সে নিজে তিমিশিকারে পোক্ত। সমুদ্রের খোলামেলা হাওয়া, অবাধ স্বাধীনতা, দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপগুলোর উত্তম পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের সান্নিধ্য তার কাম্য। গ্র্যামপাস যাচ্ছিল ঐ দিকেই। তিমিশিকার করতে। শিকারের আনন্দ আর দুপয়সা লাভ-এই নিয়েই থাকলে তো হয়। তার প্রভাব পড়েছে দলের অন্যান্যদের মনেও। ডার্ক পিটার্সের সঙ্গে একমত এই দলের প্রত্যেকেই।

শলাপরামর্শ করে তিন মূর্তিমান বিদেয় হতেই উঠে পড়েছিল অগাস্টাস। আলু সিদ্ধগুলো রেখেছিল পকেটে। মগ থেকে একটা বোতলে জল ঢেলে গুঁজেছিল বেল্টের ফাঁকে। ফুটো দিয়ে গলে বেরিয়ে এসে কিন্তু তক্তা এঁটে ফুটো বন্ধ করেনি-ছুরিটা কাঠে গেঁথে জামা ঝুলিয়ে ঢেকে রেখেছিল পার্টিশনের ফুটো। বার্থের চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছিল তোষকটা এমনভাবে যে হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে অগাস্টাস।

হ্যাচের কাছে এসে হ্যাচ খুলে খোলের ভেতরে নামতেই বন্ধ দূষিত বাতাসে প্রায় দম আটকে এসেছিল অগাস্টাসের। আমাকে খোলে লুকিয়ে রাখার আগে পর্যন্ত এ হ্যাচ অষ্টপ্রহর খোলাই থাকত। টাটকা বাতাস খেলত খোলের মধ্যে। তাই আমাকে নিয়ে এগারো দিন আগে ভেতরে এসে এরকম দম আটকানো বাতাস তার ফুসফুসে যায়নি। কিন্তু এই এগারো দিনের বন্ধ পরিবেশে, বিশেষ করে জলাভাবে, আমি আদৌ বেঁচে আছি কিনা, এই সংশয় দেখা দিয়েছিল মনের মধ্যে সেই মুহূর্তে।

নিস্তব্ধ-খোলের মধ্যে আমার সাড়াশব্দও পায়নি। আমি তো তখন অচৈতন্য। আসবার সময়ে একটা চোরা লণ্ঠনের মধ্যে মোমবাতি আর পকেটে ফসফরাস দেশলাই নিয়ে এসেছিল অগাস্টাস। লণ্ঠন জ্বালিয়ে মাথার ওপর তুলে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। চেঁচিয়ে ডাকতে পারেনি পাছে কেউ শুনে ফেলে ওপর থেকে-এই ভয়ে। অগত্যা দড়ি ধরে লণ্ঠনের আলোয় গুটি গুটি এগিয়েছিল বাক্স-ঘরের দিকে। কিছুদূর এসে দেখেছিল পথ বন্ধ। বাক্স আর পিপের মধ্যে পথ খুঁজে পাওয়া আর সম্ভব নয়। নাম ধরে ডেকেছিল বার বার। সাড়া পায়নি। হাউ হাউ করে তখন কেঁদে ফেলেছিল অগাস্টাস। বেশ বুঝেছিল আমি আর বেঁচে নেই।

বেঁচে যে নেই তার জন্যে আর দেরি করা যায় কি। রাত ফুরোনোর আগেই ফিরে যেতে হবে ওপরে-নইলে বেঘোরে যাবে প্রাণটা। অগাস্টাসের দোষ দিই না এই কারণেই। সে আমাকে

বাঁচাতে এসেছিল জল আর খাবার নিয়ে। আমার সাড়া না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যাচ্ছিল।

অথচ আমি সব শুনেও সাড়া দিতে পারিনি-গলা দিয়ে এতটুকু আওয়াজ বার করতে পারিনি। তারপর নিঃসীম হতাশায় যখন আছড়ে পড়েছি, ছুরি ঠিকরে গিয়ে শব্দতরঙ্গ তুলেছে নিস্তব্দ খোলের মধ্যে-ও তা শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। আবার ডেকেছে আমার নাম ধরে। শেষের সেই মুহূর্তে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরিয়ে এসেছিল আমার।

তাই শুনে খুঁজে খুঁজে বেদম হয়ে আমার কাছে পৌঁছেছিল অগাস্টাস-বোতল ঠেকিয়েছিল ঠোঁটে।

৬

দীর্ঘ কাহিনীর সারাংশটা শুনলোম বাক্সর কাছে বসেই। কিন্তু এবার তো অগাস্টাসকে ফিরে যেতে হবে। আমাকেও যেতে হবে ওর সঙ্গে-ওপরের ডেকে নয়, হ্যাচের ঠিক তলায়-যেখানে থাকলে টাটকা বাতাস পাব এবং সুযোগমত অগাস্টাসের রেখে যাওয়া খাবার আর জলও হাতে হাতে পেয়ে যাব।

কিন্তু টাইগার? টাইগারের কি হবে? যে জীবটা দু-দুবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, তাকে কি ফেলে যাওয়া ঠিক হবে বাক্সর খাঁচায় বন্দী অবস্থায়?

টাইগার কি বেঁচে আছে? সাড়াশব্দ তো একেবারে নেই।

সামান্য ফাঁক করলাম বাক্সের পাল্লা। দেখলাম, মরেনি টাইগার। ধুঁকছে। জ্ঞান নেই। নেতিয়ে আছে মড়ার মত।

অগাস্টাস আর আমি ওকে হিড় হিড় করে অতি কষ্টে টেনে নিয়ে এলোম র‍্যাশি রাশি বাক্স, পিপে, কাঠের বরগা আর মালপত্রের মধ্যে দিয়ে। প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল দুজনেরই। বিশেষ করে অগাস্টাসের। পথ যেখানে একেবারেই বন্ধ, সেখানে বিশাল টাইগারকে কোলে করে ওকে মাথার ওপর উঠতে হয়েছে।

যাই হোক, অতি কষ্টে হ্যাচের তলায় পৌঁছে আগে অগাস্টাস উঠে গেল ওপরে, পেছন থেকে ঠেলেঠুলে টাইগারের অসাড় দেহটা তুলে দিলাম আমি।

আমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলে পা টিপে টিপে বিদেয় নিল অগাস্টাস।

এই ফাঁকে খোলের মালপত্র রাখার ব্যাপারটা নিয়ে কিছু বলা যাক। সাধারণ পাঠকের কাছে বিষয়টা নিশ্চয় গোলমেলে ঠেকেছে গোড়া থেকেই। দোষটা ক্যাপ্টেন বার্ণার্ডের। তিমিশিকারের অভিযানে বা এই জাতীয় অভিযানে বেরুলে জাহাজের খোলে মালপত্র যেভাবে রাখতে হয় তা তিনি জানতেন না। জানলেও হুঁশিয়ার হননি। ঝড়ে জাহাজ যখন তাণ্ডব নৃত্য করতে থাকে ঢেউয়ের মাথায়, তখন মালপত্র মেঝের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে

এঁটে না রাখলে গড়িয়ে ছিটকে গিয়ে খোল ফাটিয়ে জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারে। আবার স্ক্রু দিয়ে এঁটে রাখলেও ঝকমারি আছে। ময়দার বা তামাকের গাঁটরি চাপের চোটে এমন বেড়ে যায় যে মাঝসমুদ্রে জাহাজ টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। কাজেই মধ্যপথ অবলম্বন করেন সতর্ক এবং অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেনরা।

ঝড়ের সময়ে অথবা ঝড় কেটে যাওয়ার পরেও বহু জাহাজ কাত হয়ে থেকেছে-আর সিধে হতে পারেনি-জলে ডুবে শেষ পর্যন্ত তলিয়ে গেছে জাহাজ। কারণ আর কিছুই নয়, জাহাজের খোলে মালপত্র ঠাসা অবস্থায় ছিল না। সামান্য মাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আলগা অবস্থায় রাখার ফলে ঝড়ের দাপটে জাহাজ কাৎ হতেই মালপত্র গড়িয়ে গিয়ে জড়ো হয়েছে জাহাজের সেই পাশে। ফলে ভারের চোটে জাহাজও কাৎ হয়ে থেকেছে এবং জলে ডুবে গেছে শেষ পর্যন্ত। আলগা মালপত্র খোলের মেঝেতে সেঁটে রাখতে হয় ওপরে পাটাতন ফেলে, সেই পাটাতনের ওপর খুঁটি দিয়ে সিলিংয়ের সঙ্গে ঠেকা লাগিয়ে। ঝড়ে জাহাজ যতই নাচুক না কেন, আলগা মাল আর গড়িয়ে যাবে না। পিপে পিপে শস্য নিয়ে গিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছোনোর পর দেখা গেছে প্রায় সব পিপে থেকেই শস্য কমে গেছে। তাই অনেকে শস্য খোলের মধ্যে ঢেলে ওপরে পাটাতন চাপা দিয়ে সিলিংয়ের সঙ্গে খুঁটির ঠেকা দিয়ে আটকে রাখে।

এত হুঁশিয়ার সবাই অবশ্য হয় না। আশ্চর্যের বিষয়, হুঁশিয়ার না হয়েও অনেকেই বিপদের মধ্যে পড়ে না। এরকম একটা ঘটনা আমার জানা আছে। ক্যাপ্টেন জোয়েল রাইস ভার্জিনিয়ার রিচমণ্ড বন্দর থেকে ফায়ার ফ্লাই জাহাজটাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন মাদিরয়। এর আগেও তিনি বহুবার এই জাহাজেই অন্যান্য অনেক মাল নিয়ে গেছেন পাটাতন আর খুঁটি দিয়ে মালপত্র খোলের মেঝেতে আটকে রাখার ব্যবস্থা না করেই। এবারে নিয়েছিলেন খোলের অর্ধেক ভর্তি শস্য। অনেকে আলগা শস্য গড়িয়ে যাওয়া রোধ করে মাঝে মাঝে খুঁটি পুঁতে রেখে। উনি কিছুই করেননি। কেননা কোনবারেই তো বিপদে পড়েন নি।

সেইবারে কিন্তু জাহাজ পড়ল দারুণ ঝড়ের মধ্যে। হাওয়ার গতির দিকে জাহাজ ফিরিয়ে নিয়ে ঝড়ের দাপট কাটিয়ে উনি এগিয়ে গেলেন, জাহাজ অবশ্য ঝুঁকে রইল সামনের দিকে। ঝড় কেটে যাওয়ার পরে দেখা গেল জাহাজ ঝুঁকেই রয়েছে-তার পরেই আচমকা পেছনের দিক উঠে গেল ওপরে। সামনের দিক গোঁৎ খেয়ে ডিগবাজি খেল গোটা জাহাজটা। সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট শোনা গেল প্রচণ্ড শব্দে খোলের রাশি রাশি শস্য হড়কে যাচ্ছে সামনের দিকে। ভয়ানক ধাক্কায় খোল চুরমার হয়ে জাহাজ ডুবে গেল তৎক্ষণাৎ। একজন মাত্র খালাসীকে উদ্ধার করতে পেরেছিল মাদিরা থেকে আসা ছোট্ট একটা পালতোলা জাহাজ। দুর্ঘটনার বিবরণ শোনা যায় তারই মুখে।

গ্র্যামপাস জাহাজে এই জাতীয় দুর্ঘটনা এড়ানোর কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তিমিশিকারী জাহাজে লোহার ট্যাঙ্ক ফিট করা থাকে তেল রাখার জন্যে। গ্র্যামপাস জাহাজে ছিল রাশি রাশি পিপে। পিপের পাহাড় আর বাক্সর মধ্যে মানুষ গলে যাওয়ার জায়গাও প্রায় ছিল না বললেই চলে। লোহার ট্যাঙ্ক কেন যে রাখেননি ক্যাপ্টেন বার্ণার্ড, আজও তা বুঝিনি। তক্তা কেটে যে ফোকরটা বানিয়েছিল অগাস্টাস, সেখানে পর্যন্ত পিপে রাখার জায়গা আর ছিল না। আমি গুটিসুটি মেরে লুকিয়ে রইলাম সেখানে।

খুব অল্পের জন্যে সেদিন বেঁচে গিয়েছিল অগাস্টাস-সেইসঙ্গে আমি। বার্থে গিয়ে হাতকড়া হাতে লাগিয়ে, পায়ে দড়ির ফাঁস গলিয়ে শুতে না শুতেই ঘরে ঢুকেছিল ফার্স্টমেট, ডার্ক পিটার্স আর নিগ্রো পাচক বিষম উত্তেজিত অবস্থায়। কেপভার্ডস থেকে যে জাহাজটা এসে পড়ল বলে, সেই জাহাজ প্রসঙ্গ নিয়ে উৎকণ্ঠিত দুজনেই। পাচক এসে বসল অগাস্টাসের বার্থের মাথার দিকে। হাতের নাগালের মধ্যেই রয়েছে কিন্তু পার্টিশনের গায়ে কাটা ফোকরটা। অগাস্টাস কাঠ দিয়ে তা বন্ধ করেনি-খুলেই রেখেছিল। জামাটা কেবল ঝুলিয়ে রেখেছিল ওপরে গাঁথা ছুরি থেকে-জামার নিচের দিকটাও আটকে রেখেছিল তলায়-যাতে জাহাজের দুলুনিতে জামা না সরে যায়। তাই সব দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে নিগ্রো পাচকের হাত লাগছে জামায়-তাও দেখছি এবং নিদারুণ আতঙ্কে কাঠ হয়ে রয়েছি। দেখতে পাচ্ছি টাইগারকেও-ঝিম মেরে পড়ে রয়েছে অগাস্টাসের পায়ের কাছে। মাঝে মাঝে চোখ খোলা আর হাঁ করে লম্বা শ্বাস নেওয়া দেখে বুঝেছি অবস্থা ভালোর দিকেই।

মিনিট কয়েক পরে মেট আর পাচক চলে যেতেই ডার্ক পিটার্স এসে বসল মেটের জায়গায়। সহজভাবে কথা বলতে লাগল অগাস্টাসের সঙ্গে। বুঝলাম, পাচক আর মেট সঙ্গে থাকার সময়ে মাতলামি আর উত্তেজনার ভান করে যাচ্ছিল এতক্ষণ। অগাস্টাসকে সান্ত্বনা দিলে, বাবার জন্যে অত ভাবতে হবে না। এই কদিনে গোটা পাঁচেক জাহাজের পাল দেখা গেছে দূরে দূরে। পাঁচটা জাহাজের একটায় অন্তত ঠাঁই হয়ে গেছে ক্যাপ্টেন বার্ণার্ডের।

বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিদায় নিল পিটার্স। বলে গেল আবার আসবে দুপুর নাগাদ খাবার দাবার নিয়ে।

পিটার্সের কথাবার্তা আমার ভালই লাগল। অগাস্টাসকে বললাম, দোআঁসলাটাকে কোনমতে যদি কব্জায় আনা যায়, জাহাজ পুনর্দখল অসম্ভব হবে না। কিন্তু দুজনেই বুঝলাম, প্রস্তাব পাড়তে গিয়েই সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে। মতিগতি ঠিক নেই পিটার্সের। হিতে বিপরীত যদি হয়? কাজেই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে।

দুপুর নাগাদ প্রচুর গোমাংস আর পুডিং রেখে গেল পিটার্স। খোলের অন্ধকারে ফিরে না গিয়ে ঐখানেই বসে খেলাম পেট ভরে। সারারাত ঘুমোলাম অগাস্টাসের বার্থে বেশ আরামে। ভোর নাগাদ সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পেয়ে আমাকে ঠেলে তুলে দিল অগাস্টাস। ফোকর দিয়ে গলে বেরিয়ে এলাম তৎক্ষণাৎ।

দিনের আলো ভালো করে ফুটে উঠতে দেখলাম বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে টাইগার। জলাতঙ্ক আর নেই। জল খেল চুক চুক করে। রোগটা তাহলে কুকুরে রোগ নয়। বদ্ধ পরিবেশে দূষিত হাওয়ায় মাথা বিগড়েছিল। খোলা হাওয়ায় ঘোর কেটে গেছে। ভাগ্যিস সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম ওপরে। দিনের শেষে দেখলাম একেবারেই সুস্থ হয়ে উঠেছে টাইগার। সেদিন ছিল তিরিশে জুন-নানটাকেট থেকে গ্র্যামপাস রওনা হওয়ার পর ত্রয়োদশ দিবস।

দোসরা জুলাই যথারীতি চুর চুর অবস্থায় এল মেট। মনে ভীষণ ফুর্তি। অগাস্টাসের পিঠ চাপড়ে বললে, সুবোধ বালকের মত থাকলে হাত পায়ের বাঁধন খুলে দেবে-জাহাজের যেখানে খুশি যেতে দেবে। রাজি হয়ে গেল অগাস্টাস। মেটের সঙ্গে গেল ওপরে। ফিরে এল ঘণ্টা তিনেক পরে। বললে, ওপরে থাকার অনুমতি মিলেছে-শোবেও সেখানে-কিন্তু কেবিনে যাওয়া চলবে না। বেশ কিছু খাবার আর জল এনেছিল সঙ্গে। খাওয়াতে খাওয়াতে বললে, দূরে একটা জাহাজের পাল দেখা গেছে। খুব সম্ভব কেপভার্ডেস থেকে আসছে-যে জাহাজের ওপর চড়াও হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে ফার্স্টমেট।

এর পরের আট দিনের ঘটনায় বৈচিত্র্য বেশি নেই বলে ডায়েরী লেখার কায়দায় তা বিবৃত করছি। বাদ দিলেও পারতাম। কিন্তু সে ইচ্ছে নেই। সবই লিখব।

তেসরা জুলাই।-তিনটে কম্বল দিয়ে গেছে অগাস্টাস। লুকিয়ে থাকার জায়গায় খাসা বিছানা বানিয়েছি তাই দিয়ে। সারাদিন ও ছাড়া কেউ নীচে আসেনি। টাইগার ফোকরের কাছেই বার্থে শুয়ে বেশ ঘুমিয়েছে। দূষিত বাতাসের বিষ এখনো মগজ থেকে যায়নি মনে হচ্ছে। রাতের দিকে একটা দমকা হাওয়ায় জাহাজ ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেছে। একটা পাল কেবল ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই হয়ে গেছে। অগাস্টাসের সঙ্গে চমৎকার ব্যবহার করে চলেছে ডার্ক পিটার্স। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোয় তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে চায় কিনা, জিজ্ঞেস করেছিল অগাস্টাসকে। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেছে অগাস্টাস। বোম্বেটে জীবন যাপন করার চাইতে তো ভাল।

পিটার্সের মুখেই জানলাম, বিদ্রোহীদের বেশির ভাগই মেটের কথায় এখন সায় দিয়ে চলেছে। অর্থাৎ বোম্বেটে জীবনই চায়।

চৌঠা জুলাই।-পালতোলা জাহাজটা ছোট, লিভারপুল থেকে

আসছিল। তাই ছেড়ে দিয়েছে মেট। বেশির ভাগ সময় ডেকের ওপর কাটাচ্ছে অগাস্টাস-যাতে বিদ্রোহীদের কথাবার্তা থেকে খবর সংগ্রহ করতে পারে। শুনলাম, হরদম ঝগড়াঝাঁটি চলছে নিজেদের মধ্যে। হারপুনবাজ জিম বোনারকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে জলে। সে ছিল পাচকের দলে। যে দলে রয়েছে ডার্ক পিটার্সও।

ক্রমশ দলে ভারি হচ্ছে ফার্স্টমেট।

পাঁচুই জুলাই।-সকালের দিকে দারুণ ঝড় উঠেছিল। মত্ত অবস্থায় মাস্তুল থেকে জলে ঠিকরে পড়ে গেছে পাচক আর পিটার্সের দলেরই একজন-কেউই যায়নি তাকে বাঁচাতে।

জাহাজে মোট এখন আমরা তেরোজন।

ছউই জুলাই।-ঝড়ের দাপট চলেছে সারাদিন। হাত লাগাতে হয়েছে অগাস্টাসকেও-পাম্প করে জল বার করে দিতে হচ্ছে জাহাজ থেকে। গোধূলির আলোয় দেখা গেল একটা বড় জাহাজ চলে গেল দূর দিয়ে-নিশ্চয় সেই জাহাজ যার প্রতীক্ষায় রয়েছে ফার্স্টমেট। হাঁকডাক দিয়েও কিন্তু জাহাজটার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়নি। ঝড়ের গজরানি ছাপিয়ে নিশ্চয় আওয়াজ পৌঁছোয়নি। রাত এগারো নাগাদ সমুদ্র ঝাঁপিয়ে পড়ল জাহাজের ওপর-খানিকটা অংশ ভেঙে নিয়ে গেল যেন এক থাপ্পর কষিয়ে। ভোরের দিকে কমে এল ঝড়ের দাপট-সূর্য যখন উঠল, হাওয়া আর নেই।

সাতুই জুলাই।-আবার ঝড়ো হাওয়া-বইছে সারাদিন ধরে। জাহাজ দুলছে, নাচছে, আছড়ে আছড়ে পড়ছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, খোলের মধ্যে মালপত্র দুমদাম শব্দে গড়িয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রপীড়ায় বড় কাহিল বোধ করছি। পিটার্স এসেছিল অগাস্টাসের কাছে। মিষ্টি মিষ্টি করে অনেক কথা বলেছে-যার অনেক কিছুই বুঝতে পারেনি অগাস্টাস। শুধু বুঝেছে পিটার্সের দলের আরো দুজন ভিড়েছে মেটের দলে-এদের নাম গ্রীলি আর অ্যালেন। সাঁঝ নাগাদ চুঁইয়ে চুঁইয়ে এমন জল ঢুকতে লাগল জাহাজে যে বাধ্য হয়ে একটা পাল নামিয়ে এনে বন্ধ করতে হল ফুটো।

আটুই জুলাই।-সকাল থেকেই ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের দিকেই চলেছে মেট-কেপভার্ডস থেকে আসা জাহাজ লুঠের আশা ছেড়েছে। এ নিয়ে কেউ আর কথা বলছে না-অন্তত অগাস্টাসের সামনে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট অন্তর পাম্প চালিয়ে জল বার করে দেওয়া হচ্ছে ফুটো জাহাজের মধ্যে থেকে। দুটো ছোট পালতোলা জাহাজ দেখা গেছে দূরে।

বোম্বেটেই হতে চায় ফার্স্টমেট। তবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বীপপুঞ্জকে কেন্দ্র করে।

নউই জুলাই।-চমৎকার আবহাওয়া। সবাই মিলে মেরামতি চালিয়েছে ভাঙা গলুই নিয়ে। অগাস্টাসের সঙ্গে অনেকক্ষণ

কথাবার্তা হয়েছে পিটার্সের। আগের চাইতে খোলাখুলিভাবে–হেঁয়ালি ছেড়ে দিয়ে। সোজাসুজি বলেছে, বোম্বেটে হওয়ার বাসনা তার একেবারেই নেই–দরকার হলে মেটকে হটিয়ে দখল করবে গ্র্যামপাস জাহাজ। অগাস্টাস কি থাকবে পাশে? সোজা প্রশ্নের সোজা জবাবই দিয়েছে অগাস্টাস। নিশ্চয় থাকবে। পিটার্স বলে গেছে, তাহলে দলের অন্যান্যদের বাজিয়ে দেখা যাক। সারাদিন পিটার্সের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলার আর সুযোগ পায়নি অগাস্টাস।

৭

দশুই জুলাই।–রিও থেকে একটা জাহাজ আসছে শুনলাম। যাচ্ছে নরফোকে। আবহাওয়া কুয়াশাচ্ছন্ন। পূর্বদিক থেকে এলোমেলো হালকা হাওয়া বইছে। পিটার্সের দলের হার্টম্যান রোজার্স আজ মারা গেল এক গেলাস কড়া মদ খাওয়ার পর। পিটার্সের বিশ্বাস তাকে বিষ খাইয়েছে ফাস্টমেট। এবার তার পালা। দলে এখন মোটে তিনজন। পিটার্স, জোন্স আর নিগ্রো পাচক। মেটের দলে পাঁচজন। জোন্সকে আভাস দিয়েছিল পিটার্স জাহাজ দখল করবে–মেটের দলকে কাবু করবে। জোন্স উৎসাহ দেখায়নি। পিটার্সও আর কথা বাড়ায়নি। নিগ্রো পাচককেও প্রসঙ্গটা বলা উচিত হবে বলে মনে করেনি। ভালই করেছিল। কেননা, বিকেলের দিকে পাচক নিজে থেকেই বললে পিটার্সকে, মেটের দলেই ভিড়ে যাবে ঠিক করেছে। পায়ে পা লাগিয়ে জোন্সও ঝগড়া বাঁধিয়েছে পিটার্সের সঙ্গে। হুমকি দিয়েছে, পিটার্সের জাহাজ দখলের ফন্দী ফাঁস করে দেবে মেটের কাছে।

সুতরাং আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। কপালে যাই থাকুক না কেন, জাহাজ দখল করবেই পিটার্স। অগাস্টাসকে জিজ্ঞেস করেছিল, তার সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা। অগাস্টাস রাজি হয়েছে। সেই সুযোগে জানিয়ে দিয়েছে, জাহাজের খোলে লুকিয়ে রয়েছি আমি।

শুনে ডার্ক পিটার্স যত না অবাক হয়েছে, খুশি হয়েছে তার চাইতে বেশি। তৎক্ষণাৎ দুজনে নেমে এসেছিল খোলের মধ্যে। আমার নাম ধরে ডেকেছিল অগাস্টাস। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ডার্ক পিটার্সের সঙ্গে।

তিনজনে মিলে ঠিক করেছি, আর দেরি নয়। ঝটপট জাহাজ দখল করতেই হবে। ডার্ক পিটার্স প্রশান্ত মহাসাগরে যাওয়ার মতলব ছেড়েছে। খালাসীবিহীন জাহাজ নিয়ে তা সম্ভব নয়। কাছাকাছি কোন বন্দরে নিয়ে যাবে গ্র্যামপাসকে। ধরা দেবে নিজে থেকেই। বলবে, সাময়িকভাবে মাথা খারাপ হয়েছিল বলে বিদ্রোহীদের দলে ভিড়েছিল। আমি আর অগাস্টাস উঠে পড়ে

লাগলে দণ্ড মকুব হয়ে যেতে পারে।

এই পর্যন্ত কথা হতেই ডেকের ওপর থেকে ভেসে এল চীৎকার–'জলদি এস। পাল সামলাও।' দৌড়ে ওপরে চলে গেল পিটার্স আর অগাস্টাস।

ঝড় উঠেছিল। দমকা হাওয়ার পর হাওয়ায় জাহাজকে নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু ক্ষতি হয়নি জাহাজের। সারাদিন গেল জাহাজ সামলাতে। সমুদ্র দারুণ বিক্ষুব্ধ। ঝড়ের দাপটও বাড়ছে। রাত নিবিড় হতেই অগাস্টাসকে নিয়ে পিটার্স এল খোলের মধ্যে। শুরু হল তিন জনের ষড়যন্ত্র।

ঝড়ের দাপট চলতে চলতেই পরিকল্পনা মাফিক কাজ হাসিল করতে হবে। এই তো সুযোগ। ওদের দলে যদিও নজন-আমরা মোটে তিনজন। অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত কেবিনের মধ্যে। পিটার্সের কোমরে আছে কেবল অষ্টপ্রহরের সঙ্গী ছুরি আর একজোড়া পিস্তল-লুকিয়ে রেখেছে জামার মধ্যে। কুঠার বা ডাণ্ডা যেখানে থাকার কথা, সেখানে নেই। সন্দিগ্ধ মেট নিশ্চয় সরিয়ে রেখেছে। পিটার্সকে তার বিশ্বাস নেই। সুযোগ পেলেই তাকেও খতম করবে।

পিটার্সের ইচ্ছে এখুনি গিয়ে অ্যালানকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে জলে। মেট তাকেই তো পাহারায় রেখেছে ডেকের ওপর।

জাহাজী নিয়মকানুন সম্বন্ধে আমি খুব বেশি না জানলেও এইটুকু জানতাম যে ঝড়ের উৎপাত শুরু হলেই ডেকে পাহারা রাখতে হয়। মেট কিন্তু কখনোই এ নিয়ম মেনে চলেনি। আজকে কেন পাহারা বসিয়েছে? নিশ্চয় পিটার্সকে বিশ্বাস করে না বলেই। কুঠার-টুঠার সরিয়ে রেখেছে সেই কারণেই। অর্থাৎ, সে হুঁশিয়ার। কাজেই পিটার্সের হঠকারিতার ফল ভাল হবে না। ন জনের সঙ্গে তিনজন পারব না।

মতলবটা মাথায় এল তক্ষুণি। পিটার্স বলেছিল, হার্টম্যান রোজার্সকে নাকি বিষ দিয়ে মেরেছে ফার্স্টমেট। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেলেও তার অনুমান তাই। বেচারা ছটফট করতে করতে মারা গেছে। বড় কষ্ট পেয়েছে। জাহাজের খালাসীরা ভয়ানক কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়। হার্টম্যান রোজার্সের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই রচিত হল আমার অভিনব পরিকল্পনা।

রোজার্স মারা গিয়েছিল দুপুর নাগাদ। বীভৎস সেই মৃতদেহ নাকি চোখে দেখা যায় না। অনেক দিন জলে ডুবে থাকলে শরীর যেভাবে ফুলে ঢোল হয়ে ওঠে,রোজার্সের মৃতদেহের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল সেইরকম। হাত দুখানা ফুলে ঢোল হয়েছিল বিদঘুটেভাবে। মুখখানা কিন্তু কুঁচকে ছোট হয়ে গিয়েছিল-খড়িমাখা মুখের মত সাদাটে হয়ে গেছে গোটা মুখখানা। সাদা মুখে ফুটে উঠেছে তিন চারটে জ্বলজ্বলে লাল দাগ। বিরাট

আঁচিলের মত। একটা দাগ লাল ভেলভেটের পটির মত মুখের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে ফুটে উঠেছে একটা চোখ একেবারেই ঢেকে রেখে। বীভৎস এই চেহারা দেখেই নাকি আঁৎকে ওঠে ফাস্টমেট। আতঙ্কে অথবা অনুশোচনার জন্যেই হোক, লাশটাকে আর জলে ফেলে দেয়নি—এসেছিল কিন্তু সেই মতলবেই। বলে গেছে, থলিতে পুরে মৃত খালাসীদের যেভাবে জলে সমাধি দেওয়া হয়—রোজার্সের সমাধি হোক সেইভাবে। এই সব করতে করতেই ঝড় বেড়ে যাওয়ায় রোজার্সের লাশ ডেকে রেখেই সবাই সরে পড়েছে কেবিনে। লাশ এখনো জলে ভিজছে ডেকের ওপর—থলি মোড়া অবস্থায়।

তিনজনে চুপিসাড়ে উঠে গেলাম ডেকের ওপর। অ্যালেনের দিকে সটান হেঁটে গেল পিটার্স যেন কিছু বলবে বলে। কাছে গিয়েই খপ করে গলা টিপে ধরেই ছুঁড়ে ফেলে দিলে জলে—অ্যালেন বেচারী মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ্ বার করতে পারল না।

আমি আর অগাস্টাস গিয়ে দাঁড়ালাম পিটার্সের পাশে। দাঁড়ালাম কোনমতে—জাহাজ এমন দুলছে যে সিধে হয়ে দাঁড়ানই মুস্কিল। রোজার্সের মৃতদেহ থেকে জামাকাপড় সব খুলে নিয়ে লাশটাকে ফেলে দিলাম জলে। অনেক খুঁজে গোটা দুই পাম্পের হাতল কেবল পাওয়া গেল। আমি আর অগাস্টাস হাতিয়ার হিসেবে হাতল দুটো রাখলাম হাতে। বেশি দেরী করতে পারলাম না। পাম্প চালু করে জল বার করে দেওয়ার জন্যে মেট যে কোন মুহূর্তে উঠে আসতে পারে ডেকে। অগাস্টাস দাঁড়িয়ে রইল অ্যালেনের জায়গায়—কেবিনের দিকে পেছন ফিরে—দূর থেকে দেখে যেন তাকে চেনা না যায়। আমি আর পিটার্স নেমে এলাম খোলের মধ্যে।

শুরু হল ছদ্মবেশ ধারণ। গায়ে চাপালাম রোজার্সের অদ্ভুত আলখাল্লাটা—যা দেখলেই চেনা যায়। নীলের ওপর সাদা ডোরা। রোজার্স পরে থাকত অন্য জামার ওপর। মৃতদেহটা ফুলে বীভৎস হয়ে উঠেছিল। বিছানার চাদর পেটের ওপর গুঁজে ফুলিয়ে নিলাম আকৃতিটা। উলের মাফলার আর আজেবাজে ন্যাকড়া জড়িয়ে ফেললাম হাত-দুখানা—রোজার্সের মৃতদেহে যেমনটি দেখেছি। খড়ি মাখিয়ে মুখখানা সাদা করে দিল পিটার্স। নিজের আঙুল চিরে রক্ত বার করে ফুটকি ফুটকি দাগ দিল সাদা মুখের ওপর—এক চোখ ঢেকে আড়াআড়ি লাল দাগ দিতেও ভুলল না। সব মিলিয়ে চেহারাটা দাঁড়াল ভয়াবহ—ঝোড়ো রাতের অন্ধকারে হঠাৎ দেখলে ভিরমি যাওয়ার মত।

৮

কেবিনের দেওয়ালে ঝুলছিল একটা ভাঙা আয়না। ম্যাড়মেড়ে লণ্ঠনের আলোয় নিজের চেহারার প্রতিবিম্ব দেখে এমন আঁৎকে

উঠলাম যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত থরথর করে কাঁপতে লাগল দারুণভাবে। এই চেহারা দেখিয়ে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করব, তা আঁচ করে কাঁপুনি যেন আরো বেড়ে গেল। এমন ঘাবড়ে গেলাম যে প্ল্যানমাফিক কাজ শুরু করার কথা ভাবতেই পারলাম না। নিমেষে উবে গেল এতক্ষণের তড়পানি। কিন্তু আমার যা ভূমিকা, তা আমাকে অভিনয় করে যেতেই হবে। মনকে শক্ত করলাম। পিটার্সকে নিয়ে উঠে গেলাম ওপরের ডেকে।

অগাস্টাসকে ডেকে নিয়ে গুঁড়ি মেরে তিনজনে এগিয়ে গেলাম কেবিনে নামবার সিঁড়ির দিকে। দেখলাম, সিঁড়ির ওপর কাঠের বরগা ফেলে রাখা হয়েছে যাতে আছাড়িপিছাড়ি জাহাজের ডেক থেকে কিছু গড়িয়ে এসে কেবিনের মুখ বন্ধ করে না দেয়। ফাঁক দিয়ে দেখলাম পুরো দলটাকে। পিটার্সের কথা মত ধাঁ করে চড়াও না হয়ে যে বুদ্ধিমানের কাজ করেছি, তা বুঝলাম ওদের প্রস্তুতি দেখে। পুরো দলটাই হাজির কেবিনের মধ্যে। সশস্ত্র প্রত্যেকেই। বেশ কয়েকজনের কাছে রয়েছে ছুরি আর পিস্তল। বন্দুক তো প্রায় সবার কাছেই-রয়েছে কেবিনের মেঝের ওপরেও। বার্থ থেকে টেনে এনে তোষক বিছিয়ে মেঝের ওপর শুয়ে রয়েছে কয়েকজন। গভীর শলাপরামর্শ চলছে। একজন সিঁড়ির মুখেই বন্দুক পাশে নিয়ে ঘুমোচ্ছে। মত্ত প্রত্যেকেই-তবে বেহেড নয়। এ অবস্থায় তিনজনে মার-মার করে ঝাঁপিয়ে পড়লে কেউই প্রাণে বাঁচতাম না।

কিভাবে রোজার্সের ছদ্মবেশটা দেখিয়ে ওদের পিলে চমকে দিয়ে কাজ হাসিল করব, তা মোটামুটি মনে মনে ছকে রাখা সত্ত্বেও কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনে গেলাম বিদ্রোহীদের কথাবার্তাগুলো। হর্নেট নামে একটা পালতোলা জাহাজ দখলে আনা যায় কিভাবে, ফন্দী আঁটা হচ্ছে সেই ব্যাপারে। কিন্তু সঠিক বুঝলাম না কিভাবে কাজ হাসিল করতে চায়।

পিটার্সকে নিয়ে কথা শুরু করল একজন। জবাব দিল আর একজন। মোটামুটি বুঝলাম, পিটার্স আর অগাস্টাসকে এখুনি জলে ছুঁড়ে দেওয়া হোক। দেখলাম, জোন্সের উৎসাহটাই সবচাইতে বেশি।

শুনে ভীষণ উত্তেজিত হলাম। পিটার্স আর অগাস্টাস কি করবে ভেবে উঠতে পারছে না দেখে ঠিক করলাম, শহীদ হতে হবে আমাকেই। ঘাবড়ে গিয়ে চম্পট দিলে চলবে না।

ঝড়ের বিকট গোঁ-গোঁ আওয়াজে সব কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম না। আওয়াজ সাময়িকভাবে কমলে কথাবার্তা ভেসে আসছিল কানে। শুনলাম মেটের হুকুম-পিটার্স আর অগাস্টাসকে এনে রাখা হোক কেবিনে চোখের সামনে-আড়ালে থেকে যেন কোন নষ্টামি করতে না পারে। উঠে দাঁড়াল পাচক। ঠিক সেই সময়ে গোটা জাহাজটা এমন ঝাঁকুনি খেয়ে কাৎ হয়ে পড়ল যে দড়াম করে

আছড়ে পড়ল নিগ্রো পাচক-স্টেটরুমের দরজাটাও সশব্দে খুলে গেল দু-হাট হয়ে।

লাফিয়ে পেছিয়ে এসেছিলাম আমরা তিনজনে। তাই কারোর চোখে পড়িনি। আড়ালে ঘাপটি মেরে চাপা গলায় কথা বলে ঠিক করলাম, এরপর কি করা উচিত। নিগ্রো পাচককে দেখলাম হ্যাচ দিয়ে মুণ্ডু বাড়িয়ে ডাকছে অ্যালেনকে। পাঠিয়ে দিতে বলছে পিটার্স আর অগাস্টাসকে। ওখান থেকে দেখা যায় না অ্যালেনের যেখানে দাঁড়িয়ে থাকার কথা, সেই জায়গাটা। অ্যালেনের গলা নকল করে পিটার্স হেঁকে বললে-' পাঠিয়ে দিচ্ছি।' বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে তক্ষুণি মাথা নামিয়ে নেমে গেল নিগ্রো পাচক।

তার একটু পরেই বুক ফুলিয়ে গটগট করে কেবিনে গিয়ে ঢুকল পিটার্স আর অগাস্টাস। সাদর সম্বর্ধনা জানাল মেট। বললে, কষ্ট করে যেখানে সেখানে থাকার দরকার কি এই ঝড়বাদলার রাতে ? কেবিনের মধ্যে সবাই মিলে থাকলেই তো হয়।

কেবিনে ঢুকেই দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছিল পিটার্স। আমিও সুট করে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম দরজার সামনে সিঁড়ির ওপর-একটু আগেই দাঁড়িয়েছিলাম যে অবস্থায়। হাতের কাছে রেখেছিলাম পাম্পের হাতল দুটো। একটা রেখেছিলাম সিঁড়ির গোড়ায় দরকার মত কাজে লাগবে বলেই।

পিটার্স কেবিনে ঢুকেই বকর বকর করতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। সব কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না। যেটুকু কানে এল, তা থেকে বুঝলাম, বিদ্রোহীদের রক্তারক্তি কাণ্ডকারখানা নিয়ে কথার জাল বুনে চলেছে। একটু একটু করে প্রসঙ্গটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে রোজার্সের বীভৎস মৃতদেহের প্রসঙ্গে। ভয়াবহ লাশটা বৃষ্টির জলে ভিজে জাহাজের দুলুনিতে হড়কে হড়কে যাচ্ছে ডেকের ওপর দিয়ে। এটা কী ভাল ? এখুনি লাশটাকে জলে ফেলে দেওয়া উচিত। মড়া যদি দানো হয়ে হেঁটে আসে ? শুনতে শুনতে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল মেটের মুখখানা। গোড়া থেকেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন খালাসীদের সামনে ভূতপ্রেতের গল্প জুড়ে ওদের মনের অবস্থা কাহিল করে তুলেছিল পিটার্স ইচ্ছে করেই। যতই ডাকাবুকো রক্তপিশাচ হোক না কেন, খালাসী মাত্রই অশরীরীদের ভয় করে। রোজার্সের ফুলে ঢোল মৃতদেহটাকে এই ঝড়বাদলার রাতে সমুদ্রে ফেলে দিতে হবে শুনে ভয়ের চোটে যেন আধমড়া হয়ে গেল প্রত্যেকেই। মেট দু-চার জনের দিকে তাকিয়ে নীরবে জানালে, কাজটা কেউ গিয়ে করে এলেই তো হয়-নিজে কিন্তু নড়ল না। যাদের দিকে তাকাল, তারাও অন্যদিকে তাকিয়ে রইল-নড়বার নাম করলে না।

প্ল্যানমাফিক ঠিক এই সময়ে হাতের ইসারা করল পিটার্স। সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি থেকে নেমে এসে কেবিনের দরজা খুলে চৌকাঠ

জুড়ে দাঁড় করালাম অতি-ভয়াবহ আকৃতিটাকে। নিঃশব্দে টুঁ-শব্দটি না করে।

অনেকগুলো পরিস্থিতি মিলেমিশে তীব্রতম করে তুলেছিল আমার অকস্মাৎ আবির্ভাবের অসাধারণ প্রতিক্রিয়াটাকে। সুতরাং তা নিয়ে খুব একটা অবাক হওয়ার কারণ দেখি না। কায়াহীনেরা হঠাৎ শরীরী বিভীষিকা হয়ে দেখা দিলে প্রথমটা আঁৎকে উঠলেও মনের তলদেশে একটা চাপা অবিশ্বাস বা সন্দেহ অনেকেরই মধ্যে থাকে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু ঝড়ের হুহুঙ্কার, অতবড় জাহাজটার সোলার ছিপির মত আছড়ানি, তুমুল জলোচ্ছ্বাস এবং এই সবেরই পটভূমিকায় পিটার্সের অশরীরী কাহিনী সমগ্র তিল তিল করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নাবিকদের অন্তরের অন্দর পর্যন্ত ভীতির সঞ্চার ঘটিয়ে বসেছিল আগে থেকেই। রোজার্সের ফুলে ঢোল কদাকার অবর্ণনীয় মৃতদেহ তারা স্বচক্ষে দেখেছে। গা যখন ছমছম করছে প্রত্যেকেরই, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে রোজার্সের মৃতদেহের পুনর্জাগরণের আশঙ্কায়, ঠিক সেই সময়ে অবিকল সেই আকৃতিটাকেই নিঃশব্দে দোরগোড়ায় ভোজবাজির মত আবির্ভূত হতে দেখে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গিয়েছিল প্রত্যেকেরই। অবিশ্বাস করার মত ঘটনা তো নয়। একমাত্র অ্যালেন আছে বাইরের ডেকে এবং লম্বায় সে ছ ফুট ছ ইঞ্চি। রোজার্সের ছদ্মবেশে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয় কোনমতেই। বিরাটকায় অ্যালেন তো আর ক্ষুদ্রকায় রোজার্স হতে পারে না। পক্ষান্তরে, রোজার্সের শরীরের মাপ প্রায় আমার শরীরের মাপেই। তার ওপর রয়েছে বিকট ছদ্মবেশ। ছদ্মবেশ ধরবার মত উপযুক্ত আলোও নেই কেবিনের মধ্যে। একটিমাত্র কেবিন লণ্ঠন প্রবলবেগে দুলছে জাহাজের দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে। আলো কখনোই স্থির নেই আমার ওপর। আলো আর অন্ধকার পর্যায়ক্রমে বিকটতর করে তুলেছে আমার ভয়াল ছদ্মবেশকে। জাহাজে আমার অস্তিত্ব কারোরই জানা নেই এবং অ্যালেনের আকৃতি যখন নয় রোজার্সের, তখন স্বয়ং রোজার্সই নিশ্চয় মৃত্যুলোক থেকে সশরীরে ফিরে এসেছে স্যাঙাৎদের আখড়ায়।

প্রতিক্রিয়াটা হল অভাবনীয়। বিষম আতঙ্কে দমাস করে আছড়ে পড়ল ফার্স্ট মেট-নিষ্প্রাণ দেহে এবং পরমুহূর্তেই জাহাজ ঢেউয়ের ওপর থেকে সবেগে নিচে আছড়ে পড়ায় প্রাণহীন দেহটা ছিটকে গেল একদিকে। বাকি সাতজনের তিনজন বিপুল আতঙ্কে সাময়িকভাবে স্থাণু হয়ে গেলেও রোজার্সের প্রেতদেহকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি। বাকি চারজন একেবারে কাঠের পুতুলের মতো বসে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে-মন এবং দেহ একেবারেই অসাড়।

সুযোগটার সদ্ব্যবহার করল পিটার্স চক্ষের নিমেষে। পর পর

দুবার গুলিবর্ষণ করে যমালয়ে পাঠাল দুজনকে। পার্কারের মাথায় পাম্পের হাতলের এক ঘা মারলাম আমি-ঠিকরে পড়ল সে তৎক্ষণাৎ। মেঝে থেকে একটা বন্দুক তুলে নিয়ে আর একজনকে পরলোকের পথ দেখিয়ে দিল অগাস্টাস।

বাকি রইল তিনজন। চক্ষের পলকে চার সঙ্গীর মৃত্যু দেখে আতঙ্কের ঘোর কাটিয়ে উঠে এই তিনজনেই, ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের তিনজনের ওপর। লড়াই লাগল সমানে সমানে। অগাস্টাসকে মাটিতে ফেলে তার ডান বাহুতে পর পর কয়েকবার ছুরিকাঘাত করল জোন্স। আমার ধড়াচূড়ার ভারে তাকে সাহায্য করতে পারছি না, পিটার্স নিজেও দু-দুজনের সঙ্গে ঝটাপটি করে চলেছে (তাদের মধ্যে রয়েছে বিরাটদেহী নিগ্রো পাচক)। এই অবস্থায় অগাস্টাস নির্ঘাৎ খুন হয়ে যেত জোন্সের ছুরি খেয়ে, যদি না অপ্রত্যাশিতভাবে তার সহায় হত এমন একটা প্রাণী যার কথা আমরা একেবারেই ভাবিনি।

টাইগার ! কোত্থেকে উল্কার মত কেবিনে ঢুকল সে এবং এক লাফে জোন্সের টুঁটি কামড়ে ধরে তাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর। বেঁচে গেল অগাস্টাস-রক্তে মাখামাখি অবস্থায় ধুঁকতে লাগল একপাশে।

ইতিমধ্যে পিটার্স মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিল একটা ভারি লোহার যন্ত্র। আগেই বলেছি, অসুরের মত শক্তি তার দেহে। লোহার যন্ত্র দিয়ে চোখের পলক ফেলার আগেই দু-দুজনের মাথার খুলি চুরমার করে দিয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করে দিল তাদের।

আর একটু দেরী হলেই এই দুজনের -একজনের গুলিতে প্রাণটা বেরিয়ে যেত আমার। বন্দুক টিপ করেছিল সে আমার দিকেই। ধস্তাধস্তি করার ফাঁকে তাই দেখেই পিটার্স মরিয়া হয়ে আগে খুলি চুরমার করেছিল তার-তারপর বাকি লোকটার।

ছুটে গেলাম জোন্সের কাছে। খুন করার আর দরকার হল না। টাইগার তার টুঁটি ছিঁড়ে দু-টুকরো করে দিয়েছে-দেহে প্রাণ নেই।

রক্তাপ্লুত অগাস্টাসের হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে শুনলাম কাতরাচ্ছে পার্কার। প্রাণভিক্ষা চাইছে। আমার ডাণ্ডার চোট খেয়ে তার মাথা ফেটে গিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে ঠিকই, প্রাণে মরেনি। আমরাও আর মারলাম না।

কেবিনে বসে থাকতেও পারলাম না। বাইরে মড় মড় আওয়াজ শুনেই বুঝলাম আগে থেকেই অর্ধেক ভেঙে থাকা মূল মাস্তুলটা আরো ভেঙে পড়ছে। সবাই মিলে ছুটে গেলাম ওপরে। বিরাট বিরাট ঢেউ চলে যাচ্ছে গোটা জাহাজটার ওপর দিয়ে। জাহাজ ডুবে যাবে এখুনি যদি ভাঙা মাস্তুলকে কেটে জলে ফেলে না দেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ তাই করলাম চারজনে। জাহাজ খানিকটা হাল্কা হল বটে, কিন্তু নিরতিসীম উদ্বেগ নিয়ে প্রলয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের

সঙ্গে লড়ে গেলাম সারারাত। জাহাজের নীচের দিকে জল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সাতফুট মত–পাম্প করে সেই জল বার করতেই ভোর হয়ে গেল। দুর্যোগ আরো বৃদ্ধি পেল। সামনের মাস্তুল পাল সমেত কেটে ভাসিয়ে না দিলেই নয়। পার্কার অবশ্য বাধা দিয়েছিল। আমরা শুনিনি। আপদ বিদায় করেছিলাম তৎক্ষণাৎ। ফলে শুধু একটা মোচার খোলার মত জাহাজকে নিয়ে লোফালুফি খেলতে লাগল রুদ্র প্রকৃতি। দুপুর নাগাদ ঝড়ের প্রতাপ, একটু কমলেও আবার দ্বিগুণ বাড়ল বিকেল নাগাদ। ভাষা দিয়ে বোঝানো যাবে না এমনি বিশাল একটা জলোচ্ছ্বাস হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল জাহাজের ওপর। পেছনের হালটা সবচেয়ে মজবুতভাবে আটকানো ছিল জাহাজের গায়ে হুক আর লোহার পাত দিয়ে। কাঠ থেকে প্রতিটা হুক উপড়ে নিয়ে লোহার পাত সমেত অমন মজবুত হালটা জাহাজের পেছন দিকের বেশ খানিকটা অংশ সমেত নিমেষে উধাও হয়ে গেল রক্ত-জল করা গর্জায়মান জলরাশির মধ্যে। পরক্ষণেই আবার যেন জলের পাহাড় ভেঙে পড়ল মাথার ওপর। চোখের পলক ফেলার আগেই সিঁড়ি আর হ্যাচের মধ্যে দিয়ে জল ঢুকে প্লাবিত হল পুরো গ্র্যামপাস জাহাজ।

জল! শুধু জল! জাহাজের প্রতি বর্গ ইঞ্চি জায়গায় থই থই করছে শুধু জল!

৯

কপাল ভাল বলেই রাত হওয়ার ঠিক আগেই চরকি কলের সঙ্গে নিজেদের কষে বেঁধে রেখেছিলাম প্রত্যেকেই-উপুড় হয়ে পড়েছিলাম ডেকের পাটাতনের ওপর। নইলে খড়কুটোর মত নিমেষ মধ্যে ভেসে যেতাম চারজনেই।

জলের ওজন যে কত ভয়ঙ্কর হয়, তা সেদিন হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলাম। দম আটকে মনে হয়েছিল থেঁতলে পিষে একাকার হয়ে যাব ডেকের সঙ্গে। পাহাড়প্রমাণ জলরাশি কানে তালা লাগানো শব্দে হ-উ-উ-স করে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দম আটকানো স্বরে অগাস্টাস বলেছিল–'ভাইরে! মৃত্যুর আর দেরি নেই! ভগবানকে এখন ডাকা যাক!'

বাকি দুজনেই কেউই সাড়া দেয়নি আমার ডাকে। দেবে কি করে? জলের ধাক্কায় খাবি খাচ্ছে প্রত্যেকেই-কথা বলার মত অবস্থা নেই। একটু একটু করে সাহস ফিরে পেলাম চারজনে। প্রথমটা খুবই ভেঙে পড়েছিলাম। নির্ঘাৎ ডুবে যাবে জাহাজ। ঐ রকম অবস্থায় খেয়ালই ছিল না, যে জাহাজের খোল রাশি রাশি শূন্য পিপে আর কাঠের বাক্স দিয়ে ঠাসা, সে জাহাজ অত চট করে ডুবে যায় না। সম্ভাবনাটা একটু পরে এল মাথায়। সাহসও ফিরে পেলাম। আশার উদ্দীপন ঘটল মনের মধ্যে। যাক, এখুনি তাহলে

মরছি না। আরো ভাল করে বাঁধতে লাগলাম নিজেকে চরকি কলের সঙ্গে। দেখলাম, বাকি তিনজনও সেই চেষ্টায় ব্যস্ত। কেবল অগাস্টাসই কেবল শক্ত করে বাঁধতে পারছে না নিজেকে। আমরা যে ওকে সাহায্য করব, সে উপায়ও নেই। তবে ভাগ্য ওর সহায়। ও পড়েছিল ঝড়জলে ভেঙে যাওয়া চরকি কলের নিচের দিকে। জলের তোড় সরাসরি ওর গায়ে লাগছে না-চরকি কলের ওপর দিকে লেগে মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও ওর কাহিল অবস্থা দেখে আমরা তিনজন উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় মুখ দিয়ে কথা বার করতে পারিনি। কি হয়, কি হয়-এই দুশ্চিন্তায় বাক্যহারা হয়ে থেকেছি। ও যে এতক্ষণে জলের তোড়ে ভেসে যায়নি, এটাই একটা আশ্চর্য ব্যাপার। হাজার দানোর বিকট গর্জনের মত শব্দে হুড় হুড় করে জল ধেয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকেরই উপুড় হয়ে লেপটে থাকা শরীরের ওপর দিয়ে। ভাগ্যক্রমে ও যদি চরকি কলের তলার দিকে ঠিকরে না যেত, তাহলে আর ওকে বাঁচান যেত না। জলের সে কি রুদ্ররোষ। কখনো ঝাঁপিয়ে পড়ছে সামনের দিক থেকে-কখনো পেছন দিক থেকে। টেনে হিঁচড়ে যেভাবেই হোক যেন নিয়ে যেতে চায় ডেকের ওপর থেকে। প্রতি তিন সেকেণ্ডের মধ্যে মোটে এক সেকেণ্ডের জন্যে জলের মধ্যে থেকে মুণ্ড বাড়িয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারছি-বাকি সময়টা দম বন্ধ করে থাকতে হচ্ছে প্রচণ্ড বেগে ধাবমান জলের মধ্যে। সে যে কি কষ্ট, তা ভাষায় বর্ণনা করার মত ক্ষমতা আমার নেই।

ভয়াবহ এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে কাটল গোটা রাতটা। ভোরের আলো ফুটতে আশেপাশের বীভৎস অবস্থা দেখে শিউরে উঠলাম। গ্র্যামপাস জাহাজ এখন নিছক একটা কাঠখণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়-অসহায়ভাবে পাকসাট খেতে খেতে ধেয়ে চলেছে ঢেউয়ের ওপর দিয়ে। ঝড়ের তেজ বেড়েই চলেছে-হ্যারিকেন ঝড় হয়ে গেছে বললেই চলে। দাপট আদৌ কমবে বলে মনে তো হচ্ছে না। বেশ কয়েক ঘণ্টা কাঠ হয়ে রইলাম-এই বুঝি চরকি কল থেকে বাঁধন ছিঁড়ে নিয়ে কালান্তর জল টেনে নিয়ে যাবে জাহাজের ওপর থেকে। অথবা, চারিদিকে বিক্ষুব্ধ জলই বুঝি গোটা জাহাজটার ঝুঁটি ধরে টেনে নামিয়ে নিয়ে যাবে সমুদ্রের অতলে। ভগবান কিন্তু মুখ তুলে চাইলেন। দুপুর নাগাদ বিপদ কমে আসছে মনে হল। প্রসন্ন সূর্যের মুখ দেখা গেল কালো আকাশে। তার একটু পরেই টের পেলাম ঝড়ের লাফালাফিও কমে আসছে।

এতক্ষণ কথা ফুটল অন্তত একজনের মুখে। অগাস্টাসের সব চাইতে কাছে চরকি কলে নিজেকে কষে বেঁধে রেখেছিল পিটার্স। তাকেই উদ্দেশ করে অগাস্টাস জানতে চাইলে, প্রাণে বাঁচবার কোন সম্ভাবনা আছে কি না।

জবাব এল না। ভাবলাম বুঝি বেঁচে নেই পিটার্স। তার কিছুক্ষণ পরে অতি ক্ষীণ স্বরে পিটার্স বললে, বড় কষ্ট হচ্ছে, পেটের

ওপরকার দড়ির বাঁধন মাংস কেটে বসে গেছে—বাঁধন আলগা করে না দিলে প্রাণ বেরিয়ে যাবে এখুনি।

কিন্তু আমাদের কারোর পক্ষেই তখন তা করা সম্ভব নয়। বললামও তাই, মুখবুজে আরো কিছুক্ষণ সহ্য করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। সুযোগ আসা মাত্র নিশ্চয় গিয়ে আলগা করে দেব বাঁধন। চিঁ-চিঁ করে পিটার্স বললে—সুযোগ যখন আসবে, তখন আর তার ধড়ে প্রাণ থাকবে না। এর পরেই আর কোন সাড়া শব্দ ওর দিক থেকে না পেয়ে এবং ওর নেতিয়ে পড়া অবস্থাটা দেখে ভাবলাম—শেষ হয়ে গেল পিটার্স। চারজনের একজনকে টেনে নিল করাল মৃত্যু।

রাত নামল। ঝড়ের গজরানি অব্যাহত থাকলেও সমুদ্রের মাতলামি কমেছে বলেই মনে হল। প্রতি পাঁচ মিনিটে একাধিক ঢেউ চলে যাচ্ছে জাহাজ নামক কাষ্ঠখণ্ডের ওপর দিয়ে—তার বেশি নয়। হাওয়ার জোরও কমেছে—কমেনি শুধু ফোঁসফোঁসানি। বেশ কয়েকঘণ্টা বাকি তিনজনের দিক থেকে কোন সাড়া শব্দ পাইনি। ডাকলাম অগাস্টাসের নাম ধরে। ক্ষীণকণ্ঠে কি যে বলল, বুঝতেও পারলাম না। ডাকলাম পিটার্স আর পার্কারকে—কেউই জবাব দিল না।

এরপর থেকেই আচ্ছন্নের মধ্যে ছিলাম আমি। ঐ রকম ভয়ঙ্কর পরিবেশের মধ্যে প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকা সত্ত্বেও মনের পর্দার ওপর দিয়ে ভেসে যেতে দেখেছি দ্রুতগতি বিস্তর আনন্দের চলচ্ছবি। কোন বস্তুটাই কিন্তু স্থির নয়—সবই চলমান। যেমন, হাওয়াকল, বিরাট পাখি, বেলুন, ঘোড়সওয়ার, শকট—ভীষণ বেগে মনের পটে তারা আসছে আর যাচ্ছে—দেখে বড় মজা পাচ্ছি। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠবার পরেও ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারিনি। বেশ কয়েকঘণ্টা ধরে মনে হয়েছিল যেন জাহাজের খোলেই রয়েছি বাক্সটার কাছে, পার্কারের দেহটাকে মনে হয়েছে টাইগারের দেহ।

টনটনে জ্ঞান যখন ফিরে পেলাম, দেখলাম বাতাস বইছে ঝিরঝিরেভাবে, সমুদ্রের দামালিপনাও আর নেই, চরকি কলের বাঁধন থেকে আমার বাঁ হাতটা আলগা হয়ে বেরিয়ে এসেছে। ডানহাতটার কাঁধ আর বগল থেকে কব্জি পর্যন্ত ফুলে ঢোল হয়ে রয়েছে—একেবারে অসাড় অবস্থায়—হাতটা নিজের বলেই মনে হচ্ছে না। কোমরের ওপর দড়ি দিয়ে নিজেকে বেঁধে রেখেছিলাম, সেই দড়িটা এমন টাইট হয়ে বসে গেছে যে যন্ত্রণায় ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়তে ইচ্ছে যাচ্ছে।

আশপাশে তাকিয়ে দেখলাম, পিটার্স এখনো মরেনি। খুব সরু একটা দড়ি কোমরের মাংস, উলের জামা, দুটো সার্ট কেটে বসে গিয়ে তলপেট পর্যন্ত পৌঁছেছে—রক্ত ঝরছে দরদর করে। দড়ি তো নয়, যেন ছুরি। যেন কেটে দুটুকরো করে দিয়েছে দেহটাকে। ঐ

অবস্থাতেই অতিকষ্টে শুধু হাত নেড়ে দেখাল দড়িটাকে। অগাস্টাসের দেহে প্রাণে আছে বলে মনে হল না। চরকি কলের একটা ভাঙা কাঠের ওপর পেট ঠেকিয়ে মাথাটা হাঁটুতে লাগিয়ে পুরো শরীরটাকে ভাঁজ করা অবস্থায় রেখে পড়ে রয়েছে একেবারে নিস্পন্দভাবে। আমাকে নড়তে দেখেই পার্কার বললে, আমাকেই এখন উদ্ধার করতে হবে সবাইকে। ও তো বলে খালাস। হাত নাড়াই কি করে? তা সত্ত্বেও অভয় দিয়ে বাঁ হাত ঢুকোলাম প্যাণ্টালুনের পকেটে। ছুরি বার করে বেশ কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর বাঁহাতেই বার করলাম ফলাটা। কাটলাম ডানহাতের দড়ি। কিন্তু ডানহাত নাড়াতে পারলাম না কিছুতেই-ডানহাতটা যেন আমার দেহে থেকেও আমার হাত নয়। তারপর কাটলাম পায়ের দড়ি। কিন্তু কিছুতেই নাড়তে পারলাম না পা দুখানা। পার্কার আমার অবস্থা দেখে বললে কিছুক্ষণ উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে-রক্ত চলাচল হলেই অসাড় অবস্থাটা কেটে যাবে।

রইলামও তাই। কিছুক্ষণ পরে পা নাড়াতে পারলাম বটে দাঁড়াতে পারলাম না-সে চেষ্টাও করলাম না। ঘষটে ঘষটে গেলাম পার্কারের কাছে। তার দড়ি কেটে দিলাম। সেও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর ফিরে পেল হাত পা নাড়াবার শক্তি। তারপর কাটলাম পিটার্সের দড়ি। পেটের দড়ি যে মাংস, উলের জামা, দুটো সার্ট কেটে তলপেটের তলায় গিয়ে ঠেকেছে-আবিষ্কার করলাম তখনি। দড়ি কেটে দিতেই ভারি আরাম পেল পিটার্স। আমার আর পার্কারের চাইতেও বেশ চাঙ্গা মনে হল তাকে-নিশ্চয় রক্তক্ষরণের দরুন।

অগাস্টাসের নিঃসাড় দেহে প্রাণের কোন স্পন্দন না দেখতে পেয়ে তিনজনেই ভেবেছিলাম আর বুঝি জাগানো যাবে না ওকে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলাম অবস্থা সেরকম গুরুতর নয়। ক্ষতস্থানের ব্যাণ্ডেজগুলো কেবল লোপাট করে নিয়ে গেছে উত্তাল সমুদ্র। চরকি কলের সঙ্গে নিজেকে তেমন কষে বাঁধতে পারেনি বলেই কোন দড়িটাই টাইট হয়ে বসে যায়নি শরীরে-প্রাণটা তাই এখনো টিঁকে আছে ধড়ে। দড়ি কেটে ওকে মোটামুটি একটা শুকনো জায়গায় এনে রাখলাম মাথাটা শরীরের চেয়ে নীচের দিকে করে। তারপর তিনজনেই জোরে জোরে ঘষতে লাগলাম সারা গা। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ধাতস্ত হল বটে অগাস্টাস, কিন্তু পরের দিন সকাল না হওয়া পর্যন্ত চিনতে পারল না আমাদের কাউকেই-কথা বলার শক্তি পর্যন্ত পেল না। হাত পায়ের বাঁধন খুলতে খুলতেই আবার ঘনিয়ে এল অন্ধকার। ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল নতুন করে। ফের যদি ঝড়ের হামলাবাজি আরম্ভ হয়, ঘন অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে প্রত্যেকেই। লড়বার মত শক্তি তো আর নেই-বেদম হয়ে গেছি চারজনেই। মেঘের ঘনঘটা ফের শুরু হয়েছে দেখে বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল সেই কারণেই।

ঈশ্বর কিন্তু সদয় হলেন। প্রকৃতি মুখ কালো করে থাকলেও রাতটা মোটামুটি ভালভাবেই কেটে গেল। মিনিটে মিনিটে সমুদ্র স্থির হয়ে আসতে লাগল-প্রাণে বেঁচে যাওয়ার আশার আলোয় আমাদের মনের নিরাশার অন্ধকারও কেটে যেতে লাগল মিনিটে মিনিটে। যেদিক থেকে বাতাস বইছে, সেইদিকে আলগা করে বেঁধে রাখলাম অগাস্টাসকে-নিজে থেকে কিছু আঁকড়ে থাকার ক্ষমতাই ওর ছিল না। আমরাও চরকি কলের সঙ্গে বেঁধে রাখলাম নিজেদের, রইলাম কিন্তু খুব কাছাকাছি। শলাপরামর্শ করতে লাগলাম, নানা ধরনের পরিত্রাণের পথ মাথা খাটিয়ে বার করতে লাগলাম, জামাকাপড় সব খুলে নিয়েছিলাম। শুকিয়ে নিয়ে আবার সব গায়ে দিয়েছিলাম। গা বেশ গরম হয়ে উঠেছিল। ভারি আরামবোধ করেছিলাম। অগাস্টাসের জামাকাপড়ও খুলে নিয়ে তাই করলাম। বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল-অনেকটা আরাম পেল।

সাত পাঁচ আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই খাবারের মজুত কি আছে তাই নিয়ে কথা উঠেছিল। ফলে, বুক দমে গিয়েছিল প্রত্যেকেরই, সর্বনাশ। খিদে তেষ্টায় মরার চাইতে মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রাণটা গেলে যে ভাল ছিল। আশায় আশায় রইলাম, যদি কোন জাহাজ চোখে পড়ে-হাঁকডাক দিয়ে যদি সেই জাহাজে ঠাঁই না পাই-স্রেফ খিদে আর তেষ্টায় মরা ছাড়া আর উপায় নেই। পেট চুঁই চুঁই করছে। তেষ্টায় গলা কাঠ হয়ে যাচ্ছে-এ অবস্থায় আর টিকে থাকব কতক্ষণ?

চতুর্দশ দিবসের উষালগ্নে আবহাওয়া অনেক পরিষ্কার হয়ে এল। জাহাজ আর আগের মত সমুদ্রে ডুবুডুবু হয়ে নেই-ডেকের বেশ খানিকটা জায়গা শুকনো। খাবারের খোঁজে হন্যে হয়ে লাগলাম সবাই। খিদে আর তেষ্টায় কাহিল হয়ে পড়েছিলাম বিলক্ষণ।

তিনদিন তিনরাত পেটে কিছু পড়েনি। একটা ভাঙা কাঠের দুদিকে দুটো পেরেক গেঁথে দড়ি বাঁধলাম পেরেক দুটোয়। জলে ডোবা সিঁড়ির ওপর থেকে ছুঁড়ে দিলাম কেবিনের মধ্যে-টেনে আনলাম আস্তে আস্তে-যদি কিছু সেই সঙ্গে উঠে আসে, এই আশায়। খাবার দাবার কিছুই এল না-এল কিছু বিছানার চাদর। সারা সকালটা বৃথাই চেষ্টা করে গেলাম এইভাবে।

মরিয়া হয়ে একটা বুদ্ধি বাতলাল পার্কার। দড়ি বেঁধে দেওয়া হোক কোমরে। জলে ডুব দিয়ে ডুবুরির মত নেমে যাবে কেবিনের মধ্যে। কেবিনে খাবার পাবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সঙ্কীর্ণ গলিপথে হেঁটে ডানদিকে দশ বারো ফুট গেলেই তো ভাঁড়ার ঘর পাওয়া যাবে।

তৎক্ষণাৎ পাতলুন ছাড়া সমস্ত জামাকাপড় খুলে ফেলল পার্কার। কষে দড়ি বাঁধলাম কোমরে-কাঁধের ওপর দড়ির ফাঁস দিলাম এমনভাবে যাতে হড়কে বেরিয়ে না যায়। জলে ডোবা

কেবিনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সরু গলিপথ পেরিয়ে দশ বারো ফুট হেঁটে ভাঁড়ার ঘরে পৌঁছনো যে সহজ কথা নয় তা জেনেও পার্কার দমে গেল না। খিদের জ্বালা এমনই জ্বালা।

ডুব দিল পার্কার। কিন্তু আধ মিনিট যেতে না যেতেই ঝাঁকুনি পড়ল দড়িতে। তৎক্ষণাৎ টেনে তুললাম তাকে। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, দড়িতে ঝাঁকুনি দিলেই যেন তক্ষুনি টেনে তুলে নিই। কিন্তু আধ মিনিট যেতে না যেতেই উঠে আসতে চাইল কেন পার্কার ?

বেদম হয়ে পড়েছে বলে। টানা হেঁচড়ায় সিঁড়ির ঘষটানিতে ছালচামড়া তুলে ফেলে ওপরে এসে ঝাড়া পনেরো মিনিট ধরে ধুঁকতে লাগল বেচারা। জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়াটাও নাকি একটা রকমারি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওর কাছে-শরীর চাইছে ভেসে উঠতে ডেকের দিকে-ও অবস্থায় হাঁটা যায় ? টান দিয়েছে দড়িতে। পনেরো মিনিট দম নিয়ে আবার নামল বটে পার্কার কিন্তু মরতে মরতে বেঁচে গেল দ্বিতীয় অভিযানে। সিঁড়ির রেলিংয়ে দড়ি জড়িয়ে যাওয়ায় ওর বারংবার হ্যাঁচকা টান একেবারেই টের পায়নি ওপর থেকে। অতি কষ্টে বেরিয়ে এল বেচারি। রেলিং না ভাঙলেই নয়। সবাই মিলে জলে নেমে পায়ের জোরে রেলিং ভাঙলাম। দড়ি জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আর রইল না।

তৃতীয় প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হল। ভেবে দেখলাম, পার্কারের পায়ে ভারি কিছু বেঁধে দেওয়া দরকার-যাতে সিধে হয়ে অনন্ত জলের মধ্যে হাঁটতে পারে-নইলে যে ভেসে ওঠা আটকাতেই দম বেরিয়ে যাচ্ছে। মিনিটখানেকের বেশি জলের মধ্যে থাকতেও পারছে না।

খুঁজেপেতে আনলাম খানিকটা লোহার শেকল। বেঁধে দিলাম ওর এক পায়ের গোড়ালিতে। এবার আর হাঁটতে অসুবিধা হয় নি পার্কারের। কিন্তু লবডঙ্কা লাভ হয়েছে চতুর্থ অভিযানের শেষে। ভাঁড়ার ঘরের দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছেছিল ঠিকই, কিন্তু দেখেছে, দরজায় তালা দেওয়া।

ফিরে এসে খবরটা দিতেই কান্নায় ভেঙে পড়লাম আমি আর অগাস্টাস। মৃত্যু অনিবার্য। হাঁটু গেড়ে বসে ভগবানকে ডাকা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না।

১০ - ১১

এর ঠিক পরেই এমন একটা ঘটনা ঘটল যার মত বিপুল আনন্দের অথচ বিষম ভয়াবহ ঘটনা আমার পরবর্তী দীর্ঘ ন'বছরের বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনে আর ঘটেনি।

চারজনেই এলিয়ে ছিলাম সিঁড়ির কাছে ডেকের ওপর। হঠাৎ চোখ পড়ল অগাস্টাসের মুখের ওপর। দেখলাম, ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে। অস্বাভাবিকভাবে। মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে

মুখখানা। ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। বার বার নাম ধরে ডেকেছিলাম। ও জবাব দেয়নি। ভাবলাম বুঝি পাগল হয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত, অথবা হঠাৎ শরীর খারাপ হয়েছে। অমনভাবে আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছনদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে কেন, দেখবার জন্যে ঘাড় ফিরিয়েই দেখলাম একটা জাহাজ।

মুহূর্তের মধ্যে নিঃসীম হর্ষে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল আমার শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু পেশীতন্তু। জাহাজই বটে। বিরাট জাহাজ। পালতোলা জাহাজ। মাইল দুয়েক দূরে।

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম আমি। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে দিয়ে হঠাৎ বুলেট ঢুকলে মানুষ বুঝি এমনিভাবে ছিটকে যায়। কিন্তু চেঁচাতে পারিনি। বাকরোধ ঘটেছিল। মাথার ওপর দুহাত তুলে দাঁড়িয়েছিলাম কাঠের পুতুলের মত।

পার্কার আর পিটারের অবস্থাও হয়েছিল প্রায় আমারই মত। আনন্দে ফেটে পড়েছিল দুজনেই। তবে আনন্দের বহিঃপ্রকাশটা ঘটেছিল দুজনের ক্ষেত্রে দুরকমভাবে। পিটার্স ধেই ধেই করে নাচতে আরম্ভ করে দিয়েছিল ডেকের ওপর। যেন বদ্ধ উন্মাদ। সেই সঙ্গে অর্থহীন প্রলাপ চিৎকারে গগন বিদীর্ণ হয়ে যায় আর কি। বাচ্চা ছেলের মত কান্না আরম্ভ করে দিয়েছিল পার্কার।

জাহাজটা ওলন্দাজ নির্মিত কালো রঙ করা। সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে সোনালী রঙের একটা মূর্তি। ঝড়ে বিধ্বস্ত। ভাঙাচোরা। মাস্তুল আছে-কিন্তু পাল নেই। চলছে এলোমেলোভাবে। যেন মতিগতির ঠিক নেই। কখনো আমাদের দিকে আসছে, আবার কখনো মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। দেখতে না পেয়ে চলে যাচ্ছে ভেবে পাগলের মত চারজনে হাত তুলে চেঁচিয়েছি। যেন হাঁকডাক শুনেই জাহাজের মুখ আস্তে আস্তে আমাদের দিকে ঘুরে গেছে। পরক্ষণেই আবার আস্তে আস্তে অন্যদিকে ভেসে গেছে। এ তো মহা জ্বালা! হালধারী নিশ্চয় মদে চুর হয়ে রয়েছে। নইলে এমন কাণ্ড ঘটবে কেন?

সিকি মাইলটাক দূরে আসতেই দেখতে পেলাম তিনজন নাবিককে। নিঃসন্দেহে হল্যাণ্ডবাসী-জামাকাপড় সেই দেশের। দুজন পড়ে রয়েছে সামনের দিকে জড়ো করা পালের ওপর। তৃতীয় জন আমাদের দিকেই মুখ করে ঝুঁকে রয়েছে রেলিংয়ে ভর দিয়ে। খুব লম্বা আর গাঁট্টাগোট্টা পুরুষ। আমাদের দেখতে পেয়েছে। আশ্বাস দিচ্ছে। তাই মাথা নাড়ছে অল্প অল্প। হেসে চলেছে সমানে-ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়েই রয়েছে। মাথার ওপর থেকে লাল টুপিটা খসে পড়ল জলে। ফিরেও দেখল না। সবই খুঁটিয়ে লিখছি। লিখেও যাব। যত কাছে আসতে লাগল

জাহাজখানা, ততই স্পষ্ট দেখতে পেলাম সবকিছু। খুঁটিয়ে লিখব সেই কারণেই।

আস্তে.........খুব আস্তে আসছে জাহাজ। আগের চাইতে আরো সুস্থিরভাবে। এসে গেল পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে। এবার নিশ্চয় গায়ে গা লাগিয়ে অথবা নৌকো নামিয়ে তুলে নিয়ে যাবে আমাদের গ্র্যামপাস থেকে। হঠাৎ ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজটার মুখ একটু ঘুরে গেল-গ্র্যামপাস জাহাজের প্রায় বিশ ফুট দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে-আচমকা নাকে ভেসে এল একটা বিকট পচা দুর্বিসহ ভয়ানক দুর্গন্ধ।

সে যে কী অসহ্য গন্ধ, বিশ্বের কোন মানব আজও তা জানেনি। কল্পনাও করতে পারেনি। দম আটকে এল ভয়াবহ সেই দুর্গন্ধে।

হ্যাকাসে মেরে গেলাম আমরা চারজনেই, তা সত্ত্বেও হাত নেড়ে তারস্বরে ডাকতে লাগলাম। এমন সময়ে চোখে পড়ল মড়ার গাদাটা!

প্রায় পঞ্চাশটা মৃতদেহ বিক্ষিপ্ত রয়েছে ডেকে। নারী এবং পুরুষ। পচে গলে বীভৎস।

আমরা বোধ হয় তখনই উম্মাদই হয়ে গিয়েছিলাম। নইলে মড়ার গাদাটাকেই উদ্দেশ করে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার প্রার্থনা জানিয়ে যাব কেন তারস্বরে।

চিৎকারের জবাবেই যেন অবিকল মানুষের গলায় কে সাড়া দিলে সামনের গলুইয়ের দিক থেকে। ঠিক সেই সময়ে ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজটা আবার একটু ঘুরে গেল আমাদের দিকে। রেলিংয়ে ভর দিয়ে থাকা ঢ্যাঙা লোকটার পেছন দিকটা দেখা গেল পাশ থেকে। হাতদুটোর তালু নিচের দিকে করে ঝুলিয়ে রেখেছে রেলিংয়ের বাইরে। ঝুলছে শিথিলভাবে। দেহটা সিধে হয়ে রয়েছে হাঁটুজোড়া রেলিংয়ের ভেতর দিকে টান করে বাঁধা একটা দড়িতে আটকে রয়েছে বলে। পিঠের ওপর বসে একটা বিরাট সীগল পাখি রক্তমাখা ডানা ছড়িয়ে মুখ ডুবিয়ে রয়েছে তার পিঠের মধ্যে। ভেতর থেকে দেহযন্ত্র টেনে বার করতে এত ব্যস্ত যে প্রথমে আমাদের দেখতে পায়নি। অনেক টানাহ্যাঁচড়া করে একডেলা থলথলে বস্তু বার করে নিয়ে অলস চোখে আমাদের দেখেই থমকে গেল। পরক্ষণেই ডানা ঝাপটা দিয়ে উঠে পড়ল শূন্যে। উড়ে গেল আমাদের মাথার ওপর দিয়েই। চঞ্চু থেকে ঝপাস করে খসে পড়ল রক্তমাখা দেহযন্ত্রটা-ঠিক অগাস্টাসের পায়ের কাছে। যকৃৎ বা ঐ জাতীয় কিছু। প্রথমে ছিটকে সরে গিয়েছিলাম। তারপরেই দেখি মিনতি মাখানো চোখে অগাস্টাস চেয়ে আছে আমার পানে। বুঝলাম ওর মনের কথা। গা ঘিন ঘিন করলেও লাফিয়ে গিয়ে বীভৎস বস্তুটা তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম জলে।

ঢ্যাঙা মূর্তিটা এতক্ষণ কেন দুলে দুলে উঠে মাথা নাড়ছিল এবার

তা বোঝা গেল। রাক্ষুসে পাখিটার চঞ্চুর ঘায়ে ঘটেছিল ঐ কাণ্ড। আমরা ভেবেছি বুঝি অভয় দিচ্ছে আমাদের। জাহাজ তখন আরও একটু দূরে সরে গেলেও ঢ্যাঙা মানুষের মুখটা ফিরে রয়েছে আমাদের দিকেই। সে কী মুখ! চোখের চিহ্ন নেই-খুবলে খেয়ে নিয়েছে। মুখের মাংস বেশি আর নেই। দাঁতগুলো বিকটভাবে বেরিয়ে রয়েছে সেই কারণেই। আমরা ভেবেছি বুঝি হাসছে আমাদের দেখে।

আস্তে আস্তে আরও দূরে সরে যাচ্ছে আতঙ্কভরা জাহাজ। নিঃসীম নৈরাশ্য আর বর্ণনাতীত আতঙ্কবোধে আমরা তখন এমনই বিমূঢ় এবং হতবুদ্ধি যে উদ্ধার পাওয়ার শেষ অবলম্বনটুকুকে চোখের সামনে দিয়ে সরে যেতে দেখেও কাছাকাছি যাওয়ার কোন ভাবনাই মাথায় আনতে পারলাম না। মগজের ক্রিয়াই তখন স্তব্ধ। জাহাজ যখন বেশ দূরে চলে গিয়েছে-অস্পষ্ট হয়ে এসেছে-তখন সহসা বুদ্ধি খুলে গেল প্রত্যেকের। একসঙ্গে সবাই বললাম-'সাঁতরে যাওয়া যাক-এখনও সময় আছে।'

কিন্তু জলে ঝাঁপ দিয়নি কেউই। পরে রহস্যটা নিয়ে ভেবেছি অনেক। ঢ্যাঙা লোকটার জামাকাপড় দেখে ওলন্দাজ বলেই চিনেছিলাম। নিশ্চয় সওদাগর। জাহাজে মড়ক লেগেছিল নিশ্চয় পীতজ্বর বা ঐ জাতীয় মারাত্মক কোন সংক্রমণের দরুন। মৃত্যু এসেছে সহসা-অতর্কিতে। তাই ঐ ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল অতগুলো নারী-পুরুষ। হতে পারে দূষিত খাবার খাওয়ার জন্যেও মারা গিয়েছিল সবাই। বিষাক্ত মাছ, সামুদ্রিক অজানা পাখির মাংস অথবা ভাঁড়ারের খাবারে হয়ত বিষ ছিল। কারণটা আজও স্পষ্ট নয়। স্পষ্ট শুধু সেই ভয়ানক দৃশ্যটা। গা শিউরে উঠেছিল রক্তাক্ত দেহযন্ত্রটাকে ডেক থেকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার সময়ে। আজও গা পাক দিয়ে ওঠে বিকট দুর্গন্ধটার কথা ভাবলেই।

সন্ধ্যার অন্ধকারে দিগন্তের বিভীষিকা বোঝাই জাহাজটা একেবারে না মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা ক'জন। তারপর খিদেয় পেট মোচড় দিতেই সম্বিৎ ফিরে পেলাম। কিন্তু কোথায় খাবার? রাত ভোর না হওয়া পর্যন্ত পেটের খিদে পেটে নিয়েই কাটিয়ে দিতে হবে কোনমতে। চরকি কলের সঙ্গে আবার বেঁধে ফেললাম নিজেদের। আমার কপাল ভাল বলেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ওরা কেউই দু চোখের পাতা এক করতে পারে নি। ভোর হতেই জাগিয়ে দিলে আমাকে। নতুন উদ্যমে লাগলাম খোলের ভেতর থেকে খাবার সংগ্রহের অভিযানে।

সমুদ্র এখন একেবারেই শান্ত-মৃত সমুদ্র বললেই চলে। ভয়াবহ জাহাজটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। আবহাওয়া বেশ উষ্ণ এবং আরামপ্রদ। এবার শেকল বাঁধলাম পিটার্সের গোড়ালিতে।

অসুরের মত শক্তি যার গায়ে, সে যদি ভাঁড়ার ঘরের তালা দেওয়া দরজার সামনে পৌঁছতে পারে-দরজা ভেঙেও ঢুকতে পারবে। জাহাজও আর আগের মত দুলছে না। খুব একটা অসুবিধা হবে না।

দরজা অবধি খুব তাড়াতাড়িই পৌঁছতে পেরেছিল পিটার্স, পায়ের শেকল খুলে নিয়ে দরজা ভাঙবার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু পারেনি। জলের মধ্যে দম বন্ধ করে বেশিক্ষণ থাকাও সম্ভব হয় নি। তাই উঠে আসতেই পার্কার নিজে থেকেই আবার খানিকটা শেকল জুটিয়ে নিয়ে পায়ে বেঁধে পর পর তিন বার নামল বটে ডুবুরীর মত, কিন্তু করিডোর পেরিয়ে দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না। এমন হাঁপিয়ে পড়েছিল বেচারী যে এরপর আর ওকে জলে নামানো গেল না। অগাস্টাসের অবস্থা এতই কাহিল যে ওকে দিয়ে এ কাজ করানোর প্রশ্নই ওঠে না। বাকি রইলাম তাহলে আমি।

পিটার্স খানিকটা শেকল ফেলে এসেছিল করিডোরে। ঝাঁপ দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে শেকলের খোঁজ না করেই কোনমতে ভারসাম্য বজায় রাখলাম এবং মেঝে আঁকড়ে ধরে একটু একটু করে এগোতে লাগলাম ভাঁড়ার ঘরের দরজার দিকে। সেই সময়ে হাতে ঠেকল একটা বস্তু। জিনিসটা যে কি, তা দেখবার জন্যে তৎক্ষণাৎ ভেসে উঠলাম জলের ওপর।

আনন্দে আটখানা হলাম চারজনেই। হাতে করে এনেছি একটা মদের বোতল। অনাহারে অবসাদে তৃষ্ণায় ঐ মদের বোতলটা যে অমৃতসমান কাজ করে দেবে, তার পরখ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। ছিপি খুলে প্রত্যেকেই খেলাম একটু একটু করে। ক্লান্তি কাটিয়ে ওঠে রুমাল জড়িয়ে বোতলের মুখ বন্ধ করে রাখলাম এমনভাবে যাতে ভেঙে না যায়।

জিরিয়ে নিয়ে আবার ডুব দিয়ে এবার পেয়ে গেলাম দরজা ভাঙবার মত ভারি শেকলটা। উঠে এসে গোড়ালিতে জড়িয়ে নিয়ে ডুব দিলাম তৃতীয়বার। পৌঁছলাম দরজা পর্যন্ত-ভাঙতে কিন্তু পারলাম না। মুখ চুন করে ফিরে এলাম ওপরে।

নাঃ, আর কোন আশা নেই। না খেয়েই মরতে হবে শেষ পর্যন্ত। খালি পেটে কড়া মদ পড়ায় প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে কিন্তু ততক্ষণে। আমি বারবার জলে ডুব দিয়েছি বলেই নেশায় কাবু হইনি। ওরা তিনজনেই কিন্তু প্রলাপ বকতে শুরু করে দিয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতির সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না, এমনি ধরনের অসংলগ্ন কথার তুবড়ি ছোটাচ্ছে। নানটাকেটের খবরাখবর জানার জন্যে ভীষণ ব্যাকুল হয়ে পড়েছে পিটার্স-প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে আমাকে। অগাস্টাস দারুণ সিরিয়াসভাবে একটা চিরুনি চাইছে আমার কাছে। মাছের আঁশে মাথা নাকি বোঝাই হয়ে আছে-মাথা সাফ না করে তীরে নামবে কি করে? একা

পার্কারকেই দেখলাম মোটামুটি ধাতস্থ। জেদ ধরে রয়েছে, আমাকেই আবার নামতে হবে জলে-দেখা যাক আরও কিছু আনতে পারি কিনা।

কপাল ঠুকে নেমে গেলাম। এবার হাতে ঠেকল বার্ণাডের একটা চামড়ার সুটকেশ। ভেবেছিলাম খাবার-দাবার মদ-টদ মিলবে ভেতরে। ওপরে এনে এক বাক্স ক্ষুর আর দুটো সার্ট ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। আবার ঝাঁপ দিলাম জলে-ফিরে এলাম রিক্ত হস্তে। জল থেকে মাথা তোলার সময়ে কানে ভেসে এল একটা ঝনঝন ঝনাৎ শব্দ। মাথা ঘুরিয়ে দেখি মদের খালি বোতলটা আছড়ে ভেঙে ফেলেছে সঙ্গীরা। তার আগে অবশ্য আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে খালি করেছে বোতলটাকে। বিশ্বাসঘাতকতার এই নমুনায় হাড়পিত্তি জ্বলে গেল আমার। ওরা কিন্তু ব্যাপারটাকে আমলই দিতে চাইল না। কাজটা যে খুবই হৃদয়হীনতার ব্যাপার হয়েছে, তা উপলব্ধি করে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল কেবল অগাস্টাস। বাকি দুজন তো হেসেই অস্থির। যেন একটা দারুণ রসিকতা করা হয়েছে-এইরকম একটা ভাব। কিন্তু হাসির ধরনে যে পৈশাচিকতা লক্ষ্য করেছিলাম, তাতে পরিহাসের বাষ্পটুকু নেই। বুঝিয়ে সুঝিয়ে তিনজনকেই শুইয়ে দিলাম ডেকের ওপর। শুতে না শুতেই নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তিনজনেই।

জাহাজে তখন সজ্ঞানে রইলাম আমি একা। জ্ঞান টনটনে রয়েছে বলেই বুঝলাম, মৃত্যুর আর দেরি নেই। হয় না খেয়ে, অথবা আর একটা ঝড়ের পাল্লায় পড়ে মরতেই হবে। শরীর এত অবসন্ন যে ঝড়ের খপ্পরে পড়ে জাহাজের তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হয়ে গেলে সামাল দেওয়ার অবস্থা নেই কারোরই।

খিদের যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পারছিলাম না। পেটের মধ্যে যেন ছুরি চলছে মনে হচ্ছিল। চামড়ার সুটকেশের খানিকটা কেটে নিয়ে চিবিয়ে খেতে গিয়ে দেখলাম গিলতে পারছি না। তবে চুষে নিয়ে থু থু করে ফেলে দিলে কষ্ট অনেকটা কমছে রাত হল। একে একে ঘুম ভাঙল তিন সঙ্গীর। কিন্তু অসম্ভব দুর্বলতা আর প্রচণ্ড খিদের যন্ত্রণায় আপাদমস্তক ঠক ঠক করে কাঁপছিল তিনজনেরই। একঢোক জলের জন্যে সে কি হাহাকার। এই কষ্ট যে মদ খাওয়ার দরুন, তা বুঝলাম। ভাগ্যিস, আমি ওদের মত নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়িনি। তিনজনেরই শোচনীয় অবস্থা দেখে বড় বিপদগ্রস্ত বোধ করলাম নিজেকে। তিন আধ-পাগলের সান্নিধ্যে থেকে যে কি অস্বস্তি, তা লিখে বোঝাতে পারব না। এখুনি কিছু একটা করা দরকার তিনজনের জন্যেই, নইলে পরিস্থিতি আরও ঘোরাল হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিপদ থেকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে কোন সাহায্য তো করতে পারবই না-উল্টে আরও বিপদে ফেলতে

পারে। আমি যে জলে ডুব দিয়ে খাবার খুঁজতে যাব, দড়ি ধরবে কে ?

ভেবে ভেবে একটা বুদ্ধি বার করলাম। পার্কারের কোমরে দড়ি বেঁধে ঠেলেঠুলে নিয়ে গেলাম জলে বোঝাই সিঁড়ির ধারে। তিল মাত্র বাধা দিল না পার্কার। তারপরেই আচমকা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলাম জলের মধ্যে। বেশ করে জলে চুবিয়ে নিয়ে দড়ি ধরে টেনে তুললাম তৎক্ষণাৎ।

নাকানিচোবানি খেয়ে উঠে আসার পর কিন্তু আচ্ছন্ন অবস্থাটা একেবারেই কেটে গেল পার্কারের। সহজ গলায় জানতে চাইল, জলে ফেলে দিয়ে ফের টেনে তুললাম কেন। বুঝিয়ে বললাম। ঠাণ্ডা জলে চুবিয়ে শক্ দিয়ে চাঙা করার জন্যেই করেছি। কৃতজ্ঞতা জানাল পার্কার। বিলক্ষণ ধাতস্থ এবং চাঙা বোধ করায় নিজে থেকেই প্রস্তাব করলে পিটার্স আর অগস্টাসকেও একই শক্ ট্রিটমেণ্ট দেওয়া যাক। এই ধরনের চিকিৎসার পদ্ধতিটা আমি পড়েছিলাম একটা ডাক্তারী বইতে। ঠাণ্ডা সমুদ্রের জলে হঠাৎ চুবিয়ে নেওয়ার এক্সপেরিমেণ্টটার ফল পেলাম হাতেনাতে।

দুজনে মিলে তখনি একে একে চুবিয়ে চাঙা করলাম পিটার্স আর অগাস্টাসকে। দুজনেই শত মুখে সাধুবাদ জানালে আমাকে।

যতই চাঙা বোধ করুক আর মুখে লম্বা লম্বা কথা বলুক না কেন, ওদের হাতে দড়ি ধরিয়ে জলে নামতে ভরসা পেলাম না। নিজেই বার তিন চার ডুব দিলাম। গোটা দুই ছুরি, একটা তিন গ্যালনের খালি জগ, আর একটা কম্বল ছাড়া কিছুই আনতে পারলাম না। তা সত্ত্বেও চেষ্টা চালিয়ে গেলাম আরও কয়েকবার। শেষকালে এমন হেদিয়ে পড়লাম যে পার্কার আর পিটার্স নিজে থেকেই আমাকে রেহাই দিল। ডুব দিয়ে গেল সারারাত ধরে। পেল না কিছুই। হাওয়ায় জাহাজের খোল এমনভাবে দুলছে যে ভয়ও করছে বিলক্ষণ। অগত্যা ডুব দিয়ে খাবার খুঁজে আনার আশা ত্যাগ করা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। বৃথা চেষ্টা করে লাভ কী !

বড় কষ্টের মধ্যে দিয়ে এল ষোড়শতম দিবসের উষা। ছটা দিন পেটে দানাপানি পড়েনি—সামান্য ঐ মদটুকু ছাড়া। সঙ্গী তিনজন শুকিয়ে এমন কংকালসার হয়ে গিয়েছে যে ঐ অবস্থায় যদি ওদের ডাঙায় দেখতাম কদিন আগে চিনতে পারতাম কিনা সন্দেহ। একা পার্কারই দেখলাম অনেক বেশি কষ্টসহিষ্ণু। যুক্তি বুদ্ধি একেবারেই হারিয়ে ফেলেনি। পার্কার বা পিটার্সের চাইতে আমার শরীর অনেক পলকা ঠিকই, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মনের জোর অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলাম শেষ পর্যন্ত। ওরা যখন সটান শুয়ে পড়ে শিশুর মত আবোলতাবোল বকছে, নির্বোধের মত হি হি করে

হাসছে, একেবারেই অর্থহীন প্রলাপ বকে যাচ্ছে-আমি তখনও দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়েও মনের জোরে সটান থাকতে পেরেছি। মাঝে মাঝে আচমকা তিনজনেরই ঘোর কেটে যাচ্ছে। ধাঁ করে উঠে বসে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিবেচক পুরুষের মতই কথাবার্তা বলছে। কিন্তু তা সাময়িকভাবে। আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গেই। জানি না, আমার অজ্ঞাতসারে আমিও ঠিক তাই করেছিলাম কিনা। নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

দুপুর নাগাদ হঠাৎ হৈ-হৈ করে উঠল পার্কার। দূরে নাকি ডাঙা দেখতে পেয়েছে। চোখ পাকিয়ে তাকালাম আমি। কিছু দেখতে পেলাম না। কিন্তু পার্কারের দৃঢ় বিশ্বাস-ডাঙা রয়েছে একটু দূরেই। সাঁতরেই চলে যাবে। কি কষ্টে যে তাকে আটকে রাখলাম তিনজনে, সে আমিই জানি। ঘণ্টা দু-তিন কাটল এই রকম ধস্তাধস্তির মধ্যে। তারপর পার্কার যখন সত্যিই বুঝল যে ডাঙা নয়-চোখের ভুল-তখন বাচ্চা ছেলের মত হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আর ফোঁপাতে ফোঁপাতে গুটিয়ে পড়ল ডেকে। ঘুমিয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ। ধকল সইবার মত একবিন্দু ক্ষমতাও যে ছিল না শরীরে, এই ঘটনা থেকেই তা বুঝলাম।

চামড়া চিবানোর চেষ্টা করেছিল পিটার্স আর অগাস্টাস। কিন্তু এমনই কাহিল যে চিবোতেও পারেনি। থু থু করে ফেলে দিতে বলেছিলাম। নিজেও তাই করেছিলাম। কষ্ট একটু কমালেও তেষ্টার কষ্ট আর সহ্য করতে পারছিলাম না। তিন সঙ্গীর অবস্থায় যাতে না পড়তে হয়, তাই সমুদ্রের জলও পান করিনি। অতি কষ্টে সামলে রেখেছিলাম নিজেকে তেষ্টায় প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়া সত্ত্বেও। কষ্ট সওয়া যায়-কিন্তু পিটার্স আর অগাস্টাসের মত ভয়ানক অবস্থাই পড়তে রাজি নই কোনমতেই। স্রেফ মনের জোরেই ধাতস্থ ছিলাম অকথনীয় ঐ দুর্দশার মধ্যে।

এইভাবেই গড়িয়ে গেল দিনটা। আচমকা পূর্বদিকে দেখতে পেলাম একটা জাহাজের পাল। আসছে আমাদের দিকেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পালই বটে। মরীচিকা নয়-সত্যিই একটা জাহাজ!

কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি চোখ দুটোকে। পাছে আশার ছলনায় ভুলে মুমূর্ষু তিন সঙ্গীকে খামোকা উত্তেজনার মধ্যে টেনে অবস্থাটা আরো ঘোরালো করে তুলি, সেই ভয়ে ওদেরকে কিছু না জানিয়ে অপলকে চেয়েছিলাম সেই দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ পড়ে যখন বুঝলাম, চক্ষুভ্রম নয়-সত্যিই জাহাজ-ধরাশায়ী তিন সঙ্গীকে জানালাম ব্যাপারটা।

তড়াক করে তিনজনেই লাফিয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল উন্মাদের মত নৃত্য, হাত-পা ছোঁড়া, ডেকে গড়াগড়ি দেওয়া, হাসি আর কান্নায় মিলিত অট্টরোল। সংক্রামিত হয়েছিলাম আমি নিজেও। আমিও হেসেছি, কেঁদেছি, গড়াগড়ি

দিয়েছি, লাফিয়েছি, নেচেছি।

তারপরেই যখন দেখলাম, জাহাজের পেছন দিকটা রয়েছে আমাদের দিকে এবং দূরত্ব ক্রমশ বেড়েই চলেছে গ্র্যাম্‌পাস আর সেই অজ্ঞাত জাহাজের মধ্যে-তখন যে মানসিক অবস্থায় পৌঁছেছিলাম, তা লিখে বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা আর করব না। এতক্ষণ চুল ছিঁড়েছিলাম, ডেকে পা ঠুকেছিলাম, ঈশ্বরের বন্দনা করেছিলাম চারজনেই ; ঠিক উল্টোটা ঘটল অকস্মাৎ।

থ হয়ে গেলাম প্রত্যেকেই। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াল অগাস্টাসের ; জাহাজটা যে দূরে চলে যাচ্ছে, কিছুতেই তা বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি। জাহাজ এসে পড়ল বলে, সুতরাং জিনিসপত্র গোছগাছ করার জন্যে সে কি ব্যাকুলতা। গ্র্যাম্‌পাসের কিছুদূর দিয়ে জলজ উদ্ভিদ ভেসে যাচ্ছিল। ও ভাবলে, নৌকো আসছে ওকে তুলে নিতে। জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আর কি-আমি একা গায়ের জোরে ওকে জাপটে ধরে আটকে রাখলাম ডেকের ওপর। সে কী কান্না আর বিকট আর্তনাদ অগাস্টাসের। মাথা ঠিক রেখেছিলাম কি করে, আজও তা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যাই।

একটু একটু করে ধাতস্থ হলাম প্রত্যেকেই। আশার ছলনে ভুলিয়ে অজ্ঞাত জাহাজ একসময়ে মিলিয়ে গেল দূর দিগন্তে।

আর ঠিক তখনি, আচমকা আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল পার্কার। মুখের ভাব দেখে শিউরে উঠল পা থেকে মাথা পর্যন্ত। এরকম সংযত, ধাতস্থ, ধীর, সংকল্পকঠিন মুখচ্ছবি আমি ওর মধ্যে কখনো দেখিনি। ও যে কি বলতে চায়, তা ঠোঁট নাড়ার আগেই বুঝে ফেলেছিলাম তৎক্ষণাৎ। হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠেছিল সেই কারণেই।

খুব সংক্ষেপে, মাত্র দু-চার কথায়, মনোভাব ব্যক্ত করেছিল পার্কার।

চারজনের মধ্যে একজনের মরা দরকার বাকি তিনজনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে!

১২

পরিস্থিতিটা শেষ পর্যন্ত যে এই রকম লোমহর্ষক হয়ে দাঁড়াবে, বেশ কিছুদিন ধরেই তা আঁচ করেছিলাম। মনকে শক্ত করে রেখেছিলাম, কোনমতেই এই ভয়ঙ্কর পন্থাকে বরদাস্ত করব না। বীভৎস মৃত্যু আসে আসুক, না খেয়ে মরি তাও ভাল-কিন্তু নরমাংস খেয়ে যেন জীবনটাকে টিকিয়ে রাখতে না হয়। এই যে এত কষ্ট পাচ্ছি খিদের যন্ত্রণায়, অসহ্য সেই যন্ত্রণাও আমার গোপন সংকল্পকে টলাতে পারেনি। পার্কারের প্রস্তাব পিটার্স বা অগাস্টাসের কানে যায়নি। তাই ওকে টেনে নিয়ে গেলাম একপাশে। ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বোঝালাম, নারকীয় এই মতলব যেন মাথা থেকে তাড়ায়। কাকুতি-মিনতি করে বলেছি, পার্কারের

কাছে যা কিছু পবিত্র সেই সব কিছুরই নামে দিব্যি দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছি-কখখনো না, কখখনো না-এ প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করা তো দূরের কথা-পিটার্স বা অগাস্টাসের কানেও যেন তোলা না হয়।

যুক্তি, অনুরোধ, কাকুতি-মিনতি, ঈশ্বরের নামে দিব্যি-সবই নীরবে শুনে গেছিল পার্কার। একদম কথা বলেনি। আমি চুপ করতেই বললে, খামোকা মুখ ব্যথা করছি কেন? শেষের এই ভয়ানক পন্থাটা যে কতখানি জঘন্য আর নৃশংস, তা কি তার জানা নেই? কিন্তু স্থির মস্তিষ্কে সে এই নিয়ে ভেবেছে অজ্ঞাত জাহাজটা দেখা দেওয়ার অনেক আগে থেকেই। হঠাৎ জাহাজ এসে পড়ায় বলবার সুযোগ পায়নি। যা বাস্তব, তা মেনে নেওয়ায় ভাল। না খেয়ে চারজনের মরার চাইতে তিনজনের অন্তত বেঁচে থাকা ভাল চতুর্থজনের মাংসে পেট ভরিয়ে।

আমি তখন বলেছিলাম, বেশ তো, আর একটা দিন দেখা যাক না কেন। নিশ্চয় আর একটা জাহাজ দেখা যাবে। পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। এতদিন যখন না খেয়ে থাকা গেছে, আর একটা দিনও চালিয়ে দেওয়া যাবে।

পার্কার বললে না, আর সম্ভব নয়। সহ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত মুখ বুঁজে থেকেছে সে। আর একটা দিনও না খেয়ে থাকা সম্ভব নয়। কাজটা ভয়াবহ, ভয়াবহ বলেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুখে বলেনি। শেষ মুহূর্ত যখন এসে গেছে, আর সবুর করা যায় না।

এতক্ষণ শুধু পায়ে পড়তে বাকি রেখেছি, ভিক্ষে চাওয়ার মত সুরে কথা বলেছি। কিন্তু ভবি ভোলবার নয় দেখে, সুর পাল্টালাম। কড়া গলায় বলেছিলাম, 'পার্কার, পিটার্স বা অগাস্টাস-এই তিনজনের চেয়ে কম ধকল সইতে হয়েছে আমাকে-এখন আমার স্বাস্থ্য আর শক্তি তিন জনের চাইতে সেই কারণে অনেক বেশি।' ভাল কথায় যদি কাজ না হয়, গায়ের জোরে তা হাসিল করব। নরমাংস খাওয়ার সাধ জন্মের মত মিটিয়ে দেব পার্কারকে জলে ফেলে দিয়ে।

মুখ থেকে কথাটা খসতে না খসতেই পার্কার একহাতে আমার টুঁটি খামচে ধরে আর একহাতে ছুরি বসিয়ে দিতে গেছিল আমার বুকে-একবার নয় বারবার। কিন্তু পারেনি কোনবারেই। গায়ে জোর থাকলে তো লক্ষ্য স্থির থাকবে! প্রতিবারই কোপ এড়িয়ে গেছিলাম আমি এবং দারুণ ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেছিল ডেকের ওপর।

দৌড়ে এল পিটার্স। ছাড়িয়ে দিল দুজনকে। জানতে চাইল কি ব্যাপার। পার্কারের মুখ বন্ধ করার সুযোগই পেলাম না। তড়বড় করে অভিপ্রায়টা পিটার্সের কাছে বলে ফেলল পার্কার।

ফলটা হল আরও মারাত্মক-আমি যা ভেবেছিলাম তার চাইতেও সাংঘাতিক। পিটার্স আর অগাস্টাস দুজনেই নাকি

জঘন্য পরিকল্পনাটা মাথার মধ্যে পোষণ করে এসেছে বেশ কয়েকদিন ধরে-পার্কারই প্রথম তা মুখে বলে ফেলেছে !

আশা করেছিলাম পিটার্স আর অগাস্টাসের দুজনের একজন অন্তত আমার পক্ষ নেবে। দুজনের একজনের মাথায় অন্তত এই নারকীয় চিন্তার ঠাঁই হবে না। কিন্তু এখন তো দেখছি সব শেয়ালেরই এক ডাক। এখন যদি জোরজবরদস্তি করতে যাই তো ভয়াবহ নাটকটা অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে এখুনি !

কাজেই নরম হতে বাধ্য হলাম। আরও একটা ঘণ্টা সময় চাইলাম। জোর হাওয়া বইছে দেখাই তো যাচ্ছে, কুয়াশা সরে যাবে এক ঘণ্টার মধ্যেই। দেখাই যাক না তারপর কোন জাহাজ দেখা যায় কিনা।

কেটে গেল এক ঘণ্টা। কুয়াশাও সরে গেল। কিন্তু জাহাজ দেখা গেল না। নিরুপায় হয়ে তখন প্রস্তুত হলাম লটারি করে নিজের অথবা সঙ্গীদের যে কোন একজনের প্রাণহননের জন্যে।

নৃশংসতম সেই লটারীর ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে সারব। নিরতিশয় বেদনাদায়ক সেই স্মৃতিকে নতুন করে ফিরিয়ে আনতে চাই না দীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে দিয়ে। ভার পড়েছিল আমার ওপরেই। আমাকেই চারটে ছোট বড় কাঠের কুচি হাতে করে নিয়ে দাঁড়াতে হবে তিন সঙ্গীর সামনে-চোখ বন্ধ করে। ওরা একে একে টেনে নেবে একটা কাঠি-সবচাইতে ছোট কাঠিটা পড়বে যার হাতে-নিহত হতে হবে তাকেই।

ওরা তিনজনে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল কিছু দূরে। আমি কাঠ কেটে কাঠি সাজাচ্ছিলাম একধারে। বেশি সময় লাগে না এ কাজে। কিন্তু আমার তীব্র অনিচ্ছাই বাধা করছিল সময় নেওয়ার। দেহের প্রতিটি অণু পরমাণু বিদ্রোহী হলে কি সেই কাজ করা যায় ? যা আমি কখনোই চায় না-তা-ই হতে চলেছে আমারই হাত দিয়ে। কাঠি সাজাতে সাজাতে তাই ভাবছিলাম কিভাবে ভয়াল নাটকটাকে এড়ানো যায়। এত বিপদ পেরিয়ে এলাম এটাকে পারব না ? কাঠ চিরছি আর দ্রুত বেগে মনে মনে হাজারখানেক উদ্ভট ফন্দী এঁটে চলেছি। কিন্তু সম্ভবপর নয় কোনটাই।

উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে ওরা তিনজন পেছন ফিরেই দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। একবার ভাবলাম নিঃশব্দে ছুটে গিয়ে খতম করে দিই একজনাকে-লটারীর মত জঘন্য কাজটার হাত থেকে তো নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। কিন্তু ভাবনা চিন্তার অবসান ঘটাল পার্কার। আর কত দেরি ? উদ্বেগ যে আর সহ্য হচ্ছে না। পেছন ফিরে থেকেই হুঙ্কার ছেড়েছিল পার্কার।

বুক ফেটে গিয়েছিল যেন আমার-ছোট বড় কাঠ চারখানা হাতে করে এগিয়ে যাওয়ার সময়ে। দাঁড়িয়েছিলাম ওদের সামনে।

নিমেষে একটা কাঠ টেনে নিয়েছিল পিটার্স। ছোট কাঠ সেটা নয়। তাই বেঁচে গেল। তারপরেই ফস করে আর একটা কাঠ টেনে নিল অগাস্টাস। সেটাও ছোট কাঠ নয়। বেঁচে গেল সে-ও। বুক ধড়াশ ধড়াশ করতে লাগল আমার। সীমাহীন ঘৃণা পুঞ্জিত হল উৎকণ্ঠায় ফেটে পড়া বুকখানার মধ্যে-ঘৃণার অনলে পুড়িয়ে দিতে চাইলাম পার্কারকে! তার জন্যেই এই বিকট লটারি। শেষ মুহূর্তেও ভাগ্য গণনা হতে চলেছে এখন আমার আর তার মধ্যেই। বাকি আছে আর মাত্র দুখানা কাঠ। সবচেয়ে ছোট কাঠটা এখন যার ভাগ্যে পড়বে-ছুরি বসে যাবে তারই বুকে!

উঃ সে কি যন্ত্রণা মনের মধ্যে। চোখ বন্ধ করে হাত বাড়িয়ে ধরেছিলাম। হয় আমি, নয় পার্কার-এই দুজনের মাংসে এখুনি উদর তৃপ্ত হবে জীবিত তিনজনের। কিন্তু এত সময় নিচ্ছে কেন পার্কার? এক ঝটকায় যে কোন একটা কাঠ টেনে নিচ্ছে না কেন?

আচমকা হাতের ফাঁক থেকে বেরিয়ে গেল এক টুকরো কাঠ-বাকি কাঠটা রয়ে গেল আমার হাতের মধ্যেই।

কিন্তু চোখ খুললাম না। সাহস হল না। জানি না ছোট কাঠটাই রয়ে গেল কিনা হাতের মধ্যে।

কিছুক্ষণ অসহ্য নীরবতা। কথা বলছে না কেউই। চোখ বন্ধ করে আছি আমি। তারপর পিটার্সের গলা শুনলাম। চোখ খুলতে বলছে আমাকে-ছোট কাঠটাই তুলেছে পার্কার।

বেঁচে গেছি আমি।

উদ্বেগের আকস্মিক অবসান যে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে যায় স্নায়ুমণ্ডলীকে, সেদিন তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলাম, জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলাম ডেকে।

জ্ঞান ফিরে এসেছিল নারকীয় হত্যাকাণ্ডটা অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই। যার প্ররোচনায় এই নৃশংস লটারী এবং বলিদান পর্বের ... না-মরতে হল তাকে আমারই সামনে। তিলমাত্র বাধা দেয়নি পার্কার। পিটার্স লম্বা ছুরিখানা ঢুকিয়ে দিয়েছিল হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পিঠের দিক থেকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণহীন দেহটা আছড়ে পড়েছিল ডেকে।

তারপর যা ঘটেছিল, তা আর ফেনিয়ে বলে লাভ আছে কি? উষ্ণ রক্তে তেষ্টা মেটানোর পর ওর হাত, পা, মাথা আর নাড়িভুঁড়ি জলে ফেলে দিয়েছিলাম। বাকি মাংস তিনজনে মিলে খেয়েছিলাম সেই মাসের স্মরণীয় সতের, আঠার, উনিশ এবং বিশ তারিখে।

উনিশ তারিখে মিনিট পনেরো কুড়ির মত বৃষ্টি হয়েছিল। বৃষ্টির জল ধরে রেখেছিলাম বিছানার চাদরে। ঝড়ের পর কেবিন থেকে টেনে তুলেছিলাম চাদরটা। আধ গ্যালনের বেশি জল ধরতে পারিনি। কিন্তু নামমাত্র ঐ জলেই রীতিমত শক্তি আর আশার

সঞ্চার ঘটেছিল শরীর এবং মনে।

একুশ তারিখে আবার নরমাংস খাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে-উত্তর থেকে পশ্চিমে।

বিরসবদনে তিনজনে বসেছিলাম ডেকে। সেদিন ছিল বাইশ তারিখ। খিদের আগুন জ্বলছে পেটে। হঠাৎ একটা প্ল্যান এল আমার মাথায়।

মনে পড়ে গেল, প্রথম যেদিন মাস্তুল কাটা হয়, সেদিন একটা কুঠার লুকিয়ে এনে পিটার্স আমাকে দিয়েছিল রেখে দেওয়ার জন্যে-পরে কাজে লাগলেও লাগতে পারে। জাহাজ যখন জলে ভর্তি হয়ে থই থই করছে, কুঠারটাকে আমি এনে রেখেছিলাম সামনের ডেকের নীচে একটা বার্থে। ভেবে দেখলাম, এই কুড়ুল দিয়েই তো ভাঁড়ার ঘরের ওপরকার ডেকের পাটাতন কেটে ভাঁড়ার লুঠ করতে পারি।

ভাগ্য সহায় না হলে এত সহজে কুড়ুল পুনরুদ্ধার করতে পারতাম না। যে বার্থে রেখেছিলাম শেষ ভরসা এই বস্তুটিকে, তা জলে ডুবে থাকলেও খুব একটা নীচে ছিল না। কোমরে দড়ি বেঁধে আমিই নেমে গেছিলাম। বেশি সময় লাগেনি। ফিরে এসেছিলাম একটু পরেই। আনন্দে ফেটে পড়েছিল পিটার্স আর অগাস্টাস।

ডেক কাটা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। কুড়ুল চালানোর মত শক্তি ছিল না অগাস্টাসের জখম হাতে। আমাকে আর পিটার্সকেই মেহনত করতে হয়েছে। যত সহজ ভেবেছিলাম, দেখলাম, কাজটা তত সোজা নয়। চাঁদের আলোয় সারা রাত কাঠ কুপিয়ে একজনের গলে যাওয়ার মত ফুটো সৃষ্টি করতে পারলাম পাটাতনে। সেদিন ছিল তেইশ তারিখ।

আর কি সবুর করা যায়? ভোরের আলোয় কোমরে দড়ি বেঁধে ঝপাং করে ডুব দিল পিটার্স। উঠে এল এক বোতল অলিভ নিয়ে। ভাগাভাগি করে খেলাম তিনজনে। বেশ বল পেলাম শরীরে। একটু জিরিয়ে নিয়েই আবার ডুব দিল পিটার্স। কি কপাল! এবার উঠে এল এক বোতল মাদিরা মদ আর বেশ খানিকটা শুকর মাংস নিয়ে। হাড়ের কাছে পাউণ্ড দুই মাংস ছাড়া বাকি নষ্ট হয়ে গেছিল সমুদ্রের জলে। সেইটুকুই সমান ভাগ করে নিলাম তিনজনে। আমি খেলাম একটু একটু করে-পাছে তেষ্টায় প্রাণ আইঢাই করে। সুরাপানও করলাম অল্পমাত্রায়-কদিন আগের অভিজ্ঞতাটা ভুলতে পারিনি। যদি নেশায় পেয়ে বসে তো গেছি। পিটার্স আর অগাস্টাস কিন্তু মাংস খেল গোগ্রাসে। তারপর তিনজনেই বিশ্রাম নিলাম বেশ কিছুক্ষণ। পরিশ্রমটা তো কম হয়নি-কাহিল শরীর আর সইতে পারছিল না।

দুপুর নাগাদ আবার আরম্ভ হল ভাঁড়ার তল্লাসি-চলল সূর্যাস্ত

পর্যন্ত। আমি আর পিটার্সই পর্যায়ক্রমে ডুব দিলাম জলভর্তি ভাঁড়ারে। একে একে তুলে আনলাম চার বয়েম অলিভ, আর এক খণ্ড শূকর মাংস, একটা বড় কারবয়ভর্তি তিন গ্যালন মাদিরা মদ। সবচেয়ে উল্লসিত হলাম ছোটখাট একটা কচ্ছপ পেয়ে। গ্যালিপাগো জাতের কচ্ছপ। ক্যাপ্টেন বার্ণার্ড মেরী পিটস জাহাজ থেকে বেশ কয়েকটা জোগাড় করে রেখেছিলেন গ্র্যামপাসে। মেরী পিটস প্রশান্ত মহাসাগর থেকে সদ্য এসেছিল বলেই বিশেষ এই জাতের কচ্ছপ দেদারে ছিল সেই জাহাজে।

বিশেষ এই জাতের কচ্ছপের উল্লেখ বেশ কয়েকবার থাকবে আমার এই কাহিনীতে। গ্যালিপাগোস দ্বীপপুঞ্জের নাম রাখা হয়েছে এই কচ্ছপের নাম থেকেই—অনেকেই নিশ্চয় তা জানেন। আকারে এরা বদখত এবং বিরাট। গলাখানা কাঁধ থেকে মাথা পর্যন্ত তিন ফুট পর্যন্ত হয়। ওজন হয় বারশ তেকে পনেরশ পাউণ্ড পর্যন্ত, মাটি থেকে এক ফুট উঁচুতে দেহ তুলে হাঁটে অত্যন্ত আস্তে, থপথপ করে। মুণ্ডটা দেখতে অবিকল সাপের মাথার মত। ঘাড়ের কাছে একটা থলিতে জমা থাকে টাটকা জল-দেহভর্তি চর্বি। ফলে, বছর দুয়েক না খাইয়ে জাহাজে ফেলে রেখেও দেখা গেছে বহাল তবিয়তে টিঁকে আছে প্রতিটা কচ্ছপ। সমুদ্র অভিযানে যারা যায় খাবারের আর জলের অভাব দেখা দিলে তাদের প্রাণ বাঁচায় এই জাতের কচ্ছপ। এদের খাদ্য শাক, সবজি, গাছপালা; আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ।

আমরা যে কচ্ছপটাকে তুলে আনলাম, তার ওজন পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর পাউণ্ডের বেশি নয়। তুলতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেছিল পিটার্স, আর একটু হলেই পাঙ্গাত হাত ফস্কে। অগাস্টাস বুদ্ধি করে লম্বা গলায় দড়ির ফাঁস পড়িয়ে এঁটে ধরতেই হেঁইও হেঁইও করে দুজনে মিলে তাকে টেনে তুললাম সরু ফোকরটার মধ্যে দিয়ে। পেছন থেকে পিটার্স ঠেলে না ধরলে তাও পারতাম কিনা সন্দেহ। মনে আছে নিশ্চয়, কেবিন থেকে একটা জগ উদ্ধার করেছিলাম। কচ্ছপের ঘাড়ের থলি থেকে জল সংগ্রহ করে রাখলাম জগের মধ্যে। বোতলটার ঘাড় ভেঙে গেলাস করে নিলাম। জগ থেকে গেলাসে একটু একটু করে ঢেলে পান করলাম সেই জল। অল্প করে খেলাম শূকর মাংস, অলিভ আর মদ। কচ্ছপটাকে মারলাম না। পাছে পালিয়ে যায়, তাই বেঁধে রাখলাম চরকি কলে। বাতাস বেশ শুকনো থাকায় কেবিন থেকে বিছানা তুলে এনে শুকিয়ে নিয়ে ডেকে পেতে ঘুমোলাম পরম আরামে।

এইভাবে গেল দুটো তিনটে দিন।

১৩

চব্বিশে জুলাই সকালটা শুরু হয়েছিল ভালই। ঝকঝকে

আকাশ আর ফুরফুরে হাওয়ায় মেজাজ শরীফ প্রত্যেকেরই। খাবার যা আছে, তাতে টেনেটুনে দিন পনের চলে যাবে। জল একেবারে নেই।

দুপুর নাগাদ হঠাৎ একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল–সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকানি। তাড়াতাড়ি চাদর বিছিয়ে বৃষ্টির জল ধরে জগে ঢালছি, এমন সময়ে ঝড় উঠল। দেখতে দেখতে ক্ষ্যাপা মোষের মত এমনভাবে তেড়ে এল প্রচণ্ড প্রভঞ্জন যে ভীষণভাবে ফের দুলতে লাগল জাহাজ। ভয়ের চোটে চাদর নিরাপদ জায়গায় রেখে ভাঙাচোরা চরকিকলের সঙ্গে বেঁধে ফেললাম নিজেদের। সারারাত গেল এইভাবে। পাহাড়প্রমাণ জল বারবার ধেয়ে গেল ভাঙাচোরা জাহাজের ওপর দিয়ে। আবহাওয়া গরম ছিল বলে জলও উষ্ণ ছিল। সারারাত জলে ভিজেও তাই শীতে হি-হি করে কেঁপে মরিনি।

পঁচিশে জুলাই।–সকালের দিকে আবহাওয়া ভালই। ঝড়ের তেজ আর নেই। কিন্তু বেজায় মুষড়ে পড়লাম যখন দেখলাম অত করে বেঁধে রাখা সত্ত্বেও অলিভের দুটো বয়েম আর সমস্ত মাংস ভেসে গেছে জলের দাপাদাপিতে। কি আর করা যায়, সামান্য অলিভ আর মদের সঙ্গে একটু জল মিশিয়ে খেলাম ব্রেকফাস্ট। নির্জলা মদ খাওয়ার সাহস হল না কারুরই। কচ্ছপটাকে তখুনি আর মারলাম না। আরও কিছুদিন রেখে দেওয়া যাক। দেখলাম, খোলের মধ্যে থেকে অনেক অদরকারী জিনিস আপনা থেকেই ওপরে ভেসে উঠে চলে যাচ্ছে সমুদ্রে। কোমরে দড়ি বেঁধে নামবার মত অবস্থা এখন নয়। সভয়ে লক্ষ্য করলাম, জাহাজের ডেক জল থেকে আগে যতটা উঁচুতে ছিল, এখন আর ততটা উঁচুতে নেই–জলের সমান সমান বললেই চলে। বড় বড় ঢেউ ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে ডেকের এক একদিক। ঠিক এই সময়ে রক্ত হিম হয়ে গেল কতকগুলো হাঙরকে জাহাজ ঘিরে চর্কিপাক দিতে দেখে। যেন তক্কে তক্কে রয়েছে হারামজাদারা। আর বেশি দেরি যেন করতে হবে না। ভীষণ দমে গেলাম। এক শয়তানের বুকের পাটা একটু বেশিই বলতে হবে। একটা ঢেউ ডেকের ওপর আছড়ে পড়তেই ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আছড়ে পড়েছিল ডেকে-হ্যাচের কাছেই। ঢেউ চলে যেতেই সে কি তড়পানি! ছটফটিয়ে ল্যাজ দিয়ে সপাং করে এক ঘা মেরেই বসল পিটার্সকে। ভাগ্যিস আর একটা ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল হারামজাদাকে, নইলে আমাদের হাতেই খতম হয়ে যেত বাছাধন।

দুপুরে দেখলাম সূর্য মাথার ওপর। অর্থাৎ, নিরক্ষীয় অঞ্চলের কাছাকাছি এসে গেছি ঝড়ের চক্রান্তে।

ছাব্বিশে জুলাই।–বরাত খারাপ। হাওয়ার বেগ কমেছে, জলের দাপাদাপিও কমেছে। সেই সুযোগে ভাঁড়ার ঘরে ডুব দিয়ে খাবার তুলে আনতে গিয়ে দেখলাম সর্বনাশ হয়েছে। গত রাতে

ভাঁড়ার ঘরের প্যার্টিশন ধসে যাওয়ায় খাবারদাবার সব ভেসে গেছে খোলের মধ্যে। ভাঁড়ার একদম খালি।

সাতাশে জুলাই।–সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, হাওয়া নেই। বিকেল নাগাদ জামাকাপড় খুলে শুকিয়ে নিয়ে ফের পরলাম। অনেকটা আরাম পেলাম। তেষ্টার কষ্ট কমল সমুদ্রস্নান করার পর। বেশি দূর যেতে অবশ্য সাহস কুলাল না। বেশ কয়েটা হাঙর দূরে দূরে পাহারা দিয়ে চলেছে ডুবু ডুবু জাহাজকে ঘিরে।

আটাশে জুলাই।–হাওয়া নেই ঠিকই, ঢেউয়ের দাপটও নেই–কিন্তু ডেক আর সমুদ্র প্রায় সমান সমান অবস্থায় এসে গেছে। যে কোন মুহূর্তে গ্র্যামপাস উল্টে যেতে পারে। হুঁশিয়ার হলাম। অলিভের বাকি দুটো বয়েম, জলের জগ আর কচ্ছপটাকে নিরাপদ জায়গায় বেঁধে রাখলাম।

উনত্রিশে জুলাই।–আবহাওয়া একই রকম। পচন ধরেছে অগাস্টাসের ক্ষতগুলোয়। ঘুম ঘুম পাচ্ছে, খুব বেশি তেষ্টা পাচ্ছে–কিন্তু তীব্র বেদনাবোধ নেই। অলিভের বয়েম থেকে ভিনিগার নিয়ে ক্ষত মালিশ করে দিয়েও খুব একটা আরাম দিতে পারলাম না। জলের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিলাম তিনগুণ।

তিরিশে জুলাই।–হাওয়া একেবারে নেই–দারুণ গরম। বিরাট একটা হাঙর খোলের কাছেই সাঁতরাচ্ছে দেখে ফাঁস দিয়ে ধরবার চেষ্টা করেছিলাম। অগাস্টাসের অবস্থা শোচনীয়। কাৎরাচ্ছে। মৃত্যু কামনা করছে। অলিভ শেষ। খাবার আর নেই। জল যেটুকু ছিল, তা এমনই দুর্গন্ধ যে মদ মিশিয়ে গিলতে হল। কচ্ছপটাকে না মারলেই আর নয়। কাল সকালেই মারব।

একত্রিশে জুলাই।–ডেক আর সমুদ্র একেবারেই সমান সমান হয়ে যাওয়ায় বড় উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় কেটেছে রাতটা। ভোর হতেই মারলাম কচ্ছপটাকে। মাত্র পাউণ্ড দশেক মাংস পেলাম–যতটা ভেবেছিলাম, ততটা নয়। ফালি ফালি করলাম সেই মাংস। অলিভের বয়েম আর মদের বোতল খালি হয়ে গেলেও ফেলে দিইনি। তিন পাউণ্ড মাংস ভিনিগারে ভিজিয়ে রেখে দিলাম তার মধ্যে। ঠিক করলাম, বাকি সাত পাউণ্ড মাংস ফুরিয়ে গেলেও ঐ মাংসে হাত দেব না। রোজ চার আউন্স করে খেলে তের দিন চলে যাবে।

সন্ধের ঠিক আগে বজ্রবিদ্যুৎসহ একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তেরপল মেলে ধরে আধ বোতলের বেশি জল ধরতে পারলাম না। সবটুকুই দিলাম অগাস্টাসকে। ওর মুখের ওপর চাদর মেলে ধরেছিলাম, মাঝখান থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়েছিল ওর মুখে। জল ধরে রাখার পাত্র তো নেই। মদের কারবয় আর দুর্গন্ধ জলের জগ খালি করতাম যদি বৃষ্টি আর কিছুক্ষণ হত। অত করে জল খাইয়েও অগাস্টাসের কষ্টের উপশম ঘটেনি। কাঁধ থেকে কব্জি পর্যন্ত কালো হয়ে গেছে। ন্যানটাকেট থেকে বেরিয়েছিল একশ

সাতাশ পাউণ্ড ওজন নিয়ে, এখন ওর ওজন বড় জোর চল্লিশ কি পঞ্চাশ পাউণ্ড। চোখ কোটরে ঢুকে গেছে। গালের চামড়া এমনভাবে ঝুলছে যে খাবার বা জল খেতেও পারছে না।

পয়লা আগস্ট।–আবহাওয়া একইরকম শান্ত। সূর্যের তেজ আর সহ্য হচ্ছে না! গুমোট গরম। অসহ্য তেষ্টা। জগের জলে পোকা কিলবিল করছে, দুর্গন্ধে মুখে তোলা যায় না। তাই খেলাম একটু করে মদ মিশিয়ে। আরাম পেলাম কিছুক্ষণ বাদে বাদে সমুদ্র স্নান করে। ঘন ঘন স্নান করতে পারলাম না হাঙরের ভয়ে। বিরামবিহীনভাবে জাহাজ ঘিরে টহল দিচ্ছে শয়তানের বাচ্চারা। অগাস্টাসের অবস্থা অতীব শোচনীয়। শেষ অবস্থা। মরতে বসেছে। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে–চোখে দেখা যায় না। শেষ নিঃশ্বাস ফেলল দুপুর বারোটা নাগাদ। বুক ভেঙে গেল দুজনেরই। মড়া ঘিরে নিস্পন্দদেহে চুপচাপ বসে রইলাম সারাদিন। ফিসফিস করে দুএকটা কথা বললাম বটে, কিন্তু তা পাঁজর ভাঙা হাহাকার ছাড়া কিছুই নয়। সন্ধে হল। তারও কিছুক্ষণ পর পিটার্স উঠে পাঁজাকোলা করে মড়া তুলে ফেলতে গেল জলে। অবর্ণনীয়ভাবে পচে গলে গিয়েছিল দেহটা। একটা গোটা পা খসে পড়ে গেল ডেকে। জলে ফেলে দিতেই তোলপাড় করে ছুটে এল আট দশটা বিরাট হাঙর। ফসফরাসের বিশেষ দ্যুতিতে দেখলাম বিশাল চোয়ালের ঝকঝকে দাঁতের সারিতে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে গলিত কদাকার মৃতদেহ। বিকট চোয়াল বন্ধ হওয়ার মুহুর্মুহু প্রচণ্ড শব্দ নিশ্চয় শোনা গিয়েছিল এক মাইল দূর থেকেও। রক্ত হিম হয়ে গেল আমার আর পিটার্সের ভয়াবহ সেই শব্দপরম্পরা শুনে।

দোসরা আগস্ট।–আবহাওয়া একই রকম ভয় ধরানো প্রশান্ত। গরমে প্রাণ আইঢাই করছে। ভোর যখন হল, তখন নিঃসীম নৈরাশ্য আর শারীরিক অবসাদে একেবারেই ভেঙে পড়েছি। জগের জল আর খাওয়া যায় না। থকথকে আঠার মত হয়ে গেছে। পোকা আর পাঁকের সংমিশ্রণ। ফেলে দিলাম সমুদ্রে। কচ্ছপের আচার থেকে একটু ভিনিগার ঢেলে জগ ধুয়ে নিলাম সমুদ্রের জলে। তেষ্টা আর সইতে পারছি না। মদ খেয়ে তেষ্টা মেটাতে গিয়ে বিপরীত হল। আগুনে ঘি পড়ল যেন। ভীষণ মাতাল হয়ে গেলাম। তারপর চেষ্টা করেছিলাম নোনা জল মিশিয়ে মদ খাওয়ার। ফলটা হল মারাত্মক। ভয়ানক উকি উঠতে লাগল। এ চেষ্টা আর করিনি। সারাদিন ধরে বৃথাই সুযোগ খুঁজেছি সমুদ্রস্নানের। খোল ঘিরে থুকথুক করছে হাঙরের দল। কাল রাতে অগাস্টাসের পচা দেহটা যারা পেটে পুরেছে, তারাও নিশ্চয় আছে এই দলে। রাক্ষুসে খিদের অবসান ঘটাতে চায় আমাদের দিয়ে। বুক দমে গেল, ভীষণ দমে রইলাম। সমুদ্রস্নান করে যে কি আরাম পেয়েছিলাম, তা ভাষায় বোঝানো যায় না।

সমুদ্রদানবদের উপস্থিতিতে সে পথও বন্ধ। ডেকে থেকেও বিপদের মধ্যে রয়েছি। একটু পা হড়কালেই বা নড়াচড়া করলেই জলে গিয়ে পড়ব। রাক্ষুসে মাছেদের পেটে চলে যাব চক্ষের নিমেষে। চেঁচিয়ে, হাত-পা ছুঁড়েও ভয় দেখাতে পারছি না মূর্তিমান শয়তানগুলোকে। উল্টে তেড়ে আসছে ডেকের ওপরেই। সবচেয়ে বড় একটা হাঙর এত কাছে চলে এসেছিল যে কুড়ুল দিয়ে ঘচাং করে কোপ মেরেছিল পিটার্স। ছিটকে চলে যাওয়া দূরে থাক, জখম হয়েও পিটার্সকে ঠেলে নামিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল জলের মধ্যে। সন্ধে নাগাদ মেঘ ঘনাল মাথার ওপর। কিন্তু নিরাশ হলাম একটু পরেই মেঘ সরে যাওয়ায়। সেই মুহূর্তের তেষ্টার কষ্ট কেউ কল্পনাতেও আনতে পারবেন না। জেগেই কাটালাম সারারাত-হাঙরদের ভয়ে আর তৃষ্ণার যন্ত্রণায় প্রায় প্রায় পাগল হওয়ার অবস্থায়।

তেসরা আগষ্ট।-কষ্ট লাঘব হওয়ার কোন উপায় তো দেখছি না-সম্ভাবনা একেবারেই নেই। জল আর ডেক এক লেভেলে থাকায় ডেকের ওপর দিয়েই জল চলে যাচ্ছে। মদ আর কচ্ছপের মাংস ভারী শেকল চাপা দিয়ে রেখেও ভয় হল-পাছে ভেসে যায় জাহাজ উল্টে গেলে। দুটো বড় গজাল পুঁতলাম ডেকে-হাতের কাছেই। খাবার-দাবার বেঁধে রাখলাম তাতে। সারাদিন কষ্ট পেয়েছি তেষ্টায়। স্নান করতে পারছি না হাঙরদের ভয়ে। ঘুমোন অসম্ভব।

চৌঠা আগষ্ট।-ভোর হওয়ার একটু আগেই টের পেয়েছিলাম জাহাজ উল্টে যাচ্ছে একটু একটু করে-তলার দিকে চলে আসছে ওপরে-ডেক চলে যাচ্ছে তলায়। হেলছে খুবই আস্তে আস্তে। গজালের সঙ্গে দুগাছা দড়ি বেঁধে রাখলাম হেলে পড়ার সময়ে ধরে থাকব বলে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি উল্টে যাবে ভাবতে পারিনি। আচমকা আমাদের দুজনকেই জলে ঠিকরে দিয়ে জাহাজ একেবারেই উল্টে গেল। আমি তলিয়ে গেলাম বেশ কয়েক ফ্যাদম নিচে। দারুণ অবসন্ন তখন। নিজে থেকে ওপরে ভেসে ওঠার ক্ষমতা নেই। হাল ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রইলাম। কিন্তু মৃত্যু আবার কলা দেখিয়ে গেল আমাকে। হিসেবে আবার ভুল করেছিলাম। অতবড় জাহাজ হঠাৎ উল্টে যাওয়ায় ঘূর্ণিপাকের মত জল পাক খেতে খেতে উঠে যাচ্ছিল ওপর দিকে। তারই টানে চক্ষের নিমেষে ঠিকরে গেলাম জলের ওপর। পিটার্সের চিহ্ন দেখতে পেলাম না। টুকিটাকি অনেক জিনিস ভেসে যাচ্ছিল আশপাশ দিয়ে। তার মধ্যে ছিল একটা বড়সড় তেলের পিপে। হাঁচড়পাঁচড় করে উঠে বসলাম তার ওপর। বেশ জানি হাঙরদের ঘাড়ের ওপরেই যখন ঠিকরে পড়েছি, তারা রয়েছে আমাকে ঘিরে। সেই আতঙ্কেই গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে হাত পা ছুঁড়ে জল ফেনা করে দিয়ে পিপেটাকে নৌকোর মত এগিয়ে নিয়ে গেলাম

উল্টান খোলের দিকে। বিশ গজ দূরেই ছিল ঢালু খোল। নিরাপদেই পৌঁছেছিলাম–জল তোলপাড় করে রেখেছিলাম বলেই হাঙররা দাঁতে কাটতে পারেনি। কিন্তু এমন হেদিয়ে পড়েছিলাম যে ঢালু খোল বেয়ে উঠতে পারছিলাম না। ঠিক এই সময়ে উল্টোদিক দিক থেকে পিটার্স উঠে এল খোলের ওপর। পজালে বাঁধা দড়িটা ছুঁড়েদিলে আমার দিকে। দড়ি খামচে ধরতেই টেনে তুলল আমাকে। পৌঁছলাম আগের চাইতেও উঁচু আর নিরাপদ জায়গায়। অত করে বেঁধে রাখা সত্ত্বেও মদের বোতল আর কচ্ছপের মাংস ভেসে গেছে দেখেও কিন্তু দমে যায়নি। কারণ জাহাজ উল্টে গিয়ে মাসখানের মত খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তলায় লেগে রয়েছে রাশি রাশি গেঁড়ি–বেশ বড় সাইজের।

পিটার্সের পাগলামি আর ছেলেমানুষি ভাবটা কিন্তু আর নেই। চরম দুর্দশায় সুখদুঃখে মানুষ উদাসীন হয়ে যায়। ওর মানসিক অবস্থা এখন সেইরকম। জলের অভাব আরো বেড়েছে। চাদরটা ভেসে যাওয়ায় বৃষ্টির জল ধরে রাখার উপায়ও আর নেই। সার্ট খুলে হাতে রাখলাম। বৃষ্টির জল তাতেই ধরব। তেষ্টায় প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। রাত্রে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছে পিটার্স। আমি ঘুমোতে পারিনি–এত কষ্টে।

পাঁচই আগষ্ট।–আজ ঝিরঝিরে হাওয়ায় আশপাশ দিয়ে ভেসে যেতে দেখলাম বিস্তর জলজ উদ্ভিদ। তার মধ্যে থেকে পেলাম এগারটা বড় সাইজের কাঁকড়া। খোলা বেশ নরম। সবশুদ্ধ খেয়ে নিলাম। দেখলাম, গেঁড়ি খেয়ে তেষ্টা কমেনি–কাঁকড়া খেয়ে তেষ্টা কমেছে। হাঙর বেটাচ্ছেলেদের আর দেখতে না পেয়ে চার পাঁচ ঘণ্টার মত স্নানও করেছি। খুব আরামও পেয়েছি–তেষ্টা অনেক কম। চাঙা হয়ে দুজনেই মোটামুটি আরামে ঘুমিয়েছি রাত্রে।

ছয়াই আগষ্ট।–দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়ে গেল। কারবয় আর জগটা যদি থাকত, জল ভরে রাখতে পারতাম। সার্ট ভিজিয়ে মুখের মধ্যে ভরে তেষ্টা মিটিয়েছি। সারাদিন গেল এই করতে।

সাতই আগষ্ট।–ভোর হতেই পুবদিকে দেখলাম একটা জাহাজের পাল। প্রায় মাইল পনের দূরে। ঢালু খোলের ওপর দাঁড়িয়ে এবং অবসন্ন দেহে যতটা লাফান যায় এবং চেঁচানো যায়, ততটা লাফিয়ে আর গলাবাজি করে জাহাজটার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি। দূর থেকেই দেখেছি জাহাজের পাল আছে, সামনের মাস্তুলে একটা বড় কালো বল রয়েছে। এত দূর থেকে আমাদের দেখতে না পাওয়ারই কথা। সেইজন্যই বোধ হয় এদিকে আসার লক্ষণ দেখা যায়নি। অথবা হয়ত দেখেছে, কিন্তু নিষ্ঠুরভাবেই ফেলে চলে যাচ্ছে। এ ঘটনা সমুদ্রে নতুন নয়। একটা

ঘটনা অন্তত আমার জানা আছে। ১৮১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বোস্টন থেকে রওনা হয়েছিল 'পলি' নামে একটা জাহাজ। ক্যাপ্টেন ছাড়া আটজন ছিল জাহাজে। দিন পনের পরে ঝড়ের পাল্লায় পড়ে জাহাজের তলা ফুটো হয়ে যায়। কিন্তু একেবারে তলিয়ে যায়নি। মাস্তুলটা উঠেছিল জলের ওপর। ছিল খুব সামান্য খাবার দাবার। ঐ অবস্থায় একশ একানব্বই দিন ধরে জাহাজ ভেসে যায়। প্রায় দুহাজার মাইল যাওয়ার পর 'ফেম' নামে একটা জাহাজ উদ্ধার করে দুর্গতদের। দুহাজার মাইল ভেসে আসার সময়ে অন্য কোন জাহাজ একশ একানব্বই দিনেও কি আশপাশ দিয়ে যায়নি? এই প্রশ্নের জবাবে দুর্গতরা বলেছিল, ডজনখানেকেরও বেশি জাহাজ গেছে পাশ দিয়ে। একটা জাহাজ কাছে এসে দেখেও ছিল না খেয়ে মরতে বসেছে ডুব ডুবু জাহাজের মানুষগুলো-কিন্তু জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

এই ভয় হয়েছিল আমারও। মানসিক উৎকণ্ঠা চরমে উঠেছিল। উদ্বেগে অজ্ঞান হয় যাইনি, এটাই আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু হঠাৎ চাঞ্চল্য দেখা গেছিল দূরের জাহাজের ডেকে। পতপত করে মাস্তুলে উঠে গেছিল একটা ব্রিটিশ পতাকা। মুখ ঘুরে গেছিল জাহাজের আমাদের দিকে।

কিছুক্ষণ পরেই ঠাঁই পেয়েছিলাম 'জেন গাই' জাহাজের কেবিনে। লিভারপুল থেকে ক্যাপ্টেন গাই জাহাজ নিয়ে বেরিয়েছিলেন দক্ষিণ সমুদ্রে আর প্রশান্ত মহাসাগরে বাণিজ্য করতে, আর সীলমাছ শিকার করতে।

১৪

'জেন গাই' জাহাজটা দেখতে ছিমছাম হলে কি হবে, বাণিজ্যপোত হওয়ার উপযোগী নয়। গোলাবারুদ কামান যেভাবে থাকা দরকার, তা নেই। ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে ওঠার মত করে গড়া নয়। এতবড় জাহাজ, নাবিক থাকা দরকার পঞ্চাশ থেকে ষাটজন-কিন্তু আদতে আছে মোটে পঁয়ত্রিশজন-ক্যাপ্টেন আর মেট বাদে। সবই চূড়ান্ত অব্যবস্থা।

ক্যাপ্টেন গাই মানুষটা অতিশয় ভদ্রলোক। সমুদ্রঅভিযানে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ। কিন্তু প্রাণশক্তির একটু এভাব আছে। এনার্জি জিনিসটা দুর্গমের অভিযাত্রীদের থাকা দরকার একটু বেশি মাত্রায়।

লিভারপুল থেকে বেরিয়ে এ-দ্বীপ সে-দ্বীপ ঘুরে কারগুয়েলেন দ্বীপপুঞ্জে কেন যে যাচ্ছেন, তা বুঝিনি। 'জেন গাই' জাহাজের আংশিক মালিক তিনি। বাণিজ্যের প্রয়োজনে যেখানে খুশি যাওয়ার অধিকারও তাঁর আছে।

বেশ কয়েকদিন ভালভাবেই কেটেছিল। তারপর এল প্রলয়ঙ্কর ঝড়। লিভারপুল থেকে বেরিয়ে সেই প্রথম। এই অঞ্চলে

এসব ঝড়ের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। হাওয়া আর ঢেউ জাহাজকে নিয়ে লোফালুফি চালিয়ে যাওয়ার পর দক্ষিণ দিকে একটা উজ্জ্বল বিন্দু দেখা যায়। তার মানেই হারিকেন ঝড় আসছে।

সেদিনের সেই ঝড়েও এই পূর্ব সংকেত দিয়ে হারিকেন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল 'জেন গাই'-এর ওপর। কতবার যে ডুবতে ডুবতেও বেঁচে গেল জাহাজখানা, তার বর্ণনা আর নাই বা দিলাম। এর চাইতে ঢের বেশি কষ্ট সয়েছি গ্র্যামপাস জাহাজে-বিশেষ করে উল্টোন খোলে প্রাণ হাতে করে বসে থাকার সময়ে। স্মৃতিটুকুই কেবল আছে, কিন্তু তখনকার সেই উপলব্ধি এখন আর নেই। এইরকম হয় শুনেছি। প্রচণ্ড দুঃখ থেকে সুখের মধ্যে অথবা বিপুল সুখ থেকে দুঃখের মধ্যে হঠাৎ গেলে বিস্মৃতি অধিকার করে মানুষের মনকে। আমার আর পিটার্সের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

কারগুয়েলেন আয়ল্যাণ্ডের আর এক নাম খাঁ-খাঁ দ্বীপ। একেবারে ধু-ধু করছে চারিদিক। ক্যাপ্টেন গাই একজন আত্মীয়কে নিয়ে দ্বীপে গেলেন সঙ্গে শুধু একটা বোতলে ভর্তি চিঠি নিয়ে। সবচেয়ে উঁচু টিলাটার মাথায় বোধ হয় রেখে দেবেন এমন কারো জন্যে যার আসার সম্ভাবনা আছে এ দ্বীপে।

উনি রওনা হয়ে গেলে আমি, পিটার্স আর মেট নৌকোয় করে বেরিয়েছিলাম সীল শিকারে।

খ্রিস্টমাস বন্দরে নোঙর ফেলেছিল জাহাজ। আমরা সেখান থেকেই ঘুরে ঘুরে দেখলাম আশপাশের ছোটখাট দ্বীপের বহু বিস্ময়। একটা বিচিত্র ব্যাপারের বর্ণনা না দিয়ে পারছি না।

অ্যালবেট্রস পাখিরা সীগল জাতের পাখি। ডিম পাড়ার দরকার না হলে ডাঙায় নামে না। সে ব্যাপারে অদ্ভুত আঁতাত গড়ে তোলে পেঙ্গুইনদের সঙ্গে। ডিম পাড়ার ঋতু এলেই ঝাঁকে ঝাঁকে অ্যালবেট্রস যেন এক মন এক প্রাণ নিয়ে উড়ে উড়ে খোঁজে এমন একটা সমতল জায়গা যা সমুদ্রতীর থেকে দূরে থাকবে। অথচ বেশি দূরে নয় এবং সেখানে কাঁকর পাথর বেশি থাকবে না। এমনি জায়গা পছন্দ হওয়ার পর নিখুঁত জ্যামিতির ছকে পরিষ্কার করবে চৌকো বা আয়তাকার খানিকটা জায়গা। সেখান থেকে চঞ্চুতে করে সরাবে সমস্ত কাঁকর আর পাথর-পাঁচিলের মত করে সাজিয়ে রাখবে বর্গক্ষেত্র অথবা আয়তক্ষেত্রে তিনদিকে-সমুদ্রের দিকটাই কোন পাঁচিল থাকবে না। তারপর ছয় থেকে আট ফুট রাস্তা বানাবে পাঁচিলের ভেতর দিকে গা ঘেঁষে। তারপর পুরো জমিটাকে সমান ভাগে নিখুঁতভাবে ভাগ করবে সরু সরু পায়ে চলার পথ বানিয়ে। সরু সরু পথগুলোর চৌমাথায় এক ফুট উঁচু আর দুফুট ব্যাসের টিলা বানিয়ে তার ওপর ডিম পারবে অ্যালবেট্রস। অজস্র চৌকো বা আয়তকার জমির প্রতিটার ঠিক মাঝখানে ছোট্ট গর্ত

খুঁড়ে ডিম পেরে যাবে পেঙ্গুইন। অর্থাৎ অ্যালবেট্রসের উঁচু বাসার চার কোণে যেমন থাকছে পেঙ্গুইনের ডিমের গর্ত, ঠিক তেমনি পেঙ্গুইনের ডিমের গর্তের চার কোণে থাকছে অ্যালবেট্রসের উঁচু বাসা।

ডিম ফুটে বাচ্চা না বেরন পর্যন্ত মাদী অথবা মদ্দা একজন না একজন ডিমে তা দিয়ে যাবেই-অপর জন যাবে সমুদ্রের দিকে খাবার খুঁজতে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরলেও চলবে এমনি সাবধানতা। কেননা, ডিম চুরি করার ব্যাপারে সততার ধার ধারে না অভিনব এই আঁতুড়ঘরের বাসিন্দারা।

অজস্র আয়তক্ষেত্রে যদি ফাঁকা জায়গা পড়ে থাকে, অন্য পাখিরাও ডিম পেরে যেতে পারে সেখানে। দৃশ্যটা হয় দেখার মত। ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট-বড় পাখি আকাশ ছেয়ে নামছে আর উঠছে-সমুদ্রের দিক থেকে পেঙ্গুইনরা দলে দলে হেলে দুলে অবিকল মানুষের মত পাঁচিলহীন জায়গা দিয়ে চত্বরে ঢুকে চওড়া আর সরু পথ বেয়ে হেঁটে যে যার নিজের ডিম রাখার গর্তে পৌঁছচ্ছে অথবা বেরিয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধিমান মানুষের মতই এদের এই কীর্তির কথা বিশদভাবে বললাম এই কারণে যে আমার এই 'ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি'তে ফ্যাণ্ট্যাস্টিক এই অ্যাডভেঞ্চার উপাখ্যানে এই দুটি প্রাণীর উল্লেখ থাকবে বেশ কয়েকবার।

যাই হোক লোমওলা সীল বেশি পাইনি-মাত্র সাড়ে তিনশ চামড়া জোগাড় করেছিলাম। নৌকো দেখেই তো ভোঁ দৌড় দেয়। সামুদ্রিক হস্তী অগুনতি থাকলেও শিকার করেছিলাম মাত্র কুড়িটা-তাও অতিকষ্টে।

এগারই আগস্ট জাহাজে ফিরে দেখলাম আমাদের আগেই ফিরে এসেছেন ক্যাপ্টেন গাই তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে। এরকম ঊষর দ্বীপ তিনি জীবনে দেখেননি। দু রাত সেখানে কাটাতে হয়েছে ভুল বোঝাবুঝির ফলে নৌকো গিয়ে না পৌঁছনায়।

১৫

বার তারিখে খ্রিস্টমাস বন্দর থেকে রওনা হয়ে দিন পনের পরে পৌঁছলাম ত্রিস্তান দ্য কুনহা দ্বীপে।

বৃত্তাকার তিনটি দ্বীপ রয়েছে এখানে। তিনটে দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে একটা ত্রিভুজ। প্রতিটি দ্বীপই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বেশ উঁচু, বিশেষ করে ত্রিস্তান দ্য কুনহা দ্বীপটা। পরিধি প্রায় পনের মাইল-তিন দ্বীপের মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপ। জমি উঁচু হতে হতে উত্তর দিকে প্রায় হাজার ফুট উচ্চতায় পৌঁছেছে। তারপর উঁচু জায়গাটাই সমতলভূমি হয়ে বিস্তৃত রয়েছে দ্বীপের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত। সমতলভূমির ওপর খাড়া রয়েছে একটা শঙ্কুর মত বেজায় উঁচু পাহাড়। তলার দিকে আছে বিস্তর গাছ-ওপর দিকটা বিলকুল ন্যাড়া-শুধু পাথর। মেঘে অথবা বছরের বেশিরভাগ সময় তুষারে

ঢাকা থাকে শঙ্কু পাহাড়ের ন্যাড়া চূড়া। চড়া বা অপ্রত্যাশিত বিপদ তেমন কিছু নেই এ দ্বীপে। তীরভূমি বেশ শক্ত, জল গভীর। উত্তর-পশ্চিম উপকূলে আছে একটা উপসাগর, সৈকতভূমিতে কালো বালি, দখিনা বাতাস থাকলে নৌকোয় করে অনায়াসেই নামা যায় সেখানে, পাওয়া যায় প্রচুর টাটকা জল, কড এবং অন্যান্য মাছ। পুরো দ্বীপটাকে আশি অথবা নব্বই মাইল দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে।

তিনটে দ্বীপের প্রতিটার মধ্যে ব্যবধান দশ মাইল। সবচেয়ে পশ্চিম দিকের দ্বীপটা পরিধিতে সাত থেকে আট মাইল। চারপাশে খাড়াই উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা, যেন নিষিদ্ধ অঞ্চল। দ্বীপের শীর্ষদেশে রয়েছে নিখুঁত সমতলভূমি। পুরো দ্বীপটাই অনুর্বর-সামান্য কিছু ঝোপ ছাড়া কিছু নেই। এ দ্বীপকে এই কারণেই দুর্গম দ্বীপ বলা হয়।

সবচেয়ে দক্ষিণে রয়েছে নাইটিঙ্গেল দ্বীপ। দক্ষিণ প্রান্তে আছে ছোট ছোট কয়েকটা পাথুরে দ্বীপকণা। এরকম ক্ষুদে দ্বীপ-কণিকা দেখা যায় উত্তর-পূর্বেও। জমি অসমতল এবং অনুর্বর।

আশেপাশে তিমি দেখা যায় বিস্তর। তিনটে দ্বীপেরই উপকূল বরাবর ছেয়ে থাকে কাতারে কাতারে সামুদ্রিক সিংহ, সামুদ্রিক হস্তী, লোমওলা সীল এবং নানা ধরনের অজস্র সামুদ্রিক পাখি। ফিলাডেলফিয়ার ক্যাপ্টেন প্যাটেন সাত মাস ছিলেন এই দ্বীপসমষ্টিতে এবং পাঁচ হাজার ছ'শ সীলচর্ম সংগ্রহ করেছিলেন। তখন এখানে চারপেয়ে জন্তু ছিল না বললেই চলে-সামান্য কিছু বুনো ছাগল ছাড়া। পরে জাহাজ নিয়ে যারা এসেছে, তারা অনেক চতুষ্পদ জীব ছেড়ে দিয়ে গেছে তিনটি দ্বীপেই। সবচেয়ে বড় দ্বীপটায় পেঁয়াজ, আলু, কপি এবং নানা ধরনের সবজি চাষের ব্যবস্থাও করেন আমেরিকান জাহাজ 'বেটশী'র ক্যাপ্টেন-প্যাটেনের পরেই তিনি এসেছিলেন দ্বীপসমষ্টিতে। তারপরে এসেছেন অনেকে-কেউ নিজেই দ্বীপের সর্বময় কর্তা হতে চেয়েছেন-নানা দেশের মধ্যে দ্বীপের মালিকানা হাত বদল হয়েছে। আমরা যখন এলাম, তখন দ্বীপের গভর্ণর হয়ে বসেছেন গ্লাস নামে একজন ইংরেজ। তাঁর কাছ থেকেই ক্যাপ্টেন গাই বিস্তর পশু, সবজি, সীলচর্ম এবং হাতির দাঁত কিনলেন। পনেরই নভেম্বর রওনা হলাম দক্ষিণ দিক-অরোরা দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কারের মতলবে।

অরোরা দ্বীপপুঞ্জের অস্তিত্ব নিয়ে মতবিরোধের অন্ত নেই। যাঁরা দ্বীপের অস্তিত্ব স্বচক্ষে দেখেছেন, তাঁদের দেওয়া দ্রাঘিমা-অক্ষিমার ঠিকানা নিয়ে অন্যেরা গিয়ে দ্বীপের ছায়াটুকুও খুঁজে পাননি। অদ্ভুত এই রহস্যের সমাধান করার জন্যেই উতলা হয়েছিলেন ক্যাপ্টেন গাই।

তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। অরোরা দ্বীপপুঞ্জে আমরা

পৌঁছেছিলাম, পুরো তিন হপ্তা ধরে চষে ফেলেছিলাম সেখানকার সমুদ্র অঞ্চল। আগে যেসব ভূখণ্ড দেখা গিয়েছিল, এখন তার অনেকগুলোর চিহ্নই দেখিনি।

১৬

বারই ডিসেম্বর দক্ষিণমেরু অভিযানে রওনা হলেন ক্যাপ্টেন গাই।

দক্ষিণমেরু অ্যাডভেঞ্চারে গেছেন এর আগেও অনেকে। ক্যাপ্টেন কুক গেছিলেন দু-বার। বরফ প্রাচীর পেরিয়ে দক্ষিণমেরুর ধারেকাছেও পৌঁছতে পারেননি। তারপরে গেছেন আমেরিকান জাহাজের ক্যাপ্টেন বেঞ্জামিন মোরেল। তিনি বরফ প্রাচীর পেরিয়ে যতই দক্ষিণমেরুর দিকে এগিয়েছিলেন, ততই নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া এবং খোলা সমুদ্রের আভাস পেয়েছিলেন-ভাসমান বরফখণ্ড, হিমবাহ, বরফপ্রান্তর বা বরফের দ্বীপ চোখে পড়েছিল খুব সামান্যই। এরপর গিয়েছিলেন লণ্ডন থেকে তিমি শিকারের জাহাজে ক্যাপ্টেন বিরিসকো। দু-বার অভিযান চালিয়েও ব্যর্থ হন তিনি। খোলা সমুদ্রের সন্ধান পাননি-বরফ-প্রাচীর পেরিয়েই যেতে পারেননি।

পূর্ব ইতিহাসের এই পটভূমিকায় ক্যাপ্টেন গাইয়ের দুঃসাহসিক সংকল্প তাই নিদারুণ উত্তেজনার সঞ্চার ঘটিয়েছিল আমার অণুপরমাণুতে।

১৭

মহাদেশ একটা আছে দক্ষিণমেরুতে-তাই আগের অভিযাত্রীরা সেদিক থেকে উড়ে আসতে দেখেছিলেন অগুনতি পাখিকে। বরফ-প্রাচীর পেরিয়ে একটু ভেতরে গিয়ে খোলা সমুদ্রে পড়ে ধু-ধু বরফ-প্রান্তর দেখা যায়নি সেই কারণেই। বিজ্ঞান আজও জানেনি সেই অজানা মহাদেশের রহস্য। সেই রহস্যই চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে চলল আমাদের দিনের পর দিন। সে কি উন্মাদনা! প্রতিদিনের ঘটনাবলী লিখে পাঠক-পাঠিকার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চায় না। অনেক কষ্ট, অনেক বাধা, অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে অটল সংকল্প নিয়ে আমরা চোদ্দই জানুয়ারি পৌঁছেছিলাম খোলা সমুদ্রে। ভাসমান বরফখণ্ড ছাড়া কিছুই আর নেই সেখানে-নেই ধু-ধু বরফ-প্রান্তর। সতেরই জানুয়ারী একটা ভেসে আসা বরফের চাঙরের ওপর মস্ত একটা জীব দেখে নৌকো নিয়ে গেছিলাম আমি, পিটার্স আর মেট। কাছাকাছি গিয়ে দেখেছিলাম অতিকায় একটা ভাল্লুককে। সাদা ধবধবে। চোখ দুটো টকটকে লাল। মুখখানা বুলডগের মত। এতবড় মেরুভাল্লুক কখনো দেখিনি। দানব-ভাল্লুক বললেই চলে। লম্বায় পনের ফুট। গুলি চালিয়েছিলাম নৌকো থেকে। গুলি খেয়ে ভড়কে যাওয়া দূরে

থাক, ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে এসে আধখানা দেহ তুলে ফেলেছিল নৌকোয়। দ্বিতীয়বার গুলি বর্ষণের আর সুযোগ দেয়নি। এ অবস্থায় নির্ঘাৎ মারা যেতাম তিনজনেই। বাঁচাল পিটার্স। অসীম সাহস আর মনোবলের চাক্ষুস প্রমাণ পেলাম। ছুরি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোমশ আততায়ীর পিঠের ওপর-সটান ছুরি বসিয়ে দিলে মেরুদণ্ডের পাশ দিয়ে বুকের মধ্যে। খতম পশু-দানব সমেত গড়িয়ে পড়ল জলে। তারপর দড়ি বেঁধে নিহত দানবকে নিয়ে এল জাহাজে। মাংস খেতে আঁশটে-কিন্তু সোল্লাসে তাই খেল নাবিকেরা। খেতে খেতেই হাঁক শুনলাম মাস্তুলের ডগা থেকে-ডাঙা দেখা যাচ্ছে অদূরে!

নেমেছিলাম ছোট্ট একটা পাথুরে দ্বীপে। একটা ভাঙা ক্যানোর গলুই দেখতে পেয়েছিলাম। তাতে কাঠ খুদে আঁকা একটা কচ্ছপ। এছাড়া দ্বীপে মানুষের বসতি বা অন্য কারো আসার নিদর্শন আর চোখে পড়েনি।

বিপুল উদ্যমে এগিয়েছিলাম আরো দক্ষিণে। যতই এগিয়েছি, ততই তাপমাত্রা বেড়েছে। বাতাসের আর জলের। বরফের চিহ্ন তেমন নেই। মহাদেশ আছে তাহলে সামনে-অজ্ঞাত দক্ষিণমেরুর মহাদেশ-বিজ্ঞানমহলে আজও যা বিরাট প্রহেলিকা।

দূর দক্ষিণ দিগন্তে ধোঁয়াটে ডাঙার আভাস যেদিন দেখা গেল, সেইদিন থেকেই কিন্তু ফিরে যাওয়ার কথা বলতে লাগলেন ক্যাপ্টেন গাই। জাহাজে স্কার্ভিরোগ দেখা দিয়েছে, জ্বালানিও ফুরিয়ে এসেছে।

এত কাছে এসে ফিরে যাব। ভীষণ রাগ হয়ে গিয়েছিল ক্যাপ্টেনের ওপর। জেদ ধরেছিলাম, আর কটা দিন সবুর করলে মেওয়া ফলতেও তো পারে। আবহাওয়া যে অঞ্চলে এমন মনোরম, বরফ তেমন নেই, সেখানে দূরের ঐ ডাঙায় যদি পৌঁছতে পারি-সে ডাঙা অনুর্বর নাও হতে পারে। জ্বালানি এবং অন্যান্য সমস্যারও সমাধান ঘটতে পারে।

নিমরাজি হয়েছিলেন ক্যাপ্টেন গাই। এর পরের রক্তঝরা ঘটনাবলীর দিকে আমিই তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম। লোমহর্ষক সেই ঘটনার পর ঘটনা ঘটত না যদি ক্যাপ্টেন ফিরে যেতেন। সেক্ষেত্রে দক্ষিণমেরুর গুপ্ত রহস্য গুপ্তই থেকে যেত না কি?

হ্যাঁ, আমিই নিমিত্ত হয়েছিলাম-বিজ্ঞানের স্বার্থেই হয়েছিলাম-আবিষ্কারের উন্মাদনায় আমি তাঁকে ঠেলে দিয়েছিলাম এর পরের রক্তাক্ত এবং ভয়াল ভয়ঙ্কর অধ্যায়গুলির দিকে।

সেজন্যে আমি অনুতপ্ত নই মোটেই। উদ্দেশ্যটা মহৎ ছিল বলেই।

আঠারই জানুয়ারি।–আবহাওয়া আগের মতই মনোরম। সকালের দিকে রওনা হলাম দক্ষিণ দিকে।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলি রাখি। সকাল আর সন্ধে–এই শব্দ দুটো এই উপাখ্যানে লিখেছি বহুবার যাতে পাঠক-পাঠিকারা সময়টা সঠিক বুঝতে পারেন–ভুল না করেন। কিন্তু সকাল মানেই যে সূর্যোদয়ের পরে আর সন্ধে মানেই যে সূর্যাস্তের পরে, এই সহজ মানেটা যেন না করেন। দীর্ঘদিন ধরে রাতের মুখ দেখিনি। দিনের আলো রয়েছে চব্বিশ ঘণ্টা, তারিখ ফেলা হয়েছে চব্বিশ ঘণ্টা হিসেবে। তারিখের ব্যাপারেও আমি যে একেবারে নির্ভুল কখনোই তা বলব না। কেননা, নিয়মিতভাবে দিনপঞ্জী তো লিখে রাখিনি। স্মৃতির সাহায্য নিতে হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে।

যাই হোক, রওনা হওয়ার পর দেখা গেল সমুদ্র বেশ শান্ত, উষ্ণ হাওয়া বইছে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে, জলের উষ্ণতা তিপান্ন ডিগ্রী। ঘণ্টায় এক মাইল বেগে জলস্রোত বইছে মেরুকেন্দ্রের দিকে। স্রোতের টান আর হাওয়ার গতি বিরামবিহীনভাবে দক্ষিণমুখো থাকায় অনেকে যেমন আশায় নেচে উঠল, অনেকে তেমনি একটু দমেই গেল। নির্বিকার রইলেন কিন্তু ক্যাপ্টেন গাই। ভয় ভাবনার ছাপ যাতে তাঁর মনের ওপর না পড়ে, কড়া নজর রাখলাম সেদিকে। আমি তো জানি বিদ্রূপ একেবারেই সইতে পারেন না ভদ্রলোক। কাজেই হেসেই উড়িয়ে দিলাম যত কিছু দুশ্চিন্তা। দিন কয়েক পরেই দেখলাম বেশ কয়েকটা বড় সাইজের তিমি-মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল বিস্তর অ্যালবেট্রস। লাল লিচু জাতীয় ফল বোঝাই একটা ঝোপও দেখতে পেলাম। আর পেলাম অদ্ভুতদর্শন একটা ডাঙার পশু। লম্বায় তিন ফুট, উচ্চতায় কিন্তু মোটে ছ ইঞ্চি। পা চারখানা বেজায় খাটো। প্রতি পায়ের থাবার নখগুলো উজ্জ্বল লাল রঙের। যেন প্রবাল দিয়ে তৈরী নখ। সারা গায়ে রেশমের মত নরম সোজা লোম। একেবারে সাদা। লেজটা ইঁদুরের লেজের মত খাড়া-প্রায় দেড় ফুট লম্বা। মুণ্ডুটা বেড়ালের মুণ্ডুর মত-কান দুটো বাদে। কুকুরের কানের মত লটপটে কান। দাঁত উজ্জ্বল লাল–পায়ের নখের মত।

উনিশে জানুয়ারি।–সমুদ্র অস্বাভাবিক গাঢ় রঙের। মাস্তুলের ডগা থেকে আবার দেখা গেছে ডাঙা। কাছাকাছি গিয়ে দেখা গেল বেশ কয়েকটা অত্যন্ত বড় দ্বীপের সমষ্টি। উপকূল খাড়াই পাথরের। ভেতরে যেন গম্ভীর জঙ্গল। দেখে ময়ূরের মত পেখম তুলে নেচে উঠল প্রত্যেকের মন। ঘণ্টা চারেকের মধ্যেই নোঙর ফেলা হল উপকূল থেকে মাইল তিনেক দূরে বালির মধ্যে। আর কাছে যাওয়া বিপজ্জনক-বড় বড় ঢেউ আর ফেনপুঞ্জ দেখে সাহস হল না। জলে নামান হল সবচেয়ে বড় দুখানা নৌকো। অভিযাত্রীদের মধ্যে রইলাম আমি আর পিটার্স। খাড়াই পাথুরে

প্রাচীর যেন ঘিরে রয়েছে পুরো দ্বীপটাকে, দেখা যাক, পাঁচিলের মধ্যে ফাঁক পাওয়া যায় কিনা, অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে রাখলাম প্রত্যেকেই। কিছুক্ষণ পরেই পাওয়া গেল ভেতরে ঢোকার পথ। নৌকো নিয়ে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময়ে দেখলাম উপকূল থেকে চারটে বড় ক্যানো আসছে আমাদের দিকে। প্রতিটা ক্যানোতেই রয়েছে সশস্ত্র পুরুষ। আসছে তীরের মত বেগে। তাই দাঁড়িয়ে গেলাম-আসুক কাছে, দেখা যাক কি ব্যাপার। দাঁড়ে সাদা রুমাল বেঁধে তুলে ধরলেন ক্যাপ্টেন গাই। দেখেই সে কি উল্লাসধ্বনি, ক্যানো চারখানার! দুটো শব্দ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম-অ্যানামু-উ-উ-মু! আর ল্যামা-ল্যামা! প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চলল এইহর্ষধ্বনি। সেই ফাঁকে ভাল করে দেখে নিলাম আগন্তুকদের চেহারা।

প্রতিটি ক্যানো লম্বায় প্রায় পঞ্চাশ ফুট। মোট একশ দশ জন বর্বর রয়েছে চারখানা ক্যানোয়। দেহের গড়ন মামুলি ইউরোপীয়দের মত, শুধু যা অনেক বেশি পেশিবহুল এবং গাঁটাগোট্টা। গায়ের রঙ আবলুস কাঠের মত মিশমিশে কালো। মাথার চুল লম্বা এবং পুরু। পরনে অজানা জন্তুর চামড়া, লোমশ, নরম রেশমের মত। পোশাক পরার মধ্যে বেশ নৈপুণ্য আছে। পশুচর্মের লোমের দিকটা রয়েছে ভেতর দিকে। ঘাড়, কব্জি আর গোড়ালির কাছে কেবল লোম বার করা রয়েছে বাইরের দিকে। অস্ত্র বলতে মূলত কালচে রঙের কাঠের মুগুড়-বেশ ভারি কাঠ বলেই মনে হল। বর্শাও আছে-ফলাগুলো চকমকি পাথরের। গুলতি আছে। ক্যানোর তলায় রয়েছে রাশি রাশি বড় ডিমের আকারের কালো পাথর।

হল্লা শেষ করে একজন উঠে দাঁড়াল একটা ক্যানোয়-খুব সম্ভব সর্দার নিজে-হাত নেড়ে আমাদের নৌকো দুটোকে নিয়ে যেতে বললে ওদের ক্যানোর পাশে। যেহেতু সংখ্যায় ওরা আমাদের চারগুণ, তাই ব্যবধানটা বজায় রাখাই সঙ্গত মনে করলাম এবং ভাণ করলাম যেন কিছুই বুঝতে পারছি না। সর্দার কিন্তু বুঝতে পারলে আসল কারণটা। তিনটে ক্যানো পেছনে রেখে নিজের ক্যানোটা নিয়ে এগিয়ে এল আমাদের কাছে। কাছে এসেই এক লাফে উঠে এল আমাদের বড় নৌকোটায়, জাঁকিয়ে বসে পড়ল ক্যাপ্টেনের পাশে এবং জাহাজের দিকে আঙুল তুলে বারবার বলতে লাগল অ্যানামু-উ-উ-মু! আর ল্যামা-ল্যামা! নৌকো নিয়ে চললাম জাহাজের দিকে। ক্যানো চারখানা এল পেছন পেছন-বেশ তফাতে।

জাহাজের কাছে আসার পর দেখা গেল দারুণ অবাক আর খুশি হয়েছে সর্দার। হাততালি দিয়ে, উরু আর বুক চাপড়ে, সেই সঙ্গে দাঁত বার করে হেসে সে কী কাণ্ড! পেছনের ক্যানো চারখানাতেও চলল এই একই কাণ্ড। বেশ কিছুক্ষণ ধরে কানে তালা লেগে যায় আর কি!

অনেকক্ষণ পরে ঠাণ্ডা হল অবাক আগন্তুকরা। ক্যাপ্টেন কিন্তু ভারি হুঁশিয়ার। নৌকো দুখানা তখনি তুলে নিলেন জাহাজের ওপর। সর্দারকে আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন, একবারে কুড়ি জনের বেশি ক্যানোর লোককে জাহাজে উঠতে দেওয়া হবে না।

নৌকোতে বসেই জেনে নিয়েছিলাম, সর্দারের নাম টু-উ-উইট। ক্যাপ্টেনের বন্দোবস্ত তার খুব মনে ধরেছে দেখা গেল। একটা ক্যানোকে কাছে আসতে হুকুম দিলে-বাকি তিনটেকে রাখলে পঞ্চাশ গজ তফাতে। বিশজন বর্বর উঠল জাহাজে। দড়িদড়া ঘেঁটে, প্রতিটি জিনিস বিষম কৌতূহলে দেখতে দেখতে এমনভাবে ঘুরতে লাগল জাহাজময় যেন কতদিনের চেনা জানা আমরা সবাই।

বেশ বোঝা গেল, সাদা চামড়ার মানুষ এরা কখনো দেখেনি। সাদা চামড়ার মানুষের কাছে গেলেই ভয়ে যেন সিঁটিয়ে যাচ্ছে। 'জেন' জাহাজখানা নিশ্চয় একটা জ্যান্ত প্রাণী। বর্শার ফলা ছোঁয়াতেও ভয় পাচ্ছে-ফলা তুলে রেখেছে আকাশের দিকে। একটা ব্যাপারে টু-উ-উইটের কাণ্ড দেখে তো হেসেই খুন আমাদের খালাসিরা। ডেকের ওপর কুড়ুল দিয়ে কাঠ চিরছিল পাচক। হঠাৎ কুড়ুল বসে যায় তক্তায়। তৎক্ষণাৎ তেড়ে গিয়েছিল টু-উ-উইট। এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়েছিল পাচককে। কুড়ুলের কোপে যেন কষ্টে ছটফট করছে জাহাজ, সর্দারের বুক যেন ফেটে যাচ্ছে জাহাজের কষ্টে। কাটা জায়গাটাই হাত বুলিয়ে, আদর করে, কাছের বালতি থেকে জল ঢেলে ধুইয়ে দিয়ে এমন কাণ্ড করতে লাগল যে আমরা তো অবাক

জাহাজের ওপর দিকটা দেখানোর পর ওদের নামান হল ভেতরে। বিস্ময় যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল এবার। সত্যি সত্যি তাজ্জব হওয়া কাকে বলে, সেদিন দেখলাম স্বচক্ষে। ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে না সুগভীর বিস্ময়বোধকে, নিঃশব্দে ঘুরছে পা টিপে টিপে, মাঝে মধ্যে নৈঃশব্দ ভঙ্গ হচ্ছে বিস্ময়চকিত স্বরে। খুব বেশি ভ্যাবাচাকা খেয়েছে দেখলাম অস্ত্রশস্ত্র দেখে। আগ্নেয়াস্ত্রের মাহাত্ম্য জানা নেই নিশ্চয়। বিগ্রহ বলেই মনে করেছে। কেননা, ওরা তো দেখছে কত সন্তর্পণে নাড়াচাড়া করছি প্রতিটা অস্ত্রশস্ত্র এবং ওদের হাতে যখন দিচ্ছি দেখবার জন্যে, হুঁশিয়ার থাকছি প্রতি মুহূর্তে। বড় কামানগুলো দেখে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল ওদের বিস্ময়। অত্যন্ত সন্ত্রস্ত আর সশ্রদ্ধ ভঙ্গিমায় কাছে গেল বটে, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখবার সাহস হল না। দুটো বড় আয়না ছিল কেবিনে। বিস্ময় চরমে পৌঁছল আয়নার সামনে দাঁড়াতেই। টু-উ-উইট প্রথমে গিয়ে পড়েছিল দুটো আয়নার মাঝখানে-একটা সামনে আর একটা পেছনে। প্রথমে বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা। চোখ তুলেই নিজের প্রতিবিম্ব দেখা মাত্র মনে হল বুঝি গেল এবার পাগল হয়ে। পেছন

ফিরে যেই পালাতে যাচ্ছে, আবার নিজেকেই দেখল আয়নার মধ্যে—মনে হল, এবার পতন ও মৃত্যু ঘটবে এক্ষুনি। কিছুতেই দ্বিতীয়বার আয়নার দিকে চোখ তোলাতে পারলাম না। ধড়াস করে উপুড় হয়ে পড়ে দু-হাত দিয়ে ঢেকে রাখল মুখখানা। শেষকালে নিরুপায় হয়ে ত্যকে হিড়হিড় করে টেনে বের করে আনলাম ডেকে।

চারখানা ক্যানোর সমস্ত বর্বরকেই এই একই কায়দায় তোলা হল জাহাজে। একবারে কুড়িজনের বেশি নয়। প্রতিবারেই কষ্ট করে থেকে যেতে হল টু-উ-উইটকে। চুরিচামারির প্রবণতা দেখা গেল না কারোর মধ্যেই। আপদ বিদেয় হওয়ার পর কোন জিনিস খোয়া যেতেও দেখিনি। জাহাজ দেখতে এসে শুরু করে জাহাজ থেকে নেমে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধুর মত আচরণ দেখিয়ে গেল প্রত্যেকে। হাবভাবে কয়েকটা ব্যাপার দেখে কিন্তু আমার খটকা লেগেছিল। নিরীহ কয়েকটা বস্তুর ধারেকাছেও নিয়ে যেতে পারিনি কাউকেই ; যেমন, জাহাজের পাল, একটা ডিম, একটা বই, অথবা এক ডেকচি ময়দা।

অবাক হয়েছিলাম আমরা নিজেরাও দ্বীপে অগুন্তি বৃহদাকার গ্যালিপাগো কচ্ছপ দেখে। একটা কচ্ছপ তো দেখলাম টু-উ-উইটের ক্যানোর মধ্যেই। এই সব অসঙ্গতি দেখে ক্যাপ্টেন মনস্থ করলেন পুরো তল্লাটটা চষে ফেলবেন—চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার ঘটলেও ঘটতে পারে। এই দ্রাঘিমা-লঘিমায় তো এ ধরনের বাসিন্দা আশাই করা যায় না। দ্বীপ সম্বন্ধে আরো জ্ঞান লাভের ইচ্ছে যে আমার ছিল না, তা নয় ; তার চাইতেও বেশি উৎকণ্ঠিত ছিলাম আরো দক্ষিণে যাওয়ার ব্যাপারে। দেরী করা মোটেই সমীচীন নয়। আবহাওয়া এখনও পরিষ্কার, কিন্তু কত দিন তা অনুকূলে থাকবে তা কে জানে। রয়েছি এখন চুরাশি অক্ষরেখায়, সামনে খোলা সমুদ্র, স্রোতের টান দক্ষিণ দিকেই, হাওয়াও ঝিরঝিরে . এতগুলো সহায়ক পরিস্থিতির মধ্যে থেকে নিতান্ত প্রয়োজন না হলে খামোকা কোথাও বেশি দিন থাকা উচিত কি ? খালাসীদের স্বাস্থ্য, খাবার-দাবার আর জ্বালানি—এই তিনটে ব্যাপার নিয়ে দুর্ভাবনা শুরু হওয়ার আগেই দক্ষিণের অভিযান সাঙ্গ করার জন্যে আত্যন্তিক উদ্বেগে ছটফট করেছিলাম আমি। ক্যাপ্টেনকে তাই বুঝিয়ে বললাম, ফেরার পথে এখানে শীতের কটা মাস কাটিয়ে গেলেই তো হয়—দ্বীপ পর্যবেক্ষণ তখন না হয় করা যাবে। শীতের বরফ বাধার সৃষ্টি করবে ফেরার পথে—এই দ্বীপেই তখন আশ্রয় নেওয়া যাবে এবং এক ঢিলে দু-পাখি মারার কাজ হয়ে যাবে।

আমার প্রস্তাবেই শেষ পর্যন্ত সায় দিলেন ক্যাপ্টেন। কেন জানি না, কি ভাবে তাও জানি না—ওঁর ওপর আমার প্রভাব পড়েছিল খুবই। আমার কথা বড় একটা ফেলতে পারতেন না। তাই ঠিক

হল, বড় জোর দিন সাতেক থাকব দ্বীপে, রসদ সংগ্রহ করে নিয়ে রওনা হব দক্ষিণ দিকে।

ব্যবস্থা হল সেইভাবেই। টু-উ-উইটের সহযোগিতায় জাহাজকে নিয়ে আসা হল উপকূল থেকে মাইলখানেক দূরে। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে জমিঘেরা চমৎকার একটা উপসাগরে নোঙর ফেলা হল কালো বালিতে। শুনলাম, উপসাগর থেকে একটু দূরেই উৎকৃষ্ট জলের তিনটি ঝর্ণা আছে। ধারে কাছে অনেক গাছপালাও দেখলাম। পেছন পেছন এল ক্যানো চারখানা-সম্মানজনক ব্যবধান বজায় রেখে। টু-উ-উইট জাহাজের ডেকেই ছিল এতক্ষণ। নোঙর ফেলার পর আমন্ত্রণ জানালে আমাদের ডাঙায় ওদের গ্রাম দেখে যাওয়ার জন্যে। আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন ক্যাপ্টেন। দশজন বর্বরকে রাখা হল জাহাজে জামিন স্বরূপ-আমরা বারোজন তৈরী হলাম দ্বীপে যাওয়ার জন্যে। সন্দেহের উদ্রেক না ঘটিয়ে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র রাখলাম সঙ্গে। যেকোন মুহূর্তে গোলা ছোঁড়ার জন্যে তৈরী রইল জাহাজের কামান, অন্যান্য ব্যাপারেও সতর্ক রইল সবাই-হঠাৎ আক্রান্ত হলে যেন মোকাবিলা করা যায়। চিফমেটকে বলে দেওয়া হল, আমাদের অবর্তমানে যেন কাউকে উঠতে না দেওয়া হয় জাহাজে ; বার ঘণ্টার মধ্যে যদি ফিরে না আসি, তাহলে যেন উদ্ধারকারী দল যায় দ্বীপে আমাদের খোঁজে।

এমন একটা তল্লাটে পা দিতে চলেছি যার মত অঞ্চল আজ পর্যন্ত কোন সভ্যদেশের মানুষ দেখেনি। হুঁশিয়ার হতে হল তাই প্রতি ক্ষেত্রে। সভ্য জগতের চেনাজানা কিছুই তো দেখলাম না। নিরক্ষীয়, নাতিশীতোষ্ণ বা উত্তরের তুহিন অঞ্চলের কোন গাছপালার সঙ্গে মিল নেই এখানকার গাছপালার। এমন কি দক্ষিণ অঞ্চলে আসতে গিয়ে বিভিন্ন অক্ষরেখায় যে সব গাছপালা দেখে এসেছি, সে সবের সঙ্গেও মিল নেই এখানকার গাছপালার। পাথর পর্যন্ত বিচিত্র। যেমন অদ্ভুত আকার, তেমনি আজব রঙ, স্তরবিন্যাস্যও নতুন ধরনের। স্রোতস্বিনীগুলোর চেহারা এমনই অবিশ্বাস্য ধরনের যে তাদের জল বাস্তবিকই প্রাকৃতিক জলের মতই সুপেয়-কিছুতেই তা বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি।এরকম জলধারা অন্য কোন দেশে কোন ঋতুতে দেখা যায় না। কাজেই বিবেচকের মতই জলপান থেকে বিরত থেকেছি। যাওয়ার পথে ছোট্ট একটা স্রোতস্বিনী পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে জল খাওয়ার জন্যে দাঁড়িয়েছিল টু-উ-উইট আর তার সঙ্গীরা। জলের অসাধারণ প্রকৃতি দেখেই তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম আমরা-নিশ্চয় দূষিত জল, এই ভয়েই জিভেই ছোঁয়াতে চাইনি। পরে জেনেছিলাম, এ অঞ্চলে সব জলধারার প্রকৃতি ঠিক এই রকমই। জলটা যে কি রকম, তা বোঝাতেও বেগ পেতে হচ্ছে। জানি না আদৌ বোঝাতে পারব কি না। এককথায় তো পারবই না-দীর্ঘ বর্ণনা ছাড়া উপায় নেই। ভাল

জায়গা দিয়ে বেগে প্রবহমান থাকে সব জলই-কিন্তু প্রপাতের আকারে পড়ার সময় ছাড়া কখনোই স্বচ্ছ বিশুদ্ধ বলে মনে হয় না। এখানকার স্রোতস্বিনীগুলোর জল যে কোন চুনাপাথরের জলের মতই একেবারে স্বচ্ছ-তফাৎ শুধু চেহারায়। প্রথম দর্শনে, বিশেষ করে যেখানে ঢালু অঞ্চল রয়েছে সেখানে, মামুলি জলের সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্যটা চোখে পড়ে-ঠিক যেন ঘন করে গঁদের আঠা গোলা রয়েছে। বিশেষ এই জলের অত্যাশ্চর্য গুণাবলীর মধ্যে সবচেয়ে কম মাত্রায় অত্যাশ্চর্য বলা চলে এই বৈশিষ্ট্যটাকে । এ জল রঙহীন নয়, একই রঙের জলও নয়-প্রবহমান জলের মধ্যে চোখে পড়ে বেগুনি রঙের সব কটা কম বেশি আভাস-যেন মুহুর্মুহু পালটে যাচ্ছে রেশমী চাদর। আয়না দেখে যেমন টু-উ-উইটের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, স্রোতস্বিনীর জলের রঙ পাল্টান দেখে আমাদের অবস্থা দাঁড়াল সেইরকম। উত্তেজনায়, বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম। একটা পাত্রে জল ভরে রেখে দিয়েছিলাম কিছুক্ষণ-যাতে রঙ-টঙ কিছু থাকলে থিতিয়ে যায়। কিন্তু দেখলাম পাত্র বোঝাই জলের সব জায়গাতেই রয়েছে অসংখ্য সুস্পষ্ট শিরা। প্রত্যেকটার রঙ আলাদা। একটার সঙ্গে আর একটা শিরা মিশে যাচ্ছে না মোটেই-গায়ে গায়ে চমৎকারভাবে লেগে রয়েছে কেবল প্রতিটা শিরার মধ্যেকার নিজস্ব বস্তুকণার দৌলতে। এক শিরার বস্তুকণার সঙ্গে আর এক শিরার বস্তুকণার মিল নেই। প্রতিবেশী শিরার গায়ে গা লাগিয়েও তাই বজায় রেখেছে পৃথক সত্তা। ছুরির ফলা চালিয়ে শিরাগুলোকে কাটতে গিয়ে আরো অবাক হলাম। জলে ঢাকা পড়ে গেল ওপরদিক-ছুরি সরিয়ে নিতেই মুহূর্তের মধ্যে উধাও হল ছুরির পথরেখা। তবে খুব সূক্ষ্মভাবে দুটো শিরার ফাঁকে ফলা ঢোকানোর পর দেখা গেল, গায়ে গায়ে সঙ্গে সঙ্গে লেগে যেতে পারছে না। নিয়তি আমাকে অজস্র অলৌকিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এই ঘটনার পরে-সূচনা ঘটেছিল এই জলের রহস্য দিয়ে।

১৯

গ্রামটা তীরভূমি থেকে প্রায় ন-মাইল ভেতরে। এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। পৌঁছতে লাগল প্রায় তিন ঘণ্টা। টু-উ-উইটের পুরো দলটা ক্যানো থেকে নেমে চলেছিল আমাদের সঙ্গে। যেতে যেতে দেখলাম যেন হঠাৎই রাস্তার মোড়ে পাঁচ-ছ জন করে ওর জাত ভাইরা এসে জুটছে দলে। তার মানে ওদের দল ক্রমশ বেড়েই চলেছে-আমরা মাত্র বার জন। ব্যাপারটা ভালো লাগেনি। বেশ পদ্ধতিমাফিক দল ভারি হয়ে চলেছে দেখে অবিশ্বাস দানা বেঁধেছিল মনের মধ্যে। চুপিচুপি তা প্রকাশ করেছিলাম ক্যাপ্টেনের কাছে। কিন্তু তখন আর ফিরে যাওয়া চলে না-সর্দারের সুবুদ্ধির ওপর ভরসা করে থাকা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু বারজনই রইলাম

একসঙ্গে, মাঝে মধ্যে যারা ভোজবাজির মত মোড় ঘুরতে না ঘুরতে দলে এসে ভিড়ছে, তাদের কাউকে আমাদের মধ্যে ঢুকতে দিলাম না-বারজনকে আলাদা করে ফেলতে দিলাম না। এইভাবেই এসে পৌঁছলাম একটা খাড়াই গিরিসংকটে। গোটা দ্বীপের সমস্ত বাসিন্দা নাকি থাকে এইখানেই। দূর থেকে তাদের দেখেই গলা ছেড়ে হেঁকে উঠল সর্দার। ক্লক-ক্লক শব্দটা শুনলাম বেশ কয়েকবার। তা থেকেই আন্দাজ করে নিলাম, গ্রামটার নাম ক্লক-ক্লক। অথবা, এদের ভাষায় যে কোন গ্রামকেই বলা হয় ক্লক-ক্লক।

বাসস্থান যে এত জঘন্য হতে পারে তা না দেখলে কেউ কল্পনা করতে পারবে না। বহু বর্বর জাতির মাথা গোঁজবার জায়গা দেখেছে সভ্যদেশের মানুষরা। নিবাস রচনার ক্ষেত্রে তারা একটা নকশা মেনে চলে। এদের ক্ষেত্রে সেসবের বালাই নেই। এ দ্বীপের মানুষদের বলা হয় ওয়ামপুস বা ইয়ামপুস। এদের এক একটা দল এক-একরকমভাবে বাসা বানিয়ে নিয়েছে। যেমন, একটা গাছের মূল থেকে ওপর দিকে চার ফুট পর্যন্ত গুঁড়ি কেটে খাড়া রাখা হয়েছে। তার ওপর ফেলে দেওয়া হয়েছে বেশ বড় একটা কালো পশু চর্ম। চামড়ার কিনারাগুলো ভাঁজ করা অবস্থায় ঝুলছে মাটির ওপর। এই হল এক ধরনের ছাউনি। আবার কেউ কেউ পাতা সমেত ডাল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রীর কোণে ঠেকিয়ে রেখেছে চারপাশের পাঁচ ছ-ফুট উঁচু মাটির ঢিপির ওপর-এলোমেলোভাবে মাটি ফেলে তৈরী ঢিপি-কোন ছিরিছাঁদ বা সমতা নেই। মাথার ওপর পাতার আচ্ছাদন-নিচে ঘরকন্না।খাড়াই গর্ত বানিয়ে নিয়েছে কয়েকজন মাটির মধ্যে-ডালপালা দিয়ে ঢেকে রেখে দিয়েছে গর্তের মুখ। বিচিত্র এই আচ্ছাদন সরিয়ে ভেতরে ঢুকে সংসার ধর্ম করার সময়ে আচ্ছাদন টেনে বন্ধ রাখছে গর্তের মুখ। গুলতির মত দুভাগ হয়ে যাওয়া গাছের ডালের ফাঁকেও নিবাস রচনা করেছে অনেকে-ওপরের ডালপালা কিছুটা কেটে নিচের ডালপালার ওপর বেঁকিয়ে ঠেকিয়ে রেখে ডালপালার চাঁদোয়া বানিয়ে নিয়েছে মাথার ওপর। বেশির ভাগ বর্বরই থাকে কিন্তু ছোট ছোট অগভীর গুহার খোঁদল বলাই সঙ্গত। সাজি মাটির মত দেখতে কালো পাথরের খাড়াই দেওয়াল দিয়ে ঘেরা আছে গ্রামটার তিনদিক। এই পাথরের গা খুঁড়ে বানিয়েছে ছোট ছোট যাচ্ছেতাই খুপরি। আদিম গুহা। গুহার বাসিন্দারা যখন বাইরে যায়, খুব সাবধানে পাথর দিয়ে ঢেকে রেখে যায় গুহার মুখ। যে পাথর দিয়ে গুহার মুখের তিনভাগের একভাগ মাত্র ঢাকা পড়ে, বাকি দুভাগ খোলাই পড়ে থাকে-সেই পাথর অত যত্ন করে গুহামুখের সামনে রেখে যাওয়ার কারণটা আজও আমার মাথায় ঢোকেনি।

জানি না এহেন আস্তানাকে গ্রাম বলা উচিত কি না। গ্রাম হোক আর যাই হোক, জায়গাটা রয়েছে বেশ গভীর একটা উপত্যকার

মাঝখানে। ঢোকা যায় কেবল দক্ষিণ দিক থেকে। অন্যান্য দিকে রয়েছে খাড়াই পাথুরে প্রাচীর-আগেই যার উল্লেখ আমি করেছি। উপত্যকার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে একটা কল্লোলিনী স্রোতস্বিনী। জলের প্রকৃতি সেই একই রকম-আগে যার বর্ণনা দিয়েছি। জল তো নয়, যেন জাদুমন্ত্র করা রসায়ন। ক্ষণে ক্ষণে রঙ পালটাচ্ছে। বিচিত্র আস্তানার আশেপাশে অদ্ভুত কতকগুলো জানোয়ারকে চরতে দেখলাম। গৃহপালিত পশু বলেই মনে হল। এদের মধ্যে সব চাইতে বড় জন্তুটাকে দেখতে আমাদের দেশের মামুলি শুয়োরের মতন-শরীর আর চোয়াল সেই রকমই। ল্যাজটা কিন্তু ঝাঁকাল লোমে ভরা। পাগুলো অ্যান্টিলোপ হরিণের মত সরু সরু।চলাফেরায় ভীষণ ঢিমেতালা-কোনদিকে যাবে সেটাই যেন মনস্থির করে উঠতে পারে না। পালানোর চেষ্টা করে উঠতে কখনো দেখিনি। প্রায় একই রকম দেখতে আরো অনেক জন্তু দেখলাম-শরীর অনেক বেশি লম্বা-কালো উলে ঢাকা সর্বাঙ্গ। পোষা মুরগী রয়েচে বিস্তর-বর্বরদের প্রধান খাদ্য। অবাক হলাম পোষমানা কালো রঙের অ্যালবেট্রস পাখি দেখে-একেবারেই পোষম্যানা! কিছু সময় অন্তর উড়ে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে খাবারের খোঁজে-কিন্তু প্রতিবারই ফিরে আসছে আজব গাঁয়ে-যেন এইখানেই তাদের পাকাপোক্ত বাড়ি। ডিম পাড়বার আর ডিমে তা দেওয়ার জায়গা বানিয়েছে গ্রামের দক্ষিণ দিকের উপকূলে। পেলিক্যানরাও আছে সঙ্গে-যেমন থাকে চিরকাল। কিন্তু অ্যালবেট্রসরা গ্রামে নিজেদের বাসায় যখন আসছে পেলিক্যানরা আসছে না পেছন পেছন। পোষা মুরগী ছাড়াও দেখলাম বিস্তর হাঁস। স্বদেশে যেমন হাঁস দেখেছি, প্রায় সেই রকমই-কুচকুচে কালো তেরপলের মতন পিঠ। অন্যান্য পাখিও দেখলাম। মাছ রয়েছে অনেক রকমের-বিপুল পরিমাণে। শুঁটকি স্যালমন, পাহাড়ী কড, নীল ডলফিন, ম্যাকারেল, কালো মাছ, স্কেট, কোঙ্গার ঈল, হাতি মাছ, কাকাতুয়া মাছ এবং আরও হরেক রকম জাতের-গুণে গেঁথে শেষ করা যায় না। লক্ষ্য করলাম একান্ন ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষরেখায় লর্ড অকল্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে যে ধরনের মাছ দেখা যায়, এ মাছগুলোও প্রায় সেই ধরনের। দ্বীপ ছেয়ে রয়েছে গ্যালিপাগো কচ্ছপ-কাতারে কাতারে। বুনো জন্তু খুব কমই দেখেছি। বড় আকারের বন্য প্রাণী তো দেখিইনি। চেনা জানা কোন অরণ্য পশুও চোখে পড়েনি। ভীষণাকৃতি দু-একটা সরীসৃপ পথে দেখেছিলাম বটে, কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা সেদিকে ফিরেও তাকায়নি। তাতেই বুঝেছিলাম ভয়াল আকৃতি হলেও সাপগুলো বিষধর নয়।

গ্রামের কাছাকাছি হতেই পালে পালে গ্রামবাসীরা চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এসেছিল আমাদের খাতির করে ভেতরে নিয়ে যেতে। চিৎকারের মধ্যে দুটো শব্দ উচ্চারিত হয়েছিল বার বার-অ্যানামু-উ-মু! আর ল্যামা ল্যামা! অবাক হলাম দু-একজন

ছাড়া এত লোকের পরনে তিল মাত্র পোশাক না দেখে—একেবারেই উলঙ্গ। ক্যানোয় করে যারা এসেছিল, চামড়ার পোশাক পরে আছে কেবল তারাই। গ্রামের যাবতীয় হাতিয়ারও মনে হল শেষোক্ত পুরুষদের দখলে-গাঁয়ের কোন মানুষের হাতেই তো অস্ত্রশস্ত্র দেখলাম না। মেয়ে আর বাচ্চা রয়েছে অগুন্তি। সৌন্দর্য বলতে যা বুঝি, মেয়েদের মধ্যে তার খুব একটা ঘাটতি নেই। সিধে লম্বা আকৃতি, সুগঠনা। চলাফেরার মধ্যে এমন একটা সুষম ছন্দ, লাবণ্য আর স্বাধীনচেতা মনোভাব ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে, যা সভ্য দেশের মেয়েদের মধ্যেও দেখা যায় না। ঠোঁট অবশ্য পুরুষদের মতই। পুরু এবং ধ্যাবড়া। হেসে গড়িয়ে পড়লেও দাঁত দেখা যায় না সেই কারণেই। মাথার চুল মিহি-পুরুষদের মত ঘন এবং পুরু নয়। কাতারে কাতারে গাঁয়ের মানুষ উলঙ্গ দেহে নাচতে নাচতে ছুটে আসতেই-দেখে নিলাম মাত্র দশ বারো জনের পরনে রয়েছে টু-উ-উইটের স্যাঙাৎদের পোশাকের মত কাল পশুচর্মের পোশাক-হাতেও রয়েছে বল্লম আর মুগুর। গাঁ শুদ্ধ লোক এঁদের খুব মেনে চলে দেখলাম-সম্বোধন করছে ওয়ামপু বলে। কালো চামড়া দিয়ে তৈরী প্রাসাদের বাসিন্দাও বটে এরা। টু-উ-উইটের প্রাসাদটাই সবচেয়ে বড়, রয়েছে গ্রামের ঠিক মধ্যিখানে-নির্মাণ-কৌশলও অনেক ভাল। গাছের গুঁড়ি কাটা হয়েছে শেকড় থেকে বার ফুট উঁচুতে-ঠিক তার নীচের ডালপালা না কাটার ফলে ঢালু হয়ে রয়েছে নীচের দিকে। আচ্ছাদন ফেলা রয়েছে এই ডালপালার ওপর। ফলে, আলগাভাবে মাটিতে লুটোচ্ছে না বিচিত্র চন্দ্রাতপ। বিচিত্র বললাম এই কারণে যে একখানা পশুচর্ম দিয়ে নির্মিত নয় চাঁদোয়া-চারখানা পশুচর্ম পাশাপাশি জোড়া হয়েছে কাঠের শলাকা দিয়ে এবং মাটিতে গোঁজ পুঁতে লাগিয়ে রাখা হয়েছে টান টান করে। মেঝেতে শুকনো পাতা-ঠিক যেন পুরু কার্পেট।

বিষম বিনয় দেখিয়ে মহাসমারোহে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল অভিনব এই কুটিরের ভেতরে। গ্রামবাসীরাও ঢুকল পেছন পেছন-যত জন পারে। টু-উ-উইট জাঁকিয়ে বসল পত্র গালিচায়। ইঙ্গিতে বসতে বললে আমাদের। বসবার পরেই দেখলাম গতিক সুবিধের নয়। আমাদের বারো জনকে ঘিরে গায়ে গা লাগিয়ে এমন জমাটি হয়ে বসেছে জনাচল্লিশ গ্রামবাসী যে হঠাৎ গোলমালের সূচনা ঘটলেই হাতিয়ার চালাতে তো পারবই না-উঠে দাঁড়াতেও পারব না। গ্রামবাসীদের এই চাপ যে শুধু কুটিরের মধ্যেই তা নয়। সাড়া তল্লাটের সমস্ত মানুষ জড়ো হয়েছে কুটিরের বাইরে। ভেতরে ঢুকতে পারছে না কেবল সর্দারের নিরন্তর তর্জন-গর্জনের ফলে। সর্দার ঐভাবে হাঁক না ছাড়লে, পায়ের তলাতেই পিষে অক্কা পেতাম বারো জনে। সর্দারের ওপরেই যখন নির্ভর করছে আমাদের নিরাপত্তা, তখন ঠিক করলাম তার গা ঘেঁসেই বসে থাকা

যাক। বেচাল দেখলেই আগে খতম করব তাকে।

প্রথম দিকে কিছুক্ষণ সোরগোলের পর চেঁচামেচি কমে এলে সর্দার বিকট অঙ্গভঙ্গি করে বক্তৃতা দিয়ে গেল বেশ কিছুক্ষণ ধরে-ক্যালোয় দাঁড়িয়েও এইরকম লেকচার দিতে শুনেছিলাম। এবারে কিন্তু 'অ্যানামু-উ-মু!' শব্দটাকে যতখানি গুরুত্ব দিয়ে উচ্চারণ করা হল, 'ল্যামা ল্যামা!' শব্দটাকে ততখানি আমল দেওয়া হল না। নিঃশব্দে শুনলাম বচনমালা-তিলমাত্র না বুঝেও। তারপর উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। বন্ধুত্ব এবং প্রীতিপূর্ণ বচনমালায় ঠাসা জমজমাট একখানা বক্তৃতা ঝেড়ে সর্দারকে আশ্বস্ত করলেন এবং সৌহার্দ্যের নিদর্শনস্বরূপ উপহার দিলেন খানকয়েক নীল পুঁতির মালা আর একটা ছুরি। পুঁতির মালা দেখে অবজ্ঞায় নাক সিঁটকোল সর্দার, কিন্তু অতীব তৃপ্ত হল ছুরিখানা হাতে নিয়ে এবং খানা আনার হুকুম দিল তৎক্ষণাৎ। পরিচারকরা মাথায় করে বয়ে আনল অজ্ঞাত একটা জানোয়ারের স্পন্দিত অন্ত্র। খুব সম্ভব সরু পা-ওলা শুয়োরের অন্ত্র-গাঁয়ে ঢুকতেই যাদের দেখেছিলাম। দেখেই তো আক্কেল গুড়ুম আমাদের-খাবার স্পৃহা উধাও হল তৎক্ষণাৎ। হাত গুটিয়ে বসে আছি দেখে সর্দার ভাবলে বুঝি এমন মুখরোচক খানা খাওয়ার প্রক্রিয়াটা আমাদের জানা নেই। তাই নিজেই খেতে খেতে দেখিয়ে দিলে পা-পাক দেওয়া পদ্ধতিটা। লম্বা অন্ত্রের একদিক থেকে গেলা আরম্ভ হল। একাই খেয়ে ফেলল বেশ কয়েক গজ। বিবমিষায় আমাদের উদরের অবস্থা তখন এমনই কাহিল যে নিশ্চয় তার অভিব্যক্তি ঘটেছিল চোখে মুখেও। নইলে অমন আঁতকে উঠবে কেন সর্দার। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যেভাবে আঁতকে উঠতে দেখেছিল্যাম-এবারের আতঙ্ক অবিশ্যি মাত্রায় তার চাইতে কিঞ্চিত কম। আমরা যদিও আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম, এমন উপাদেয় খানা না খাওয়ার কারণটা। পেটে একদম জায়গা নেই। এক পেট খেয়ে এসেছি যে জাহাজে!

সাঙ্গ হল নৃপতির ভোজন পর্ব। শুরু করলাম একটার পর একটা প্রশ্ন। সবই অবশ্য আকারে ইঙ্গিতে। প্রক্রিয়াগুলো আবিষ্কার করে নিতে হল ওইখানেই। জিজ্ঞেস করলাম, এ অঞ্চলে কি কি জিনিস অঢেল পাওয়া যায় এবং সেসব বস্তু আদৌ লাভজনক হবে কিনা। অনেক কসরত করার পর সর্দারের মাথায় ঢোকাতে পারলাম আমাদের জিজ্ঞাসাগুলো। অন্তত কিছুটা মানে আঁচ করতে পেরেছে বলে মনে হল। আঙুল তুলে দেখাল যে প্রাণীটাকে তার নাম biche de mer। বুঝিয়ে দিলে' এ প্রাণী বিস্তর পাওয়া যায় এ অঞ্চলে। নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে যাবে উপকূলে-তাদের

ভেরায়। জংলীদের ভিড় থেকে বেরিয়ে পড়ার সুযোগটা হাতছাড়া করলাম না। রাজি হয়ে গেলাম তৎক্ষণাৎ। তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলাম সর্দারের সঙ্গে-গ্রামের সমস্ত মেয়ে পুরুষ বাচ্চা চলল পেছন পেছন। সে এক দেখবার মত শোভাযাত্রা। পৌঁছোলাম দ্বীপের একদম দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে-জাহাজ নোঙর ফেলেছে সেখান থেকে খুব কাছেই। কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই জংলীদের ক্যানো চারখানা এসে গেল সামনে। বারোজনই উঠলাম একটা ক্যানোতেই। উপকূল বরাবর কিছুদূর যেতেই দেখলাম কাতারে কাতারে সেই বিশেষ প্রাণী-যা নিয়ে বাণিজ্য করলে কুবের হতে বেশি দেরী লাগে না। সভ্য দেশের কোন মানুষ এই জাতের এতগুলো প্রাণীকে একজায়গায় এভাবে জড়ো হয়ে থাকতে দেখেনি। এই অক্ষরেখায় কেন যে এরা পঙ্গপালের মত বংশবৃদ্ধি করে চলেছে, ভেবে পেলাম না। চারখানা জাহাজ বোঝাই হয়ে যায়-সংখ্যায় এত!

জাহাজের দিকে রওনা হওয়ার আগে সর্দারকে দিয়ে কথা আদায় করে নিলাম, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ক্যানো বোঝাই হাঁস আর গ্যালিপাগো কচ্ছপ এনে দিতে জাহাজে।

সন্দেহের উদ্রেক ঘটানর মত কিছুই কিন্তু লক্ষ্য করিনি দীর্ঘ এই অ্যাডভেঞ্চারের সময়ে-খটকা লেগেছিল কেবল একবারই।

জাহাজ থেকে নেমে গাঁয়ের দিকে যাওয়ার সময়ে বেশ ছকবাঁধা পদ্ধতিতে একটু একটু করে যখন দলে ভারি হয়েছিল দ্বীপবাসীরা।

২০

কথার খেলাপ করেনি সর্দার। টাটকা খাবার দাবার এসে পৌঁছেছিল অচিরেই-প্রচুর পরিমাণে। কচ্ছপগুলো অতীব উপাদেয়-এত স্বাদু কচ্ছপ জীবনে খাইনি। বুনো মোরগও পাঠিয়েছিল সর্দার-হাঁসগুলো অবশ্য মোরগের চাইতেও ভাল। মাংস বেশ নরম, সরস এবং গন্ধটাও খাসা। আকারে ইঙ্গিতে দ্বীপবাসীদের বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আরো কী কী চাই। তাই এনে দিলে প্রচুর পরিমাণে বাদামি শস্য, স্কার্ভি-ঘাস আর ক্যানো ভর্তি টাটকা মাছ আর শুঁটকি মাছ। শস্যটা খেতে চমৎকার। স্কার্ভি-ঘাস খেয়ে প্রাণে বেঁচে গেল স্কার্ভি রোগে যারা ধুঁকছিল। দিন কয়েকের মধ্যেই স্কার্ভি রোগী আর একজনও রইল না জাহাজে। এছাড়াও এসেছিল আরও অনেক টাটকা খাবার। যেমন, শামুকের মত খোলাওলা এক রকমের মাছ, দেখতে শুক্তির মত, কিন্তু স্বাদটা ঝিনুকের মত। চিংড়ি পেলাম দু-জাতের। পেলাম অ্যালবেট্রস পাখির ডিম। কালো খোসাওলা কিছু ডিমও পেলাম। অন্য প্রাণীর। শুকর মাংস এল রাশি রাশি। খালাসীরা খুব তারিফ করেছিল সেই মাংসের-আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগেনি-যেমন

আঁশটে গন্ধ, খেতেও তেমনি বিচ্ছিরি। এত খাবার-দাবার- এর বিনিময়ে দ্বীপবাসীদের দিলাম সামান্য কয়েকটা জিনিস ; নীল পুঁতির মালা, তামার বালা, পেরেক, ছুরি, আর লাল কাপড়ের কাটপিস। তাতেই কি খুশি বেটারা। রীতিমত হাট বসিয়ে দিলাম সৈকত ভূমিতে। জাহাজের কামানগুলোর মুখগুলো অবশ্য ফেরান রইল হাটের দিকেই। কিন্তু বেচাকেনা চলল বেশ বন্ধুত্ব পূর্ণ পরিবেশে-বিশৃঙ্খলার ছায়াও দেখা যায়নি। সংশয় অবিশ্বাসের বাষ্পটুকুও নেই কারো আচরণে। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু-ওরাও যেন বিশ্বাস দিয়ে জয় করেছিল আমাদের।

কিন্তু এ বিশ্বাস যে সুগভীর ষড়যন্ত্রকে সুকৌশলে দীর্ঘদিন ধরে ঢেকে রাখার একটা ছদ্ম-আবরণ মাত্র, তা বুঝেছিলাম পরে। বুঝেছিলাম, আমাদের ধরাধাম থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করার জন্যেই এত অমায়িক, এত বিনয়ী থেকে বন্ধুর মত, এত সাহায্য করে এসেছে দ্বীপবাসীরা। তামাম দুনিয়া এদের চাইতে নৃশংস, কুটিল পিশাচ প্রকৃতির মানুষ যে আর নেই-হাড়ে হাড়ে তা উপলব্ধি করেছিলাম দিন কয়েক পরে। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছিল !

দুই পক্ষের নিবিড় মিতালির মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় প্রথায় বাণিজ্য চলেছিল কিন্তু বেশ কয়েকদিন ধরে। এই সময়ে নেটিভদের বেশ কয়েকটা দল দেখে গেছে জাহাজ। আমাদের খালাসীরাও দল বেঁধে দেখে এসেছে দ্বীপের ভেতর পর্যন্ত। বিন্দুমাত্র নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়নি কাউকে। দ্বীপের প্রতিটা মানুষ যেন পরমাত্মীয় হয়ে উঠেছিল আমাদের।

দেখেশুনে একাধারে বাণিজ্য এবং দক্ষিণ অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাটা এসেছিল ক্যাপ্টেনের মাথায়।

বাণিজ্যটা অবশ্যই biche de mer নামক শম্বুক জাতীয় কোমলাঙ্গ জন্তুদের নিয়ে ! চীন দেশের মানুষের কাছে খুব চড়া দামে বিক্রি হয় এই শম্বুকজাতীয় প্রাণী। অঢেল পাওয়া যায় ভারত মহাসাগরে এবং প্রশান্ত মহাসাগরেরর উপকূলে। এদের খোলা থাকে না। দেহযন্ত্র বলতে শুধু খাদ্যবস্তু শুষে নেওয়া এবং বার করে দেওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু শুঁয়োপোকা বা গুটিপোকার মত ডানা আছে-তা টানলে বেড়ে যায়। এই ডানার সাহায্যেই গুটি গুটি গড়িয়ে চলে জলের তলা দিয়ে। সোয়ালো পাখি চঞ্চুর ঠোক্কর মেরে ভেতর থেকে টেনে বার করে জিলেটিনের মত চটচটে একটা বস্তু এবং তাই দিয়ে মজবুত করে বানায় নিজেদের বাসার দেওয়াল।

আকারে লম্বাটে ধাঁচের হয় এই শম্বুকজাতীয় প্রাণীরা-তিন থেকে আঠার ইঞ্চি পর্যন্ত। দু-ফুট লম্বা হতে দেখেছি কয়েকটাকে। প্রায় গোলাকার-তলার দিকটা চ্যাপ্টা-লেপটে থাকে সমুদ্রতলে। এক ইঞ্চি থেকে আট ইঞ্চি মোটা। বছরের

বিশেষ ঋতুতে গুটি গুটি যায় অগভীর জলে। ভাঁটার টানে জল সরে গেলে থেকে যায় উষ্ণ বালিতে। বাচ্চাদের কখনো কিন্তু অগভীর জলে আনে না-গভীর জল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি কেবল ধেড়েদের। যা থেকে প্রবাল তৈরী হয়, সেই জুফাইটস এদের প্রধান খাদ্য।

তিন-চার ফুট গভীর জল থেকে এদের তুলে এনে বালির ওপর ফেলে ছুরি দিয়ে চিরে দেওয়া হয় একটা দিক। শম্বুকের সাইজ অনুসারে চিরতে হয় কখনো এক ইঞ্চি, কখনো তারও বেশি। চেরা জায়গা দিয়ে চেপে বার করে আনা হয় ভেতরের নাড়িভুঁড়ি। জলে ধুয়ে ফোটাতে হয় কিছুক্ষণ। তারপর পুঁতে রাখতে হয় মাটির নীচে ঘণ্টাচারেক। তারপর আর এক দফা ফুটিয়ে নিয়ে শুকিয়ে নিতে হয় রোদে বা আগুণের আঁচে। রোদে শুকনোই সব চাইতে ভাল-তবে আগুনের আঁচে শুকলে অনেক কম সময়ে পরিমাণে বেশি শুঁটকি পাওয়া যায়। এরপর শুকনো জায়গায় বছর দুয়েক রেখে দিলেও নষ্ট হয় না-মাসতিনেক অন্তর কেবল দেখে নিতে হয় স্যাঁতসেঁতে হয়ে যাচ্ছে কিনা।

আজব এই শুঁটকির সবচাইতে বেশি কদর চীন দেশের মানুষের কাছে। অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং শক্তিবর্ধক। বুড়োকেও নাকি জোয়ান বানিয়ে ছাড়ে।

এমন একটা দামি জিনিস জাহাজ ভর্তি করে নিয়ে যাওয়ার চমৎকার একটা ফন্দী আঁটলেন ক্যাপ্টেন। দ্বীপবাসীদের দিয়েই শুঁটকি বানাবেন। মেহনতের দাম দেবেন লাল কাপড়, চুরি, বালা আর পুঁতির মালা দিয়ে। উপকূলেই কাঠের বাড়ি বানিয়ে গুদামজাত করে রাখবেন শুঁটকি শম্বুক। জাহাজের তিনজনকে রেখে যাবেন তদারকির জন্যে-বাকি সবাইকে নিয়ে দক্ষিণের অভিযান সেরে ফিরে এসে জাহাজ ভর্তি শুঁটকি নিয়ে রওনা হবেন সওদা করার উপযুক্ত দেশের দিকে।

সানন্দে রাজি হয়ে গেল সর্দার। খালাসীরা দ্বীপে নেমে গাছ কেটে ঘর বানালে। দেখে তো অবাক দ্বীপের জংলীরা।

মাসের শেষাশেষি রওনা হওয়ার জন্যে তোড়জোড় শুরু হল জাহাজে। সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালে সর্দার-যাওয়ার আগে তাকে আর একবার অতিথি সৎকারের সুযোগ দেওয়া হোক।

আপত্তি করেন নি বিবেচক ক্যাপ্টেন-খামোকা চটিয়ে লাভ কি? তবে হুঁশিয়ার রইলেন বিলক্ষণ। জাহাজে রেখে গেলেন ছজনকে। হুকুম দিয়ে গেলেন, কাউকে যেন জাহাজে উঠতে না দেওয়া হয় এবং সবকটা কামানে বারুদ ঠেসে চারদিকে ফিরিয়ে রাখা হয়-কোন দিক দিয়েই যেন কোন ক্যানো অতর্কিতে চড়াও হতে না পারে।

ব্যবস্থা সাঙ্গ করে আমরা বত্রিশজন নামলাম ডাঙায়। প্রায় শখানেক যোদ্ধা এল আমাদের খাতির করে নিয়ে যেতে। কিন্তু

কারোর কাছেই কোন অস্ত্র দেখতে পেলাম না। আমরা কিন্তু সশস্ত্র প্রত্যেকে। বন্দুক, পিস্তল, লম্বা ছোরা আছে প্রত্যেকের কাছেই। বন্দুকের মহিমা অবশ্যই কেউই জানে না। আগ্নেয়াস্ত্রের প্রলয়ংকর ক্ষমতা ইচ্ছে করেই গোপন রাখা হয়েছিল ওদের কাছে।

পথ দেখিয়ে পাঁচ-ছজন শক্তসমর্থ পুরুষ চলল সামনে-পাথর সরিয়ে পথ পরিষ্কার করতে করতে। বাকি জংলীরা এল পেছন পেছন। কুঅভিসন্ধিটা ঘুণাক্ষরেও তখনো কেউ আঁচ করতে পারিনি।

যাবার পথে পড়ল সেই ম্যাজিক নদী। তারপর দুর্গম গিরিসঙ্কট। চুনাপাথরের দেওয়াল দু-পাশে উঠে গেছে সত্তর-আশি ফুট পর্যন্ত-কোথাও কোথাও আরো উঁচুতে-এমনভাবে হেলে পড়েছে মাথার ওপর যে দিনের আলোও আসছে না-যেতে হচ্ছে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে। পথও সঙ্কীর্ণ। দশ বার ফুটের বেশি চওড়া নয় কোথাও-চলেছে এঁকেবেঁকে গোলকধাঁধার মত। মাঝে মাঝে এমন সরু গলি হয়ে গেছে যে পাঁচ-ছজনেও পাশাপাশি হাঁটতে পারছি না। মাইল দেড় দুই নাকি যেতে হবে এইভাবে।

ডানদিকে একটা খোঁদল দেখে ভেতরে ঢুকেছিলাম আমি। প্রায় ষাট-সত্তর ফুট উঁচু একটা ফাটল। নরম পাথর যেন আপনা থেকেই ফেটে গেছে। ফাটলের মুখটা একফুটের বেশি চওড়া নয়-কোনমতে একজন ঢুকে যেতে পারে। সামান্য বাঁয়ে ঢালু হয়ে আঠার থেকে বিশ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত গহ্বরটা দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকেই। খাটো ঝোপে একরকমের বাদাম ফলে রয়েছে দেখে আমি গিয়ে ঢুকেছিলাম তার মধ্যে। বাদাম তুলছি, এমন সময়ে দেখি পেছন পেছন এসেছে ডার্ক পিটার্স আর উইলসন অ্যালান। ধমক দিলাম এত সরু জায়গায় এত জনের ঢোকার জন্যে। ধমক খেয়ে ওরা পিছু হটতে যাচ্ছে, এমন সময়ে মনে হল যেন মেদিনী বিদীর্ণ হয়ে গেল, পৃথিবী ধ্বংস হতে চলেছে-

প্রলয়ংকর সেই সংঘাত-নিনাদের বর্ণনা দেওয়ার ভাষা আমার জানা নেই। এরকম অভিজ্ঞতাও জীবনে কখনো ঘটেনি।

২১

বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছিল বেশ কিছুক্ষণের জন্যে। লণ্ডভণ্ড কাণ্ড চলছিল মাথার মধ্যে।

সম্বিৎ ফিরে পেলাম যখন, দেখলাম প্রায় দম আটকে মরতে বসেছি। চারপাশে এবং মাথার ওপর প্রপাতের মত মাটি ঝরে পড়ছে-ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

জ্যান্ত কবরস্থ হতে চলেছি, ভয়ানক এই চিন্তাটাই ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল আমাকে। চনমনে হয়ে গেছিলাম নিমেষমধ্যে। নিদারুণ আতঙ্কে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম মাটির স্তূপের তলা থেকে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ভাবছিলাম কেন এমন হল। আচম্বিতে শুনলাম কে যেন কাতরাচ্ছে আমার কানের কাছে। পিটার্সের গলা। ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বাঁচাতে বলছে ওকে। অন্ধের মত দু-হাত সামনে বাড়িয়ে দু-পা যেতেই হাতে ঠেকল পিটার্সের মাথা আর ঘাড়। হাত বুলিয়ে টের পেলাম, কোমর পর্যন্ত ডুবে গেছে ধসে পড়া মাটির মধ্যে-প্রাণপণে চেষ্টা করছে নিজেকে টেনে বার করার। সর্বশক্তি দিয়ে মাটি সরিয়ে টেনে বার করলাম বেচারাকে।

আতঙ্ক আর বিস্ময়বোধ কাটিয়ে উঠতেই গেল বেশ কিছুক্ষণ। কথা বলার শক্তি পেলাম তারপর। হুট করে ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়াটা ঠিক হয়নি। আহাম্মক আমরা। মাটি ধসে পড়ায় তাই জ্যান্ত কবরস্থ হতে চলেছি। আলগা মাটি নিশ্চয় আমাদের তিনজনের ঠেলাঠেলি সইতে পারেনি। তাই এই দুর্ঘটনা। তখনকার সেই আতীব্র মানসিক যন্ত্রণা ভাষায় বোঝাতে পারব না। অনুরূপ অবস্থায় না পড়লে কেউ উপলব্ধিও করতে পারবে না। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, বাতাসের অভাবে ফুসফুস যেন ফেটে যাচ্ছে, ভিজে মাটির সোঁদা বাষ্পে গা-পাক দিচ্ছে-সবমিলিয়ে বর্ণনাতীত আতঙ্কের সঞ্চার ঘটায় জীবিত অবস্থাতেই মড়া হয়ে গেছি যেন দুজনেই।

পিটার্সই সবার আগে কাটিয়ে উঠল আচ্ছন্ন অবস্থা। এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরলে তো চলবে না। বাঁচার চেষ্টা করা যাক। এগিয়ে গিয়ে দেখাই যাক না বেরবার পথ পাওয়া যায় কিনা!

মরিয়া হয়ে সেই চেষ্টাই করেছিলাম। অতি কষ্টে মাটির স্তূপ থেকে নিজেকে টেনে বার করে এক পা এগতেই ক্ষীণ আলোর আভাস দেখেছিলাম। বিপুল আশায় নেচে উঠেছিল মনটা। যাক! দম আটকে তাহলে মরতে হবে না-কবরের মধ্যে বাতাসের অভাব অন্তত ঘটবে না। রাবিশ ঠেলে পাগলের মত এগিয়ে গেছিলাম আলো লক্ষ্য করে-যতই এগিয়েছি ততই টের পেয়েছি ফুসফুসের কষ্ট কমে আসছে। আরো একটু পরে ফাটলের শেষ প্রান্ত দেখতে পেলাম-ক্ষীণ আলোয় আশেপাশের অনেক কিছুই চোখে পড়ল। বাইরে থেকে দেখেছিলাম ফাটলটা সিধে আঠার থেকে বিশ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত। এখন দেখলাম, শেষ প্রান্তে ফাটল গহ্বর আচমকা বাঁদিকে মোড় নিয়ে প্রায় ঢালু হয়ে উঠে গেছে ওপর দিকে। আলো আসছেই সেইদিক দিয়েই-যদিও শেষ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠে যেতে পারলে নিশ্চয় খোলা বাতাসে পৌঁছে যাব।

কিন্তু অ্যালেন কোথায়। তাকে তো ফেলে যাওয়া যাবে না! সে ছিল ফাটলের মুখের কাছে-আমার ধমক খেয়ে ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে যেতে গিয়েই এই বিপত্তি ঘটিয়েছে নিশ্চয়। পিটার্স তার

নাম ধরে ডাকল-কিন্তু সাড়া দিল না অ্যালেন। ফিরে গিয়ে তাকে খুঁজে দেখতে যাওয়াটাও তো বিপজ্জনক। আলগা মাটি যদি আবার ধসে পড়ে মাথার ওপর? কিন্তু অকুতোভয় পিটার্সকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। মাটি ঠেলে ঠেলে অন্ধকারেই এগিয়ে গেল অ্যালেনের খোঁজে। একটু পরেই শুনলাম তার চিৎকার। পাওয়া গেছে অ্যালেনকে, কিন্তু দেহে প্রাণ নেই। ধসটা ভালভাবেই নেমেছে ঠিক তার ওপরেই-জীবন্ত কবর রচনা করেছে তৎক্ষণাৎ! বুক ভেঙে গেল শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ শুনে। কিন্তু আর দেরি করলে ঐ একই হাল হতে পারে আমাদেরও। তাই মড়া ফেলে রেখেই আমি আর পিটার্স রওনা হলাম বাঁকের দিকে।

ঢাল বেয়ে উঠতে প্রাণ বেরিয়ে গেছিল। গিরিসঙ্কটের পাথরটা সোপস্টোন জাতীয়-নরম টাল্‌ক জাতীয় উপাদানই এর মধ্যে রয়েছে বেশি-পিচ্ছিল এবং পা হড়কে যাচ্ছে পদে পদে। মাঝে মাঝে এমন খাড়াই হয়ে গেছে ফাটল যে যতটা হাঁচড়-পাঁচড় করে উঠছি, নেমে আসছি তার চাইতেও বেশি। প্রতিবারই শিউরে উঠছি নিঃসীম আতঙ্কে-এই বুঝি আবার ধস নামল মাথার ওপর-জীবন্ত সমাধি আর আটকানো যাবে না। ভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে হাতে ঠেকেছিল স্লেট পাথরের খোঁচা খোঁচা টুকরো। তাই খামচে ধরেছি, তাতে পা দিয়ে দিয়ে উঠেছি। তারপর একেবারে বেদম হয়ে বেরিয়ে এসেছি জঙ্গল পরিবৃত গিরিবর্ত্মের মাথায়। পেছন ফিরে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখেছি যে সংঘাতের ফলে ধস নেমে সমাধিস্থ হতে চলেছিলাম, সেই সংঘাতের ফলেই ফাটলটা তৈরী হয়ে গেছে সদ্য-বেরবার পথ পেয়েছি সেই কারণেই। মাথার ওপর নীল আকাশ। ধড়ে প্রাণ ফিরে পেয়ে প্রথমেই মনে হয়েছে পিস্তল নির্ঘোষ শুনিয়ে সাঙ্গপাঙ্গদের জানান থাক যে আমরা বেঁচে আছি এখনো। পিস্তল ছাড়া কোমরে আর কিছুই ছিল না তখন। ছোরা আর বন্দুক পড়ে রয়েছে নিচে-মাটির তলায়।

কিন্তু পিস্তল ছু ড়িনি শেষ পর্যন্ত। ছুঁড়লে আর প্রাণে বাঁচতাম না। শেষ মুহূর্তে আমার কেমন জানি সন্দেহ হয়েছিল, দুর্ঘটনাটা প্রাকৃতিক নয়। নিশ্চয় মানুষের হাতে ঘটান। তাই পিস্তল ছুঁড়ে দ্বীপবাসীদের সজাগ করে দিতে চাইনি-বাধা দিয়েছিলাম পিটার্সকে। ওরা যেন না জানতে পারে আমরা রয়েছি কোথায়।

সঙ্কীর্ণ ফাটল বেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলাম চ্যাটাল একটা জায়গায়। চারপাশে উঁচু পাথর আর গাছ। হঠাৎ কানে ভেসে এল আর্ত চিৎকারের পর চিৎকার। গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল সেই আর্তনাদ পরম্পরা শুনে। গুঁড়ি মেরে গাছ আর পাথরের কিনারায় পৌঁছে উঁকি দিতেই উঁচু থেকে চোখের সামনে ভেসে উঠল পুরো

অঞ্চলটা এবং উদঘাটিত হয়ে গেল প্রলয়ঙ্কর সংঘাতের ভয়াল গুপ্ত রহস্য!

আমরা রয়েছি গিরিসঙ্কটের পশ্চিম পাড়ে-সব চেয়ে উঁচু শিখরটার কাছে। পুব পাড়ে দেখা যাচ্ছে কতকগুলো কাঠের মোটা মোটা খুঁটি এক গজ অন্তর পোঁতা ফুট দুয়েক গভীরে। পাশে পাশে এক গজ অন্তর এরকম খুঁটি পোঁতার চিহ্নও দেখা যাচ্ছে এদিক থেকে-খুঁটি আর এখন নেই-চিহ্নটা কেবল রয়ে গেছে। যে খুঁটিগুলো এখনো রয়ে গেছে-তাদের মাথায় বাঁধা মজবুত লতা। একই লতায় প্রতিটা খুঁটিকে লাইন দিয়ে বাঁধা। খুঁটিগুলো পোঁতা হয়েছে কিনারা থেকে দশ বার ফুট দূরে। প্রায় তিনশ ফুট লম্বা অঞ্চলে এমনি খুঁটি অথবা খুঁটি পোঁতার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে মাটির গায়ে।

অর্থাৎ প্রায় শখানেক খুঁটির ওপরই দড়ি বেঁধে রাখা হয়েছিল পুব পাড়ে-অনেক উঁচুতে। এখানকার বিশেষ ধরনের নরম পাথর আপনা থেকেই ফেটে যায়। এই রকম একটা ফাটলের মধ্যে ঢুকেছিলাম আমরা তিনজন-প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে এসেছি এই ধরনেরই ফাটল দিয়ে। নরম পাথর বলে ফাটল তৈরী হয় সামান্য বিপর্যয়ে। এমনি একটা টানা লম্বা ফাটলে তিনশ ফুট লম্বা জায়গায় একশটা খুঁটি পুঁতে একসঙ্গে লতা দিয়ে বেঁধে হ্যাঁচকা টান দিয়েছে নৃশংস দ্বীপবাসীরা বিশেষ একটা সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

ফলে, পুব পাড়ের পুরো পাহাড়টা ধসে পড়েছে গিরিসঙ্কটের মধ্যে-একশ ফুট জায়গা জুড়ে পড়েছে রাশি রাশি পাথর। আমরা বত্রিশ জন ছিলাম ঐ একশ ফুটের মাঝখানে-প্রায় পঞ্চাশ ফুট জায়গা জুড়ে।

তাই নিমেষে সমাধিস্থ হয়েছে পুরো দলটা।

দ্বীপে জীবিত শ্বেতকায় মানুষ বলতে এখন আমরা শুধু দুজন-ডার্ক পিটার্স আর আমি!

২২

জ্যান্ত সমাধি হয়ে গেল বলে পরিস্থিতি যতটা ভয়ঙ্কর কল্পনা করেছিলাম, এখনকার পরিস্থিতি দাঁড়াল তার চাইতেও ভয়াবহ। হয় এখন মরতে হবে নৃশংস বর্বরদের হাতে, নয় তো ওদের গোলাম হয়ে অসীম নির্যাতন সহ্য করে যেতে হবে যতদিন না অক্কা পাচ্ছি। গভীর অরণ্য অঞ্চলে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারি অবশ্য, পাহাড়ের ফাটলে বা খোঁদলেও লুকিয়ে থাকতে পারি-এইমাত্র যে ফাটল থেকে বেরিয়ে এলাম, তার মধ্যেও ঘাপটি মেরে থাকতে পারি। কিন্তু মেরু অঞ্চলে সুদীর্ঘ শীত যখন শুরু হবে, তখন নিদারুণ ঠাণ্ডায় আর অনাহারে মৃত্যুকে তো এড়াতে পারব না। উষ্ণ ছাউনি আর খাদ্যের সন্ধানে বেরলেই ধরা পড়ব-তারপর

জবাই হতে কতক্ষণ। পরিস্থিতি সত্যিই অতীব ভয়াবহ।

উঁচু থেকে দেখতে পাচ্ছি গোটা দ্বীপটায় পিলপিল করছে কৃষ্ণকায় উলঙ্গ জংলী। নিশ্চয় দক্ষিণ দিকের পাশের দ্বীপ থেকে এসেছে চ্যাপ্টা ভেলায় চড়ে–'জেন' জাহাজ দখল এবং লুঠ করার মতলবে। উপসাগরে দিব্বি শান্তভাবে ভেসে রয়েছে জাহাজ। খালাসী ছ-জন বোধ হয় জানেই না কি ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে গেল এখুনি এবং বিপদ এগিয়ে যাচ্ছে তাদের দিকেও। পাশে গিয়ে যদি এখন দাঁড়াতে পারতাম আমি আর ডার্ক পিটার্স–নরমেধ যজ্ঞ কাকে বলে দেখিয়ে দিতাম। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতাম আশ মিটিয়ে। আর সংখ্যায় বেশি বর্বরদের সঙ্গে টক্কর দিতে না পারলে চম্পট দেওয়ার একটা উপায় তো উদ্ভাবন করা যেত সবাই মিলে মাথা খাটিয়ে–অথবা লড়তে লড়তেই মৃত্যুবরণ করা যেত একসঙ্গে।

কিন্তু তা সম্ভব নয়। হুঁশিয়ার করাও সম্ভব নয়। তার আগেই প্রাণ যাবে আমাদের। তাতে ওদের উপকার তো হবে না, সুতরাং গোঁয়ার্তুমি করে লাভ কী?

পিস্তল ছুঁড়লে হয় না? পিস্তল নির্ঘোষ শুনিয়ে সাবধান করে দিতে তো পারি! আওয়াজ শুনে নিশ্চয় বুঝবে গোলমাল একটা কিছু ঘটেছে। কিন্তু পরিত্রাণের একমাত্র পথ যে এখুনি নোঙর তুলে চম্পট দেওয়া, পিস্তল নির্ঘোষের মধ্যে দিয়ে তো সে খবর জানানো যাবে না। জানান যাবে না যে সঙ্গীরা কেউ আর বেঁচে নেই, তাদের উদ্ধার করার জন্যে মৃত্যুপণ করে বসে থাকাও এখন বাতুলতা। জংলীরা প্রস্তুত জাহাজ লুঠের জন্যে–প্রস্তুত অনেক দিন থেকেই। গুলির আওয়াজ শুনিয়ে উপকার তো করতেই পারব না, চূড়ান্ত ক্ষতি হয়ে যাবে। এই সব বিবেচনা করে পিস্তল ছোঁড়া সমীচীন বোধ করলাম না।

তারপরেই ভাবলাম তেড়ে গিয়ে চারখানা ক্যানোর একখানা দখল করে জাহাজে উঠে পড়লেই তো হয়। কিন্তু তা সম্ভব নয় একেবারেই। দ্বীপের সর্বত্র জংলীরা টহল দিচ্ছে–এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। পাহাড় জঙ্গলের আনাচে কানাচে যারা ওৎ পেতে আছে, তাদের দেখতে না পেলেও সংখ্যায় নিশ্চয় অগুন্তি। উপকূল অভিমুখে যেতে গেলে যে পথ মাড়িয়ে যেতে হবে–পালে পালে সশস্ত্র বর্বর ঘুরছে ঠিক সেই সেই জায়গায়। ক্যানো চারখানা যেখানে ভাসছে, তার সামনেই সৈকতভূমিতে সর্দারের নেতৃত্বে জড়ো হয়েছে বিরাট একটা দল–তোড়জোড় চলছে নিশ্চয় জাহাজ লুঠের। ক্যানোয় যারা রয়েছে, তারাও নিশ্চয় নিরস্ত্র নয়। মাত্র দুজন আমরা। এতগুলো সশস্ত্র মানুষকে ঠেঙিয়ে জাহাজে পৌঁছতে পারব না কখনোই। না, কখনোই না। তার চাইতে বরং লুকিয়ে থাকা যাক।

আধঘণ্টাও গেল না। দক্ষিণ দিক থেকে ষাট সত্তরটা চ্যাপ্টা

ধরনের ভেলা-নৌকো এসে পৌঁছল ক্যানো চারখানার সামনে-যোদ্ধাদের প্রত্যেকের হাতে কাঠের মুগুর-স্তূপাকারে পাথর রয়েছে নৌকোর ওপর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিক থেকেও এসে গেল আরো নৌকো-সংখ্যায় আরো বেশি-প্রত্যেক নৌকোতেই রয়েছে মুগুরধারী যোদ্ধা, পায়ের কাছে রাশি রাশি নুড়ি পাথর। ক্যানো চারখানাতেও উঠে পড়ল সশস্ত্র যোদ্ধারা। লিখতে যতটুকু সময় গেল, তার চাইতেও কম সময়ে, যেন ম্যাজিকের মত, 'জেন' জাহাজকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল এতগুলো জলযান। কালো মানুষ গিজগিজ করছে প্রতিটি নৌকোয়। শুরু হয়ে গেল নরক গুলজার করা পৈশাচিক চিৎকার।

জাহাজে যে ছ-জন রয়েছে, তারা হতচকিত হয়ে গেছিল নিশ্চয়। নইলে অমন এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে যাবে কেন? চারখানা ক্যানোই তখন পিস্তলের আওতার মধ্যে এসে গেছে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে লক্ষ্য স্থির রাখলে নির্ঘাৎ ঘায়েল করা যেত কয়েকজনকে। কিন্তু তা তো হল না। গুলি বেরিয়ে গেল জংলীদের মাথার ওপর দিয়ে।

আগেই বলেছি, আগ্নেয়াস্ত্রের মহিমা এদের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। তাই আচমকা দমাদম আওয়াজ, আগুনের ঝলক আর ধোঁয়া দেখে বিষম বিস্ময়ে থ হয়ে গেছিল জংলীরা বেশ কিছুক্ষণের জন্যে। ভাবলাম এবার বুঝি নিশ্চয় রণে ভঙ্গ দেবে। কিন্তু তা ঘটল না। বিহ্বল অবস্থা কাটিয়ে উঠেই চতুর্দিক থেকে আবার কয়েকশ ভেলা-নৌকো আর ক্যানো ছেয়ে ধরল জাহাজকে।

জাহাজের ছ-জন যে কামান দাগার ব্যাপারে তেমন পোক্ত নয়, তা জানতাম। গোড়া থেকেই যদি উপর্যপরি কামান বর্ষণ করে খানকয়েক নৌকো ধ্বংস করতে পারত-অবস্থাটা দাঁড়াত নিশ্চয় অন্যরকম।

কিন্তু কামান দাগা হল বড় দেরিতে। কানে তালা ধরান শব্দে গোলা ছিটকে গিয়ে টুকরো টুকরো করে দিলে সাত আট খানা ভেলা-নৌকোকে। তিরিশ চল্লিশ জন জংলী খতম হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ-শখানেক জংলী সাংঘাতিক জখম হয়ে ঠিকরে পড়ল জলে-আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে সাঁতরাতে লাগল যে যেদিকে পারে।

কামান দাগা হয়েছিল জাহাজের একপাশ থেকে। সেইদিকের জলে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড সৃষ্টি করে খালাসী ছ-জন দৌড়েছিল জাহাজের আর একপাশে সেদিককার কামান দাগবে বলে। কিন্তু তখন আর সময় কোথায়? ক্যানো-চারখানা নক্ষত্র বেগে ততক্ষণে পৌঁছে গেছে জাহাজের পাশে। শেকল ধরে শখানেক জংলী উঠে পড়েছে ডেকে। পলতেতে আগুন ধরানর সময়ও পেল না ছ-জনে-নিমেষে টুকরো টুকরো হয়ে গেল দেড়শ নৃশংস জংলীর হাতে!

ছত্রভঙ্গ ভেলা নৌকোর যোদ্ধারা তাই দেখেই ফিরে পেল হারান

সাহস। দ্বিগুণ উদ্যমে দলে দলে ধেয়ে এল জাহাজের দিকে। উঠে পড়ল ডেকে। শুরু হয়ে গেল লুঠতরাজ এবং ধ্বংসলীলা। পাল, দড়িদড়া, আসবাবপত্র-তছনছ হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে। ক্যানোয় করে দড়ি ধরে টেনে এবং হাজার হাজার জংলী সাঁতার কেটে জাহাজটাকে ঠেলতে ঠেলতে এনে ফেলল উপকূলে।

সর্দার মহাপ্রভু ওস্তাদ সেনাধ্যক্ষের মতই এতক্ষণ উপকূলে দাঁড়িয়ে পরিচালনা করছিল লুঠেরাদের-একদম নড়েনি সেখান থেকে। অসংখ্য যোদ্ধা ঘাপটি মেরে ছিল পাহাড়ের মধ্যে সঙ্কেতের প্রতীক্ষায়। পরিকল্পনামাফিক কাজ হাসিল হয়েছে দেখেই পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকা স্যাঙাৎদের ডেকে নিয়ে এগিয়ে এল সামনে।

সুযোগটা নষ্ট করলাম না। কালো যোদ্ধারা পাহাড়ের মধ্যে থেকে যেই নেমে গেল জাহাজ লুঠের লোভে, আমরাও বেরিয়ে এলাম বাইরে। গিরিসঙ্কটের মুখেই একটা ঝর্ণার জল পান করে মেটালাম অসহ্য তৃষ্ণা। তারপর বাদাম সংগ্রহ করলাম ঝোপ থেকে-যে বাদামের কথা আগেই বলেছি। খেয়ে দেখলাম মন্দ নয়। টুপিভর্তি বাদাম নিয়ে লুকিয়ে রাখলাম পাহাড়ের ফাটলে। ঠিক এই সময়ে একটা আওয়াজ শুনে চমকে উঠেছিলাম। ত্রস্তে ফিরে দেখলাম, ঝোপের মধ্যে বিশালকায় একটা পাখি বেরিয়ে এসে ওড়বার ফিকিরে আছে। দৌড়ে গেল পিটার্স-ক্যাঁক করে গলা খামচে ধরতেই সে কী ঝটপটানি আর বিশ্রী চিৎকার। সর্বনাশ! জংলীদের কানে গেলে আর রক্ষে নেই! পিটার্স অবশ্য তৎক্ষণাৎ পকেট ছুরির এক কোপে ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলে বিকট বিহঙ্গের। টেনে হিঁচড়ে রাখলাম গিরিসঙ্কটের ফাটলে। এক হপ্তার মত খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করে নিলাম এইভাবে।

তারপর গেলাম দক্ষিণ দিকে আরও খাবার-দাবারের খোঁজে। পেলাম না কিছুই। অগত্যা শুকনো কাঠ নিয়ে যখন ফিরছি গোপন ফাটলের দিকে, দেখলাম জনা কয়েক জংলী জাহাজ থেকে লুঠ করা মালপত্র কাঁধে নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে পাহাড়ের নীচ দিয়ে যাচ্ছে গ্রামের দিকে। লুকিয়ে পড়লাম তৎক্ষণাৎ।

লুকোনোর জায়গাটা আরো গুপ্ত অবস্থায় রাখতে হল এরপর। ফাটলের ওপর দিয়ে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছিল-এইখান দিয়েই মঞ্চের মতো চ্যাটালো জায়গাটায় বেরিয়ে এসেছিলাম দুজনে। ঝোপঝাড় টেনে এনে বন্ধ করে রাখলাম ফাটলের সেই মুখটা-দৈবাৎ যদি কেউ নীচের দিক থেকে ভেতরে ঢুকেও পড়ে-আলো বা আকাশ দেখতে পাবে না-ওপরে ওঠার চেষ্টাও করবে না।

কিন্তু এছাড়াও আরও আস্তানা করা দরকার। কে জানে এখান থেকেও হঠাৎ পালাতে হবে-অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে। ঠিক করলাম, সুযোগ পেলেই পাহাড়ের চুড়োয় উঠে খুঁজে দেখব

অন্য কোন গোপন বিবর পাওয়া যায় কিনা। আপাতত গিরিবর্ত্মের মাথা থেকে দেখা যাক শয়তান জংলীদের কাণ্ডকারখানা।

যা দেখলাম, তা চোখে জল এনে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। জাহাজ লুঠ সম্পূর্ণ হয়েছে-ভেঙেচুরে একসা করে এনেছে। এখন আগুন লাগানোর চেষ্টা চলছে। মূল হ্যাচের দিক থেকে ঘন ধোঁয়া উঠছে। একটু পরেই আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠল ডেকের সামনের দিকে। আগুন লেগে গেল তৎক্ষণাৎ দড়িদড়া, মাস্তুলে-পালগুলোর যেটুকু পড়েছিল, দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল সেগুলোও। দেখতে দেখতে আগুন ছড়িয়ে গেল সারা ডেকে। জংলীরা তখনো দলে দলে জাহাজ ঘিরে দাঁড়িয়ে পাথর কুড়ুল আর কামানের গোলা দিয়ে দমাদম করে ঠুকছে বল্টু, লোহার পাতে আর তামার কারুকাজ। প্রায় হাজার দশেক জংলী ঘিরে রয়েছে জাহাজকে। আরো হাজার দশেক বর্বর লুঠের মাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সৈকত ভূমির ওপর দিয়ে। প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয়টা ঘটতে যে আর বেশি দেরী নেই, আঁচ করেছিলাম তখুনি। ঘটলও তাই। আচমকা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল যেন জাহাজে-থরথর করে কেঁপে উঠল যেন গোটা জাহাজটা। গিরিবর্ত্মের মাথায় দাঁড়িয়েও টলে উঠেছিলাম আমরা দুজন সেই সংঘাতে। বুঝলাম বিস্ফোরণ ঘটল জাহাজের খোলে-কিন্তু চোখে তা দেখা যায়নি প্রথমদিকে। দারুণ চমকে উঠেছিল জংলীরা। চেঁচামেচি হট্টগোল থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। স্তব্দ হল দমাদম করে জাহাজ ঠোকা। তারপরেই আবার যেই পাথর, কুড়ুল আর কামানের গোলা মাথার ওপর তুলেছে বাড়ি মারবে বলে, ঠিক সেই সময়ে ভক করে তাল তাল ধোঁয়া ঠিকরে গেল ডেকের ওপর থেকে। ঠিক যেন বজ্রগর্ভ মেঘ। আর তারপরেই জাহাজের উদর থেকে যেন ঠিকরে ধেয়ে এল সুদীর্ঘ অগ্নিশিখা-ছিটকে গেল প্রায় সিকি মাইল উঁচুতে। পরক্ষণেই বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ল অগ্নিরাশি এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুরো তল্লাট জুড়ে ভোজবাজির মত ছড়িয়ে গেল টুকরো কাঠ, ধাতু, খণ্ডবিখণ্ড মনুষ্যদেহ-চক্ষের নিমেষে ঘটল এই কাণ্ড। সবশেষে টের পাওয়া গেল ভয়ানক বিস্ফোরণের প্রলয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া-গিরিবর্তের্ম্যর মাথায় দাঁড়িয়েও ঠিকরে পড়লাম আমরা মাটিতে। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি গমগমে শব্দলহরী ধেয়ে গেল পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে-অতি সূক্ষ্ম ধ্বংসাবশেষ নক্ষত্রবেগে ধেয়ে গেল আমাদের চারপাশ দিয়ে

জংলীদের যে হাল হল, তা কহতব্য নয়। কল্পনাও করতে পারিনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঘটবে এইভাবে। যে হাজার দশেক শয়তান জাহাজ পিটে চলেছিল এতক্ষণ ধরে-চক্ষের পলকে তারা টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে গেল ডাঙায় আর সমুদ্রের জলে। আরো হাজার দশেক ডাঙার ওপরে থেকেও রেহাই পেল

না-মারাত্মক জখম হয়ে ঠিকরে গেল বহুদূরে। মড়া আর আধ মরায় ছেয়ে গেল সমুদ্র আর সৈকত। আচমকা এই বিপর্যয়ে চ্যাচা আপন প্রাণ বাঁচা নীতি অবলম্বন করে কেউ আর কারোর দিকে তাকাচ্ছে না-কে মরল, কে বাঁচল, কে জখম হল-সেসব ভাববার মত মনের অবস্থা নেই। কোনমতে জখম শরীরগুলোকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে জল আর স্থলের ওপর দিয়ে। তারপর দেখলাম আতঙ্ক কাটিয়ে উঠেছে র‍্যাক্সেলরা। বিষম উত্তেজনায় দল বেঁধে ছুটে যাচ্ছে সৈকতভূমির বিশেষ একটা দিকে। আচরণটা রীতিমত অদ্ভুত। তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে বটে-আকাশ-বাতাস যেন চৌচির হয়ে যাচ্ছে সম্মিলিত চিৎকারে-কিন্তু চিৎকারের মধ্যে মিলেমিশে রয়েছে নিদারুণ বিভীষিকা, নিঃসীম ক্রোধ আর আত্যন্তিক কৌতূহল। চোখেমুখেও দেখা যাচ্ছে সেই অভিব্যক্তি। গলা ফাটিয়ে বার বার আওড়াচ্ছে কিন্তু একটাই শব্দ-'টেকেলি-লি ! টেকেলি-লি !'

কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম, বিশাল একটা দল গেল পাহাড়ের দিকে ; ফিরে এল রাশি রাশি কাঠের খুঁটি নিয়ে। জমায়েত যেখানে সবচেয়ে বেশি, খুঁটিগুলো নিয়ে গেল সেই দিকেই। খুঁটি নিয়ে এগতেই সরে গিয়ে পথ করে দিলে জংলীরা-উত্তেজনার কারণটাও তখন দেখতে পেলাম সুস্পষ্ট।

সাদা মতন কি যেন একটা পড়ে রয়েছে কালো বালির ওপর। প্রথমে বুঝতে পারিনি জিনিসটা কি। তারপরেই বুঝলাম।

আগেই বলেছি, আঠারই জানুয়ারি সমুদ্রে একটা অদ্ভুত প্রাণী পেয়েছিলাম-যার দাঁত আর থাবার নখ টকটকে লাল রঙের। ক্যাপ্টেন গাই বিচিত্র পশুটাকে কেবিনের লাকারে রেখে দিয়েছিলেন খড় পুরে ইংল্যাণ্ড নিয়ে যাবেন বলে। বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভট এই প্রাণীটাই ঠিকরে এসে পড়েছে ডাঙায়।

কিন্তুতকিমাকার জীবটাকে নিয়ে এত উত্তেজিত হয়েছিল কেন জংলীরা, তা কিন্তু বুঝতে পারলাম না। ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বটে-কিন্তু বেশ তফাতে-কাছে আসছে না কেউই। খুঁটিগুলোও গোল করে পোঁতা হল বিচিত্র জীবের বেশ খানিকটা দূরে-বেড়া দেওয়া সাঙ্গ হতেই জংলীদের পুরো দলটা 'টেকেলি-লি ! টেকেলি-লি !' বলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল গ্রামের দিকে।

২৩

এর পরের ছ-সাতদিন গোপন বিবর থেকে বেরিয়ে ছিলাম কদাচিৎ। খুব সাবধানে খুঁজে পেতে এনেছি বাদাম-ঝরনার জলে মিটিয়েছি তেষ্টা। মঞ্চের মত জায়গাটায় মাথার ওপর আচ্ছাদন দিয়ে মোটামুটি একটা ছাউনি বানিয়ে নিয়েছিলাম, মেঝেতে পেতেছিলাম শুকনো পাতার বিছানা। তিনটে বড় চ্যাটালো পাথর

জুড়ে যে ফায়ারপ্লেস বানিয়েছিলাম, টেবিলের কাজও চালিয়েছিলাম তাই দিয়ে। আগুন জ্বালিয়ে ছিলাম একটা শক্ত কাঠের সঙ্গে আর একটা নরম কাঠ ঘষে। পাখির মাংস খেতে মন্দ নয়–একটু যা শক্ত। সামুদ্রিক মোরগ যদিও নয়–বক জাতীয় পাখি বলা যায়–পালক কুচকুচে কালো এবং তেলতেলে। শরীরের অনুপাতে ডানা অনেক ছোট। পরে একই জাতের আরো তিনটে পাখিকে উড়তে দেখেছিলাম আশেপাশে–এসেছিল নিশ্চয় প্রথম পাখিটার খোঁজে–যার মাংসে উদরপূজা করেছি এই ছ-সাতদিন। তিনটের কোনটাকেই ধরতে পারিনি আকাশ থেকে মাটিতে না নামায়।

পক্ষীমাংস ফুরিয়ে যেতেই খাবারের প্রয়োজন দেখা দিল। শুধু বাদামে কি খিদে মেটে ? পেট ভরে খেলেও বিপদ। পেট কামড়ায়, মাথা ব্যথা করে। পাহাড়ের পূবদিকের সৈকতে বেশ কয়েকটা বড় কচ্ছপ দেখেছিলাম। ঠিক করলাম, দ্বীপবাসীদের চোখ এড়িয়ে পাহাড় থেকে নেমে ধরে আনব একটাকে।

দক্ষিণ দিকের ঢাল বেয়ে কিছুটা নামবার পরেই আর যেতে পারলাম না। যে গিরিসঙ্কটে সমাধিস্থ হয়েছে জাহাজের সঙ্গীরা, তারই একটা শাখা পথ জুড়ে রয়েছে সামনেই। কিনারা বরাবর সিকি মাইল যাওয়ার পর আবার থমকে দাঁড়াতে হল। নিতল খাদ পড়ল সামনে। ফিরে এলাম মুখ চুন করে।

এবার গেলাম পূবদিকে। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ হল সেদিকেও। অতি কষ্টে প্রাণটাকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে কোনমতে নীচে নামবার পর দেখলাম বিশাল একটা গহ্বর। চারপাশে কালো গ্র্যানাইট পাথর, পায়ের তলায় মিহি ধুলো। গহ্বর থেকে বেরবার পথ একটাই–নেমেছি যে পথ দিয়ে।

কালঘাম ছুটে গেল সেই পথ বেয়ে ওপরে উঠতে। চেষ্টা চালালাম উত্তর দিকে, খুব সাবধানে। গাঁয়ের জংলীদের চোখে পড়ে যেতে পারি, যে কোন মুহূর্তে। কখনো হামাগুড়ি দিয়ে, কখনো ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বুকে হেঁটে বেশ কিছুটা পথ যাওয়ার পর পৌঁছলাম সুগভীর একটা খাদের সামনে। এত গভীর খাদ জীবনে দেখিনি। খাদটা সরাসরি গিয়ে মিলেছে মূল গিরিসঙ্কটে।

এই ভয়টাই করেছিলাম প্রথম থেকে। একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি বহির্জগৎ থেকে। মুষড়ে পড়লাম খুবই। কী কষ্ট করে যে ফিরে এসেছিলাম মঞ্চের মতন চ্যাটাল গোপন আলয়ে, তার বর্ণনা আর দিতে চাই না। ঘাসের বিছানায় টেনে ঘুমোলাম ঘণ্টাকয়েক।

নিষ্ফল এই প্রচেষ্টার পর অভিযান চালালাম পর্বতচূড়া অঞ্চলে–খাবারদাবারের সন্ধানে। বাদাম আর কার্জি-ঘাস ছাড়া কিছু পাইনি। যতদূর মনে পড়ে, পনেরই ফেব্রুয়ারি নাগাদ সামান্য এই আহার্যের ভাণ্ডার শূন্য হয়ে এল। হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকা

ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। পনেরই ফেব্রুয়ারি তারিখটা মনে থাকার কারণ, ঐদিনেই আবার দেখলাম দূর দক্ষিণ দিগন্তে ধূসর বাষ্পরাশি। জাহাজে করে আসার সময়েও দেখেছিলাম বিচিত্র এই বাষ্পকুণ্ডলী-আগেই তা লিখেছি।

ষোলই ফেব্রুয়ারি আবার চক্কর দিয়ে এলাম বন্দীশালার প্রাচীর বরাবর-ফিরে এলাম নিরাশ হয়ে। ফাটল দিয়ে নামলাম গিরিসঙ্কটে-সঙ্গীরা পাথর চাপা পরে রয়েছে যেখানে। ভেবেছিলাম বেরবার পথ একটা পাব। কিছুই পাইনি। কুড়িয়ে পেলাম একটা বন্দুক। ফিরে এলাম তাই নিয়ে।

সতের তারিখে আবার গেলাম কালো গ্র্যানাইটের গহ্বরে। প্রথমবার গহ্বরের গায়ে একটা ফাটল দেখেছিলাম। তাড়াহুড়োয় ভাল করে দেখা হয়নি। এবার ঠিক করলাম, ভেতরে ঢুকে দেখা যাক বেরবার পথ পাওয়া যায় কিনা।

গহ্বরটা সত্যিই অত্যাশ্চর্য। পুরোপুরি প্রকৃতির হাতে গড়া বলে মনে হয়নি। পূব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত লম্বায় প্রায় পাঁচশ গজ-আঁকাবাঁকা পথ ধরে গেলে। সরলরেখায় দূরত্বটা চল্লিশ পঞ্চাশ গজের বেশি নয়। পাহাড়চূড়া থেকে শখানেক গজ নামবার পর দেখলাম গহ্বরের দুদিকের দেওয়াল দুরকমের-একই রকমের উপাদান নেই কোনো দিকেই-কোনো কালে ছিল বলেও মনে হল না। একদিকে রয়েছে একরকমের কালো রঙের উর্বর মাটি-যা জমিতে সার দেওয়ার কাজে লাগে। ধাতুর মত বস্তু মিশে রয়েছে এই মাটিতে। আর একদিকে রয়েছে নরম সোপস্টোন-যার মূল উপাদান টাল্‌ক। দুদিকের এই দুই বিসদৃশ খাড়াই পর্বত-প্রাচীরের মাঝখানের জায়গাটুকু খুব সম্ভব ষাট ফুটের বেশি চওড়া নয়। আরো নিচে নামবার পর দেখলাম, দুপাশের খাড়াই পর্বত-প্রাচীর প্রসারিত রয়েছে সমান্তরালভাবে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত-প্রাচীরের উপাদান কিন্তু আগের মতই বিসদৃশ-দুরকমের উপাদান রয়েছে দুদিকে। তলদেশ থেকে পঞ্চাশ ফুট ওপরে পৌঁছে কিন্তু দেখা গেল সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে দুদিকের দেওয়ালে। বৈসাদৃশ্য একেবারেই নেই। একই উপাদান, একই রঙ। চকচকে কালো গ্র্যানাইট পাথর। মাঝের ব্যবধানটাও কুড়ি গজের বেশি নয় কোথাও। বিচিত্র এই গহ্বরের একটা নকশা এঁকে নিয়েছিলাম পকেটবুকে। পেন্সিলও ছিল সঙ্গে। সুদীর্ঘ অ্যাডভেঞ্চার পর্বে এই দুটি বস্তু সব সময়ে পকেটে ছিল বলেই স্মৃতির ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়নি ফ্যানটাসটিক এই কাহিনী লেখবার সময়ে।

গহ্বরের দুদিকের দেওয়ালে ছোট্ট অনেক ফোকর দেখেছি। একদিকের দেওয়ালে যে ফোকর রয়েছে, ঠিক তার বিপরীত দিকের দেওয়ালে রয়েছে অবিকল সেইরকম আর একটা ফোকর। পায়ের তলার তিন-চার ইঞ্চি অতি মিহি ধুলোর নীচে

রয়েছে কালো গ্র্যানাইট। ডানদিকের প্রান্তে রয়েছে সেই ফাটলটা যার মধ্যে ঢোকবার মতলবেই এসেছি দ্বিতীয়বারের এই অভিযানে।

বিপুল উদ্যমে ঢুকলাম ফাটলের মধ্যে। কাঁটা ঝোপ কেটে পথ সাফ করতে হল। ধারাল চকমকি পাথর স্তূপাকারে পড়েছিল পথ জুড়ে। আকারে তীরের ফলার মতন। সরাতে হল সেই স্তূপও। দূর প্রান্তে আলোর আভাস দেখে আশায় নেচে উঠল মনটা। প্রায় তিরিশ ফুট যাওয়ার পর পৌঁছলাম নিখুঁতভাবে খিলেন দেওয়া একটা ফাটলে-পায়ের তলায় একই রকমের অতি মিহি ধুলো। চোখে পড়ল অতি জোরাল আলো। এগলাম সেইদিকে। পৌঁছলাম বিরাট একটা গহ্বরে-দেখতে আগের গহ্বরের মতনই-শুধু যা লম্বাটে ধরনের। নোটবইতে স্কেচ করে নিলাম পেন্সিল দিয়ে।

লম্বায় এই গহ্বরটা সাড়ে পাঁচশ গজ। মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে একটা সরু ফাটল-আগের মতই কাঁটাঝোপ আর সাদা চকমকি পাথরের ঢিপিতে ঢাকা। পথ পরিষ্কার করে পৌঁছলাম তৃতীয় গহ্বরে। প্রথম গহ্বরের মতনই-তবে একটু বেশি লম্বা। এটারও নকশা এঁকে নিলাম পকেট বইতে।

তৃতীয় গহ্বরটার দৈর্ঘ্য তিনশ কুড়ি গজ। মাঝামাঝি জায়গায় ছ-ফুট চওড়া একটা ফাটল পনের ফুট লম্বা পাথর ভেদ করে গিয়ে শেষ হয়েছে উর্বর মাটির গায়ে। এরপর আর কোন গহ্বর নেই। আলো খুবই কম এখানে। ফিরে যেতে যাচ্ছি, পিটার্স আঙুল তুলে দেখাল উর্বর মাটির দেওয়ালে কতকগুলো অদ্ভুত চিহ্ন। একদম বাঁদিকের খোদাই চিহ্নটা মোটামুটিভাবে নরদেহের। দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে একটা মানুষ। বাকিগুলো যেন হরফ। অন্তত পিটার্সের ধারণা তাই। ভুলটা ধরিয়ে দিলাম মেঝে থেকে কয়েকটা স্খলিত মাটির টুকরো তুলে নিয়ে। দেওয়ালের গায়ে খোদাই চিহ্ন বলে মনে হলেও, স্খলিত টুকরোগুলো খাপে খাপে বসে যায় প্রতিটি চিহ্নে। অর্থাৎ, ভূমিকম্প বা ঐ জাতীয় প্রাকৃতিক কারণে মাটির দেওয়াল থেকে টুকরো খসে পড়েছে। খাবলা জায়গাগুলোকে হরফের মতন মনে হচ্ছে। তা সত্ত্বেও পকেট বইতে নকশা এঁকে নিলাম অদ্ভুত খাবলা চিহ্নগুলোর।

বেরবার পথ কিন্তু পেলাম না। হতোদ্যম হয়ে ফিরে এলাম পর্বতচূড়ার আস্তানায়। পরের চব্বিশ ঘণ্টায় উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। তৃতীয় গহ্বরের পূবদিকের জমিতে দেখেছিলাম শুধু দুটো তেকোণা গর্ত। কালো গ্র্যানাইট পাথর রয়েছে গর্তের তিনদিকেই এবং রীতিমত গভীর। নিছক কুয়ো নিশ্চয়, বেরবার পথ পাব না-এই ভেবে খামোকা কষ্ট করে ভেতরে নামিনি।

প্রত্যেকটা গর্তের পরিধি প্রায় কুড়ি গজ। নকশা করে নিলাম পকেট বইতে।

২৪

মাসের বিশ তারিখে কোমর বেঁধে লাগলাম দক্ষিণদিকের ঢাল বেয়ে নামবার জন্যে। বাদাম আর খেতে পারছিলাম না। মাঝে মাঝে ভুগেছি পেটের আর মাথার যন্ত্রণায়। মরিয়া হয়ে গেছিলাম সেই কারণেই।

সত্যিই বেপরোয়া হয়ে গেছিলাম। নইলে অসম্ভবকে সম্ভব করতে যাই? দক্ষিণদিকের নরম সোপস্টোনের পাহাড় খাড়াইভাবে নেমে গেছে প্রায় দেড়শ ফুট। ওপর থেকে ঝুঁকে দেখলাম প্রায় বিশ ফুট নীচে রয়েছে একটা কার্নিশ। দুজনের রুমালে গিট বেঁধে তাই ধরে ঝুলে পড়ল পিটার্স এবং লাফিয়ে নামল কার্নিশে। একই পন্থায় নামলাম আমিও।

নামবার পর দেখলাম, নরম পাথরের গা কেটে পরিষ্কার জায়গা বানিয়ে আরো নিচে নেমে যাওয়া খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়।

ভেবেছিলাম সেই রকমই। কার্যক্ষেত্রে প্রাণটা যেতে বসেছিল। গিঁট বাঁধা রুমালের দড়ি কাঁটাঝোপে বেঁধে ঝুলে পড়েছিল পিটার্স। তারপর ঝুলন্ত অবস্থাতেই পিস্তলের কুঁদো আর ছুরি দিয়ে নরম পাথর খুঁড়ে একটা একটা খুঁটি পুঁতে, তার ওপর দাঁড়িয়ে কাঁটাঝোপ থেকে রুমাল-দড়ি খুলে নিয়ে খুঁটিতে খুঁটিতে বারবার বেঁধে একটু একটু করে পৌঁছেছিলাম একদম তলায়।

আমার পালা আসতেই চোখে অন্ধকার দেখেছিলাম নামবার সময়ে। বন্দুকটা সঙ্গে নিয়েছিলাম। বন্দুকের ঠেকা দিয়ে খুঁটিতে পা রেখেও অত উঁচু থেকে একটু একটু করে নামতে গিয়ে মাথা ঘুরে গিয়েছিল। নিচ থেকে তাই দেখে খুঁটিতে পা দিয়ে উঠে এসে পিটার্স আমাকে আলতো করে লুফে নিয়ে নিচে যখন পৌঁছেছিল, তখন আর আমার জ্ঞান নেই। মিনিট পনের ছিলাম এইভাবে।

জ্ঞান ফিরে পিয়ে দেখেছিলাম অদ্ভুত গিরিসঙ্কটটার বিচিত্র রূপ। ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষ দেখে এসে পর্যটকরা যা যা লিখে গেছিলেন, সবই আমার পড়া। সেই দৃশ্যের সঙ্গে এখানকার সাদৃশ্য রয়েছে বলেই মনে হয়েছিল। উত্তর দিকের খাড়াই পর্বত-প্রাচীরে স্থাপত্যশিল্পের কোনো নিদর্শন অবশ্য নেই। কিন্তু মেঝেতে রয়েছে যেন শিল্পসুন্দর স্থাপত্যের বিরাট ধ্বংসাবশেষ। সুবিশাল কালো গ্র্যানাইটের চৌকোণা পাথর রয়েছে বিস্তর-ধাতুমিশ্রিত উর্বর মাটির চৌকোণা খণ্ডও রয়েছে তার মধ্যে—এর রঙও কালো। সারা দ্বীপে কালো জিনিসই শুধু দেখেছি-হাল্কা রঙের কোন বস্তুই দেখিনি। ধাতুর দানা রয়েছে গ্র্যানাইট পাথরেও। গাছপালা

একদম নেই। খাঁ খাঁ করছে সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট। বিরাটকায় কাঁকড়া বিছে আর বেশ কয়েকটা অদ্ভুত সরীসৃপ ছাড়া অন্য কোনো জীবের আস্তানা নেই সেখানে।

এসেছিলাম কচ্ছপ ধরব বলে, রওনা হলাম সেই দিকেই! কিছু দূর যেতেই আচমকা পাথরের আড়াল থেকে পাঁচজন জংলী ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ওপর। একজনের মুগুরের ঘায়ে পিটার্স লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। আর একজন বর্শা তুলল তার বুক লক্ষ্য করে।

বন্দুকটা জখম করে বসেছিলাম খাড়াই পাহাড় বেয়ে নামবার সময়ে। কাজেই পিস্তল বাঁর করে আগে গুলি করলাম বর্শাধারীকে-তারপরেই আর একজনকে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই ছুরি চালাল পিটার্স। পিস্তল ছুঁড়তেও পারত। কিন্তু পিস্তলের শক্তির চেয়েও ওর হাতের শক্তি যে কত বেশি, তার চাক্ষুস প্রমাণ দিলে নিমেষ-মধ্যে। তিনটে লাশ গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

শোরগোল শুনলাম দূরে। পিস্তলের আওয়াজ শুনে ছুটে আসছে জংলীরা। যে পথে এসেছি, সেই পথে ফিরতে গেলে যেতে হবে ওদের সামনে দিয়েই। যদিও বা এড়িয়ে যাই, পাহাড় বেয়ে ওঠবার সময়ে দেখতে পাবে আমাদের।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবছি কী করব, এমন সময়ে আমি যে দুজনকে গুলি করেছিলাম, তাদের একজন ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত ছিটকে গেল মাটি থেকে। বেশি দূর অবশ্য যেতে পারলাম না। দৌড়ে গিয়ে টুঁটি টিপে ধরে খতম করে দিতে যাচ্ছি, বাধা দিল পিটার্স। এই হারামজাদাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাক না আমাদের সমুদ্রের ধারে!

পিস্তল জিনিসটা যে মোক্ষম মারণাস্ত্র, এ জ্ঞান তখন হয়েছে জংলীটার। উদ্যত নলচের সামনে কেঁচোর মত গুটিয়ে গিয়ে হুকুম তামিল করল তৎক্ষণাৎ। পাথরের আড়াল দিয়ে আমাদের বার করে আনল বালুকাবেলায়।

বহু দূরে দেখলাম দলে দলে জংলী দৌড়ে আসছে বিকট চিৎকারে আকাশ-বাতাস ফালা ফালা করে দিয়ে।

উদভ্রান্তের মত এদিকে সেদিকে চাইতেই চোখে পড়েছিল পাথরের আড়ালে তোলা দুটো ক্যানো। জংলীটাকে হিড় হিড় করে টেনে দৌড়েছিলাম সেদিকে। জলে টেনে নামিয়েছিলাম একটা ক্যানো। তিনটে কচ্ছপ রয়েছে দেখলাম ভেতরে। দাঁড় টেনে পঞ্চাশ গজ গিয়েই বুঝলাম মারাত্মক ভুল করে বসেছি।

আর একটা ক্যানো রয়েছে যে বালির ওপর! জংলীরা আর বেশি দূরে নেই। এক্ষুনি ঐ ক্যানোতে চেপেই পেছন নেবে আমাদের। বহু হাতের দাঁড় টানায় ক্যানো ছুটবে নক্ষত্রবেগে! পালাতে তো পারব না!

ক্যানোটার সামনের গলুই আর পেছনের গলুই একইরকম। সুতরাং ক্যানো না ঘুরিয়েই উলটো দিকে দাঁড় টেনে যে জলরেখায় সরে এসেছিলাম তীরভূমি থেকে, সেই একই জলরেখায় ধেয়ে গেলাম তীরে রাখা ক্যানোটার দিকে। লাফ দিয়ে নেমে টেনে হিঁচড়ে নামাতে গিয়েও পারলাম না-পাথরে আটকে গেছে। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে বাড়ি মেরে বেশ খানিকটা গলুই আর পাশের কাঠ ভেঙে দিল পিটার্স। ঠিক সেই সময়ে লম্বা চওড়া একজন জংলী সামনে এসে যেতেই সটান তার খুলি উড়িয়ে দিল পিস্তল ছুঁড়ে। দৌড়ে ফিরে এলাম জলে ভেসে থাকা ক্যানোয়। দুজন জংলী টেনে হিঁচড়ে ক্যানোটাকে ডাঙায় তোলার চেষ্টা করেছিল। পিটার্সের ছুরি খেয়ে দুজনেই ছিটকে পড়ল দুদিকে। লাফিয়ে উঠলাম ভেতরে। ঝপাঝপ দাঁড় টেনে চলে এলাম মাইল তিনেক দূরে। আরও দুটো ক্যানো যে জাহাজ-ধ্বংসের সময়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, সে খবর তখন রাখতাম না। তাই পাছে কেউ পেছন নেয়, এই ভয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দ্বীপ ছেড়ে গভীর সমুদ্রে গিয়ে পড়তে চেয়েছিলাম। মাইল তিনেক গিয়ে দেখলাম ভাঙা ক্যানোটাকেই জলে ভাসিয়ে পেছন নেওয়ার বৃথা চেষ্টা করছে ক্ষিপ্ত জংলীরা। সে কী আস্ফালন আর কানের পর্দা ফাটানো চিৎকার। মাইল পাঁচেক যাওয়ার পর দেখলাম পাঁচ-ছখানা ভেলা নৌকোয় চেপে জংলীরা আসছে পেছনে। কিন্তু কিছু দূর এসেই খামোকা আর চেষ্টা না করে ফিরে গেল দ্বীপে।

২৫

চলেছি ধু-ধু আটলান্টিকের ওপর দিয়ে। চুরাশি ডিগ্রী অক্ষরেখা ছাড়িয়ে। পলকা ক্যানোর মধ্যে রয়েছে শুধু তিনটে কচ্ছপ। সুদীর্ঘ মেরু শীত এসে গেল বলে। তার আগেই পৌঁছতে হবে নিরাপদ অঞ্চলে। আশপাশের কোন দ্বীপেই ওঠার ইচ্ছে নেই। পিছিয়ে যাওয়া সমীচীন নয়। জাহাজে আসতেই দেখেছি কী পরিমাণ বরফ জমে রয়েছে সেখানে। ভরসা শুধু সামনের দিকে-আরো দক্ষিণে-যদি উষ্ণ অঞ্চল পাওয়া যায় সেখানে। বুক ঠুকে তাই ক্যানো চালালাম সেই দিকেই।

সুমেরু মহাসমুদ্রের মতই প্রশান্ত দেখলাম আটলান্টিক মহাসমুদ্রকে। প্রবল ঝড় বা পাগলা জলের দাপাদাপি নেই একেবারেই। তাহলেও পলকা এই ক্যানোকে মজবুত করা দরকার। অজ্ঞাত এক গাছের বাকল দিয়ে তৈরী ক্যানোর পাঁজরগুলো কিন্তু বেতের। লম্বায় পঞ্চাশ ফুট, চওড়ায় চার থেকে ছ ফুট, গভীরতায় সাড়ে চার ফুট। দক্ষিণ সমুদ্রের কোন বাসিন্দাদের কাছে এ ধরনের নৌকো দেখেনি সভ্য দুনিয়ার মানুষ। যে দ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে এলাম, সে দ্বীপের মানুষগুলোর মত কুচক্রী, রক্তপিপাসু, নৃশংস বর্বর মানুষও এই ভূগোলকে আর কোথাও নেই

বলেই আমার বিশ্বাস। চূড়ান্ত অসভ্য আদিম এই নরপশুরা মজবুত বেত আর বাকল দিয়ে ক্যানো বানানর উন্নত নির্মাণ কৌশল রপ্ত করেছে বলেও আমার বিশ্বাস হয়নি। অনুমানটা যে ভুল নয়, তা দিন কয়েকের মধ্যেই যাচাই করে নিয়েছিলাম দ্বীপ থেকে ধরে আনা বর্বরটার কাছ থেকে। দক্ষিণ পশ্চিমের নেটিভরা জানে এই ক্যানো নির্মাণের কৌশল। ক্যানো চারখানা তাদেরই। এদের হাতে আসে দৈবাৎ।

ক্যানোয় দাঁড় ছিল প্রচুর। বাড়তি দাঁড় দিয়ে একটা কাঠামোর মত করে ক্যানোর পাশে লাগিয়ে রাখলাম যাতে জল লাফিয়ে ভেতরে ঢুকতে না পারে-বড় ঢেউকে ভেঙে দিতে পারে। দুখানা দাঁড় সোজা করে বেঁধে মাস্তুল বানালাম। অতিকষ্টে গায়ের সার্ট দিয়ে পাল তৈরী করলাম। বাঁধতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেছিলাম। কয়েদী বর্বরটা কোনো সাহায্য করেনি-হাতও দেয়নি-বেশ দূরে দূরে থেকেছে-আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থেকেছে। বাঁধা শেষ হয়ে যাওয়ার পর হাওয়ায় যখন সাদা সার্ট পতপত করে উড়ছে, তখন বিষম আর্তনাদ বেরিয়ে এসেছে গলা চিরে-'টেকেলি-লি! টেকেলি-লি!'

এই সেই চিৎকার যা শুনেছিলাম ফেলে আসা দ্বীপে-লাল দাঁত আর নখওলা অদ্ভুত সাদা জন্তুটাকে দেখে ভয়ে, বিস্ময়ে, ক্রোধে ঠিক এই নামটাই গলা ফাটিয়ে উচ্চারণ করেছিল কুচক্রী বর্বররা। নিঃসীম ত্রাসে সিঁটিয়ে যাচ্ছে তাদের জাত ভাইটা। ব্যাপারটা কী?

কচ্ছপ তিনটে বধ করে মাংস আর জল খেয়েছি সাত আট দিন ধরে। মজবুত নৌকো তরতর করে ভেসে চলেছে প্রবল স্রোতের টানে সোজা দক্ষিণ দিকে। উত্তুরে হাওয়ায় পাল ফুলে রয়েছে। ঝড়জলের চিহ্নমাত্র নেই। আবহাওয়া অতিশয় মনোরম। বরফখণ্ড একদম নেই। বেনেটস আইলেট ছেড়ে আসার পর থেকে বরফের চিহ্নমাত্র দেখিনি কোথাও। যতই দক্ষিণে যাচ্ছি, ততই আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে উঠছে।

পয়লা মার্চ।-তারিখ একটা লিখলাম বটে, কিন্তু সঠিক হয়ত নয়। দিনের পর দিন যা দেখেছি, যা শুনেছি-সেই বিবরণের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যে মোটামুটি একটা তারিখ নোটবইতে পেন্সিলে টুকে রেখেছিলাম। দেখছি বহু বিচিত্র এবং অসাধারণ প্রাকৃতিক কাণ্ডকারখানা। চক্ষু স্থির করে দেওয়ার মত আশ্চর্য জগতে প্রবেশ করতে চলেছি-সূচনা দেখেই আঁচ করা যাচ্ছে। দক্ষিণ দিগন্তে বিরামবিহীনভাবে বহু উঁচু পর্যন্ত ভেসে রয়েছে হাল্কা ধূসর বাষ্পরাশি। মাঝে মাঝে তির্যক আলোকরশ্মি ধেয়ে যাচ্ছে বাষ্পরাশির মধ্যে দিয়ে পূব থেকে পশ্চিমে, অথবা পশ্চিম থেকে পূবে, কখনো পর্বত চূড়ার মত ঠেলে উঠছে আকাশের দিকে'। মেরুজ্যোতিতে এই ধরনের উন্মত্ত আলোর নাচন দেখা যায়।

এখান থেকে বাষ্প রাশির ঘন উষ্ণতা প্রায় পঁচিশ ডিগ্রী। সমুদ্রের তাপমাত্রা যেন বাড়ছে। জলের রঙ পাল্টে যাচ্ছে।

দোসরা মার্চ।–বন্দী জংলীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দ্বীপের নরমেধ যজ্ঞ, দ্বীপবাসী এবং তাদের রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক খবর জোগাড় করলাম। পাঠক-পাঠিকাকে বিরক্ত করতে চাই না সেসবের বিশদ বর্ণনা শুনিয়ে। শুধু এইটুকু বলা যাক। মোট আটটা দ্বীপ আছে এই দ্বীপাবলীতে। শাসন করে একজন রাজা, তার নাম টসালেমন। সবচেয়ে ছোট্ট দ্বীপটায় সে থাকে। সেই দ্বীপের উপত্যকায় অতিকায় এক জাতের প্রাণী থাকে। তাদের কালো চামড়া থেকে তৈরী হয় যোদ্ধাদের পোশাক।চ্যাপ্টা ভেলা-নৌকো ছাড়া অন্য কোনো নৌকো তৈরী করতে জানে না দ্বীপবাসীরা।বেনেটস আইলেটের একটা বড় দ্বীপ থেকে চারখানা বড় ক্যানো এরা জোগাড় করেছিল দৈবাৎ। বড় জংলীটার নাম নু-নু। বেনেটস আইলেট কোথায়, তা সে জানে না। যে দ্বীপ ছেড়ে এলাম, তার নাম টসালাল। পর্বতচূড়ায় যে বক জাতীয় পাখিটার মাংস খেয়েছিলাম, মরবার সময়ে তার চিৎকারে একটানা হিস-হিস শব্দ শুনেছিলাম। ঠিক সেই রকম টানা হিস-হিস স্বরে টসালাল বা টসালেমন নাম দুটো উচ্চারণ করে গেল বন্দী জংলী। অনুকরণ করতে গেছিলাম–পারিনি।

তেসরা মার্চ।–জলের উষ্ণতা আশ্চর্যভাবে বেড়েছে। রঙও দ্রুত পালটাচ্ছে। স্বচ্ছ আর নেই–দুধের মত ঘোলাটে। ক্যানোর আশপাশের জল মসৃণ–বিপদের সম্ভাবনা দেখছি না। কিন্তু মাঝে মাঝে ডাইনে বাঁয়ে বেশ দূরে দূরে হঠাৎ জল তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে। অনেকক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম, দূর দিগন্তে বাষ্পরাশির মধ্যে আলোক ঝলক ছুটে যাওয়ার পরেই জল তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে ডাইনে বাঁয়ে। দুই বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে সম্পর্কটা যে কী তা মাথায় ঢুকছে না।

চৌঠা মার্চ।–উত্তুরে বাতাস পড়ে যাওয়ায় ক্যানোর পালটাকে আরো চওড়া করার জন্যে পকেট থেকে সাদা রুমাল বার করেছিলাম। হাওয়ায় হঠাৎ ফরফর করে উড়তে আরম্ভ করেছিল নু-নু'র মুখের সামনে। তৎক্ষণাৎ ভয়াবহ খিঁচুনি শুরু হয়ে গেল। পাকসাট খেয়ে আচ্ছন্নের মত লুটিয়ে পড়ল ক্যানোর তলায়। অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল গলা চিরে–'টেকেলি-লি! টেকেলি-লি!'

পাঁচই মার্চ।–বাতাস একেবারে পড়ে গেছে। কিন্তু দ্রুত বেগে এখনো দক্ষিণ দিকেই যাচ্ছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রচণ্ড স্রোত টেনে নিয়ে যাচ্ছে ক্যানোকে। বিপদ ঘটতে পারে যে কোন মুহূর্তে। পিটার্স নির্বিকার। ওর মুখ দেখে অনেক সময়ে মনের ভাব ধরা যায় না। কেমন জানি অসাড় হয়ে আসছে আমার দেহ আর মন। স্বপ্নালু অনুভূতি। তার বেশি কিছু নয়।

ছ-ই মার্চ।–ধূসর বাষ্প দিগন্ত ছাড়িয়ে আরও উর্ধ্বেঠেলে উঠেছে–ধূসরাভা আর থাকছে না–ক্রমশ কমে আসছে। জল দারুণ গরম। হাত দিয়ে ছোঁয়া যাচ্ছে না, দুধের মত রঙটা আগের চাইতেও বেশি। আজ ভীষণভাবে একবার জল তোলপাড় হল ক্যানোর খুব কাছেই। যথারীতি ঠিক তার আগেই ক্ষিপ্র আলোকরশ্মির ছুটোছুটি দেখলাম বাষ্পরাশির শীর্ষদেশে–পরক্ষণেই তলদেশে। বাষ্পমধ্যস্থ আলোকঝলক মিলিয়ে যেতেই এবং সমুদ্রের তোলপাড় হওয়া শুরু হতেই ছাইয়ের মত খুব মিহি সাদা পাউডার ঝরে পড়ল নৌকোর ওপর এবং অনেকখানি জায়গা জুড়ে জলের ওপর। দেখতে ছাইয়ের মত হলেও ছাই নয়। নু-নু নৌকোর তলায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে–কিছুতেই চিৎ করা যাচ্ছে না।

সাতই মার্চ।–নু-নুকে আজ জিজ্ঞেস করেছিলাম, দ্বীপবাসীরা 'জেন' জাহাজের সবাইকে মেরে ফেলল কেন। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে থাকায় যুক্তিসঙ্গত জবাব দিতে পারল না হতচ্ছাড়া। এখনো দুহাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে ক্যানোর তলায়। কিন্তু ছাড়বার পাত্র নই আমরা। জবাব ওকে দিতেই হবে। অনেক পীড়াপীড়ির পর ও শুধু তর্জনী দিয়ে ওপরের ঠোঁটটা তুলে দাঁত বার করে দেখাল আমাদের। কুচকুচে কালো দাঁত। টসালাল দ্বীপের কোন মানুষের দাঁত এর আগে দেখিনি। এই প্রথম দেখলাম। আশ্চর্য হলাম। এরকম মিশমিশে দাঁত কখনো দেখিনি।

আটই মার্চ।–টসালাল দ্বীপে যে সাদা প্রাণীর মৃতদেহ দেখে দারুণ সাড়া পড়ে গিয়েছিল, অবিকল সেই রকম একটা মরা জীবকে ভেসে যেতে দেখলাম ক্যানোর পাশ দিয়ে। ইচ্ছে হয়েছিল তুলে নিই ক্যানোয়–কিন্তু হঠাৎ উদাসীন হয়ে গেলাম–হাত গুটিয়ে বসে রইলাম। জল রীতিমত তপ্ত, কাছাকাছি হাত আনা যাচ্ছে না। পিটার্স মুখে চাবি দিয়ে রয়েছে–জানি না কি ভাবছে। নু-নুর নিঃশ্বাস পড়ছে বটে–কিন্তু নড়ছে না।

ন-ই মার্চ।–ছাইয়ের মত রাশি রাশি সাদা পাউডার অবিরাম ঝরে পড়ছে মাথার ওপর এবং চারিদিকে। বাষ্পরাশি দিগন্তের আরো উঁচুতে ঠেলে উঠেছে–স্পষ্ট আকার নিচ্ছে যেন বহু উঁচু থেকে, অনন্ত মহাশূন্য থেকে, বিরামবিহীনভাবে নিঃশব্দে প্রপাত ঝরে পড়ছে। এছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না। এ প্রপাতের শেষ নেই.........শেষ নেই। দানবিক আবরণে ঢেকে রয়েছে পুরো দক্ষিণ দিগন্ত। প্রপাত ঝরছে তো ঝরছেই কিন্তু কোন শব্দ নেই।

একুশে মার্চ।–বিষণ্ণ অন্ধকার দুলছে মাথার ওপর। কিন্তু দুধের মত সাদা মহাসাগরের ভেতর থেকে আলোকময় প্রখর দ্যুতি ঠিকরে আসছে ওপরে–ক্যানো ঘিরে অদ্ভুত আভা। বিচিত্র পাউডার, ছাইয়ের মত সাদা গুঁড়ো, প্রচুর পরিমাণে জমা হচ্ছে সারা

গায়ে, মাথায়, নৌকোয়-কিন্তু জলে পড়েই গলে যাচ্ছে। স্তম্ভিত হয়ে রয়েছি। প্রপাতের শীর্ষদেশ বহুদূরের অস্পষ্টতায় অদৃশ্য। আমরা কিন্তু বীভৎস গতিবেগে ধেয়ে চলেছি সেই দিকেই। মাঝে মাঝে কুহেলি সদৃশ্য রহস্যাবৃত এই যবনিকা যেন ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে-ফাঁক দিয়ে হু-হু করে নিঃশব্দে ধেয়ে আসছে বাতাস-ব্যাদিত ফাটলে এবং ফাটলের বাইরে ক্ষণেকের জন্যে প্রদীপ্ত হয়ে উঠছে অস্পষ্ট কিন্তু অতীব চঞ্চল আকৃতির পর আকৃতি-লণ্ডভণ্ড কাণ্ড চলছে যেন অস্থির আকৃতিগুলির মধ্যে। সমুদ্র তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে শব্দহীন বায়ু ধেয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে। থ হয়ে বসে আছি আমি আর পিটার্স।

বাইশে মার্চ।-তমিস্রা আরো বেড়েছে। মাঝে মাঝে জলের দ্যুতি তা ফিকে করে দিচ্ছে-সামনের সাদা যবনিকাও যেন ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে গাঢ় আঁধারকে। অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে উড়ে আসছে অগুন্তি অতিকায় সাদা পাখি-আসছে তো আসছেই। তাদের বিরামবিহীন আর্তনাদটাও অদ্ভুত-'টেকেলি-লি! টেকেলি-লি! নিরন্তর বিকট চিৎকারে কান ঝালাপালা করে দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিপথের বাইরে। চিৎকার শুনেই ভীষণভাবে নু-নু কেঁপে উঠেছিল ক্যানোর তলায়। গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, দেহপিঞ্জর প্রাণশূন্য হয়েছে। নক্ষত্রবেগে ধেয়ে চলেছি অনন্ত প্রপাতের দিকে-বিশাল একটা গহ্বর মুখব্যাদান করে রয়েছে ঠিক সামনেই-যেন গিলে নিতে চলেছে গোটা ক্যানোটাকে। আচমকা ঠিক সামনেই পথ জুড়ে উঠে দাঁড়াল একটা অবগুণ্ঠন-আবৃত নরদেহ-পৃথিবীর যেকোন মানুষের চেয়ে আকারে অনেক.........অনেক বড়। অদ্ভুত মূর্তির চামড়ার রঙ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে-তুষারের মতই একেবারে সাদা।

টীকা

খবরের কাগজে বেরিয়েছে কিভাবে হঠাৎ মারা গেছেন মিঃ পিম। দুর্ঘটনায় মৃত্যুর আগে পর্যন্ত উনি যে লেখাটা টাইপ করতে দিয়েছিলেন আবার ভাল করে লিখবেন বলে, সেই লেখাই প্রকাশিত হল ওপরে। পরের অধ্যায়গুলো সম্ভবত ওঁর কাছেই ছিল-দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর আর তার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।

ভূমিকায় যে ভদ্রলোকের নাম লেখা হয়েছে, তিনি কাহিনীর শেষটুকু হয়ত বলতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে রাজি করানো যায়নি। কারণ আর কিছুই নয়, মিঃ পিম-এর উপাখ্যান তিনি আদৌ বিশ্বাস করেন না-বিশেষ করে শেষের অংশটুকু। পিটার্সও বলতে পারে এরপর কি ঘটেছিল। তার বর্তমান নিবাস ইলিনয়ে। কিন্তু তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

শেষের দিকে নিশ্চয় দুটো কি তিনটে অধ্যায় বাকি ছিল। এগুলো পাওয়া গেলে সুমেরু সম্বন্ধে অনেক বিচিত্র তথ্য জানা যেত,

লেখকের বিবৃতি যাচাই করা যেত, যে সরকারি অভিযান দক্ষিণ সমুদ্রে যাচ্ছে, তাদের কাজে লাগত।

টসালাল দ্বীপে মিঃ পিম যে গহ্বরগুলোর নকশা এঁকেছিলেন, সেগুলি সম্পর্কে দু-চার কথা বলা যেতে পারে।

মোট পাঁচটা গহ্বরের নকশা পর পর সাজালে মিশে যায় একটা ইথিয়পীয় মূল ক্রিয়াশব্দের সঙ্গে-যার মানে 'ছায়াবৃত থাকুক'। অর্থাৎ সব কিছুই ঢাকা থাকুক অন্ধকার অথবা ছায়ায়।

উর্বর মৃত্তিকার গা থেকে ভূকম্পজনিত কারণে মাটি খসে পড়ায় নরাকৃতি এবং হরফ-আকৃতি চিহ্নগুলি নাকি আপনা থেকেই জেগে উঠেছে-সত্যি সত্যিই তা মানুষের আকৃতি বা হরফ নয়-এই কথাই লিখেছেন মিঃ পিম এবং তার বেশি মাথা ঘামাননি।

কিন্তু পিটার্সের অনুমানই হয়ত ঠিক। ওপরের লাইনের হরফগুলোর সঙ্গে একটা আরবীয় মূল ক্রিয়াশব্দের সাদৃশ্য আছে, যার মানে-'সাদা থাকুক'। অর্থাৎ সব কিছুই হোক উজ্জ্বল এবং সাদাটে। নীচের লাইনের চিহ্নগুলো ভাঙা ভাঙা হলেও একটা মিশরীয় শব্দের সঙ্গে মিলে যায়; যার মানে-'দক্ষিণের অঞ্চলে'। দেওয়ালের মানুষের হাতটাও বিস্তৃত ছিল দক্ষিণের দিকে-যেখানে সব কিছুই সাদা এবং ঝকঝকে।

'টেকেলি-লি!' শব্দটাও বিলক্ষণ ইঙ্গিতবহ। টসালাল দ্বীপে অজ্ঞাত জানোয়ার দেখে 'টেকেলি-লি!' বলে চিৎকার করেছিল দ্বীপবাসীরা। ক্যানোর মধ্যে সাদা সার্ট, সাদা রুমাল এবং জলে ভেসে যাওয়া সাদা জীবকে দেখেও 'টেকেলি-লি!' বলে চেঁচিয়েছিল নু-নু। রহস্যময় বাষ্পযবনিকা ভেদ করে অতিকায় সাদা পাখিরা 'টেকেলি-লি! টেকেলি-লি!' ডাক ছেড়ে মিলিয়ে গেছিল দূরে। সাদা বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত রয়েছে 'টেকেলি-লি!' শব্দটা। টসালাল দ্বীপের কোথাও সাদা জিনিস দেখা যায়নি। দ্বীপবাসীদের দাঁত পর্যন্ত কালো-কালো সেখানকার গ্র্যানাইট পাথর। ইথিয়পীয় শব্দের ভাণ্ডার ঘাঁটলে হয়ত 'টেকেলি-লি!' শব্দের অর্থ-রহস্যও প্রাঞ্জল হয়ে যাবে।

'পাহাড়ের মধ্যে দিলাম কবর; পাথরের ধুলোয় থাকুক আমার প্রতিহিংসা।'

আর্থার গর্ডন পিম লিখিত শেষের অধ্যায়গুলো পাওয়া যায় নি বলে এডগার অ্যালান পো অত্যাশ্চর্য এই কাহিনীর সমাপ্তি প্রহেলিকাময় রেখে দিয়েছেন। নিগূঢ় রহস্য ভাবিয়ে তুলেছিল কিন্তু বিশ্বের বহু কথাশিল্পীকে-পিম-এর অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে তারা অনেক অনেক ধরনের কাহিনী রচনা করেন। জুল ভের্ণ নিজে যে

আশ্চর্য আলেখ্য রচনা করেন, তা প্রকাশিত হল জুল ভের্ণ রচনাবলীর নবম খণ্ডে। পিম এবং পিটার্সের দুঃসাহসিক অভিযানের শেষটুকু জানতে যাঁরা আগ্রহী, তাঁরা পড়ে দেখতে পারেন ভের্ণের 'তুহিন-তেপান্তরের স্ফিংক্স-দানবী'।

ফন কেমপেলেন এবং তাঁর আবিষ্কার

(ফন কেমপেলেন অ্যাণ্ড হিজ ডিসকভারি)

ফন কেমপেলোনের আবিষ্কারের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন অ্যারাগো তাঁর নিবন্ধে-খতিয়ে লিখেছেন, কিছু বাদ দেননি। সিলিম্যান্স জার্নালেও বেরিয়েছে আবিষ্কারের সংক্ষিপ্তসার। লেফটেন্যাণ্ট মরি সদ্য প্রকাশ করেছেন বিস্তারিত প্রতিবেদন। এত কাণ্ডের পর তাড়াহুড়ো করে এই আবিষ্কার সম্পর্কে কিছু মন্তব্য লিখতে বসার মানে এই নয় যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আবিষ্কারটাকে দেখার মতলব নিয়ে কলম ধরেছি। আমার উদ্দেশ্য এক কথায় প্রথমেই স্বয়ং ফন কেমপেলেনের সম্বন্ধে দু চারটে কথা বলা। বছর কয়েক আগে ভদ্রলোকের সঙ্গে সামান্য পরিচয় লাভের সম্মানে সম্মানিত হয়েছিলাম আমি। এই মুহূর্তে তাঁর সম্বন্ধে যে কোন বিষয়ই কৌতূহলের সঞ্চার করতে পারে বলেই কলম ধরেছি। আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হ'ল মোটামুটিভাবে এবং কল্পনারঙীন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আবিষ্কারটার ফলাফল কি হতে পারে, তাই নিয়ে লেখনী চালনা করা।

খবরের কাগজে আবিষ্কারটাকে বলা হয়েছে পিলে-চমকানো, এবং প্রশ্নাতীতভাবে অপ্রত্যাশিত। এ-হেন ধারণার প্রতিবাদ জানাচ্ছি কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে লেখার শুরুতেই।

'স্যার হামফ্রীর ডাইরী'র উল্লেখ করা যাক (প্রকাশক : কট্‌ল্ অ্যাণ্ড মুন্‌রো, লণ্ডন, পৃষ্ঠা : ১৫০)। ৫৩ এবং ৮২ পৃষ্ঠায় দেখা যাবে, স্বনামধন্য এই রসায়নবিদ আলোচ্য এই আইডিয়াকে

মস্তিষ্কে ঠাঁই দিতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক দিয়ে নগণ্যতম অগ্রগতিও সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। ফল কেমপেলেন অনুরূপ বিশ্লেষণ বিজয়-গৌরবে হাজির করেছেন জনসাধারণের সামনে। ডাইরীর উল্লেখ কিন্তু কোথাও করেন নি ফন কেম্‌পেলেন। প্রয়োজন দেখা দিলে, নির্দ্বিধায় তা প্রমাণও করতে পারি। ডাইরীর আইডিয়ার কাছে ঋণ স্বীকার না করলেও প্রকৃতপক্ষে এবং সন্দেহাতীতভাবে ডাইরীর কাছেই উনি ঋণী। ওঁর কীর্তির প্রথম ইঙ্গিত রয়েছে ঐ ডাইরীর মধ্যেই। বিষয়টা একটু টেকনিক্যাল। তা সত্ত্বেও ডাইরী থেকে দুটি প্যারাগ্রাফ উদ্ধৃত না করে পারছি না। স্যার হামফ্রীর বহু সমীকরণের একটি আছে তার মধ্যে। (বীজগণিতের চিহ্ন নিষ্প্রয়োজন বলে এবং এথনিয়াম লাইব্রেরীতে ডাইরীটা পাওয়া যাবে বলে, মিস্টার পো-র পাণ্ডুলিপির ছোট্ট একটা অংশ আমরা বাদ দিলাম।-সম্পাদক)

'কোরিয়ার অ্যাণ্ড এন্‌কোয়ারার' পত্রিকায় যে-উদ্ধৃতিটি আছে এবং যে উদ্ধৃতিটি বর্তমানে কাগজে কাগজে ছাপা হচ্ছে, বিশেষ কয়েকটা কারণে উদ্ধৃতিটির মূল লেখক কে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বার্নসউইকের মিস্টার কিশাম দাবী জানিয়েছেন বিশেষ একটা আবিষ্কারের সেই উদ্ধৃতিটির মধ্যে। বিবৃতিটার মধ্যে অসম্ভব এবং একেবারেই সম্ভবপর নয়, এরকম কিছু না থাকা সত্ত্বেও দাবীর যৌক্তিকতা মেনে নিতে পারছি না। বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন দেখি না। অনুচ্ছেদটা যে কায়দায় লেখা হয়েছে, মূলতঃ তার উপরেই গড়ে উঠেছে আমার অভিমত। দেখে ত সত্যি বলে মনে হয় না। ঘটনা যাঁরা বিবৃত করেন, তাঁরা কদাচিৎ মিস্টার কিশামের মত দিন, তারিখ এবং স্থান সম্বন্ধে এত সতর্ক থাকেন। তাছাড়া, মিস্টার কিশাম যদি সত্যিই করে থাকেন আবিষ্কারটা, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তা প্রচার করে ফলভোগ করলেন না কেন ? ফলটা শুধু নিজেই পেতেন না', বিশ্বের উপকার হত। আবিষ্কার তো করেছেন আশি বছর আগে-ওঁর দাবী তো তাই। অবিশ্বাসটা এই কারণেই। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কোনো মানুষ এমন একখানা আবিষ্কার করার পর বাচ্চা ছেলের মত আচরণ করে যাবেন, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ? মিস্টার কিশাম অবশ্য তাঁর আচরণটাকে পেঁচার আচরণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাছাড়া, মিস্টার কিশাম লোকটাই বা কে ? 'কোরিয়ার অ্যাণ্ড এনকোয়ারার' পত্রিকায় প্রকাশিত পুরো প্রতিবেদনটাই যে কপোলকল্পনা নয়, তারই বা প্রমাণ কি ? এমন ভাবে মনগড়া যেন বিষয়টা সত্যি বলেই মনে হয়। বিপুল ধাপ্পাবাজির অত্যাশ্চর্য আভাস রয়েছে কিন্তু প্রতিবেদনে। তাই আমার বিনীত অভিমত এই ঃ এ-হেন প্রতিবেদনে আস্থা রাখা যায় না। বিজ্ঞান-প্রতিভূরাও মাঝে মাঝে নিজস্ব ব্যাপারে তদন্ত করতে

বসে বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে ফেলেন, তাও তো দেখেছি। নইলে প্রফেসর ড্রেপারের মত নামকরা রসায়নবিদ কিশামের ছদ্ম-আবিষ্কারের বৃত্তান্ত নিয়ে অমন গুরুত্বসহকারে আলোচনা করেন? সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার। আরও আছে। মিস্টার কিশামের নামটা আদতে কি? মিস্টার কুইজেম নয় তো?

যাক গে, স্যার হামফ্রী ডেভীর রোজনামচা প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। পুস্তিকাটি জনসাধারণের জন্যে পরিকল্পিত হয়নি। এমনকি লেখকের পরলোক গমনের পরেও নয়। রচনাশৈলী দেখলেই যে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ধরে ফেলবেন লেখাটা কার। যেমন ধরুন, মাঝামাঝি জায়গায় ১৩ পৃষ্ঠায় অ্যাজোটের প্রোটোক্সাইডের গবেষণা প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'আধ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস অব্যাহত থাকাকালীন আস্তে আস্তে সেগুলি কমে এল এবং অনুরূপ চাপ সৃষ্টি করল সমস্ত পেশীর উপর।' শ্বাস-প্রশ্বাস যে কমেনি, তা বোঝা যায় পরের 'সেগুলি' শব্দের ব্যবহারে। আসলে উনি যা বোঝাতে চেয়েছেন, তা এই: 'আধ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস অব্যাহত থাকাকালীন আস্তে আস্তে (এই অনুভূতিগুলি) কমে এল এবং (একটা অনুভূতির) অনুরূপ চাপ সৃষ্টি করল সমস্ত পেশীর উপর।' এ রকম উদাহরণ শ'খানেক আছে। সন্ধানী চোখে ঠিকই ধরা পড়বে যে পাণ্ডুলিপিটা লেখক রচনা করেছিলেন কেবল নিজের জন্যেই। কিন্তু পুস্তিকা খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে আমার ধারণা কতখানি সত্যি। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ঝট করে বলে ফেলার পাত্র ছিলেন না ডেভী। যা লিখেছিলেন, সেটা তাঁর 'খসড়া নোটবই'। হাতুড়েগিরি তো বরদাস্ত করতেনই না, নিজের বিষয় নিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার পরেও হাতেকলমে তা প্রমাণ করার মত উপকরণ তৈরী না হওয়া পর্যন্ত মুখ খুলতেন না। ওঁর ইচ্ছে ছিল, রোজনামচাটা যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়—অনেক কিছু ভুল হলেও-হতে পারে বৃত্তান্ত বোঝাই রোচনামচা কিন্তু পোড়ানো হয়নি। মৃত্যুর সময়ে তা জানলে মৃত্যুটা যে অশান্তির মধ্যে দিয়েই আসত, তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই আমার। শুধু এই নোটবইটাই নয়, অন্যান্য অনেক কিছুই পুড়িয়ে ফেলার ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করে গেছিলেন। না পোড়ানোর ফলে ভাল হয়েছে, কি, খারাপ হয়েছে—তা অচিরেই দেখা যাবে। ডেভীর ইঙ্গিতটুকু কিন্তু ফন কেমপেলেন তাঁর স্মরণীয় আবিষ্কারটি করতে পেরেছিলেন—স্মরণীয় হলেও মানব-সভ্যতা তাতে কতখানি উপকৃত হয়েছে অথবা হবে, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। ফন কেমপেলেন এবং তাঁর বন্ধুবর্গও যে এই আবিষ্কারের দৌলতে কুবের হয়ে বসবেন, এমন কল্পনা বাতুলতা। সূক্ষ্ম মূল্যের বস্তুর বিনিময়ে বাড়ীঘরদোর কেনা যায় না।

ফন কেমপেলেনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'হোমজার্নালে' প্রকাশিত

হওয়ার পর ফলাও করে তার নকল হয়েছে নানা জায়গায়। অনুবাদকের ত্রুটির ফলে মূল জার্মান সম্পর্কে কিছু ভুল বোঝাবুঝিও হয়েছে।

চেহারার দিক দিয়ে 'মনুষ্যবিদ্বেষী' না হলেও ফন কমপেলেন যে কুখ্যাতি অর্জন করেছেন, অথবা করতে চলেছেন–তা কিন্তু তুচ্ছ ব্যাপার নয় মোটেই।

ফন কমপেলেনের জন্ম নিউইয়র্ক স্টেটে, বাপ-মা কিন্তু প্রেসবার্গের মানুষ। যান্ত্রিক দাবা-খেলার কৃতিত্বের ব্যাপারে এই পরিবারের নাম জড়িয়ে আছে। আকারে তিনি খর্বকায়, গাঁট্টাগোট্টা। নীল চোখ দুটো মেদবহুল এবং বড় বড়। চুল আর ঝাঁটা-গোঁফ লালচে রঙের। মুখবিবর বিস্তৃত, দেখলে ভালই লাগে। দাঁত সুন্দর। নাকটা রোমীয় ধাঁচের। একটা পায়ে দোষ আছে। কথাবার্তা দিব্যি খোলামেলা। চালচলন, কথাবার্তা, আচার-আচরণ মনুষ্যবিদ্বেষীর মতই। বছর কয়েক আগে রোড আয়ল্যাণ্ডের আর্লস হোটেলে হপ্তাখানেক একসঙ্গে ছিলাম দুজনে–তখনি বিভিন্ন সময়ে মোট বড়জোর ঘণ্টা তিন চার কথাবার্তা হয় ওঁর সঙ্গে। সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ নিয়েই কথা বলেছিলেন, বৈজ্ঞানিক কীর্তি নিয়ে টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করেন নি। আমার আগেই হোটেল থেকে রওনা হয়েছিলেন নিউইয়র্ক অভিমুখে, সেখান থেকে গেছিলেন ব্রেমেন শহরে। এই শহরেই সর্বপ্রথম জনসমক্ষে প্রকাশিত হয় তাঁর বিরাট আবিষ্কার বৃত্তান্ত-অথবা বলা যায় এ রকম একটা আবিষ্কার যে তিনি করেছেন, এমন সন্দেহ দেখা গিয়েছিল তখনি। ফন কেমপেলেন এখন অমর। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি কেবল এইটুকুই। জনসাধারণের কাছে এই সামান্য খবরও কৌতূহলোদ্দীপক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

যা কিছু গুজব রটেছে, তা আলাদীনের প্রদীপ আবিষ্কারের মত অত্যাশ্চর্য। তবে কি, সত্য তো চিরকালই উপন্যাসের চাইতেও অলীক হয়।

ব্রেমেনে খুব দুরবস্থায় দিন কেটেছে ফন কেমপেলেনের। সামান্য টাকার জন্যেও বাসা বদল আর ছুটোছুটি করতে হয়েছে। গাট্‌স্‌মাউথ কোম্পানীর সেই বিরাট জালিয়াতির ফলে সারা দেশ চঞ্চল হয়েছিল। সন্দেহটা গিয়ে পড়েছিল কিন্তু ফন কেমপেলেনের ওপর। কেন না গ্যাসপারনিলেন, অত ভূসম্পত্তি কেনার টাকা কোথা থেকে পেলেন, তার সদুত্তর তিনি দিতে পারেন নি। গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন, প্রমাণাভাবে খালাসও পেয়েছিলেন। পুলিশ কিন্তু খুব নজর রেখেছিল তাঁর গতিবিধির ওপর। দেখেছিল, প্রায়ই বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন ভদ্রলোক। হাঁটেন একই পথ ধরে। 'ডনডারগাট' নামে কুখ্যাত ওঁদো অলিগলি অঞ্চলে গিয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দেন প্রতিবারই।

অবশেষে অসীম অধ্যবসায়ের ফলে একদিন আবিষ্কৃত হ'ল তাঁর গোপন বিষয়। ছিনেজোঁকের মত পেছনে লেগে থেকে পুলিশ তাঁকে দেখতে পেল ফ্লাৎশ্লাৎ নামক একটা গলির মধ্যে সাততলা একটা বাড়ীর চিলেকোঠায়- হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়তেই দেখা গেল পুলিশী অনুমানই সত্যি-জালিয়াতি কাণ্ডকারখানার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে রয়েছেন ফন কেমপেলেন। ভয়ানক উত্তেজিত হয়েছিলেন ভদ্রলোক-দেখে তাঁর অপরাধ সম্বন্ধে তিলমাত্র আর সন্দেহ রইল না পুলিশের মনে। হাতে হাতকড়া লাগিয়ে খানাতল্লাসি চালিয়েছিল শুধু চিলেকোঠায় নয়-সাততলা বাড়ীর প্রতিটি ঘরেই-কেননা দেখেশুনে মনে হয়েছিল সব ঘরই রয়েছে তাঁর একার দখলে।

চিলেকোঠা সংলগ্ন দশফুট লম্বা আট ফুট চওড়া যে-ঘরটিতে গ্রেপ্তার হলেন ফন কেমপেলেন, সে ঘরে পাওয়া গেল এমন একটা কেমিক্যাল যন্ত্র যার উদ্দেশ্যটাই মাথায় ঢুকল না কারুর। ছোট্ট এই ঘরটির এক কোণে খুব ছোট্ট একটা চুল্লির উপর একই নল দিয়ে যুক্ত দুটো চিনেমাটির মুচি বসানো ছিল। একটা মুচি প্রায় কাণায় কাণায় ভর্তি ছিল গলিত সিসেতে-একদম কাণায় কাণায় অবশ্য নয়-ঠিক সেইখানেই লাগানো ছিল নলের একটা মুখ। গলিত সিসে ততদূর পৌঁছোয়নি। আর একটা মুচিতে প্রচণ্ড বেগে একটা তরল পদার্থ বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছিল। হাতেনাতে ধরা পড়ে যেতেই অ্যাসবেসটস-নির্মিত দস্তানা পরা দু-হাতে মুচি দুটো ধরে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ফন কেমপেলেন। হাতকড়া লাগানো হয় তারপরেই। বাড়ীখানা তল্লাসী করার আগে দেহ তল্লাসী করতে গিয়ে কোটের পকেটে একটা কাগজের প্যাকেট ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় নি। অস্বাভাবিক তেমন কিছুই পাওয়া যায় নি অন্যান্য পকেটেও। কাগজের প্যাকেটের মধ্যে ছিল প্রায় সমপরিমাণে মিশানো দুটি বস্তু-একটি অ্যাণ্টিমনি, অপরটি নামহীন অজ্ঞাত একটি জিনিস। এ তথ্য নির্ণীত হয়েছিল পরে বিশ্লেষণ করার পর। অজ্ঞাত বস্তুটিকে নিয়ে বহু বিশ্লেষণ এবং গবেষণা বিফলে গিয়েছে, বস্তুটির স্বরূপ জানা যায়নি। কিন্তু একদিন যে জানা যাবে, তাতে সন্দেহ নেই।

চিলেকুঠরি সংলগ্ন এই ক্ষুদে প্রকোষ্ঠের পাশেই আর এক ছোট্ট ঘরে পুলিশ অফিসাররা একটা খাট দেখেছিলেন-কিন্তু সে খাটে রসায়নবিদ ভদ্রলোক নিদ্রা যান বলে যা কিছু গুজব রটেছে, তা আলাদীনের প্রদীপ আবিষ্কারের মত অত্যাশ্চর্য। তবে কি, সত্য তো চিরকালই উপন্যাসের চাইতেও অলীক হয়।

ব্রেমেনে খুব দুরবস্থায় দিন কেটেছে ফন কেমপেলেনের। সামান্য টাকার জন্যেও বাসা বদল আর ছুটোছুটি করতে হয়েছে। গাট্স্‌মাউথ কোম্পানীর সেই বিরাট জালিয়াতির ফলে

সারা দেশ চঞ্চল হয়েছিল। সন্দেহটা গিয়ে পড়েছিল কিন্তু ফন কেমপেলেনের ওপর। কেন না গ্যাসপারনিলেন অত ভূসম্পত্তি কেনার টাকা কোথা থেকে পেলেন, তার সদুত্তর তিনি দিতে পারেন নি। গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন, প্রমাণাভাবে খালাসও পেয়েছিলেন। পুলিশ কিন্তু খুব নজর রেখেছিল তাঁর গতিবিধির ওপর। দেখেছিল, প্রায়ই বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন ভদ্রলোক। হাঁটেন একই পথ ধরে। 'ডনডারগাট' নামে কুখ্যাত এঁদো অলিগলি অঞ্চলে গিয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দেন প্রতিবারই। অবশেষে অসীম অধ্যবসায়ের ফলে একদিন আবিষ্কৃত হ'ল তাঁর গোপন বিষয়। ছিনেজোঁকের মত পেছনে লেগে থেকে পুলিশ তাঁকে দেখতে পেল ফ্লাৎপ্লাৎ নামক একটা গলির মধ্যে সাততলা একটা বাড়ীর চিলেকোঠায়-হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়তেই দেখা গেল পুলিশী অনুমানই সত্যি-জালিয়াতি কাণ্ডকারখানার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে রয়েছেন ফন কেমপেলেন। ভয়ানক উত্তেজিত হয়েছিলেন ভদ্রলোক-দেখে তাঁর অপরাধ সম্বন্ধে তিলমাত্র আর সন্দেহ রইল না পুলিশের মনে। হাতে হাতকড়া লাগিয়ে খানাতল্লাসি চালিয়েছিল শুধু চিলেকোঠায় নয়-সাততলা বাড়ীর প্রতিটি ঘরেই-কেননা দেখেশুনে মনে হয়েছিল সব ঘরই রয়েছে তাঁর একার দখলে।

চিলেকোঠা সংলগ্ন দশফুট লম্বা আট ফুট চওড়া যে-ঘরটিতে গ্রেপ্তার হলেন ফন কেমপেলেন, সে ঘরে পাওয়া গেল এমন একটা কেমিক্যাল যন্ত্র যার উদ্দেশ্যটাই মাথায় ঢুকল না কারুর। ছোট্ট এই ঘরটির এক কোণে খুব ছোট্ট একটা চুল্লির উপর একই নল দিয়ে যুক্ত দুটো চিনেমাটির মুচি বসানো ছিল। একটা মুচি প্রায় কাণায় কাণায় ভর্তি ছিল গলিত সিসেতে-একদম কাণায় কাণায় অবশ্য নয়-ঠিক সেইখানেই লাগানো ছিল নলের একটা মুখ। গলিত সিসে ততদূর পৌঁছোয়নি। আর একটা মুচিতে প্রচণ্ড বেগে একটা তরল পদার্থ বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছিল। হাতেনাতে ধরা পড়ে যেতেই অ্যাসবেসটস-নির্মিত দস্তানা পরা দু-হাতে মুচি দুটো ধরে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ফন কেমপেলেন। হাতকড়া লাগানো হয় তারপরেই। বাড়ীখানা তল্লাসী করার আগে দেহ তল্লাসী করতে গিয়ে কোটের পকেটে একটা কাগজের প্যাকেট ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় নি। অস্বাভাবিক তেমন কিছুই পাওয়া যায় নি অন্যান্য পকেটেও। কাগজের প্যাকেটের মধ্যে ছিল প্রায় সমপরিমাণে মিশানো দুটি বস্তু-একটি অ্যাণ্টিমনি, অপরটি নামহীন অজ্ঞাত একটি জিনিস। এ তথ্য নির্ণীত হয়েছিল পরে বিশ্লেষণ করার পর। অজ্ঞাত বস্তুটিকে নিয়ে বহু বিশ্লেষণ এবং গবেষণা বিফলে গিয়েছে, বস্তুটির স্বরূপ জানা যায়নি। কিন্তু একদিন যে জানা যাবে, তাতে সন্দেহ নেই।

চিলেকুঠরি সংলগ্ন এই ক্ষুদে প্রকোষ্ঠের পাশেই আর এক ছোট্ট ঘরে পুলিশ অফিসাররা একটা খাট দেখেছিলেন-কিন্তু সে খাটে রসায়নবিদ ভদ্রলোক নিদ্রা যান বলে মনে হয় নি। ড্রয়ার আর বাক্স হাঁটকে পাওয়া গিয়েছিল অদরকারী বিস্তর কাগজ আর বেশ কিছু সোনা আর রুপোর মুদ্রা। খাটের তলায় পাওয়া গিয়েছিল ডালাখোলা একটা ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কে তালা নেই, কব্জাও নেই। হেলায় ডালাটা পড়েছিল খাটের তলায়। টেনে বার করতে গিয়ে এক ইঞ্চিও নড়ানো যায়নি। একজন হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় ঢুকে সবিস্ময়ে বলেছিল-'আরে, এতো দেখছি পেতলের পুরানো টুকরোয় ভর্তি। ঐ জন্যেই টেনে বার করতেই পারিনি!'

দেওয়ালে পা রেখে গায়ের জোড়ে ঠেলা মেরে এবং বাইরে থেকে সঙ্গীরা এক সঙ্গে হেঁইও-হেঁইও করে টেনে বার করেছিল ট্রাঙ্কটা। দেখেছিল ভেতরকার রাশি রাশি ধাতুখণ্ড। পেতলের টুকরো বলে যা মনে হয়েছিল, তার প্রতিটি অসম আকারের-মটরদানা থেকে ডলারের সাইজ পর্যন্ত-কিন্তু প্রায় সবকটাই মোটামুটি চ্যাপ্টা-ঠিক যেন গলিত নরম সিসে মাটিতে ফেলে দেওয়ার ঠাণ্ডা হয়ে জমে গেছে। এ-ধাতু যে পেতল নয়, অন্য ধাতু-এ সন্দেহ কোনো অফিসারের মাথাতেই তখনই আসেনি। পেতল বলে মনে হলেও জিনিসটা যে সোনা, এ ধারণা মাথায় আসবেই বা কি করে? উদ্ভট কল্পনা নয় কি? হেলায় ট্রাঙ্কভর্তি এই ছোট বড় দানার 'পেতল' থানায় নিয়ে গিয়েছিল ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে-অবজ্ঞায় নাক সিঁটকিয়ে থাকায় একটা কণাও পকেটস্থ করার প্রবৃত্তি হয়নি কারুরই। পরের দিন ব্রেমেন শহরের কাকপক্ষীও পর্যন্ত জেনে গিয়েছিল 'রাশি রাশি পেতল খণ্ডের' প্রতিটা খণ্ডই খাঁটি সোনা। মুদ্রায় যে খাদ মিশানো সোনা ব্যবহার করা হয়-সে সোনা নয়। একেবারে খাঁটি, নির্ভেজাল সোনা।

ফন কেমপেলেনের স্বীকারোক্তি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল বলে তা নিয়ে খুঁটিয়ে আর লিখতে চাইনা। পরশ পাথরের সন্ধান উনি পেয়েছেন-কোনো সন্দেহই নেই তাতে। অজ্ঞাত বস্তুটাকে বিসমাথ বলে জাহির করেছিলেন ফন কেমপেলেন-কিন্তু বিশ্লেষণে তা আজও প্রমাণিত হয়নি। সব পরীক্ষা-নিরীক্ষাই বিফলে গিয়েছে। উনি নিজে মুখ আলগা না করলে রহস্য চিরকাল রহস্যই থেকে যাবে। শুধু থেকে যাবে একটা পরম সত্য-খাঁটি সোনা সিসে থেকে বানানো যায় এমন এক উপাদানের সংযোগে যে উপাদানটির প্রকৃতি এবং মিশ্রণের অনুপাত আজও অজ্ঞাত।

ঘটনার গুরুত্ব দেখা গিয়েছিল পরবর্তী কয়েকটি ঘটনার

মধ্যে। ক্যালিফোর্নিয়ার সোনার খনি থেকে রাতারাতি সোনা তুলে নেওয়ার হিড়িক উঠেছে। কলোনী পত্তন হয়ে গেছে শুধু এই কারণেই। আজ হোক, কি কাল হোক, সিসে থেকে সোনা তৈরীর রহস্য ফন কেমপেলেন কি চিরকাল গোপন রাখতে পারবেন? কক্ষনো না। তখন তো দেখা যাবে, সিসের দাম সোনার চেয়ে বেশী, সোনার দামও নেমে যাবে রুপোর নিচে।

আবিষ্কারটার বৃত্তান্ত দেশের লোক জেনেছে মাত্র ছ-মাস আগে। কিন্তু এর মধ্যেই ইউরোপে সিসের দাম ডবল হয়ে গেছে, রুপোর দাম বেড়েছে প্রায় এক চতুর্থাংশ।

লাল মৃত্যুর মুখোশ

(দ্য রেড ডেথ)

দেশ জুড়ে হাহাকার সৃষ্টি করেছে 'লাল মৃত্যু'। শরীর থাকলেই ব্যাধি থাকে। কিন্তু এ রকম কদর্য এবং মারাত্মক ব্যাধি কখনো দেখা যায় নি। রক্তই এই কালরোগের লক্ষণ। রক্তের লাল রঙ আর বীভৎসতাই যেন 'লাল মৃত্যু'র আত্মপরিচয়। রহস্যময় ব্যাধি-উপদেবতার শীলমোহর এই রক্ত। অথবা রক্তই এই অবতারের পার্থিব রূপ। হঠাৎ অতীব্র যন্ত্রণা, চোখে ধোঁয়া দেখা, লোমকূপ দিয়ে অঝোর ধারে রক্তক্ষরণ। সারা গায়ে, বিশেষ করে মুখভর্তি টকটকে লাল ক্ষতচিহ্নের দরুন রোগগ্রস্তের ধারে কাছে কেউ এগোয় না-সেবা শুশ্রূষা সহানুভূতি তো দূরের কথা! রোগের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লাগে মাত্র আধ ঘণ্টা। প্রাণপাখি পিঞ্জর ছেড়ে উড়ে যায় আধ ঘণ্টা ফুরোলেই।

প্রিন্স প্রসপারো কিন্তু দারুণ সাহসী এবং ভীষণ সুখী মানুষ। তাঁর রাজত্বেই যখন 'লাল মৃত্যু' জনপদের পর জনপদ জনশূন্য করে দিলে, উনি হাজারখানেক সুস্থ বন্ধুবান্ধব বেছে নিলেন পাত্রমিত্র অমাত্যের মধ্যে থেকে। সবাইকে নিয়ে আশ্রয় নিলেন কেল্লার মত সুরক্ষিত একটি মঠে। জায়গাটা দেখবার মত, জমকালো। আয়তনে বিশাল। সাজসজ্জা সুরুচিপূর্ণ-প্রিন্স বাতিকগ্রস্ত হলেও রুচিবান পুরুষ। পুরো মঠটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের গায়ে লোহার ফটক। পারিষদবর্গ আগুনের চুল্লী আর হাতুড়ি সঙ্গে এনেছিল। ভেতরে ঢুকে ঝালাই করে এঁটে দিল ছিটকিনিগুলো। হঠাৎ মন খারাপ হলে, বাইরে যাওয়ার জন্যে ক্ষেপে উঠলে, কোনোরকমেই যাতে বেরোনো না যায়-তাই

এই ব্যবস্থা। খাবার-দাবারের অভাব নেই মঠে। সুতরাং লাল মৃত্যুকে থোড়াই কেয়ার! বাইরের দুনিয়া মরুক গে। শোক দুঃখে ভেঙে পড়াও মূর্খতা। প্রিন্স আমোদ-প্রমোদের ঢালাও ব্যবস্থা রেখেছেন মঠের মধ্যেই। আছে ভাঁড়, স্বভাব-কবি, নাচনী, গাইয়ে-বাজিয়ে, রূপসী এবং সুরা। সেই সঙ্গে নিরাপত্তা। বাইরে থাকুক 'লাল মৃত্যু'।

মাস পাঁচ ছয় পর অত্যন্ত অসাধারণ এক মুখোশ নাচের আয়োজন করলেন প্রিন্স মঠের সুরক্ষিত নিরাপত্তায় -বাইরের জগতে তখন 'লাল-মৃত্যু'-র অখণ্ড রাজত্ব।

মুখোশ নৃত্য শুধু ইন্দ্রিয়-সেবীদের মানায়। জাঁকজমকপূর্ণ বিলাসবহুল এ নাচের আসরে ভোগাসক্তি ছাড়া আর কিছু থাকে না। কিন্তু তার আগে যে ঘরগুলোয় নাচের ব্যবস্থা হয়েছিল, তার বর্ণনা আগে দেওয়া যাক। মোট সাতখানা রাজকীয় প্রকোষ্ঠে মুখোশ নাচ হয়। অনেক রাজপ্রাসাদে এই সাতখানা ঘর পরপর সাজানো থাকে এবং মাঝের প্রকাণ্ড দরজাগুলো ভাঁজ করে দু'পাশের দেওয়ালের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়ে দেওয়া হয় যে সাতখানা ঘরের উৎসব-দৃশ্য একসঙ্গে দেখা যায়। প্রিন্স কিন্তু গতানুগতিকতা ভালবাসতেন না-একটু উদ্ভট, একটু সৃষ্টিছাড়া আয়োজন না হলে তাঁর মন উঠত না। তাই মুখোশ নাচের সাতখানা ঘর এখানে এমন ভাবে নির্মিত, যাতে একবারে একখানা ঘরের দৃশ্যই দেখা যায়-তার বেশী নয়। বিশ তিরিশ গজ অন্তর আচমকা বাঁক নিয়েছে ঘরগুলো এবং প্রতি বাঁকে নানারকম অদ্ভুত চমকের ব্যবস্থা। ডাইনে-বাঁয়ের দেওয়ালের ঠিক মাঝখানে একটা লম্বা সরু গথিক জানলা। জানলার বাইরে বারান্দা-সাতখানা ঘরকে বেষ্টন করে রেখেছে এই জানলা। জানলার কাচ আঁটা-পাল্লা বন্ধ। এক-একটা জানলার এক একরকম রঙ। ঘরেরমধ্যে যে রঙের সাজসজ্জা-জানলার কাচের রঙও তাই। যেমন, পুব প্রান্তের ঘরটি নীলসজ্জায় সজ্জিত-জানলার রঙও গাঢ় নীল। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের অলংকরণ এবং দেওয়াল ঢাকা পর্দার রঙ নীলাভ লাল-জানলা দুটোর রঙও তাই। এই ভাবে তৃতীয় ঘর আর জানলা সবুজ রঙের, চতুর্থর আসবাবপত্র হাল্কা কমলা রঙের, পঞ্চমটিতে সাদা-ষষ্ঠ কক্ষে বেগুনী। সপ্তম ঘরটির কড়িকাঠ থেকে মেঝে পর্যন্ত ঝুলছে কালো মখমল-দেওয়াল ঢাকা পর্দা-কালো গালিচার ওপর লুটোচ্ছে এই ভেলভেট পর্দা। কিন্তু এ ঘরের জানলার রঙের সঙ্গে ঘরের রঙের মিল নেই। এ ঘরের দুই জানলার কাচ দুটি টকটকে লাল-রক্তলাল।

সাতখানা ঘরের কোনোটাতেই ঝাড়বাতি বা শামাদান রাখা হয় নি। কড়িকাঠ, মেঝে, দেওয়াল জোড়া বিস্তর স্বর্ণখচিত বিলাস সামগ্রীকে আলোকিত করা হয় নি সারি সারি দীপস্তম্ভ

সাজিয়ে। আলো আসছে জানলার বাইরে থেকে-রঙীন কাচের মধ্যে দিয়ে। জানলার ঠিক বাইরে বারান্দার ওপর দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন, তিন পায়ার ওপর রাখা কাঁসার পাত্র জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিপূর্ণ। আগুনের আভা রঙীন কাচের মধ্যে দিয়ে সেই রঙটিকেই ছড়িয়ে দিচ্ছে ঘরের মধ্যে। ফলে, এক একটি ঘরে সৃষ্টি হয়েছে এক একরকমের ফ্যানটাসটিক পরিবেশ-রোমাঞ্চক র, অলীক, উদ্ভট । পশ্চিম প্রান্তের কালো ঘরটির মধ্যে রক্ত লোহিত জানলার রঙ এসে-এমন এক নারকীয় পরিবেশ জাগিয়ে তুলেছে, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। রক্তলাল সেই আলোকরশ্মি যার মুখে পড়ছে, তাকেই মনে হচ্ছে মানুষ নয়-শরীরী প্রেত। লোমহর্ষক এই দৃশ্য দেখে বুক কেঁপে ওঠে না-এমন কেউ নেই। তাই এ ঘরে সচরাচর কেউ পা দিতে চায় না।

এই ঘরেরই পশ্চিম দেওয়ালে বসানো আছে আবলুস কাঠের তৈরী একটা দানবিক ঘড়ি। একঘেয়ে ধাতব শব্দে পেণ্ডুলাম দুলছে তো দুলছেই, মিনিটের কাঁটা এক চক্কর ঘুরে এলেই শোনা যায় এক ঘণ্টা সম্পূর্ণ হওয়ার বাজনা। ধাতুর ফুসফুস ভারি মিষ্টি সুরে যেন গান গেয়ে ওঠে। গভীর, স্পষ্ট এবং উচ্চগ্রামের সেই বাজনা এত মধুর যে অর্কেস্ট্রা স্তব্ধ হয়ে যায় ক্ষণেকের জন্যে-উৎকর্ণ হয়ে থাকে বাজনদাররা-ঘড়ির বাজনা শোনবার জন্যে। বাজনা যখন শুরু হয়, তখন যেন ছন্দ কেটে যায় সাতখানা ঘরের আমোদ-প্রমোদের -কারো মাথা ঘোরে, বয়োজ্যেষ্ঠরা কপাল টিপে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। প্রতিধ্বনির রেশ পুরো পুরি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই কিন্তু চাপা হাসি ছড়িয়ে পড়ে সাতখানা ঘরে, বাজনদাররা বিমূঢ় হাসে, ফিসফিস করে কথা বলে। ভাবে, কি বোকামিই না হয়েছে-পরের বার আর হবে না! কিন্তু ষাট মিনিট মানে, তিন হাজার ছশো সেকেণ্ড ঘুরে আসার পর মিনিটের কাঁটা যখন ঘণ্টার বাজনা বাজায়, আবার দেখা যায় ঘরজোড়া সেই বিহ্বলতা, ছন্দ-পতন, রোমাঞ্চ এবং অন্যমনস্কতা।

তা সত্ত্বেও কিন্তু নাচের আসরে ফূর্তির অভাব ঘটে না। প্রিন্সের রুচি ভিন্ন এবং অদ্ভুত। বর্ণচ্ছটার তারতম্য ধরার সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাঁর ছিল। তাই মামুলী অলংকরণ দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। তাঁর পরিকল্পনা বলিষ্ঠ এবং উত্তেজক-ধ্যানধারণায় আদিম জ্যোতি, কেউ কেউ তাঁকে এই কারণেই বলে উন্মাদ! তাঁর ভক্তবৃন্দ কিন্তু তা বলে না। প্রিন্সের কথা শুনলে, তাঁর দর্শন পেলে, তাঁর স্পর্শ লাভ ঘটলে মনেও হবে না তিনি আদৌ উন্মাদ!

ঘরসজ্জা তাই অত উদ্ভট, কিম্ভূতকিমাকার! সব মিলিয়ে কিন্তু যেন একটা ভয়ানক রূপকথার অলীক দেশ। ঐশ্বর্য, আভরণ, জাঁকজমকের ঘাটতি নেই-কিন্তু সবই বিদঘুটে।

আরব্য মূর্তিগুলোর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেমানান। আসবাবপত্রের পরিকল্পনায়, ক্ষিপ্ত মস্তিষ্কের দুরন্ত কল্পনার ছাপ-যেন প্রলাপের ঘোরে সৃষ্টি করেছে অপ্রকৃতিস্থ কোনো শিল্পী। সুন্দর, কিন্তু ভয়ঙ্কর। সৃষ্টিছাড়া, কিন্তু ন্যক্কারজনক নয়-দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে না। সাতখনা ঘরে ছড়ানো এই ধরনের অজস্র স্বপ্ন। অর্কেস্ট্রায় প্রণয় বাজনা বাজলেই এই স্বপ্ন গুলো যেন নেচে ওঠে, জানলার মধ্যে দিয়ে ফিলটার হয়ে আসা বিশেষ রঙ শুষে নিয়ে জীবন্ত হয় এবং অস্বাভাবিক ছায়ামায়ার মধ্যে সরীসৃপ গতিতে সঞ্চরমান হয়। সবই অবশ্য দৃষ্টিবিভ্রম, কিন্তু মনে হয় সত্যি, সত্যি, সব সত্যি! ঘণ্টা শেষে বাজে ভেলভেট কক্ষের দানব ঘড়ি। সাতখানা ঘরে নেমে আসে শ্বাসরোধী নৈঃশব্দ-ঘড়ির বাজনা ছাড়া সবার কণ্ঠ তখন নীরব। স্বপ্নগুলো পর্যন্ত যেন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তুপ্রতিধ্বনিরঢেউ মিলিয়ে যেতে না যেতেই চাপা হাসির ঢেউ আছড়ে পড়ে সাতখানা ঘরে। আবার উদ্দাম হয় ঐকতান সঙ্গীত। জাগ্রত হয় স্বপ্নগুলো, কাঁসার পাত্রস্থিত অগ্নি-আলোকের রঙ শুষে নিয়ে নেচে দুলে ঘুরতে থাকে যেন ঘরময়। পশ্চিম প্রান্তের মখমল কক্ষে কেউ কিন্তু ভুলেও আসে না। সেখানকার কালো ভেল ভেটের পটভূমিকায় রক্তলাল রশ্মি রক্ত হিম করে দেয়, অত কাছ থেকে আবলুস ঘড়ির টিকটিক হৃদঘাত হাতুড়ির মত আছড়ে পড়ে কানের পর্দায়।

অন্য ঘরগুলিতে কিন্তু তিল ধারণের জায়গা নেই। প্রাণস্পন্দন উত্তাল হয়েছে বাকি ছটি ঘরে। ঘূর্ণিপাকের মত ঘুরে ঘুরে নাচ চলছে তো চলছেই হাসি, ফুর্তি, আনন্দ, উচ্ছ্বাস তুফান ঝড় সৃষ্টি করেছে ছ'খানা ঘরে। এমন সময়ে শুরু হল মধ্যরাতের বাজনা। দানবিক ঘড়ির বক্ষপিঞ্জর থেকে ভেসে এল সুরেলা সঙ্গীত-তীক্ষ্ণ তীব্র অথচ মধুর। সবাই নিশ্চুপ। সবাই উৎকর্ণ ঘণ্টাধ্বনির জন্য! পরপর বারো বার বাজল দানবিক ঘণ্টা। শেষ ঘণ্টার গমগমে রেশ তখনো মিলিয়ে যায় নি সাতখানা ঘর থেকে -এমন সময়ে হাজার মানুষের খেয়াল হল মুখোশ পরা এক আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটেছে নাচের আসরে। অথচ একটু আগেও তাকে দেখা যায় নি। গুঞ্জন ছড়িয়ে গেল ঘরে ঘরে। গুজব, গুঞ্জন বিস্ময় অভিভূত করল হাজার মানুষকে-সবশেষে আতঙ্ক, বিভীষিকা। ঘৃণার বিষে কুঁকড়ে গেল হাজারটি হৃদয়। ফ্যানটাসটিক ঘরগুলোর অপচ্ছায়া সমাকীর্ণ এই যে ছবি আমি আঁকলাম, সেই পরিবেশে সাধারণ মানুষের আবির্ভাব এতখানি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারত না। অলীক, উদ্ভট, অবাস্তব রূপকথার রাজত্বে নিশ্চয় এমন কোনো আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটেছিল -যা এই ফ্যানটাসটিক পরিবেশকেও ম্লান করে দিয়েছে। কিন্তু মুখোশ নৃত্যের অনুমতি তো সবাইকে দেওয়া হয়

না। আগন্তুক কিন্তু অনুমতির ধার ধারে নি। প্রিন্সের অসীম সৌজন্যকে ডিঙিয়ে আবির্ভূত হয়েছে নাচের আসরে।

শরীরী রহস্য দীর্ঘকায় এবং বলিষ্ঠ। আপাদমস্তক কফিনসাজে আবৃত। মুখোশটি হুবহু মড়ার মুখের মত। আড়ষ্ট মুখচ্ছবি-খুঁটিয়ে দেখলেও মুখোশ বলে মনে হয় না-এত নিখুঁত মুখোশ। এ হেন গা-ঘিনঘিনে চেহারাও বরদাস্ত করা যেত-কিন্তু অস্ফুট গুঞ্জন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল অন্য কারণে। অদ্ভুত এই মূর্তিটি বিমূর্ত 'লাল-মৃত্যু'! সারা গায়ে কাঁচা রক্তের দাগ। মুখে রুধিরসিক্ত বীভৎস ক্ষত।

বাজনদারদের মাঝে ধীর পদক্ষেপে হাঁটছিল এই প্রেতচ্ছায়া। দেখেই শিউরে উঠলেন প্রিন্স। পরমুহূর্তে মুখ আরক্ত হল প্রচণ্ড ক্রোধে।

হুঙ্কার দিয়ে বললেন পারিষদদের-'কার এত সাহস? আমাকে অপমান করার এত স্পর্ধা কার? ঘাড় ধরে টেনে আনুন-টান মেরে খুলে দিন মুখোশ -কাল সূর্য উঠলেই ফাঁসি দেব পাঁচিলের ওপর!'

নীল ঘরে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠলেন প্রিন্স-অর্কেস্ট্রা স্তব্ধ হয়েছিল আগেই তাঁর হাতের ইশারায়-তাই সাত খানা ঘরে গম গম করে উঠল তাঁর বজ্রগর্ভ কণ্ঠের হুঙ্কার।

ফ্যাকাসে মুখে পারিষদরা ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তাঁকে-অদূরে আগন্তুক। হুঙ্কার শুনেই কেউ কেউ এগোলো সেই দিকে-কিন্তু আচম্বিতে দীর্ঘ পদক্ষেপে প্রিন্সের দিকে এগিয়ে এল প্রেতমূর্তি। সভয়ে সরে গেল সবাই-পথ ছেড়ে দিল মূর্তিমান আতঙ্ককে। কারও সাহস হল না, প্রবৃত্তি হল না রক্তাপ্লুত দেহ স্পর্শ করতে। বিনা বাধায় তাই মূর্তিমান আতঙ্ক প্রিন্সের একগজ দূর দিয়ে হেঁটে গেল নীলাভ লাল ঘর অভিমুখে। অদৃশ্য হস্তের ধাক্কায় ঘরশুদ্ধ লোক পিছু হটতে হটতে সিঁটিয়ে রইল দেওয়ালের সঙ্গে। আগন্তুক বাধা পেল না কোথাও- তাড়াহুড়ো করল না। মেপে মেপে পা ফেলে ধীরে সুস্থে নীলাভ লাল কক্ষের মধ্যে দিয়ে পৌঁছোলো সবুজ কক্ষে-সেখান থেকে কমলা কক্ষে-তারপর সাদা ঘরে-এর পর বেগুনী প্রকোষ্ঠে-কিন্তু পথ রোধ করল না কেউ।

বেগুনী ঘরে পৌঁছোতেই সাময়িক কাপুরুষতা কাটিয়ে উঠে রুদ্ররোষে ধেয়ে গেলেন প্রিন্স-কোষ থেকে টেনে নিলেন শাণিত ছুরিকা। কিন্তু তথাপি কারো সাহস হল না তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার। আতঙ্কে নীল হয়ে সিঁটিয়ে রইল দেওয়ালের গায়ে। আগন্তুক তখন ভেলভেট কক্ষের প্রান্তে পৌঁছেছে-ছুটতে ছুটতে খোলা ছুরি হাতে তার তিন চার ফুট দূরে গিয়ে পৌঁছোলেন প্রিন্স।

সহসা ঘুরে দাঁড়াল আগন্তুক। আর্তশ্বরে চিৎকার করে উঠলেন প্রিন্স-ছুরি ছিটকে গেল কার্পেটে-নিষ্প্রাণ দেহটা সটান আছড়ে

পড়ল আগন্তুকের পদতলে।

সম্বিত ফিরে পেল অভ্যাগতরা! বিষম ক্রোধে ধেয়ে এল কালো ঘরে। আবলুস ঘড়ির গা ঘেঁষে নিথর দেহে দাঁড়িয়ে ছিল আগন্তুকের দীর্ঘ মূর্তি-রাগে চেঁচাতে চেঁচাতে টান মেরে খসিয়ে আনা হল মড়ার মুখের মুখোশ আর কফিন সাজের পোশাক। রক্ত জল হয়ে গেল পরক্ষণেই-কফিন সাজের অন্তরালে শুধু শূন্যতা-শরীর নেই।

এইভাবে এল 'লাল মৃত্যু'-এল রাতের আঁধারে চোরের মত নিঃশব্দ চরণে। একে একে অভ্যাগতরা আছড়ে পড়ল রুধিররঞ্জিত দেহে-আর নড়ল না। স্তব্ধ হল আবলুস ঘড়ি। নিভে গেল তেপায়ার অগ্নিশিখা। অন্ধকার, অবক্ষয় আর 'লাল মৃত্যু'র নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল ভূখণ্ডে।

মৃত্যুর পরে

(লিজিয়া)

লেডী লিজিয়ার সঙ্গে কবে, কিভাবে, কোথায় আমার প্রথম পরিচয় ঘটেছিল, বিশ্বাস করুন, আমার কিছুই মনে নেই। তারপর অনেক বছর গেছে, অনেক কষ্ট পেয়েছি, স্মৃতি দুর্বল হয়ে এসেছে। অথবা লিজিয়ার দুর্জ্ঞেয় চরিত্রের সবটুকু আমি ধরতে পারিনি বলেই সব কথা মনে করতে অক্ষম।

লিজিয়া ! লিজিয়া ! লিজিয়া ! শুধু এই নামটি মন্ত্রের মত উচ্চারণ করলেই মনের চোখে ভেসে উঠে অতুলনীয় একটি রূপ-ইহ লোকের মায়া যে অনেক আগেই কাটিয়েছে। লিজিয়া ! লিখতে বসে মনে পড়ছে, সে এসেছিল আমার বান্ধবীরূপে, তারপর বাগদান করে সহায় হয়েছিল আমার পড়াশুনায়। সবশেষে আমার হৃদয়মণিরূপে বরণ করেছিল আমাকে স্বামীত্বে।

সব ভুলেছি, ভুলি নি কেবল লিজিয়ার অসামান্য রূপ। দীর্ঘাঙ্গী, কৃশকায়া। চলাফেরা করত হাল্কা চরণে। পড়ার ঘরে ঢুকত লঘুপায়ে ছায়ার মত, টের পেতাম না। সঙ্গীতের মত নরম মিষ্ট কণ্ঠে কথা বললে চমক ভাঙত, রোমাঞ্চিত হতাম কাঁধের ওপর মর্মর হস্তের স্পর্শে।

লর্ড ভেরুলাম বলেছেন, প্রকৃত রূপ চিনেও চেনা যায় না। সে রূপের মধ্যে এমন অদ্ভুত কিছু থাকে, যা আমাদের অজ্ঞাত, ব্যাখ্যার অতীত। লিজিয়ার মধ্যে আমি এই অজানা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি, কিন্তু খুঁজে পাই নি কেন সে এত শ্রীমতী। রূপ সম্বন্ধে আমাদের চিরকালের যে সংজ্ঞা, লিজিয়ার রূপ সেই বাঁধাধরা

ফরমুলায় পড়ে না। তবুও সে অলোকসামান্যা কেন? ললাট নিখুঁত, গাত্রচর্ম হস্তীদন্তশুভ্র, দাঁড়কাকের মত কুচকুচে কালো একরাশ ঢেউ খেলানো চুল। নাকের গড়ন হিব্রু সুন্দরীদের হার মানায়। সুচারু নাসারন্ধ্রে পরিস্ফুট স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। মিষ্টি মুখটি স্বর্গীয় সুধায় রমণীয়। ওষ্ঠের তুলনায় অধর ঈষৎ পুষ্ট, গালের টোল যেন নিজেই মুখর হতে চায়, হাসলেই দেবলোকের বিমল রশ্মিরেখায় যেন ঝলমল করে ওঠে পরিপাটি দাঁতের সারি।

সবচেয়ে আশ্চর্য ওর নয়ন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ডাক-সাইটে সুন্দরীদের নয়নের মত নয়, কোনো তুলনাই চলে না। লর্ড ভেরুলাম সৌন্দর্য রহস্যের ব্যাখ্যা করতে যা বলেছেন, অজানা সেই রহস্য বুঝি বিধৃত ওর আকাশ সমান আঁখির মধ্যে। সাধারণ সুন্দরীদের চেয়ে বড় চোখ, উজ্জ্বল তারকার মত প্রদীপ্ত। উত্তেজিত হলেই ভাস্বর হয়ে ওঠে তুলনাহীন এই প্রত্যঙ্গ দুটি। বিচ্ছুরিত হয় অপার্থিব সৌন্দর্য। তখন তা বন্য তাতার সুন্দরীদের চোখের মতই দুরন্ত ঝলমলে। চোখের মণি দুটোয় কালো হীরের দীপ্তি। বড় বড় চক্ষু পল্লব। বঙ্কিম ভুরু দুটিও কুচকুচে কালো। অদ্ভুত সৌন্দর্যটা কিন্তু চোখের রঙ, দীপ্তি বা গঠন সুষমায় নয়-এ রহস্য ওর চোখের চাহনিতে। কেন ওর চোখের ভাব এত রহস্যময়! এত মোহময়! কিছুতেই তল পাই নি নিতল সেই চাহনির। আমার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দূর আকাশের যুগল নক্ষত্রর মত অম্লান থেকেছে ওর সৌন্দর্যের আকর যুগল নয়ন। আমি পূজা করেছি সেই নক্ষত্র দুটিকে, জ্যোতির্বিদের মত অন্বেষণ করেছি নক্ষত্রের স্বরূপ—ব্যর্থ হয়েছি।

আশ্চর্যসুন্দর রহস্যময় এই নক্ষত্রসম চোখ দুটির দ্যুতিও কিন্তু ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে এল। অসুস্থ হল লিজিয়া। বন্য চোখ দুটিতে আর সে আভা ফুটল না, বিশীর্ণ আঙুলগুলি মোমের আঙুলের মত রক্তহীন হয়ে এল। সামান্যতম আবেগেই স্পষ্ট হল শুভ্র ললাটের নীল শিরা। বেশ বুঝলাম, সময় ফুরিয়ে আসছে লিজিয়ার, মরতে ওকে হবেই। আমি প্রাণপণে লড়তে লাগলাম মনের সঙ্গে। লড়তে লাগল লিজিয়াও। জীবনের প্রতি অসীম মায়া, জাগতিক সংসারের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ, বেঁচে থাকার আত্যন্তিক বাসনা বিমূর্ত হল ওর মৃদু কণ্ঠস্বরে। ওর সেই অবস্থায় সান্ত্বনার কোনো ভাষা আমি পাই নি।

লিজিয়া আমায় ভালবাসত। বুক দিয়ে ভালবাসত। ওর ভালবাসার গভীরতা সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছি ওর চিরবিদায়ের পর। মৃত্যুর আগে ধীর স্থির নয়নে আমার পানে চেয়ে মৃদু স্বরে ও আমাকে প্রেমের অমৃত বচনই শুনিয়েছিল। বলেছিল, সেই কবিতাটি আবৃত্তি করবে?

আমি অবরুদ্ধ আবেগে শুনিয়েছিলাম ওর স্বরচিত কবিতা। কবিতা শেষ হল। আর্তীক্ষ্ণ চিৎকার করে সটান বিছানায় দাঁড়িয়ে উঠল লিজিয়া। মৃত্যুপথযাত্রীর এত আবেগ সইবে কেন? নিঃশেষিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল শয্যায়। শেষ নিশ্বাস যখন পড়ছে, তখন শুনলাম বাতাসের সুরে ওর আত্মা যেন বিড়বিড় করছে অধরোষ্ঠের ফাঁকে। কান পেতে শুনলাম গ্ল্যানভিলের সেই অমর কথা-"ইচ্ছার মৃত্যু নেই। ঈশ্বর স্বয়ং একটা মহান ইচ্ছা। মানুষ দেবলোকে যেতে চায় না-মরার পরেও না-আপন ইচ্ছাশক্তি যতক্ষণ না দুর্বল হচ্ছে।"

এই তার শেষ কথা। মারা গেল লিজিয়া। শোকে দুঃখে আছড়ে পড়লাম আমি। নিঃসঙ্গ পুরীতে থাকতে পারলাম না। ঐশ্বর্য বলতে যা বোঝায়, আমার তার অভাব ছিল না। নশ্বর মানুষ যে সম্পদ কল্পনাও করতে পারে না, আমার তা ছিল। সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল লিজিয়াকে বিয়ে করার পর। তাই মাস কয়েক পরে ঘরছাড়া দিকহারা হয়ে দেশভ্রমণের পর একটা পুরনো মঠ কিনলাম ইংল্যাণ্ডের মাটিতে। বিষাদাচ্ছন্ন মঠ। আসবাবপত্রে অনেক স্মৃতি, অনেক গাথা, অনেক ইতিহাস বিজড়িত। আমার নিঃসঙ্গ শোকবিধুর মনের উপযোগী পরিবেশ। ভাঙা মঠের বাইরেটা ভাঙাই রইল, মেরামত করলাম না। কিন্তু ভেতরটা সাজালাম রুচিসুন্দরভাবে দামী দামী জিনিস দিয়ে। আমার তখন মাথার ঠিক নেই। ছেলেমানুষী উন্মাদনায় পেয়ে বসেছিল আমাকে। মহার্ঘ আসবাসপত্র দিয়ে ঘরসজ্জা আমার চিরকালের বাতিক। নিরালা অঞ্চলের সেই ভাঙা মঠের অভ্যন্তরেও তাই নিয়ে এলাম স্বর্ণখচিত গালিচা, মিশরীয় কারুকার্য, জমকালো পর্দা। শোকাচ্ছন্ন হয়েও আফিমের ঘোরে আমি দিনকয়েক মত্ত রইলাম গৃহ সজ্জা নিয়ে। তারপর একদিন শুভ্রকেশী নীল নয়না লেডী রোয়েনাকে বধূবেশে নিয়ে এলাম সেই বাসভবনে অবিস্মরণীয় লিজিয়ার শূন্য সেই সিংহাসনে বসাতে।

কনে বউয়ের জন্যে যে ঘরটি সাজিয়ে ছিলাম, তার বর্ণনা দিচ্ছি এবার। ঘরটা মঠের শীর্ষদেশে, বুরুজের তলায়। পাঁচকোনা ঘর। দক্ষিণ দিকের দেওয়াল জোড়া একটা জানলা। ভেনিস থেকে আমদানি করা প্রকাণ্ড একখানা রঙীন কাঁচ বসানো জানলায়। সূর্যালোক অথবা চন্দ্রকিরণ সেই কাঁচের মধ্য দিয়ে ভৌতিক প্রভা দিয়ে লুটিয়ে পড়ে ঘরের আসবাসপত্রে। বিশাল জানলার ওপরে একটা প্রাচীন আঙুরলতা শ্যাওলা ধরা বুরুজ বেয়ে উঠে গিয়েছে ওপরে। ওক কাঠের কড়িকাঠ অনেক উঁচু। খিলানের আকারে নির্মিত। কাঠের গায়ে বহু পুরোনো কিম্ভূতকিমাকার আধা গথিক কারুকাজ। বিষণ্ণ কড়িকাঠের মাঝখানের খিলান থেকে সোনার চেনে ঝুলত একটা সোনার

ধুনুচি। সারাসেনিক প্যাটার্নে তৈরী গন্ধ পাত্র। সর্পিল রেখায় অবিরাম বর্ণবিচিত্র অগ্নিশিখা লেলিহ রসনা মেলে ধরত কারুকার্য পরিবৃত রন্ধ্রপথে।

বেশ কয়েকটি তুর্কী পালঙ্ক আর সোনালী শামাদান সাজানো ঘরের নানা স্থানে। ভারতবর্ষ থেকে আনিয়েছিলাম নিরেট আবলুস কাঠে নির্মিত নতুন বউয়ের আরামকেদারা, মাথার ওপর ছত্রাকার চন্দ্রাতপ। পাঁচকোণে বসানো পাঁচটা সমাধি-সিন্দুক, ঘন কালো আগ্নেয়শিলা খুদে তৈরী। ডালার ওপর সুপ্রাচীন ভাস্কর্য, সিন্দুকগুলি সংগ্রহ করেছি রাজারাজড়ার সমাধি-মন্দির থেকে। সবচেয়ে জবর ফ্যানট্যাসি কিন্তু দেওয়াল জোড়া পর্দায়। দানবিক দেওয়ালের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত ঝুলছে মহার্ঘ বস্ত্রাবরণ, যা গালিচার মত পুরু, তুর্কী পালঙ্কের চাদরের মত চিত্র-বিচিত্র, জানলার পর্দার মত জমকালো। সোনার কাপড় দিয়ে তৈরী এই বস্ত্রাবরণের দাম শুনলে স্তম্ভিত হতে হবে। কুচকুচে কালো কাপড়ের ওপর স্বর্ণচিত্র, ব্যাস এক ফুট, সমান ব্যবধানে আরবী ইমারতের উদ্ভট নকশা। ঘরের মধ্যে ঢুকলে প্রথমে নকশাগুলোকে আরবদেশীয় মনে হবে। আরো এগোলে নকশার চেহারা পালটে যাবে, যেন বিরাটকায় দানবদল কিম্ভুতকিমাকার ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে; পায়ে পায়ে ঘরের মাঝে এলে দানবদলও অদৃশ্য হবে রোমাঞ্চকর পর্দার বুক থেকে। তখন ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে কেবল দুলবে কুসংস্কারের ছায়ামূর্তি। অঙ্গহীন বিন্দুতে মূর্তিগুলোকে মনে হবে মুখ ঢাকা সন্ন্যাসীর দল, নির্নিমেষে নিরীক্ষণ করছে ঘরের প্রাণীদের। কৃত্রিম উপায়ে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে পর্দার পেছনে। তাতে বৃদ্ধি পেয়েছে গা-শিউরোনো অনুভূতি। হাওয়ায় অবিরাম দুলতে থাকে ভারি পর্দা—অলীক কাহিনীর বিচিত্র অপচ্ছায়ার মত মঠবাসীদের কল্পিত আকারগুলিকে মনে হয় সজীব। গায়ে রোমাঞ্চ জাগে সেই দৃশ্য দেখলে, সিরসির করে শিড়দাঁড়া।

বিয়ের প্রথম মাসটা এহেন ঘরেই কাটল। খুব একটা অশান্তি হল না। নতুন বউ আমার থমথমে মুখ দেখে ভয় পেত, আমার আত্মনিমগ্ন রূপ দেখে দূরে সরে যেত। আমাকে সে ভালোবাসতে পারেনি, তাতে আমি খুশিই হয়েছি। নিজের মনের অতলে ডুব দিয়ে দিবারাত্র ধ্যান করতাম লিজিয়াকে—যে লিজিয়া আর কোনো দিন ফিরে আসবে না। চিরবিদায় নিয়েছে বলেই তার রূপ আমার মধ্যে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তার প্রতি আমার আকর্ষণ আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমার আফিমের নেশা ছিল। নেশার ঘোরে স্বপ্ন দেখতাম লিজিয়াকে। কল্পনা করতাম, আহা রে, আবার যদি ওকে ফিরিয়ে আনা যেত এই মাটির পৃথিবীতে!

বিয়ের দ্বিতীয় মাসে হঠাৎ অসুস্থ হল লেডী রোয়েনা। রোগমুক্তি ঘটতে সময় লাগল। ব্যাধির প্রকোপেই বোধ হয় প্রায় অনুযোগ করত ঘরের মধ্যে অদ্ভুত পদশব্দের। যেন ছায়া নড়ছে, অদ্ভুত আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। চোখের ভুল আর কানের ভুল বলে উড়িয়ে দিতাম। স্নায়ু দুর্বল হলে এ-রকম ইন্দ্রজাল অনুভব করে অনেকেই।

বেশ কিছুদিন পরে আস্তে আস্তে ভাল হয়ে উঠল রোয়েনা। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার শয্যাশায়ী হল। এবার কিন্তু রোগ সারবার লক্ষণ দেখা গেল না। ভয় পেলাম ওর অবস্থা দেখে। শুকিয়ে যেতে লাগল দিনের পর দিন, যেন মিশে গেল বিছানার সাথে। ডাক্তাররাও ধরতে পারল না অসুখটা। মাঝে মাঝে ছেড়ে যায়, আবার এসে চেপে ধরে। ক্রমশঃ কমে আসতে লাগল প্রাণশক্তি, বৃদ্ধি পেল স্নায়ুবিক বিকার। সেই অপচ্ছায়ার নড়াচড়া নাকি আবার দেখতে পাচ্ছে—শুনতে পাচ্ছে অদ্ভুত শব্দ। দেওয়ালজোড়া ফ্যানটাস্টিক পর্দার আড়াল থেকেই এ শব্দ শোনা যায়, সাঁৎ করে ছায়ামূর্তি মিলিয়ে যায় পর্দার বুকে।

একদিন রাতে ওর এই অস্বস্তির কথা নিয়ে আমাকে আরো চেপে ধরল রোয়েনা। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চমকে উঠছিল। আমি উদ্বিগ্ন চোখে দেখছিলাম বিশীর্ণ মুখের ভাবতরঙ্গ। পালঙ্কের পাশে রাখা আবলুস কাঠের কেদারায় বসেছিলাম আমি। ঘুম ভাঙল রোয়েনার। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে বললে, শব্দটা নাকি আবার শোনা যাচ্ছে। আমি কিন্তু কিছু শুনলাম না। বলল, অপচ্ছায়াকে আবার দেখা যাচ্ছে, আমি কিন্তু কাউকে দেখলাম না। হাওয়ায় পর্দা দুলছিল। ভাবলাম, ওকে বুঝিয়ে বলি, প্রায় অশ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ পর্দার খসখসানি ছাড়া কিছু নয়। পর্দার বিদঘুটে মূর্তিগুলো দুলে দুলে উঠছে বলে মনে হচ্ছে, কে যেন সরে যাচ্ছে পর্দার আড়ালে।

রোয়েনার মুখ কিন্তু নিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। বুঝিয়ে ওর ভয় কাটাতে পারব না। মানুষ মরে গেলে মুখ যে রকম সাদা হয়ে যায়, রোয়েনার মুখের অবস্থা তখন তাই। মনে হল, এই বুঝি জ্ঞান হারাবে। কাছাকাছি চাকর-বাকর নেই যে ডাকব। মনে পড়ল, হঠাৎ দরকারের জন্যে ঘরের মধ্যেই এক বোতল সুরা রেখে গিয়েছিলেন ডাক্তার। তাই দৌড়ে গেলাম ঘরের অপর প্রান্তে সুরার আধার আনতে। মাথার ওপর ঝুলন্ত সোনার গন্ধপাত্রের তলা দিয়ে যাওয়ার সময়ে একই সময়ে দুটো বিচিত্র অনুভূতি সাড়া জাগিয়ে গেল আমার লোমকূপে।

স্পষ্ট মনে হল কে যেন আলতো করে আমার গা ঘষটে সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, ধুনুচির তলায় আলোকবলয়ের মধ্যে স্বর্গের পরীর মত একটা আবছা অস্পষ্ট ছায়া। ছায়ার ছায়া যদি কিছু থাকে-দ্যুতিময় সেই ছায়াটা যেন তাই।

কিন্তু আমি নিজে তখন আফিমের ঘোরে, তাই এ সব কথা রোয়েনাকে না বলাই সমীচীন মনে করলাম। মদিরাপাত্র এনে পেয়ালায় ঢেলে তুলে ধরলাম ওর ঠোঁটের কাছে। তখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে রোয়েনা। মদিরাপেয়ালা আমার হাত থেকে নিয়ে ধরল ঠোঁটের কাছে। আমি বসলাম আবলুস কাঠের আরামকেদারায়। চোখ রইল কিন্তু রোয়েনার ওপর। ঠিক এই সময়ে আমার সর্বসত্তা দিয়ে অনুভব করলাম আবার সেই মায়াস্পর্শ। স্পষ্ট শুনতে পেলাম, কে যেন লঘু চরণে হেঁটে এল কার্পেটের ওপর দিয়ে, এগিয়ে গেল কেদারার পাশ দিয়ে। ঠিক তখনি পেয়ালাটা উঁচু করে ধরেছে রোয়েনা। আমার চোখের ভুল কিনা জানি না, কিন্তু বেশ দেখলাম যেন শূন্যমার্গের কোন নির্ঝরিণী উৎস থেকে সহসা আবির্ভূত হল চার-পাঁচটা টলটলে চুণীর মত অত্যুজ্জ্বল তরল বিন্দু এবং টপটপ করে খসে পড়ল পেয়ালার সুরায়।

রোয়েনা কিছু দেখল না। এক চুমুকে পাত্র নিঃশেষ করে ফিরিয়ে দিল আমার হাতে। আমি ভাবলাম, যা দেখেছি তা আফিমের প্রভাবে দেখেছি। রাত্রি নিশীথে আতঙ্কিত স্ত্রীকে সামনে রেখে নিজেই ইন্দ্রজাল দর্শন করছি।

একটা ব্যাপার কিন্তু আমার মনের কাছে গোপন করতে পারলাম না। রুবীর ফোঁটা সুরার মধ্যে ঝড়ে পড়ার পর থেকেই আরো খারাপ হল স্ত্রীর শরীর। তৃতীয় রাত্রে দাসীরা তাকে কবরে শোয়ার পোশাক পড়িয়ে দিলে। চতুর্থ রাত্রে তার চাদর ঢাকা প্রাণহীন দেহ সামনে নিয়ে পাথরের মত বসে রইলাম। ফ্যানট্যাসটিক সেই কক্ষে অনেক উদ্ভট দৃশ্য যেন আফিমের ঘোরে ছায়ার মত কল্পনায় ভেসে গেল। ঘরের পাঁচ কোণে রাখা পাঁচটি শবাধারের পানে চাইলাম অশান্ত চোখে। দেখলাম, দুলন্ত পর্দার গায়ে কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিগুলোর নড়াচড়া, মাথার ওপরে ধুনুচি ঘিরে সর্পিল আগুনের কুণ্ডলী। সেখান থেকে দৃষ্টি নেমে এল তলায়, মেঝের ওপরে। দু'রাত আগে যেখানে দেখেছিলাম অপার্থিব এক জ্যোতির্ময় ছায়ার অস্পষ্ট আদল। কিন্তু এখন সে স্থান শূন্য। এতক্ষণ নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখছিলাম, এবার স্বচ্ছন্দ হয়ে এল শ্বাস-প্রশ্বাস। সহজভাবে তাকালাম শয্যায় শায়িতা পাণ্ডুর আড়ষ্ট দেহের পানে। সঙ্গে সঙ্গে লিজিয়ার স্মৃতি ভিড় করে এল মনের মধ্যে। মনে পড়ল, এমনিভাবে আর এক রাতে তার প্রাণহীন দেহ সামনে নিয়ে নিথরভাবে বসে থেকেছি আমি। মনে পড়ল হাজার হাজার মিষ্টি মধুর বেদনাবিধুর ঘটনা। রাত বয়ে চলল। তিক্ত স্মৃতিভারে তন্ময় হয়ে গেলাম-লিজিয়ার ধ্যানে বিশ্বসংসার বিস্মৃত হলাম।

মাঝরাত নাগাদ একটা চাপা, হ্রস্ব, মধুর, কিন্তু স্পষ্ট ফোঁপানির শব্দে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করলাম,

শব্দটা এসেছে আবলুস কেদারা থেকে। কুসংস্কারের আতঙ্ক পেয়ে বসল আমায়, উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। কিন্তু মৃত্যু কেদারা থেকে আর কেউ ফুঁপিয়ে উঠল না। আড়ষ্ট হয়ে চাইলাম নিষ্প্রাণ দেহের পানে, কিন্তু নিস্পন্দ দেহে সামান্যতম চাঞ্চল্যও দেখতে পেলাম না।

কিন্তু আমার ভুল হয় নি। যতক্ষণই হোক না কেন, ফোঁপানির শব্দ আমি ঠিকই শুনেছি, শুনেছি বলেই ধ্যান থেকে জেগে উঠেছি। তাই মনটা শক্ত করে নিমেষহীন চোখে চেয়ে রইলাম মৃতা স্ত্রীর পানে।

অনেকগুলো মিনিট কাটল বিনা ঘটনায়। তারপর শুরু হল আর এক অলৌকিক রহস্যের খেলা। ধীরে ধীরে রক্তিম হয়ে এল দুই গাল। খুব আবছা হলেও রক্তাভা চোখ এড়ালো না আমার, সেই সঙ্গে দেখলাম রক্তের খেলা বসে যাওয়া চোখের পাতায়। হাত-পা অবশ হয়ে এল আমার সেই অসম্ভব দৃশ্য দেখে। মনে হল, এই বুঝি স্তব্ধ হয়ে যাবে হৃৎপিণ্ড।

তীব্র কর্তব্যবোধ শেষ পর্যন্ত মাথা চাড়া দিল মনের মধ্যে। বেশ বুঝলাম, রোয়েনা মারা যায়নি। এখনো বেঁচে আছে। এখুনি কিছু উপাসনার দরকার। কিন্তু চাকর-বাকরেরা থাকে মঠের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, আমার ডাক সেখানে পৌঁছোবে না। উঠে গিয়েও তাদের ডেকে আনতে সাহস পেলাম না।

তাই একাই সূক্ষ্মদেহী রোয়েনার আত্মাকে আহ্বান জানালাম–সে তো এখনো যায়নি, আছে আমার কাছেই, আকুল আহ্বান জানালাম দেহপিঞ্জরে ফের ফিরে আসতে। কিন্তু দেখতে দেখতে রক্তাভা মিলিয়ে গেল চোখের পাতা আর গালের চামড়া থেকে। আবার মৃত্যুর ভয়াবহতা প্রকট হল চোখে মুখে। আবার মার্বেল-সাদা হয়ে গেল মুখখানা, মড়ার ঠোঁটের মত দাঁতের ওপর চেপে বসল নিরক্ত অধরোষ্ঠ। তুহিনকঠিন দেহের পানে চেয়ে থাকতে থাকতে কেঁপে উঠলাম থরথর করে, এলিয়ে পড়লাম কেদারায় এবং আবার তন্ময় হয়ে গেলাম লিজিয়ার কামনাতপ্ত স্মৃতি-জাগরণে।

এক ঘণ্টা পর আবার অস্পষ্ট শব্দ শুনলাম। শয্যার দিক থেকে এল শব্দটা। নিঃসীম আতঙ্কে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। এবার আর ভুল হল না। স্পষ্ট শুনলাম, কে যেন পাঁজর খালি করা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ধেয়ে গেলাম মড়ার পাশে। দেখলাম-স্পষ্ট দেখলাম, ঠোঁটটা থিরথির করে কাঁপছে।

এক মিনিট পরেই কিন্তু শিথিল হয়ে গেল অধরোষ্ঠ, ফাঁক দিয়ে দেখা গেল মুক্তাদাঁতের ঝকঝকে সারি। এবার আতঙ্কে চোখ আমার ঝাপসা হয়ে এল। ভাবনা এলোমেলো হয়ে গেল। অতি কষ্টে সিধে রাখলাম নিজেকে। কর্তব্য করতেই হবে-ভয় পেলে তো চলবে না।

এবার প্রাণের ম্লান আভা প্রকাশ পেল ললাটে, গালে, গলায়। উষ্ণতায় আচ্ছন্ন হল সারা দেহ। এমন কি মৃদু মৃদু স্পন্দিত হল বক্ষদেশও।

বেঁচে আছে! বেঁচে আছে! লেডী বেঁচে আছে! দ্বিগুণ উৎসাহে ওকে পুরোপুরি সজীব করার জন্যে হাত-পা-রগ ঘষতে লাগলাম। ডাক্তারি জানি না, আনাড়ীর মতই করে গেলাম। কিন্তু বৃথা হল প্রচেষ্টা।

আচম্বিতে অদৃশ্য হল রক্তিমআভা, স্তব্ধ হল বক্ষস্পন্দন, দাঁতের ওপর আড়ষ্ট হয়ে গেল অধরোষ্ঠ। মুহূর্তের মধ্যে আবার মড়ার মতই কঠিন, শীতল, বীভৎস হয়ে উঠল দেহের প্রতিটি রেখা, সমাধি মন্দিরে ছাড়া অন্যত্র যার স্থান নেই।

আবার নিমগ্ন হলাম লিজিয়ার ধ্যানে। আবার ফোঁপানি শুনলাম আবলুস-শয্যার দিক থেকে।

রাত তখন ফুরিয়ে এসেছে। আগের চাইতেও স্পষ্টভাবে নড়ে উঠল নিষ্প্রাণ দেহটা। আমি কিন্তু নড়লাম না, উদ্গত আবেগের টুঁটি টিপে ধরে অতি কষ্টে বসে রইলাম কেদারায়। আগের মতই রঙের ছোঁয়া লাগল কপোলে, কপালে। উষ্ণতায় চঞ্চল হল সারা দেহ, স্পন্দিত হল বক্ষদেশ, কম্পিত হল চক্ষুপল্লব। তবুও আমি নড়লাম না। রোয়েনার অঙ্গে তখনো কফিনের সাজ, ব্যাণ্ডেজ এবং অন্যান্য বস্ত্র। কফিন-সজ্জা না থাকলে রোয়েনাকে জীবন্তই বলা যেত। কিন্তু অচিরেই আমার মনের সব দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে এল দেহটা। স্খলিত চরণে টলতে টলতে দু হাত সামনে বাড়িয়ে যেন স্বপ্নের ঘোরে ঘরের ঠিক মাঝখানে এসে পৌঁছোলো চাদরমোড়া নারীমূর্তি।

তবুও আমি নড়লাম না, শিউরে উঠলাম না। কারণ, অনেকগুলো অবর্ণনীয় কল্পনা যুগপৎ আছড়ে পড়ল আমার মস্তিষ্ক গগনে। চলমান মূর্তির চালচলন, দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা যেন অসাড় করে দিল আমার মগজকে। আমি পাথর হয়ে গেলাম। একচুলও না নড়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলাম প্রেতমূর্তির পানে। কে এই শরীরী রহস্য? রোয়েনা? কিন্তু এ সন্দেহ কেন আসছে মাথার মধ্যে? শুভ্রকেশী নীলনয়না রোয়েনা নয় আগুয়ান ঐ নারী মূর্তি, এমন উদ্ভট ধারণা কেন পীড়িত করছে আমার মস্তিষ্ককে? মুখের ওপর ব্যাণ্ডেজের পটি আছে ঠিকই, কিন্তু সঘন নিঃশ্বাসে প্রাণময় ও-মুখ লেডী রোয়েনার না হয়ে অন্যের হতে যাবে কেন? রক্তিম ঐ কপোল তো রোয়েনারই, জীবনের মধ্যাহ্নে প্রাণ-সূর্যের আলোক ছিল যেভাবে, ঠিক সেইভাবে গোলাপী ও গাল রোয়েনার ছাড়া আর কারো নয়। ঐ চিবুক, ঐ টোলও নিশ্চয় রোয়েনার। কিন্তু.........কিন্তু......-...অসুখে ভুগে কি মাথায় লম্বা হয়ে গিয়েছে রোয়েনা? একি উন্মত্ত চিন্তা পেয়ে বসেছে আমাকে? ক্ষিপ্তের মত ধেয়ে গেলাম,

ছিটকে পড়লাম তার পায়ের ওপর। আমার ছোঁয়া পেতেই মাথা থেকে কদর্য কফিন-সজ্জা খুলে ফেলে দিল সে, ব্যাণ্ডেজের আড়াল থেকে মেঘের মত পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়ল একরাশ চুল, সে চুল মধ্যরাতের দাঁড়কাকের ডানার চেয়েও কুচকুচে কালো!

তারপর ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল শরীরী রহস্য।

বুকফাটা হাহাকার করে উঠলাম আমি-"এবার চিনেছি...-......চিনেছি তোমায়.........কৃষ্ণকালো বড় বড় এ চোখ যে আমার হারিয়ে যাওয়া প্রেয়সী লেডী লিজিয়ার!"

ব্যাঙ তড়কা

(দ্য হপ ফ্রগ)

রাজামশায় ঠাট্টাতামাসা পেলে দুনিয়া ভুলে যেতেন। বড় রঙ্গপ্রিয় ছিলেন ভদ্রলোক। বেঁচেছিলেন যেন কেবল রঙ্গব্যঙ্গের জন্যেই। তাঁর মন জয় করার নিশ্চিন্ত পন্থা হল হাসির গল্প বলা এবং বেশ জমিয়ে বলে পেটে খিল ধরিয়ে দেওয়া।

রাজামশায় যদি নিজে এত আমুদে হন তো তাঁর পাত্রমিত্র অমাত্যরাও আমুদে হতে বাধ্য। সাতজন মন্ত্রীও নাম কিনেছিলেন ভাঁড়ামোর জন্যে। রাজাকে অনুকরণ করতে গিয়ে রাজার মতই নাদাপেটা তেল চকচকে ভুঁড়িদাস বাবাজী হয়ে গিয়েছিলেন সাতজনই। মানুষ মোটা হলেই ভাঁড়ামো করে, না, ভাঁড়ামো করতে করতে মোটা হয়ে যায়–তা বলতে পারব না। চর্বির মধ্যে সঙ সাজার গুণ আছে কিনা, তাও বলতে পারব না। শুধু জানি, রোগা লিকলিকে হাড্ডিসার ভাঁড়েরা কখনো নাম কিনতে পারে নি।

রাজামশায় কিন্তু স্থূল রসিকতা ভাল বুঝতেন। সূক্ষ্ম রসিকতার কদর বুঝতেন না। কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে হাসাতে জানতেন, কথার কারিকুরি দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করতে পারতেন না। বেশি সূক্ষ্ম হাস্যপরিহাস সহ্য হত না–হাঁপিয়ে উঠতেন। মোদ্দা কথা, মৌখিক রঙ্গতামাশার চাইতে পছন্দ করতেন গাড়োয়ানি ইয়ার্কি।

এ গল্প যে সময়ের, তখন রাজরাজড়াদের সভাগৃহে মূর্খ ভাঁড়েদের অভাব ছিল না। ভাঁড় না হলে রাজসভা জমত না।

তারা চোখা চোখা বুলি আর ধারালো বুদ্ধি দিয়ে হাসির বোমা ফাটিয়ে ছাড়ত সভাগৃহে। রাজার অনুগ্রহ পেতে কে না চায়?

আমাদের এই রাজাটিও একজন 'উজবুক' ভাঁড় মোতায়েন রেখেছিলেন। সেরা উজবুক সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর উজবুক মন্ত্রীদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্যে-নিজেকেও উজবুক শ্রেণী থেকে বাদ দেননি।

তাঁর সংগৃহীত পেশাদার ভাঁড় শুধু মূর্খ নয়, বিকৃত-অঙ্গ এবং বেঁটে বামন। ভাঁড়ের মত ভাঁড়! এ ভাঁড়ের দাম তিনগুণ তো হবেই। রাজসভায় বেঁটে বামন আকছার দেখা যেত সেকালে। বামনরা মূর্খই হয়। তাই তাকে ছাড়া রাজসভার একঘেয়েমি ঘুচতো না। যে কোন রাজসভার অলস দিনগুলো যেন ফুরতে চায় না-মনে হত বড্ড বেশি লম্বা। এ অবস্থায় রাজারা চাইত ভাঁড় আর বামন-দু'জনকেই। ভাঁড় হাসাবে আর বামনকে দেখে হাসবেন। কিন্তু আগেই বলেছি, শতকরা নিরানব্বই জন ভাঁড়ই চালকুমড়োর মত বেঢপ মোটা হয়। সেক্ষেত্রে হপ ফ্রগ একাধারে তিন তিনটে গুণের অধিকারী হওয়ায় রাজার ভারী পছন্দ তাকে।

হপ-ফ্রগ কিন্তু এই বেঁটে বিকৃতাঙ্গ ভাঁড়ের নাম। এ নাম সাতজন মন্ত্রীর দেওয়া। কারণ, হপ-ফ্রগ সোজা হাঁটতে পারে না। এক পায়ে ব্যাঙ-তড়কা লাফ আর কেঁচোর মত কিলবিলিয়ে গতি-এই দুটো জুড়ে দিলে যে চলনভঙ্গী, হপ-ফ্রগ হাঁটে সেইভাবে। রাজার নিজের ধারণা তিনি অতি সুপুরুষ (যদিও তাঁর মাথা হাঁড়ির মত এবং পেট জালার মত)-তাই কদাকার হপ-ফ্রগকে দেখলেই যেন তাঁর কাতুকুতু লাগে।

পায়ের গড়ন অস্বাভাবিক হওয়ার দরুন হপ-ফ্রগকে পথ চলতে হত ঐভাবে। কিন্তু ঈশ্বর তাকে দিয়েছিল বলিষ্ঠ মাংসপেশী সমৃদ্ধ একজোড়া বাহু। ফলে, গাছে উঠতে বা দড়ি বেয়ে ঝুলতে জুড়ি ছিল না তার। বাচ্চা বাঁদর আর চঞ্চল বেঁজির মতো অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় খেলা দেখাতে পারত দড়ি বা গাছে। তখন আর তাকে ব্যাঙ বলে মনে হত না।

হপ-ফ্রগ কোন দেশে জন্মেছিল জানি না। নিশ্চয় রাজার এলাকা থেকে অনেক দূরে কোন অসভ্য অঞ্চলে। জোর করে ধরে আনা হয়েছিল তাকে তার জন্মস্থান থেকে। আনা হয়েছিল আরো একটি বামন মেয়েকে। মাথায় সে হপ-ফ্রগের চেয়ে সামান্য খাটো। দুজনকেই উপহার পাঠানো হয়েছিল রাজাকে খোসামোদ করার জন্য।

মেয়েটির নাম ট্রিপেটা। বামন হলেও নিখুঁত সুন্দরী সে। ভাল নাচতে পারত। সুতরাং সবাই ভালবাসত তাকে। হপ-ফ্রগ ব্যায়ামবীর হলে কি হবে, কারো সুনজরে ছিল না। ট্রিপেটা আর

হপ-ফ্রগের মধ্যে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছিল দুজনেই বামন বলে। দুজনেই দুজনকে নানাভাবে উপকার করত।

কি একটা উপলক্ষে রাজার খেয়াল হল মুখোশ-নৃত্যের আসর বসাবেন। এ সব ক্ষেত্রে হপ-ফ্রগ আর ট্রিপেটার ডাক পড়ে সবার আগে। কেননা দুজনেরই উর্বর মাথা থেকে নানারকম পরিকল্পনা বেরোয়। বিশেষ করে হপ-ফ্রগ এমন সব চরিত্র কল্পনা করত, জামাকাপড় বানাতো, মুখোশ নাচের ছন্দ আবিষ্কার করত-যা কেউ ভাবতেও পারে না।

উৎসবের রাত এসে গেল। কুঁড়েমির জন্যে রাজা এবং তাঁর সাত মন্ত্রী কিন্তু নিজেদের জন্যে কোন যোগাড়যন্ত্র করেন নি। অথচ নিমন্ত্রিত অতিথিরা সাতদিন আগে থেকেই তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে-হরেকরকম পোশাক আর মুখোশ বানিয়ে নিয়েছে। যে ঘরে নাচ হবে, সে ঘরটিও ট্রিপেটার তত্ত্বাবধানে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। সাজেন নি কেবল রাজা আর তাঁর মন্ত্রীরা। রাত ঘনিয়ে আসতেই টনক নড়ল সবার। ডাক পড়ল দুই বামনের।

ওরা এসে দেখলে মন্ত্রীদের নিয়ে মদ্যপান করতে বসেছেন রাজা। হপ-ফ্রগ মদ সহ্য করতে পারত না একদম। মদ খেলেই মাত্রা ছাড়া উত্তেজনায় তুরুক-নাচ নাচত, রাজা তা জানতেন। মজা দেখবার জন্যে জোর করে ওকে মদ গেলাতেন।

সেদিনও হইহই করে উঠলেন হপ-ফ্রগকে দেখে-'এসো, এসো। এক ঢোক খেয়ে যাও-মগজ সাফ হয়ে যাবে।'

হপ-ফ্রগ রসিকতা করে পাশ কাটানোর চেষ্টা করল বটে, কিন্তু পারল না নাছোড়বান্দা রাজার সঙ্গে। সেদিন আবার ওর জন্মদিন। দেশের বন্ধু-বান্ধবদের জন্যে মন কেমন করছিল। রাজা তা জেনেই খোঁচা মারলেন অদৃশ্য বন্ধুদের উল্লেখ করে।

বললেন, 'নাও, নাও। একটু গিলে নাও। মনে কর অদৃশ্য বন্ধুদের সঙ্গে খাচ্ছ!'

কথাটা তীরের মত বিঁধল হপ-ফ্রগের মনে। টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ল চোখ বেয়ে।

দেখে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লেন সপারিষদ রাজামশায়। খুব হাসতে পারে তো হপ-ফ্রগ! হাপুসনয়নে কি রকম কাঁদছে দেখো!

কেঁদেও নিস্তার পেল না হপ-ফ্রগ। রাজার হাত থেকে মদের গেলাস নিয়ে খেতে হল এক চুমুকে! দুচোখ প্রদীপ্ত হল সুরার জ্বালায়।

ভীষণ মোটা প্রধানমন্ত্রী বললেন-'এবার কাজের কথা।-'

'হ্যাঁ, এবার কাজের কথা,' বললেন রাজা। 'হপ-ফ্রগ, নতুন কিছু চরিত্র বাতলে দাও তো।' বলে হেসে গড়িয়ে পড়লেন

রাজা। অগত্যা হাসতে হল সাত মন্ত্রীকেও।

হাসল হপ ফ্রগও। কিন্তু শূন্যভাবে।

'হল কি তোমার?' অসহিষ্ণুভাবে বললেন রাজা-'মাথা খেলছে না বুঝি?'

'ভাববার চেষ্টা করছি,' বিমূঢ়ভাবে বলল হপ-ফ্রগ। মদ খেয়ে মাথা তার তখন বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে, ভাববার শক্তি নেই।

'চেষ্টা করছো? মাথাটা এখনো সাফ হয় নি দেখছি-নাও, আর এক পেয়ালা খাও!'

হপ-ফ্রগের তখন দম আটকে আসছে-চেয়ে রইল ফ্যাল-ফ্যাল করে।

রেগে গেলেন রাজা-'খেতে বলছি না?'

দ্বিধায় পড়ল বামন। রেগে লাল হয়ে গেলেন রাজা। মন্ত্রীরা আরো উস্কে দিলেন তাঁকে। ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে গেল ট্রিপেটা। সে রাজার পায়ের কাছে বসল- মিনতি করে বলল বন্ধুকে ছেড়ে দিতে।

রাজা তো হতবাক! মেয়েটার স্পর্ধা তো কম নয়! কটমট করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর ঠেলে ফেলে দিয়ে মদের গেলাসের সবটুকু মদ ছুঁড়ে দিলেন ট্রিপেটার মুখের ওপর।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ট্রিপেটা। ক্ষীণতম দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল না। গিয়ে বসল টেবিলে।

আধমিনিটটাক কোনো শব্দ নেই। গাছের পাতা পড়লে বা পাখির পালক উড়ে এলেও শোনা যায়, এমনি নৈঃশব্দ। তারপর সেই অসহ্য নীরবতা ভঙ্গ হল একটা চাপা দাঁত কড়মড়ানির শব্দে। মনে হল যেন ঘরের চার কোণ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এল ভয়াবহ শব্দটা।

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন রাজা। তেড়ে গেলেন হপ-ফ্রগকে-'ফের যদি ও রকম আওয়াজ করবি তো-'

হপ-ফ্রগ মদের নেশা কাটিয়ে উঠেছিল। রাজার চোখে চোখ রেখে বললে শান্তকণ্ঠে, 'আমি? এমন আওয়াজ করা আমার পক্ষে কি সম্ভব?'

একজন মন্ত্রী বললে-'আমার তো মনে হল আওয়াজটা এল ঘরের বাইরে থেকে। কাকাতুয়া জানলা বা খাঁচা ঠোকরাচ্ছে বোধ হয়।'

'হতে পারে।' গরগর করে বললেন নিষ্ঠুর রাজা।' 'আমার কিন্তু মনে হল ঐ বেঁটে বদমাসের দাঁত থেকেই বেরোলো আওয়াজটা।'

শুনেই বড় বড় দাঁত বের করে হেসে ফেলল হপ-ফ্রগ। রাজা এমন হকচকিয়ে গেলেন যে সভার মাঝে ভাঁড়ের হাসি দেখে প্রতিবাদ করতেও ভুলে গেলেন। হপ-ফ্রগ কিন্তু শক্ত দাঁতের হাসি

গোপন করে প্রশান্ত কণ্ঠে আরো মদ্যপান করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই রাজার রাগ জল হয়ে গেল।

এক পেয়ালা মদ চোঁ-চোঁ করে মেরে দিয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে মুখোশ নাচের অভিনব পরিকল্পনা শোনাতে বসল হপ-ফ্রগ। মদ খেয়ে তিলমাত্র বিকার ঘটেছে বলে মনে হল না। জীবনে যেন মদ স্পর্শ করেনি, এমনি শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বললে-'আইডিয়াটা মাথায় এল রাজামশায়ের মদ ছোঁড়া দেখে আর জানলার বাইরে কাকাতুয়ার ঠোঁটে বিচ্ছিরি আওয়াজটা শুনে। পরিকল্পনাটা একেবারেই অভিনব-গতানুগতিক নয় মোটেই। এ নাচ আমরা নাচি আমাদের দেশে। কিন্তু এখানে এ জিনিস একদম নতুন-দরকার কিন্তু আট জন-'

হো-হো করে হেসে রাজা বললেন-'ব্যারে আমরা তো আটজনই !'

বিকৃত বামন বললে-'এ নাচের নাম ''শেকলবাঁধা আট ওরাংওটাং।'' অভিনয়ের ওপর নির্ভর করছে নাচের সার্থকতা।'

'করব ! করব ! ভাল অভিনয় করব !' লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন রাজা।

'এ খেলার সব চেয়ে বড় মজা হল, মেয়েরা দারুণ ভয় পায়।' বললে হপ-ফ্রগ।

'তাই তো চাই ! তাই তো চাই !' সে কি আনন্দ আটজনের।

হপ-ফ্রগ বললে-'আপনাদের ওরাংওটাং সাজানোর ভার আমার । অবিকল ওরাংওটাং সেজে ঘরে ঢুকলে অভ্যাগতরা চিনতেও পারবে না আপনাদের-মনে করবে সত্যিকারের ওরাংওটাং-পালিয়ে এসেছে খাঁচা ভেঙে। আপনারা মিছিমিছি তাড়া করবেন, বিকট চেঁচাবেন-দারুণ ভয় পাবে প্রত্যেকেই-চেঁচামেচি হুটোপুটি শুরু হয়ে যাবে। ঘর ভর্তি মেয়ে-পুরুষরা দামী দামী জামাকাপড় পরে থাকবে-অথচ আপনারা আটজনে কদাকার সাজে সেজে থাকবেন। ফারাকটা অবিশ্বাস্য হওয়ায় মজা জমবে আরো বেশী।'

'ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো,' বলে মন্ত্রীদের নিয়ে উঠে পড়লেন রাজা। অনেক দেরী হয়ে গেছে তৈরী হতে হবে তো !

খুব সহজে আটজনকে ওরাংওটাং সাজিয়ে দিল হপ-ফ্রগ। আগে টাইট সার্ট আর পাজামা পরালো প্রত্যেককে। তার ওপর বেশ করে লাগাল আলকাতরা। একজন মন্ত্রী প্রস্তাব করলেন-পালক লাগানো হোক আলকাতরার ওপর। হপ-ফ্রগ তৎক্ষণাৎ চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলে-পালক নয়, ওরাংওটাংয়ের গায়ের লোম নকল করতে পারে শুধু পাট।

পাটের পুরু স্তর চেপে চেপে বসিয়ে দেওয়া হল আলকাতরার ওপর। তারপর একটা শেকল জড়ানো হল আটজনের কোমরে। গোল হয়ে দাঁড়াল আটজনে-এক শেকলে বাঁধা অবস্থায়। বাড়তি শেকলটা বৃত্তের মাঝখানে কোণাকুণি করে রেখে দুটি ব্যাস তৈরী করল হপ-ফ্রগ। বোর্ণিওতে শিম্পাঞ্জী ধরা হয় ঠিক এই কায়দায়।

ওরাংওটাংকে পৃথিবীর খুব কম লোকই দেখেছে। আটজনের অতি কদাকার বীভৎস সাজসজ্জা দেখে তাই কারো বোঝবার উপায় রইল না যে ওরা ছদ্মবেশী মানুষ-সত্যিকারের বনমানুষ নয়।।

যে ঘরে মুখোশ নাচ হবে, সেটি গোলাকার। ছাদের ঠিক মাঝখানে একটি মাত্র স্কাইলাইট দিয়ে সূর্যালোক আসে। সেখান দিয়েই একটি শেকল নেমে এসেছে ঘরের মধ্যে। শেকল থেকে ঝোলে প্রকাণ্ড ঝাড়বাতি। তাতে জ্বলে মোমবাতি। শেকলটা ছাদের ফুটো দিয়ে বাইরে অদৃশ্য হয়েছে। কপিকলের সাহায্যে ভারী ঝাড় বাতিকে তোলা নামা করা হয় বাইরে থেকে।

এ ঘরের সাজসজ্জার ভার ট্রিপেটার ওপর। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথা হপ-ফ্রগ তাকে বুদ্ধি জুগিয়েছে এ ব্যাপারে। তাই ঝাড়বাতিটাকে সরিয়ে ফেলা হল ঘর থেকে। কারণ, নাকি এই গরমে মোমের ফোঁটা পড়ে অভ্যাগতদের মূল্যবান পোশাক নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তার বদলে দেওয়ালে দেওয়ালে জ্বলতে লাগল পঞ্চাশ-ষাটটা বড় মশাল।

রাত বারোটার সময়ে পাশবিক চীৎকার করতে করতে আটটা ওরাংওটাং ঢুকল সেই ঘরে। ঘরে তখন আর তিল ধারণের জায়গা নেই। সঙ্গে সঙ্গে রাজার হুকুম মত সব কটা দরজা বন্ধ করে চাবিটা দেওয়া হল হপ-ফ্রগের হাতে।

আতঙ্ক চরমে উঠল আটটা বীভৎস মূর্তি দেখে আর অপার্থিব হুঙ্কার শুনে। বুদ্ধি করে আগেই রাজা হুকুম দিয়েছিলেন, অভ্যাগতরা অস্ত্র বাইরে রেখে ঘরে ঢুকবেন। নইলে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রাঘাতে নিহত হতেন সপারিষদ রাজামশায়।

সে কী হট্টগোল! ঠেলাঠেলিতে ঠিকরে পড়ল নরনারীরা! ঝনঝন শব্দে শিকল বাজিয়ে এলোপাতারি ছুটছে আট ওরাংওটাং। কারো খেয়াল নেই ছাদের দিকে। থাকলে দেখতে পেত ঝাড়বাতির সেই শেকলটা আস্তে আস্তে নেমে আসছে মেঝের দিকে-ডগায় ঝুলছে একটা হুক!

ঠিক সেই সময়ে হল্লোড় করতে করতে আর মনে মনে পেট ফাটা হাসি হাসতে হাসতে রাজা আর মন্ত্রীরা এসে পড়লেন ঝুলন্ত হুকের তলায়। তৈরী হয়ে ছিল হপ-ফ্রগ। টুক করে হুকটা আটকে দিল কোণাকুণিভাবে লাগানো শেকল দুটির ঠিক মাঝখানে। তৎক্ষণাৎ হ্যাঁচকা টানে নাগালের বাইরে উঠে স্থির

হয়ে গেল ছকটা। ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হল আটজন ওরাংওটাং।

প্রথমে চমকে উঠলেও এখন হো হো করে হেসে উঠল অভ্যাগতরা। এতক্ষণে সবাই বুঝল, পুরো ব্যাপারটা সাজানো এবং হাস্যরসের জন্যই পরিকল্পিত। নরবানরদের দুর্গতি দেখে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল প্রত্যেকের।

হাসির অট্টরোল ছাপিয়ে শোনা গেল হপ-ফ্রগের তীক্ষ্ণ চীৎকার–'ওদের ভার আমার! আমি ওদের চিনি–আপনাদেরও চিনিয়ে দেব এখুনি।''

বলেই, হাঁচড় পাঁচড় করে উঠে গেল অভ্যাগতদের ঘাড়ের ওপর। ঘাড়ে পা দিয়েই লাফাতে লাফাতে গেল দেওয়ালের কাছে–একটা জ্বলন্ত মশাল খামচে ধরে ফিরে এল সেই পথেই। এক লাফে গিয়ে উঠল রাজার মাথায়। সেখান থেকে বিদ্যুৎগতিতে শেকল বেয়ে উঠে গেল কিছু ওপরে। তারপর মশালটা নামিয়ে ওরাংওটাংদের মুখ দেখতে দেখতে বললে বিষম তীব্র কণ্ঠে–'বলছি, বলছি, এখনি বলছি ওরা কারা!'

আটজন ওরাংওটাং সমেত অভ্যাগতরা তখন বেদম হাসিতে লুটিয়ে পড়তে পড়লে বাঁচে। হাসাতেও পারে বটে ভাঁড়টা! ঠিক তখনি তীক্ষ্ণ শিষ দিয়ে উঠল হপ-ফ্রগ। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হাতের হ্যাঁচকা টানে তিরিশ ফুট ওপরে উঠে গেল শেকলটা–টেনে তুলে নিয়ে গেল আটজন ওরাংওটাংকে–ছটফট করতে লাগল আটটা মিশমিশে কালো কুৎসিত মূর্তি ছাদের স্কাইল্যাইটের কাছে।

হপ-ফ্রগ কিন্তু তখনো নির্বিকারভাবে ঝুলছে শেকল ধরে এবং যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে জ্বলন্ত মশাল নাড়ছে ওরাংওটাংদের মুখের কাছে।

সব চুপ। ঘর নিস্তব্ধ। দারুণ অবাক্ হয়ে অভ্যাগতরা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখছে নতুন খেলা। ছুঁচ পড়লেও তখন শোনা যায়, এমনি স্তব্ধতা বিরাজ করছে অত বড় ঘরে।

আচমকা সেই থমথমে নৈঃশব্দ ভঙ্গ করে শোনা গেল একটা আশ্চর্য শব্দ। দাঁতে দাঁত পেষার রক্ত জল করার আওয়াজ। ঠিক এই শব্দই শোনা গিয়েছিল রাজামশায় যখন মদ ছুঁড়ে ভিজিয়ে দিয়েছিলেন ট্রিপেটার মুখ। তখন শব্দের উৎস ধরা যায় নি–এখন ধরা গেল।

আওয়াজটা আসছে হপ-ফ্রগের দাঁতের পাটির মধ্য থেকে। শ্ব-দন্তের মত দাঁত কিড়মিড় করছে হপ-ফ্রগ, মুখের কোণ দিয়ে বেরুচ্ছে ফেনা–জ্বলন্ত চোখে উন্মত্ত ক্রোধে চেয়ে আছে রাজা আর তাঁর সাত মন্ত্রীর ঊর্ধ্বমুখের পানে।

অমানবিক কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল বেঁটে বামন–'চিনেছি! চিনেছি! এবার তোদের চিনেছি!' বলে, জ্বলন্ত মশালটা নামিয়ে মুখ দেখার অছিলায় আগুন ধরিয়ে দিল রাজার পায়ে।

আধমিনিটের মধ্যেই আটজনের আলকাতরা ভিজানো পাটের সাজ জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। নীচের শিহরিত আতঙ্কিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা শুধু গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়েই গেল-প্রতিকার করতে পারল না।

আগুন লেলিহান হয়ে উঠল। গা বাঁচানোর জন্যে শেকল বেয়ে বানরের মত ক্ষিপ্রগতিতে ওপরে উঠে গেল বেঁটে বামন-আন্যার দম বন্ধ করা নীরবতা নেমে এল ঘরে। জনতা মূক হয়ে চেয়ে রইল অবিশ্বাস্য এই দৃশ্যের দিকে।

তীব্র কণ্ঠে বলল বামন ভাঁড়-'শুনুন আপনারা, শুনুন। এরা কারা এখন চিনতে পারছেন? রাজা আর তাঁর সাত মন্ত্রী। অসহায় একটি মেয়েকে আঘাত করতে রাজার বিবেকে আটকায় নি। মন্ত্রীরা বাধা দেয়নি-বরং উসকে দিয়েছে। আর আমি? আমি হপ-ফ্রগ-আপনাদের ভাঁড়। কিন্তু এই আমার শেষ ভাঁড়ামো!'

পাটের সাজ তখন আরো জোরে পটপট শব্দে জ্বলছে। আটটা কদর্য মাংসপিণ্ড একত্রে ঝুলছে শেকলের প্রান্তে। পুড়ে কালো হয়ে চেনা দায়। বিকৃত বামন জ্বলন্ত মশাল জ্বলন্ত দেহগুলোর ওপর নিক্ষেপ করে অলস ভঙ্গিমায় উঠে গেল আরো ওপরে-বেরিয়ে গেল স্কাইলাইট দিয়ে।

ছাদে দাঁড়িয়েছিল ট্রিপেটা। কপিকল ঘুরিয়ে সে-ই তুলেছে ওরাংওটাংদের। প্রতিশোধ নিতে সাহায্য করেছে হপ-ফ্রগকে। দুই বন্ধু ছাদ থেকে নেমে পালিয়ে গেল স্বদেশে-আর তাদের দেখা যায় নি।

হৃদ্‌পিণ্ড

(টেল টেল হার্ট)

নার্ভাস হয়েছি ঠিকই, দারুণ ভয় পেয়েছি। কিন্তু পাগল হয়েছি বলছেন কেন? রোগভোগের পর থেকেই আমার অনুভূতির ধার খুব বেড়ে গিয়েছে—ভোঁতা হয়নি। সবচেয়ে বেড়েছে শ্রবণশক্তি। স্বর্গ-মর্ত-পাতালের সব শব্দই যেন স্পষ্ট শুনতে পাই। পাগল বলবেন না। পাগল হলে কি এমন জাঁকিয়ে বসে ধীরস্থিরভাবে এ গল্প লিখতে পারতাম?

আইডিয়াটা প্রথম কিভাবে মাথায় এসেছিল, বলতে পারব না। কিন্তু মগজে ঢোকবার পর থেকেই ইচ্ছাটা ভূতের মত তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়েছে আমাকে দিনে-রাতে সমানে, উদ্দেশ্য কিছুই নেই। আবেগও নেই। বুড়োকে আমি ভালবাসতাম। আমার কোনো ক্ষতি সে করেনি। মনে ব্যথাও দেয় নি। তার সোনাদানার ওপরও কোনো লোভ নেই আমার।

ক্ষেপেছি শুধু ওই চোখটার জন্যে। বুড়োর একটা চোখ দেখতে শকুনির চোখের মত। হাল্কা নীল রঙ, খুব পাতলা স্তর দিয়ে ঢাকা। ও চোখের দৃষ্টি আমার ওপর নিবদ্ধ হলেই রক্ত হিম হয়ে গিয়েছে। তাই ধীরে ধীরে, খুব আস্তে আস্তে, একটু একটু করে আমার মনকে শক্ত করেছি—বুড়োর প্রাণ শেষই নেব—তবেই যদি ঐ চোখের চাহনি থেকে মুক্তি পাই।

এখন কি বলবেন আমাকে? পাগল? পাগলরা কিন্তু অজ্ঞ হয়। অথচ আমার প্রস্তুতিপর্ব দেখলে আপনি অবাক হয়ে

যেতেন। ভবিষ্যতের কথা ভেবে, মাথা ঠাণ্ডা করে, হুঁশিয়ার হয়ে আমি এগিয়েছি! যে রাতে বুড়োকে খুন করলাম, তার আগের সপ্তাহে প্রতিটি দিন প্রাণঢালা ব্যবহারে মুগ্ধ করেছি তাকে। অথচ প্রতি রাতে,ঠিক রাত দুপুরে, দরজা ফাঁক করেছি আস্তে আস্তে। ঢাকা লণ্ঠনটা আগে রেখেছি দরজার ফাঁক দিয়ে-এতটুকু আলো বিচ্ছুরিত হয়নি আবরণের ফাঁক দিয়ে। তারপর মুণ্ড ঢুকিয়েছি ঝাড়া একটি ঘণ্টা ধরে-পাছে বুড়োর ঘুম ভেঙে যায়, তাই এত হুঁশিয়ারি। পাগল কি এত সাবধান হতে পারে? বলুন আপনি?

মুণ্ডটা পুরোপুরি ঢোকবার পর একটু একটু করে ফাঁক করেছি লণ্ঠনের আবরণ-যাতে অতি সরু একটি রশ্মি গিয়ে বুড়োর শকুন চোখের ওপর গিয়ে পড়ে।

সাত রাত এই কাণ্ড করেছি। ঠিক রাত দুপুরে আলোর রেখা তাগ করে ফেলেছি চোখের ওপর। কিন্তু প্রতিবারেই দেখেছি চোখটা বন্ধ। তাই কাজ শুরু করতে পারিনি। কেন না, বুড়ো তো আমার মাথায় খুন চাপায় নি-চাপিয়েছে ঐ শকুন চোখ। অলক্ষুনে চোখ!

ভোর হলেই প্রতিদিন ঘরে ঢুকেছি হইহই করে, কুশল জিজ্ঞাসা করেছি, রাতে ঘুম হল কেমন খোঁজ নিয়েছি-বুড়ো ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারেনি রাত দুপুর হলেই আমি কেন তার ঘুমন্ত চোখের ওপর আলো ফেলে বসে থেকেছি ওৎ পেতে।

অষ্টম দিনে আরো সন্তর্পণে দরজা ফাঁক করেছি, লণ্ঠন ঢুকিয়ে মেঝেতে রেখেছি। মনে মনে মজা পেয়েছি বুড়োর অবস্থাটা কল্পনা করে। ঘুমোচ্ছে অঘোরে, জানে না আমি ওৎ পেতে বসে আছি খুন করার জন্যে। ভাবতেই শুষ্ক নীরস হাসিটা আর চাপতে পারিনি-খুক-খুক শব্দে বেরিয়ে এসেছিল গলা দিয়ে। আওয়াজ শুনেই যেন চমকে উঠল বুড়ো-নড়ে উঠল বিছানায়। আমি কিন্তু মাথা টেনে নিয়ে পালালাম না। দাঁড়িয়ে রইলাম কাঠের মত। কেন না, ঘরে মিশমিশে অন্ধকার। চোর-ডাকাতের ভয়ে জানলাগুলো বন্ধ। কাজেই আমাকে চোখে পড়বে না। তাই একটু একটু করে বড় করতে লাগলাম জানলার ফাঁক।

মুণ্ডটা পুরোপুরি ঢুকিয়ে যেই লণ্ঠনটা খুলতে গিয়েছি, টিনের আবরণের ওপর আমার বুড়ো আঙুল পিছলে যাওয়ায় একটা আওয়াজ হল। তড়াক করে বিছানায় উঠে বসল বুড়ো-"কি ওখানে?"

আমি সাড়া দিলাম না। নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। একঘণ্টা খাড়া রইলাম একভাবে। বুড়োও বসে রইল ভয়ে কাঠ হয়ে। গত সাতটা দিন আমি যেভাবে কান খাড়া করে রাত

কাটিয়েছি এই ঘরে, ঠিক সেইভাবে বুড়োও উৎকর্ণ হয়ে শুনছে দেওয়াল ঘড়ির টিক-টিক-টিক শব্দ।

একঘণ্টা পর একটা অস্পষ্ট গোঙানি শুনতে পেলাম। মরণাতঙ্কে গুঙিয়ে উঠছে বুড়ো। যেন নাভিমূল থেকে আতঙ্ক উঠে এল আর্ত কান্নার আকারে–সমস্ত অন্তরাত্মা যেন শিউরে শিউরে উঠছে সেই কান্নার মধ্যে। এ গোঙানি আমি চিনি। আমার নিজের অন্তরের গহন থেকে কত নিশুতি রাতে এই গোঙানি ঠেলে উঠে এসেছে গলা দিয়ে।

মায়া হল বুড়োর ওপর। তবুও হাসলাম মনে মনে। এই একটি ঘণ্টা বুড়ো ঠায় খাটে বসে থেকেছে। মনকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে–ও কিছু নয়, ইঁদুরের খুটখাট। কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারে নি। অথচ অন্ধকারে আমার মুণ্ডও দেখতে পায় নি।

অনেকক্ষণ সবুর করলাম। বুড়ো কিন্তু বসেই রইল-শুল না। তাই আস্তে আস্তে সরিয়ে দিলাম লণ্ঠনের আবরণ-মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম একটা রশ্মি গিয়ে পড়ল শকুন-চোখের ওপর।

চোখ খোলা-পুরোপুরি খোলা-দেখেই মাথায় রক্ত চড়ে গেল আমার। নিষ্প্রভ চক্ষুর ওপর কদাকার ঐ অবগুণ্ঠন নিমেষ মধ্যে রক্ত হিম করে দিল আমার। বুড়োর মুখ কিন্তু দেখতে পেলাম না। দেখব কি করে? লণ্ঠনের আলো যে প্রথমবারেই পড়েছে ঠিক শকুন-চোখের ওপর।

আগেই বলেছি, অনুভূতির ধার বেড়ে যাওয়াকে পাগলামি মনে হতে পারে। আমি কিন্তু স্পষ্ট একটা শব্দ শুনলাম। একটা দ্রুত চাপা শব্দ-ঠিক যেন তুলোয় মোড়া একটা ঘড়ি চলছে।

এ শব্দ আমি চিনি বইকি। বুড়োর হৃদ্‌ঘাতের শব্দ। শুনেই আরো ক্ষিপ্ত হলাম। দামামাধ্বনি যেভাবে সৈন্যের রক্তে নাচন জাগায়–আমারও হল সেই অবস্থা।

তা সত্ত্বেও নড়লাম না। লণ্ঠনটিও নাড়ালাম না। আলোকরশ্মি নিবদ্ধ রইল ভয়ানক ঐ চক্ষুর ওপর। একদিকে হৃদ্‌ঘাতের শব্দ বেড়েই চলেছে। দ্রুত হতে দ্রুততর হচ্ছে ধুকপুকুনি। যেন নরকের ঘণ্টা বাজছে-ঢং-ঢং-ঢং! মুহূর্তে মুহূর্তে উচ্চ হতে উচ্চতর হচ্ছে স্পন্দন-নিনাদ! বুড়োর আতঙ্ক চরমে পৌঁছেছে বোধহয়-তাই ক্রমশঃ বাড়ছে আওয়াজটা।

সারা বাড়ি নিঝুম নিস্তব্ধ। শোনা যাচ্ছে কেবল ঐ অদ্ভুত আওয়াজটা। শুনতে শুনতে অবর্ণনীয় আতঙ্ক পেয়ে বসল আমাকে। এ আতঙ্ক কাটিয়ে উঠবার ক্ষমতা আমার নেই। তা সত্ত্বেও বেশ কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম অন্ধকারে। কিন্তু হৃদ্‌ঘাত যে বেড়েই চলেছে! ফেটে যাবে নাকি হৃদ্‌পিণ্ড?

শুনতে শুনতে আর একটি ভয় উঁকি দিল মনের মধ্যে। হৃদ্‌ঘাতের এই ভয়ঙ্কর আওয়াজ যদি প্রতিবেশীরা শুনে ফেলে?

আর দেরী কেন ? মৃত্যু ঘনিয়েছে বুড়োর-ফুরিয়েছে আয়ু !

বিকট চিৎকার করে লণ্ঠনের আবরণ পুরোপুরি খুলে দিলাম এবং লাফ দিয়ে ঢুকলাম ঘরের মধ্যে। বুড়ো চেঁচিয়ে উঠল আর্তকণ্ঠে-কিন্তু একবারই। পরক্ষণেই হ্যাঁচকা টানে তাকে এনে ফেললাম মেঝের ওপর-ভারী বিছানাটা টেনে রাখলাম ওপরে।

হাসতে লাগলাম মনের আনন্দে। হৃদ্‌ঘাতের চাপা আওয়াজটা আরো মিনিট কয়েক শোনা গেল অবশ্য। ঘাবড়ালাম না। বুড়ো এবার মরবেই। দেওয়াল ফুঁড়েও আওয়াজ বাইরে পৌঁছোবে না।

অবশেষে স্তব্ধ হল হৃদ্‌পিণ্ড। বুড়ো মরেছে। বিছানা সরিয়ে লাশ পরীক্ষা করলাম। মরে কাঠ হয়ে গিয়েছে বুড়ো। বুকে হাত রেখে বুঝলাম, হৃদ্‌পিণ্ড আর চলবে না। ঐ চোখ আর আমার রক্ত হিম করবে না।

এর পরেও যদি পাগল ভাবেন আমাকে, তাহলে শুনুন, এর পর কি করলাম। সারারাত ধরে নিঃশব্দে দেহটাকে টুকরো টুকরো করলাম। ধর থেকে মুণ্ড, হাত, পা আলাদা করে ফেললাম।

তারপর মেঝের তিনটে তক্তা সরিয়ে পুঁতে ফেললাম খণ্ডবিখণ্ড লাশটা। তক্তা বসিয়ে দেওয়ার পর কোথাও কোন চিহ্ন রাখলাম না। কোনো মানুষের চোখের পক্ষে, এমন কি বুড়োর শকুন চোখের পক্ষেও আর বোঝা সম্ভব নয়। রক্ত ? একটা বালতি ভর্তি করে ফেলে দিলাম বাইরে। হাঃ হাঃ হাঃ !

কাজ শেষ করে দিলাম ভোর চারটেয়। তখনো অন্ধকার কাটে নি। কিন্তু দরজায় টোকা শুনলাম। তিনজন পুলিস অফিসার ঢুকল ঘরে। প্রতিবেশীরা গভীর রাতে একটা বীভৎস চিৎকার শুনেছে। তাই তদন্ত করতে এসেছে পুলিস।

আমি কিন্তু একদম ভয় পেলাম না। কেন পাব ? ভয় আর কাকে ? হাসিমুখে বললাম, চিৎকারটা আমার নিজের। দুঃস্বপ্ন দেখে চেঁচিয়েছি, বুড়ো এখন এ দেশেই নেই। পুলিসদের নিয়ে সারা বাড়ি দেখালাম। তন্নতন্ন করে খোঁজালাম। শেষকালে নিয়ে এলাম বুড়োরই ঘরে। সোনাদানা যেমন তেমনি রয়েছে-কিছু খোয়া যায় নি দেখে আশ্বস্ত হল তারা। আমার তখন আনন্দ দেখে কে ! আহ্লাদে আটখানা হয়ে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম ঠিক সেইখানে যেখানে পোঁতা রয়েছে বুড়োর লা . .।

আমার হাবভাব দেখে অফিসাররা নিঃসংশয় হয়েছিল। আমার আশ্চর্য অনাড়ষ্ট আচরণ তাদের মন থেকে সব সন্দেহ দূর করেছিল। তাই চেয়ারে বসে ওরা শুরু করল খোস গল্পের আসর। আমিও খোসমেজাজে যোগ দিলাম-নানান প্রশ্নের জবাব

দিলাম। ফুর্তি যেন উথলে উঠছিল আমার ভেতরে।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি পাণ্ডুর হয়ে গেলাম। মনে মনে চাইলাম যেন ওরা এক্ষুনি বিদেয় হয়। তীব্র যন্ত্রণা শুরু হল মাথার মধ্যে-কানের মধ্যে ধূপ ধূপ ভোঁ-ভোঁ করতে লাগল। ওরা কিন্তু উঠল না। মত্ত রইল গল্পগুজবে।

আওয়াজটা বেড়েই চলল, কান ঝালাপালা হয়ে গেল সেই শব্দে। কানের মধ্যে যেন ভোঁ বাজছে। অনর্গল কথা বলতে লাগলাম অনুভূতিটা ঝেড়ে ফেলার জন্যে-কিন্তু বিরামবিহীন রইল সেই আওয়াজ-আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল-তারপর বুঝলাম আওয়াজটা আমার কান ভোঁ-ভোঁ করা নয়-বাইরে থেকে ঢুকছে কানের ভেতরে।

আরও ফ্যাকাশে হয়ে গেলাম। আরও কথা বলতে লাগলাম-আরও জোরে জোরে। শব্দটা তবুও বেড়ে চলল-একটা চাপা দ্রুত শব্দ-ঠিক যেন তুলোয় মোড়া ঘড়ি চলছে!

দম আটকে এল আমার। কিন্তু কী আশ্চর্য! অফিসাররা কেউ শুনতে পেল না সেই আশ্চর্য আওয়াজ। আমি আরো জোরে আরো বেগে কথা বলে চললাম-তালে তাল মিলিয়ে বাড়তে লাগল আওয়াজটা। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে গলাবাজি করলাম-আওয়াজটাও সেই মাত্রায় বৃদ্ধি পেল। অফিসাররা কিছুতেই বিদেয় হচ্ছে না দেখে পাগলের মত পদচারণ করতে লাগলাম ঘরের মধ্যে-চেঁচালাম গলার শির তুলে-ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ আওয়াজটাও বাড়তে লাগল সমানে। হে ভগবান! কি করি আমি? রাগে ফুঁসতে লাগলাম-উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগলাম-আতঙ্কে মুখে যা এল তাই বলে গেলাম। চেয়ারটা মাথার ওপর তুলে আছাড় মারলাম মেঝের পাটাতনে-আওয়াজটা আরো বাড়ল-ছাপিয়ে গেল সব শব্দ। বাড়তে বাড়তে যেন লক্ষ করতালির মত বাজতে লাগল সেই শব্দ ঘরের মধ্যে-লোক তিনটে তা সত্ত্বেও গল্প করতে লাগল স্মিতমুখে। ওরা কি এ শব্দ শুনতে পায় নি? না-না! শুনেছে নিশ্চয়! আন্দাজ করতেও পেরেছে! মজা করছে আমাকে নিয়ে! আমি যে ভয়ে মরতে চলেছি, তা দেখে ওদের আনন্দের সীমা পরিসীমা নেই! কিন্তু এই অন্তর্যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না! যা হয় হোক-কিন্তু এই ব্যথা সইতে আর পারছি না! ওদের কপট হাসিও আর দেখতে পারছি না। অবসান ঘটুক এই প্রহসনের!

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বললাম-"শয়তানের দল! হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিই খুন করেছি বুড়োকে! এইখানে আছে লাশটা-পাটাতন সরালেই দেখা যাবে! এ আওয়াজ ওর হৃদপিণ্ডের!"

কালো বেড়াল

(দ্য ব্ল্যাক ক্যাট)

ছেলেবেলা থেকেই আমি পশুপাখী খুব ভালবাসি। আমার স্বভাবও ছিল শান্ত। জন্তুজানোয়ার পুষতে ভীষণ ভালবাসতাম। বড় হলাম। কিন্তু স্বভাব পাল্টাল না।

বিয়ে করলাম অল্প বয়সে। বেশ মনের মত বউ পেলাম। স্বভাবটি মিষ্টি। শান্ত। জন্তুজানোয়ার পোষবার সখ আমার মতই। আমাদের সখের চিড়িয়াখানায় একটা বেড়ালও ছিল। কালো বেড়াল।

শুধু কালো নয়, বেড়ালটা বেশ বড়ও বটে। বুদ্ধিও তেমনি। বেড়ালের মগজে যে এত বুদ্ধি ঠাসা থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বউ কিন্তু কথায় কথায় একটা কথা মনে করিয়ে দিত আমাকে। কালো বেড়ালকে নাকি ছদ্মবেশী ডাইনী মনে করা হত সেকালে। আমি ওসব কুসংস্কারের ধার ধারতাম না।

বেড়ালটার নাম প্লুটো। অষ্টপ্রহর আমার সঙ্গে থাকত, পায়ে পায়ে ঘুরত, আমার হাতে খেত, আমার কাছে ঘুমোতো। প্লুটোকে ছাড়া আমারও একদণ্ড চলত না।

বেশ কয়েক বছর প্লুটোর সঙ্গে মাখামাখির পর আমার চরিত্রের অদ্ভুত একটা পরিবর্তন দেখা গেল।

ছিলাম ধীর, শান্ত। হলাম অস্থির, অসহিষ্ণু, খিটখিটে। মেজাজ এত তিরিক্ষে হয়ে উঠল যে বউকে ধরেও মারধর শুরু করলাম। প্লুটোকেও বাদ দিলাম না।

এক রাতে মদ খেয়ে বাড়ি এসে দেখলাম প্লুটো আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। আর যায় কোথা! মাথায় রক্ত উঠে গেল আমার। খপ করে চেপে ধরলাম। ফ্যাঁস করে সে কামড়ে দিল আমার হাতে। আমি রাগে অন্ধ হয়ে গেলাম। পকেট থেকে ছুরি বার করে প্লুটোর টুঁটি ধরলাম এক হাতে—আরেক হাতে ধীরে সুস্থে উপড়ে আনলাম একটা চোখ।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙবার পর একটু অনুতাপ হল বৈকি। উত্তেজনা মিলিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে কিন্তু প্লুটো আমার ছায়া মাড়ানো ছেড়ে দিল। চোখ সেরে উঠল দুদিনেই। কিন্তু আমাকে দেখলেই সরে যেত কালো ছায়ার মত।

আস্তে আস্তে মাথার মধ্যে পশু প্রবৃত্তি আমার জেগে উঠল। যে বেড়াল আমাকে এত ভালবাসত, হঠাৎ আমার ওপর তার এত ঘৃণা আমার মনের মধ্যে শয়তানী প্রবৃত্তিকে খুঁচিয়ে তুলতে লাগল। সে কিন্তু কোনো দিন ক্ষতি করেনি আমার। তা সত্ত্বেও ওকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার জন্যে হাত নিশ পিশ করতে লাগল আমার।

একদিন সত্যি সত্যিই ফাঁসি দিলাম প্লুটোকে। বাগানের গাছে লটকে দিলাম দড়ির ফাঁসে। ও মারা গেল। আমিও কেঁদে ফেললাম। মন বলল, এর শাস্তি আমাকে পেতেই হবে।

সেই রাতেই আগুন লাগল বাড়িতে। রহস্যজনক আগুন। জ্বলন্ত মশারীর মধ্যে থেকে বউকে নিয়ে বেরিয়ে এসে দেখলাম পুড়ছে সারা বাড়ি।

দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল গোটা বাড়ি। খাড়া রইল শুধু একতলার একটা দেওয়াল। পাড়ার সবাই অবাক হয়ে গেল কিন্তু সাদা দেওয়ালের ওপর একটা কালো ছাপ দেখে। ঠিক যেন একটা কালো বেড়াল। গলায় দড়ির ফাঁস।

একরাতেই ফকির হয়ে গেলাম আমি। কালো বেড়ালের স্মৃতি ভোলার জন্যে আবার একটা বেড়ালের খোঁজে ঘুরতে লাগলাম সমাজের নিচু তলায়। একদিন একটা মদের আড্ডায় দেখতে পেলাম এমনি একটা বেড়াল। বসেছিল পিপের ওপর—অথচ একটু আগেও জায়গাটা শূন্য ছিল। অবিকল প্লুটোর মতই বড়, মিশমিশে কালো। শুধু বুক ছাড়া। সেখানটা ধবধবে সাদা।

বেড়ালটার মালিকের সন্ধান পেলাম না। আমি কিন্তু গায়ে হাত দিতেই যেন আদরে গলে গেল সে। বাড়ী নিয়ে আসার পরের দিন সকাল বেলা লক্ষ্য করলাম—একটা চোখ নেই।

সেই কারণেই আরো বেশি করে আমার বউ ভালবেসে ফেলল নতুন বেড়ালকে। মনটা ওর নরম। মমতায় ভরা—তাই।

যা ভেবেছিলাম, আমার ক্ষেত্রে ঘটল কিন্তু তার উল্টো। ভালবাসা তো দূরের কথা—দিনকে দিন মনের মধ্যে ক্রোধ আর

ঘৃণা জমা হতে লাগল নতুন বেড়ালের প্রতি। কোথেকে যে এত হিংসা বিদ্বেষ রাগ মনে এল বলতে পারব না।

বেড়ালটার আদেখলেপনাও বাড়ল তালে তাল মিলিয়ে। যতই মাথায় খুন চাপতে লাগল আমার ওর প্রতি-ততই আমার গায়ে মাথায় কোলে চাপার বহর বেড়ে গেল হতভাগার। প্রতিবারেই ভাবতাম, দিই শেষ করে। সামলে নিতাম অতি কষ্টে।

বউ কিন্তু একটা জিনিসের ওপর বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করত আমার। জিনিসটা কালো বেড়ালের সাদা বুক। প্লুটোর সঙ্গে তফাৎ শুধু ঐ জায়গায়। সাদা ছোপটা দেখতে অবিকল ফাঁসির দড়ির মত!

একদিন পুরোনো বাড়ির পাতাল ঘরে গেছি বউকে নিয়ে। অভাবের তাড়নায় না গিয়ে পারতাম না। ন্যাওটা বেড়ালটা পায়ে পায়ে আসছে। পায়ে পা বেধে তাই পড়তে পড়তে সামলে নিলাম নিজেকে। কিন্তু সামলাতে পারলাম না মেজাজকে। ঝাঁ করে একটা কুড়ুল তুলে নিয়ে টিপ করলাম হতচ্ছাড়া বেড়ালের মাথা-বাধা দিল আমার বউ।

বউ বাধা না দিলে সেদিনই দফারফা হয়ে যেত নতুন বেড়ালের। কিন্তু সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল বউয়ের ওপর। অমানুষিক রাগ। কুড়ুলটা মাথার ওপরে তুলে বসিয়ে দিলাম ওর মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল স্ত্রী।

সমস্যা হল লাশটা নিয়ে। অনেক ভেবে চিন্তে দেওয়ালের মধ্যে রক্ত মাখা দেহটা খাড়া করে দাঁড় করিয়ে ইট দিয়ে গেঁথে ফেললাম। প্লাস্টার করে দিলাম। বাইরে থেকে ধরবার কোন উপায় রইল না।

বড় শান্তিতে ঘুমলাম সে রাত্রে-বেড়াল ছাড়া। কুড়ুল নিয়ে খুঁজে ছিলাম তাকে বধ করবার জন্যে-পাইনি।

দিন কয়েক পরে পুলিশ এস। সারা বাড়ি খুঁজল। আমি সঙ্গে রইলাম। একটুকুও বুক কাঁপল না। চার চারবার নিয়ে গেলাম পাতাল কুঠরির সেই দেওয়ালের কাছে।

তারপর যখন মুখ চুন করে ওরা চলে যাচ্ছে, বিজয়োল্লাসে ফেটে পড়লাম আমি। হাতের পাটি দিয়ে খটাস করে মারলাম দেওয়ালের ঠিক সেইখানে যেখানে নিজের হাতে কবর দিয়েছি বউকে।

আচমকা একটা বিকট কান্নার আওয়াজ ভেসে এল ভেতর থেকে। সারা বাড়ি গমগম করতে লাগল সেই আওয়াজে। শিউরে উঠল পুলিশ বাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে ফেলল দেওয়াল। দেখল, আমার মরা বউয়ের মাথার ওপর বসে রয়েছে সেই কালো বেড়ালটা-যার বুকের কাছটা সাদা!

বেলুনে চড়ে চাঁদে যাওয়া

(দ্য বেলুন হোক্স)

"উদ্ভট ভয়ানক কল্পনা দুলছে আমার হৃদয়ে, আমিই তার কম্যাণ্ডার।

জ্বলন্ত বর্শা নিয়ে পবন-অশ্বে চেপে ছুটে চলি আমি অজানার উজানে।"

রোটারড্যাম থেকে সব শেষে পাওয়া খবরে জানা গেল সেখানে এখন দার্শনিক উত্তেজনা চরমে উঠেছে। অত্যাশ্চর্য কাণ্ডকারখানা ঘটছে। ঘটনাগুলো নাকি শুধু অভিনবই নয়, এতদিনের ধ্যানধারণা ধূলিসাৎ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সেই কারণেই মনে হচ্ছে সারা ইউরোপে সাড়া পড়তে আর বিশেষ দেরী নেই। পদার্থবিদ্যাকে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়ে যুক্তিতর্ক আর জ্যোতির্বিজ্ঞানকে কান ধরে নতুন শিক্ষা দেওয়ার সময় এসে গেছে।

তারিখটা সঠিক বলতে পারব না। বিশেষ সেই দিনে নাকি কাতারে কাতারে লোক জড়ো হয়েছিল রোটারড্যামের এক্সচেঞ্জ চত্বরে। জড়ো হওয়ার উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। বেশ গরম পড়েছে—এ সময়ে যা অস্বাভাবিক, বাতাস একদম নেই। আকাশে মেঘ জমেছে। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টিও পড়ছে। বিনা নোটিশে নীল আকাশে সাদা মেঘের এই উৎপাত নীচের জনারণ্যের ভালই লাগছে।

তা সত্ত্বেও দুপুর নাগাদ চঞ্চল হল মানুষগুলো। নড়ে উঠল দশ হাজার জিভ, মুহূর্তের মধ্যে দশ হাজার মুণ্ড ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল আকাশের দিকে, দশ হাজার তামাকের পাইপ নেমে এল দশ হাজার জোড়া ঠোঁটের ফাঁক থেকে এবং এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল দশহাজার গলা। সে কি চিৎকার! যেন নায়গারার ভ্রজ্ঞনাদ! সারা শহর কেঁপে উঠল সেই দশ হাজারি উল্লাসে ঃ

উল্লাসের কারণটা দেখা গেল তার পরেই। মেঘের ফাঁক থেকে নেমে এল একটা অদ্ভুত বস্তু, নীল চাঁদোয়া ফুঁড়ে ধীরে ধীরে নামতে লাগল মর্তের দিকে। আকারে তা প্রকাণ্ড, মনে হল নিরেট, কিন্তু এমনই কিম্ভূতকিমাকার যে নীচের হাঁ করে তাকিয়ে থাকা দশ হাজার মানুষ কস্মিন কালেও তা দেখেনি-কল্পনাতেও আনতে পারেনি।

জিনিসটা তাহলে কি? কেউ জানে না। এমন কি শহরের বার্গোমাষ্টার, মানে মেয়র, মিনহীর সুপারবাস ফন আনডারডাক নিজেও এ-রহস্যের কিনারা করতে পারলেন না। অগত্যা যে যার পাইপ ফের মুখে তুলে নিল, ফুক ফুক করে ধোঁয়া ছাড়ল, বক বক করে খানিক বকল, গট গট করে পায়চারীও করা হয়ে গেল এবং ফের ফুক ফুক করে ধোঁয়া ছেড়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল আকাশ পানে।

ইতিমধ্যে শহরের দিকে আরও নেমে এসেছে বিদঘুটে বস্তুটা। জল্পনা কল্পনা এবং অনর্গল ধূমপানের তোয়াক্কা না রেখেই নামছে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই বেশ খুঁটিয়ে দেখা গেল বিদিগিচ্ছিরি জিনিসটাকে।

দেখে মনে হল বেলুন-না মনে হওয়া নয়-সত্যিই বেলুন! কিন্তু এরকম বেলুন রোটারড্যামের কেউ বাপ ঠাকুরদার আমলেও দেখেনি। বেলুন কি নোংরা খবরের কাগজ দিয়ে তৈরী করা হয়? শুনেছেন কখনো? হল্যাণ্ডের কেউ অন্ততঃ শোনেনি। তা সত্ত্বেও তাদেরই নাকের উপর দিয়ে ঝুলতে ঝুলতে নামতে লাগল খবরের কাগজ দিয়ে তৈরী আজব বেলুন!

বেলুনের এ-রকম অপমান দেখলে কার না রাগ হয়! দশহাজার লোকের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল ঐ দৃশ্য দেখে। আরো রাগ হল জিনিসটার আকার দেখে। ইয়ার্কির একটা সীমা আছে। গাধার টুপি উলটো করে ধরলে যা হয়, বেলুনটা নাকি প্রায় সেই রকমই!

আরো কাছে নামতে দেখা গেল ভেড়ার গলায় যেমন ঘণ্টা দোলে, সেই রকম ঘণ্টা সারি সারি দুলছে গাধার টুপির কিনারা বরাবর-দুলছে আর বাজছে টুং টাং করে। টুপির ছুঁচোলো তলা থেকে দুলছে একটা ঝুমকো দড়ি। তার চাইতেও আজব ব্যাপার হল ফ্যানটাসটিক এই মেশিনের তলায় নীল ফিতে দিয়ে

ঝোলানো অদ্ভুত গাড়ীটা। আসলে তা দোলনা। কিন্তু অবিকল বীবরের চামড়ার টুপির মতন গড়ন। টুপির ফাঁদ প্রকাণ্ড, বেড় চওড়া, ওপর দিকে একটা গোল গম্বুজ ঘিরে কালো পটির ওপর রুপোর বাকল।

সব চাইতে আশ্চর্য হল, বিটকেল ঐ টুপি দেখেই কেমন যেন চেনা চেনা লাগল অনেকের। বেশ কিছু লোক তো দিব্বি গেলে বলেই ফেলল, এ টুপি তারা আগেও দেখেছে বেশ কয়েকবার। লাফিয়ে উঠলেন শ্রীমতি গ্রেট্রেল ফঅল্। তাঁর স্বামীকে দেখাও যা এই টুপি দেখাও নাকি তা।

ঘটনাটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা বছর পাঁচেক আগে তিন জন সঙ্গী সহ রহস্যজনক ভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল শ্রীযুক্ত ফঅল্। অনেক খোঁজ খবর করা হয়েছে তার কিন্তু টিকির সন্ধানও পাওয়া যায় নি। সম্প্রতি শহরের পূর্বদিকে পরিত্যক্ত অঞ্চলে বেশ কিছু হাড় অদ্ভুত রকমের রাবিশের সঙ্গে মিশানো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। জনরব, হাড়গুলো মানুষের এবং মানুষগুলোকে খুন করা হয়েছে। এমন কথাও শোনা গিয়েছে, ফঅল্-য়ের নিরুদ্দিষ্ট তিন সঙ্গীই নাকি নিহত হয়েছে সেখানে। কিন্তু সে কথা যাক-ফিরে আসা যাক মর্তাভিমুখী বেলুন প্রসঙ্গে।

বেলুনটা (নিঃসন্দেহে তা বেলুনাই) ইতিমধ্যে নেমে এসেছে মাটি থেকে একশ ফুটের মধ্যে। আরোহিকে দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট, সত্যই অসাধারণ চেহারা তার। মাথায় মাত্র দু-ফুট। ঐ টুকু মানুষের পক্ষে ব্যালেন্স রাখা কঠিন এবং ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু পড়ছে না কেবল বিশেষ ধরনের বুক পর্যন্ত উঁচু একটা রেলিংয়ের জন্য। লোকটার হাইট মাত্র দু-ফুট হলে কি হবে, বেঢপ মোটা। ঐটুকু হাইটে এই রকম গোল আলুর মত ফিগার দেখে নাকি হাসি গুলগুলিয়ে উঠেছিল দশহাজার পেটের মধ্যে। লোকটার পা অবশ্য দেখা যায় নি। হাত দু-খানা বিশাল-মাত্রাহীন প্রকাণ্ড। চুল ধুসর-মাথার পেছনে ঝুঁটি বাঁধা। নাক অতিশয় লম্বা, বেঁকানো এবং লাল; চোখ দুটো বড়, ঝকঝকে এবং তীক্ষ্ণ; থুৎনি আর গাল বয়সের ভারে কুঁচকে গেলেও বেশ চওড়া এবং থলথলে; কিন্তু সব চাইতে বিদঘুটে হল কান দু-খানা—এ-হেন একখানা মুণ্ডুর কোনো অংশের সঙ্গে যার কোন সঙ্গতিই নেই।

বিচিত্র এই মানুষের পরনে আকাশনীল সাটিনের ঢিলেঢালা কোট, পাৎলুন অত্যন্ত টাইট-রুপোর বাক্‌ল্ লাগানো। ভেতরের জামাটা খুব ঝকঝকে হলদেটে কিছু দিয়ে তৈরী; মাথায় সাদা টুপি একদিকে ঈষৎ হেলানো; গলায় বাঁধা একটা রক্ত-লাল রুমাল-গিটটা প্রকাণ্ড এবং ফ্যানটাসটিক-ঝুলছে বুকের ওপর।

জমি থেকে শখানেক ফুটের মধ্যে এসেই লোকটার টনক নড়ল যেন। চঞ্চল হয়ে উঠল। ভাবসাব দেখে মনে হল আর নীচে না নামার তোড়জোড় করছে। অতি কষ্টে এক বস্তা বালি রেলিং টপকিয়ে নীচে ফেলে দিতেই শূন্যপথে দাঁড়িয়ে গেল বেলুন। হন্তদন্তভাবে কোটের পকেট থেকে টেনে বার করল মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো একটা মস্ত পকেট বুক। হাতে নিয়ে সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, অবাক হল যৎপরোনাস্তি-খুব সম্ভব পকেট-বইয়ের ওজন দেখে।

তারপর অবশ্য পকেট-বই খুলে টেনে বার করল লাল গালা দিয়ে সাঁটা এবং ফিতে দিয়ে বাঁধা একটা মস্ত খাম এবং এমন টিপ করে ছুঁড়ে দিল নীচের দিকে যে এসে পড়ল মেয়রের পায়ের গোড়ায়।

তৎক্ষণাৎ হেঁট হয়ে চিঠিখানা কুড়িয়ে নিতে গেলেন মহামান্য মেয়র মশাই। এদিকে কিন্তু হাতের কাজ শেষ হওয়ায় ফের শূন্যে চম্পট দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল অদ্ভুত আরোহী। নীচের দিকে না তাকিয়েই পর-পর ছ-টা বালির বস্তা ওপর থেকে ফেলে দিল নীচে। পড়বি তো পড় ছ-টা বস্তাই দমাদম করে এসে পড়ল মেয়রেরই পিঠে। বাধ্য হয়ে ভদ্রলোককে পর-পর ছ-খানা অতি উত্তম ডিগবাজি খেতে হল দশহাজার লোকের চোখের সামনে। আগন্তুকের এতখানি ধৃষ্টতা নাকি মেয়র কখনোই সহ্য করতেন না এবং বাগে পেলে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়তেন। সেই মুহূর্তে অবশ্য মাঠভর্তি লোক দেখেছে, বার্গোমাষ্টার প্রতিটি ডিগবাজি খেয়েছেন পাইপ কামড়ে থেকেই-মরবার মুহূর্ত পর্যন্ত নাকি পাইপ তিনি দাঁতের ফাঁক থেকে সরাতে রাজি নন।

এদিকে কিন্তু বেলুনটা ভরত পাখীর মত সাঁ সাঁ করে উড়ে গিয়ে দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল মেঘের আড়ালে। শহরবাসীদের চোখ নেমে এল চিঠির দিকে-যে চিঠি কুড়োতে গিয়ে মহামান্য মেয়র মশাইকে মান-সম্মান খুইয়ে আধ ডজন ডিগবাজি খেতে হয়েছে।

মেয়র তৎক্ষণে দেখে নিয়েছেন খামের ওপর লেখা নাম এবং অবাক হয়েছেন। চিঠি খানা এসে পড়েছে ঠিক লোকের পায়েই। কেননা, খামের ওপর নাম লেখা রয়েছে তাঁর এবং প্রফেসর রুবাডুব-য়ের। ইনি রোটারড্যাম জ্যোতির্বিজ্ঞান কলেজের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। প্রেসিডেণ্ট হলেন মেয়র স্বয়ং।

খামখানা তৎক্ষণাৎ ছেঁড়া হল এবং ভেতরে পাওয়া গেল পিলে চমকানো অত্যদ্ভুদ এই চিঠিখানা :

রোটারড্যাম শহরস্থিত জ্যোতির্বিদদের কলেজের প্রেসিডেণ্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মহামান্য ফন আনডারডাক এবং রুবাডুব সমীপেষু-

অধীনকে নিশ্চয় মনে আছে। আমার নাম হ্যান্স ফঅল্। নগণ্য মানুষ। হাপর মেরামত করে সংসার চালাতাম। বছর পাঁচেক আগে তিনজনকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিলমে। জানি সে নিরুদ্দেশ রহস্যের আজও কোনো কিনারা হয় নি।

বিশ্বাস করুন, এ-চিঠি লিখছে সেই হ্যান্স-ফঅল্-ই। আমি থাকতাম সরক্রুট রাস্তার শেষে ইঁটের তৈরী চৌকোনা বাড়ীতে। চল্লিশ বছর ছিলাম সেই বাড়িতে-নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে পর্যন্ত। স্মরণাতীত কাল থেকে আমার পূর্বপুরুষরাও থেকেছেন ঐ বাড়ীতেই-হাপর সারিয়ে সংসার চালিয়েছেন আমার মতই। ইদানিং শহরের অনেকেই রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি করছে অবশ্য-কিন্তু আমার মত সজ্জন নাগরিকের পক্ষে এর চাইতে ভাল কাজ করা সম্ভব ছিল না। হাত কখনো খালি যায় নি-পয়সাকড়িরও অভাব হয়নি। বাজারে সুনাম ছিল যথেষ্ট। কিন্তু ঐ যে বললাম, রাজনীতিবিদের বড় বড় লেকচার শুনে দুদিনের স্বাধীনতার মূল্য ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান গজগজ করতে লাগল মাথার মধ্যে। এককালের ভাল খদ্দেররা আমাকে চিনতেই পারত না-আমার মত নগণ্য মানুষকে নিয়ে মাথাও ঘামাত না-বিপ্লব, ধীশক্তি ইত্যাদি গালভরা ব্যাপার নিয়ে তখন তারা ব্যস্ত। আগুন না জ্বললে বাতাস করত খবরের কাগজ দিয়ে। গভর্ণমেণ্ট যতই দুর্বল হতে লাগল, চামড়া আর লোহা ততই শক্ত হতে লাগল-সারানোর মত হাপর আর রইল না কোথাও, ঠোকবার মত রইল না লোহা।

অচল হয়ে পড়ল আমার সংসার। রোজগার নেই, পেটে খাবার নেই। বউ বাচ্ছা নিয়ে অনাহারে শুকিয়ে ইঁদুরের মত আধখানা হয়ে গেলাম। ঠিক করলাম আত্মহত্যা করব। কিন্তু করা যায় কি ভাবে?

সে ভাবনারও সময় দিল না পাওনাদাররা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হত্যে দিয়ে বসে থাকত বাড়ীতে। এদের মধ্যে তিনজন ছিল একের নম্বরের ছ্যাঁচড়া -ছিনে জোঁক। চৌকাঠ কামড়ে বসে থাকত ভোর থেকে। আর মাঝে মাঝে আদালতের ভয় দেখাতো।

ঠিক করলাম নাছোড়বান্দা এই তিন ছ্যাঁচড়াকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। এমন প্রতিশোধ নেব যে বাছাধনদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে। সেই আনন্দেই আত্মহত্যার ভাবনাটা মুলতবী রাখলাম এবং মিষ্টিমিষ্টি কথায় তিন শয়তানকে ভুলিয়ে ভালিয়ে সুযোগের সন্ধানে রইলাম।

স্তোকবাক্য দিয়ে একদিন তিন ছ্যাঁচড়াকে বিদেয় করার পর খিঁচড়োনো মেজাজ নিয়ে টোঁ-টোঁ করতে বেরোলাম শহরে। উদ্দেশহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম একটা বইয়ের দোকানের সামনে। খদ্দেরদের বসবার জন্যে চেয়ার ছিল

সামনে। ধপ করে বসলাম সেই চেয়ারে এবং কিছু না বুঝেই হাতের কাছে যে বইখানা পেলাম, ওলটালাম তার মলাট।

বইটা জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। লিখেছেন কে এক প্রফেসর এঙ্কে। ভদ্রলোক হয় জার্মান, নয় ফরাসী। এ ব্যাপারে যৎকিঞ্চিৎ জানা ছিল আমার। তাই বইটা পড়তে শুরু করে এমন তন্ময় হয়ে গেলাম যে হুঁশ রইল না একদম। বার দুয়েক পড়ে ফেলার পর দেখি সন্ধ্যে নামছে—চোখ আর চলছে না। অগত্যা বই রেখে রওনা হলাম বাড়ীর দিকে। মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল বইয়ের কথাগুলো। সেই সঙ্গে বার বার মনে পড়তে লাগল বাষ্পবিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা গুপ্ত আবিষ্কার। আবিষ্কারটা আমাকে চুপিসারে জানিয়েছে আমারই এক খুড়তুতো ভাই—থাকে নান্‌তেজে। দুয়ে মিলে মনের ওপর এমন একটা ছাপ পড়ল যে বাড়ীর দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভেবে দেখলাম, লেখক খুব একটা উদ্দাম উদ্ভট কল্পনা করেন নি। কয়েকটা পরিচ্ছেদ তো খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিল আমার কল্পনাকে। লেখাপড়া কম জানতাম বলেই লেখকের উদ্ভট আইডিয়াকে অবাস্তব মনে করতে পারলাম না। সেরকম জ্ঞান আমার ছিল না। যুক্তিতর্ক বিজ্ঞান দিয়ে নাকচ করবার মত এলেম ছিল না বলেই অত উত্তেজিত হলাম, বইটা পড়ে।

বাড়ী পৌঁছোলাম রাত করে। সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুমুতে পারলাম না। মাথাভর্তি চিন্তা নিয়ে ঘুমোনো যায় না। ভোরবেলা উঠেই ফের দৌড়োলাম সেই বইয়ের দোকানে। কুড়িয়ে বাড়িয়ে কিছু পয়সা নিয়ে গিয়েছিলাম। তাই দিয়েই কিনলাম বলবিদ্যা আর ব্যবহারিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের খানকয়েক বই। বাড়ী এসে বসলাম বই মুখে করে। হাতে কাজ না থাকলেই গোগ্রাসে গিলতাম লাইনগুলো। দুদিনেই এই দুই শাস্ত্রে বেশ ব্যুৎপত্তি অর্জন করলাম। প্রকৃতির রহস্য জানবার প্রেরণা পেলাম যেন খোদ শয়তানের কাছ থেকে এবং তিনিই যেন অদ্ভুত একটা পরিকল্পনার বীজ আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে গেলেন। শয়তানের খুরে খুরে প্রণাম!

ইতিমধ্যে কিন্তু বিবিধ স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে রাখলাম ছ্যাঁচড়া পাওনাদার তিন জনকে। বাড়ীর কিছু আসবাপত্র বেচে কিছু টাকা মিটিয়ে দিয়ে বললাম বাকী টাকাটা দেব আমার একটা ছোট্ট এক্সপেরিমেণ্ট শেষ হলেই। লাভজনক এক্সপেরিমেণ্ট। পাওনাদারদের সাহায্য পেলে টাকা উপচে পড়বে। ওরা ক অক্ষর গোমাংস। পেটে বিদ্যেবুদ্ধি ছিল না। কাজেই রাজী করলাম খুব সহজেই।

ছ্যাঁচড়া তিনটেকে এইভাবে খপ্পরে আনবার পর বৌকে বোঝালাম। তার সাহায্য নিয়েই আমার বাদবাকী সম্পত্তিও বিক্রয় করে দিলাম। নানা অছিলায় বেশ কিছু টাকাও ধার

করলাম-উদ্দেশ্যটা অবশ্য কাউকে বললাম না। কেন না বলতে লজ্জা লাগলেও বলছি, টাকা শোধ দেবার কোনো সদিচ্ছাই আমার ছিল না।

এই টাকা নিয়ে আরম্ভ করলাম কেনাকাটা। খুব সূক্ষ্ম বারো গজ পিসের কেম্ব্রিক মসলিন, টোয়াইন সুতো, রবারের ভার্নিশ, ফরমাস মাফিক মস্ত একটা বেতের বাস্কেট, এবং আরও অনেক টুকিটাকি বস্তু-বেলুন নির্মাণে যা অপরিহার্য। বেলুন হবে আকারে প্রকাণ্ড-এত বড় বেলুন এর আগে তৈরী করার কথা কেউ ভাবেনি। বউয়ের ঘাড়ে বেলুন তৈরীর ঝামেলা দিলাম। বলে দিলাম কি কি করতে হবে। সেই ফাঁকে টোয়াইন সুতো দিয়ে বানালাম মস্ত জাল, তলায় লাগালাম দড়িদড়া ফাঁস। ঊর্ধ্বআকাশে পরীক্ষানিরীক্ষার জন্যে বেশ কিছু যন্ত্রপাতি কিনলাম বাজার থেকে।

তারপর একদিন গভীর রাতে রোটারড্যামের পুবে নিয়ে গেলাম এই জিনিসগুলো ঃ পাঁচটা লোহার পাতমারা পিপে-প্রতিটির মধ্যে গ্যালন পঞ্চাশ তরল পদার্থ ঢালা যায় ; আরও একটা লোহার পাতমারা পিপে-সাইজে আরও বড় ; তিন ইঞ্চি ব্যাসের দশফুট লম্বা ছ-টা টিনের নল ; বেশ খানিকটা বিশেষ এক ধরনের ধাতব বস্তু-আধা-ধাতুও বলা যায়-নামটা কিন্তু বলব না ; এক ডজন বয়েম ভর্তি অত্যন্ত সাধারণ একটা অ্যাসিড। শেষের জিনিসগুলো থেকে যে গ্যাস তৈরী হবে, সে-গ্যাস এর আগে আমি ছাড়া আর কেউ বানায়নি-বিশেষ এই কাজেও লাগায়নি। শুধু বলব গ্যাসটা এক ধরনের যবক্ষারজ বাষ্প এবং হাইড্রোজেনের চাইতে ঊর্ধ্ব 37.4 হাল্কা। স্বাদহীন ; নীল আগুন হয়ে জ্বলে, এবং যে কোন জন্তুকে নিমেষে মেরে ফেলতে পারে। গ্যাসটার গুপ্তরহস্য বলতে বাধা নেই। কিন্তু আবিষ্কারটা তো আমার নয়। ফ্রান্সের নানতেজ থেকে আমার এক খুড়তুতো ভাই চিঠি লিখে জানিয়েছিল-সর্ত ছিল সিক্রেট ফাঁস করব না। এর কাছে আরও একটা মস্ত আবিষ্কারের গুপ্ত কথা জেনে গিয়েছিলাম। বিশেষ এক জন্তুর চামড়া দিয়ে নাকি বেলুন তৈরী করলে গ্যাস একেবারেই বেরোয় না। জিনিসটা কিন্তু ব্যয়সাপেক্ষ। তাই ভাবলাম কেমব্রিক মসলিনের ওপর রবারের ভার্নিশ লাগালেই চলে যাবে-ব্যাপারটা লিখলাম নানতেজের সেই লোকটার সুবিধের জন্যে। জন্তুর চামড়ার বদলে এইভাবে বেলুন তৈরী অনেক সহজ, খরচও কম।

বেলুন ফোলাবার জায়গায় পাতমারা পিপেগুলো যেখানে যেখানে রাখব ঠিক করলাম, সেই সেই জায়গায় খুঁড়লাম ছোট ছোট কতকগুলো চোরা গর্ত। পঁচিশ ফুট ব্যাসের একটা বৃত্ত টেনে পাঁচটা গর্ত খুঁড়লাম সেই বৃত্তের ওপর। আর একটা গর্ত খুঁড়লাম বৃত্তের কেন্দ্রে। পাঁচ টিন কামানের বারুদ রাখলাম পাঁচটা ছোট

গর্তে, মাঝের বড় গর্তে রাখলাম ছোট্ট পিপে ভর্তি কামান বারুদ। পলতে দিয়ে জুড়ে দিলাম সব কটা টিন আর পিপে-মাটি খুঁড়ে ট্রেঞ্চ কেটে পলতে রাখলাম তার ভেতরে। তারপর লোহার পাতমারা পিপেগুলো বসিয়ে দিলাম গর্তগুলোর ওপর-ছোট পাঁচটা বৃত্তের ওপরে-বড়টা কেন্দ্রে। একটার মধ্য দিয়ে পলতের ডগাটা বেরিয়ে রইল সামান্য-নজরেই আসে না এমনিভাবে।

বাতাস ঘনীভূত করার একটা মেসিনও নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখলাম ঐ জায়গায়। অবশ্য আমার কাজের উপযোগী করে অনেক পরিবর্তন সাধন করতে হলো যন্ত্রটার মধ্যে। সে যাই হোক, বিস্তর খাটাখাটুনির পর দেখলাম কোনকাজেই আর ত্রুটি নেই। সফল হলাম প্রস্তুতি পর্বে। বেলুনটাও তৈরী হয়ে গেল দিন কয়েকের মধ্যে। চল্লিশ হাজার ঘন ফুটেরও বেশী গ্যাস ধরবে সেই বেলুনে। যন্ত্রপাতি আর একশ পঁচাত্তর পাউণ্ড ব্যালাস্ট সমেত আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে আকাশে। ব্যালাস্ট মানে কিছু ভারি জিনিস যা বেলুনে রাখতে হয় বেলুন স্থির রাখার জন্যে। তিন কোট ভার্নিশ দেওয়ার ফলে দেখলাম কেমব্রিক মসলিন সিল্কের মতই মজবুত হয়ে উঠেছে। অথচ খরচ পড়ল খুব কম।

''সব যখন ঠিক ঠাক, তখন আমি বউকে দিয়ে দিব্যি করালাম, বইয়ের দোকানে প্রথম যেদিন গিয়েছিলাম, সেই দিন থেকে শুরু করে যা-যা করেছি তা যেন কাক পক্ষীও না জানে। কথা আদায় করে আমিও কথা দিলাম, সুযোগ পেলেই ফিরে আসব। যদ্দিন না আসি, তদ্দিনের জন্যে কিছু টাকা দিলাম সংসার চালানোর হিসেবে-তারপর নিলাম বিদায়।

''সত্যি কথা বলতে কি, এসব ব্যাপারে বউকে নিয়ে আমার কোন ভাবনা ছিল না। আমার সাহায্য ছাড়াই সংসার চালানোর এলেম ওর ছিল। আমার তো মনে হয় ও আমাকে অপদার্থ বোঝা বলেই মনে করত। ভাবত, হাওয়ায় প্রাসাদ নির্মাণ করি, কোনো কাজের নয়।-তাই হাঁফ ছেড়েই বেঁচেছিল ঘাড় থেকে আমি নেমে যাওয়ায়।

''অন্ধকার রাত্রে বউয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিন ত্যাঁদোড় পাওনাদারকে সঙ্গে করে সব জিনিসপত্র আর বেলুন সমেত এসে পৌঁছোলাম বেলুন-স্টেশনে! এসে দেখলাম, যেখানকার জিনিস সেইখানেই আছে-কেউ হাত দেয়নি। সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দিলাম আসল কাজ।

''সেদিন পয়লা এপ্রিল। কালো রাত। তারা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে পড়ছিল বৃষ্টি-অবস্থা কাহিল করে ছাড়ছে। উদ্বিগ্ন হলাম বেলুন আর বারুদের জন্যে। ভার্নিশ করা সত্ত্বেও জল লেগে ভারি হয়ে যাচ্ছে বেলুন। বারুদও স্যাঁতসেঁতে হতে বাধ্য। তাই তিন পাওনাদারকে কাজে লাগিয়ে

দিলাম তক্ষুনি। মাঝের পিপের চারধারে বরফ ঠেসে দেওয়া হল-অন্যগুলোর মধ্যে নাড়া হল অ্যাসিড। এত যন্ত্রপাতি নিয়ে হবেটা কি? এই প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে চলল তিন ত্যাঁদোড়, গজ গজ করতে লাগল এত খাটাচ্ছি বলে। ভিজতে ভিজতে কোন ভূতপ্রেতের পুজো হচ্ছে? লাভ কি এত খেটে?

শুনে আমার উদ্বেগ বেড়ে গেল। তিন আহাম্মক সত্যি সত্যিই ভেবে বসতে পারে আমি শয়তানের আবাহনের আয়োজন করছি। প্রকৃত পক্ষে শয়তানি কাজেই তো নেমেছি আমি। তাই হাত চালালাম আরো তাড়াতাড়ি। ভয় হল, ইডিয়ট তিনটে আমাকে ফেলে না পালায়। লোভ দেখালাম, কাজ শেষ হলে অনেক টাকা দেব। ওষুধ ধরল তক্ষুনি। এত খাটাখাটুনি বাবদ যদি বেশ কিছু টাকা দিই আমি, তাহলে শয়তান আমাকে গোল্লায় নিয়ে গেলেও ওদের মাথাব্যথা নেই-টাকা না আসা পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবে।

সাড়ে চার ঘণ্টা পরে দেখলাম বেলুন বেশ ফুলে উঠেছে। দোলনাটা তলায় ঝুলিয়ে জিনিসপত্র তুলে ফেললাম ভেতরে। টেলিস্কোপ, ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার, ইলেকট্রোমিটার, কম্পাস, চৌম্বক, ছুঁচ সেকেণ্ড ঘড়ি, ঘণ্টা, কথা বলার চোঙা ইত্যাদি ইত্যাদি। বায়ুশূন্য ছিপি লাগানো একটা কাঁচের গোলকও নিলাম সঙ্গে, সেই সঙ্গে বাতাস ঘনীভূত করার যন্ত্র, শক্ত চুন, গালা, জল, খাবার-দাবার এবং এক জোড়া পায়রা আর একটা বেড়াল।

"তখন ভোরের আলো ফুটতে চলেছে-আর দেরী করা ঠিক নয়। এবার রওনা হওয়া দরকার। যেন হাত ফস্কে পড়ে গেল, এমনি ভাবে জলন্ত চুরুটটা ফেলে দিলাম মাটিতে। তারপর হেঁট হয়ে কুড়িয়ে নেওয়ার অছিলায় পিপের মাথা দিয়ে বেরিয়ে থাকা সলতেতে দিলাম আগুন ধরিয়ে-কিন্তু তিন ত্যাঁদোড় দেখতেও পেল না কি কাণ্ড করলাম আমি। লাফ দিয়ে উঠলাম দোলনায়, ঘ্যাচ করে ছুরি দিয়ে কেটে দিলাম একটি মাত্র দড়ি-একশ পঁচাত্তর পাউণ্ড সিসের ব্যালাস্টশুদ্ধ ভারী ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে বেলুন ছিটকে উঠে গেল ওপরে। মর্ত্য ছাড়িয়ে আসবার সময়ে ব্যারোমিটার দেখলাম-তিরিশ ইঞ্চি। থার্মোমিটার দেখলাম-উনিশ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড।

"পঞ্চাশ গজ উঠতে না উঠতেই একটা ভীষণ গুম্‌গুম্ দড়াম-দুম্ শব্দ শুনলাম নীচে, সেই সঙ্গে আগুন, ধোঁয়া, পাথর, ধাতু আর ছিন্নবিচ্ছিন্ন হাত -পা-মুণ্ড-ধড় এমন বেগে ছিটকে এল বেলুনের দিকে যে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল আমার। আতংকে নীল হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম দোলনার মধ্যে। বুঝলাম, বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। ফলাফলটা টের পাব এখুনি।

''এক সেকেণ্ডও গেল না, মনে হল দেহের সব রক্ত মাথায় উঠে এসেছে। ঠিক তখনি অনুভব করলাম একটা প্রচণ্ড সংঘাত-শরীরের সব বাঁধুনি, বেলুনের পুরো কাঠামো যেন আলগা হয়ে খুলে পড়ল এক ধাক্কায়। কারণটা পরে বুঝতে পেরেছিলাম। বিস্ফোরণের ধাক্কা সব চাইতে বেশী যেখানে ছুটে যাওয়া উচিত, আমি ছিলাম ঠিক সেই জায়গায়-বিস্ফোরণের মাথায়। সেই মুহূর্তে কিন্তু আমি তখন প্রাণ বাঁচানোর কথাই কেবল ভেবেছি। প্রথম ধাক্কাতেই বেলুন থেঁতলে চুপসে গিয়েছিল, তারপর ভীষণ বেগে ফুলে উঠল এবং মাতালের মত ঘুরতে লাগল বাঁই বাঁই করে। সামলাতে পারলাম না আমি-ছিটকে গেলাম দোলনার বাইরে। বেতের গা থেকে ফুট তিনেক লম্বা একটা দড়ি ঝুলছিল। ভাগ্যক্রমে পা জড়িয়ে গেল সেই দড়িতে। মাথা নীচের দিকে করে ঝুলতে লাগলাম মাটি থেকে অনেক উঁচুতে। আমার তখনকার অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল কোটর থেকে, সমস্ত শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে হাঁকপাঁক করতে লাগলাম একটু নিঃশ্বাসের জন্যে, প্রত্যেকটা নার্ভ প্রত্যেকটা মাসল্ যেন ছিঁড়ে পড়তে চাইল ভয়াবহ সেই অবস্থায়-নিদারুণ বিবমিষায় আচ্ছন্ন হয়ে এল চেতনা-অবশেষে অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান হারালাম।

''এ অবস্থায় ছিলাম কতক্ষণ বলা সম্ভব নয়। নিশ্চয় অনেকক্ষণ। কেননা জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দেখলাম ভোর হচ্ছে। অনেকটা নীচে একটা সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। দিগন্তে জমির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। ভাবছেন হয়ত দেখে খুব ঘাবড়ে গেলাম, মনে খুব যন্ত্রণা হল। মোটেই না। বরং অদ্ভুত উন্মত্ত প্রশান্তিতে মনটা কানায় কানায় ভরে উঠল। ধীরস্থিরভাবে দেখতে লাগলাম কি অবস্থায় পৌঁছেছি। একটার পর একটা হাত তুললাম চোখের সামনে। বুঝলাম না, শিরাগুলো ফুলে উঠেছে কেন, আঙুলের নখ অমন বীভৎসভাবে কালো হয়ে গেছে কেন। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম-বেলুনের চাইতে বড় হয়নি অন্ততঃ মাথাটা। তারপর হাত ঢুকালাম প্যান্টের পকেটে-ট্যাবলেট আর খড়কে কাঠির কৌটো দুটো পেলাম না। তখন খেয়াল হল, বাঁ গোড়ালিটা বড্ড ব্যথা করছে। একটু একটু করে টের পেলাম কি অবস্থায় পৌঁছেছি এবং কি রকম সঙীনভাবে ঝুলছি। কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখুন, একটুও ভয় পেলাম না, অবাকও হলাম না। বরং একটা মারাত্মক উভয় সংকট চালাকি দিয়ে কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছি বলে ঐ অবস্থাতেই বেশ কিছুক্ষণ কাঠহাসি হাসলাম। অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে থাকলাম তন্ময়ভাবে। কঠিন সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সবাই ইজিচেয়ারে আড় হয়ে শুয়ে যেমন গালে হাত দিয়ে ভাবে আমিও তেমনি ঠোঁট কামড়ে নাকের পাশে তর্জনী ঠেকিয়ে গভীর চিন্তায়

মগ্ন রইলাম। সমাধানটা মাথায় আসতেই খুব সাবধানে হাত দিলাম পিঠে এবং প্যাণ্ট-আটকানো কোমরবন্ধনীর লোহার বাক্‌লটা খুলে নিলাম। বেশ বড় বাক্‌ল্। কাঁটা তিনটেতে মরচে ধরে যাওয়ায় ঘুরতে চায় না। জোর করে ঘুরিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলাম বাক্‌লের গায়ে-কামড়ে ধরলাম দাঁতের ফাঁকে। এবার খুললাম গলার বড় নেকটাই। একটা দিক বাঁধলাম বাক্‌লের সঙ্গে। আর একটা দিক আমার কোমরে-সাবধানের মার নেই বলে। তারপর অতি কষ্টে শরীরটাকে বেঁকিয়ে ওপরে তুলে বাক্‌ল্ ছুঁড়ে দিলাম দোলনার ভিতরে। বেতের গায়ে খ্যাঁচ করে আটকে গেল বড় বড় কাঁটা তিনটে।

"এই সব করতে গিয়ে দোলনার তলার দিকটা হেলে পড়েছিল বাইরের দিকে-ফলে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছিলাম আমি। পড়বার সময়ে যদি দোলনার দিকে মুখ ফিরিয়ে পড়তাম এবং যে দড়িতে পা আটকে ছিল, সেটি দোলনার তলা দিয়ে না বেরিয়ে কিনারা দিয়ে যদি ঝুলত, তাহলে এত কাণ্ডর কোনোটাই করতে পারতাম কিনা সন্দেহ। তাই নির্বোধ আনন্দে ডগমগ চিত্তে মিনিট পনেরো ঐ অবস্থায় ঝুলতে লাগলাম শূন্যপথে। আনন্দ অবশ্য মিলিয়ে গেল একটু পরেই। উপলব্ধি করলাম পরিস্থিতির ভয়াবহতা। মাথা নীচের দিকে থাকায় সমস্ত রক্ত মাথায় জমা হয়ে যে উন্মত্ত আনন্দ সৃষ্টি করেছিল এতক্ষণ, এখন তা তিরোহিত হল যেখানকার রক্ত সেখানে ফিরে যাওয়ায়-কেননা আমি এখন আর মাথা নীচের দিকে করে ঝুলছিলাম না-অনুভূমিক অবস্থায় দোলনার সঙ্গে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী শূন্যে শুয়েছিলাম বলা যায়। মাথার রক্ত নেমে যেতেই ভীষণ ভয়ে শিউরে উঠলাম। পড়ি কি মরি করে হাঁচর-পাঁচর করে ঠেলে উঠলাম নেকটাই বেয়ে এবং বেতের কিনারা টপকে দড়াম করে মুখ থুবড়ে পড়লাম দোলনার ভেতরে। পড়েও কাঁপতে লাগলাম ঠকঠক করে-ভয়ে।

বেশ কিছুক্ষণ গেল সামলে উঠতে। তারপর মন দিলাম বেলুন তদারকিতে। খুঁটিয়ে দেখলাম বেলুনের আগাপাশতলা এবং হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম কোথাও ফুটো-টুটো হয় নি দেখে। যন্ত্রপাতি খোয়া যায় নি-ব্যালাস্ট পড়ে যায় নি-খাবার-দাবারও সব আছে। এ রকম একটা অ্যাকসিডেণ্টেও জিনিসপত্র পড়ে না যাওয়ার একমাত্র কারণ হল গোড়া থেকেই জিনিসগুলো রেখে ছিলাম সুদৃঢ় ভাবে। ঘড়ি দেখলাম। ছটা বাজে। বেলুন তখনও দ্রুত উঠছে। ব্যারোমিটার দেখলাম-পৌনে চার মাইল উঠেছি। নীচে তাকালাম। বেলুনের ঠিক নীচে একটা কালো মত কি যেন ভাসছে। অনেকটা খেলনার মত গড়নটা। টেলিস্কোপের মধ্য দিয়ে দেখলাম একটা বৃটিশ কামান-জাহাজ। চুরানব্বইটা কামান রয়েছে ডেকে। উত্তাল সমুদ্রে ভীষণ ভাবে দুলতে দুলতে চলেছে পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে। জাহাজ ছাড়া সমুদ্রে বা আকাশে আর কিছু

নেই। কেবল সূর্য উঠেছে দিগন্ত ছাড়িয়ে।

আমার এই অভিযানের উদ্দেশ্যটা বলবার সময় এখন হয়েছে। মহামান্য প্রেসিডেণ্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মহাশয়ের মনে থাকতে পারে কি শোচনীয় অবস্থায় পড়ে রোটারড্যামে আত্মহত্যা করব ঠিক করেছিলাম। জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে এ সিদ্ধান্ত আমি নিইনি। দুঃখ কষ্ট আর সইতে পারছিলাম না বলেই মরে পালাতে চেয়েছিলাম। ঠিক এই সময়ে বইয়ের দোকানের সেই বইটা আর নানতেজের আমার সেই খুড়তুতো ভাইয়ের আবিষ্কারটা আমার মন ঘুরিয়ে দিল। আমি মরে পালাতে চেয়েছিলাম। এবার ঠিক করলাম বাঁচবার জন্যে পালাব। এই পৃথিবী ছেড়েই পালাব। যাব চাঁদে। পাগল ভাবছেন আমাকে! ভাবুন। কিন্তু শুনুন বিপদ আর কষ্টে ভরা এই অসম্ভব অভিযানকেও সম্ভব করবার জন্যে কি কি আমি ভেবেছিলাম।

প্রথমে ভাবলাম পৃথিবী থেকে চাঁদের সঠিক দূরত্ব। সেটা গড়ে দাঁড়ায় ২,৩৭,০০০ মাইল। গড়ে বললাম এই কারণে যে চাঁদ উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এই দূরত্বটা কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে চাঁদের কেন্দ্র পর্যন্ত। চাঁদ আর পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বাদ দেওয়া যাক ২,৩৭,০০০ মাইল থেকে। চাঁদের ব্যাসার্ধ ১,০৮০ এবং পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ধরুন ৪০০০ দুয়ে মিলে ৫,০৮০। বাদ দিলে দাঁড়ায় ২,৩১,৯২০ মাইল। যে পথ আমাকে পাড়ি দিতে হবে। পথ এমন কিছু বেশি নয়। ডাঙার ওপর ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে যানবাহন চালানো বহুবার সম্ভব হয়েছে। তার বেশি গতিবেগও ভবিষ্যতে সম্ভব। এই গতিবেগে গেলেও চাঁদে পৌঁছোতে লাগবে ১৬১ দিন। তবে এর চাইতে বেশী গতিবেগে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল কয়েকটা ব্যাপারের দরুন–সেগুলো পরে বলব।

দূরত্বর পরেই যে জিনিসটা সব চেয়ে বেশী ভাবিয়ে তুলল, তা হল বাতাসের ঘনত্ব। ব্যারোমিটার দেখে আমরা জানি, ভূপৃষ্ঠ ছাড়িয়ে হাজার ফুট উঠলে বায়ুস্তরের তিরিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র ছাড়িয়ে আসা যায়; ১০,৬০০ ফুট উঠলে তিন ভাগের এক ভাগ; ১৮,০০০ ফুট উঠলে অর্ধেক। হিসেব করে দেখা গেছে, ভূপৃষ্ঠ থেকে আশী মাইল পর্যন্ত উঠলেই বায়ুস্তর এত পাতলা হয়ে যাবে যে কোন জীব সেখানে বাঁচতে পারবে না। কোনো যন্ত্র দিয়েও বায়ুর অস্তিত্ব ধরা যাবে না। তবে এ সব হিসেব ভূপৃষ্ঠের লাগোয়া একদম কাছের বায়ুস্তরে বসে করা। সবটাই পরীক্ষামূলক জ্ঞান। এটাও ঠিক যে ভূপৃষ্ঠ থেকে খুব বেশী উঁচুতে উঠলে যে কোন জীবই অক্কা পাবে। আকাশ অভিযান চালিয়ে মঁসিয়ে গে-লুসাক আর বায়োট উঠেছিলেন মাত্র ২৫,০০০ ফুট পর্যন্ত। আশী মাইলে কি হবে, সেটা ভাববার কথা বইকি।

তবে কি জানেন, উঁচুতে উঠলেই যে বাতাস একদম মিলিয়ে যাবে তা তো নয়। পাতলা হয়ে যেতে পারে-তবে কিছু না কিছু থাকবেই। এটা হল আমার নিজের যুক্তি।

অন্য যুক্তিও থাকতে পারে। যেমন, বিশেষ একটা উচ্চতার পর বায়ু বলে কোন পদার্থই আর নেই। যুক্তিটা প্রণিধান যোগ্য। কিন্তু অতি সূক্ষ্ম ইথিরীও মিডিয়াম নিশ্চয় আছে। ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছে এই ইথার। গ্রহের কাছাকাছি গিয়ে ঘনীভূত হয়েছে। হয়ত ভূস্তরের প্রভাবেও তা জমাট হয়ে বাতাসের আকার নিয়েছে। Encke ধূমকেতুর কক্ষপথের তেড়াবেঁকা অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এমনি একটা সিদ্ধান্ত অনেকের মাথাতেই এসেছে। সূর্যের কাছাকাছি গেলেই ধূমকেতুর নীহারিকা-ভাবটা গুটিয়ে আসে-দূরে গেলেই ছড়িয়ে পড়ে। সূর্যের কাছে ইথার ঘন হয়েছে বলেই এমন হয়।

এই সব ভেবেই আর দ্বিধা করিনি। যাত্রা পথে পাতলা বায়ুকে ঘন করে নিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়ার উপযুক্ত করব বলেই সঙ্গে নিয়েছিলাম মঁসিয়ে গ্রিমের বাতাস ঘন করার যন্ত্র। কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাত্রা শেষ করা দরকার। অর্থাৎ ভাবা দরকার কত মাইল বেগে যেতে পারব বেলুন নিয়ে।

পৃথিবী ছাড়িয়ে উঠবার সময়ে বেলুন মাঝারি গতিবেগ নেয়। কিন্তু যতই পাতলা স্তরে পৌঁছোবে, গতিবেগ ততই দ্রুত হবে, এমন কোন কথা নেই। মাধ্যাকর্ষণ তো রয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে বেলুনের নিম্ন গতি দেখা যায়, সেটা বেলুন থেকে গ্যাস বেরিয়ে আসার দরুন মামুলী ভার্নিশ করার জন্যে। মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দু থেকে দূরে গেলে নিম্নগতির যদি এইটাই একমাত্র কারণ হয়, তাহলে আমি তো বলব ইথারের মাঝে উঠে গেলে বেলুনের গ্যাসও অতিশয় পাতলা হয়ে যাবে ঠিকই, হয়ত বেলুন ফেটে বেরিয়েও যেতে পারে, সেক্ষেত্রে গ্যাস বার করে দিতে হবে একটু একটু করে। কিন্তু কখনোই যন্ত্রপাতি, দোলনা এবং আমাকে সমেত প্রকাণ্ড বেলুনের ওজন স্থানান্তরিত সমপরিমাণ ইথারের ওজনের সমান হবে না। যদিও বা হয়, ব্যালাস্ট ফেলে দিলেই হল। তিনশ পাউণ্ড পর্যন্ত ওজন ফেলতে পারব। ততক্ষণে মাধ্যাকর্ষণও কমে আসবে-আওতার বাইরে চলে যাবে-বেড়ে যাবে চাঁদের আকর্ষণ।

অসুবিধে আরো একটা আছে। বেশ কিছুক্ষণ অশান্তিতে ভুগেছি এই অসুবিধার কথা ভাবতে গিয়ে। দেখা গিয়েছে, বেলুন বেশী ওপরে উঠলেই আরোহীদের শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়, মাথায় আর শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হতে থাকে, নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে, আরও অনেক ভয়ানক লক্ষণ দেখা যায়, বেলুন যত ওপরে ওঠে, উৎপাতগুলো ততই বাড়তে থাকে, ব্যাপারটা ভাববার বিষয়। উৎপাতগুলো বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত মরণকে ডেকে

আনবে না তো? ভেবে দেখলাম, তা নাও হতে পারে। দেহের ওপর বায়ুচাপ কমে আসে বলেই তো রক্তবহা নালীগুলো স্ফীত হয়ে ওঠে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। হাদ্‌পিণ্ডের নিলয়স্থিত রক্তকে পাতলা বাতাস সমৃদ্ধ করতে অক্ষম হয় বলে। শেষোক্ত এই ব্যাপারটি ছাড়া সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য অবস্থাতেই জীবন টিঁকে থাকবে না কেন বুঝি না। বুকের খাঁচার সংকোচন প্রসারণ-যাকে সবাই বলে নিঃশ্বাস নেওয়া-আসলে পুরোটাই পেশীঘটিত ব্যাপার। নিঃশ্বাস নেওয়ার সেটাই হল কারণ, পরিণাম নয়। এক কথায় বায়ুচাপ কমে গেলে মানুষ যদি তাতে মানিয়ে নিতে পারে, যন্ত্রণাবোধও আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে এবং যদি সেইটুকু সহ্য করা যায়, আমার লৌহ কাঠামোর মধ্যে প্রাণটুকুও আটকে থাকবে।

মহামান্য মহাশয়গণ, চন্দ্রাভিযানের এই হল সংক্ষিপ্ত গৌরচন্দ্রিকা। এবার শুনুন আমার দুঃসাহসের বিবরণ-মানব ইতিহাসে যার নজীর একেবারেই নেই।

পৌনে চার মাইল ওঠবার পর দোলনা থেকে কয়েকটা পালক ফেলে দিলাম। দেখলাম, বেশ বেগে উঠছি তখনও। কাজেই ব্যালাস্ট ফেলবার দরকার নে-ই। ফেলতেও চাই না, জমিয়ে রাখতে চাই সঙ্কট মুহূর্তের জন্যে, কেননা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অথবা চাঁদের বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব শেষ পর্যন্ত যে কি দাঁড়াবে আমি জানি না। শারীরিক অসুবিধে তখনও পর্যন্ত টের পাইনি। নিঃশ্বেস নিচ্ছিলাম পরমানন্দে, মাথার মধ্যেও যন্ত্রণা নেই। কোট খুলে দোলনার মেঝেতে রেখে দিলাম, বেড়ালটা আমেজ করে তার ওপর বসে উদ্ধত ভাবে তাকিয়েছিল পায়রাগুলোর দিকে। বেড়াল নিয়ে পায়রাদের মাথাব্যথা দেখলাম না। কুটুর কুটুর করে খুঁটে খুঁটে চাল খেয়ে চলল দোলনার মেঝে থেকে।

ছ-টা বিশ মিনিটে ব্যারোমিটার দেখলাম ২৬,৪০০ ফুট উঠেছি, অর্থাৎ প্রায় পাঁচ মাইল। বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। গোলাকার জ্যামিতি দিয়ে হিসেব করা যায় পৃথিবীর কতখানি জায়গা চোখে আসছে। সেই হিসেবে, ভূগোলকের যা ক্ষেত্রফল, তার ষোলশ ভাগের এক ভাগ মাত্র দেখতে পাচ্ছি প্রায় পাঁচ মাইল ওপর থেকে। সমুদ্র মনে হচ্ছে আয়নার মত স্থির চকচকে, টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলে অবশ্য অন্য দৃশ্য-ভীষণ বিক্ষুব্ধ। জাহাজটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। দিগন্তে মিলিয়ে গিয়েছে বোধ হয়। এখন থেকেই মাথার তীব্র যন্ত্রণা শুরু হল। বিশেষ করে দুই কানে, নিঃশ্বেস নিচ্ছিলাম কিন্তু খুব সহজেই, পায়রা আর বেড়াল দেখলাম নির্বিকার। এখনও এই কষ্টের মধ্যে পড়েনি।

সাতটা বাজতে যখন কুড়ি মিনিট, তখন পর পর কয়েকটা জলভরা ঘন মেঘের মধ্যে দিয়ে উঠে গেল বেলুন। ফলে, কি

ঝামেলায় যে পড়লাম কি আর বলব। বাতাস ঘন করার মেশিনটা গেল বিগড়ে। নিজেও ভিজে সপসপে হয়ে গেলাম। এত উঁচুতে মেঘের মধ্যে জল থাকতে পারে, ভাবতেও পারিনি। তাই ঠিক করলাম দুটো পাঁচ পাউণ্ডের ব্যালাস্ট ফেলে দেওয়া যাক। তাতেও ১৬৫ পাউণ্ডের মত ওজন হাতে থাকবে। ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তেড়েমেড়ে উঠতে লাগল বেলুন-গতিবেগ বেশ বেড়ে গেল। মেঘের স্তর ভেদ করে উঠে আসতে না আসতেই বিদ্যুৎ চমকে উঠেছিল একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত। জ্বলন্ত কাঠকয়লার মত আলোকিত হয়ে উঠল পুরো মেঘমণ্ডল। মনে রাখবেন, এ ঘটনা ঘটল কিন্তু পরিষ্কার দিনের আলোয়। রাতের অন্ধকারে অনুরূপ দৃশ্যের সঙ্গে এ দৃশ্যের তুলনা হয় না। যেন নরকদৃশ্য দেখলাম। মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল পায়ের তলায় নিতল গহ্বর, বিশাল স্তম্ভ, কদাকার অগ্নি, বীভৎস যমদূত, অদ্ভুত খিলেন এবং বিচিত্র হলঘর কল্পনা করে-বেঁচে গিয়েছি এক চুলের জন্যে। ব্যালাস্ট ফেলতে যদি দ্বিধা করতাম, বেলুন তো ভিজতই, বিদ্যুতে পুড়ে ছাই হয়ে যেতাম এতক্ষণে। বেলুন বিহারে এ ধরনের বিপদের সম্ভাবনা আছে। মাথার যন্ত্রণাটা অবশ্য তখন আর টের পাচ্ছিলাম না-খুব উঁচুতে উঠে আসার জন্যেই বোধ হয়।

উঠছি এখন বেগেই। সাতটায় ব্যারোমিটার দেখলাম। সাড়ে ন মাইল নীচে রয়েছে ভূপৃষ্ঠ। নিঃশ্বেস টানতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। মাথার যন্ত্রণাটা ফের আরম্ভ হয়েছে। অতি তীব্র যন্ত্রণা। গালটা কেন ভিজে ভিজে, হাত বুলিয়ে দেখতে গিয়ে শিউরে উঠলাম। রক্ত পড়ছে কান দিয়ে। চোখ দুটোও যেন ফেটে বেড়িয়ে আসতে চাইছে। হাত বুলিয়ে চমকে উঠলাম। সত্যি সত্যিই কোটর থেকে অবিশ্বাস্যভাবে বেরিয়ে এসেছে-যা দেখছি সবই বিকৃত মনে হচ্ছে। বেলুনটাকে পর্যন্ত। এরকম লক্ষণের জন্যে তৈরী ছিলাম না আমি। হাঁকপাঁক করে খান তিনেক পাঁচ পাউণ্ডের ব্যালাস্ট ফেলে দিলাম নীচে অমনি লাফ দিয়ে আরো বেগে বেলুন উঠে গেল এমন এক জায়গায় যেখানে বায়ু ভীষণ পাতলা। ফলটা হল মারাত্মক। অভিযান মাথায় উঠল। মনে হল এই শেষ-আর বাঁচব না। আচমকা খিচুনি আরম্ভ হয়ে গেল পা থেকে মাথা পর্যন্ত-মিনিট পাঁচেক একটানা। নিঃশ্বেস টানছিলাম অনেকক্ষণ পরে পরে, খাবি খাওয়ার মত। ফুস ফুস ফেটে যাচ্ছিল যেন-সেই সঙ্গে দরদর করে রক্ত পড়ছিল নাক আর কান দিয়ে-এমনকি চোখ দিয়েও ফোঁটা ফোঁটা! পায়রাগুলোর বেশ কষ্ট হচ্ছিল। ডানা ঝটপটিয়ে পালাতে চাইছিলাম। বেড়ালটা জিভ বার করে মিউমিউ করে গড়াচ্ছিল দোলনার মধ্যে-যেন বিষ খেয়েছে। বুঝলাম, দুম করে অতগুলো ব্যালাস্ট ফেলে খুব ভুল করেছি। মৃত্যু এসে গেছে-মিনিট কয়েকের মধ্যে মরতে হবেই

এত কষ্ট হচ্ছিল যে প্রাণটাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে চেষ্টা পর্যন্ত অসাধ্য হয়ে পড়েছিল। ভাবনা চিন্তা লোপ পেয়েছিল মাথার প্রচণ্ড যন্ত্রণায়। জ্ঞান লোপ পেতে চলেছে বুঝে নীচে নামবার ভাল্‌ভের দড়ি চেপে ধরলাম কোন মতে-আর একটু হলেও দড়ি টেনে দিতাম-কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল তিন পাওনাদারের কি হাল করে এসেছি আমি এবং ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হলে আমার হালটা কি হবে কল্পনা করে ছেড়ে দিলাম দড়ি। দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত কি হয়। মুখ গুঁজড়ে দোলনার মেঝেতে পড়ে থেকে অতিকষ্টে চেষ্টা করলাম নিজের বুদ্ধি আর শক্তিকে সংহত করতে। তাতে লাভ হল খানিকটা। ঠিক করলাম শরীর থেকে রক্ত বার করে দিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করা যাক। কিন্তু ল্যানসেট কোথায়? শেষ পর্যন্ত কলম কাটা ছুরী দিয়ে চিরে দিলাম বাম বাহুর একটা ধমনী। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে না বেরোতেই আরাম বোধ করলাম। মাঝারি সাইজের একটা গামলা অর্ধেক ভর্তি হতেই যন্ত্রণা-টন্ত্রণা সব মিলিয়ে গেল। চোখ-কান-নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল। মেঝে ছেড়ে তক্ষুনি উঠে পড়া সঙ্গত মনে করলাম না। তাই চেরা জায়গাটা এঁটে ব্যাণ্ডেজ করে শুয়ে রইলাম পনেরো মিনিট। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখি শরীর বেশ ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে। গত সওয়া এক ঘণ্টা যে নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছি, তার চিহ্ন মাত্র আর নেই। শুধু যা নিঃশ্বেস নেওয়ার কষ্টটা খুব একটা কমেনি-অর্থাৎ বাতাস ঘন করার কনডেন্সারটা এবার না চালালেই নয়। তাকিয়ে দেখি বেড়ালটা ফের আয়েস করে বসে পড়েছে আমার কোটের ওপর-পাশে তিনটে বেড়াল ছানা! ভাবুন দিকি কি কাণ্ড! আমি যখন মরতে চলেছি, ও তখন বাচ্চা বিয়োচ্ছে! ভাবলাম, ভালই হল। অনেক দিনের ধারণাটা এবার যাচাই করে নেওয়া যাবে। আমার বিশ্বাস, ভূপৃষ্ঠের বায়ু চাপে প্রাণীজগৎ এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে ঊর্ধ্বস্তরে মানিয়ে নিতে পারে না। যদি দেখি বাচ্চা তিনটে বহাল তবিয়তে আছে, বুঝব আমার ধারণাই ঠিক। আর যদি দেখি ওদের মায়ের মত কষ্ট পাচ্ছে। বুঝব ধারণাটা বিলকুল ভুল।

আটটার সময়ে পৃথিবীর ঠিক আঠারো মাইল ওপরে পৌছে গেলাম। বেশ জোরেই উঠছি। ব্যালাস্ট না ফেললেও এই উচ্চতায় উঠে আসতাম-তবে একটু ধীর গতিতে। মাথার আর কানের যন্ত্রণা ফের শুরু হয়েছে, নাক দিয়ে ফের রক্ত পড়ছে-তবে আগের মত কষ্ট আর নেই। নিঃশ্বেস নিচ্ছি অবশ্য দমকে দমকে-অনেকক্ষণ পরে পরে-প্রত্যেকবার বুকের খাঁচা যেন সিঁটিয়ে উঠেই পরক্ষণেই ফুলে ফেটে যেতে চাইছে। বাতাস ঘন করার কনডেনসার বার করলাম বাক্স থেকে। আর দেরী করা সমীচীন হবে না।

আঠারো মাইল ওপর থেকে বড় সুন্দর লাগছে পৃথিবীকে। পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে সমুদ্রের যেন শেষ নেই এবং জলরাশি যেন একদম স্থির। মুহূর্তে মুহূর্তে যেন গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে নীল রঙ। অনেক দূরে পূবদিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গ্রেটবৃটেনের দ্বীপগুলো, ফ্রান্স আর স্পেনের আটলান্টিক উপকূল, আফ্রিকার সামান্য উত্তরাংশ। অট্টালিকা একটাও মালুম হচ্ছে না-মানব সভ্যতার অনেক গর্বের বড় বড় শহরগুলো যেন একেবারেই মিলিয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে।

আমি কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে। ভূগোলক যেন ফাঁপা এবং ভূপৃষ্ঠ যেন ভেতর দিকে বেঁকে ঢুকে গেছে। ভূগোলক কূর্মপৃষ্ঠবৎ হবে-এইটাই তো স্বাভাবিক। নুব্জতা আশা করা কি ভুল ? কিন্তু একটু ভাবতেই বুঝলাম যা দেখেছি সেটাই বরং চোখের ভুল। জ্যামিতির অংক অনুযায়ী দিগন্তকে মনে হচ্ছে যেন দোলনার সমান লেভেলে রয়েছে-কিন্তু ঠিক নীচে যা দেখছি তা যেন অনেক নীচে রয়েছে (এবং সত্যই তাই রয়েছে) তাই পৃথিবী পৃষ্ঠকে দেখছি বক্রোদর অবস্থায়-যেন ফাঁপা বস্তুর ভেতর পিঠ।

পায়রাগুলোর কষ্ট বেড়ে যাচ্ছে দেখে ঠিক করলাম ওদের মুক্তি দেব। একটাকে এনে বসালাম বেতের বাস্কেটের ওপর। কিন্তু নিজে থেকে উড়ে তো গেলই না বরং এমন বিকট কু-উ-উ-উ শব্দ করতে লাগল আর ইতি-উতি তাকাতে লাগল যেন উদ্বেগ আর অস্বস্তি প্রচণ্ড বেড়ে গিয়েছে-সেই সঙ্গে ঝটপট করে ঝাপটাতে লাগল ডানা। শেষ কালে আমিই ওকে মুঠোয় ধরে ছুঁড়ে দিলাম বেলুন থেকে গজ ছয়েক দূরে। ভেবেছিলাম, এবার অন্ততঃ নিচে নামবে, কিন্তু তার বদলে ভীষণ তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে অতিকষ্টে ফিরে এল দোলনায় এবং বেতের কিনারায় বসতে না বসতেই ঘাড় গুঁজে মারা গেল। ধুপ করে পড়ল দোলনার ভেতরে। দ্বিতীয়টার কপাল অত মন্দ হয়নি। যাতে না ফিরে আসতে পারে, তাই দুহাতে ধরে প্রাণপণে ছুঁড়ে দিলাম নীচের দিকে। খুশী হলাম ওর সাঁ সাঁ করে নেমে যাওয়া দেখে। প্রবল বেগে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায় পাখা নেড়ে দেখতে দেখতে চলে গেল চোখের আড়ালে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এটি জ্যান্ত ফিরতে পেরেছিল ধরাধামে। বেড়ালটি ইতিমধ্যে মরা পায়রাকে খেয়ে নিয়েছে। এক পেট খেয়ে টান টান হয়ে ঘুমের আয়োজন করছে। বাচ্চা তিনটেও দেখলাম দিব্বি আছে।

সোয়া আটটায় নিঃশ্বেস নিতে এত কষ্ট হতে লাগল যে সঙ্গে সঙ্গে কনডেনসার লাগানোর কাজে হাত দিলাম। প্রথমে একটা আবরণ দিয়ে মুড়ব বেলুন আর আমাকে-যাতে ঐ অতি পাতলা বায়ু বাইরে থাকে-আমি থাকি ভেতরে। তারপর কনডেনসার চালিয়ে ঐ পাতলা বায়ুকে ঘন করে ছেড়ে দেব আবরণের

মধ্যে-যাতে মোড়কের মধ্যে থেকে নিঃশ্বেস নিতে পারি সহজেই। এ কাজের জন্যে ভীষণ শক্ত, পুরোপুরি বায়ু নিরোধক, গাম ইলাসটিকে তৈরী একটা ব্যাগ সঙ্গে এনেছিলাম-পুরো দোলনাটাকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তার মধ্যে। থলিটাকে প্রথমে নীচে ঝোলাতে হয়। তারপর দোলনার চারপাশ দিয়ে টেনে তুলে মাথার ওপরে দড়িগুলো যেখানে পতর আর জালের সঙ্গে লাগানো সেইখানে এঁটে দিতে হয়। কিন্তু জালের গা থেকে পতর বা আংটা খুললে দোলনা ঝুলবে কিসে সে ব্যবস্থা ছিল থলির গায়ে। জাল তো পতরের গায়ে পাকাপাকিভাবে লাগানো ছিল না। কতকগুলো ফাঁস খুলে থলির খানিকটা অংশ গলিয়ে আনলাম সেই ফাঁক দিয়ে-দোলনা ঝুলতে লাগল বাকি ফাঁসগুলো থেকে। থলির মুখ ভেতরে আনবার পর ফাঁসগুলো এঁটে দিলাম থলির কাপড়ের গায়ে লাগানো কয়েকটা বোতামে-কেননা মাঝে কাপড় থাকায় পতরের গায়ে ফাঁস লাগানো আর সম্ভব নয়। এবার খুললাম অন্যদিকের বাকী ফাঁসগুলো-একইভাবে থলি ভেতরে টেনে এনে বোতামের সঙ্গে এঁটে দিলাম ফাঁস। অর্থাৎ গোটা দোলনাটা ঝুলতে লাগল সারি সারি বোতামের গায়ে। পতরটা ঝুলে পড়ে রইল দোলনার ভেতরে। মনে হতে পারে কাজটা খুব নিরাপদ নয়। বোতাম যদি ছিঁড়ে যায়? কিন্তু তা সম্ভব নয় কোনমতেই। বোতামগুলো সাধারণ বোতাম নয়, বিশেষ ভাবে তৈরী এবং পাশাপাশি বসানো। আমার যন্ত্রপাতির আর দোলনায় ওজন যদি তিনগুণও হত, বোতাম ছিঁড়ত না। কয়েকটা ছিঁড়ে গেলেও বাকীগুলোর ওপর দোলনাকে ঝুলিয়ে রাখত।

এবার হাত দিলাম শেষ পর্বে। পতরটাকে তুলে মাথার ওপর যেখানে ছিল সেখানে রাখলাম-তিনটে কাঠের খুঁটির ঠেকা দিয়ে আটকে রাখলাম বেলুনের তলার দিক আর জালের অংশ আটকে রইল সেখানে। সবশেষে থলির মুখ বেশ করে ভাঁজ করে ক ষ এঁটে বেঁধে দিলাম।

শক্ত, মজবুত, নমনীয় আবরণ মুড়ে রইল দোলনাকে তলায়, পাশে, ওপরে। তিনটে গোলাকার পুরু কাঁচের জানলা লাগানো ছিল থলির পাশে-যাতে ভেতরে থেকেই বাইরে দৃশ্য দেখতে পাই। আর একটা জানলা ছিল পায়ের তলায় থলির গায়ে-দোলনার তলাও কেটে গোল করে রাখা হয়েছিল সেই জন্যে। ফলে, নীচের দৃশ্য দেখতে পাব। পাব না খালি মাথার ওপরকার দৃশ্য দেখতে। সেখানে কাপড় এত কুঁচকে রয়েছে, জানলা বসানো সম্ভব নয়। বসালেও বেলুন থাকার জন্যে কিছুই দেখতে পেতাম না।

পাশের একটা জানলার এক ফুট নীচে তিন ইঞ্চি ব্যাসের একটা গোলাকার ফুটো ছিল। ফুটোর গায়ে পেতলের আংটা এমনভাবে লাগানো যাতে ভেতর থেকে পেঁচিয়ে ইস্‌কুরুপ এঁটে

রাখা যায়। এই ফুটো দিয়ে কনডেনসার বাইরের পাতলা বাতাস টেনে এনে ঘনীভূত করবে আবরণের মধ্যে-মেশিন থাকবে ভেতরে। কিন্তু ঐটুকু বন্ধ জায়গায় ফুসফুস থেকে ছেড়ে দেওয়া দূষিত বাতাস বেশী জমা হলে মুস্কিল। তার জন্যে পায়ের তলায় দোলনায় ছোট ফুটো রাখা হয়েছিল। দূষিত বায়ু ওজনে ভারী-আপনা আপনি ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যাবে বাইরে। একটা ভাল্‌ভ্‌ লাগানো ছিল সেই ফুটোয়। সেকেণ্ড কয়েকের জন্যে ভাল্‌ভ্‌টা খুলেই ফের বন্ধ করে দিতাম-সব হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ বায়ু শূন্য হওয়ার আগেই বন্ধ করে দিতাম। তারপর যতটা হাওয়া বেরিয়েছে, ততটা হাওয়া কনডেনসারের পাম্পের দু'এক ধাক্কাতেই তৈরী হয়ে যেত। ফের ভাল্‌ভ্‌ খুলতাম সেকেণ্ড কয়েকের জন্য।

এক্সপেরিমেণ্টের শুরুতেই বাচ্চা তিনটে সমেত বেড়ালটিকে খাঁচায় করে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম জানলার তলায় বাইরের দিকে। ভাল্‌ভ্‌ দিয়ে হাত বাড়িয়ে খাঁচা গলিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম একটা বোতামের সঙ্গে। ঘন বাতাস থলির ভেতর জমা হতেই গাম-ইলাসটিকের ব্যাগ ফুলে বেশ বড় হয়ে উঠল। ভাল্‌ভ্‌ দিয়ে হাত বাড়িয়ে খাওয়াতেও কোন অসুবিধে হত না। ওদের ওখানে রেখেছিলাম পাতলা বাতাসের প্রতিক্রিয়া ওদের ওপর দিয়ে পরখ করার জন্যে।

নটা বাজতে দশ মিনিটের মধ্যেই হয়ে গেল এত কাজ। ম্যাজিকের মত মিলিয়ে গেল সব কষ্ট। ঘণ্টা দুয়েক কি কষ্টই না পেয়েছি-এখন বুঝলাম সবটাই নিঃশ্বাস ঘটিত। রাগ হল নিজের ওপর যেচে কষ্ট ভোগ করার জন্যে। মরতে পর্যন্ত বসেছিলাম নিজের গাফিলতির জন্যে। থলিটা আগেই খাটিয়ে ফেলা উচিত ছিল। ফেলে রাখা ঠিক হয়নি। আবিষ্কারটার সুফল পেলাম হাতে হাতে। প্রচণ্ড ব্যথা বেদনা তিরোহিত হল। মাথায় সামান্য অসোয়াস্তি, হাতের কব্‌জি, পায়ের গাঁট আর গলার কাছটা সামান্য ফুলে থাকার ভাব ছাড়া কিছুই আর টের পেলাম না।

নটা বাজার কুড়ি মিনিট আগে, মানে, চেম্বারের মুখ বন্ধ করার আগে, ব্যারোমিটার দেখেছিলাম। উচ্চতা তখন ছিল ১,৩২,০০০ ফুট অর্থাৎ পঁচিশ মাইল। নটার সময়ে পূব দিকের জমি-টমি আর দেখা গেল না। সমুদ্র আগের মতই ভেতর দিকে বক্র-পৃষ্ঠ হয়ে রইল। মাঝে মাঝে দৃষ্টি আড়াল করে উড়ে গেল মেঘের তাল।

সাড়ে নটায় ভালভের মধ্য দিয়ে এক মুঠো পালক উড়িয়ে দিলাম। ভেবে ছিলাম ভেসে থাকবে। ঘটল ঠিক তার উল্টো। বন্দুকের বুলেটের মত সব কটা পালকই একসাথে সাঁৎ করে চলে গেল চোখের আড়ালে-নীচে। ঘাবড়ে গেলাম। ব্যাপার কি?

বেলুন কি হঠাৎ নক্ষত্রবেগে ওপরে উঠছে ? পালকগুলো এত গতিবেগ পেল কিসে ? তার পরেই বুঝলাম রহস্যটা। বাতাস এখানে এতই পাতলা যে পালকদের ভাসিয়ে রাখার ক্ষমতাও নেই। তাই লোহার মত টুপ করে খসে পড়ল পালকের দল-আমি ওপরে উঠছি বলে পালকের পতন বেগ দ্বিগুণ মনে হল আমার চোখে।

দশটা নাগাদ দেখলাম হাতে আর কাজ নেই। মনে হচ্ছিল খুব দ্রুত উঠছি-কিন্তু গতিকে মাপবার উপায় ছিল না। রোটারড্যাম থেকে বেরিয়ে ইস্তক এত তরতাজা শরীর মন এর আগে কখনো অনুভব করিনি। ফুর্তির চোটে যন্ত্রপাতিগুলো ঠিক আছে কিনা একবার দেখে নিলাম। তারপর চেম্বারের হাওয়াকে আবার টাটকা করে রাখলাম। স্থির করলাম, চল্লিশ মিনিট অন্তর এই কাজটি আমাকে করতে হবে-শুধু আমার সাধের প্রাণটিকে টিঁকিয়ে রাখার জন্যে। মাঝখানের সময়টুকু আকাশ পাতাল কপোলকল্পনা নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলাম। আষাঢ়ে কল্পনার রাশ একবার আলগা দিলে আর রক্ষে নেই। চাঁদ নিয়ে কত উদ্ভট কাহিনীই না শুনেছি। সে জায়গা নাকি যেমন বন্য, তেমনি স্বপ্নিল। ছায়াময় রহস্যধূসর চন্দ্রপৃষ্ঠে গিয়ে কি দেখব কে জানে। বিশাল জঙ্গল ? সুগভীর খাদ ? জলপ্রপাতের বজ্রনাদ ? নাকি, পপিফুল ছাওয়া বিস্তীর্ণ প্রান্তর, লিলিফুলের মত কুসুমাস্তীর্ণ দিগন্ত জোড়া বাগান, নির্জন নিস্তব্দ নিথর পরিবেশ ? অথবা হয়ত দেখব বিপুল সরোবর-কিনারা ঘিরে মেঘের লুটোপুটি। সুন্দর কল্পনার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছিল চন্দ্র পৃষ্ঠের ভয়াবহ সম্ভাবনাগুলো। শিউরে উঠছিলাম সেই সব কল্পনায়। এ সবের মধ্যেও ভাবতে হচ্ছিল যাত্রা পথের বিপদগুলো।

বিকেল পাঁচটার সময়ে বাতাস টাটকা রাখার কাজ করতে করতে ভালভ দিয়ে উঁকি দিলাম তিন বাচ্চা সমেত বেড়ালটার পানে। মা বেড়াল বেশ কষ্ট পাচ্ছে দেখলাম-নিশ্চয় নিঃশ্বেস নিতে পারছে না। কিন্তু বাচ্চাদের নিয়ে আমার এক্সপেরিমেণ্ট সফল হয়েছে আশ্চর্যভাবে। ভেবেছিলাম, মায়ের মত অতটা না হোক, একটু কষ্ট হবে বাচ্চাগুলোর-সইয়ে নিতে পারবে। কিন্তু ওদের এরকম বহাল তবিয়তে দেখব আশা করিনি। বাস্কেটের মধ্যে পরমানন্দে খেলছে তিনটিতে। ব্যথাবেদনার চিহ্ন মাত্র নেই। তার মানে আগে যা ভেবেছিলাম, তা ভুল। পাতলা বাতাসের রাসায়নিক উপাদান জীবনের পক্ষে অনুপযুক্ত-এটা ঠিক নয়। ঐ পরিবেশে মানুষ জন্মালে সে কিছুই টের পাবে না-অভ্যস্ত হয়ে যাবে। বরঞ্চ তাকে পৃথিবীর ওপর ঘন বাতাসের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেলেই অসহ্য কষ্ট পাবে-যে কষ্ট কিছুক্ষণ আগে আমি পেয়েছি। ঠিক এই সময়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটায় বেড়াল পরিবারকে হারাতে হল এবং চিরকালের মত দুঃখ থেকে গেল এরকম একটা

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে আরো তলিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম বলে। ভালভের মধ্য দিয়ে হাত ঢুকিয়ে এক কাপ জল খাওয়াচ্ছিলাম মা বেড়ালকে। যে ফাঁসে ঝুলছিল বেতের ঝুড়িটা, আমার জামার হাতা তাতে আটকে যাওয়ায় ঝুড়িটা ফস করে খুলে গেল বোতাম থেকে। অদৃশ্য হলেও বোধ হয় এত তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যেতে দেখতাম না ঝুড়িটা। এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগও লাগল কিনা সন্দেহ, বেড়াল-টেরাল সমেত ঝুড়িটা সাঁ করে চলে গেল চোখের আড়ালে। শুভেচ্ছা জানালাম। কিন্তু মনে মনে বুঝলাম, আয়ু ওদের ফুরিয়ে এসেছে।

ছ-টার সময়ে পুবদিকের বেশ খানিকটা ভূপৃষ্ঠ ছায়ায় ঢেকে গেল। দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল ছায়াটা। সাতটা বাজবার পাঁচ মিনিট আগে দেখলাম রাতের অন্ধকার গ্রাস করেছে ভূপৃষ্ঠের যে টুকু দেখা যাচ্ছে সেই টুকু। এর পরেও অনেকক্ষণ ধরে অস্তগামী সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে রইল আমার বেলুন এবং বড় আনন্দ হল তাই দেখে। বুঝলাম, কাল সকালে ভোরের আলোও এইভাবে রাঙিয়ে রাখবে আমাকে রোটারড্যামের বাসিন্দাদের চোখে তা পৌঁছোনোর আগেই। যত ওপরে উঠব, সূর্যকে দেখব তত বেশী। এখন থেকে ঠিক করলাম চব্বিশঘণ্টার হিসেবে ডাইরি লিখব-রাতের অন্ধকারের অভিজ্ঞতাও বাদ দেব না।

রাত দশটা বাজতে ঘুম পেল। কিন্তু ঘুমোতে গিয়ে দেখি একটা ঝামেলার ব্যাপার আগে ভাবা হয়নি। যদি ঘুমোই, চল্লিশ মিনিট অন্তর চেম্বারের বাতাস টাটকা রাখবে কে? একঘণ্টা পর্যন্ত নিঃশ্বেস নেওয়া যাবে, কিন্তু টেনে টুনে সওয়া একঘণ্টা পর্যন্ত কোনমতে চালালে প্রাণটাকে টিঁকিয়ে রাখা যাবে না। মহা সমস্যায় পড়লাম। এত ঝক্কি এত ঝামেলা পেরিয়ে আসার পর এই একটি ব্যাপারের সুরাহা করতে না পেরে পৃথিবীতে নেমে যাওয়াও তো সম্ভব নয়। ভেবে দেখলাম, মানুষ মাত্রেই অভ্যেসের দাস। দৈনন্দিন জীবন ধারণে যে সব ব্যাপারগুলো অপরিহার্য মনে হয়-আসলে সেগুলো অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। না ঘুমিয়ে থাকতে পারব না ঠিকই, কিন্তু চল্লিশ মিনিট অন্তর ঘুম থেকে উঠতে পারব। বাতাস টাটকা করতে লাগবে বড় জোর পাঁচ মিনিট-ঝামেলা তো কেবল চল্লিশ মিনিট অন্তর ঘুম ভাঙানোর সমস্যাটা নিয়ে। সমস্যাটা নিয়ে অবশ্য খুব একটা মাথা ঘামাতে হয় নি। একজন ঘুম কাতুরে ছাত্র নাকি রাত জাগার জন্যে এক হাতে একটা পেতলের বল ঝুলিয়ে পড়তে বসত। ঢুলুনি আরম্ভ হলেই পেতলের বল ঠন্ করে গিয়ে পড়ত নীচে রাখা ধাতুর গামলায়। তবে আমার সমস্যাটা একটু অন্য রকমের। আমি ঘুমোতে চাই-জেগে থাকতে চাই না-জাগতে চাই ঠিক চল্লিশ মিনিট অথবা ষাট মিনিট বাদে বাদে। ভাবতে

ভাবতে সমস্যাটার এমন একটা মৌলিক সমাধান করলাম যা আবিষ্কার হিসাবে স্টীম ইঞ্জিন, দূরবীন, ছাপাখানার চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বেলুন স্বচ্ছন্দভাবে সোজা উঠছিল বলে দোলনা একটুও দুলছিল না। ওপরে উঠছি বলে মনেই হচ্ছিল না। আমিও তাই চাইছিলাম। দু-গাছি দড়ি নিয়ে পাশাপাশি সমান্তরালভাবে বাঁধলাম বেতের গায়ে দোলনার এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত আড়াআড়ি ভাবে-ঠিক যেন একটা তাক হল। দড়ির তাক। দোলনার মেঝে থেকে চার ফুট আট ইঞ্চি ওপরে রইল এক দড়ির তাক। তার আট ইঞ্চি নীচে, মানে, মেঝে থেকে চার ফুট ওপরে পাতলা কাঠ দিয়ে বানালাম আর একটা তাক। এবার বার করলাম জলের পিপে। পাঁচ গ্যালন জল ভর্তি পিপে অনেকগুলো তুলেছিলাম দোলনায়। একটা বার করে শুইয়ে রাখলাম দড়ির তাকে। ঠিক নীচে রাখলাম একটা গাড়ু-কাঠের তাকে শোয়ানো পিপের মুখে একটা ফুটো করলাম। একটা কাঠের ছিপি আটকালাম সেই ফুটোয়। কিন্তু ছিপির মধ্যেই রইল সরু একটা ছেঁদা। ছিপিটা এমন ভাবে এঁটে রাখলাম পিপের ফুটোয় যাতে গাড়ু ভর্তি হতে সময় লাগে ঠিক ষাট মিনিট। সরু জল পড়ছিল ছিপির ছেঁদা দিয়ে। বার কয়েক চেষ্টা করতেই দেখলাম গাড়ু ভর্তি হতে ষাট মিনিট লাগছে। ভর্তি হয়ে গেলেই গাড়ুর বাড়তি জল নল দিয়ে বেরিয়ে নীচে পড়ছে। যেখানে পড়ছে, মেঝের ঠিক সেই জায়গায় আমার বালিশ রাখলাম এবং শুয়ে পড়লাম। চারফুট উঁচু থেকে জলের ধারা মাথা মুখে পড়লে মোষের ঘুমও ভাঙতে বাধ্য! হলও তাই। ঠিক ষাট মিনিট অন্তর ঘুম ভাঙল আমার। উঠে পড়ে গাড়ুর জল পিপেতে ঢেলে দিয়ে বাতাস টাটকা করে নিলাম মিনিট পাঁচেকের মধ্যে। ঘুমোলাম সঙ্গে সঙ্গে। এইভাবে ঘণ্টায় ঘণ্টায় উঠেও ঘুমটা হল জব্বর। সকাল বেলা যখন উঠলাম, তখন সূর্য অনেক আগেই দিগন্ত ছাড়িয়ে উঠে এসেছে এবং ঘড়িতে বাজে সাতটা।

তেসরা এপ্রিল। বেলুন বেশ উপরে উঠেছে। ভূপৃষ্ঠ আর অবতল মনে হচ্ছে না-বেশ উত্তল। পায়ের তলায় সমুদ্রে কয়েকটা কালো ফুটকি দেখছি-নিঃসন্দেহে দ্বীপ। মাথায় ওপরে কুচকুচে কালো আকাশে তারাগুলো দারুণ ঝকঝক করছে। অনেক উত্তরে দিগন্তের কাছাকাছি একটা রীতিমত উজ্জ্বল বা সাদা রেখা দেখতে পাচ্ছি-মেরু সমুদ্রের দক্ষিণাঞ্চলের বরফ নিশ্চয়। খুব কৌতূহল হল আরও উত্তর দিকে সরে যাওয়ার-তাহলে অজ্ঞাত মেরু অঞ্চল দু চোখ ভরে দেখা যেত।

সারাদিনে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটল না। যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক চলছে, বেলুন দুলছে না, সোজা উঠছে। কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে,

ওভার কোট পড়তে বাধ্য হয়েছি। পৃথিবীতে অন্ধকার নামতেই আমি বিছানা পাতলাম-যদিও দিনের আলো অনেকক্ষণ ঘিরে রইল বেলুনকে। জল-ঘড়ি ভাল ডিউটি করছে-ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঠিক তুলে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও ভাল ঘুমিয়েছি।

চৌঠা এপ্রিল। শরীর বেশ ঝরঝরে। সমুদ্রের আশ্চর্য পরিবর্তন দেখে অবাক লাগছে। ঘন নীল রঙ আর নেই এখন-ধূসর সাদাটে এবং চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে দারুণ ঔজ্জ্বল্যে। পৃথিবী এবং সমুদ্র এখন এমনই উত্তল যে দিগন্তের কাছে গিয়ে সাগরের জল যেন গোঁৎ খেয়ে খাদে পড়েছে। জল প্রপাতের শব্দটা কেবল শোনা যাচ্ছে না। অনেক ওপরে উঠেছি বলেই বোধ হয় দ্বীপগুলো আর দেখা যাচ্ছে না। উত্তর দিকের বরফ রেখা ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে। ঠাণ্ডার কামড় আর তত কাহিল করছে না। গুরুত্বপূর্ণ তেমন কিছু ঘটেনি সারাদিনে-বই পড়ে সময় কাটিয়েছি।

পাঁচুই এপ্রিল। সারা পৃথিবী যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন দেখলাম সূর্যোদয়ের অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য। আলো ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীতে। উত্তরে বরফ আরো স্পষ্ট পুবে আর পশ্চিমে যেন টুকরো জমি দেখতে পাচ্ছি। সকাল সকাল ঘুমোচ্ছি আজ।

ছউই এপ্রিল। বরফ আরো এগিয়ে এসেছে। ক্রমশঃ উত্তর মেরুর দিকে সরে যাচ্ছে বেলুন। এইভাবে আর কিছুক্ষণ গেলে তুহিন জমাট সমুদ্র দেখতে পাব। ভয় হচ্ছে রাতের অন্ধকারে উত্তর মেরু বেলুনের তলা দিয়ে বেরিয়ে যাবে না তো?

সাতুই এপ্রিল। খুব ভোরে উঠেছি। পায়ের তলায় উত্তর মেরু দেখে কি আনন্দই না হচ্ছে। কিন্তু এত ওপরে উঠেছি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। হিসেব মত সমুদ্রের ৭২৫৪ মাইল ওপরে পৌঁচেছে বেলুন। দূরত্বটা বেশী মনে হলেও নির্ভুল কিনা সন্দেহ আছে। আন্দাজে করা কিনা। সে যাই হোক, পুরো উত্তর গোলার্ধ এখন পায়ের তলায় দেখতে পাচ্ছি। বিষুব রেখা বলয়াকারে এখন দিগন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতদূর থেকে স্পষ্ট কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মানুষ উত্তর মেরুর যে পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছে, সেই বরফ-বলয়ের ভেতর থেকে সাদা বরফ যেন চাদরের মত পাতা মনে হচ্ছে। ছায়াময় প্রান্তর দেখা যাচ্ছে-মাঝে মাঝে অন্ধকার। দুপুর বারোটার সময়ে মাঝখানের বৃত্তাকার কেন্দ্রের পরিধি আরো ছোট হয়ে এল। সন্ধ্যে সাতটায় অদৃশ্য হয়ে গেল। বেলুন পশ্চিমের বরফ পেরিয়ে এসে উড়ে চলল বিষুবরেখার দিকে।

আটুই এপ্রিল। পৃথিবীর ব্যাস যেন দারুণ কমে গিয়েছে মনে হচ্ছে। রঙ আর চেহারাও পাল্টেছে। যতদূর দেখা যাচ্ছে, কেবলই ফিকে হলুদের বাহার-মাঝে মাঝে তা এত উজ্জ্বল যে

চোখ ধাঁধিয়ে যায়। হলুদ রঙ সব জায়গায় এক রকম নয়-কমেছে বা বেড়েছে, মেঘ এসে দৃষ্টিপথ অবরোধ করায় ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে পৃথিবীর চেহারা। গত দুদিন ধরে এই অসুবিধাটা চোখকে পীড়া দিচ্ছে। কিন্তু আমি নিরুপায়। যতই ওপরে উঠছি ততই বিক্ষিপ্ত বাষ্প-পিণ্ডগুলো মনে হচ্ছে যেন কাছাকাছি জড়ো হচ্ছে। তা সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছে নর্থ আমেরিকার বিপুল হ্রদগুলোর ওপর দিয়ে চলেছি-চলেছি দক্ষিণে, বিষুব অঞ্চল অভিমুখে। খুব ভাল। আগের পথ ধরে চলতে থাকলে চাঁদে কোনকালেই পৌঁছোতাম না। কেননা চাঁদের কক্ষ পথ উপবৃত্তের সঙ্গে মাত্র ৫ ডিগ্রী ৮ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ড কোণে অবস্থিত। দেরীতে হলেও ঠিক এই সময়ে খেয়াল হল কি ভুলই করেছি আমি। চান্দ্র-উপবৃত্তের সমতল ক্ষেত্র যেখানে পৃথিবীকে ছোঁয় সেই জায়গার কোথাও থেকে রওনা না হয়ে।

নউই এপ্রিল। পৃথিবীর ব্যাস আজ আরো কমে গেছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভূপৃষ্ঠ আরো বেশী হলুদ মনে হচ্ছে। দক্ষিণ দিকে সোজা উড়ে চলেছে বেলুন। রাত নটায় পৌঁছোলো মেক্সিকো উপসাগরের উত্তর প্রান্তে।

দশই এপ্রিল। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড পট পট শব্দে ভোর পাঁচটায় ঘুম ছুটে গেল। বুঝলাম না আওয়াজটা কিসের! আওয়াজটা হয়েই বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এরকম বিশ্রী শব্দ এর আগে কখনো শুনিনি। মনটা বড় উদ্বিগ্ন হল। বেলুন ফাটল না তো? যন্ত্রপাতি নেড়ে চেড়ে দেখলাম সব ঠিক আছে। সারাদিন ভেবে ভেবেই গেল-কারণ ধরতে পারিনি। ঘুমোতে যাচ্ছি ভয়ে কাঁটা হয়ে-না জানি কি বিপদ ঘটে গেল।

বারই এপ্রিল। চমকপ্রদ মোড় নিয়েছে বেলুন। খুব খুশী হয়েছি, যেমনটি ভেবেছিলাম তাই হয়েছে। আগের পথে যেতে যেতে দক্ষিণ অক্ষাংশের বিংশতিতম সমান্তরালে গিয়ে আচমকা ঘুরে গিয়েছি পূর্বদিকে। সারাদিন ধরে চলেছে চান্দ্র উপবৃত্তের সমতল ক্ষেত্র বরাবর। দোলনা খুব দুলছে হঠাৎ মোড় নেওয়ায়।

তেরোই এপ্রিল। আবার সেই প্রচণ্ড পট পট শব্দ শুনলাম। অনেক ভাবলাম-রহস্য ভেদ করতে পারলাম না। পঁচিশ ডিগ্রী কোণে পৃথিবীকে দেখা যাচ্ছে-ব্যাস দারুণ কমে আসছে। চাঁদ ঠিক মাথার ওপর এসে যাওয়ায় দেখা যাচ্ছে না। চান্দ্র উপবৃত্তের সমতল ক্ষেত্রেই রয়েছি-পূবে এগিয়েছি যৎসামান্য।

চোদ্দই এপ্রিল। পৃথিবীর ব্যাস খুব দ্রুত কমছে। বেশ বুঝেছি চাঁদ পৃথিবীর সব চাইতে কাছে যেখানে আসে-বেলুন সোজা উড়ে চলেছে সেইদিকে-অ্যাপসাইড লাইন বরাবর পেরিজির দিকে। চাঁদ ঠিক মাথার ওপর দেখা যাচ্ছে না। খুব মেহনৎ হচ্ছে বাতাস ঘন রাখতে।

পনেরোই এপ্রিল। পৃথিবীর কোনো মহাদেশ বা মহাসমুদ্রকেই আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। বারোটার সময়ে আবার শিউরে উঠলাম সেই প্রচণ্ড পট পট শব্দটা নতুন করে শুনে। এবার আর কিন্তু আওয়াজটা অল্পে থামল না–চলল বেশ কিছুক্ষণ ধরে এবং বেড়েই চলল। ভয়ে উদ্বেগে সিঁটিয়ে রইলাম। ধ্বংসের বোধ হয় আর দেরী নেই। কিন্তু ধ্বংসটা আসছে কোনদিক দিয়ে সেটাই তো ঠাহর করতে পারছি না। অনেকক্ষণ এই ভাবে থাকবার পর আচমকা প্রচণ্ড জ্বলন্ত বিরাট বিপুল লেলিহান অগ্নিশিখাময় একটা বস্তু হাজারটা বাজ পড়ার মত ভয়ংকর গর্জন করতে করতে সাঁ করে বেরিয়ে গেল বেলুনের পাশ দিয়ে। অনুমান করলাম, চাঁদের বুকে নিশ্চয় অগ্ন্যুৎপাত চলছে। এই মাত্র যা ছিটকে গেল পাশ দিয়ে, পৃথিবীর আকাশ দিয়ে তা যখন জ্বলতে জ্বলতে ভূপৃষ্ঠে আছড়ে পড়বে, তখন তার নাম হবে উল্কা।

ষোলই এপ্রিল। আজ পাশের তিনটে জানলা দিয়ে তাকিয়ে চাঁদের চাকার মত চেহারা দেখলাম। বিরাট বেলুনের চারপাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে। ভীষণ উত্তেজিত হয়েছি। আর কি, চাঁদ তো এসে গেল। কনডেনসার নিয়ে এত খাটতে হচ্ছে যে বলবার নয়। একটুও জিরোতে পারছি না। ঘুমের প্রশ্নই আর ওঠে না। মানুষের কাঠামো এত ধকল সইতে পারে না। আমিও কাহিল হয়ে পড়েছি। শরীর ভেঙে পড়েছে। হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়েআর একটা গনগনে উল্কা পাথর ছুটে গেল পাশ দিয়ে। তারপর থেকেই উল্কা দেখতে লাগলাম ঘনঘন। ভয় হচ্ছে–বেলুনে না লাগে।

সতেরোই এপ্রিল। অভিযানের মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছিল আজ। তেরোই ডাইরিতে লিখেছিলাম পৃথিবীকে পঁচিশ ডিগ্রী কোণে দেখা যাচ্ছে। ক্রমশঃই তা কমছিল। ষোলই রাত্রে শোয়ার আগে দেখেছিলাম সাত ডিগ্রী পনেরো মিনিট। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল পায়ের তলায় জমির পরিমাণ বেড়ে যাওয়া দেখে। উনচল্লিশ ডিগ্রী কৌণিক ব্যাসের কম নয়। মাথায় বাজ পড়লেও এরকম আঁৎকে উঠলাম না। সর্বনাশ হয়েছে। বেলুন তাহলে সত্যিই ফেটে গিয়েছে। ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। হাঁটু কাঁপতে লাগল। দাঁতে দাঁত ঠোকাঠুকি লাগল, মাথার চুল দাঁড়িয়ে গেল! বেলুন তাহলে সত্যি সত্যিই ফেটে চৌচির হয়ে গেল। প্রথমেই যে ভাবনাটা ধেয়ে এল মনের মধ্যে, তা এই–বেলুন নিশ্চয় ফেটেছে! ভীষণ বেগে পৃথিবীর দিকে নেমে গিয়েছি। এত খানি পথ তাই এত অল্প সময়ের মধ্যে পেরিয়ে এসেছি এবং এই গতিবেগে পড়তে থাকলে, পৃথিবীর ওপর আছড়ে পড়ব খুব জোর আর মিনিট দশেকের মধ্যেই! আতংকে কাঠ হয়ে প্রথম-প্রথম এই সব কথা ভাববার পর মনটা হাল্কা হয়ে এল একটু তলিয়ে ভাবতেই। সত্যিই কি

পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছি ? সন্দেহ হল মনে। অসম্ভব। তা ছাড়া যে গতিবেগে পায়ের তলার দিকে নামছি, তা আগে যা মনে করেছিলাম মোটেই তার সঙ্গে খাপ খায় না। মনটা একটু থিতিয়ে আসতেই মাথাটা পরিষ্কার হয়ে এল-বিস্ময়ের চমকটা কেটে যেতেই যুক্তিবুদ্ধি ফিরে এল। অমন আঁতকে না উঠলে পায়ের তলায় যে জমি দেখছি, তার সঙ্গে আমার মা পৃথিবীর তফাৎটা নজরে পড়ত। পৃথিবী এখন আমার মাথার ওপর-বিশালাকার বেলুনের আড়ালে দেখাই যাচ্ছে না। চাঁদ এসেছে পায়ের তলায় !

ব্যাপারটা হয়েছে কি, ঘুমের মধ্যেই বেলুন ঘুরে গিয়েছে। মাথা পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে পা চাঁদের দিকে নামিয়েছে। এমনটি যে হবে, তা হিসেবের মধ্যেই ছিল। এমন একটা সময় আসবে যখন পৃথিবীর আকর্ষণ বেলুনের ওপর কমে আসবে, চাঁদের আকর্ষণ বাড়বে। আরও সোজা করে বললে, বেলুনের মাধ্যাকর্ষণ যেখানে পৌঁছোলে পৃথিবীর প্রতি কমে যাবে-কিন্তু চাঁদের প্রতি বাড়বে-সে জায়গাটা ঘুমের সময়ে পেরিয়ে এসেছি। বেলুন নিশ্চয় বোঁ করে ঘুরে যায়নি-আস্তে আস্তে ঘুরেছে। কিন্তু ঘুম থেকে উঠলে মানুষ মাত্রেরই বুদ্ধি টুদ্ধি একটু ধোঁয়াটে থাকে। আমিও তাই খামোকা আঁৎকে উঠে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে শুরু করেছিলাম মৃত্যু আসন্ন জেনে।

মনটা ঠাণ্ডা হতেই চাঁদের চেহারা নিয়ে তন্ময় হলাম। ঠিক যেন একটা খোলা ম্যাপের মত পায়ের তলায় দেখছি চাঁদকে। যদিও দূরত্ব এখনো অনেক-কিন্তু আশ্চর্যরকমের স্পষ্ট দেখছি সব কিছুই। কারণটা আমার বুদ্ধিতে কুলোলো না। চাঁদের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সত্যিই বিস্ময়কর। সমুদ্র কি মহাসমুদ্র, নদী বা হ্রদ, এমন কি ছিটেফোঁটা জল পর্যন্ত কোথাও নেই। তবে বিস্তীর্ণ জায়গায় পলিমাটি রয়েছে বলে মনে হল। আর রয়েছে আগ্নেয় পাহাড়। অসংখ্য পাহাড়। চূড়াগুলো শঙ্কুর মত ছুঁচোলো-যেন প্রকৃতির হাতে গড়া নয়-কৃত্রিম। আশ্চর্য, তাই নয় ? মাননীয় মহাশয়দের বলব, দয়া করে তাঁরা যেন ম্যাপ খুলে ক্যাম্পি ক্লিগ্রের আগুন পাহাড়ের জেলাটা দেখে নেন-তাহলেই খানিকটা ধারণা করতে পারবেন। বেশির ভাগ আগ্নেগিরিই কিন্তু আগুন বমি করে চলেছে। ভীমবেগে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে জ্বলন্ত পাথর এবং আগের চাইতে অনেক বেশী পরিমাণে ছুটে আসছে বেলুনের দিকে। ভুল করে এই সব পাথরকেই পৃথিবীতে আমরা বলি উল্কাপিণ্ড।

আঠারোই এপ্রিল। আজ চাঁদের আকার দারুণ বেড়ে গেছে। পতন বেগও বৃদ্ধি পেয়েছে-ভয় করছে খুব। মনে আছে নিশ্চয় চন্দ্রাভিযানের শুরুতে আমার দূরদর্শন শুনিয়েছিলাম আপনাদের। তখন বলেছিলাম, যে যাই বলুক, চাঁদে বাতাস নেই

আমি মানি না। চাঁদের আয়তনের অনুপাতে ঘন বাতাস নিশ্চয় চাঁদের কাছেই আছে। Encke-এর ধূমকেতু আর জোডিয়াক তার প্রমাণ। এ ছাড়াও লিলিয়েন থেলের মিঃ স্ক্রোটার আমার এই তত্ত্বের সমর্থন জুগিয়েছেন। শশীকলার বয়স যখন মাত্র আড়াই দিন, তখন থেকেই সূর্যাস্ত হলেই চাঁদের দিকে চেয়ে থাকতাম-যতক্ষণ না চাঁদের অন্ধকার অংশটা দৃশ্যমান হয়। ছুঁচোলো অগ্রভাগ দুটো আগে স্পষ্ট হয়ে উঠত সূর্যরশ্মি প্রতিসরণের জন্যে-অন্ধকার অংশ দেখা যেত পরে। তার একটু পরেই আলোকিত হয়ে উঠত অন্ধকার অংশটুকু। আমার হিসেব অনুযায়ী, অর্ধবৃত্ত ছাড়িয়ে এগিয়ে আসা ছুঁচোলো অগ্রভাগ দুটি আগেভাগে আলোকিত হওয়ার একমাত্র কারণ চাঁদে বাতাস আছে। চন্দ্রপৃষ্ঠের কত ওপর পর্যন্ত বায়ুস্তর ঘনীভূত আকারে আছে, সে অংকও করেছিলাম। (এই বায়ুস্তর থেকেই সূর্যরশ্মি প্রতিসরিত হয়ে গোধূলির সৃষ্টি করে এবং সেই গোধূলির আলো পৃথিবীপৃষ্ঠে গোধূলির চাইতে অনেক প্রদীপ্ত-যখন চাঁদ পূর্ণচন্দ্র থেকে ৩২ ডিগ্রী কোণে অবস্থিত থাকে)। দেখেছিলাম, প্যারিস ফুট অনুযায়ী এর উচ্চতা ১৩৫৬ ফুট; সেই হিসেবে সর্বোচ্চ যে উচ্চতায় চন্দ্রবায়ু সূর্যরশ্মি প্রতিসরিত করতে পারে, তা হল ৫৩৭৬ ফুট। দার্শনিক চিন্তার বিরাশিতম খণ্ডেও সমর্থন পেয়েছি আমার এই তত্ত্বের, সেখানে লেখা আছে, বৃহস্পতির উপগ্রহদের গ্রহণ থাকলে তৃতীয় উপগ্রহটা এক কি দু-মিনিট অস্পষ্ট থাকার পর অদৃশ্য হয়ে যায় এবং চতুর্থটা অস্পষ্টই থেকে যায় ছুঁচোলো অগ্রভাগের কাছে।

নিরাপদে চাঁদের পিঠে নামতে গেলে চাঁদের বাতাসের ওপর নির্ভর আমাকে করতেই হবে-যে রকম ঘন বাতাস মনে মনে কল্পনা করেছি, সে রকমটি না থাকলে বিপদে পড়বই। ঘাটে এসে কি তরী ডুববে? এত পথ নির্বিঘ্নে এসে শেষ পর্যন্ত কি চাঁদের এবড়ো খেবড়ো পিঠে আছড়ে পড়ে মরতে হবে? এ হেন আতংকের কারণ ছিল বই কি। চাঁদ আর বেশী দূরে নেই। কিন্তু কনডেনসার চালাতে এখনো কালঘাম ছুটে যাচ্ছে-মেহনৎ এতটুকু কমেনি। তার মানে, চাঁদের বাতাস যে রকম ঘন হবে ভেবেছিলাম, তা নয়।

উনিশে এপ্রিল। আজ আমার বড় আনন্দের দিন। নটা নাগাদ, চাঁদ যখন ভীষণ ভাবে কাছে এগিয়ে এসেছে এবং ভয়ে আমার বুক ঢিপঢিপ করছে-ঠিক তখন আচমকা কনডেনসারের পাম্পের কাজ কমে এল-ঘন বাতাস এসে গেছে! দশটার সময়ে বুঝলাম ঘনত্ব বেশ বেড়েছে। এগারোটার সময়ে কনডেনসারের কাজ একেবারেই কমে এল। বারোটা বাজতেই একটু দ্বিধা করে গাম-ইলাসটিক ব্যাগের ওপর দিকটা খুলে ফেললাম। তারপর আস্তে আস্তে পুরো চেম্বারটাই দোলনার পাশ দিয়ে নামিয়ে নিলাম।

এক্সপেরিমেণ্টটা বিপজ্জনক। কিন্তু আশা আমার বৃথা গেল না শুধু যা একটু মাথা দপদপ করে উঠল, হাতে পায়ে একটু খিঁচ ধরল-তার বেশী কিছু হল না। কিন্তু এর জন্যে কেউ মরে যায় না। সুতরাং চাঁদের আরো কাছে গিয়ে পরীক্ষা চালাবো ঠিক করলাম। তাই করতে গিয়ে বুঝলাম, চাঁদের বাতাসের ঘনত্ব নিয়ে বেলুন ভাসবে কি করে? পৃথিবীর মতই চাঁদেও বায়ুমণ্ডলের ঘনত্বের অনুপাতে যে কোন বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ কমে ও বাড়ে। যে ভাবে সাঁ সাঁ করে পড়ছি, তাতে আর কোন সন্দেহই নেই যে চাঁদের বাতাস মোটেই বেলুন ভাসিয়ে রাখবার মত ঘন নয়। খুব সম্ভব অগ্ন্যুৎপাতের দরুনই বাতাস এখানে এত পাতলা। তীরবেগে নামতে নামতে তাই একটা একটা করে জিনিসছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলাম দোলনা থেকে। প্রথমে গেল ব্যালাস্ট, তারপর জলের বোতল, কনডেনসার, গাম-ইলাসটিক চেম্বার এবং সবশেষে দোলনার মধ্যে যা কিছু ছিল-সব। কিন্তু কাজ হল না। ভয়ংকর বেগে নেমেই চললাম-নামতে নামতে পৌঁছোলাম চাঁদ থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে। শেষ কালে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম হ্যাট, কোট, বুট। তারপর পুরো দোলনাটা-ঝুলতে লাগলাম জাল ধরে। ঝুলতে ঝুলতে চোখে পড়ল পায়ের তলায় অনেক অদ্ভুত দৃশ্য। দেখলাম ক্ষুদে ক্ষুদে আকারের জীবজগৎ। উদ্ভিদজগৎ। আমি যেন একটা বামন-শহরে গিয়ে নামছি। ক্ষুদে আকারের বিস্তর জীব হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমার দুরবস্থা দেখে সাহায্যের জন্যে দৌড়াদৌড়ি করা দূরে থাকুক, বুকের ওপর দু-হাত ভাঁজ করে রেখে ইডিয়টের মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে দাঁত বার করে এমন হাসছে যে গা জ্বলে গেল আমার। রেগে মেগে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকালাম পৃথিবীর দিকে-বোধ হয় জন্মের মতই ছেড়ে এলাম যে গ্রহকে, মাথার ঠিক ওপরে তাকে দেখলাম তামার মস্ত ঢালের মত ঝুলতে। ব্যাস প্রায় দু ডিগ্রী-একদম নড়ছে না। একটা কিনারা ভীষণ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে-যেন সোনা দিয়ে মোড়া সে দিকটা। জমি বা জলের চিহ্ন মাত্র দেখলাম না। বিষুব রেখা অঞ্চলে ফুটকি ফুটকি নানা ধরনের কালো দাগের মেঘের মত আবরণ ছাড়া কিছুই আর ঠাহর করতে পারলাম না।

মহামান্য মহাশয়গণ, এই হল আমার চন্দ্রাভিযানের বিবরণ। রোটারড্যাম থেকে রওনা হওয়ার উনিশ দিন পরে পৌঁছোলাম চাঁদে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো মানুষ যা পারে নি, যে অভিযানের কথা ভাবতেও পারে নি-আমি তা সম্ভব করলাম। তবে কি জানেন, চাঁদে কি করে নিরাপদে পৌঁছোলাম, সে বর্ণনার চাইতে অনেক বেশী কৌতূহলোদ্দীপক হলো চাঁদে পৌঁছোনোর পর আমার অভিজ্ঞতার বিবরণ। চাঁদ এমনিতে পৃথিবীর প্রতিবেশী-বুদ্ধিমান জীব যে জগতে বাস করে, তারই উপগ্রহ।

তার ওপরে চাঁদে বছর পাঁচেক থাকবার পর সেখানকার বহু বৈশিষ্ট্য দেখেও আমি চমৎকৃত। সুতরাং আমার এই শেষের কাহিনীটাই স্টেটস কলেজ অফ অ্যাসট্রনমার্স-য়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে অধিকতর উপাদেয় লাগা উচিত। অনেক কথাই বলার আছে এবং তা বলব মনের আনন্দে। উপগ্রহের আবহাওয়ার খবরই কি কম জেনেছি-বলে শেষ করা যায় না। গরম আর ঠাণ্ডা কি সুন্দরভাবেই না সেখানে আসছে আর যাচ্ছে। মাসের পনেরো দিন গায়ে ফোস্কা পড়ার মত বিরাম-বিহীন রোদ্দুর-বাকী পনেরোদিনে কুমেরু সুমেরুর কনকনে ঠাণ্ডা। সূর্যের দিক থেকে আর্দ্রতা ভেসে আসছে অনবরত-পরিশীলিত হচ্ছে বায়ুশূন্যতার মধ্যে। জল বয়ে চলেছে চন্দ্রপৃষ্ঠে নানান অঞ্চলে নানান ভাবে। মানুষগুলোও সেখানকার দেখবার মত। তাদের আচার আচরণ, রীতিনীতি এবং রাজনৈতিক সংস্থা সম্বন্ধে বলবার আছে ভুরি ভুরি। এদের দৈহিক গঠন কিন্তু সত্যিই অদ্ভুত। ভীষণ কদাকার। কানের বালাই নেই-যেখানে বাতাস বলে পদার্থটা নেই বললেই চলে-সেখানে কান নামক প্রত্যঙ্গের দরকার হয় না। বাতাস না থাকলে শব্দ যাবে কার মধ্যে দিয়ে ? শুনবে কে ? শোনার কেউ না থাকলে বলবারও প্রশ্ন উঠে না। তাই ওরা কথা বলবার গুণাগুণ সম্পর্কে এমনই অজ্ঞ যে বলবার নয়-কথা বলার দরকার হয় কেন-তাও বোঝে না। কথার বদলে ওরা পরস্পরের মধ্যে মনের ভাব দেওয়া নেওয়া করে অত্যাশ্চর্য এক পন্থায়। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের সঙ্গে চাঁদের প্রতিটি মানুষের এমন একটা নিগূঢ় সম্পর্ক এবং যোগাযোগ আছে বুদ্ধি যুক্তি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না ; আরো স্পষ্ট কথায়, চাঁদের বিশেষ একজনের সঙ্গে পৃথিবীর বিশেষ একজনের একটা অদৃশ্য যোগসূত্র আছে ; অনেকটা যমজ ভাইয়ের মত ; একজন পৃথিবীতে আর একজন চাঁদে ; একজনের জীবন এবং ভাগ্য উলবোনার মত জড়িয়ে আছে আরেক জনের জীবন আর ভাগ্যের সঙ্গে , চাঁদ আর পৃথিবীর মণ্ডল বা কক্ষের জন্যেই এরকম হতে পারে। কিন্তু এ সবই ম্লান হয়ে যাবে যার বর্ণনায় তা রয়েছে চাঁদের উল্টো পিঠে-যে পিঠ দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় কোনোদিনই পৃথিবীর দূরবীনের দিকে ঘুরে আসবে না-কেননা নিজে লাট্টুর মত ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর চারদিকে চর্কিপাক দিয়ে আসার ফলে চাঁদের ভয়ংকর ঐ পিঠই চিরকালই মানুষের চোখে অদৃশ্য এবং রহস্যময়-এবং তা থাকাই ভাল-কেন না সেদিককার ভয়ংকর কুৎসিত রহস্য মানুষের দেখবার নয়। পাঁচ বছর চাঁদে থেকে এমনি অনেক কিছুই দেখেছি, জেনেছি-সব বলব আপনাদের, কিন্তু একটা পুরস্কারের বিনিময়ে। পৃথিবীতে আমার বাড়ীর জন্যে, বউয়ের জন্যে বড্ড মন কেমন করছে-তাই ফিরতে চাই রোটারড্যামে। ফিরলে

পৃথিবীরও লাভ। ফিজিক্যাল আর মেটা-ফিজিক্যাল সায়ান্স সম্বন্ধে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের শিখিয়ে দেওয়ার মত বহু তত্ত্ব গজগজ করছে মাথার মধ্যে। এ সব বিলিয়ে দেব বৈজ্ঞানিকদের। কিন্তু মহামান্য মহাশয়রা কথা দিন রোটারড্যামে যে অপরাধ করে চাঁদে পালিয়ে এসেছি-তার জন্য সাজা দেবেন না। তিন পাওনাদারকে খুন করার দায় থেকে যদি নিষ্কৃতি দেন-তবেই ফিরব পৃথিবীতে। এত কথা লিখলাম শুধু এই উদ্দেশ্যেই। এ চিঠি নিয়ে যাচ্ছে চাঁদের একজন মানুষ। ক্ষমা করলেন কি না, সে খবর নিয়েই ও ফিরে আসবে চাঁদে।

আপনার একান্ত অনুগত বশংবদ
হ্যান্স ফঅল্

অতি অসাধারণ এই চিঠি পড়ার পর প্রফেসর রুবাডুব নাকি এমন অবাক হয়েছিলেন মুখ থেকে তামাক খাওয়ার পাইপ খসে পড়েছিল ঘাসের ওপর এবং মিনহীম সুপারবাস ফন্ আণ্ডারডাকের পিলে এমনই চমকে গিয়েছিল যে আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি চোখের চশমা হাতে নিয়ে থ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন-নিজের এবং পরের মান রেখে বোঁ করে তিন পাক ঘুরতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলেন-ভীষণ অবাক হলে যা করা উচিত ছিল তার মত মানী লোকের পক্ষে। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল। হ্যান্স ফঅল্ ক্ষমা পেয়ে যাচ্ছেন। প্রফেসর এই রকম একটা আভাস দিতেই ফন আণ্ডারডাক তো বলেই ফেললেন বাড়ী ফিরে গিয়েই এখুনি কাগজ পত্র ঠিক করে ফেলা যাক এবং প্রফেসরের হাত জড়িয়ে ধরে রওনা হলেন সেই মুহূর্তেই। ফন আণ্ডারডাকের বাড়ীর দোরগোড়ায় গিয়ে অবিশ্যি প্রফেসর বলেছিলেন, ক্ষমা করার আর দরকার হবে কি? খবরটা নিয়ে যাবে কে? চাঁদের মানুষ তো পৃথিবীর বর্বর চেহারা দেখেই ভড়কে পালিয়েছে। পৃথিবী থেকে চাঁদে রওনা হওয়ার হিম্মৎ চাঁদের মানুষেরই আছে। কেউ যখন যাবার নেই তখন ক্ষমা করলেই বা কি, না করলেই বা কি। শুনে ফন আণ্ডারডাকের মন ঘুরে গেল। সত্যিই তো, খামোকা ক্ষমা করে লাভ কি? কাজেই ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ল ঐখানেই।কিন্তু গুজবের মুখ কি বন্ধ করা যায়? ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়ল কত রকম কাহিনী। চিঠিখানা কাগজে ছাপা হতেই শুরু হল হৈ-চৈ। যাঁদের জ্ঞান বুদ্ধি বেশী, তারা বললেন যত্তোসব ধাপ্পাবাজি। হাস্যকর ব্যাপার! কিন্তু ধাপ্পা দেওয়ার মত লোক এ ব্যাপারে কেউ ছিলেন কি? ধাপ্পা জিনিসটাই যে তাঁরা ধারণাতে আনতে পারেন না। তা সত্ত্বেও জানি না একথা কেন বলা হল। তবে যে পাঁচটি কারণ তুলে ধরা হয়েছিল, তা এই:

প্রথমত ঃ রোটারড্যামে এমন অনেক লোক আছে বদ রসিকতা যাদের রক্তে। কিছু কিছু মেয়র আর জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ওপর এদের রাগ আছে।

দ্বিতীয়ত ঃ প্রতিবেশী শহর ব্রাজেস থেকে দিন কয়েক আগে অদ্ভুত একটা লোক উধাও হয়েছে। লোকটা সার্কাস দেখাতো। বোতলের খেলায় ওস্তাদ ছিল। মাথায় সে ভীষণ বেঁটে এবং দুটো কানই মাথার কাছ থেকে চেঁচে কাটা-নিশ্চয় অতীতে কোনো দুষ্কর্মের জন্যে।

তৃতীয়ত ঃ বেলুনের গায়ে সাঁটা খবরের কাগজগুলো হল্যাণ্ডের তৈরী-সুতরাং বেলুনটাও চাঁদ থেকে আসে নি। অত্যন্ত নোংরা এই কাগজগুলো নাকি রোটারড্যামেই ছাপা হয়েছে-বাইবেল ছুঁয়ে দিব্যি গেলে বলেছে মুদ্রক স্বয়ং।

চতুর্থত ঃ মাতাল পাজী বদমাস হ্যান্স ফঅলকে নাকি তিন পাওনাদার সমেত দিন দুতিন আগে পাড়াগাঁয়ের একটা মদের আড্ডায় দেখা গেছে। সমুদ্র যাত্রা করে সদ্য ফিরেছে চারজনে এবং টাকা পয়সা নাকি ঝন্ ঝন্ করছিল চারজনেরই পকেটে।

সবশেষে রোটারড্যাম জ্যোতির্বিজ্ঞান কলেজ বা পৃথিবীর কোনো কলেজেই এই চিঠির বৃত্তান্ত পড়ে তিল মাত্র জ্ঞান অর্জন করে নি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ-

আঠারোই এপ্রিলে চাঁদের বাতাস সম্পর্কে-

হ্যাভেলিস লিখছেন, আকাশ যখন বেশ পরিষ্কার, অনেক দূরের মিটমিটে তারাগুলোও যখন বেশ ঝকঝকে, তখনও চাঁদ আর চাঁদের গায়ে কলঙ্ক একই দূরবীন দিয়ে কখনো সমান স্পষ্ট দেখা যায় না।চাঁদ যখন পৃথিবী থেকে একই দূরত্বে তখনও একই দূরবীন দিয়ে বার বার 'তাকিয়ে একই ঘটনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এই থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে দোষটা পৃথিবীর বাতাসে নেই, দূরবীনের নলেও নেই, নেই চাঁদে, এমন কি যে দেখছে তার চোখেও-কিন্তু আছে চাঁদেরই চারধারে কোথাও (বাতাসে ?)।

শনি, বৃহস্পতি এবং অন্যান্য স্থির নক্ষত্রের দিকে প্রায় চেয়ে থাকতেন ক্যাসিন। চাঁদের দিকে গ্রহণের সময়ে এগোলেই এদের গোল চাকার মত চেহারা ডিমের মত লম্বাটে হয়ে যায় লক্ষ্য করেছিলেন উনি। কিন্তু অন্য গ্রহ উপগ্রহের সঙ্গে গ্রহণে এই ব্যাপার তিনি দেখেন নি। তাই থেকেই ধরে নেওয়া যেতে পারে 'মাঝে মাঝে' চাঁদের চার ধারে এমন একটা ঘন বস্তু জমা হয় যা নক্ষত্র রশ্মিকে প্রতিসরিত হতে বাধ্য করে।

খুঁটিয়ে দেখতে গেলে, মিঃ লকির বিখ্যাত চাঁদের গল্পের সঙ্গে এই বুড়ি-ছুঁয়ে-যাওয়া-গোছের কাহিনীর মিল অতি

সামান্যই-যদিও একটি লেখা হয়েছে ঠাট্টাচ্ছলে-আরেকটি গম্ভীরভাবে। কিন্তু যেহেতু দুটি গল্পেরই মোদ্দা কথা হল ধাপ্পাবাজি এবং একই বিষয় (চাঁদ) নিয়েই ধাপ্পার সৃষ্টি দুই গল্পেই, কাজেই হ্যান্স ফঅল্‌য়ের লেখক সবিনয়ে নিবেদন করতে চান একটি কথা ঃ

'চাঁদের গল্প' প্রকাশিত হয় 'নিউইয়র্ক সান' পত্রিকায়। তার তিন সপ্তাহ আগেই কিন্তু হ্যান্স ফঅল্‌য়ের কাহিনী ছাপা হয় 'সাদার্ন লিটারারি মেসেনজার' পত্রিকায়। দুটো গল্পই অনেক জায়গায় হুবহু এক, এই রকম একটা কল্পনা করে নিয়ে নিউইয়র্কের বহু পত্রিকা হ্যান্স ফঅল্‌-কে নকল করে 'চাঁদের ভাঁওতার' সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন এবং দুই গল্পের লেখক যে পরস্পরকে নকল করেছেন, সেই রকম কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।

চাঁদের ভাঁওতায় ভুলেছিলেন অনেকেই, কিন্তু মুখে স্বীকার করেন খুব কম লোক। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই কাহিনীর জাত বিচারে দু-চারটে কথা বলা দরকার। যদিও গল্পের মধ্যে কল্পনাকে টেনে আনা হয়েছে কায়দা করে, কিন্তু তত্ত্বের মধ্যে ফাঁক থেকে গেছে বিস্তর। সাধারণ মানুষ মুহূর্তের জন্যেও যদি বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন গল্প পড়ে, বুঝতে হবে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে কত ভ্রান্ত ধারণাই না প্রচলিত রয়েছে এখনো।

মোটামুটিভাবে চাঁদ পৃথিবী থেকে ২,৪০,০০০ মাইল দূরে রয়েছে। দূরবীনের লেন্সের মধ্যে দিয়ে চাঁদ মনে হয় কাছে এসে গেছে। কত কাছে এসেছে জানতে ইচ্ছা হলে চাঁদের দূরত্বটাকে লেন্সের মহাকাশ ফুঁড়ে দেখবার শক্তি দিয়ে ভাগ করতে হয়। মিঃ এল বলেছেন তাঁর লেন্সের শক্তি ৪২,০০০ গুণ। চাঁদের দূরত্বকে ৪২,০০০ দিয়ে ভাগ দিলে পাই ৫ মাইলের সামান্য বেশী। এতদূর থেকে কোন জানোয়ারকে দেখা যায় না-খুঁটিনাটি জিনিস তো নয়ই-অথচ মিঃ এল সেসবের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর গল্পে। উনি বলেছেন, স্যার জন হার্সচেল নাকি ফুলের (প্যাপাভার, রিয়া ইত্যাদি) চেহারা শুদ্ধ দেখেছিলেন। এমন কি পুঁচকে পুঁচকে পাখীদের গায়ের রঙ আর চোখের গড়ন পর্যন্ত নজর এড়ায়নি। এর কিছু আগেই কিন্তু উনি নিজেই বলেছিলেন আঠারো ইঞ্চির ছোট কোন জিনিস দূরবীন দিয়ে দেখা যাবে না। তাহলেও কিন্তু লেন্সের ক্ষমতা সাংঘাতিক রকমের বেশী থেকে যাচ্ছে। আশ্চর্য এই লেন্স নাকি তৈরী হয়েছিল ডাম্বার্টনের হার্টলি অ্যাণ্ড গ্রাণ্ট কোম্পানীর কাঁচের কারখানায়। কিন্তু এই ভাঁওতা ছাপবার অনেক বছর আগেই কারবারে লালবাতি জ্বেলেছিলেন হার্টলি অ্যাণ্ড কোম্পানী।

পুস্তিকা সংস্করণের ১৩ পৃষ্ঠায় এক ধরনের বাইসনের লোমশ অবগুণ্ঠন সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন "স্যার হার্সচেল দেখেই বুঝলেন চাঁদের যে দিক আমাদের দিকে ফেরানো, সেই

দিকের তীব্র আলো আর তীব্র অন্ধকারের খপ্পর থেকে চোখ বাঁচানোর জন্যেই এমনি লোমশ অবগুণ্ঠনের সৃষ্টি।" পর্যবেক্ষণটা মোটেই প্রশংসনীয় নয়। কেননা চাঁদের যে দিক আমাদের দিকে ফেরানো, সেই দিকে অন্ধকারের বালাই নেই, সব সময়ে আলো রয়েছে। সুতরাং 'তীব্র' শব্দটা অচল হয়ে যাচ্ছে। সূর্য না থাকলেও পৃথিবীর আলো আছে। উজ্জ্বলতায় তেরটা পূর্ণচন্দ্রের সমান সেই আলো।

চন্দ্র পৃষ্ঠের বর্ণনাতেও ভুল। ব্লাণ্টের চান্দ্র মানচিত্রের সঙ্গে মিল নেই। এমন কি গরমিল রয়েছে লেখকের নিজের বর্ণনাতেও। কম্পাসের কাঁটাও অব্যাখ্যাত ভাবে পথ গুলিয়ে ফেলেছে। লেখক বোধ হয় জানেন না চান্দ্র ম্যাপে কম্পাসের কাঁটা পৃথিবীর হিসেবে ধরা যায় না।

চান্দ্র ম্যাপে ছায়াময় অঞ্চলগুলিতে সমুদ্র অথবা জলাশয় কল্পনা করেছেন লেখক। কিন্তু ছায়া থাকলেই যে জল থাকবে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

২১ পৃষ্ঠায় মানুষ বাদুড়ের ডানার যে বর্ণনা, তা পিটার উইলকিন্স বর্ণিত উড়ুক্কু দ্বীপবাসীদের হুবহু নকল। এই ছোট্ট ঘটনাটাই সন্দেহের উদ্রেক করা উচিত ছিল।

২৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে পৃথিবী নাকি চাঁদের তেরোগুণ বড়। ওটা হওয়া উচিত উনপঞ্চাশগুণ জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে খবর স্কুলের ছেলেও জানে-তারও অভাব দেখিয়েছেন লেখক।

গল্পে বলা হয়েছে, চাঁদের জন্তু জানোয়ার পর্যন্ত দেখা গিয়েছে। তাদের ব্যাস কতখানি, শুধু এই টুকুই বলা হয়েছে-কিন্তু কি রকম ভাবে দেখা যাবে তা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। পৃথিবী থেকে এদের দেখা যাবে কিন্তু উল্টো অবস্থায়-অর্থাৎ পা তুলে মাথা নামিয়ে যেন হাঁটছে।

ইংলণ্ডে আর্ল অফ রস টেলিস্কোপ এই সেদিন তৈরী হয়েছে। এটি কিন্তু সব দিক দিয়েই হার্সচেল টেলিস্কোপের চাইতেও অনেক শক্তিশালী। খবরটা গল্পকারের জানা ছিল না।

চাঁদ নিয়ে এরকম অনেক উদ্ভট গল্প আছে। ইংরাজী থেকে ফরাসীতে অনুবাদ করা একটা গল্প পড়েছিলাম। সিগনর গোনজালিস নামে একজন একটি দ্বীপে পরিত্যক্ত হয়। সঙ্গে ছিল একজন নিগ্রো চাকর। দ্বীপের পাখীদের চিঠি বইতে শিখিয়েছিলে গোনজালিস। চাকর থাকত আলাদা-পাখীরা চিঠি বয়ে নিয়ে যেত তার কাছে। আস্তে আস্তে পাখীদের আরো ভারী বোঝা বইতে শেখানো হয়। তার পরই মতলবটা এল গোনজালিসের মাথায়। ঝাঁটার মত একটা মেসিন বানিয়ে তাতে বাঁধা হল অনেক সুতো। সুতোগুলোর আর একদিক বাঁধা হল পাখীদের ল্যাজে। একসঙ্গে পাখীগুলো মেশিন নিয়ে উড়ল আকাশে-মাঝখানে আরাম করে বসে রইল সিগনর

গোনজালিস। গল্পের চমকটা কিন্তু একদম শেষে। এই যে হাঁস পাখী, নাম যাদের গাঁজা, তারা চাঁদের জীব। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে আসত পৃথিবীতে। গোনজালিসের একটু ভ্রমণের সখ হতেই গাঁজারা তাকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে উড়িয়ে নিয়ে গেল চাঁদে। গোনজালিস আশাই করতে পারেননি এরকম একটা কাণ্ড ঘটতে পারে। চাঁদে গিয়ে সে অনেক অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। সেখানে মানুষ দারুণ সুখী ; আইনের বালাই নেই ; মরবার সময়ে একটুও যন্ত্রণা পায় না ; উচ্চতায় দশ থেকে তিরিশ ফুট ; আয়ু পাঁচ হাজার বছর ; তাদের সম্রাটের নাম ইরডোনোজুর ; এক লাফে তারা যাট ফুট ওপরে উঠতে পারে এবং মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে আসে-তখন পাখনা নেড়ে উড়ে যায়।

চাঁদে অভিযানের আরো অনেক কাহিনী আছে। গোনজালিসের গল্পের মত কৌতূহলোদ্দীপক কোনোটাই নয়। বারজারাক অর্থহীন অনেক কিছু লিখেছেন। আমেরিকান কোয়ার্টারলি রিভিউতে কঠোর সমালোচনা বেরিয়ে ছিল একটা কাহিনীর। নাম মনে নেই। গল্পটা এই ঃ চাঁদকে আকর্ষণ করতে পারে, এমনি একটি ধাতু পৃথিবীর মাটি থেকে খুঁড়ে বার করে তাই দিয়ে বানানো হল একটা বাক্স। তারপর তাতে চড়ে নায়ক যাত্রা করল চাঁদে। আরেকটা যাচ্ছেতাই গল্পের হিরো হাংরি ছিল পাহাড়ের মাথা থেকে ঈগল পাখীর পিঠে চড়ে চাঁদে গিয়েছিল।

এই ধরনের গল্পের মোদ্দা রস ব্যঙ্গবিদ্রূপ, হাসিঠাট্টা-অথচ জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের নিতান্ত অভাব-অবৈজ্ঞানিক ব্যাপারে ঠাসা ; কিন্তু হ্যান্স ফলাল্-য়ের পরিকল্পনা একেবারেই মৌলিক। এর আগে কোনো গল্পে পৃথিবী থেকে চাঁদে যাওয়ার পথের বর্ণনা, অভিজ্ঞতার কথা এত খুঁটিয়ে লেখা হয় নি।

বন্দী আত্মার লোমহর্ষক কাহিনী

(দ্য ফ্যাক্টস ইন দ্য কেস অফ মঁসিয়ে ভালডিমার)

মঁসিয়ে ভালডিমারের অস্বাভাবিক কেস রীতিমত উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল কেন, সে বিষয়ে অবাক হওয়ার ভান দেখানোর আর কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। পুরো ব্যাপারটাকেই বলা যায় অলৌকিক ব্যাপার। সাময়িকভাবে বিষয়টা জনসমক্ষে আনা হবে না, এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আরো কিছু গবেষণা করার জন্যে, যাতে অত্যাশ্চর্য ঘটনাটায় কিছু আলোকপাত করা যায়-বিচিত্র প্রহেলিকাকে প্রাঞ্জল করা যায়। কিন্তু গোপন করতে গিয়ে এমন কানাঘুষা শুরু হয়ে গিয়েছিল যে আসল ব্যাপারটা পাঁচজনের কানে না পৌঁছে, পৌঁছেছিল ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়া অতিরঞ্জিত এক বিবরণ। ঢি-ঢি পড়ে গিয়েছিল সমাজের নানা মহলে এবং স্বভাবতঃই অবিশ্বাস আর বিদ্রূপের বন্যা বয়ে গিয়েছিল হাটে বাজারে।

ঠিক যা ঘটেছিল, তা নিবেদন করা সঙ্গত মনে করি এই কারণেই। সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই ঃ

গত তিন বছর ধরে মেসমেরিজম্‌ বিদ্যায় আকৃষ্ট হয়েছিলাম আমি। ন-মাস আগে হঠাৎ খেয়াল হল পর-পর এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সত্ত্বেও একটা বিষয় বরাবরই বাদ পড়ে গেছে। বিষয়টা রীতিমত অত্যাশ্চর্য তো বটেই, যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে তার কূল-কিনারাও পাওয়া যায় না।

জ্যান্ত মানুষকে সম্মোহন করা হয়েছে অনেকবার কিন্তু মুমূর্ষু বা মড়াকে সম্মোহন করার চেষ্টা তো কেউ করেনি। যে মানুষটা মরতে চলেছে, তাকে যদি মেসমেরাইজ করা যায়, মরে যাওয়ার

পর ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়–সেটা দেখাও তো দরকার। এমনও তো হতে পারে যে সম্মোহন করে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব?

এ ধরনের উদ্ভট এক্সপেরিমেণ্টে ন্যামবার আগে অনেকগুলো পয়েণ্ট বিবেচনা করা দরকার। তার মধ্যে মূল পয়েণ্ট তিনটে ঃ প্রথম, মৃত্যুর মুহূর্তে চৌম্বক প্রভাব মানুষটার ওপর কার্যকর হয় কিনা ; দ্বিতীয়, যদি কার্যকর হয়, তবে আসন্ন মৃত্যু সম্মোহনের প্রভাবকে বাড়িয়ে দেয়, না কমিয়ে দেয় ; তৃতীয়, কতদিন অথবা কি পরিমাণে যমরাজকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব।

শেষের পয়েণ্টটাই কিন্তু আমাকে নাড়া দিল সবচেয়ে বেশী। অস্থির হয়ে গেলাম কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে।

কিন্তু কাকে নিয়ে অভিনব এই এক্সপেরিমেণ্টে নামা যায়? মনে পড়ল বন্ধুবর মঁসিয়ে আরনেস্ট ভালডিমারের কথা। 'বিবলিথিকা ফরেনসিকা' বইটা লিখে যিনি যথেষ্ট নাম করেছেন এবং ছদ্মনামে লিখেছেন 'ইস্‌সাছার মার্ক্স'। তাঁর লেখা 'গর্গনচুয়া' আর 'ওয়ালেন্সটাইন' বই দুখানির নামও কারও অজানা নয়। মঁসিয়ে ভালডিমার ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ থেকে থাকেন নিউইয়র্কের হারলেম অঞ্চলে। চেহারায় বাড়াবাড়ি ছিটেফোঁটাও নেই। শরীরের নীচের দিকটা জন র‍্যানডল্‌ফ-এর নিম্নাঙ্গের মতো। চুল মিশমিশে কালো–কিন্তু জুলফি ধবধবে সাদা। ফলে অনেকেরই ধারণা চুলটা আসল নয়–নকল ; মানে পরচুলা। অত্যন্ত নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ। সম্মোহনের পরীক্ষা নিরীক্ষার পক্ষে আদর্শ ব্যক্তি। বার দুই-তিন তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে ছিলাম অতি সহজেই–বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু নাকাল করে ছেড়েছিলেন বেশ কয়েকবার। ভদ্রলোকের ধাতটা এমনই অদ্ভুত যে আগে ভাগে আন্দাজ করা যায় না ঠিক কি কি ঘটতে পারে। কখনোই ওঁর ইচ্ছাশক্তি পুরোপুরি কব্‌জায় আনতে পারিনি। আমরা যাকে বলি 'ক্লেয়ারভয়্যান্স'–সোজা কথায় যাকে বলা যায় অলোকদৃষ্টি বা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি–এই ব্যাপারটিতে ওঁর ওপর আস্থা রাখা যায়নি কোনোদিনই। ব্যর্থতার কারণ হিসাবে অবশ্য আমি দায়ী করেছি তাঁর স্বাস্থ্যের টলমল অবস্থাকে–কখন যে ভালো আছেন, আর কখন যে কাহিল হচ্ছেন–তার কোনো ঠিক নেই। ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ হওয়ার মাসকয়েক আগে ডাক্তাররা এক বাক্যে রায় দিয়েছিলেন, রোগটা দুরারোগ্য–থাইসিস। মরতে হবেই জেনে উনি কিন্তু বিচলিত হন নি। মৃত্যুকে প্রশান্ত মনে বরণ করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

উদ্ভট আইডিয়াটা মাথায় আসতে এই সব কারণেই মঁসিয়ে ভালডিমারের কথাটাই মনের মধ্যে এল সবার আগে। ওঁর মনের চেহারা আমার অজানা নয়–আমার অদ্ভুত এক্সপেরিমেণ্ট নিয়ে বাধা দিতে যাবেন না। আমেরিকাতে ওঁর কোন

আত্মীয়-স্বজনও নেই যে ঝাগড়া দিতে আসবে। তাই প্রসঙ্গটা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করলাম ভদ্রলোকের সঙ্গে। অবাক হলাম তাঁর আগ্রহ আর উত্তেজনা দেখে। অবাক হওয়ার কারণ আছে বইকি। আমার সম্মোহনের খপ্পরে বারংবার নিজেকে সঁপে দিয়েও সম্মোহনের বিদ্যেটা নিয়ে কস্মিনকালেও গদগদ হন নি ভালডিমার। ব্যাধিটা এমনই যে মৃত্যু কবে হবে কখন হবে তা যখন সঠিক ভাবে হিসেব করে বলে দেওয়া সম্ভব নয় তখন উনি বললেন, ডাক্তাররা যখনই বলে যাবে মৃত্যুর দিন আর সময়, তার ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা আগে উনি আমাকে ডেকে পাঠাবেন।

মাস সাতেক আগে ভালডিমারের স্বহস্তে লেখা পেলাম এই চিঠিটাঃ

"মাই ডিয়ার পি—

স্বচ্ছন্দে এখন আসতে পারেন। কাল মাঝরাত পর্যন্ত আমার আয়ু—বলে গেলেন দুজন ডাক্তার। সময় হয়েছে। চলে আসুন।

ভালডিমার"

চিঠি লেখার আধ ঘণ্টা পর চিঠি পৌঁছোলো আমার হাতে, তার ঠিক পনেরো মিনিট পর আমি পৌঁছোলাম মুমূর্ষু মানুষটার শয্যার পাশে। দিন দশেক তাঁকে দেখিনি। কিন্তু দশ দিনেই চেহারার হাল যা হয়েছে, আঁৎকে ওঠার মতো। মুখ সিসের মতো বিবর্ণ; চোখ একেবারেই নিষ্প্রভ; এত ক্ষীণ হয়ে গেছেন যে গালের চামড়া ফুঁড়ে যেন হনু বেরিয়ে আসতে চাইছে। অবিরল শ্লেষ্মা বেরোচ্ছে নাক আর মুখ দিয়ে। নাড়ি প্রায় নেই বললেই চলে। তা সত্ত্বেও অটুট মনোবল আর শেষ দৈহিক শক্তিকে আঁকড়ে থাকার ফলে টিঁকে আছেন এখনো। চাঙ্গা হওয়ার জন্য নিজেই ওষুধ নিয়ে খেলেন। ঘরে যখন ঢুকলাম, দেখলাম পকেটবুকে কি লিখছেন। কথা বললেন সুস্পষ্ট স্বরে। দুপাশে দাঁড়িয়ে দুই ডাক্তার। বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আছেন ভালডিমার কোনমতে পিঠ সোজা করে।

ডাক্তার দুজনকে আড়ালে ডেকে এনে শুনে নিলাম বন্ধুবরের শরীরের অবস্থা। বাঁদিকের ফুসফুস গত আঠারো মাস ধরে শক্ত হয়ে এসেছে এবং এখন তা একেবারেই অকেজো। ডানদিকের ফুসফুসের ওপরের অংশের অবস্থাও তাই। নিচের দিকটা দগদগে হয়ে রয়েছে অসংখ্য ক্ষতে। কয়েক জায়গায় ফুসফুস একেবারেই ফুটো হয়ে গেছে এবং পাঁজরার সঙ্গে আটকে রয়েছে। ডানদিকের এই অবস্থা ঘটেছে সম্প্রতি। ফুসফুস শক্ত হয়েছে খুবই তাড়াতাড়ি—অস্বাভাবিক গতিবেগে। একমাস আগেও লক্ষণ ধরা পড়েনি। ফুসফুস যে পাঁজরার সঙ্গে লেগে রয়েছে, এটা ধরা পড়েছে মাত্র তিন দিন আগে। থাইসিস ছাড়াও

হৃদ্‌যন্ত্রের মূল ধমনীও নিশ্চয় বিগড়েছে-যদিও তা যাচাই করে দেখা এখন আর সম্ভব নয়। কেননা, ভালডিমার মারা যাবে রবিবার রাত বারোটা নাগাদ। একথা হল শনিবার সন্ধ্যে সাতটার সময়ে।

ডাক্তারদের বললাম, পরের দিন রাত দশটা নাগাদ যেন রুগীর বিছানার পাশে হাজির থাকেন। বিদায় নিলেন দুই ডাক্তার। ভালডিমারের পাশে বসলাম। শরীরের বর্তমান অবস্থা আর আসন্ন এক্সপেরিমেণ্ট নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করলাম। ঐরকম শোচনীয় অবস্থাতেও ওঁর আগ্রহ তিলমাত্র কমেনি দেখে অবাক হলাম। তাড়া লাগালেন সময় নষ্ট না করে এক্ষুনি শুরু হয়ে যাক এক্সপেরিমেণ্ট। দুজন নার্স ছিল ঘরে। কিন্তু নির্ভর-যোগ্য সাক্ষী সামনে না রেখে কাজ শুরু করতে মন চাইল না। দুর্ঘটনা ঘটতে কতক্ষণ ? তাই বললাম, এক্সপেরিমেণ্ট শুরু হবে পরের দিনরাত্ত আটটা নাগাদ। আটটার সময়ে একজন মেডিক্যাল স্টুডেণ্টকে রাখব ঘরের মধ্যে। ছোকরার নাম থিওডোর এল-। ডাক্তাররা না এসে পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই ভালো হত। কিন্তু ভালডিমারের পীড়াপীড়িতে আর তাঁর শারীরিক অবস্থা দেখে বেশী দেরী করতে চাইলাম না।

মিঃ এল যা দেখেছিলেন এবং যা শুনেছিলেন-সব হুবহু লিখে নিয়েছিলেন। তাঁর সেই লেখা থেকেই এই প্রতিবেদন হাজির করছি আপনাদের সামনে।

পরের দিন আটটার সময়ে ভালডিমারের হাত ধরে জিজ্ঞেস করলাম-"যতদূর পারেন, স্পষ্টভাবে বলুন মিঃ এল-এর সামনে, এই এক্সপেরিমেণ্টে আপনার সায় আছে কিনা।"

ক্ষীণ কিন্তু সুস্পষ্ট স্বরে উনি বললেন-'হ্যাঁ, আমি সম্মোহিত হতে চাই এক্ষুনি। অনেক দেরী করে ফেলেছেন।' সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলাম হস্তচালনা-যেভাবে এর আগে ওঁকে ঘুম পাড়িয়েছি বহুবার-ঠিক সেইভাবে। কপালে দু-একবার টোকা দিতেই শুরু হয়ে গেল সম্মোহনের প্রভাব। কিন্তু দশটা নাগাদ ডাক্তার দুজন এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত সেরকম ফল পেলাম না। ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ওঁদের কোন আপত্তি আছে কিনা। ওঁরা বললেন, রুগীর মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে-এখন অনায়াসেই সম্মোহনের ঝুঁকি নেওয়া চলে। আমি তখন হাত চালালাম নিচের দিকে -একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম ভালডিমারের ডানচোখের দিকে।

ওঁর নাড়ি তখন অতিশয় ক্ষীণ, আধমিনিট অন্তর নিঃশ্বাস ফেলছেন অতিকষ্টে।

পনেরো মিনিট অব্যাহত রইল এই অবস্থা। তারপর গভীর শ্বাস ফেললেন ভালডিমার। নিঃশ্বাসের কষ্ট আর রইল না-কিন্তু আধমিনিটের ব্যবধানটা থেকেই গেল। হাত-পা বরফের মতো

ঠাণ্ডা হয়ে এল।

এগারোটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে প্রকৃত সম্মোহনের মোক্ষম লক্ষণগুলো প্রকাশ পেল। ঘুমের ঘোরে যারা হেঁটে বেড়ায়, তাদের চোখের সাদা অংশে যেরকম অন্তর্মুখিতা ফুটে ওঠে, ঠিক সেইরকম ভাব প্রকাশ পেল তাঁর চোখে। দ্রুত হস্তচালনা করলাম বার কয়েক। থিরথির করে কেঁপে উঠে বন্ধ হয়ে গেল চোখের পাতা। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে জোরে জোরে আরও কয়েকবার হাত চালিয়ে এবং আমার ইচ্ছাশক্তিকে পুরোপুরি খাটিয়ে শক্ত এবং সহজ করে আনলাম ওঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। দু-পা দু-হাত সটান বিছানার ওপর মেলে ধরে মাথা ঈষৎ উঁচিয়ে স্থির হয়ে রইলেন ভালডিমার।

তখন মধ্যরাত্রি। ঘরে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বললাম ভালডিমারকে ভালভাবে দেখে নিতে। প্রত্যেকেই একবাক্যে বললেন, উনি এখন পুরোপুরি সম্মোহিত। ডক্টর ডি অত্যন্ত উত্তেজিত হলেন-সারা রাত থাকতে চাইলেন। ডক্টর এফ বলে গেলেন ভোর হলেই চলে আসবেন। মিঃ এল আর নার্স দুইজন রইলেন ঘরে।

রাত তিনটে পর্যন্ত ভালডিমারকে রেখে দিলাম একইভাবে। ডক্টর এফ বিদায় নেওয়ার সময়ে ওঁকে যেভাবে দেখে গিয়েছিলেন, তখনও হুবহু সেইভাবেই। নাকের সামনে আয়না ধরলে শুধু বোঝা যাচ্ছে নিঃশ্বাস পড়ছে। চোখ বন্ধ, হাত পা মার্বেল পাথরের মত শক্ত আর ঠাণ্ডা। কিন্তু মৃত্যুর লক্ষণ নেই শরীরের কোথাও। ভালডিমারকে এর আগে সম্মোহিত অবস্থায় রেখে একটা ব্যাপারে পুরোপুরি সফল হইনি কখনোই। ডান বাহুর ওপর হাত চালিয়ে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে আমার হাত নাড়ার অনুকরণে তাঁর হাত নাড়াতে পারিনি! সুতরাং ভালডিমারের ক্ষেত্রে সেই চেষ্টা আবার করলাম-ব্যর্থ হব জেনেই করলাম। কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম আশ্চর্যভাবে সফল হওয়ায়। আমার হাত যেদিকে যেদিকে গেল, ওঁর হাতও নড়তে লাগল সেই সেই দিকে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'মঁসিয়ে ভালডিমার, আপনি কি ঘুমোচ্ছেন?' উনি জবাব দিলেন 'না'। কিন্তু থিরথির করে কেঁপে উঠল ঠোঁটজোড়া। পর-পর তিনবার জিজ্ঞেস করলাম একই প্রশ্ন। তৃতীয় বারে ওঁর চোখের পাতা খুলে গেল। শিথিলভাবে নড়ে উঠল ঠোঁট এবং দুঠোঁটের ফাঁক দিয়ে অতি অস্পষ্ট ফিসফিসানির মতো ভেসে এল এই কটি কথা :

'হ্যাঁ;-ঘুমোচ্ছি। জাগাবেন না!-মরতে দিন এইভাবেই!'

হাত আর পা দেখলাম আগের মতই শক্ত অথচ আমি হাত নাড়ালেই উনি ডানহাত একইভাবে নাড়াচ্ছেন।

প্রশ্ন করলাম-"বুকে ব্যথা এখনও অনুভব করছেন ?"

জবাবটা এল তক্ষুনি-তবে আগের চাইতে আরো অস্পষ্টভাবে ঃ

"কোনো ব্যথা নেই-আমি মারা যাচ্ছি !"

ভোরের দিকে এক না আসা পর্যন্ত ভালডিমারকে আর ঘাঁটালাম না। রুগী এখনো বেঁচে আছে দেখে উনি তো স্তম্ভিত। নাড়ি টিপে এবং ঠোঁটের কাছে আয়না ধরে পরখ করে নিয়ে আমাকে বললেন প্রশ্ন চালিয়ে যেতে।

আগের মতই মিনিট কয়েক ভালডিমার কোনো জবাব দিলেন না। মনে হল, শক্তি সঞ্চয় করছেন। পরপর চারবার একই প্রশ্ন করলাম। চতুর্থবারে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন ঃ

"হ্যাঁ, এখনো ঘুমিয়ে আছি-মারা যাচ্ছি।"

ডাক্তাররা বললেন, ভালডিমারের এই প্রশান্ত অবস্থাকে টিকিয়ে রাখা হোক মৃত্যু না আসা পর্যন্ত। মৃত্যুর নাকি আর দেরী নেই-বড় জোর আর কয়েক মিনিট।

আগের প্রশ্নটাই আবার জিজ্ঞাসা করলাম ভালডিমারকে।

সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেল মুখাবয়বে। চক্ষুগোলক আস্তে আস্তে ঘুরে উঠে গেল ওপর দিকে, চোখের তারা অদৃশ্য হয়ে গেল সেই কারণেই; বিবর্ণ হয়ে গেল চামড়া-সাদা কাগজের মতো; দুই হনুর ওপর জ্বরভাবযুক্ত উত্তপ্ত চক্রাকার দাগ দুটো নিভে গেল আচমকা। 'নিভে গেল' শব্দ দুটো ব্যবহার করলাম বিশেষ কারণে। মনে হল, ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া হল জ্বলন্ত মোমবাতি। এতক্ষণ দাঁত ঢাকা ছিল ওপরের ঠোঁট ঝুলে থাকায়-অকস্মাৎ কাঁপতে কাঁপতে ওপরের ঠোঁট ওপর দিকে গুটিয়ে যাওয়ায় প্রকট হল দাঁতের সারি-ঝপাৎ করে নীচের চোয়াল ঝুলে পড়ায় বেরিয়ে পড়ল ফুটে ওঠা কালচে জিভ। ঘরে যারা উপস্থিত ছিলেন, মৃত্যু দেখে তাঁরা অভ্যস্ত। তা সত্ত্বেও ভালডিমারের ঐ ভয়ানক মুখচ্ছবি দেখে সভয়ে সিঁটিয়ে খাটের পাশে পেছিয়ে গেলেন প্রত্যেকেই।

জানি পাঠকের মনে অবিশ্বাস দানা বাঁধছে। তা সত্ত্বেও যা ঘটেছিল, হুবহু তা বলে যাব।

ভালডিমারের সারা অঙ্গে প্রাণের আর কোন লক্ষণ না দেখে আমরা ধরে নিলাম উনি মারা গেছেন। নার্সদের তদ্বিরের ওপরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়াই ঠিক করলাম সবার মত নিয়ে। ঠিক তখুনি ভীষণভাবে কেঁপে উঠল তাঁর জিভ। কাঁপতে লাগল পুরো এক মিনিট। তারপর হাঁ-হয়ে-থাকা নিথর চোয়ালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল এমন ভয়ানক কণ্ঠস্বর যার বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে বাতুলতা। শব্দটা কর্কশ, ভাঙা ভাঙা এবং শূন্যগর্ভ। বীভৎস। অবর্ণনীয়। মানুষের কান কখনো এরকম বিকট শব্দ শোনেনি। দুটো কারণে তা অপার্থিব-অন্ততঃ আমার যা মনে

হয়েছিল। প্রথম, শব্দটা যেন ভেসে এল বহুদূর থেকে-পাতাল থেকে। দ্বিতীয়, আঠালো বস্তুর মতই তা চটচটে।

'শব্দ' আর 'কণ্ঠস্বর'-এর কথাই কেবল বললাম। আরও একটু খুলে বলা যাক। আওয়াজটা আশ্চর্য রকমের রোমাঞ্চকর স্পষ্ট শব্দাংশ। মিনিট কয়েক আগে ভালডিমারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, উনি এখনো ঘুমোচ্ছেন কিনা। উনি তাঁর জবাব দিলেন এইভাবে ঃ

"হ্যাঁ ;-না ;-ঘুমিয়েছিলাম-এখন-এখন মারা গেছি।"

গায়ের লোম খাড়া হয়ে গিয়েছিল শব্দ কটার বীভৎস উচ্চারণে ; শব্দ যে এরকম লোমহর্ষকভাবে উচ্চারিত হতে পারে, এরকম থেমে থেমে মেপে মেপে জিভ দিয়ে বেরোতে পারে-অতি বড় দুঃস্বপ্নেও কেউ তা কল্পনা করতে পারবেন না। সুতর‍্যাং গায়ে কাঁটা যে দিয়েছিল তা কেউই অস্বীকার করতে পারেন নি। এক কথায় শব্দ কটা উচ্চারিত হওয়ার মত নয় একেবারেই-কিন্তু তবুও তা ভয়াল অনুকম্পন তুলে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ঠিকরে এসেছিল জিভ দিয়ে যেন কবরের অন্ধকার থেকে। মেডিক্যাল স্টুডেণ্ট মিঃ এল অজ্ঞান হয়ে গেলেন। নার্স দুজন দৌড়ে পালিয়ে গেল ঘর থেকে। কিছুতেই আর তাদের ফিরিয়ে আনা যায় নি। আমার অবস্থাটা যে কিরকম দাঁড়িয়েছিল সেই মুহূর্তে, পাঠকের কাছে তা ধোঁয়াটে রাখতে চাই না। বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছিল বললেই চলে। ঘণ্টাখানেক কারো মুখে আর একটা শব্দও বেরোয়নি। এক নাগাড়ে মিঃ এল-এর জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে গেছি। উনি জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর কথাবার্তা শুরু হল ভালডিমারের অবস্থা নিয়ে।

অবস্থার বর্ণনা আগে যা দিয়েছিলাম, দেখা গেল তার রদবদল হয়নি-ভালডিমার রয়েছেন ঠিক একইভাবে। আয়না ধরলে নিঃশ্বাসের লক্ষণ আর ধরা পড়ছে না-তফাৎ শুধু এইখানে। বাহু থেকে রক্ত টেনে বার করার চেষ্টা ব্যর্থ হল। আমার ইচ্ছাশক্তি দিয়ে বাহুকে আর নাড়াতেও পারছিলাম না। সম্মোহনের ভাব দেখা যাচ্ছিল কেবল ভালডিমারের জিভে। যতবার প্রশ্ন করেছি, ততবার জিভ থরথর করে কেঁপে উঠেছে, যেন আপ্রাণ চেষ্টা করছে জবাব দেওয়ার-কিন্তু স্বর ফুটছে না। আমি ছাড়া অন্যরা প্রশ্ন করে ব্যর্থ হয়েছেন-এমন কি যুগ্ম-সম্মোহনের প্রভাবেও অন্যকে দিয়ে প্রশ্ন করে ফল পাইনি-ভালডিমারের জিভ নিথর থেকেছে। অন্য নার্সদের জুটিয়ে এনে তাদের জিম্মায় ভালডিমারকে রেখে দশটার সময়ে ডাক্তার দুজন আর মিঃ এল-কে নিয়ে বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে।

বিকেলের দিকে আবার সবাই এলাম রোগীকে দেখতে। অবস্থা আগের মতনই। আবার ওঁকে জাগানোর চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই, এ বিষয়ে একমত হলাম প্রত্যেকেই। পরিষ্কার

দেখা গেল, মৃত্যু বলতে যা বোঝায় সম্মোহনের প্রভাবে তাঁকে. আটকে রাখা সম্ভব হয়েছে। এ অবস্থায় ওঁকে ফের জাগাতে গেলে মৃত্যু ত্বরান্বিত হবে।

সেদিন থেকে গত সপ্তাহ পর্যন্ত, ঝাড়া সাত মাস একই ভাবে পড়ে থেকেছেন ভালডিমার। ডাক্তার এবং অন্যান্যদের নিয়ে দেখে এসেছি মাঝে মাঝে। নার্সদের তদ্বিরে ছেদ পড়েনি মুহূর্তের জন্যেও।

গত শুক্রবার ঠিক করলাম, আবার ওঁকে জাগানোর চেষ্টা করা যাক। সর্বশেষ এই এক্সপেরিমেণ্টের ফল শুভ হয়নি এবং এই নিয়েই যত কিছু কানাঘুষোর সূচনা ঘটেছিল আড়ালে আবডালে।

সম্মোহনী প্রক্রিয়ার বিধিমত হস্তচালনা করে বেশ কিছুক্ষণ বিফল হলাম। তারপর দেখাগেল কনীনিকা আস্তে আস্তে একটুখানি নামল নিচের দিকে। সেই সঙ্গে অত্যন্ত দুর্গন্ধময় হলদেটে রস বেরিয়ে এল নেমে আসা চোখের তারার আশপাশ দিয়ে ।

চেষ্টা করলাম ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে ভালডিমারের বাহু আবার চালনা করা যায় কিনা। ব্যর্থ হলাম। ডক্টর এফ-এর ইচ্ছানুসারে তখন একটা প্রশ্ন করলাম ঃ

''মঁসিয়ে ভালডিমার, এই মুহূর্তে আপনার ইচ্ছে বা অনুভূতি কি ধরনের, বলতে পারবেন ?''

মুহূর্তের মধ্যে হনু দুটোর ওপর জ্বরতপ্ত চক্রাকার লোহিত আভা জেগে উঠল। থরথর করে কেঁপে উঠল জিভ-যেন ভীষণ ভাবে ঘুরপাক খেতে লাগল ব্যাদিত মুখ গহ্বরের মধ্যে। চোয়াল আর ঠোঁট আগের মতই আড়ষ্ট ছিল বলে হাঁ হয়েছিল মুখটা এই সাত মাস। তার পরেই, বেশ কিছুক্ষণ পরে, কদাকার সেই স্বর ঠিকরে ঠিকরে বেরিয়ে এল জিভ দিয়ে ঃ

''ঈশ্বরের দোহাই !-তাড়াতাড়ি করুন !-তাড়াতাড়ি !-হয়, ঘুম পাড়িয়ে দিন-না হয় জাগিয়ে দিন !-এখুনি ! এখুনি ! আমি মারা গেছি !''

ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর ভালডিমারকে সুস্থিত করবার চেষ্টা করলাম। ব্যর্থ হলাম একেবারেই। চেষ্টা করলাম জাগাতে। ইচ্ছাশক্তি সংহত করে ধস্তাধস্তি করে গেলাম বললেই চলে। লক্ষ্য করলাম, কাজ হচ্ছে। ভালডিমারের সম্মোহনের প্রভাব কেটে যাবে এখুনি। ঘরশুদ্ধ লোক সাগ্রহে চেয়ে রইলেন কি হয় দেখবার জন্যে।

যা হয়েছিল, তা এমনই অসম্ভব কাণ্ড যা দেখার জন্যে প্রস্তুত থাকতে পারে না কোনো মানুষ।

দ্রুত হাত চালিয়ে যাচ্ছি আর রোমাঞ্চিত কলেবরে শুনে যাচ্ছি

বিকট, বীভৎস হাহাকার-'মারা গেছি! মারা গেছি!' কথাটা বেরোচ্ছে কিন্তু ঘুরপাক খাওয়া জিভ থেকে-ঠোঁট থেকে নয়। তারপরেই আচমকা আমার হাতের নীচেই পুরো দেহটা এক মিনিটের মধ্যে কুঁচকে, গুটিয়ে, ছোট্ট হয়ে গুঁড়িয়ে, একেবারে পচে গেল। বিছানাময় পড়ে রইল কেবল অতি জঘন্য, অতি দুর্গন্ধময় খানিকটা জলীয় পদার্থ।

মমির সঙ্গে কিছু কথা

(সাম ওয়ার্ডস্ উইথ এ মমি)

গত রাতের আলোচনা সভা বেশ ঝাঁকুনি দিয়ে গেছে আমার স্নায়ুমণ্ডলীকে। যন্ত্রণায় মাথা ফেটে যাচ্ছিল। আলোচনা শেষে হাওয়া খাওয়ার যে অভিসন্ধিটা মাথার মধ্যে ছিল, যন্ত্রণার চোটে তা নাকচ করতে বাধ্য হলাম। দু-মুঠো খেয়ে নিয়ে সোজা শয্যাগ্রহণ করলাম।

খেয়েছিলাম খুবই কম। হাল্কা খানা বলতে যা বোঝায়-তাই। ওয়েল্স খরগোস আমার অতি প্রিয় খাদ্য। দাম একটু বেশিই। তাই একেবারে পাউণ্ডখানেক খেয়ে ফেলাটা সমীচীন নয়। তাই বলে কি দু-পাউণ্ড খাওয়া যায় না? যায় বইকি। আমিও খাই। দুই আর তিনের মধ্যে ফারাক খুব একটা নেই বলে মাঝে মধ্যে তিন পাউণ্ডও মেরে দিই। চার পাউণ্ড সেঁটে দেওয়ার সাহসও দেখিয়েছি।

গিন্নি বলেন, পাঁচ পর্যন্ত নাকি সাঁটাই আমি। আর এখানেই দুটো সুস্পষ্ট ব্যাপারে গুলিয়ে ফেলেন ভদ্রমহিলা। পাঁচ বলতে আমি কিন্তু বোঝাচ্ছি ব্রাউন স্টাউট মদের বোতল। এই বস্তুই না থাকলে ওয়েলস-খরগোসও গলা দিয়ে নামতে চায় না।

এই হল গিয়ে আমার অতি সামান্য নৈশ আহার। খাওয়া দাওয়া সেরে, মাথায় রাতের টুপি লাগিয়ে, শয্যাগ্রহণ করেছিলাম। ভেবেছিলাম, এক ঘুমেই রাত কাবার তো করবোই-পরের দিন দুপুরের আগে আর চোখ খুলছি না।

প্রগাঢ় নিদ্রার আবির্ভাব ঘটেছিল তৎক্ষণাৎ।

কিন্তু মানুষ যা ইচ্ছা করে, তাই কখনো হয়? ইচ্ছাপূরণ যদি ঠিকঠাক ঘটে যেত, জগতের চেহারা হত অন্যরকম। তৃতীয় দফায় নাসিকা গর্জন সমাপ্ত করার আগেই কান ঝালাপালা হয়ে গেল দরজায়ঘণ্টাধ্বনিরভয়ানক শব্দে, পরক্ষণেই খটাখট খটাখট শব্দে বেজে উঠলো দরজার কড়া-আগন্তুকের ধৈর্য যেন শেষ সীমায় পৌঁছেছে।

এহেন নৈশ কলরবের পর কোন ভদ্রলোক নাক ডেকে যেতে পারে? আমারও ঘুম উড়ে গেল দু-চোখের পাতা থেকে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসতে যাচ্ছি-আমার সহধর্মিনী একটা চিরকুট নাড়তে লাগলেন নাকের সামনে।

চিঠি লিখেছেন আমার পুরোনো দোস্ত ডক্টর পোন্নোম্নার।

পত্রের বয়ান এই ঃ

"প্রিয় বন্ধু, এই লিপি হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে পড়ুন আমার সান্নিধ্য অভিমুখে। আসুন এবং আনন্দের আসরে অংশ নিন। অনেক দিন ধরে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সরকারি দপ্তরগুলো তছনছ করার পর অবশেষে পেয়েছি বহু প্রত্যাশিত সেই অনুমতি। মমিটাকে পরীক্ষা করার অনুমোদন দিয়েছেন সিটি মিউজিয়ামের ডিরেক্টররা। দরকার হলে মমি মহাশয়ের পটি খুলেও তাকে অবলোকন করতে পারি। মুষ্টিমেয় সুহৃদ উপস্থিত থাকছেন। হে বন্ধু, আপনি তাঁদের অন্যতম। মমি মহাশয় এসে গেছেন আমার আলয়ে-রয়েছেন বহাল তবিয়তে। রাত ঠিক এগারোটার সময়ে শুরু হবে তাঁর উদ্ঘাটন-পর্ব।

"আপনার চিরকালের মিত্র,

"পোন্নাম্নার"

"পোন্নাম্নার' স্বাক্ষর পর্যন্ত পৌঁছোনোর অনেক আগেই নিদ্রাদেবী একেবারেই পলায়ন করেছিলেন আমার অন্তরতম প্রদেশ থেকে। প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে ছিলাম পরম বিস্ময়ের আকর পত্রখানির দিকে।

পরমুহূর্তে আমি বিপুল পুলকে আত্মহারা হয়েলম্ফদিয়ে নেমে এলাম খাট থেকে-রাত্রিবাস টেনে খুলে ছুঁড়ে ফেললাম-পায়ের কাছে যা পড়লো, পদাঘাতে তা সরিয়ে দিলাম, চমকপ্রদ গতিবেগে জামা-কাপড় পরে নিলাম এবং প্রবলতর গতিবেগে ধেয়ে গেলাম ডক্টরের নিবাস অভিমুখে।

গিয়ে দেখি সাগ্রহে সবাই অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। অসহিষ্ণুতা প্রকট হয়ে রয়েছে প্রত্যেকেরই চোখে মুখে। খাবার টেবিলে শোয়ানো রয়েছে মমিটাকে। আমি ঘরে প্রবেশ করতে না করতেই শুরু হয়ে গেল তাকে খুঁটিয়ে দেখার পর্ব।

বছর কয়েক আগে পোন্নাম্নারের এক তুতো ভাই (তাঁর নাম ক্যাপ্টেন আর্থার সাব্রেতাশ্) এক জোড়া মমি এনেছিলেন

লিবিয়ান পর্বতমালার ইলিথিয়াস্ থেকে। জায়গাটা নীল নদীর ধারে-থিব্স থেকে বেশ দূরে। এই মমিটা সেই দুটির একটি।

মমি ছিল পাতালে-গুহার অনুকরণে নির্মিত প্রস্তর-কক্ষে। থিব্স-এর সমাধি-স্তম্ভগুলোর মতো অত জমকালো না হলেও গুহাকক্ষটি অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক শুধু এই কারণে যে মিশরিয়দের ঘরোয়া জীবনের বিস্তর চিত্র ছিল সেখানে। ফ্রেসকো পেন্টিং আর উৎকীর্ণ কারুকাজে ঢাকা প্রতিটি দেওয়াল। এছাড়াও ছিল বিস্তর মূর্তি, ফুলদানি আর অনুপম প্যাটার্নের মোজেক কারুকাজ। দেখলে বোঝা যায়, মৃত ব্যক্তি কুবেরের ঐশ্বর্য ভোগ করে গেছেন জীবদ্দশায়।

ক্যাপ্টেন সাব্রেতাস যেভাবে সম্পদ উদ্ধার করেছিলেন ঠিক সেইভাবে তা গচ্ছিত রেখেছিলেন মিউজিয়ামে। অর্থাৎ, কফিন খোলা হয়নি। আট বছর ছিল এইভাবেই-বাইরে থেকে শুধু দেখে গেছেন উৎসুক জনসাধারণ।

সেই মমি এখন আমাদের হেফাজতে। এ যে কত বড় সৌভাগ্য, তা বুঝবেন তাঁরাই যাঁরা জানেন, লাটঘাট করা হয়নি এমন সুপ্রাচীন দুষ্প্রাপ্য বস্তু এখন রীতিমত বিরল। অক্ষত অবস্থায় কিছুই আর পৌঁছোয় না এ দেশে।

হন হন করে গিয়ে দাঁড়ালাম টেবিলের সামনে। নয়ন সার্থক করলাম বাক্সটার দিকে তাকিয়ে। লম্বায় প্রায় সাত ফুট। চওড়ায় ফুট তিনেক। উচ্চতায় আড়াই। আয়তাকার বাক্স-কফিনের আকারে নয়। প্রথমে ভেবেছিলাম ডুমুর গাছের কাঠ দিয়ে তৈরী। কাটবার পরে দেখা গেল প্যাপিরাস থেকে বানানো কাগজের মণ্ড দিয়ে নির্মিত হয়েছে পুরো বাক্সটা। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া আর নানা ধরনের শোকব্যঞ্জক ছবি আঁকা রয়েছে আগাগোড়া। ছবির ফাঁকে ফাঁকে সাঙ্কেতিক লিখনের সারি-নিঃসন্দেহে লোকান্তরিত ব্যক্তির নামধাম। সৌভাগ্যক্রমে মিস্টার গ্লিডন ছিলেন আমাদের দলে। হরফগুলোর তর্জমা করে ফেললেন উনি অনায়াসেই। কঠিন মোটেই নয়। ধ্বনিতত্ত্ব অনুসারে শব্দচিত্র। পাওয়া গেল একটাই শব্দ।

আল্লামিস্টাকিও

না ভেঙেচুরে আধারটাকে খুলতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল আমাদের। কাজটা সুসম্পন্ন হওয়ার পর পাওয়া গেল আর একটা কফিনাকৃতি বাক্স-প্রথম বাক্সর চাইতে অনেক ছোট হলেও বাহ্যিক চেহারায় হুবহু একরকম। দুই বাক্সের ফাঁক ভরে রাখা হয়েছিল ধুনো দিয়ে। ফলে, কিছুটা বিবর্ণ হয়েছে ভেতরকার বাক্সের বাইরের রঙ।

এ বাক্সটাকে খুলে ছিলাম সহজেই। পেয়েছিলাম কফিনাকৃতি তৃতীয় বাক্স। দ্বিতীয় বাক্স থেকে তার কোনো ফারাক নেই।

বাক্সের উপাদান কিন্তু চিরহরিৎ সিডার কাঠ। শক্ত, লাল এবং সুগন্ধময়। অদ্ভুত সেই গন্ধ এখনো লেগে রয়েছে বাক্সের গায়ে। দ্বিতীয় আর তৃতীয় বাক্সের মধ্যে কোনো বস্তু ঠেসে দেওয়া হয়নি। দরকারও হয়নি। দুটো বাক্সই খাপে খাপে বসে রয়েছে। গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে। তৃতীয় আধারে পেলাম দেহটাকে-নিয়ে এলাম বাইরে। ভেবেছিলাম নিশ্চয় কাপড়ের পটি বা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে মোড়া থাকবে সেই দেহ। কিন্তু দেখলাম, প্যাপিরাস নির্মিত এক ধরনের খাপে ঢোকানো রয়েছে নশ্বর দেহটি-তার ওপরে রয়েছে প্লাস্টারের আস্তরণ। সোনালি প্রলেপ আর পেণ্টিং-এর পুরু চিত্রকর্ম দিয়ে সুদৃশ্য করা হয়েছে অপরূপ কোষ-টিকে। দেহমুক্ত আত্মার কি কি করণীয়, চিত্রকর্মে রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশ। কোন্ কোন্ দেব-দেবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দরকার তাদের ছবি। আর রয়েছে অগুন্তি মানুষের প্রতিকৃতি-নিঃসন্দেহে যারা দেহটিকে মলম লোশন-রসায়ন দিয়ে মমি বানিয়েছে-তাদের ছবি। ধ্বনিতত্ত্বমূলক সাঙ্কেতিক হরফ দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত লম্বালম্বিভাবে প্যাপিরাস-কোষে আবার লেখা হয়েছে পরলোকগত ব্যক্তির নাম আর উপাধি।

কোষমুক্ত করার পর দেখলাম গলা বেষ্টন করে রয়েছে কাঁচের পুঁতি দিয়ে নির্মিত চোঙার মতো একটা কলার, বহু বর্ণ রঞ্জিত। সাজানোর কায়দায় ফুটে উঠেছে বিভিন্ন উপাস্য দেবদেবী, পবিত্র গুবরে পোকা ইত্যাদি-ডানাওলা ভূগোলকও রয়েছে পুঁতি-ছবির মাঝে। কটি বেষ্টন করে রয়েছে অনুরূপ একটি কলার বা বেল্ট।

প্যাপিরাস ছিঁড়ে ফেলে দেখলাম মাংস এতটুকু নষ্ট হয়নি, নাকে কোন গন্ধ আসছে না। রঙটা লালচে। চামড়া শক্ত, মসৃণ এবং চকচকে। দাঁত আর চুল রয়েছে অতি উত্তম অবস্থায়। চোখ দুটো (মনে হলো) অপসৃত হয়েছে। সে জায়গায় বসানো হয়েছে কাঁচের চোখ। ভারি সুন্দর। অবিকল জীবন্ত চোখের মত। তফাৎ শুধু একটি ক্ষেত্রে-স্থির চাহনিটা যেন বড় বেশী অটল। আঙুল আর নখে ঝকঝকে সোনালি পালিশ।

ত্বকের লালচে ভাব দেখে মিস্টার গ্লিডন মনে করেছিলেন, নিশ্চয় আলকাতরা জাতীয় অ্যাসফাল্ট দিয়ে পচন-নিরোধক উপাদানটা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ইস্পাতের ছুরি দিয়ে একটুখানি চেঁচে, পাউডার বানিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করতেই নাকে ভেসে এল কর্পূর আর মিষ্টি গঁদের সুবাস।

নাড়িভুঁড়ি যে যে পথ দিয়ে বের করা হয়, সেই পথের সন্ধান করলাম প্রথমেই। এবং তাজ্জব হলাম। সেরকম কোন চিহ্নই পেলাম না। তখনও পর্যন্ত আমাদের এই ছোট্ট দলের কারোরই জানা ছিল না যে, গোটা বা অক্ষত মমি একেবারেই যে পাওয়া যায় না, তা নয়। তবে হ্যাঁ, নিয়মমাফিক মগজ বের করে আনা হয়

নাকের ফুটো দিয়ে, উদরের পাশের দিক কেটে টেনে আনা হয় অন্য অস্ত্র, তারপর দেহটাকে কামিয়ে, ধুইয়ে, নুন মাখিয়ে রেখে দেওয়া হয় কয়েক সপ্তাহ। পচন নিরোধন শুরু হয় তখন থেকেই।

কাটা-ছেঁড়ার কোন চিহ্নই যখন পাওয়া গেল না, ডক্টর পোনোন্নার ছুরি কাঁচি সাজাতে লাগলেন কাটাকুটি করার জন্যে। আমি দেখলাম রাত প্রায় দুটো। তাই সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম, পরের রাতে মমি দেহের ভেতরে কি আছে দেখা যাবে-কাটা ছেঁড়া এখন থাক।

রাতের মত বিদায় নেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে একজন বলে উঠলেন ভোলটেইক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাটারি দিয়ে একটা এক্সপেরিমেণ্ট করলে কেমন হয় ?

তিন থেকে চার হাজার বয়সী একটা মমির ওপর ইলেকট্রিসিটি প্রয়োগের আইডিয়াটা খুব সাধু না হলেও মৌলিক তো বটেই। ফলে রাজি হয়ে গেলাম তৎক্ষণাৎ। রীতিমত গুরুত্ব সহকারে সম্মতি দিলেন এক-দশমাংশ-বাকি সবাই রাজি হলেন স্রেফ রগড় দেখবার জন্যে। ডক্টরের স্টাডিরুমে একটা ব্যাটারি রেখে সেখানে বহন করে নিয়ে গেলাম মিশরিয় মমিকে।

বেশ কিছুক্ষণ মেহনৎ করার পরে রগের চামড়া ছাড়িয়ে সেখানকার কিছু পেশীকে নগ্ন করতে পারলাম। পারলাম শুধু এই কারণে যে রগ দুটোই কেবল শরীরের অন্যান্য জায়গার মত প্রস্তর-কঠিন হয়ে যায়নি বলে। কিন্তু ব্যাটারির তার ছোঁয়ানোর পরেও সে পেশীতে রাসায়নিক তড়িৎ-ক্রিয়া বিন্দুমাত্র দেখা গেল না-আমরাও অবশ্য সেইরকম আশাই করেছিলাম।

প্রথম প্রচেষ্টার ফল আশানুরূপ না হওয়ায় আমরা আমাদের উদ্ভট আইডিয়াকে বর্জন করলাম তৎক্ষণাৎ। একচোট হেসে নিয়ে সেই রাতের মতো পরস্পরের কাছে যেই বিদায় নিতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময়ে আমার চোখ পড়েছিল মমি মহাশয়ের দুই চোখের ওপর। বিষম বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে ফেলেছিলাম তৎক্ষণাৎ।

চকিতে দেখলেও যা দেখেছিলাম, তা ঠিকই দেখেছিলাম। যে-চক্ষু গোলক দুটিকে কাঁচ-নির্মিত বলে ধরে নিয়েছিলাম, এখন সেই দুটির খুব অল্পই দেখা যাচ্ছে চোখের পাতা তাদের অনেকখানি ঢেকে দেওয়ায়।

তারস্বরে চেঁচিয়ে প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম সেদিকে।

আঁৎকে উঠেছিলাম এ হেন দৃশ্য দেখে, এমন কথা কখনই বলবো না। কারণ ভয়ে কাঠ হয়ে যাওয়ার ধাত আমার নয়। তবে হ্যাঁ, ব্রাউন স্টাউট মদিরা আমার নার্ভগুলোকে একটু কাহিল

করে দেওয়ার ফলেই বোধ হয় কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গেছিলাম। অন্যান্যদের কথা আর বলবেন না। ভয়ের চোটে যেন গুটিয়ে গেছিলেন কেঁচোর মতই। ডক্টর পোন্নান্নার ভদ্রলোককে অনুকম্পা করার ছাড়া আর কিছু করা যায় না। কি এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় নিজেকে অদৃশ্য করে ফেললেন মিস্টার গ্লিডন। মিস্টার সিল্ক বাকিংহ্যাম চার হাত-প্যায়ে হামাগুড়ি দিয়ে সড়াৎ করে উধাও হয়ে গেলেন টেবিলের তলায়।

বিস্ময় আর বিভীষিকা-বোধের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাওয়ার পর ঠিক করলাম এক্সপেরিমেণ্টের আরও পর্বগুলো চালিয়ে যাওয়া যাক। অপারেশনের ক্ষেত্র নির্বাচন করলাম ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে। চামড়া চিরে 'আবডাকটর' মাসলের মূলে পৌঁছে গেলাম। ব্যাটারি ঠিকঠাক করে নিয়ে চেরাই নার্ভে তড়িৎ-প্রবাহ প্রয়োগ করলাম।

সজীব মানুষের মতো মমি মহাশয় ডান হাঁটু গুটিয়ে প্রায় ঠেকিয়ে ফেললো উদরে এবং পরক্ষণেই আচমকা পা সিধে করে এনে কল্পনাতীত শক্তি সহযোগে এমন একখানা লাথি মেরে বসালো ডক্টর পোন্নান্নারকে যে ভদ্রলোক গুলতি নিক্ষিপ্ত গুলির মতোই ছিটকে জানলা ভেঙে গিয়ে পড়লেন বাইরের রাস্তায়।

সদলবলে সিঁড়ি বেয়ে যখন ছুটছি ডক্টরের পিণ্ডি পাকানো দেহাবশেষ তুলে আনবার জন্যে, দেখলাম, ডক্টর নিজেই অকারণ ক্ষিপ্রতায় লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে আসছেন সিঁড়ি বেয়ে। জ্ঞানতৃষ্ণায় প্রোজ্জ্বল চোখমুখ। ভীষণ উৎসাহে এক্সপেরিমেণ্ট অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর।

তাঁর উপদেশেই এবার চেরা হল নাকের ডগার সামান্য অংশ। ভয়ানকভাবে কম্পিত হস্তে নাকটা টেনে এনে তারের অগ্রভাগ সেখানে ছোঁয়ালেন ডক্টর নিজেই।

আক্ষরিকভাবে এবং শরীরগতভাবে, চিন্তন এবং উপমা উভয়দিক দিয়েই-প্রতিক্রিয়াটা ঘটলো বিদ্যুৎ গতিতে। প্রথমেই চোখ খুললো মড়া এবং বিপুল বেগে চোখ পিটপিট করে গেল মিনিট কয়েক (নির্বাক অভিনেতা মিস্টার বার্নেস যেমন করেন); তারপর হ্যাঁচ্চো করে হেঁচে উঠলো বিচ্ছিরিভাবে, পরক্ষণেই উঠে বসলো পিঠখাড়া করে; অতঃপর মুঠি পাকিয়ে নাড়তে লাগলো ডক্টর পোন্নান্নারের মুখের ওপর; সবশেষে মিস্টার গ্লিডন এবং মিস্টার বাকিংহ্যামের দিকে ফিরে অত্যুৎকৃষ্ট মিশরিয় ভাষায় গড়গড় করে যে ধমকানিটা দিয়ে গেল, তা এই :

'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের ব্যবহারে আমি বিস্মিত এবং যৎপরোনাস্তি আহত। ডক্টর পোন্নান্নারের কাছ থেকে এর চাইতে অধিক আশা করা যায় না। ভদ্রলোক যেমন মোটা, তেমনি বেঁটে, মাথায় গোবরভর্তি-এই মগজে এর চাইতে বেশি

জানগম্যি থাকতে পারে না। তাই না হয় ওঁকে দয়া করে ক্ষমা করলাম। কিন্তু মিঃ গিলডন আপনি-আপনি সিন্ধ-আপনারা মিশর চষে ফেলেছেন, মিশরের মানুষ বলেই মনে হয় আপনাদের, মিশরের ভাষা বলেন অবিকল মিশরিয়দের মতনই-ধরে নিচ্ছি মাতৃভাষাটাও বলেন সেইভাবে-বরাবর জানতাম আপনারা দুজনেই মমিদের প্রাণের বন্ধু-আপনাদের কাছ থেকে সত্যিকারের ভদ্রলোকের মতো ব্যবহারটা আশা করেছিলাম। অত্যন্ত জঘন্যভাবে আমার দেহটাকে কাজে লাগানো হচ্ছে দেখেও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কিভাবে? আপনারা দেখেছেন যদু-মধু আমাকে কফিন থেকে টেনে বের করছে (এই রকম বিচ্ছিরি ঠাণ্ডায়) অনুমতিটা দিলেন কিভাবে? মোদ্দা কথায় তাহলে আসা যাক, শয়তানের শিরোমণি ডক্টর পোন্নোন্নারের কী অধিকার আছে আমার নাক মলে দেওয়ার? জানতে পারি কি, জঘন্য এই লোকটার সঙ্গে কি ধরনের আঁতাত পাকিয়ে বসে আছেন?'

সঙ্গত কারণেই বলা যায়, এহেন পরিস্থিতিতে এই ভাষণ শোনবার পর আমাদের সকলেরই হয় টেনে দৌড় লাগানো উচিত ছিল দরজার দিকে, অথবা মৃগী রুগীদের মতো হাত-পা ছুঁড়ে দাঁত-কপাটি লাগানো উচিত ছিল, নতুবা এক যোগে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তিনটির যে কোন একটি অথবা সবকটিই সংঘটিত হলে মানিয়ে যেত। কিন্তু কেন যে কেউই করিনি, তা আজও ভেবে পাই না। হয়তো বয়স হয়েছে বলেই এইগুলির কোনটির মধ্যে যাইনি। অথবা হয়তো রক্ত জল করা কথাগুলোও অতিশয় স্বাভাবিকভাবে মমি মহাশয় বলে গেছিল বলেই বিন্দুমাত্র বিচলিত হইনি, মোট কথা আমাদের মধ্যে কেউই মমির ধমকধামকে ঘাবড়ে যায়নি-অথবা অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটে গেল-এমন ভাবনাও সেই মুহূর্তে মাথায় আনতে পারেনি।

আমার কথাই বলা যাক। যা ঘটেছে স্বাভাবিক, মনের মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে শুধু একটু সরে দাঁড়িয়েছিলাম-যাতে মিশরিয় ঘুসির আওতার বাইরে থাকা যায়। ডক্টর পোন্নান্নার ট্রাউজার্সের দুই পকেটে দু-হাত ঠুসে কটমট করে তাকিয়ে রইলেন মমির দিকে-অতিরিক্ত মাত্রায় আরক্ত সে মুখ বাস্তবিকই দেখবার মতো। গোঁফে তা দিতে দিতে শার্টের কলার ঠিক করতে লাগলেন মিস্টার গিলডন। মাথা হেঁট করে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মুখবিবরের বাম কোণে স্থাপন করে দাঁড়িয়ে রইলেন মিস্টার বাকিংহাম।

মমি মহাশয় শক্ত মুখে কিছুক্ষণ তা দেখে নিয়ে বললে কণ্ঠস্বরে অবজ্ঞা ছিটিয়ে:

'কথা বলছেন না কেন, মিস্টার বাকিংহ্যাম? কানে ঢুকছে

কি বললাম ? মুখ থেকে বুড়ো আঙুলটা সরান।'

একটু চমকে উঠলেন মিস্টার বাকিংহ্যাম। বুড়ো আঙুলটা মুখের বাঁ কোণ থেকে সরিয়ে এনে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সংস্থাপন করলেন মুখের ডান কোণে।

মিঃ বাকিংহ্যামের কাছে জবাব না পেয়ে সুপ্রাচীন মূর্তিটা রাগতভাবে তাকালো মিঃ গ্লিডনের দিকে এবং রীতিমত প্রভুত্বব্যঞ্জক গলায় জানতে চাইলো মানে কি এ সবের।

অনেকক্ষণ সময় নিলেন মিঃ গ্লিডন জবাবটা দিতে। ধ্বনিতত্ত্ব প্রকৌশলে উনি যে বক্তব্য হাজির করেছিলেন, আমেরিকান ছাপাখানায় সেই সাঙ্কেতিক লিখনের হরফগুলো না থাকায় তাঁর অপূর্ব ভাষণটা হুবহু আমাদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে পারলাম না।

এই সুযোগে একটা কথা বলে রাখি। মমির সঙ্গে এখন থেকে যেসব আলোচনা হয়েছে, তাতে অনুবাদকের ভূমিকা নিয়েছেন মিঃ গ্লিডন এবং মিঃ বাকিংহ্যাম। কথাবার্তা হয়েছে সেকেলে মিশরিয় ভাষায়—যে ভাষা জানি না আমি এবং আরো কয়েকজন। আলোচনার মধ্যে আধুনিক প্রসঙ্গ যখনি এসেছে, মিশরিয় ভাষাবিদ দু'জন হালে পানি পাননি। তখন অঙ্গভঙ্গী করে, ছবি এঁকে জিনিসটা বোঝাতে হয়েছে। যেমন, 'পলিটিকস' বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মিঃ গ্লিডনকে কাঠকয়লা দিয়ে দেওয়ালে আঁকতে হয়েছে একটা বিচিত্র মূর্তি। বিষফোড়ার মতন নাকওলা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে কাটা গুঁড়ির ওপর। বাঁ পা পেছনে টেনে, ডান হাত সামনে বাড়িয়ে রয়েছে। হাতের মুঠো বন্ধ, ঊর্ধ্বনেত্র মুখবিবর নব্বই ডিগ্রি কোণে উন্মুক্ত। 'হুইগ' নামে রাজনৈতিক দলের আধুনিকীকরণ কী, তা বোঝাতে গিয়ে একেবারে ফ্যাকাসে মেরে গেলেন মিঃ বাকিংহ্যাম।

মমির দেহ কফিন থেকে বের করে এনে তার দেহ চিরে দেখলে বিজ্ঞানেরই উপকার, এই বিষয়টা শেষ পর্যন্ত বোঝাতে পেরেছিলেন মিঃ গ্লিডন অনেক ক্ষমা-টমা চেয়ে এবং সর্তক ছিলেন আগাগোড়া যাতে আল্লামিসটাকিও নামক মমি মহাশয়ের আঁতে ঘা না লাগে। ডক্টর পোন্নান্নার ছুরি কাঁচি নিয়ে তৈরী হয়েছিলেন বিজ্ঞানের স্বার্থে; এটা ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়ার পর আল্লামিসটাকিও হৃষ্টচিত্তে টেবিল থেকে নেমে করমর্দন করে নিলে প্রত্যেকের সঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গে স্ক্যালপেল দিয়ে কাটা জায়গাগুলো নানারকমভাবে মেরামত করে দিলাম সবাই মিলে। রগের কাটা চামড়া সেলাই করে দিলাম, পায়ের বুড়ো আঙুলে ব্যাণ্ডেজ করলাম এবং নাকের ডগায় কালো রঙের এক বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ প্লাস্টার লাগিয়ে দিলাম। কাউণ্ট আল্লামিসটাকিও (এইটাই তার খেতাব)

শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে দেখে ডক্টর তাঁর জামা কাপড়ের আলমারি থেকে এনে দিলেন তাঁর কালো ড্রেস কোট, আকাশি-নীল ডোরাকাটা প্যাণ্টালুন, গোলাপি শার্ট, সাদা ওভারকোট, হুকের মতো বেঁকানো ছড়ি, কিনারাহীন টুপি, চামড়ার বুট, ফিকে হলদে রঙের দস্তানা, আই গ্লাস, দাড়ি গোঁফ আর গলবন্ধ। দুজনের সাইজ দু'রকম বলে (ডক্টরের দু-গুণ লম্বা কাউণ্ট) পরিধেয় পরাতে বেগ পেতে হলো রীতিমতো। বস্ত্রাবৃত হওয়ার পর মিশরিয়র হাত ধরে মিঃ গ্লিডন নিয়ে গেলেন আগুনের চুল্লির পাশে এবং বেল বাজিয়ে চুরুট আর মদিরা আনতে হুকুম দিলেন ডক্টর।

অচিরেই জমে উঠল আলাপ। সবচেয়ে বেশী ঔৎসুক্য প্রকাশ পেলো আল্লামিসটাকিও-র এখনো জীবিত থাকার ব্যাপারটা নিয়ে।

মিঃ বাকিংহ্যাম তো বলেই ফেললেন-'আমি তো ভেবেছিলাম এতদিনে অক্কা পেয়েছেন।'

বিষম অবাক হয়ে উত্তর দিয়েছিল কাউণ্ট-'কেন বলুন তো? আমার বয়স তো মোটে সাতশোর একটু বেশি! আমার বাবা বেঁচেছিলেন এক হাজার বছর-মারা গেছিলেন নিরেট শরীর আর সতেজ মগজে-বার্ধক্য তাঁকে ছুঁতেই পারেনি।'

বেশ কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হয়ে গেল এই সময়ে। শেষকালে জানলাম, মমি মহাশয়ের বয়সের ভুল হিসেব কষেছি প্রত্যেকেই। কফিনস্থ হওয়ার সময় থেকে কাউণ্টের সঠিক বয়সটা পাঁচ হাজার পঞ্চাশ বছর কয়েক মাস।

মিঃ বাকিংহ্যাম বললেন আমতা আমতা করে-'কফিনে ঢোকবার সময়ে আপনার বয়স কত ছিল, তা তো জানতে চাইনি। অ্যাসফাল্টার লাগানোর পর থেকে বিরাট সময়ের ফারাকটা নিয়ে ধাঁধায় পড়েছিলাম।'

'কী লাগানোর পর?' কাউণ্টের প্রশ্ন।

'অ্যাসফাল্টার'।

'বুঝেছি কি বলতে চান। আমাদের সময়ে ব্যবহার করা হতো বাইক্লোরাইড অব মারকারি।'

'তা না হয় বুঝলাম', বললেন ডক্টর পোন্নান্নার-'কিন্তু পাঁচ হাজার বছর পরেও বহাল তবিয়তে এত ফূর্তি নিয়ে আছেন কি করে সেটাই তো মাথায় ঢুকছে না।'

'মরে তো যাইনি। মিট ব্যামোয় জ্ঞান ছিল না। বন্ধুরা ভাবলে ধড়ে প্রাণ নেই। শব-সংরক্ষণ করে ফেলা যাক। শব-সংরক্ষণ ব্যাপারটা বোঝেন?'

'পুরোপুরি না।'

'সেটা আঁচ করেছিলাম। অজ্ঞতার কী শোচনীয় অবস্থা! খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়ে সংক্ষেপে বলছি। দেহটার জান্তবতাকে

অনন্তকালের জন্যে বন্দী করে রাখার নাম শব-সংরক্ষণ। জ্যান্তবত্তা বলতে বোঝাচ্ছি শুধু শরীরের দিক দিয়ে–তার বেশী কিছু নয়। শব-সংরক্ষণের সময়ে শরীরে যে ধরনের জ্যান্তবত্তা ছিল, তা যেন বজায় থাকে অনন্তকাল। আমার কপালটা ভালো। স্ক্যারাবিয়াস-এর রক্ত রয়েছে ধমনীতে। তাই জ্যান্ত শব-সংরক্ষণ হয়েছে আমার ক্ষেত্রে এবং তা দেখতেই প্যাচ্ছেন।'

'স্ক্যারাবিয়াস-এর রক্ত! মানে গুবরে পোকার রক্ত!' যেন আঁতকে উঠলেন ডক্টর পোম্মান্নার।

'স্ক্যারাবিয়াস মানে গুবরে পোকা ঠিকই-কিন্তু প্রাচীন মিশরে স্ক্যারাবিয়াস ছিল অত্যন্ত খানদানি প্রজাতির বংশ প্রতীক। 'স্ক্যারাবিয়াসের রক্ত' বলতে বোঝাচ্ছি সেই বংশের মানুষ আমি। আলঙ্কারিক অর্থ বোঝেন না?'

'কিন্তু তার সঙ্গে আপনার বেঁচে থাকার সম্পর্কটা কি?'

'আরে মশায়, মিশরের সাধারণ রীতিনীতি অনুযায়ী শব-সংরক্ষণের আগেই মড়ার মধ্যে থেকে বের করে নেওয়া হয় মগজ আর নাড়িভুঁড়ি। হয়না শুধু স্ক্যারাবিয়াস বংশধরদের ক্ষেত্রে। এই বংশে না জন্মালে আমার মগজ আর নাড়িভুঁড়িও কি থাকতো? এগুলো না থাকলে বেঁচে থাকাটাও তো একটা ঝঞ্ঝাট।'

'তাহলে কি বলতে চান গোটা মমি যতগুলো এসেছে এদেশে, সবই স্ক্যারাবিয়াস বংশের?' প্রশ্ন রাখলেন মিঃ বাকিংহ্যাম।

'নিঃসন্দেহে।'

মিনমিন করে বলে উঠলেন মিঃ গ্লিডন–'আমি তো ভেবেছিলাম, মিশরের অন্যতম দেবতার নাম স্ক্যারাবিয়াস।'

'অন্যতম কি বললেন?' তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে কাউণ্ট।

'দেবতা'। বিলক্ষণ ঘাবড়ে যান পর্যটক মশায়।

'মিঃ গ্লিডন, আপনার কথা বলার ধরন দেখে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাচ্ছে আমার।' ফের আসন গ্রহণ করতে করতে কড়া গলায় বলে গেল কাউণ্ট–'পৃথিবীর কোন জাতই এক দেবতার বেশী কাউকে ঈশ্বর' বলে মানে না। স্ক্যারাবিয়াস, আইবিস ইত্যাদি প্রত্যেকের মাধ্যমে সেই স্রষ্টার কাছেই পুজো পাঠানো হয় সরাসরি, তাঁর কাছে কিছু নিবেদন করা কি অসম্ভব ধৃষ্টতা নয়?'

কিছুক্ষণ কারো মুখে আর কথা নেই। তারপর শুরু করলেন ডক্টর পোম্মান্নার-'আপনার সমাধির ধারে কাছে স্ক্যারাবিয়াস বংশের বা প্রজাতির আরও অনেকের মমি থাকা তাহলে সম্ভব?'

'এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না,' ঝটিতি জবাব দেয়

কাউণ্ট–'জীবিত অবস্থায়'যাদের শব-সংরক্ষণ করা হয়েছে, তারা এখনও জলজ্যান্ত রয়েছে। এদের মধ্যে কাউকে কাউকে ইচ্ছে করেই করা হয়েছে–অথবা হয়তো খেয়াল করা হয়নি। তারা এখনো বেঁচে শুয়ে আছে সমাধি গহ্বরে।'

'ইচ্ছে করেই' কথাটা বললেন কেন?' এবার প্রশ্ন আমার।

'বললাম এই কারণে যে,' এই পর্যন্ত বলে আই-গ্লাসের মধ্যে দিয়ে আমাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে নেয় কাউণ্ট–সরাসরি প্রশ্ন করেছিলাম সেই প্রথম–'আমাদের সময়ে মানুষের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল ছিল প্রায় আটশো বছর, অসাধারণ দুর্ঘটনায় কেউ কেউ মারা যেত ছশো বছরের আগে। কেউ কেউ বাঁচত হাজার বছর। কিন্তু আটশোই ছিল স্বাভাবিক। শব-সংরক্ষণ প্রক্রিয়াটার আবিষ্কারের পর জ্ঞানীগুণীরা ঠিক করলেন এই স্বাভাবিক আয়ুষ্কালকে কয়েক কিস্তিতে ভাগ করে নিয়ে বেঁচে থাকলে বিজ্ঞানের উপকার ঘটবে। ইতিহাসের ক্ষেত্রে দেখা গেল এই ধরনের একটা ব্যাপার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ধরুন, পাঁচশো বছর বেঁচে থাকার পর একজন ঐতিহাসিক ইতিহাসের বই লিখে ফেলে নিজেকে শব-সংরক্ষণ করে নিলেন। বলে গেলেন, যেন পাঁচ-ছ-শ' বছর পরে তাঁকে জাগানো হয়। সমাধি গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি দেখবেন, তাঁর নিজের লেখা ইতিহাসই এলোমেলো তথ্য-সংগ্রহ করে দাঁড়িয়েছে পরবর্তীকালের ঘটনা প্রবাহের ফলে এবং সমালোচকরা বিস্তর ধাঁধা, অনুমান, আর ব্যক্তিগত কলহ ইতিহাসের মধ্যে মন্তব্য আকারে লিপিবদ্ধ করে মূল ইতিহাসকে আরও জটিল করে ফেলেছেন। ঐতিহাসিক মশায়কে তখন লণ্ঠন হাতে ঐসব টীকা-টিপ্পনীর অরণ্য ভেদ করে নিজের লেখা মূল ইতিহাসকে খুঁজে বের করতে হবে। তারপরে নতুন করে লিখতে হবে নিজের অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য মিশিয়ে। এইভাবেই আমাদের ইতিহাস সমাধির ভেতর থেকে বারে বারে বেরিয়ে এসে লেখা হয়েছে বলেই মিশরের ইতিহাস ইতিহাসই রয়েছে–নিছক উপকথা হয়ে দাঁড়ায়নি।'

ডক্টর পোন্নান্নার আলতোভাবে হাত রাখলেন কাউণ্টের বাহুতে–'একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?'

'স্বচ্ছন্দে,' কথার ঝোঁক কাটিয়ে ওঠে কাউণ্ট।

'ইহুদিদের গুপ্ত ঐতিহ্য কাবালা কি ইতিহাসের অনুমোদন পেয়েছিল আপনাদের সময়ে?'

'কাবালার অলিখিত সব ব্যাপারই যে পুরোপুরি ভুলে ভরা নয়, তা জানা গেছিল।'

'সৃষ্টি সম্বন্ধে আপনাদের ঐতিহাসিকদের ধারণা কী ছিল বলবেন? মাত্র হাজার বছর আগে বিশ্বব্যাপী কৌতূহল জেগেছে

এ ব্যাপারে-নিশ্চয় আপনার অজানা নয়।'

'কী বললেন ?'

কাউণ্ট আল্লামিসটাকিও-কে বোঝাতে অনেকটা সময় নিলেন ডক্টর।

'অদ্ভুত আইডিয়া!' শুরু হল কাউণ্টের বিস্ময়ের প্রকাশ-'ব্রহ্মাণ্ডের যে একটা শুরু আছে, এই ধারণাটাই কারো মাথায় আসেনি আমাদের সময়ে। মানুষ জাতটার শুরু সম্বন্ধে আবছা একটা কথা শুনেছিলাম। আদম, মানে, লাল মাটি শব্দটাও শুনেছিলাম একজনের কাছে। আদমকেই নাকি মানুষ সৃষ্টির কাজে লাগানো হয়েছিল। জাতিগত অর্থে শুনেছিলাম নামটা। পচা মাটি থেকে নীচু শ্রেণীর প্রাণীর অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছিল আগে। পাঁচ দঙ্গল মানুষ একই সময়ে অঙ্কুরের মত গজিয়ে উঠেছিল ভূগোলকের পাঁচটি প্রায় সমান সুস্পষ্ট অঞ্চলে।'

শুনে তো তাৎপর্যপূর্ণ কাঁধ ঝাঁকুনি দিলাম আমরা প্রত্যেকেই। দু-একজন নিজেদের কপাল ছুঁয়ে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন অব্যক্ত অনেক কথা। মিঃ সিল্ক বাকিংহ্যাম দেখে নিলেন প্রথমে কাউণ্টের মাথার পিছন দিকটা, তারপর কপাল থেকে চাঁদি পর্যন্ত।

বললেন স্পষ্ট গলায়-'মিশরিয়রা যে ইয়াঙ্কিদের চেয়ে বিজ্ঞানে অনেক পেছিয়েছিল, তার জন্যে দায়ী মিশরিয়দের মাথার খুলি।'

'মাথার খুলির সঙ্গে বিজ্ঞানের কি সম্পর্ক বুঝিয়ে দেবেন ?' বিলক্ষণ হুঁশিয়ার হয়ে শুধোয় মমি ভদ্রলোক।

সমস্বরে সবাই বলে উঠলাম, মাথার খুলি পরীক্ষা করে চরিত্র জানবার বিজ্ঞান ফ্রেনোলজি সম্বন্ধে দু-চারকথা। অ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজম্-এর অদ্ভুত কীর্তিকলাপ নিয়েও মুখর হলাম প্রত্যেকে।

কাউণ্ট আল্লামিসটাকিও মন দিয়ে শুনে গেল প্রতিটি কথা। প্রশ্ন করে জেনে নিল আরও কিছু তথ্য। তারপর যা বললে, তা থেকে জানলাম, করোটি বা মস্তিষ্ক-বিজ্ঞান বহু আগেই মিশরে উন্নতির শিখরে উঠে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। আর মেসমার সাহেবের 'অ্যানিম্যাল ম্যাগনেটিজম' নামক চালাকিকে অনুকম্পার চোখেই দেখা হয়েছে-সে তুলনায় থিবস-এর পণ্ডিতরা অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম জানতেন-উকুন এবং ঐ জাতীয় বস্তু সৃষ্টি করতে পারতেন।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, মিশরিয়রা সূর্যগ্রহণ আর চন্দ্রগ্রহণের হিসেব জানতো কিনা। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে কাউণ্ট বলেছিল-'জানতো বইকি।'

দমে গেছিলাম। জ্যোতির্বিজ্ঞানে মিশরিয় পারদর্শিতা সম্বন্ধে

প্রশ্ন তুলেছিলাম। পাশের ভদ্রলোকটি আমার কানে কানে বলেছিলেন, টলেমি আর প্লুটার্চ পড়ে নিতে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম মিশরের লোক আতস কাঁচ আর লেন্স তৈরী করতে জানতো কিনা। পাশের ভদ্রলোক আবার আমাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন-বলেছিলেন অমুক বইটা পড়ে নিই যেন। ঠিক এই সময়ে কাউণ্ট জিজ্ঞেস করে বসলো, এমন কোন অনুবীক্ষণ কি আমরা বানিয়েছি যা দিয়ে দামী পাথরের ওপর উঁচু করা নকশা খোদাই করা সম্ভব? ঠিক যেভাবে করতো মিশরিয়রা? কী জবাব দেয় যখন ভাবছি, ক্ষুদে মানব ডক্টর পোয়ায়ার আলোচনা নিয়ে এলেন অন্য খাতে।

বললেন-দেখেছেন আমাদের ভাস্কর্য? জানেন আমেরিকায় কি বিশাল বিশাল ইমারত আছে? ক্যাপিটল বিল্ডিং-এর শুধু দরদালানেই আছে বিয়াল্লিশটা থাম। প্রত্যেকটার ব্যাস পাঁচ ফুট। দশ ফুট ব্যবধানে সাজানো।' পর্যটক দুজন এই সময়ে চিমটি কেটে কেটে কালসিটে ফেলে দিয়েছিল ডক্টরের শ্রীঅঙ্গে-কিন্তু তাঁকে থামানো যায়নি।

মোলায়েম হেসে বলেছিল কাউণ্ট-'আজনাক শহরের প্রধান অট্টালিকাগুলোর আকার আয়তন এত বছর পরে মনে করতে পারছি না-কিন্তু আমার শব-সংরক্ষণের সময়েও বিশাল ধ্বংসাবশেষ ছিল থিব্‌স-এর পশ্চিমে। দরদালানের প্রসঙ্গ যখন তুললেন, তখন বলি: কারনাক নামে একটা শহরতলির অতি নিকৃষ্ট একটা প্রাসাদে থামের সংখ্যা ছিল একশো চুয়াল্লিশ, প্রতিটার পরিধি সাঁইত্রিশ ফুট, বাইশ ফুট ব্যবধানে সাজানো। নীলনদ থেকে এই দরদালানে যেতে হত দু'মাইল লম্বা বীথির মধ্য দিয়ে-দু'পাশে সাজানো ছিল সারি সারি স্ফিংক্স, মূর্তি, চতুষ্কোণ ছুঁচোলো থাম-প্রত্যেকটার উচ্চতা কুড়ি ফুট, ষাট ফুট আর একশ ফুট। প্রাসাদটাই ছিল লম্বাই দু'মাইল, পরিধিতে সাত মাইল। প্রতিটি দেওয়ালের ভেতরে বাইরে ছিল সাঙ্কেতিক লিখন। সবিনয়ে বলতে পারি, দুশো থেকে তিনশো 'ক্যাপিটল' বিল্ডিংকে ঠেসেঠুসে ঢুকিয়ে দেওয়া যেত প্রাসাদ-প্রাকারের চৌহদ্দির মধ্যে। মনে রাখবেন, কারনাকের এই প্রাসাদ সত্যিকারের প্রাসাদের তুলনায় কিছুই নয়।'

'ফোয়ারা ছিল প্রাসাদে?' মোক্ষম প্রশ্ন করলেন ডক্টর।

'তা অবশ্য ছিল না। মিশরে কোথাও এ জিনিস ছিল বলে মনে পড়ে না,' কাউণ্টের জবাব।

'রেল রাস্তা?' আমার প্রশ্ন।

'ওরকম বাজে জিনিস না থাকলেও ছিল লোহার রাস্তা যার ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হত গোটা মন্দির আর নিরেট চতুষ্কোণ, দেড়শ ফুট উঁচু থাম।'

'দানবিক যন্ত্রশক্তি কি ছিল মিশরে?' প্রশ্ন করেছিলাম সবেগে।

'সেরকম কিছু না থাকলেও কখনো কি ভেবেছেন কারনাকের ওই নিকৃষ্ট প্রাসাদের ভারি ভারি পাথরগুলো কিভাবে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অত উঁচুতে?'' কাউণ্টের সংক্ষিপ্ত জবাব।

'উৎস কূপ?' আমায় রোখে কে?

অবজ্ঞাভরে ভুরু তুলে শুধু তাকিয়েছিল কাউণ্ট। সাত তাড়াতাড়ি নিম্ন কণ্ঠে আমাকে শুনিয়ে দিলেন মিঃ গ্লিডন-গ্রেট ওয়েসিসে এই সেদিন পাওয়া গেছে একটা আর্টেজীয় কূপ-যার জল ভেতরের চাপে আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে বাইরে। উঁচু মানের ইঞ্জিনীয়ার তাহলে ছিল মিশরে।

এরপর এসেছিলাম ইস্পাত প্রসঙ্গে। নাক উঁচু করে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিল মমি মশায়, তামার তৈরী হাত-যন্ত্র দিয়ে ছুঁচোলো চতুষ্কোণ থামে যে সূক্ষ্ম খোদাই কর্মগুলো করা হয়েছে-ইস্পাতের কোন হাত-যন্ত্র কি তা করতে পারতো?

এহেন জবাব পেয়ে বিলক্ষণ দমে গেলাম প্রত্যেকেই। নাছোড়বান্দার মতো অধিবিদ্যার তর্ক তুলতেই কাউণ্ট ভদ্রলোক এক জবাবেই শুইয়ে দিয়েছিল আমাদের। এ সবই তো সে যুগের অতি-সাধারণ ব্যাপার। অতি মামুলি কাণ্ডকারখানা। নচ্ছার বিষয় বলেই বেশিদূর এগোয়নি।

'গণতন্ত্র?' ভেবেছিলাম বুঝি এবার কুপোকাৎ করা যাবে মমিকে। 'রাজাহীন রাজত্ব?'

জবাব শুনে কুপোকাৎ হলাম আমরাই। এ ধরনের একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার অনেক আগেই নাকি ঘটে গেছে মিশরে। তেরোটা প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে, পণ্ডিত ব্যক্তিদের একত্র করে রচনা করেছিল অত্যন্ত মৌলিক একটা সংবিধান। কিছুদিন চলেছিল ভালই। উদ্যোক্তাদের দোষ ছিল একটাই-সীমাহীন বড়াই। তারপর প্রচণ্ড স্বেচ্ছাচারিতা অবসান ঘটায় গণতন্ত্রের-সবকটা প্রদেশ মিলে এক হয়ে যায় শেষ কালে।

প্রশ্ন করেছিলাম-'কি নাম ছিল সেই অত্যাচারীর?'

'যদ্দুর মনে পড়ে নাম তার Mob।'

কী জবাব দেব ভেবে না পেয়ে গলা চড়িয়ে বলেছিলাম, 'বাষ্প কি জিনিস, তা জানতই না মিশরিয়রা।'

আবার খোঁচা খেয়েছিলাম পাশ থেকে। কাউণ্টও সবিস্ময়ে তাকিয়েছিল আমার দিকে, নীরব সঙ্গী ফিসফিস করে বলেছিল-'কী মুসকিল। সলোমনের আমলেই 'হিরো'র আবিষ্কার থেকে মর্ডান স্টিম ইঞ্জিন এসেছে-এটাও জানো না?' বুঝলাম, মমি আমাদের হারাবেই। দিশেহারা হয়ে ডক্টর বলেছিলেন,-'এ যুগের এমন সুন্দর জামাকাপড় কি ছিল মিশরে?'

নিজের অঙ্গে কোনোমতে ফিট করা বিলকুল বেমানান পোশাকের দিকে চেয়ে আকর্ণ হেসেছিল কাউণ্ট-কোন জবাব দেয়নি।

ডক্টর পোন্নাম্মার এবার চলে এসেছিলেন নিজের আবিষ্কৃত এমন একটি বটিকা-প্রসঙ্গে, যা নিয়ে পাঁচজনের সামনে আলোচনা করা যায় না।

কান পর্যন্ত লাল হয়ে গেছিল কাউণ্টের। জবাব দেয়নি, মড়ার মতো বসেছিল চেয়ারে।

এই সুযোগে বিদায় নিলাম। বাড়ী ফিরলাম ভোর চারটের সময়ে। ঘুমোলাম সকাল সাতটা পর্যন্ত। এখন বাজে বেলা দশটা। সমস্ত ব্যাপারটা লিখলাম আমার পরিবারের এবং দেশের মঙ্গল কামনায়। নিজের জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে পড়েছি। ঊনবিংশ শতাব্দীটা এখন দু'চোখের বালি। ২০৪৫ সালে কে প্রেসিডেণ্ট হবেন, জানবার জন্যে ছটফট করছি। দাড়ি কামিয়ে কাপ দুয়েক কফি খেয়েই যাবো পোন্নাম্মারের বাড়িতে। দুশো বছরের জন্যে শব-সংরক্ষণ করাতেই হবে আমার এই দেহটার।

কাউণ্ট আল্লামিসটাকিও বলে দেবে প্রক্রিয়াটা।

ডক্টর আলকাতরা ও প্রফেসর পালক

(দ্য সিসটেম অফ ডক্টর টার অ্যাণ্ড প্রফেসর ফেদার)

পাগলা গারদটার সুনাম শুনেছিলাম প্যারিসে থাকতেই। দক্ষিণ ফ্রান্সে বেড়াতে গিয়ে এসে পড়লাম এরই কাছাকাছি। ইচ্ছে হলো ভেতরে ঢুকে দেখে যাই-জীবনে তো পাগলদের হাসপাতালে ঢুকিনি-বিশেষ করে এই ধরনের প্রাইভেট পাগলা গারদ দেখবার সুযোগ আর নাও পেতে পারি।

আমার সঙ্গে ছিলেন যে ভদ্রলোক, তাঁর সঙ্গে পথেই আলাপ-দিন কয়েক আগে। পাগলা গারদ ঘুরে যাওয়ার ইচ্ছেটা তাঁর কাছে প্রকাশ করতেই ভদ্রলোক শিউরে উঠলেন। এ সব জায়গার নাম শুনলেই নাকি তাঁর গা শিরশির করে। ঢোকার প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং যেতে হবে আমাকে একা-তিনি আমাকে সঙ্গ দিতে পারবেন না।

কিন্তু পাগলা গারদে তো যে কেউ হুট করে ঢুকে পড়তে পারে না। সুপারিশ-টুপারিশ আনতে হয়। আমার কাছে সেরকম কিছুই নেই। ঢুকবো কি করে?

সঙ্গী ভদ্রলোক অভয় দিলেন। বিশেষ এই প্রাইভেট পাগলা গারদের সুপারিণ্টেনডেণ্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল বছর কয়েক আগে। নাম তাঁর মঁসিয়ে মেলার্ড। আমাকে নিয়ে গিয়ে পরিচয়টা করিয়ে দেবেন-তার বেশী

না-নিজে ঢুকবেন না ভেতরে।

করলেনও তাই। দুজনে ঘোড়া নামিয়ে আনলাম মূল সড়ক থেকে। ঘাস-ছাওয়া মেঠোপথ ধরে আধ ঘন্টা যাওয়ার পর পৌঁছোলাম একটা গভীর জঙ্গলে। পাহাড়ের সানুদেশ ঘিরে রয়েছে এই জঙ্গল। বনের মধ্য দিয়ে মাইল দুই যেতে যেতে পথ হারালাম বার কয়েক। এ রকম নিঝুম জঙ্গল কখনো দেখিনি। যেমন স্যাঁতসেঁতে, তেমনি অন্ধকার। দম আটকে আসা পরিবেশ। তারপর পৌঁছোলাম প্রাইভেট পাগলা গারদটার সামনে।

বাড়িটা মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মত। ফ্যানট্যাসটিক। তবে ভাঙাচোরা। যত্ন-টত্নও নেওয়া হয়নি। বয়সের ভারে ঝুঁকে পড়েছে। বাইরের চেহারা দেখেই বুক গুর গুর করে উঠল। ঘোড়ার রাস টেনে ধরলাম। একবার ভাবলাম-আর নয়, ফিরেই যাই। তারপরেই গর্জে উঠল ভেতরটা। ভীতুমি-কে ধিক্কার দিয়ে এগিয়ে গেলাম সামনের দিকেই।

দূর থেকেই দেখলাম, গেটের পাল্লা ফাঁক করে এক ভদ্রলোক উঁকি মারছেন বাইরে। আমরা আর একটু এগোতেই দৌড়ে এলেন তিনি আমার সঙ্গী ভদ্রলোকের দিকে। দু-হাত জড়িয়ে ধরে খুবই খাতির করে নিয়ে যেতে চাইলেন ভেতরে।

শুনলাম, ইনিই মঁসিয়ে মেলার্ড। নামকরা এই পাগলা গারদের সর্বেসর্বা। ভদ্রলোককে দেখতে খাঁটি ভদ্রলোকেরই মতন। কথাবার্তা রীতিমত মার্জিত। চালচলনে গাম্ভীর্য, ব্যক্তিত্ব আর কর্তৃত্ব যেন ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে।

ভীতু ভদ্রলোক কিন্তু আমার সঙ্গে মঁসিয়ে মেলার্ডের পরিচয় করিয়ে দিয়েই সরে পড়লেন। আর তাঁকে দেখিনি।

মঁসিয়ে মেলার্ড আমাকে খুব খাতির করলেন। ছোট্ট একটা ঘরে বসালেন। ছিমছাম সাজানো ঘর। প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে সুন্দর রুচির ছাপ রয়েছে। ঘর গরম করার চুল্লি জ্বলছে এক কোণে। ফুলদানির ফুল আর দেওয়ালে ঝোলানো আঁকা ছবিগুলো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা যায়। গান বাজনার সরঞ্জামও রয়েছে অনেক। পিয়ানোর সামনে বসে নরম গলায় গান গাইছিল একটি মেয়ে। আমাকে দেখেই গান থামিয়ে অভিবাদন করল ভদ্রভাবে। চোখ মুখ কিন্তু বড় বিষণ্ণ। পরনে রয়েছে শোকের পোশাক। অথচ তাকে দেখলেই সমীহ করতে ইচ্ছা যায়।

প্যারিসে বসেই শুনেছিলাম, মঁসিয়ে মেলার্ড পরিচালিত এই পাগলা গারদে পাগলদের সাজা-টাজা দেওয়া হয় না। তারা ছাড়া থাকে, সারা বাড়ীতে ঘুরে বেড়ায়, মনের জ্বালাগুলোকে জুড়িয়ে আনে একটু একটু করে।

পিয়ানো-বাজিয়ে এই মেয়েটাকে দেখে আমার তাই প্রথমেই

মনে হয়েছিল, এ মেয়ে নির্ঘাৎ পাগল। সেইজন্যেই নানা বিষয়ে এমনভাবে তার সঙ্গে কথা বলে গেলাম যাতে সে কখনোই বুঝতে না পারে যে তাকে পাগল ভাবছি। পাগলরা যা বলে তার প্রতিবাদ করতে নেই। সায় দিয়ে যেতে হয়। এ মেয়েটা কিন্তু যা যা বলে গেল, তার মধ্যে পাগলামির ছিটেফোঁটাও দেখলাম না। ধীর স্থির কথাবার্তায় জ্ঞান আর বুদ্ধি যেন ঝিলিক মেরে মেরে উঠছে। কে বলবে মাথা খারাপ।

খাবার দাবার এসে পৌঁছলো একটু পরেই। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মেয়েটা। দুই চোখে একগাদা প্রশ্ন নিয়ে আমি তাকালাম গৃহস্বামীর দিকে।

ঝটিতি বললেন উনি–'আরে না! ও আমার ভাইঝি। একই ফ্যামিলি। শিক্ষাদীক্ষা আছে–মাজাঘষা কথাবার্তা আর চেহারা দেখে বুঝলেন না?'

'তা বুঝলাম বলেই তো হকচকিয়ে গেছি,' আমতা আমতা করে বললাম আমি–'প্যারিসে আপনার সুখ্যাতি শুনেছি অনেক। আপনার এখানে পাগলরা বাড়ীময় ঘুরে বেড়ায়। যদি বেফাঁস কিছু বলে ফেলি–তাই হুঁশিয়ার আছি গোড়া থেকেই। কিছু মনে করবেন না, মঁসিয়ে মেলার্ড। শেষকালে কিনা আপনার ভাইঝিকেই পাগল ঠাউরে বসলাম।'

'মনে করব কেন? বরং খুশি হয়েছি। পাগলামি সারানোর আমার এই পদ্ধতিটা তো সাধারণ লোকের মাথায় ঢোকে না। এখানে এসে এমন সব উল্টোপাল্টা কথা বলে বসে যে তাল সামলাতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। এই জন্যেই যাকে তাকে আর ঢুকতে দিই না। পদ্ধতিটা যদ্দিন চালু ছিল–তদ্দিন এরকম বাজে ব্যাপার হরবখৎ ঘটেছে।'

'পদ্ধতিটা যদ্দিন চালু ছিল মানে? এখন কি তা চালু নেই?'

'কয়েক হপ্তা আগে পর্যন্ত ছিল। এখন আর নেই। কোনদিন আর চালু হবে না।'

'সে কী?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মঁসিয়ে মেলার্ড বললেন–'দেখুন মশায়, মনের জ্বালা জুড়িয়ে দিয়ে পাগলামি সারানোর এই পদ্ধতিতে সুফল যেমন ফলে, তেমনি বিপদও ঘটে। আগে যদি আসতেন, তাহলে বুঝতেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করতে পারলে অসুস্থ মানুষ কীভাবে আর পাঁচটা সুস্থ মানুষের মতো হেসে খেলে থাকতে পারে। কিন্তু তাই নিয়ে বড় বেশী নাচানাচি হয়ে গেছে এখানে। আসলে যতটা সুফল ফলে–তার চাইতে অনেক বেশি জয়ঢাক পেটানো হয়েছে। বিপদের দিকটা একেবারেই উপেক্ষা করা হয়েছে। আমি কি বলতে চাইছি, তা আগে যদি আসতেন–নিজের চোখে দেখলে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারতেন।

চিকিৎসার ধরনটা কি রকম জানেন ?'

'আজ্ঞে না। লোকমুখে যেটুকু শুনেছি।'

'তাহলে আমিই গুছিয়ে বলছি ব্যাপারটা। এ চিকিৎসার মোদ্দা কথা হচ্ছে মানবিকতা। আঁতে ঘা না দিয়ে, যে যে রকমটা ভাবছে, তাকে ঠিক সেই রকমই ভাবতে দেওয়া হোক না। যে যেরকমভাবে জীবনটাকে চালাতে চাইছে-তাকে সেইভাবেই চলতে দেওয়া হোক। যদি ভুল বুঝে থাকে, ভুলই বুঝে থাকুক-তাকে শুধরোতে যাই না। পাগলদের সঙ্গে তর্ক করে কোনো লাভ নেই। ক্ষীণ যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে ওরা সঠিক যুক্তিকে ধরতে পারে না। যেমন ধরুন, নিজেদের মুরগির ছানা ভাবতো, এমন কিছু লোক এখানে এককালে ছিল। এদেরকে সাতদিন মানুষের খাদ্য খেতে দেওয়া হয়নি-শুধু ধান আর নুড়ি পাথর প্লেটে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। রোগ পালিয়েছে পড়পড়িয়ে-মুখে যদি বোঝাতে যেতেন-নিজেদের বোকামি ধরতেই পারতো না।'

'চেঁচামেচি করেনি ?'

'করবে কেন ? নিজেদের বোকামির ফাঁদে নিজেরাই তো ধরা পড়েছে। অন্য সব ব্যাপারে তাদের আর পাঁচটা মানুষের থেকে তো আলাদা করে দেখা হয়নি। গান, বাজনা, ব্যায়াম, বই পড়া-এই সব নিয়েই থেকেছে। 'উন্মাদ' শব্দটা একেবারেই ব্যবহার করা হতো না-শরীরে রোগ কার না হয়-এদেরও যেন তাই হয়েছে-চিকিৎসা হচ্ছে সেই শরীরের রোগের-মনের রোগের নয়-এই ধারণাটা ঢুকিয়ে দেওয়া হতো মনের মধ্যে। উল্টে প্রত্যেকের ওপর ভার থাকত, অন্যান্যদের আগলানোর। ফলে পাগলাদের আগলে রাখার জন্যে একগাদা লোকজনের দরকার হয়নি।'

'সাজা টাজা দিতেন না ?'

'একেবারে না।'

'আলাদা ঘরে আটকে রাখতেন না ?'

'খুব একটা দরকার হতো না। কালেভদ্রে এক-আধজন ক্ষেপে গিয়ে মারধর শুরু করলে চোর-কুঠুরিতে ঢুকিয়ে দিতাম। একটু সামলে উঠলে পাঠিয়ে দিতাম সদর হাসপাতালে-বন্ধুবান্ধবদের কাছে। মারদাঙ্গা পাগলদের ঠাঁই নেই এখানে।'

'এমন সুন্দর সব ব্যবস্থা বন্ধ করে দিলেন ?'

'ওর চাইতে ভালো ব্যবস্থা শুরু করলাম বলেই বন্ধ করলাম। তবে আগের ব্যবস্থাটা ফ্রান্সের সব পাগলা গারদেই এখন ছড়িয়ে পড়েছে।'

'মাফ করবেন, ফ্রান্সের কোনো পাগলা গারদে এমন ব্যবস্থা চালু আছে বলে আমার জানা নেই।'

'আপনার বয়স কম, সব খবর রাখেন না বলেই জানতে পারেননি। লোকের কথায় কান দেবেন না-নিজেই ঘুরে ফিরে পৃথিবীটাকে চিনুন। এখানকার নতুন ব্যবস্থাও দেখবেন-আমিই নিয়ে গিয়ে সব দেখাবো-তার আগে একটু জিরিয়ে নিন। এতটা পথ ঘোড়া চালিয়ে এসেছেন-পা-গতরের ব্যথাটা মরুক।'

'নতুন ব্যবস্থাটা কি আপনি নিজেই মাথা খাটিয়ে বের করলেন?'

'তা তো বটেই। দুনিয়ার সেরা ব্যবস্থা-নিজের চোখে দেখলেই বুঝবেন।'

এইভাবেই ঘণ্টাখানেক কথা বলে গেলাম মঁসিয়ে মেলার্ডের সঙ্গে। বাগান-টাগান দেখালেন আমাকে।

বললেন-'রুগিদের দেখতে দেব না এখন। রাতের খাওয়া নষ্ট হয়ে যেতে পারে। খেয়ে দেয়ে স্নায়ুগুলোকে চাঙ্গা করে নিন-তারপর।'

খেতে বসলাম সন্ধ্যা ছটার-বেশ বড় একটা ঘরে। সেখানে রয়েছে আরো পঁচিশ তিরিশ জন মেয়ে পুরুষ। দেখে শুনে মনে হল প্রত্যেকেরই অবস্থা বেশ সচ্ছল। তিন ভাগের দু-ভাগই মেয়ে। যাদের বয়স সত্তরের নিচে নয় মোটেই, তাদের সজ্জা উজ্জ্বার বাহারই নেই। খোলা বুক আর বাহু দামি দামি পাথর বসানো গয়না দিয়ে মুড়ে রেখেছে। পিয়ানো-বাজিয়ে সেই মেয়েটার অদ্ভুত পোশাক দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। প্রথম যখন দেখেছিলাম, তখন তার পরনে ছিল শোকের পোশাক। এখন পড়ে আছে একটা ক্যাটকেটে রঙের ঘাঘরা। কোমর ঘিরে শক্ত বেষ্টনী। মাথায় একটা নোংরা টুপি। ঝালর ঝুলছে চার পাশ থেকে এবং বেঢপ বিরাট সাইজের ফলে মুখটাকে মনে হচ্ছে এইটুকু। পায়ে উঁচু গোড়ালির খটমট জুতো। পঁচিশ তিরিশ জন মানুষের প্রত্যেকেই বলতে গেলে এইভাবে কিছু না কিছু অদ্ভুত। একবার সন্দেহ হলো, মঁসিয়ে মেলার্ড কি আমাকে চমকে দেওয়ার জন্যে পাগলদের সঙ্গে ডিনার খেতে বসিয়েছেন? তারপরেই অবশ্য মনে পড়লো, প্যারিসে থাকতেই বন্ধুবান্ধবরা বলেছিল-দক্ষিণ ফ্রান্সের লোকগুলো বড় ছিটিয়াল-অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা বাসা বেঁধে আছে সবারই মাথার মধ্যে। কথাটা মনে পড়তেই মনের ভয় চলে গেল-সহজ হয়ে বসলাম।

খাবার ঘরটা লম্বাটে। তিনদিকের দেওয়ালে দশটা জানলা। মূল বাড়ি থেকে ঠেলে বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে এই ঘর। দরজা একটাই-মূল বাড়ির গায়ে। চোখ ট্যারা করে দেওয়ার মত আসবাবপত্র তেমন নেই। মেঝেতে কার্পেট নেই। জানলাগুলোয় পর্দা নেই। পাল্লা বন্ধ। লোহার পাত আড়াআড়িভাবে আঁটা ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত-দোকান ঘরে যেমন থাকে।

তবে হ্যাঁ, ঘরে আলোর বাড়াবাড়িটা বড় বেশী। চোখ ধাঁধিয়ে

দেয়। আমার আবার নরম-আলো ভালো লাগে। কিন্তু এ ঘরে মোমবাতির ছড়াছড়ি যাচ্ছে। রুপোর শামাদানে জ্বলছে অজস্র মোমবাতি, টেবিলের ওপর তো বটেই-ঘরের মেঝেতেও-যেখানে ফাঁক, সেইখানেই বসানো একটা করে রুপোর শামাদান।

ঘরটার শেষের দিকে একটা বড় টেবিল ঘিরে সাত-আট জন লোক রকমারি বাজনা নিয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে বাজনার নামে অপবাদ্য বাজিয়ে যাচ্ছে। শুনে প্রত্যেকেই পুলকিত হচ্ছে-আমি ছাড়া।

খাবার দাবারের আতিশয্য বর্বর যুগের কথা মনে করিয়ে দেয়। এত অপচয় সহ্য হয় না আমার। খাবে কে পাহাড়ের মতো এত মাংস আর চাটনি?

যাই হোক, বেড়াতে যখন বেরিয়েছি, দেশ বিদেশের হাজারো উদ্ভট ব্যাপারের সঙ্গে মানিয়ে নিতেই হবে আমাকে। তাই শান্ত হয়ে বসে রইলাম মঁসিয়ে মেলার্ডের ঠিক পাশের চেয়ারে। গল্প-সল্প উনিই আরম্ভ করলেন। পাগলা গারদের হর্তাকর্তা হিসেবে নিজেকে জাহির করতে একটুও দ্বিধা করলেন না। পাগলদের সৃষ্টিছাড়া কাণ্ডকারখানা নিয়েও রসালো আড্ডা আরম্ভ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। কথাবার্তা শুনে বুঝলাম, খেতে বসেছি যাদের সঙ্গে, তারা প্রত্যেকেই শিক্ষিত। আমার ডান দিকে বসেছিল একজন বেঁটে মোটা লোক। পাগলরা কতরকমভাবে খামখেয়ালি হয়, তার একটা উদাহরণ দিতে গিয়ে উনি বললেন-'একজন তো নিজেকে টি-পট মনে করতো। চা তৈরীর অদ্ভুত এই সরঞ্জামটি কেন যে তার ব্রেনে ঢুকে বসেছিল, তা ভগবানই জানেন। ফ্রান্সের আর কোনো পাগলা গারদে এমন পাগল পাবেন কিনা সন্দেহ। রোজ সকালে উঠে চামড়া আর বুরুশ দিয়ে নিজেকে মেজেঘষে চকচকে করে রাখতো খুব দামি টি-পটের মতোই।'

উল্টো দিকে বসে থাকা লম্বা লোকটা বলে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে-'সেই লোকটার কথা মনে পড়ে? নিজেকে মনে করতো একটা আস্ত গাধা। উফ! কি জ্বালানটাই না জ্বালিয়েছে! দিনরাত পাঁ-পাঁ করে গর্দভ রাগিনী তো শুনিয়েছেই-সেই সঙ্গে সে কি লাফালাফি। কিছুতেই একজায়গায় ধরে রাখা যেত না। কাঁটাগাছ খেতে চাইত বলে শুধু কাঁটাগাছ খাইয়ে সারিয়ে দিয়েছিলাম গাধাগিরি। সেরে উঠেই কিন্তু শুরু হয়ে গেল ঠিক গাধার মতই পা ছোঁড়া-এইভাবে-এইভাবে-এইভাবে-'

কড়া গলায় ধমকে উঠলো পাশের বুড়ি-'মিঃ ডি-কক্! ভদ্রভাবে পা চালান। এমন করছেন যেন নিজেই একটা গাধা। বারোটা বাজিয়ে দিলেন আমার ব্রোকেডের। শুধু মুখের কথায় কি ব্যাপারটা বোঝানো যায় না?'

'তাই নাকি? তাই নাকি?' এক গাদা সুরা এগিয়ে দিয়ে বলে

উঠলো লম্বা লোকটা–'এক হাজার এক খানা ক্ষমা চাইছি। খেয়ে নিন–মনে ফূর্তি আসবে।'

ঠিক এই সময়ে বলে উঠলেন মঁসিয়ে মেলার্ড–'এই বার আসছে আজকের ভোজসভার বিশেষ খাবার।'

তিনজন পরিচারক একটা প্রকাণ্ড থালা বয়ে এনে রাখলো টেবিলের ওপর। থালায় রয়েছে রোস্ট করা একটা আস্ত বাছুর। হাঁটু গেড়ে তাকে বসানো হয়েছে ইংলিশ কায়দায় (ইংরেজরা বসায় রোস্ট করা খরগোশ ঠিক এইভাবে), মুখে আটকানো একটা আপেল।

আমি বললাম–'আমাকে অন্য মাংস দিন।'

'এই কে আছো, এঁকে দাও খরগোসের পাখি-চাটনি।'

'থাক। আমি নিজেই নিচ্ছি অন্য খাবার।' মনে মনে বললাম, আর যাই খাই, একজনের মাংসর সঙ্গে আর একজনের মাংসর চাটনি খেতে রাজি নই।

টেবিলের শেষ দিকে বসেছিল মড়ার মতো পাঁশুটে রঙের একটা লোক। আড্ডার খেই তুলে নিয়ে সে বললে–'শুনুন তাহলে এখানকার আর এক রুগির বিটকেল বাতিকের গল্প। নিজেকে ভাবতো চিজ। হাতে একখানা ছুরি নিয়ে ঘুরতো সবসময়ে। যাকে সামনে পেতো, তাকেই বলতো–এই নাও ছুরি। আমার উরু থেকে খানিকটা চিজ কেটে নিয়ে চেখে দ্যাখো–মুণ্ডু ঘুরে যাবে।'

'আরে সে তো একটা রামবোকা,' বলে উঠলো আর একজন–'জীবন্ত শ্যাম্পেনের বোতলকে মনে আছে? সেই যে সেই-নিজেকে মনে করতো শ্যাম্পেনের বোতল।সব সময়ে ফট্-ফটাস আর চুস-চুস-চুস আওয়াজ করে ঘুরে বেড়াতো এইভাবে।'

বলেই লোকটা নিজের বুড়ো আঙুল গালে টিপে ধরে সরিয়ে নিয়েই মুখে আওয়াজ করলো ফট্-ফটাস (অবিকল শ্যাম্পেনের বোতলের ছিপি খোলার শব্দ), তারপরেই জিভ উলটে দাঁতে লাগিয়ে, মুখ দিয়ে চুস-চুস-চুস-চুস আওয়াজ করে গেল একনাগাড়ে কয়েক মিনিট ধরে। ঠিক যেন বুড়বুড়িয়ে ফেনা উঠছে ছিপিখোলা শ্যাম্পেনের বোতল থেকে। স্পষ্ট দেখলাম, ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগছে না মঁসিয়ে মেলার্ডের। কিন্তু তিনি একটা কথাও না বলে চুপ করে বসে রইলেন মুখে চাবি দিয়ে। এর পরের গল্পটা শুরু করলো প্যাঁকাটির মতো সিড়িঙ্গে একটা লোক–মাথার পরচুলোটা সে তুলনায় প্রকাণ্ড এবং একেবারেই বেমানান।

'ব্যাঙবাবাজির কাণ্ড কি ভোলবার? মূর্খ কোথাকার! দিনরাত কটর-কটর ঘ্যানোর ঘ্যানোর করে কান ঝালাপালা করে ছেড়েছে। নিজেকে ভাবতো বিশাল ব্যাঙ। এইভাবে দুই কনুই

টেবিলে রেখে বসে, এইভাবে বিশাল হাঁ করে গেলাসে চুমুক দিত টকাস্‌-টকাস করে। সেই সঙ্গে চোখ পিটপিট করতো ঠিক এইভাবে ··· এইভাবে ··· এইভাবে ··· লোকটার প্রতিভা ছিল মশায়, দেখলে আপনার আক্কেল গুরুম হয়ে যেতো।' .

কথাটা যেহেতু বলা হলো আমাকে, তাই মুখভাবকে অনেক কষ্টে সহজ স্বাভাবিক রেখে জবাবটাও দিতে হলো সেইভাবে–'তা তো বটেই, তা তো বটেই।'

অমনি বলে উঠল আর একজন–'আর সেই নস্যি পাগলটা? নিজেকে মনে করত এক টিপ নস্যি–কিন্তু কিছুতেই দু-আঙুলের ফাঁকে নিজেকে ধরতে পারতো না বলে কি দুঃখই না ছিল বেচারার।'

'কুমড়ো পাগলটার কথা ভুলে গেলে?' ফোড়ন দিলো একজন তার পাশ থেকে–'কুমড়ো হয়ে সে জন্মেছে, এই বিশ্বাস নিয়েই সে এসেছিল এখানে। দিনরাত ঘ্যান ঘ্যান করতো রাঁধুনির কাছে–কেন তাকে কুচি কুচি করে কেটে কুমড়োর ঘ্যাঁট রাঁধা হচ্ছে না। শুনে নাক সিঁটকাতো বটে রাঁধুনি, আমার কিন্তু মনে হয়–পাগলটাকে দিয়ে কুমড়োর ঘ্যাঁট রান্না করলে খেতে খুব খারাপ লাগত না।'

'শুনে অবাক হলাম,' বলে ফেললাম আমি।

সঙ্গে সঙ্গে বিদিগিচ্ছিরিভাবে হেসে উঠলেন মঁসিয়ে মেলার্ড।–'হাঃ হাঃ হাঃ! হি হি হি! হে হে হে! হো হো হো! বলেছেন খাসা! তবে কি জানেন, অবাক হবেন না–একদম হবেন না। বন্ধুগণ! আমাদের এই বিশেষ অতিথি অতিশয় রসিক পুরুষ। ওঁর সব কথার মানে অক্ষরে অক্ষরে করতে যাবেন না। হ্যাঁ, তারপর?'

'তারপর সেই দু-মুণ্ডওলা বদ্ধ পাগলটার কথা না বললেই নয়,' তড়বড় করে বলে উঠল একজন টেবিলের ওদিক থেকে–'সেইযে সেই মাথায় পোকা লোকটা–মনে চোট খাওয়ার পর থেকেই তার ধারণা হয়ে গেছিল দুটো মুণ্ড আছে তার ঘাড়ের ওপর–একজন আর একজনের শত্রু। খুব ভালো বক্তৃতা দিতে পারতো পাগলটা। কথার তুবড়ি ছোটাতো মুখ দিয়ে ডিনার টেবিলের ওপর ঠিক এইভাবে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে–'

পাশের লোকটা কি যেন ফিসফিস করে বললে বক্তার কানে কানে। সঙ্গে সঙ্গে সে মুখখানাকে উৎকট প্যাঁচার মতো করে বসে পড়লো চেয়ারে হেলান দিয়ে।

ফিসফিস করে কথা বলছিল যে, এবার তার পালা। সে বললে–'মনে পড়ে সেই মানুষ-লাট্টুটার কথা? আরে মশাই, অবিকল লাট্টুর মতো তার বনবন্‌ পাক খাওয়া যদি দেখতেন, হাসতে হাসতে পেট ফেটে যেত আপনার। ঠিক এইভাবে

একখানা গোড়ালির ওপর দাঁড়িয়ে পাক খেত ঝাড়া একটা ঘণ্টা ধরে-'

এই না বলে লোকটা নিজেই বন্‌বনিয়ে পাক খেয়ে দেখিয়ে দিলো মানুষ-লাটিমের কীর্তি।

তারস্বরে চেঁচিয়ে বললে এক বুড়ি-'বোকার মতো পাক খেলেই হলো? শুধু পাগল নয়-মাথামোটা পাগল না হলে ওরকমভাবে কেউ ঘোরে? লাট্টু না ছাই, ওর চেয়ে অনেক বুদ্ধি ধরতো ম্যাডাম জইয়ূস। মনে পড়ে? নিজেকে মনে করতো মোরগ। ডানা ঝাপটাতো ঠিক এমনি করে। আর সে কি ডাক! ঠিক এইভাবে কোঁকর-কোঁ! কোঁকর-কোঁ! কোঁকর-কোঁ!'

'ম্যাডাম জইয়ূস,' ভীষণ রেগে ধমকে উঠলেন মঁসিয়ে মেলার্ড-'এ কি অসভ্যতা! হয় সহবৎ মেনে চলুন, নইলে বেরিয়ে যান।'

ধমক খেয়ে মুখটুখ লাল করে চোখ নামিয়ে মরমে মরে গেলেন যেন ম্যাডাম জইয়ূস নামে সেই বৃদ্ধা।

আর আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম 'ম্যাডাম জইয়ূস' নামটা শুনেই। নিজেই নিজের কেচ্ছা দেখিয়ে গেল এত নির্লজ্জভাবে।

গলার শির তুলে এবার চেঁচিয়ে উঠলো সেই মেয়েটা যাকে এই পাগলা গারদে ঢুকেই পিয়ানো বাজাতে দেখেছিলাম শোকাচ্ছন্ন মুখে অতিশয় মিষ্টি মার্জিত মেয়ের মতো। এখন তার পরনের বেশবাস অবশ্য রীতিমতো উৎকট-গলাবাজিও যাচ্ছেতাই।

চিৎকার করে সে বললে-'ম্যাডাম জইয়ূস-এর মাথায় যে বুদ্ধি ছিল না একফোঁটাও সেটা সবাই জানে-কিন্তু তুলনা হয় না ইউজিন সালসাফেট্রের। যেমন সুন্দরী তেমনি মিষ্টি বয়স। জামাকাপড় পড়ার কি আশ্চর্য ফ্যাশন আবিষ্কার করেছিল বলুন তো? নিজেকে জামাকাপড়ের ভেতরে না রেখে বাইরে নিয়ে আসতে পারতো চমৎকারভাবে। অথচ কায়দাটা জলের মতো সোজা। প্রথমে এইভাবে ··· তারপর এইভাবে ···তারপর এইভাবে ··· তারপর-'

একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো একডজন গলা-'এ কী করছেন ম্যাডাময়জেল সালসাফেট্রে! ঢের হয়েছে, আর না! থামুন! থামুন!'

বেশ কয়েকজন তড়াক তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো শ্রীমতী সালসাফেট্রের বিচিত্র ফ্যাশন-প্রদর্শনী বন্ধ করার জন্যে-আর একটু দেরি হলেই নির্ঘাৎ মেয়েটি সাক্ষাৎ 'ভেনাস' হয়ে যেত ···

ঠিক এত সময়ে বাগড়া এল বাড়ির ভেতর থেকে।

আচমকা শোনা গেল ভয়ানক সোরগোল। অনেকগুলো গলা যেন একসঙ্গে বিকট হুঙ্কার ছেড়ে চলেছে।

রক্ত জল করা সেই গর্জন শুনেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল আমার। কিন্তু আমার চাইতেও বেশী ভয় পেয়েছে দেখলাম ঘরশুদ্ধ লোক। যে যে-চেয়ারে বসেছিল, সে সেই-চেয়ারের ভেতরেই ঢুকে গেল ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে। সেই সঙ্গে সে কি ঠক্‌ঠক কাঁপুনি। মড়ার মতো বিবর্ণ প্রত্যেকেই। বিকট হুঙ্কার সেই মুহূর্তে বন্ধ হতেই সব্বাই কান খাড়া করে রইলো আবার তা শোনার জন্যে। এবং তা শোনাও গেল। এবার আরো কাছে। আগের চাইতেও জোরে। তৃতীয়বার হুঙ্কারের হট্টগোল ফেটে পড়লো খাবার ঘরের আরো কাছে-আরও জোরে। চতুর্থবারে লোমহর্ষক আর্তনাদ-লহরী আবার শোনা গেল বটে-তবে অনেক স্তিমিত। আওয়াজ পরম্পরা ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে শুনে যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল খাবার ঘরের সব্বাই এবং চোখে মুখে ফিরে এল বিপুল ফুর্তি। আমিও একটু ধাতস্থ হয়ে জানতে চাইলাম, কারা অমন আচমকা চেঁচিয়ে উঠলো-থেমেই বা গেল কেন?

'ও কিছু নয়', বুঝিয়ে দিলেন মঁসিয়ে মেলার্ড-'মাঝে মাঝে জোট বেঁধে চেঁচিয়ে উঠে পাগলরা। কুকুররা দল বেঁধে চেঁচায় গভীর রাতে-এও ঠিক তেমনি।'

'এরকম অবস্থায় ওদের সামাল দিতে লোকজন আছে নিশ্চয়?'

'আছে বৈকি। জনা দশেক সব মিলিয়ে।'

'দশ জনের বেশির ভাগ নিশ্চয় মেয়ে?'

'না, না! দশজনেই পুরুষ। রীতিমতো গাঁটাগোট্টা।'

'সে কি! মেয়েরাই তো শুনেছি বেশি পাগল হয়।'

'তা হয়। তবে সব সময়ে হয় না। এক সময়ে এখানে সাতশ জন পাগল ঠাঁই নিয়েছিল-তাদের মধ্যে সতেরো জনই ছিল মেয়েছেলে। দিনকাল পালটেছে।'

'হ্যাঁ, দিনকাল পালটেছে,' সায় দিল একজন।

'খুব পালটেছে,' কোরাস গেয়ে উঠলো যেন ঘরশুদ্ধ সবাই।

"চুপ! চুপ! জিভগুলোকে সামলান-কোনো কথা নয়," রেগে টঙ হয়ে গাঁ-গাঁ করে চেঁচিয়ে উঠলেন মঁসিয়ে মেলার্ড। অমনি চুপ হয়ে গেল গোটা ঘরটা। এক বুড়ি তার অস্বাভাবিক রকমের লম্বা জিভটা দু-হাত দিয়ে টেনে সামনে রেখে দিলো দু-সারি দাঁতের ফাঁকে-জিভ সামলাতে বলেছিলেন মঁসিয়ে মেলার্ড-অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেল তাঁর হুকুম।

পুরো একটা মিনিট গেল এই ভাবে। ঘর একেবারে নিস্তব্ধ।

আমি মঁসিয়ে মেলার্ডের দিকে একটু হেলে পড়ে বললাম তাঁর কানে কানে-'কোঁকর-কোঁ ডাক শোনালেন যে ভদ্রমহিলা, উনি ঠিক আছেন তো?'

'ঠিক আছেন মানে?' থতমত খেয়ে চোখ কপালে তুলে ফেললেন মঁসিয়ে মেলার্ড।

'মানে, হেড অফিসে গোলমাল নেই তো?' নিজের মাথায় আঙুল ঠুকে বললাম।

'কি যে বলেন? আমার হেড অফিস যতখানি সুস্থ-ওঁরও তাই। তবে কি জানেন, বয়স হলে সব বুড়িরাই একটু আধটু বাতিকে ভোগে।'

'আর সবাই?' বললাম ঘরশুদ্ধ লোককে দেখিয়ে।

'ওরা আমার বন্ধু আর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট।'

'মেয়েরাও! বলেন কী। এত মেয়ে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট!'

'মেয়ে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ছাড়া কি কাজ চলে? দুনিয়ার যে পাগলা গারদেই যান না কেন, দেখবেন মেয়ে নার্সের মতো আর নার্স হয় না। ওদের ওই চকচকে ঝকঝকে চোখের চাহনিতে সারা হয়ে যায় অর্ধেক কাজ-চোখ দিয়ে সাপেরা যেভাবে সম্মোহন করে-অনেকটা সেইরকম বলতে পারেন।'

'তা বটে! তা বটে! কথাবার্তা আর ব্যবহার-ট্যাবহারগুলো একটু যা খাপছাড়া। আপনার কি মনে হয়?'

'খাপছাড়া? তা বটে! তা বটে! তবে কি জানেন, দক্ষিণী আদমী তো আমরা, যা খুশি তাই করে যাই-তারিয়ে তারিয়ে জীবনটাকে চেখে দেখি।'

'তা বটে! তা বটে!' বললাম আমি।

'তাছাড়া খানাপিনার আসরে প্রত্যেকেই একটু না একটু বেসামাল হয়ে যায়।'

'তা বটে! তা বটে! ভালো কথা, মঁসিয়ে মেলার্ড, এই যে নতুন চিকিৎসা ব্যবস্থাটা এখানে আপনি চালু করেছেন-সে ব্যবস্থায় কড়া সাজা-টাজার বন্দোবস্ত নিশ্চয় রেখেছেন?'

'একেবারেই রাখিনি। মাঝে সাঝে ঘরে আটকে রাখতে হয় বটে-সে বেশিক্ষণের জন্যে নয়। মোদ্দা চিকিৎসাটা কিন্তু একেবারেই ডাক্তারি ওষুধপত্রের ব্যাপার-রুগিদের ভালোই লাগে।'

'নতুন এই ব্যবস্থা আপনার আবিষ্কার?'

'পুরোপুরি নয়। ডক্টর আলকাতরা আর প্রফেসর পালক অনেক সাহায্য করেছেন। দুজনেই কৃতী পুরুষ। আলাপ আছে নিশ্চয় আপনার সাথে?'

'জীবনে নাম শুনিনি!'

'কী সর্বনাশ!' আচমকা সবেগে নিজের চেয়ারখানাকে পেছনে টেনে নিয়ে যেন ভিরমি খেলেন মঁসিয়ে মেলার্ড-'স্বনামধন্য ডক্টর আলকাতরা আর প্রফেসর পালকের নাম পর্যন্ত শোনেননি আপনি!'

'আমার অজ্ঞতার জন্যে মাফ চাইছি মঁসিয়ে মেলার্ড। দুজনেরাই বই পত্র জোগাড় করে নিয়ে পড়ে নেব,' মরমে মরে গিয়ে বললাম আমি।

'যাক সে কথা। আসুন, এক গেলাস আসব পান করা যাক।'

গেলাস ভর্তি পানীয় এগিয়ে দিলেন মঁসিয়ে মেলার্ড। দুজনেই পান করলাম এক সঙ্গে। আমাদের দেখাদেখি টেবিলের সমস্ত মেয়ে পুরুষ গেলাস গেলাস পানীয় খেতে লাগল চোঁ চোঁ, ঢক ঢক, ঢুকুস ঢুকুস, চকাৎ চকাৎ শব্দে। হাসতে লাগল হো হো করে, বকর বকর করতে লাগলো একনাগাড়ে, ঠাট্টা ইয়ার্কি-মস্করার আওয়াজে মনে হলো এই বুঝি পটাং করে ফেটে যাবে কানের পর্দা দুটো। গোদের ওপর বিষ ফোড়ার মতো ঠিক এই সময়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে জগঝম্প বাজনা শুরু করে দিলো কোণের টেবিলের সাত আটটা লোক-তাল ঠুকতে লাগল আরও কিছু লোক। জগঝম্পের গুরুগম্ভীর নিনাদ আর বাঁশির কান ঝালাপালা করা তীক্ষ্ণ আওয়াজে তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল আমার মাথার মধ্যে। মঁসিয়ে মেলার্ড কিন্তু এরই মধ্যে গলা ছেড়ে কথা চালিয়ে যাচ্ছেন আমার সঙ্গে। গানবাজনা চেঁচামেচি ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে-বাড়তে বাড়তে গোটা ঘরটা একটা আস্ত নরক গুলজার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তালে তাল মিলিয়ে গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছেন মঁসিয়ে মেলার্ড-আমিও গলা চিরে ফেলে পাল্টা কথা বলে যাচ্ছি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। নায়াগারা জলপ্রপাতের তলায় যদি দুটি মাছ কথা বলে, তাদের অবস্থা যেমন দাঁড়ায়-আমাদের অবস্থা তখন ঠিক তেমনি।

মঁসিয়ে মেলার্ডের কানের কাছে মুখ নিয়ে তারস্বরে চীৎকার করে বললাম-'আগের চিকিৎসা পদ্ধতিতে বিষম বিপদ আছে বলছিলেন। বিপদটা কি?'

'আছে বৈকি। ভয়ঙ্কর বিপদ আছে,' সমানে চেঁচিয়ে বলে গেলেন মঁসিয়ে মেলার্ড-'পাগলরা বড় খামখেয়ালি হয়-ওদের খেয়ালের ফিরিস্তি তৈরী করতে গেলে নিজেকেও পাগল হয়ে যেতে হবে, আমি, ডক্টর আলকাতেরা এবং প্রফেসর পালক-আমরা তিনজনেই মনে প্রাণে বিশ্বাস করি পাগলাদের কখনো ছেড়ে রাখতে নেই-আগলে রাখার ব্যবস্থা শিকেয় তুলে রাখতে নেই। বদ্ধ উন্মাদরা দারুণ ধড়িবাজ হয়। মনে মনে যা করবার প্ল্যান করে, সেটা করবার জন্যে বাইরে একেবারে সুস্থ সেজে থাকে। পাগল যদি দিব্বি ভাল মানুষ হয়ে মিষ্টি কথা বলে, বুঝতে হবে জিলিপির প্যাঁচ চলছে তার মনের ভেতরে-তক্ষুণি পাতালঘরে তাকে আটকে রাখা উচিত।'

'কিন্তু বিপদটা কি ধরনের? এই পাগলা গারদে আপনি নিজে সেরকম কোনো বিপদের মোকাবিলা করেছেন কি?'

'এখানে ? আমার সামনেই ? আরে মশাই, বেশ কিছুদিন আগে এমন কাণ্ড তো ঘটেইছে এই পাগলা গারদে। শয়তানি ফন্দি এঁটে বসেছিল বেশ কিছু কুচক্রুরে পাগল। একদিন সকালে তারাই পাগলা গারদের মালিক হয়ে বসে গেল-যারা তাদের দেখাশুনা করছিল, তাদের হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখলো পাতাল ঘরে।'

'সেকী ! জীবনে শুনিনি এমন অঘটন !'

'অঘটন তো বটেই-কিন্তু বিলকুল খাঁটি অঘটন ! কুবুদ্ধিটা এসেছিল একটা পাগলের মাথায়। সে ঠিক করেছিল, পাগল সরকার দিয়ে দেশ শাসন করবে। সব পাগলকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে হাত করে নিলে দিন দুয়েকের মধ্যেই-তারপর পাগলদের রাজা হয়ে দখল করলো এই পাগলা গারদ।'

'দখলে রাখতে পেরেছিলো কী ?'

'আলবৎ পেরেছিলো। পাগলাদের ওপর খবরদারি করার ভার যাদের ওপর, তাদের সব্বাইকে তো ঢুকিয়ে দিয়েছিল পাতাল ঘরে।'

'অর্থাৎ বিদ্রোহী হয়েছিল ছাড়া পাগলের দল ?'

'ঠিক ! ঠিক ! ঠিক !'

'পাল্টা বিদ্রোহ করেনি পাতালে বন্দী লোকগুলো ? আশপাশের লোকজন রুখে দাঁড়ায়নি ? পাগলা গারদ দেখতে যারা আসে, তারা হৈ-চৈ শুরু করেনি ?'

'করবে কি করে ? পাগলদের এই রাজাটা ছিল বেজায় সেয়ানা। বাইরের কাউকে ঢুকতেই দেয়নি ভেতরে। একদিন, শুধু একদিন, একটা বোকামার্কা ছোকরা এসেছিল পাগলা গারদ দেখতে। স্রেফ মজা করবার জন্যেই তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল ভেতরে । চুটিয়ে মজা করা হয়েছিল সেদিন ছোকরাকে নিয়ে। তারপর বের করে দেওয়া হয়েছিল বাইরে।'

'পাগলদের এই রাজত্ব চলেছে কতদিন ?'

'অনেকদিন-তা প্রায় একমাস তো বটেই। ইতিমধ্যে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে পাগলরা। যার যা খুশি তাই করে যাচ্ছে। অদ্ভুত অদ্ভুত জামাকাপড় পরছে মনের সুখে। দামী দামী জামাকাপড় আর গয়নাগাটি পড়ার সখও মিটিয়ে নিচ্ছে। পানীয় ঢালছে আর খাচ্ছে। পাগলরা এ জিনিসটা বড় পছন্দ করে।'

'চিকিৎসা কি চলছে ? কী চিকিৎসা করছে পাগলদের রাজা ?'

'সে তো বোকা নয়। এমন চিকিৎসা চালাচ্ছে যার জুরি চিকিৎসা পৃথিবীর কোথাও নেই-চূড়ান্ত চিকিৎসা বলতে পারেন-যেমন সোজা-তেমনি পরিষ্কার-নেই কোনো ঝামেলা-আর রীতিমতো উপাদেয়-চিকিৎসাটা হচ্ছে-'

ঠিক এই সময়ে আবার সেই বন্য বর্বর উল্লোল-নি নন্দন নৃত্য করে উঠল কানের পর্দার ওপর। অনেকগুলো গলা আবার বিকট বীভৎসভাবে এক সঙ্গে চেঁচাচ্ছে.........চেঁচাতে চেঁচাতে এইদিকেই ছুটে আসছে।

আঁৎকে উঠে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আমিও-'ছাড়া পেয়েছে! পাগলগুলো ছাড়া পেয়েছে!'

'তাই তো মনে হচ্ছে!' নিদারুণ বিবর্ণ হয়ে গিয়ে বললেন সঁসিয়ে মেলার্ড। ততক্ষণে বিকট হুঙ্কারবাজ পাগলগুলো দরজা জানালার ওদিকে পৌঁছে গেছে। ঢেঁকি-টেকি জাতীয় কিছু দিয়ে দমাদম করে দরজা ভাঙা হচ্ছে। প্রচণ্ড ধাক্কায় মড়মড় করছে জানলাগুলো।

ঘরের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে দক্ষযজ্ঞের মতো ভয়ানক কাণ্ডকারখানা। আমার পিলে চমকে দিয়ে সঁসিয়ে মেলার্ড সড়াৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন একটা আলমারির তলায়। পনেরো মিনিট ধরে যারা কাড়ানাকাড়া জাতীয় বাজনা বাজিয়ে কানের পোকা বের করে দিচ্ছিল-তারা টপাটপ করে লাফিয়ে উঠে গেল খাবার টেবিলের ওপর এবং বেতালা বেসুরোভাবে অতিমানুষিক শক্তি দিয়ে বাজিয়ে গেল আমেরিকান জাতীয় সঙ্গীত। ভয়াবহ সেই নির্ঘোষে ঘরের চারখানা দেওয়াল আর একখানা ছাদ মনে হলো এই বুঝি চৌচির হয়ে ধসে পড়বে ঘাড়ের ওপর।

ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড করে চলেছে বাতিকগ্রস্ত সেই মেয়ে পুরুষরা যারা এতক্ষণ ধরে পাগলদের নানান মজার গল্প বলে জমিয়ে রেখেছিল খাবার টেবিল। বক্তৃতা দিতে গিয়েও যে লোকটাকে আটকে দেওয়া হয়েছিল-টপাং করে সে লাফ দিয়ে গিয়ে সটান দাঁড়িয়ে উঠেছে টেবিলের ওপর রাশি রাশি খাবারের মাঝে এবং গলা ছেড়ে লেকচার ঝেড়ে যাচ্ছে অনবদ্যভাবে-যদিও একটা বর্ণও কানে ঢুকছে না তুমুল হট্টগোলের জন্যে। লাটিমের গল্প শুনিয়েছিল যে লোকটা, সে মেঝেময় চর্কিপাক দিচ্ছে দু-হাত দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে এবং ঘুরন্ত হাতের ধাক্কায় আশপাশের লোকগুলোকে দমাদম করে ছিটকে ফেলে দিচ্ছে মেঝের ওপর। অবর্ণনীয় এই সোরগোল ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে শ্যাম্পেনের বুড়বুড়ি কাটার ফট-ফটাস এবং ভুস-ভুস-ভুস শব্দ বিরামবিহীনভাবে-অপরিসীম নিষ্ঠা নিয়ে শ্যাম্পেন পাগলের পাগলামি দেখিয়ে চলেছে লোকটা। ব্যাঙ-বাবাজি গাল ফুলিয়ে আর গলার শির তুলে কটর কটর ঘ্যানোর ঘ্যানোর করে যাচ্ছে তন্ময় চিত্তে-যেন এই সিদ্ধিলাভের ওপরই নির্ভর করছে তার নির্বাণলাভের চরম সমস্যা। গাধার গাঁ গাঁ ডাক এ হেন হট্টগোলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এমনভাবে কড়িকাঠ কাঁপিয়ে চলেছে একনাগাড়ে যে কানে আঙুল দেবার কথাও আর মনে পড়ছে না। এরই মাঝে কিঞ্চিৎ

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ম্যাডাম জইয়ুস বেচারি এককোণে দাঁড়িয়ে নিঃসীম নিষ্ঠায় কোঁকর-কোঁ কোঁকর-কোঁ করে ডেকেই চলেছে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে।

নাটক চরমে পৌঁছোলো এর ঠিক পরেই। দমাস্ দুম ধড়াম ধাম্-করে ভেঙে গেল দশ দশটা জানলা। আমার চোখ ছানাবড়া করে দিয়ে ভাঙা জানলা গলে ঘরশুদ্ধ লোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো যারা তাদের শিম্পাঞ্জি, ওরাং ওটাং আর বিরাটকায় বেবুন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

অকথ্য মার মারল এরা-এই দশটা নরবানর। মারের চোটে আমি ঢুকে গেলাম একটা সোফার তলায়। মিনিট পনেরো ছিলাম সেখানে এবং তখনই শুনে শুনে জেনেছিলাম এহেন নারকীয় নাটকের গোড়ার ব্যাপারটা।

পাগলদের রাজা নামে যে পাগলটার কীর্তি কাহিনী সাড়ম্বরে আমাকে শুনিয়েছিলেন মঁসিয়ে মেলোর্ড-সে রাজা তিনি নিজেই। নিজের গৌরব গাথাই ফলাও করে বলে গেছেন এতক্ষণ। বছর দু-তিন আগে ইনি সত্যি সত্যিই হর্তা-কর্তা ছিলেন এই পাগলা গারদের। পাগলদের সঙ্গে থেকে থেকে একসময়ে পাগল হয়ে যান নিজেই। কিন্তু এ খবরটা জানা ছিল না আমার পর্যটন সঙ্গী সেই ভদ্রলোকের-যাঁর সঙ্গে এসেছিলাম এখানে এবং যিনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন পাগল-শিরোমণি মঁসিয়ে মেলোর্ডের সঙ্গে। যে দশ জন শক্তসমর্থ পুরুষ দেখাশুনা করতো পাগলদের, আচমকা তাদের কাবু করে ফেলা হয়, তারপর সারা গায়ে আচ্ছা করে আলকাতরা মাখিয়ে, আলকাতরার ওপর পালক সেঁটে দিয়ে, ঢুকিয়ে রাখা হয় পাতাল ঘরে। এইভাবে পুরো একটা মাস পাতাল ঘরে বন্দী ছিল বেচারারা এবং এই একমাস ধরে মঁসিয়ে মেলোর্ড তাদেরকে সরবরাহ করে গেছেন আলকাতরা আর পালক-এই দুটি জিনিস দিতে কিপটেমি করেননি একেবারেই-এছাড়াও রোজ দিয়েছেন খাবলা খাবলা রুটি আর এন্তার জল-পাম্পে করে সেই জল রোজ ঢেলে দেওয়া হয়েছে দশজনের মাথার ওপর। শেষের দিকে একজন নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে এবং মুক্তি দেয় বাকি সবাইকে।

পুরোনো চিকিৎসা পদ্ধতি নতুন করে ফের চালু হয়েছে এই পাগলা গারদে। তবে হ্যাঁ, মঁসিয়ে মেলার্ডের সঙ্গে আমি একমত। ওঁর উদ্ভাবিত চিকিৎসাটাই পাগলদের পাগলামি সারাতে বেশি কাজ দেয় বলে মনে হয় আমার। ওঁরই ভাষায়, এ চিকিৎসা চূড়ান্ত চিকিৎসা-যেমন সোজা-তেমনি পরিষ্কার-নেই কোনো ঝামেলা-আর রীতিমতো উপাদেয়!

শেষকালে শুধু একটা কথাই বলার আছে আমার। ইউরোপের সমস্ত লাইব্রেরি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ডক্টর আলকাতরা আর প্রফেসর পালক-এর লেখা কোনো কেতাব আমি পাইনি।

ধূমকেতু

(দ্য কনভারসেশন অফ ইরোজ অ্যাণ্ড চারমিয়ন)

ইরোজ ॥ ইরোজ নামে কেন ডাকছো আমাকে ?

চারমিয়ন ॥ ওই নামেই এখন থেকে ডাকা হবে তোমাকে। ভুলে যাও তোমার পৃথিবীর নাম। যেমন ভুলে যেতে চাই আমি নিজে। এখন থেকে আমার নাম চারমিয়ন।

ইরোজ ॥ স্বপ্ন দেখছি বলে তো মনে হচ্ছে না !

চারমিয়ন ॥ স্বপ্ন আর এখন নেই-রয়েছে শুধু রহস্য। তোমার মধ্যে প্রাণ রয়েছে, যুক্তি রয়েছে-দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে আমার। ছায়ার প্রলেপ কেটে গেছে তোমার চোখের ওপর থেকে। মনে জোর আনো, ভয় পেও না। ঘোরে ছিলে এদ্দিন, যে-কটা দিন তোমার ভাগে পড়েছিল-এখন আর তা নেই, কাল তোমাকে দীক্ষা দেবো। তোমার এই আশ্চর্য অস্তিত্বে-যে অস্তিত্ব আছে শুধু আনন্দ আর বিস্ময়।

ইরোজ ॥ ঘোর-টোর কেটে গেছে, ভয়ঙ্কর সে অন্ধকারও আর নেই। অসহ্য দুর্বলতাবোধ উধাও হয়েছে, ভীষণ পাগলা আওয়াজটাও আর শুনতে পাচ্ছি না। তা সত্ত্বেও কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আমার এই নতুন অস্তিত্বের সূক্ষ্ম উপলব্ধি যেন ছুরি চালাচ্ছে মাথার মধ্যে।

চারমিয়ন ॥ দিন কয়েক হবে এইরকম-তারপর সব কেটে যাবে। আমি কিন্তু হাড়ে হাড়ে বুঝছি কী অবস্থার মধ্যে এই মুহূর্তে রয়েছো তুমি। আমিও ছিলাম ঐ অবস্থায়। পৃথিবীর হিসেবে দশ বছর আগে। কিন্তু মনে আছে আজও স্পষ্ট। যন্ত্রণা সহ্য করতে পেরেছো বলেই আসতে পেরেছো এখানে।

ইরোজ ॥ এখানে !

চারমিয়ন ॥ আইদেন এখানকার নাম।

ইরোজ ॥ আইদেন! আমার যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, চারমিয়ন। অজানা এসে যাচ্ছে জানা-র জগতে, রহস্যময় ভবিষ্যত এসে মিশছে আনন্দময় নিশ্চিত বর্তমানে-এত বোঝা যে সইতে পারছি না।

চারমিয়ন ॥ মাথা থেকে তাড়াও এসব ভাবনা। এ নিয়ে কথা হবে কালকে, এখন তোমার মন চঞ্চল, স্মৃতি নিয়ে মেতে থাকো, শান্তি পাবে। উত্তেজনা মিলিয়ে যাবে, স্বস্তি আসবে। আশপাশে তাকাতে যেও না-সামনেও তাকাবে না-তাকাও শুধু পেছনে।তোমার মুখেই যে শুনতে চাই, অভাবনীয় সেই মহাপ্রলয়ের খুঁটিনাটি বিবরণ-যার ফলে তুমি এসে পড়েছো আমাদের মধ্যে। খুলে বলো, ইরোজ, খুলে বলো সব কিছু। পুরনো সেই পৃথিবীর চেনা জানা ভাষাতেই কথা বলো-যে পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে লোমহর্ষক কাণ্ডকারখানার মধ্যে দিয়ে-যে পৃথিবী আর কোনো দিনই ফিরে আসবে না-কথা বলো সেই পৃথিবীর ভাষায়।

ইরোজ ॥ লোমহর্ষক কাণ্ডকারখানা বটে-গায়ের রক্ত জমিয়ে দেওয়ার মতো ভয়াল ভয়ঙ্কর মহাপ্রলয়। স্বপ্ন নয়-সত্যি!

চারমিয়ন ॥ অথচ তা স্বপ্নের মতোই। এখন তা কেটেও গেছে। ইরোজ, দেখে কি মনে হয় আমাকে-শোকে-তাপে জ্বলে পুড়ে মরছি?

ইরোজ ॥ এখন তা মনে হয় না বটে, কিন্তু শেষের সেদিনের কথা মনে পড়ছে বড় ভীষণ ভাবে। শোক দুঃখের কালো জমাট মেঘ ভাসছিলো তোমার বাড়ীর মাথায়।

চারমিয়ন ॥ শুধু শেষের সেদিন কেন, সব শেষের ভয়ানক মুহূর্তটার কথা বলে হাল্কা হও, ইরোজ। আচমকা ফেটে পড়েছিল মহা-বিপর্যয়-উলঙ্গ নাচ নেচে গেছিল পৃথিবী জুড়ে-এইটুকুই শুধু মনে আছে-তারপর কি কি ঘটেছিল, মনে নেই কিছুই। মানুষ জাতটার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে ঠাঁই পেলাম কবরের অমানিশায়, সেই সময়ে যে দুর্ভোগ, যে যন্ত্রণা সয়ে ছিলাম-যা তোমাকেও সইতে হয়েছে-তার জন্যে তৈরী ছিলাম না কস্মিনকালেও। কোনোরকম পূর্ব্বজ্ঞান দিয়ে দুরন্ততম কল্পনাতেও ফুটিয়ে তোলা যায় না সেই ভোগান্তিগুলোকে। অবশ্য ভবিষ্যতের কথা বলার বিদ্যের অ-আ-ক-খ'ও তো জানতাম না আমি।

ইরোজ ॥ ঠিকই বলেছো। প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত ভোগান্তির হিসেব আগে থেকে জানা যায়নি একেবারেই। তবে কি জানো, মানুষ জাতটার কপালে পুড়বে কিভাবে, তা নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেক আগে থেকেই বিস্তর জল্পনা-কল্পনা করে গেছেন। বন্ধু, তুমি যখন বিদায় নিলে আমাদের মধ্যে থেকে,

তখন থেকেই কিন্তু জ্ঞানী গুণীরা বলতে শুরু করেছিলেন, তবে কি পবিত্র গ্রন্থে লেখা ভবিষ্যতের ঘটনা ঘটা শুরু হয়ে গেল? সবই কি ছারখার হয়ে যাবে আগুনে? আগুনটা লাগবে কি করে, অথবা পৃথিবী ধ্বংস হবে কিভাবে-এ ব্যাপারে জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞানের ভাঁড়ারেও গলদ থেকে গেছিল গোড়া থেকে। ওঁদের বিশ্বাস ছিল, ধূমকেতুতে আগুনের আতঙ্ক নেই। মহাকাশের এই বিভীষিকাদের মোটামুটি একটা ঘনত্ব হিসেব করে জানা গেছিল। বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহদের আশপাশ দিয়ে এরা ছুটে যায় বটে, কিন্তু গ্রহ উপগ্রহগুলোর চেহারা পালটে দিয়ে যায় না, তাদের কক্ষপথেরও অদলবদল ঘটতে পারে না। বায়বীয় বস্তু দিয়ে গড়া এই ধূমকেতুরা যদি ধাক্কাও মারে পৃথিবীতে-পৃথিবীর গায়ে আঁচড়টিও পড়বে না-এমনটাই ধরে নিয়েছিলাম আমরা। ধাক্কাধাক্কির ভয়ও কোনদিন হয়নি। কেন না, আমরা তো জানতাম, মহাশূন্যের এই ভবঘুরেরা তৈরী হয় কি কি উপাদান দিয়ে। এদের জঠরে যে আগুন তৈরীর উপাদান থাকতে পারে, এমন ধারণা অসম্ভব বলেই আমরা জানতাম। অথচ দেখো, মানুষ অবাক হতে ভালবাসে, অলীক কল্পনা নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকতে চায়। ধূমকেতু তেড়ে আসছে শুনে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ভয়ে আধখানা হয়ে গেছিল বটে, বেশিরভাগ মানুষ উত্তেজনা আর অবিশ্বাস নিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণ শুরু করে দিয়েছিল।

হিসেব-টিসেব করা হয়ে গেছিল তক্ষুনি। জানা গেছিল, ধূমকেতুর ঝাপটা পৃথিবীর গায়ে লাগবেই। জনা দুই তিন দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেছিলেন, পৃথিবী বেচারাকে ছুঁ মারতেই আসছে ওই পাগলা ভবঘুরে। কে যে কতটা জানে, তাই নিয়ে সংশয় দেখা গেছিল বলেই সাধারণ মানুষ ততটা উতলা হয়নি। শুধু চেয়ে থাকত আকাশের দিকে। দিন সাত আট একই রকম ঘোলাটে ভাব নিয়ে দেখা দিয়ে গেছে সেই ধূমকেতু। পুচ্ছ প্রদেশকেও দেখা গেছে আবছাভাবে। মাঝে মাঝে রঙ পালটেছে খুব সামান্য। তারপরেই পণ্ডিতরা আসল কথাটা ভাঙলেন। সত্যিই কি ঘটতে চলেছে-তা জানলো সাধারণ মানুষ।

তখনও কিন্তু দোনামোনা অবস্থায় থেকেছে প্রায় সকলেই। ধাক্কা মেরে পৃথিবীকে লণ্ডভণ্ড করতে পারে আকাশের আগন্তুক-দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতদের এই ভবিষ্যৎবাণীতে খুব একটা আস্থা রাখা যায়নি। কেননা, পয়লা সারির পণ্ডিতরা যুক্তি খাড়া করে দেখিয়ে দিলেন, এমন অসম্ভবকাণ্ড ঘটতেই পারে না। বৃহস্পতি গ্রহের আশপাশ দিয়ে ধূমকেতুরা আনাগোনা করছে অনেকদিন ধরেই। প্রতিটি ধূমকেতুর মাথা আমাদের চেনাজানা সব চাইতে বিরল গ্যাসের চাইতেও হাল্কা। বৃহস্পতি উপগ্রহদের

কোনো অনিষ্ট যখন হয়নি-তখন এই পৃথিবী বেচারীর ক্ষয়ক্ষতি হবে কী করে ?

যুক্তির ধারে কাজ হলো খুবই। ভয় কেটে গেল সাধারণ মানুষের মন থেকে।

এমন কি, বাইবেলের বচন শুনিয়েও ধর্মগুরুরা ভয়ার্ত করে তুলতে পারেননি জনসাধারণকে। আগুনে ছারখারে হয়ে যাবে এই পৃথিবী। আগুনকে বয়ে নিয়ে আসবে ধ্বংসের দূত। বেশ, বেশ ! কিন্তু ধূমকেতুর পেটে আগুন নেই-এটা তো বাচ্চা ছেলেও জানে।

ধূমকেতুর আবির্ভাবে মড়ক লাগে, যুদ্ধ বাধে-ইতিহাস তাই বলছে। বলুকগে। ও সব কুসংস্কারে এখন কান দিচ্ছে কে ?

কিন্তু অতবড় একটা আকাশ-দালো পৃথিবীর পাশ দিয়ে ল্যাজ নেড়ে গেলে কিছুটা টের পাওয়া তো যাবে। যেমন, একটু-আধটু ভৌগোলিক হেরফের ঘটতে পারে, আবহাওয়া যৎকিঞ্চিৎ পালটে যেতে পারে, গাছপালারাও সেই কারণে উল্টোপাল্টা কাণ্ড ঘটাতে পারে, ম্যাগনেটিক এবং ইলেকট্রিক্যাল প্রভাবেও যৎসামান্য অদলবদল ঘটতে পারে। যাই ঘটুক না কেন, ভীষণ রকমের পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। এই সব সাত পাঁচ কথা-কাটাকাটির মধ্যে দিয়েই দিনে দিনে চেহারা পালটে ফেলেছিল কালকেতু। এগিয়ে আসছিল আরো কাছে। তখন তার চেহারা আরও বড়। বিপুলবপু আরও ঝকঝকে। এই না দেখেই ফ্যাকাশে মেরে গেল গোটা মানুষ জাতটা।

এর আগে এমন কোনো ধূমকেতু এত বড় আকারে এমন চোখ ধাঁধানো আকারে দেখা দেয়নি। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আলতু-ফালতু বকে গেছেন-এই কথা যাঁরা বলেছিলেন-এবার তারা শিউরে উঠলেন। ধ্বংসের দূতের ভয়ানক আকৃতি তাঁদের হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনি বাড়িয়ে দিল। মস্তিষ্কের কন্দরে ঘোর কালো ছায়া ফেলে গেল। অঘটন যে ঘটতে চলেছে, এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহই রইল না। কেন না, বড় তাড়াতাড়ি বিরাট বড় আগুনের গোলা হয়ে উঠেছে মহাকাশের বিভীষিকা। দিগন্ত জুড়ে আগুন লকলক করছে তার প্রকাণ্ড চেহারায়।

বাঁচবো কি মরবো, এই দোটানা ভাবটা একদিন কেটে গেল। ধূমকেতুর আওতায় এসে গেছি, হাড়ে হাড়ে একদিন তা বুঝলাম। দারুণ চাঙ্গা হয়ে গেল মন আর দেহ। ভয়-ডর কমে যাওয়ার ফলেই সহজভাবে দেখতে পেলাম গাছপালারাও পালটে যাচ্ছে। এত সবুজপাতা এমন উজ্জ্বলভাবে কোনো গাছে দেখা যায়নি। এত ফুল, এত কুঁড়ি কোনো পাদপ অতীতে আমাদের দেখাতে পারেনি। আবহাওয়ার পরিবর্তন তাহলে ঘটেছে। পণ্ডিতরা ঠিকই বলেছিলেন।

তারপর একদিন বুঝলাম, ধূমকেতু হাঁড়ি মাথা দিয়েই প্রথম-ঢুঁ মারবে পৃথিবীকে। আতঙ্ক আর যন্ত্রণা যুগপৎ আশ্রয় করলো প্রতিটি মানুষকে। অকথ্য যন্ত্রণার উৎপত্তি দুটো কারণে ; এক, খিঁচ ধরেছে বুক আর ফুসফুস অঞ্চলে ; দুই, চামড়া শুকিয়ে যাচ্ছে অসহ্যভাবে। পরিণামটা কল্পনা করেই কেঁপে উঠল সমস্ত মানুষ।

আমরা জানি বাতাসে রয়েছে একুশভাগ অক্সিজেন আর উনআশি ভাগ নাইট্রোজেন। অক্সিজেন ছাড়া আগুন জ্বলে না-প্রাণ থাকে না। আগুন অথবা প্রাণ কোনোটাকেই ঠেকা দিয়ে টিঁকিয়ে রাখতে পারে না নাইট্রোজেন। কিন্তু যদি অক্সিজেন খুব বেড়ে যায়, তার বাড়তি এনার্জি মানুষকে উদ্বেল, উত্তাল, মাতাল করে তুলবে, আমরা দেখেছি, ঠিক এইরকমটাই ঘটেছিল এরপর। আর যদি নাইট্রোজেন একেবারেই চলে যায় ? দপ করে জ্বলে উঠবে প্রলয় আগুন-নিমেষের মধ্যে সংহার করবে বসুন্ধরাকে।

করাল কালকেতুর রক্তলাল আওয়ান আকৃতির মধ্যেই দেখলাম আমাদের শেষমুহূর্ত। নিহিত নিয়তি এলো ঠিক একদিন পরেই। বাতাসের উপাদান ঝটপট পালটে যেতেই খাবি খাওয়া শুরু হলো ভূগোলকের সর্বত্র। ধমনীতে ধেয়ে গেল লালরক্ত। ভয়াবহ প্রলাপ আচ্ছন্ন করলো প্রতিটি মানুষকে। আড়ষ্ট দু-হাত তুলে ধরলাম বটে আকাশের রক্তগোলকের দিকে-কিন্তু রেহাই পেলাম না। মুহূর্তের জন্য মড়ার মতো ম্লান বিষণ্ণ আলোয় ছেয়ে গেল চরাচর-পাণ্ডুর সেই আলো এফোঁড় ওফোঁড় করে গেল সব কিছু। তারপরেই স্বয়ং ঈশ্বর যেন চেঁচিয়ে উঠলেন-সেরকম আওয়াজ কেউ কখনো শোনেনি-পর মুহূর্তেই আগুন ফেটে পড়ল ইথারে-যে ইথারের মধ্যে রয়েছে আমাদের অস্তিত্ব। লকলকে সেই আগুনের বর্ণনা দেওয়া যায় না। এবং সেই শেষ।

লম্বাটে বাক্স

(দ্য অবলঙ বক্স)

কয়েক বছর আগের কথা। চার্লসটন থেকে নিউইয়র্ক যাচ্ছিলাম জাহাজে করে। যাওয়ার আগে দেখা করতে গেছিলাম ক্যাপ্টেন হার্ডির সঙ্গে। কিছু কাজের কথা বলতে।

শুনলাম অনেক প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে এই জাহাজে-থাকছে অনেক মহিলা। যারা যাচ্ছে, তাদের তালিকায় দেখলাম আমার চেনাশুনা জনাকয়েকের নাম রয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন মিঃ কর্নেলিয়াস ওয়্যাট। আর্টিস্ট। বয়স আমারই মতন। অর্থাৎ তরুণ।

কর্নেলিয়াস আর আমি একই কলেজে পড়েছি। প্রাণ খুলে মিশেছি। মনটা ওর খুব ভালো। সব ব্যাপারেই দারুণ উৎসাহী। দিলদরিয়া মেজাজ।

লক্ষ্য করলাম, তিনটে ঘর নিয়েছে কর্নেলিয়াস। প্রতিটি ঘরে আছে দুটো করে বার্থ অর্থাৎ শোবার জায়গা। বড় সরু। একজনের বেশি দুজন শুতে পারে না। কর্নেলিয়াস যাচ্ছে ওর স্ত্রী আর দুই বোনকে নিয়ে। ওর নিজের বোন। দুটো ঘরেই কুলিয়ে যায়। তিনটে ঘর কি দরকার?

তাহলে কি কাজের লোক যাচ্ছে সঙ্গে? লিস্টে 'কাজের লোক' শব্দ দুটো প্রথমে লেখা হয়েছিল, পরে কেটে দেওয়া হয়েছে। তার মানে, বাড়তি ঘরখানা ও রেখেছে নিজের আঁকা ছবি-টবি রাখবে বলে।

কর্নেলিয়াসের বোন দুজনকে আমি চিনি। দুজনেই খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আর ভারি চালাক। ওর বউ-এর সঙ্গে এখনো আলাপ হয়নি। চোখেই দেখিনি। শুনেছি খুব সুন্দরী আর বুদ্ধিমতী, মার্জিতা আর শিক্ষিতা। কর্নেলিয়াসই বলেছিল। তাই উৎসুক হয়ে রইলাম জাহাজে দেখা হলে আলাপ করবো বলে।

পনেরোই জুন জাহাজ ছাড়বে। আমি সেখানে পৌঁছিলাম চোদ্দই জুন। ক্যাপ্টেন বললেন, কর্নেলিয়াস বউ আর বোনেদের নিয়ে এখুনি এসে পড়বে। একটু থেকে গেলে দেখা হয়ে যাবে।

তাই দাঁড়িয়ে রইলাম জাহাজে। ঘণ্টাখানেক পরে শুনলাম, কর্নেলিয়াস আজ আসছে না। হঠাৎ শরীর খারাপ হয়েছে। কালকে আসবে।

পরের দিন জাহাজে উঠতে যাচ্ছি, ক্যাপ্টেন বললেন, বিশেষ কারণে দিন দুই পরে ছাড়বে জাহাজ। শুনে অবাক হলাম। চমৎকার দক্ষিণী হাওয়া বইছে। জাহাজ ছাড়ার এই তো সময়। পাল ফুলে উঠবে হাওয়ায়.........

বিরক্ত হয়ে চলে এলাম হোটেলে।

দুদিন কেন, সাতদিন বসে থাকতে হলো হোটেলে। তারপর খবর পাঠালেন ক্যাপ্টেন। সঙ্গে সঙ্গে বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে হাজির হলাম জাহাজে।

গিয়ে দেখি লোক গিজগিজ করছে। প্যাসেঞ্জাররা আলাপ পরিচয় করছে। দশ মিনিট পরেই এসে গেল কর্নেলিয়াস। সঙ্গে ওর বউ আর দুই বোন।

কিন্তু লক্ষ্য করলাম কেমন যেন ঝিমিয়ে আছে কর্নেলিয়াস। বউ-এর সঙ্গে আলাপটাও করিয়ে দিল না। দুই বোনের একজন এগিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল আমাদের।

অবাক হয়েছিলাম ভদ্রমহিলার মুখ দেখে। আমি বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন করতেই তিনি ঘোমটা সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ঘোমটার জন্যেই মুখটা এতক্ষণ দেখা যায়নি। এবার দেখলাম।

কর্নেলিয়াস খুব লম্বা লম্বা কথা বলেছিল ওর বউ-এর রূপ গুণ সম্পর্কে। আমি দেখলাম, মুখে তার কোনো ছাপ নেই। রূপ তো নেই-ই, শিক্ষা আর সহবৎও তেমন আছে বলে মনে হয় না।

তবে হ্যাঁ, বেশভূষা বেশ দামি। কর্নেলিয়াসের কাছে থেকে নিশ্চয় শিখেছে।

এইটুকুই দেখেছিলাম। তার পরেই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁর কেবিন ঘরে। সঙ্গে গেল কর্নেলিয়াস।

এইসব দেখেই পুরোনো কৌতূহলটা আবার মাথা চাড়া দিল আমার মনের মধ্যে। কাজের লোক তো দেখছি না, মালপত্রও

তেমন নেই-তবে বাড়তি ঘরখানা কেন ?

একটা পেল্লায় লম্বাটে-বাক্স সঙ্গে করে এনেছিল কর্নেলিয়াস। সেটা ডেকে উঠতেই জাহাজ সরে এলো জেটি থেকে।

বাক্সটা লম্বায় ছ-ফুট, চওড়ায় আড়াই ফুট। বড় বদখৎ আকার। এমন বাক্সে করে কেউ ছবি নিয়ে যায়, আগে জানা ছিল না। কর্নেলিয়াস ওর আঁকা ছবির ব্যাপারে আমার কাছে কিছুই লুকোয় না। কিন্তু বাক্সবন্দী ছবিগুলো সম্পর্কে একটা কথাও বললো না আমাকে। তবে কি লুকিয়ে দুষ্প্রাপ্য ছবি চালান করছে নিউইয়র্কে ?

ঠিক করলাম বাক্স রহস্য জানতেই হবে।

রহস্য আরও জমাট বাঁধলো যেদিন দেখলাম, বাক্সটা বাড়তি ঘরে রাখা হয়নি। রয়েছে ওরই শোবার ঘরে। মেঝের ওপর। মেঝের ওপর হাঁটা চলাও দায় সেজন্যে। আলকাতরা অথবা রঙ দিয়ে ডালার ওপর লেখা রয়েছে ; সাবধানে নাড়াচাড়া করবে। এই দিকটা ওপর দিকে রাখবে।

একটা বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোচ্ছিল বাক্স থেকে। খুব সম্ভব এই আলকাতরা অথবা রঙের জন্যে। মোটেই ভালো লাগেনি আমার।

প্রথম তিন চার দিন বেশ কাটলো। আবহাওয়া চমৎকার। তীরভূমি আর দেখা যাচ্ছে না। যেদিকে তাকাই, শুধু সমুদ্র। সেই কারণেই প্যাসেঞ্জাররা সকলেই খুশিতে ফেটে পড়ছে। মেলামেশা করছে। মুখে কথার ফোয়ারা ফোটাচ্ছে।

কিন্তু কর্নেলিয়াস আর তার দুই বোন এড়িয়ে চলেছে সবাইকেই। কর্নেলিয়াস না হয় এমনিতেই একটু চুপচাপ থাকতে ভালোবাসে, ওর বোন দুটো তো সেরকম নয় । কিন্তু জাহাজে উঠে পর্যন্ত এই বোনদুটোর হাবভাবও কেমন জানি বড় আড়ষ্ট।

কর্নেলিয়াস বেশ বিমর্ষই হয়ে রয়েছে। আর্টিস্ট হলে এরকম খ্যাপাটে হয় জানি। কিন্তু দুই বোন পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন ? বেশিরভাগ সময় কাটায় ওদের কেবিন ঘরে। বাইরে বেরুলে দুটো কথা বলে পেটের কথা বাইরে টেনে বার করতাম-সে সুযোগই দিচ্ছে না।

কর্নেলিয়াসের বউ অবশ্য সবার সঙ্গে মিশছেন। নিজের ঘরে ঢুকে বসে থাকেন না। সারাদিন টো টো করছেন জাহাজময়। কথা বলছেন প্রত্যেকের সঙ্গে। এবং সবাই বেশ মজা পাচ্ছে-ওঁর সঙ্গে কথা বলে।

মজা কথাটা বললাম ইচ্ছে করেই। পুরুষরা ভদ্রমহিলাকে নিয়ে একদম মাথা ঘামান না। জাহাজের অন্য সব মহিলা কিন্তু ওঁর সম্বন্ধে বলছে একটাই কথা। উনি নাকি লেখাপড়া শেখেন নি একেবারেই। খারাপ কথা বলেন যখন তখন। তবে হ্যাঁ, মনটা

ভালো। কারও সাতে পাঁচে নেই।

আমার মনে খটকা লাগছে তো সেই কারণেই। কর্নেলিয়াস ওর বউ সম্বন্ধে বলেছিল ঠিক এর উল্টো কথা। শুধু তাই নয়। কানাকড়িও না নিয়ে এই বিয়ে সে করেছে স্রেফ রূপ আর গুণ দেখে।

অথচ এখন দেখা যাচ্ছে এ মেয়ের গুণের ঘাট নেই। রূপের ঢেঁকিও নন। দিনরাত খালি 'আমার স্বামী' আর 'আমার স্বামী' করেই গেলেন। স্বামী যেন আর কারও নেই। অথচ স্বামী যখন ঘরে, উনি তখন বাইরে। রাজ্যের লোকের সঙ্গে হা-হা হি-হি করে বেড়াচ্ছেন। এবং সেটা যে খুব সভ্য ভব্য ভাবে তাও নয়। কর্নেলিয়াসের মতো রুচিশীল মানুষ এ মেয়েকে বিয়ে করলো কেন , সেটাও একটা হেঁয়ালি। টাকার জন্যে যে নয়, তা হাজারবার ও বলেছে আমাকে।

বেশ বুঝলাম, কারে পড়ে বিয়েটা করতে বাধ্য হয়েছে কর্নেলিয়াস। এরকম গেঁইয়া মেয়ের সঙ্গে ও মানিয়ে নিতে পারছে না বলেই মুখখানা প্যাঁচার মতো করে রেখেছে–ঘর থেকেই বেরুচ্ছে না। বেচারা!

কর্নেলিয়াসকে একদিন পেয়ে গেলাম ওর কেবিন ঘরের সামনেই। গোমড়া মুখে তাকিয়ে ছিল সমুদ্রের দিকে। দুনিয়ার দুঃখ জড়ো হয়েছে যেন মুখের প্রতিটি রেখায়। আমাকে দেখেই সটকান দিতে যাচ্ছিল কেবিনের মধ্যে-কিন্তু তার আগেই আমার কনুই গলিয়ে দিলাম ওর কনুইয়ের ফাঁকে। তারপর হৈ-চৈ করে টেনে নিয়ে গেলাম ওরই ঘরের মধ্যে।

এইটাই আমার স্বভাব। ফুর্তি দিয়ে নাচিয়ে ছাড়ি সবাইকে। যদি দেখি কারও মনে দুঃখ জমে আছে, আমার মনের ফুর্তি দিয়ে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিই তার মনের দুঃখকে। কর্নেলিয়াসকে নিয়ে এরকম হুটোপাটি কলেজে করেছি বহুবার। ঝিমিয়ে থাকলেই চাঙ্গা করে দিয়েছি। সেদিন কিন্তু পারলাম না। ব্যাপারটা ঘটল ঠিক তার উল্টো।

নিজের বউকে নিয়ে কোনো কথার ধার দিয়েও যখন গেল না, তখন ঠিক করলাম ওর মনের আগল ভাঙা যাক বাক্স রহস্য নিয়ে খোঁচা মেরে।

আঙুল দিয়ে ওর পাঁজরা খুঁচিয়ে বলেছিলাম-'ওহে কর্নেলিয়াস, তোমার ওই বিদিগিচ্ছিরি লম্বাটে বাক্সটা ঘরজোড়া হয়ে পড়ে রয়েছে কেন, আমি তা জানি। কারণ আমি জানি ওর ভেতরে কি আছে।'

বলবো কি মশায়, এই কথাটা শুনেই কর্নেলিয়াস যেভাবে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, সেভাবে ওকে অন্তত কখনো আমি তাকাতে দেখিনি।

আমার লম্বা আঙুলটা দিয়ে তখনও কিন্তু ওর পাঁজরা

খোঁচাচ্ছি। আর তাকাচ্ছি দুচোখে দুষ্টুমি নাচিয়ে। সে চাহনির অর্থ খুব গভীর। মুখে আর কোনো কথা না বলে চোখের ভাষা দিয়ে বলতে চাইছি-জানি হে জানি, আমি স-ব জানি।

এরপরেই ঘটলো সেই বিপত্তি।

আচমকা হাসতে শুরু করল কর্নেলিয়াস। সে কী হাসি। নায়েগ্রা জলপ্রপাত যদি কখনো হাসির প্রপাত হয়ে যায়, তাহলে বুঝি এমনি হয়। এত হাসি যে কোথায় লুকিয়ে ছিল গোমড়ামুখো কর্নেলিয়াসের ভেতরে, সেটাও একটা রহস্য। হেসেই গেল ও। দমকে দমকে হাসি ছুটিয়ে গেল পাক্কা দশ দশটা মিনিট ধরে। তারপরেই ধড়াস করে আছড়ে পড়লো কেবিন ঘরের মেঝেতে-বিদিগিচ্ছিরি ওই লম্বাটে বাক্সটার পাশেই। দেখেশুনে মনে হলো, বুঝি মারাই গেল কর্নেলিয়াস। লোকজন ডেকে সে যাত্রা ওকে চাঙ্গা করা হলো বটে, ক্যাপ্টেন আর আমি ঠিক করলাম, এখন থেকে ওর সঙ্গে কথাবার্তা না বলাই ভালো। মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে মনে হচ্ছে। এটাও ঠিক হলো, ব্যাপারটা নিয়ে পাঁচ-কান করাটা সঙ্গত হবে না। চেপে যাওয়াই যাক।

এরকম এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগলো পরপর যে তুঙ্গে উঠে গেল আমার কৌতূহল।

আমার ঘর থেকে কর্নেলিয়াসের তিনখানা কেবিনঘরের দরজা দেখা যায় একটা স্লাইডিং দরজা খোলা থাকলে। জোরালো বাতাসে জাহাজ মোচার খোলার মতো দুলে দুলে, কখনো ঝুঁকে পড়ে কখনো চিতিয়ে পড়ে, চলছিল বলে এই দরজাটা হড়কে গিয়ে খোলা থাকতো বেশির ভাগ সময়। বন্ধ করার গরজ হতো না কারুরই। আমার ঘরের স্লাইডিং দরজাটাও জাহাজ দুলুনির ফলে খুলে যেত-আমি বন্ধ করতাম না হাওয়া খাওয়ার লোভে। এত গরমে দরজা বন্ধ করে থাকা যায় না।

পরপর দুরাত ভাল করে ঘুমোতে পারিনি। 'সবুজ চা' খেয়েও প্রাণটা আইচাই করেছে। তাই দেখতে পেয়েছিলাম অদ্ভুত ব্যাপারটা।

রাত এগারোটা নাগাদ কর্নেলিয়াসের বউ কর্নেলিয়াসের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঢুকতো পাশের বাড়তি ঘরটায়। ভোর বেলায় কর্নেলিয়াসের ডাক শুনে বাড়তি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঢুকতো কর্নেলিয়াসের ঘরে।

এই ব্যাপার! স্বামী-স্ত্রীতে আর বনিবনা নেই। হয়তো বিবাহ-বিচ্ছেদেরও আর দেরি নেই! বাড়তি ঘরের রহস্য বোঝা গেল এদ্দিনে!

এ রহস্যটা ফাঁস হলো তো রহস্য পাকিয়ে উঠলো অন্য একটা ব্যাপারে। বউ যতক্ষণ পাশের ঘরে থাকতো, ততক্ষণ

কর্নেলিয়াসের ঘরে অদ্ভুত-অদ্ভুত আওয়াজ হতো। বাটালি আর হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে যেন লম্বাটে বাক্সটা খোলা হচ্ছে, বাক্সর ডালা খুব আলতো করে মেঝেতে নামিয়ে কাঠের দেওয়াল ঠেস দিয়ে রাখা হচ্ছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কে যেন কাঁদছে। ভোরের দিকে এসব আওয়াজ থেমে যেত। কর্নেলিয়াস পুরোদস্তুর জামাকাপড় পড়ে দরজা খুলে পাশের ঘর থেকে বউকে ডেকে আনতো।

এতো বড় জবর রহস্য! ডালা খোলার আওয়াজ যাতে বেশী না ছড়ায়, তাই বাটালির আর হাতুড়ির মাথা যে ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে নেওয়া হয়েছে, তা চাপা আওয়াজ শুনেই আন্দাজ করে নিতাম। ভোরের দিকে চাপা আওয়াজে ঠুকে ঠুকে ডালা বন্ধ করা হচ্ছে তাও টের পেতাম। তারপরেই ফুলবাবুটি সেজে বেরিয়ে আসতো বাবু কর্নেলিয়াস।

সাতদিন গেল এইভাবে। তারপর এলো ঝড়। জাহাজকে নিয়ে লোফালুফি খেলা চলল দিন দুই। পেছনের পাল ছিঁড়ে ফর্দাফাই হয়ে পৎ পৎ করে উড়তে লাগলো লম্বা লম্বা ফিতের মতো। তারপরে, একই দশা ঘটলো সামনের পালখানারও। ঝড় যখন হ্যারিকেন ঝড়ে হয়ে দাঁড়ালো, তখন জাহাজে জল দাঁড়িয়ে গেল চার ফুট। ছুতোর মিস্ত্রি এসে খবর দিলে, এ ফুটো মেরামত করা যাবে না-জল বার করাও যাবে না-কেননা জলের পাম্প বিগড়েছে।

তৃতীয় দিন সকাল থেকে ঝড় থামলো। কিন্তু জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে জাহাজ হাল্কা করার চেষ্টা করেও কোনো লাভ হলো না। জাহাজ ডুবেই চলেছে দেখে রাত আটটায় ফুটফুটে চাঁদের রাতে লঙ-বোট নামিয়ে বেশির ভাগ যাত্রী আর মাঝিমাল্লা নিরাপদে আশ্রয় নিল কাছের একটা দ্বীপে। জলি-বোটে চাপলাম আমরা চোদ্দজন যাত্রী আর সপরিবারে ক্যাপ্টেন। কর্নেলিয়াস ছিল এই বোটে। ছিল ওর বউ আর দুই বোন।

মালপত্র কিছু নিতে পারেনি কেউই। জায়গা কই? হঠাৎ কিন্তু সটান উঠে দাঁড়িয়েছিল কর্নেলিয়াস। জলি-বোট তখন ডুবন্ত জাহাজ থেকে কয়েক ফ্যাদম দূরে সরে এসেছে।

বলেছিল ঠাণ্ডা গলায়-'ক্যাপ্টেন, আমার বাক্সটা আনতে দিন।'

'জায়গা নেই। বসে পড়ুন-পড়ে যাবেন,' কড়া গলায় বলেছিলেন ক্যাপ্টেন।

'একটা বাক্স রাখার জায়গা ঠিকই হবে,' দাঁড়িয়ে থেকেই একইভাবে বলে গেছিল কর্নেলিয়াস।

ক্যাপ্টেন আর স্থির থাকতে পারেননি। ঝড় থামলেও হাওয়ায় বেশ জোর রয়েছে। নৌকো দুলছে। তাই তেড়ে উঠেছিলেন-'আপনার মাথা খারাপ হয়েছে মিঃ কর্নেলিয়াস।

আরে.........ধরুন.........ধরুন ! ধরুন !'

আর ধরুন ! চোখের নিমেষে নৌকো ছেড়ে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল কর্নেলিয়াস। অমানুষিক চেষ্টায় সাঁতরে গিয়ে একটা দড়ি ধরে হাঁচড় পাঁচড় করে উঠে পড়েছিল প্রায় ডোবা জাহাজে।

তারপরেই চাঁদের আলোয় দেখেছিলাম অবিশ্বাস্য সেই দৃশ্য। হিঁচড়ে হিঁচড়ে লম্বাটে বাক্সটাকে কেবিন ঘর থেকে ডেকের ওপর নিয়ে এলো কর্নেলিয়াস। বাক্সের গায়ে নিজেকে বাঁধলো দড়ি দিয়ে। তারপর বাক্স পিঠে নিয়ে ঝাঁপ দিল জলে। ডুবে গেল টুপ করে। আর উঠল না।

হাওয়ার ঝাপটায় জলি-বোট নিয়ে ওর দিকে যেতেও পারলাম না।

দম বন্ধ করে সেই দৃশ্য দেখবার পর ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেছিলাম ক্যাপ্টেনকে-টুপ করে কিভাবে ডুবে গেল দেখলেন ! আমি তো ভেবেছিলাম ফের ভেসে উঠবে-বাক্সই ওকে ভাসাবে।

'তা ভাসাবে-নুন গলে যাওয়ার পর।' বলেছিলেন ক্যাপ্টেন।

'নুন ! মানে ?'

'চুপ। মিঃ কর্নেলিয়াসের বউ আর বোনেরা যেন শুনতে না পায়। পরে সব বলবো আপনাকে।'

চারদিন পর আমাদের জলি-বোট পৌঁছেছিল একটা দ্বীপে। এক মাস পরে নিউইয়র্কে ক্যাপ্টেনের কাছে শুনেছিলাম কর্নেলিয়াসের কাণ্ডকারখানা।

কর্নেলিয়াস যাকে বিয়ে করেছিল, সত্যিই সে ছিল রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। কিন্তু এমনই কপাল বেচারার, যেদিন জাহাজে ওঠার কথা সেদিনই হঠাৎ অসুখে মারা যায় ওর বিদ্যেধরী বউ। শোকে পাগলের মতো হয়ে যায় কর্নেলিয়াস। মা-এর কাছে বউকে নিয়ে যাবে বলেই তিনখানা ঘর ভাড়া করেছিল জাহাজে। একটায় থাকবে বউকে নিয়ে, আর একটায় থাকবে বোন দুজন, তৃতীয়টায় থাকবে কাজের লোক-একটি মেয়ে।

বউকে নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া নিতান্তই দরকার হয়ে পড়েছিলো অন্যান্য ব্যাপারে-জ্যান্ত অথবা মড়া। ক্যাপ্টেন তখন বুদ্ধি দিয়েছিলেন। মৃতদেহটাকে লম্বা বাক্সে শুইয়ে নুন দিয়ে ভরাট করে দেওয়া হয়েছিল-যাতে পচন না ধরে। এছাড়া আর উপায়ও ছিল না। জাহাজের একটা মড়া যাচ্ছে, একথা ছড়িয়ে পড়লে সব যাত্রীই চম্পট দিত জাহাজ ছেড়ে।

কাজের লোক সেই মেয়েটা কর্নেলিয়াসের বউ-এর ভূমিকায়

অভিনয় করার চেষ্টা করেছে জাহাজে। রাতে শুতে যেত বাড়তি ঘরে-আসলে যে ঘরটা নেওয়া হয়েছে তারই জন্যে।

লম্বাটে বাক্স রহস্য এইভাবেই পরিষ্কার হয়ে গেছিল আমার কাছে। কিন্তু আজও রাত গভীর হলেই উন্মত্ত অট্টহাসিতে ঘুম ভেঙে যায় আমার। এ হাসি জাগে আমার মাথার মধ্যে। অন্ধকারের মধ্যে যেন দেখতে পাই, কোটর থেকে দুই চোখ ঠেলে বের করে প্যাট প্যাট করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে একটা মুখ।

সে মুখ আমার বন্ধু কর্নেলিয়াস ওয়্যাটের।

দাঁত

(বেরেনিস)

— এ জীবনে দুঃখের জন্ম আনন্দ থেকে। আজকের বেদনার উৎস অতীত সুখের স্মৃতি। আমার নাম ইগিয়াস। পদবিটা বলবো না। এদেশে আমাদের বাড়ির বুরুজের চাইতে বুড়ো বুরুজ আর নেই ; এ বাড়ির প্রতিটি পাথরের যা বয়স, তত বয়স নয় কোনো প্রাসাদ-প্রস্তরের। বয়স আর বহু দর্শনের ভারে ঝুঁকে পড়লেও আমাদের এই প্রাসাদ আজও সবার নজর কেড়ে নেয়। এখানকার ধূসর এবং শ্যাওলাসবুজ পাথরগুলো বহু প্রজন্মের ইতিহাসকে ধরে রেখেছে। এখানকার হাওয়ায় বন্ধ হয়ে রয়েছে অতীতের অনেক দীর্ঘশ্বাস, অনেক হাহাকার, অনেক উৎকট উল্লাসের কাহিনী।

স্মৃতি-উষ্ণ এই প্রাসাদেরই একটি কক্ষে দেহপিঞ্জর শূন্য হয়েছিল আমার গর্ভধারিণীর। সেই কক্ষেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম আমি। এ ঘরের প্রতিটি ধূলিকণায় লেখা শতাব্দীসঞ্চিত স্মৃতি আমার সত্তার ওপর ছাপ ফেলে গেছে জন্মমুহূর্ত থেকে-একই ভাবে ইতিহাসের বিষ দিয়ে আমার মগজের কোষগুলোকে সিঞ্চিত করে গেছে হাজার হাজার কেতাব-যাদের সম্পর্কে আমি আর একটা কথাও বলবো না আমার এই কাহিনীতে।

ফ্যামিলি লাইব্রেরীর কথা না বলাই শ্রেয়। এরকম অদ্ভুত গ্রন্থ সংগ্রহ বিশ্বের কোন গ্রন্থাগারে নেই বললেই চলে। পূর্ব পুরুষদের মনগুলো কি ধাতু দিয়ে তৈরী হয়েছিল-তার জলন্ত

প্রমাণ রয়ে গেছে প্রতিটি বইয়ের মধ্যে। কল্পনার জগতে বিচরণ করে তাঁরা অপার্থিব আনন্দ পেতেন-কল্পনাকে উধাও হওয়ার প্রেরণা যুগিয়ে গেছে বিচিত্র এই কেতাবগুলো শুধু গ্রন্থ সংগ্রহই নয়-তাঁদের উদ্ভট কল্পনা-বিলাসের স্বাক্ষর বহন করছে সুবিশাল এই প্রাসাদের সৃষ্টিছাড়া নকশা, দেওয়াল জুড়ে আঁকা সুদীর্ঘ ফ্রেসকো ছবি, ঝোলানো পর্দা, অস্ত্রাগারের হাতিয়ার, সুপ্রাচীন তৈল চিত্র, লাইব্রেরি ঘরের অদ্ভুত ডিজাইন। অদৃশ্য জগতের প্রতি উন্মাদ আকর্ষণ ছিল তাঁদের রক্তে। সেই রক্ত বইছে আমার ধমনীতে।

থমথমে এই প্রাসাদের অলিগলিতে হেঁটেছি আর ভেবেছি আমার অতীতের কথা। কেন জানি বার বার আমার মনে হয়েছে এখানে আমি ছিলাম-আবার ফিরে এসেছি। প্রতিটি কুলুঙ্গী, প্রতিটি অলিন্দ যেন আমার সুপরিচিত। আমার এই জন্মের আগে যেন আরো একবার জন্মেছিলাম এখানে। আমার সেই ধূসর অতীত দিবানিশি বিষণ্ণ করে রেখেছিল আমাকে সেই ছোটবেলা থেকেই।

জন্মান্তরের স্মৃতি আপনি মানেন না? কিন্তু আমি মানি। এটা আমার উপলব্ধি-আপনি বুঝবেন না। ছায়ার মতো স্মৃতিগুলো আমাকে পাগল করে রেখেছে শৈশব থেকে। অস্পষ্ট সেই ছায়া-স্মৃতি কখনোই পরিপূর্ণ আকারে নিয়ে আমার মনের মধ্যে ছবির পর ছবি এঁকে যায়নি; আমার সমস্ত সত্তা জুড়ে ছায়া হয়েই তারা রয়ে গেছে, আবছাই হয়ে থেকেছে, খেয়ালখুশিমতো রূপ পালটেছে, সরে গেছে, আবার ফিরে এসে ভিড় করেছে-কিন্তু কখনোই পরিষ্কার চেহারা নিয়ে আমার যুক্তির সামনে হাজির হয়নি। হলে না হয় বুদ্ধি আর ব্যাখ্যা দিয়ে তাদের একটা মানে দাঁড় করানো যেত। কিন্তু অষ্টপ্রহর আমার ভেতরটাকে ছায়াচ্ছন্ন করে রেখে তারা জানান দিয়ে গেছে-আছে, আছে, অনেক কিছু আছে আমার এই জন্মের আগের জন্মে-অস্পষ্ট অবয়ব নিয়ে তারা শুধু হুটোপুটিই করে যাচ্ছে আমার এ-জন্মের জ্ঞানবুদ্ধির দোরগোড়ায়-ঢুকতে আর পারছে না।

অলীক কল্পনার এই প্রাসাদ পিটে পিটে তৈরী করেছে আমার মন মেজাজকে ছেলেবেলা থেকে। লম্বা লম্বা বারান্দা আর বড় বড় ঘরগুলোয় একা একা ঘুরে বেড়াতাম-হু হু করে উঠতো মনের ভেতরটা। লাইব্রেরিতে বইয়ের তাগাড় নিয়ে বসে থাকতাম। যাদের অস্তিত্ব নেই, তাদের উপস্থিতি যেন টের পেতাম আমার চারপাশে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেত-দু চোখ মেলে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতাম-দানবিক চিন্তার প্রবাহে মন আর মগজ ভেসে যেতো। চমকে উঠতাম, অনেক প্রত্যাশা নিয়ে বিষম আগ্রহে নিরন্ধ্র তমিস্রার মধ্যে তাদের অন্বেষণ করতাম-যাদের দেখা যায় না। শৈশব গেল, কৈশোরও

এইভাবে অতিবাহিত হলো–এলো যৌবন–তখনও মশগুল হয়ে থেকেছি দিবাস্বপ্নে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকেই আমার মন-মেজাজে ফুটে উঠলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। বাপ-পিতামহর, এই মঞ্জিল ছেড়ে কোথাও যাইনি–সেই কারণেই বোধহয় আমার জীবনের বসন্ত আটকে রইলো একই জায়গায়–সুস্থ শ্রীবৃদ্ধি তো দূরের কথা–বদ্ধ বিশ্বাস নিয়ে মামুলি বিষয়গুলির মধ্যেই বিকৃত ধারণাগুলোকে সযত্নে লালনপালন করে গেছি। দুনিয়ার বাস্তবতাকে মনে হয়েছে ভাসা-ভাসা মরীচিকা–আমার দৈনন্দিন জীবনে আদতে তারা কোনো বস্তুই নয়। স্বপ্নলোকের উদ্ভট ব্যাপারগুলোই কেবল আমার কাজে কর্মে চিন্তার ভাবনায় নিজেদের অস্তিত্বরক্ষা করে চলেছে।

* * *

বেরেনিস আমার তুতো বোন। বাপ-ঠাকুর্দার এই মহল-মঞ্জিলেই বড় হয়েছি দুজনে। কিন্তু দুভাবে। আমি সদাবিমগ্ন-অসুস্থ। বেরেনিস প্রাণোচ্ছল-টগবগে। তুলনা নেই তার প্রাণ-শক্তির। এনার্জি ফেটে ফেটে পড়ছে তার প্রতিটি কাজে, প্রতিটি কথায়। সে যেন পাহাড়ি ঝরণা, আর আমি মঠের পাতকুয়ো। আমি থেকেছি শুধু আমার হৃদয় নিয়ে ; যন্ত্রণাময় আত্মচিন্তায় মগ্ন। সে উড়ে বেরিয়েছে খোলামেলায়–ছায়া-চিন্তা আর নৈঃশব্দ্য তার কাছে ঘেঁষতে পারেনি। বেরেনিস! বেরেনিস! এ নাম উচ্চারণ করলেই হাজার খানেক-বিধ্বংসী স্মৃতি প্রপাতের শক্তি নিয়ে আছড়ে পড়ে আমার মনের পাতায়। বেরেনিস! বেরেনিস! বেরেনিস! আঃ কি সুখ! আবার আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ছেলেবেলার সেই বেরেনিসকে–আগের মতই দুর্বার, দুরন্ত, প্রাণরসে টলমলে। অতুলনীয় সৌন্দর্যের আধার বেরেনিস–দেবীরূপেও তাকে কল্পনা করতে গিয়ে বুঝি খামতি থেকে যায়। এ রূপের তুলনা নেই স্বর্গে, মর্তে, পাতালে। বেরেনিস! পাহাড়ি ফুল বেরেনিস! দুরন্ত সমুদ্র বেরেনিস! উড়ন্ত পাখি বেরেনিস! হায়! কোথেকে এক কাল অসুখ এসে এমন নিষ্পাপ কুসুমকেও শুকিয়ে দিয়ে গেল। ঝরে গেল তার রূপের জলুস, মিলিয়ে গেল তার কথার চমক, হারিয়ে গেল চাহনির রোশনাই! কালব্যাধি তার সব কিছু লুঠ করে নিয়ে গিয়ে ফেলে গেল অতীতের কঙ্কালসার এক ছায়াকে–সে ছায়ার মধ্যে বেরেনিসকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না–টগবগে আরবি ঘোড়ার মতো আশ্চর্য সেই মেয়েটা শুকিয়ে গেল শুকনো কাঠের মতনই–যে রইলো, সে কি সত্যিই সেই বেরেনিস?

অজানা এই অসুখ দাবানলের প্রভাব নিয়ে ওকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে যাবার সময়ে দিয়ে গেল একটা মারাত্মক উপহার। মৃগীরোগ। আক্রমণটা যখন শুরু হতো, তখন বেরেনিসকে আর বেরেনিস বলে চেনা যেত না। রৌরব নরকের

বিভীষিকায় যেন সিঁটিয়ে থাকতো, ভিন্ন ব্যক্তিত্বরা যেন দখল করতো ওর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে-বসে থাকত না কোন ইন্দ্রিয়ই। ছিনেজোঁক মোহ আশ্রয় করতো ওকে সেই সময়ে। ঘোরের মধ্যে থাকতো। ভূতের ভর হলে যে-রকম হয়-অনেকটা সেইরকম। ঘোর কাটত আচমকা-চমকে উঠতো ও নিজেই। মুহূর্তের মধ্যে বিধ্বস্ত বেরেনিসকে আবার আমরা দেখতে পেতাম ওর শুকনো হাসি আর মরা চাহনির মধ্যে।

এই ফাঁকে বলে নিই আমার রোগের কথাটাও। রোগ ছাড়া কি-ই বা বলব একে? আমার দেহ আর মনকে যারা, যে ছায়া-চিন্তাগুলো-কোনোদিনই স্বাভাবিক অবস্থায় রাখেনি-বেরেনিসের মৃগীরোগে ভোগান্তির সময়ে তারা যেন আরও পেয়ে বসলো আমাকে। দিনে দিনে বৃদ্ধি পেল তাদের আনাগোনা-তাদের দামালপনা। একটা মুহূর্তের জন্যেও নিস্তার পেতাম না তাদের হামলা থেকে। ঘোর অমাবস্যার মতোই অজস্র অদ্ভুত বিকার ছেয়ে রেখেছিল আমার মগজ আর মনকে। রোমন্থনের এই বাতিক কিছুতেই একমনে ভাবত দিত না আমাকে। পাঠককে বোঝাতে পারব না আমার তখনকার মনের অবস্থাটা। আগ্রহ নেই জাগতিক কোনো ব্যাপারে অথচ এই বস্তু জগতেরই তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তু নিয়ে একনাগাড়ে আবোল তাবোল ভেবে গেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বোঝাতে পারলাম কী? না, পারলাম না।

মন তো নয় যেন একটা পাগলা ঘোড়া। হাজার বিশ্লেষণ করেও তার প্রকৃতি বুঝে ওঠা কঠিন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে শুধু একখানা বইয়ের হরফ, অথবা হরফগুলোর পাশের সাদা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থেকে। গ্রীষ্মের অলস দুপুরগুলো কাটিয়েছি মেঝের ওপর লুটিয়ে থাকা পর্দার অদ্ভুত ছায়ার দিকে তাকিয়ে। সারা রাত দুচোখের পাতা এক করিনি প্রদীপের শিখার দিকে চেয়ে থেকে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত পুরো একটা দিন নিজেকে একেবারে ভুলে থেকেছি বাগানের ফুলের সৌরভ নিয়ে। কখনো কখনো শুধু একটা শব্দ বার বার আওড়ে গেছি-বিশেষ সেই শব্দটার বিচিত্রধ্বনিস্রোতার মধ্যে বিশেষ কোনো অনুরণন সৃষ্টি করতে পারে কিনা-তা দেখার জন্যে। কখনো ইচ্ছে হয়েছে শরীরের কোনো প্রত্যঙ্গ না নড়িয়ে চুপচাপ বসে থাকার-গতি জিনিসটাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যদি তেমন কিছু আবিষ্কার করা যায়-এই আশায়। আমার সৃষ্টি ছাড়া ভাবনাচিন্তার কয়েকটা মাত্র নমুনা শোনালাম। শুনলে হাসি পায় ঠিকই-কিন্তু এই ধরনের আবোল-তাবোল ব্যাপারে মগ্ন থাকতাম দিনের পর দিন-মাসের পর মাস; চুল চেরা বিচারেও এদের কোনো মানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

একই সঙ্গে আমার রোগগ্রস্ত মন তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মশগুল

থেকেছে–আবার অলীক বিষয় নিয়ে কল্পনার জাল বুনে চলেছে। পরিশেষে ভুলে গেছি যা নিয়ে শুরু হয়েছিল তন্ময়তা–অলৌকিকের আস্বাদ ছেয়ে রেখেছে আমার সমস্ত সত্তা। মন-কে কখনো কব্জায় রেখেছি–কখনো সে বল্গাহীন হয়েছে। এ তবে কি রকম মন? অসুস্থ নিশ্চয়।

আগেও বলেছি: আবার বলছি–বই পড়ার বাতিক বাড়িয়ে দিয়েছে আমার মনের এই পাগলামি। বইগুলো সবই ফ্যামিলি লাইব্রেরীর।

তুচ্ছ বিষয় নিয়ে এইভাবেই ধ্যানস্থ থেকেছি। তারপর শুরু হয়েছে যন্ত্রণা। ধ্যানের যন্ত্রণা। অলৌকিকের আস্বাদ আমাকে অন্য মানুষ বানিয়ে ছেড়েছে। তখন আমার মন আর আমার কব্জায় থাকেনি।

বেরেনিসকে নিয়ে ভেবেছিলাম ঠিক এইভাবেই। ও যখন অজানা অসুখে ভুগে ভুগে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল–আমি তখন রূপহীন অবয়বটার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত চিন্তা দিয়ে মাথাকে ভরিয়ে রেখেছি। লাবণ্য যতই উধাও হয়েছে ওর চোখমুখ থেকে, ততই আবিল হয়েছে আমার মস্তিষ্ক উদ্ভট যত চিন্তায়।

বেরেনিস যখন অপরূপা ছিল, তখন কিন্তু ওকে হৃদয় দিয়ে দেখিনি। পাহাড়ি ঝরণার মতো ও যখন কলকলিয়ে উঠতো আমার সামনে–আমি সেই শব্দ শুনে নিবিষ্ট হয়ে যেতাম সৃষ্টিছাড়া চিন্তায়। ওকে নিয়ে আকুলতা ছিল মনের মধ্যে–হৃদয়ের মধ্যে নয়। ভোরের কুয়াশায় ওকে দেখেছি আর ভেবেছি কুহেলী সুন্দরীদের কথা, দুপুরের গরমে জঙ্গলের ছায়ায় ওকে মনে করেছি রহস্যময়ী ছায়া-পরী, নিস্তব্ধ লাইব্রেরি ঘরে ওর চকিত অপসৃয়মান দেহবল্লরীর দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে, এই তো সেই রূপের ললনা। রক্তমাংসের বেরেনিসকে আমি বরাবর কল্পলোকের বেরেনিস হিসেবেই ভেবেছি। মর্ত্যের বেরেনিসকে নিয়ে মনে মনে অলীক বিশ্লেষণ করে গেছি। বেরেনিসকে যে ভালোবাসা যায়, এমন কথা কোনো দিন মনে ঠাঁই পায়নি–এ শুধু আমার কল্পনা বিলাসেরই সামগ্রী হয়ে থেকেছে।

এই বেরেনিসকেই কিন্তু আমি বিয়ে করবো মনস্থ করলাম ওর একদম শেষের অবস্থা দেখে। একেবারেই ঝরে পড়ার মুখে তখন ও ঠিক যেন একটা হলুদ ফুল। কান্তি নেই কোথাও। একদা প্রাণবন্ত বেরেনিস কোথায়? যাকে দু-চোখ দিয়ে দেখেও কোনোদিন দেখিনি–সেদিন তাকে দেখলাম এবং শিউরে উঠলাম। সেদিন আমার মনে হলো, বেরেনিস আমাকে ভালোবাসে। অনেক দিন ধরে ভালোবাসে। কু-লগ্নে তাকে জানালাম আমার অভিলাষ–বিয়ে করার ইচ্ছে।

বিয়ের দিনের আর বেশি দেরী নেই। শীত জমিয়ে পড়েছে।

বিকেলের দিকে কুয়াশাও বেশ ঘন হয়েছে। লাইব্রেরির ভেতরের ঘরে বসে বিভোর হয়েছিলাম আত্মচিন্তায়-যা আমার স্বভাব।

হঠাৎ চোখ তুলে দেখলাম, বেরেনিস দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে।

কল্পনার বাড়াবাড়ির জন্যেই কিনা বলতে পারবো না, আমার মনে হলো আমি যেন দেখছি বেরেনিসের এক অস্পষ্ট দেহরেখাকে। কুয়াশার জন্যে অথবা ধূসর গোধূলির জন্যেও চক্ষুভ্রম ঘটে থাকতে পারে। ফিনফিনে সাদা পোশাক ওর দেহ ঘিরে ঝুলছিল বলেও ভুল দেখে থাকতে পারি। অস্পষ্ট সেই দেহরেখা থির থির করে কাঁপছিল কেন, তাও বলতে পারবো না। ও কিন্তু একটা কথাও বলেনি। আমিও বলতে পারিনি। অদ্ভুত একটা শৈত্য বোধ কাঁপিয়ে দিয়ে গিয়েছিল আমার হাড় পর্যন্ত। বরফের ঠাণ্ডাও সে তুলনায় কিছু নয়। অসহ্য উদ্বেগে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম নিমেষে। একই সঙ্গে বিপুল কৌতূহল হাজারখানা দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল মনের মধ্যে। হেলে পড়েছিলাম চেয়ারে। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে, নিস্পন্দ দেহে, নিষ্পলক চোখে চেয়েছিলাম ওর দিকে।

বড় বেশি শুষ্ক মনে হয়েছিল বেরেনিসকে-সেই মুহূর্তে। আগের মেয়েটার কোনো চিহ্নই নেই এই আকৃতির চোখে মুখে চেহারায়।

উদগ্র উত্তেজনায় যেন আগুন ধরে গিয়েছিল আমার চোখে। জ্বালা চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলাম ওর মুখাবয়ব। ওর যে চুল এক সময়ে ছিল দাঁড়কাকের পালকের মতো কুচকুচে কালো-এখন তা শুকনো হলুদ খড়ের মতো ঝুলছে কপাল আর দুই রগে। অজস্র রেখা অগুন্তি বলয় ফুটিয়ে তুলেছে রগে আর চোখের তলায়, নাকের পাশে আর গালের গর্তে। সারা মুখে স্তরে স্তরে জমে রয়েছে সমস্ত বিশ্ব থেকে জড়ো করা বিষাদ আর নৈরাশ্য। কাঁচের মতো স্বচ্ছ দুই চোখে নেই প্রাণের আভাস। চোখের তারা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না। নিষ্প্রাণ নিরেট চোখে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে বটে-কিন্তু আমাকে দেখছে না।

আর একবার কেঁপে উঠেছিল আমার সর্বাঙ্গ। বিহ্বলচোখ নামিয়ে এনেছিলাম ওর দুই ঠোঁটের ওপর। এক সময়ে এই অধর আর এই ওষ্ঠে জোয়ার ভাঁটা খেলতো, চন্দ্র, সূর্য উঠতো, শীত বসন্ত খেলা করতো; এখন সেই ঠোঁটজোড়া শুকিয়ে, গুটিয়ে, নিদারুণ পাতলা হয়ে সরে যেতে চাইছে দাঁতের ওপর থেকে।

শিহরিত অন্তরে নির্নিমেষ চোখে তবুও আমি চেয়েছিলাম। তাই দেখেছিলাম বুক-কাঁপানো সেই দৃশ্য। চামচিকের চামড়ার মতো শুকনো রক্তহীন ঠোঁটদুটো আস্তে আস্তে সরে গেল দাঁতের ওপর থেকে। বেরেনিস যেন হাসতে চাইছে। আপ্রাণ চেষ্টায়

হাসি ফুটিয়ে তুলতে চাইছে অবর্ণনীয় মুখখানায়। দাঁতগুলো তাই প্রকট হয়ে পড়েছে।

হে ঈশ্বর! কেন দেখলাম সেই দাঁতের পাটি?

কেন আমার মৃত্যু হল না তার আগেই?

* * *

ঘোর কেটে গেল দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে। চোখ তুলে দেখলাম ঘরে আমি একা—বেরেনিস চলে গেছে। কিন্তু যায়নি আমার বিকারগ্রস্ত ব্রেনের ভেতর থেকে। ওর সাদা দাঁতের বীভৎস বর্ণালী চাবুকের পর চাবুক মেরে চলেছে আমার মগজের বিভ্রান্ত কোষগুলোকে। সব দাঁত আস্ত নয়-কিনারা ভাঙা ছিল কয়েকটার। চকচক করছিল এনামেল। কিন্তু এসব কোনো ছাপই ফেলেনি আমার বিকৃত মনে। অথচ চকিতের সেই দাঁত বের করা হাসি নাড়া দিয়ে গেছে আমার খেয়ালি মনের ভেতর পর্যন্ত। আর কিছু মনে নেই আমার—মনে পড়ছে শুধু সেই হাসি। কিছুতেই ভুলতে পারছি না দাঁতগুলোকে। চোখ বুঁজলেও দেখতে পাচ্ছি দাঁত.........যেদিকে তাকাই না কেন সেদিকেই দেখছি দাঁত! দাঁত, দাঁত, আর দাঁত! সব দিকেই রয়েছে এই দাঁত! রঙ জ্বলা বিকট ঠোঁটের চামড়া আস্তে আস্তে গুটিয়ে সরে যাচ্ছে দাঁতের ওপর থেকে—তারপর তারা একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। লম্বা, সরু আর বড্ড-বেশি সাদা প্রতিটা দাঁত যেন পুঞ্জ পুঞ্জ অদৃশ্য চক্ষু মেলে নিরীক্ষণ করে চলেছে আমার কুটিল মনের তলদেশ পর্যন্ত।

উদ্ভট চিন্তার বাতিকটা ঠিক তখন থেকেই মাথা চাড়া দিল আরো বেশি করে। তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল আমার দুর্জ্ঞেয় মনের গহনতম অঞ্চলও। মনের ঝড় যে কী ভয়ঙ্কর এবং কী প্রলয়ঙ্কর—তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। মন জিনিসটা কোনো কালেই আমার কব্জায় ছিল না—বেরেনিসের দাঁত তাকে একেবারেই উন্মাদ বানিয়ে দিয়ে গেল চকিত দেখা দিয়ে। দাঁত ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। সমস্ত দুনিয়া আমার সামনে থেকে মুছে গিয়েছিল—সে জায়গা দখল করে বসেছিল বেরেনিসের দাঁত। ধ্যান করেছি শুধু এই দাঁতের। মনের চোখে দেখেছি শুধু এই দাঁতকে। আমার মানবিক জীবনের সারবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই দাঁত। রকমারি আলোয়, রকমারি উদ্দেশ্যে দাঁতগুলোর বৈশিষ্ট্য আর চরিত্র অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে। ওরা যেন নিছক দাঁত নয়—জমাট বাঁধা শক্তি। ওরা যেন অনেক কিছু জানে—অনেক কথা বলতে পারে। অনেক অজানা রহস্যের আধার ওই এক-একটি দাঁত। ওদের আমার দরকার। তবে যদি সুস্থ হতে পারি, শান্তিকে ফিরিয়ে আনতে পারি।

সন্ধে গেল, এল রাত। রাত কাটলে, হলো ভোর। আমি বসেই রইলাম লাইব্রেরি ঘরে। এলো আর একটা রাত। আকাশ পাতাল চিন্তা নিয়ে তম্ময় হয়ে রইলাম বইঠাসা ছোট্ট ঘরটায়। ঘরের আলো কমা বাড়া-র সঙ্গে সঙ্গে দাঁতের প্রহেলিকা নিবিড়তর হয়ে উঠলো ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমার মনের পরতে পরতে। কদাকার আর গা কাঁপানো দাঁতগুলো ঝলকে ঝলকে অবশ করে রেখে দিলো আমার মগজখানাকে। একটা আঙুল পর্যন্ত নাড়াতে পারিনি এতগুলো ঘণ্টায়। শুধু দেখেছি দাঁতের ঝিলিক আমার আশপাশে-চোখ বুঁজে চেয়ে চেয়ে। রাত গভীর হতেই হৈ-চৈ শুনলাম বাড়ির মধ্যে। কানে ভেসে এলো কান্নাকাটির শব্দ। উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার ছেড়ে। দরজার পাল্লা খুলতে না খুলতেই ধেয়ে এল একজন কাজের মেয়ে। কান্নায় ভেঙে পড়ে সে জানালো-ভোররাত থেকে মৃগীর খিঁচুনি শুরু হয়েছিল বেরেনিসের-এখন আর সে নেই। কবর খোঁড়া হয়ে গেছে-কফিন নামানো হবে এখুনি।

* * *

বিকল, স্থবির মন নিয়ে আমি বসে আছি আমার লাইব্রেরি ঘরে। জুবুথুবু বপুতে নেই কোনো স্পন্দন, নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে আমার মগজের লক্ষ কোটি পাগলা কোষ। এই মুহূর্তে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর মগজ কোন কাজ করতে চাইছে না-করতে পারছেও না। যেন নিদারুণ মেহনতের পর শৈথিল্য তাদের অনুপরমাণুকে আশ্রয় করেছে। কিন্তু কেন ? প্রশ্ন সেইটাই।

আমি বসে আছি একা। একেবারে একা। চিরকাল একাই থেকেছি এইভাবে। আজ কিন্তু আরো বেশি একা মনে হচ্ছে নিজেকে। সেইসঙ্গে ভাষার অতীত একটা অনুভূতি সর্পিল গতিতে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধরছে আমার সত্তাকে। এই জন্যই কি আচম্বিতে নির্জীব হয়ে গেলাম ? কে জানে।

কেন জানি আমার মনে হচ্ছে, এইমাত্র স্বপ্ন ভেঙে গেল আমার। একটা নিরতিসীম জটিল আর উত্তেজক স্বপ্ন এইমাত্র তার নাগপাশ খসিয়ে নিয়ে ঝরে গেল আমার আশপাশ থেকে। স্বপ্ন আর নেই। স্বপ্নটা যে কী, তা মনেও করতে পারছি না। কেন ?

আমি জানি, এখন মধ্য রজনী। এটাও জানি, সন্ধের যবনিকা নেমে আসতে না আসতেই মাটি চাপা পড়েছে বেরেনিসের চিরশান্তির কাঠের কফিনে। এর বেশি আর কিছু মনে করতে পারছি না। বেরেনিসের কবরস্থ হওয়ার সময়টুকু বিস্মৃতির কালিমালিপ্ত হয়ে রয়েছে আমার মনের মধ্যে।

পুরোপুরি বিস্মৃতিই বা বলি কি করে । আবছা একটা স্মৃতি কেউটে ছোবল মেরে চলেছে আমার মনের অতলে। ভয়ঙ্কর স্মৃতিটার পূর্ণ অবয়ব দেখতে পাচ্ছি না বটে-কিন্তু সে স্মৃতি যে

মোটেই সুখাবহ নয়-তা মুহুর্মুহু উপলব্ধি করছি শিউরে শিউরে উঠে। ভয়াবহ.........ভয়ানক কি সেই স্মৃতি ? কেন তা এত অস্পষ্ট-অথচ এত মর্মান্তিক, এত যন্ত্রণাময় ?

না, কিছু মনে করতে পারছি না। এই টুকুই শুধুই বুঝছি, ধরাধামে আমার এই অস্তিত্বের সবচেয়ে আতঙ্কময় পরিচ্ছেদকে ধরে রেখে দিয়েছে এই স্মৃতিটা। অতিশয় কদাকার, অতিশয় দুর্বোধ্য এমন কিছু ঘটে গেছে যা মনে করতে পারছি না হাজার চেষ্টা করেও। মাঝে মধ্যে একটা নারীকণ্ঠের আকুল আর্তনাদ মনের তন্ত্রগুলোকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতে চাইছে। যাতনাময় সেই চিৎকার আর দেহপিঞ্জর বিমুক্ত আত্মার অপার্থিব হাহাকার যেন একই তারে বাঁধা। আমি বৃথাই এই বুকে মোচড় দেওয়া আকাশ বাতাস খান-খান করা চিৎকারটার অর্থ অন্বেষণ করার চেষ্ট করছি-কিন্তু পারছি না কিছুতেই।

কী যেন একটা করেছি। কিন্তু সেটা কি ?-কী.........কী কাজ করে এলাম আমি ?

আমার পাশেই রয়েছে একটা টেবিল। একটি মাত্র লম্ফ জ্বলছে টেবিলে। লম্ফের পাশে রয়েছেএকটা ছোট্ট বাক্স। এমন কিছু দর্শনীয় বাক্স নয়। কারুকার্জের মধ্যে এমন কিছু আহামরি দক্ষতা নেই যে হুমড়ি খেয়ে দেখতে হবে। এর আগেও বাক্সটাকে দেখেছি বহুবার। কারণ, এতো আমাদের ফ্যামিলি ডাক্তারের বাক্স। কিন্তু সে বাক্স এখানে, আমার এই টেবিলের ওপর এলো কী করে ? কেনই বা বাক্সটার ওপর চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিউরে শিউরে উঠছি ?

আলতো টোকা পড়লো দরজায়। কবরখানার প্রেতের মতো ফ্যাকাশে মুখে একজন গৃহভৃত্য ঢুকলো ঘরে। আতঙ্কে ঠেলে বেরিয়ে আসছে তার দুই চোখ। কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল। ফিসফিস করে ভাঙা ভাবে কী যে ছাই বলে গেল-তার অর্ধেকের অর্থ আমি বুঝতেই পারলাম না। বিকট বন্য একটা চিৎকারে আচমকা নাকি বাড়িশুদ্ধ লোকের ঘুম ছুটে গিয়েছিল। রক্ত জল করা চিৎকারটা কোত্থেকে এসেছে তা দেখবার জন্যে ছুটোছুটি শুরু হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। কবরখানায় গিয়ে দেখা গেছে লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে একটা কবরের মাটি। পাশেই সাদা পোশাক পড়া একটা বিকৃত দেহ-ধুকপুক করছে তার নাড়ি, বেঁচে রয়েছে এখনও।

শেষের কথাগুলো বলতে বলতে জিভ জড়িয়ে গিয়েছিল গৃহভৃত্যের-চাপা ফিসফিসানির রোমাঞ্চ খাড়া করে তুলেছিল আমার পায়ের লোম। আচমকা সে আঙুল তুলে দেখিয়েছিল আমার জামাকাপড়। চাপ চাপ কাদামাটি লেগে আমার সারা গায়ে। মিনিমেষে আমিও তা দেখলাম-কথা বলতে পারলাম না, আলগোছে সে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল আমাকে। -এবার আরও

স্পষ্ট দেখা গেল কাদামাটির ছোপ। মানুষের নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে দেওয়া হয়েছে আমার সর্বাঙ্গ। জমাট কাদায় নখের দাগ সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। এবার সে আঙুল তুলে দেখালো দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা একটা জিনিস। আচ্ছন্ন চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর চিনতে পারলাম বস্তুটাকে। একটা কোদাল।

আচমকা বন্য বর্বর চিৎকার বেরিয়ে এসেছিল আমার গলা চিরে। এক লাফে গিয়ে পড়েছিলাম টেবিলের ওপর রাখা ছোট্ট বাক্সটার ওপর। থরথর করে কাঁপছিল আমার দুই হাত। জোর ছিল না আঙুলে। কিছুতেই খুলতে পারছিলাম না ডালা-টা। হাত ফস্কে হঠাৎ তা ঠিকরে গেল মেঝের ওপর। রীতিমত ভারি বাক্স বলেই আছড়ে পড়ে খান্ খান্ হয়ে গেল। টুকরোগুলো ছড়িয়ে গেল ঘরময়, সেই সঙ্গে ছিটিয়ে গেল দাঁত তোলবার একগাদা ডাক্তারি সরঞ্জাম এদের সঙ্গে সঙ্গেই মিলেমিশে ঠক-ঠক-কড়-কড় শব্দে গড়িয়ে গেল ক্ষুদে ক্ষুদে সাদা রঙের, হাতির দাঁতের মতো দেখতে বত্রিশটা বস্তু।
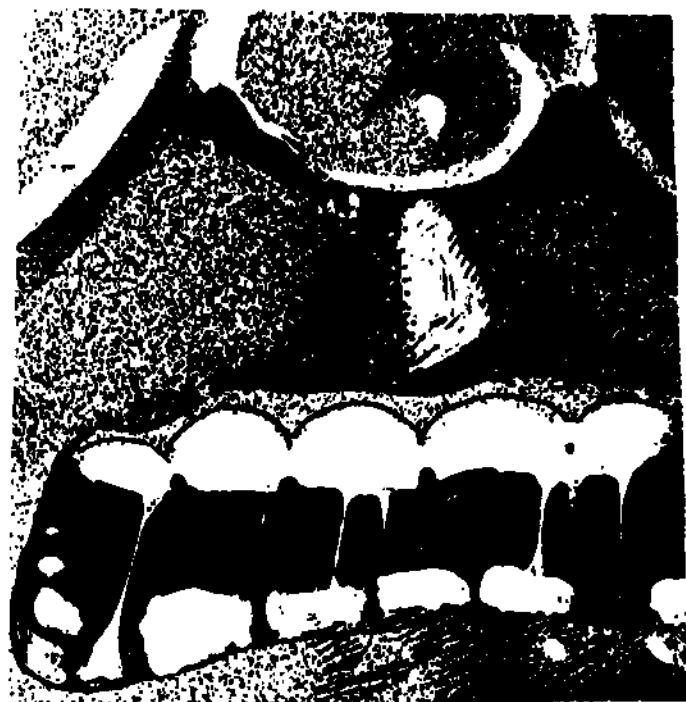
আবার আরব্য রজনী

(থাউজ্যাণ্ড অ্যাণ্ড সেকেণ্ড টেল অফ শাহরাজাদী)

প্রাচ্য দেশের গল্প-টল্পোগুলো কী রকম হয়, সেই কৌতূহল নিয়ে 'আরব্য রজনী' পড়তে বসেছিলাম। পড়বার পর কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম। উজির-কন্যা শাহরাজাদীর গল্প তো শেষ হয়নি। শেষ পর্যন্ত তার কপালে কী যে ঘটেছিল, তাও আর লেখা হয়নি।

সে গল্পে আসার আগে 'আরব্য রজনী'র বিশাল ব্যাপারটাকে ছোট্ট করে বলে নেওয়া যাক।

অনেক বছর আগে প্রচণ্ড রকমের একটা বেইমানির ঘটনা ঘটে গিয়েছিল ইরানের বাদশা মহলে। রেগেমেগে বাদশা মশাই তাঁর আদরের বেগমের গর্দান তো নিলেনই, সেই সঙ্গে ফরমান দিলেন রোজ একজন 'আমীর ওমরাহ'র কন্যাকে বিয়ে করবেন—পরের দিন ভোরেই তার গর্দান নেবেন।

এইভাবেই চলল মাসের পর মাস। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দেখা গেল, আমীর ওমরাহদের সব মেয়েই ফৌত হয়ে গেছে—বাকী আছে শুধু উজিরের দুই মেয়ে।

মাথায় হাত দিয়ে বসলেন উজির সাহেব। এতদিন হন্যে হয়ে তিনিই রোজ নতুন বেগম যুগিয়ে গেছেন ক্ষ্যাপা বাদশাকে—এবার ?

বড় মেয়ে শাহরাজাদী মিষ্টি হেসে বললে বাপকে—'আব্বা, পাঠাও আমাকে। দেখোই না কী কাণ্ড করি।'

চমকে উঠলেন উজির সাহেব—'বলিস কী! তোকে করব বাদশার বিয়ের কনে ?'

কিন্তু পারলেন না শাহরাজাদীর সঙ্গে। বিয়ে হয়ে গেল ঠিক

সন্ধেবেলা। রাত হতেই শুনে বরকে বললে নতুন বউ-'আমার একটা আর্জি রাখবেন, জাঁহাপনা ?'

শাহরাজাদীর সুন্দর মুখ দেখে অনেক আগেই ভুলেছিলেন বাদশা। মিষ্টি কথাই এখন গলে গেলেন। বললেন, দিলখোশ গলায়-'একটা রাতেই তো সঙ্গ পাচ্ছো আমার। বল কী নজরানা চাই তোমার।'

'আমার একটা ছোট্ট বোন আছে। নাম তার দুনিয়াজাদী। কাল সকাল থেকে আর তো তাকে দেখতে পাবো না। শুধু রাত টুকু তাকে আমার কাছে এনে রাখবেন ?'

'মঞ্জুর ! মঞ্জুর !' বলে বাদশা তক্ষুণি দুনিয়াজাদীকে নিজের শোবার ঘরে নিয়ে এসে পাশের একটা পালঙ্কে ঘুমোবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

দুনিয়া কিন্তু ঘুমোল না। ঘুমোল না তার দিদিও। বাদশা যদিও ঘুমিয়ে কাদা। নাক ডাকিয়ে চললেন কাড়া-নাকাড়ার আওয়াজে। রাত তিন প্রহর কেটে গেল-বাকী আর একটা প্রহর।

দুনিয়াকে তার দিদি বলেই রেখেছিল ঠিক এই সময়ে কী বলতে হবে।

শেখানো বুলিটা আওড়ে গেল দুনিয়া-'দিদি, ঘুমোসনি ?'

'দূর ! ঘুম কি আসে ! কিন্তু ডাকছিস কেন ?'

'গল্প শুনবো বলে। কী সুন্দর গল্প বলিস তুই। কাল থেকে তো আর শুনতে পাবো না।'

'জাঁহাপনার ঘুম ভেঙে যাবে যে-যদি নারাজ হন ?'

দুই বোনের গলাবাজিতে জাঁহাপনার ঘুম আগেই ভেঙেছিল-কেন না তাঁর নাক ডাকানি বন্ধ হয়ে গেছিল।

শালীর বায়না শুনে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন-'হোক, হোক, একটা গল্প হোক-আমিও শুনি !'

সেই হলো শুরু। মানে, গল্পের শুরু-আর শাহরাজাদীর প্যাঁচেরও শুরু। রাত ভোর হয় তো গল্প আর শেষ হয় না। আদ্ধেক গল্প শুনে বাদশা বলেন প্রতি ভোরেই-গর্দান নেওয়া মুলতুবি থাক আজ-গল্পের শেষ টুকু শুনে নেওয়া যাক রাতে। রাত ভোর হলে আবার সেই একই ব্যাপার-গল্পের রেশ ফুরোচ্ছে না-গল্পে বুঁদ বাদশারও বেগমের গর্দান নেওয়ার হুকুম দেওয়া হচ্ছে না।

এইভাবে বাদশাহী ফরমানকে ঠেকিয়ে রেখে দিয়েছিল গল্পের যাদুকরী প্রতি রজনীতে এক একটি গল্পের যাদু-মহল সৃষ্টি করে। প্রতিটি গল্পের মধ্যে অগাধ বিস্ময় আর রোমাঞ্চের শিহরণ। আবিষ্ট বাদশা গল্পের সেই রহস্যপুরীর মধ্যে দিয়ে চলেছেন তো চলেইছেন।

ইতিমধ্যে সন্তানের পিতাও হয়ে গেলেন খুনে বাদশা।

শেষকালে মৃত্যুর খড়্গ আর নামিয়ে আনতে পারলেন না গল্পবাজ বেগমের ওপর-শুধু শাহরাজাদী নয়-রেহাই পেল আমীর ওমরাহদের সব মেয়েই। বিকট বিবাহ-প্রথার অবসান ঘটালেন বাদশা। খারিজ করে দিলেন গর্দান নেওয়ার হুকুম।

তারপর ?

শুরু হোক এক হাজার-দু নম্বর সেই অত্যাশ্চর্য গল্প !

সেই রাতেই আরব্য রজনী স্টাইলে শাহরাজাদী বললে দুনিয়াজাদীকে-'প্রিয় ভগিনী, গর্দান নেওয়ার বাঁধা গৎ যখন নাকচ করে দিয়েছেন মহামান্য জাঁহাপনা, তখন যে গল্পটা বলবো-বলবো করেও বলা হয়নি-এবার তা বলা যাক। এ গল্প সেই ডাকাবুকো সিন্দবাদের গল্প-যে লোকটা সাতবার বাণিজ্যে বেরিয়ে দেদার টাকা কামিয়ে বাড়ী ফিরেছিল। এটা তাঁর অষ্টম অভিযানের লোমহর্ষক কাহিনী।'

অধীর কণ্ঠে বললে বাদশা শাহরিয়া-'বলো, বলো, জলদি বলো।'

মনে মনে খোদাকে তসলিম করে নিয়ে ধীর মধুর গলায় আবার কথার ইন্দ্রজাল বোনা শুরু করলো শাহরাজাদী। নিজের কিসমত কী হবে, তা আর ভাবলো না।

'বুড়ো বয়সে শেষ কালে ঠিক করলাম, আবার বেরোনো যাক বাণিজ্যে (সিন্দবাদ বলছে নিজের জবানিতে), এত আরাম আর সইছে না। বাড়ীর কাউকে কিছু বললাম না। বিক্রির জিনিস পত্র বোঁচকায় বেঁধে নিলাম। কুলি ডাকলাম। তার মাথায় চাপিয়ে চুপি চুপি চলে এলাম সমুদ্রের ধারে। হা-পিত্যেশ করে বসে রইলাম যে-কোনো একটা জাহাজের পথ চেয়ে।

'বালির ওপর মালপত্র রেখে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কানে ভেসে এলো একটা অদ্ভুত গুন্-গুন্-গুন্-গুন্ শব্দ। আওয়াজটা আসছে সমুদ্রের দিক থেকে। কুলিটাও শুনতে পেয়েছে সেই আওয়াজ। কিছুক্ষণ পরে সমুদ্রের বুকে অনেক দূরে দেখা গেল একটা কালো ধুলোর মতো দাগ। একটু একটু করে তা বড় হলো। আওয়াজও বেড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। চোখ ছানাবড়া করে আমরা দেখলাম, একটা বিশাল বিদঘুটে জানোয়ার জল তোলপাড় করে সটান তেড়ে আসছে আমাদেরই দিকে। তার বিরাট বুকের ধাক্কায় জল পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে আছড়ে পড়ছে দুপাশে। ফেনায় ফেনায় ছেয়ে যাচ্ছে দুদিক। যেখান দিয়ে যেখান দিয়ে আসছে, সেখানকার জল আলোয় আলোয় ঝলমল করছে। পেছনে রেখে আসছে আগুনের টানা লম্বা রেখা-সে রেখার শেষ আর দেখতে পাচ্ছি না। বিপুল বপুর বেশিরভাগ জলের ওপর তুলে অকল্পনীয় বেগে কিম্ভূতকিমাকার সাগর-দানবের এ হেন গতিবেগ দেখে চক্ষু স্থির হয়ে গেল আমাদের দুজনেরই।

কাছে আসতেই তার আকার আয়তনটা আরও স্পষ্ট দেখতে পেলাম। লম্বায় সে তিন-তিনটে পৃথিবীর সব চাইতে লম্বা গাছের সমান, আর চওড়ায় বাদশা মহলের সব চাইতে চওড়া হলঘরের মতন (কসুর মাফ করবেন, জাঁহাপনা)। দেহটা কিন্তু মামুলি মাছের মতো নয় মোটেই; পাথরের মতো নিরেট, আবলুস কাঠের মতো কালো-লাল টকটকে একটা পট্টি লম্বালম্বিভাবে ঘিরে রয়েছে তার পুরো দেহটাকে। পেটখানা মাঝে মাঝে জল থেকে উঠেই আবার ভু-উ-স্ করে ডুবে যাচ্ছিল ঠিকই-তা সত্ত্বেও দেখেছি চাঁদের কুয়াশা রঙের শক্ত বড় বড় ধাতুর আঁশ দিয়ে পুরোপুরি মোড়া রয়েছে বিশাল উদর। সাদা রঙের পিঠখানা কিন্তু বিলকুল চ্যাপ্টা। ছ-টা পাখনা রয়েছে এই পিঠে-প্রতিটি পাখনা লম্বায় গোটা শরীরের অর্ধেক।

বীভৎস এই প্রাণীর মুখ নেই। মুখের অভাব পূরণ করেছে একগাদা চোখ। নিদেনপক্ষে চার কুড়ি গোল গোল চোখ সারি দিয়ে সাজানো লাল লম্বাটে পটিটার ওপরে আর নীচে দুটো সমান্তরাল রেখায়। মাঝের লাল টকটকে পটিখানা যেন এই ডবল লাইনের চোখগুলোর ভুরু। প্রতিটা চোখই গঙ্গা ফড়িং-এর চোখের মতো কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে বাইরের দিকে। এদের মধ্যে দুটো তিনটে চোখ বিকট বড়-মনে তো হলো নিরেট সোনা দিয়ে তৈরি।

আগেই বলেছি, ভীষণ জোরে আমাদের দিকে ছুটে আসছিল অত্যন্ত কদাকার এই সমুদ্র-শয়তান। শুধু চেহারা নয়, তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম তার এই অবিশ্বাস্য গতিবেগ দেখেও। যাদুকরী শক্তি ছাড়া তো এমন ভীষণ বেগে জল কেটে যাওয়া যায় না। যাচ্ছেই বা কী করে? মাছের মতো পাখনা নেই, হাঁসের মতো পাতা-পা নেই, শামুকের মতো ডানাও নেই যে নেড়ে নেড়ে জাহাজের মতো তীরবেগে ছুটবে। বানমাছের মতো কিলবিল করেও তো যাচ্ছে না। মাথার গড়ন আর লেজের গড়ন হুবহু একই রকম। ল্যাজের দু'পাশে রয়েছে দুটো ফুটো-যাদের কাজ অবশ্য নাকের কাজের মতনই। সেইভাবে হুড়হুড় করে ঘন বাষ্প ছাড়ছে দু-দুটো ফুটো দিয়ে। বিশ্রী বিকট আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। শ্বাসপ্রশ্বাসে এমন জঘন্য গর্জন!

মোদ্দা কথা, জানোয়ারটা অতীব কুৎসিত। গা ঘিন-ঘিন করে উঠেছিল আমাদের দুজনেরই। চোখ ফিরিয়ে নিতে পারিনি তা সত্ত্বেও।

কেন না, ঘেন্নার চাইতেও বড় বিস্ময় পিলপিল করছিল তার সাদাটে চ্যাটালো পিঠের ওপর। এরাও জানোয়ার-তবে আকারে আর আয়তনে মানুষের মতন। কিন্তু জামাকাপড়গুলো মানুষের জামাকাপড়ের মতন নয়-মানে, সে রকম ঢিলেঢালা নয়। অসম্ভব টাইট। যেন গায়ের চামড়া গায়েই সেঁটে আছে। ফলে,

বিষম যন্ত্রণায় নিশ্চয় প্রাণ আইঢাই করছে বেচারাদের। আমাদেরও গা রি-রি করছে হতকুচ্ছিৎ সেই পোশাকের ডিজাইন দেখে।

সৃষ্টিছাড়া জীবগুলোর প্রত্যেকের মাথায় বসানো একটা করে চৌকোমতো বাক্স। প্রথমে মনে হয়েছিল পাগড়ি জাতীয় কিছু একটা হবে। কিন্তু তা তো নয়। প্রতিটা বাক্সই নিরেট এবং বেজায় ভারি। শুধু বুঝতে পারছিলাম না এত ওজন মাথায় চাপিয়ে রেখেছে কেন জানোয়ারগুলো। একটু মাথা খাটাতেই সমাধান করে ফেললাম রহস্যটার, মাথাগুলো যাতে সিধে থাকে ঘাড়ের ওপর, নড়ে চড়ে গিয়ে বিপদে না ফেলে-তাই এই ওজনের ব্যবস্থা। মাথাকে নিরাপদে রাখার এরকম বিদঘুটে আয়োজন কখনো দেখিনি।

আরও একটা তাজ্জব ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম জানোয়ারের গলায়। আমরা কুকুরের গলায় পরাই বকলস। অবিকল সেইরকম, কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশী চওড়া আর শক্ত, কুচকুচে কালো বকলস গলায় পরে আছে অদ্ভুত জীবগুলো। বান্দা বলে যাতে চেনা যায়, নিশ্চয় তার ব্যবস্থা। কিন্তু গলা ঘোরাতে পারছে না কিছুতেই-এদিকে ওদিকে তাকাতে গেলে পুরো দেহটাকে ঘোরাতে হচ্ছে অকারণে। থ্যাবড়া নাকখানাকেই দেখে যাচ্ছে অষ্টপ্রহর-তার বাইরে যেন আর দুনিয়া নেই। আহারে! কী কষ্ট!

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে, তার কাছাকাছি এসেই হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসলো সাগরদানো। আচমকা ঠেলে লম্বা করে তুললো একটা চোখ, চোখ ধাঁধানো ভয়ানক আগুনের ঝলক বেরিয়ে এলো চোখের মধ্যে থেকে, ভক্ করে ঠিকরে গেল একরাশ ঘন কালো ধোঁয়া-সেই সঙ্গে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো সাংঘাতিক একখানা আওয়াজে-যে আওয়াজকে তুলনা করা স্পয় বাজ পড়ার আওয়াজের সঙ্গে।

পিলে চমকে উঠেছিল দুজনেরই। ধোঁয়া কেটে যাওয়ার পর চোখ কচলে নিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, সাদা পিঠে দাঁড়িয়ে থাকা একটা কিম্ভূত মানুষ জানোয়ার চোঙার মতো একটা জিনিস এক হাতে ধরে, মুখের সামনে রেখে, তার মধ্যে দিয়ে চড়া, কড়া, যাচ্ছেতাই রকমের কর্কশ গলায় কথা বলছে আমাদের সঙ্গে। বিচ্ছিরি সেই চেঁচানি নিঃসন্দেহে ওদের ভাষা-কিন্তু যে ভাষা নাক দিয়ে একেবারেই বেরোচ্ছে না-তাকে ভাষা বলাও তো ঠিক নয়।

কথা তো বলা হলো আমার সঙ্গে, কিন্তু জবাব দেব কিভাবে, এইটা ভাবতে ভাবতেই মাথা খারাপ হয় আর কি! কী যে ছাই বলে গেল কচর মচর হাঁউমাউ করে, তার বিন্দুবিসর্গ বুঝিনি। ব্যাপারটা পরিষ্কার করার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালাম কুলির দিকে।

বিশ্রী বিকট সাগর-দানোকে দেখে তখন তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড়। ভিমরি খাবে মনে হচ্ছে। দাবড়ানি দিয়ে আগে তাকে চাঙ্গা করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, রাক্ষসটা কী জাতের, কী চায়; পিঠের ওপর কাতারে কাতারে যারা গুলতানি করছে, তারাই বা কী জাতের জানোয়ার। কাঁপতে কাঁপতে কুলি যা বললে, তা এই; এই জাতীয় সমুদ্র শয়তানের কথা সে এর আগেও শুনেছে। অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয় এই জানোয়ারগুলো। এদের পেটে ঠাসা থাকে গন্ধক আর আগুনের রক্ত। মানুষ জাতটাকে নাজেহাল করার জন্যে একটা বজ্জাত ভূত উৎকট এই জিনিস বানায় কদাকার জানোয়ারটার বিরাট পেটের চৌবাচ্চায়। পিঠের ওপর এই যে যারা পোকার মতো কিলবিল করছে, ওরা আসলে পোকা-ই। যে ধরনের পোকা কুকুর আর বেড়ালের শরীরে ঢুকে তাদের ভোগায়-এরা প্রায় সেই জাতের পোকা, তবে অনেক বড় আর বর্বর। ভূত বেটাচ্ছেলে জঘন্য এই পোকাগুলোকেও সাগর-শয়তানের পিঠে ছেড়ে রেখেছে বিশেষ মতলবেই। এরা কুরে কুরে খায় সাগর-শয়তানকে আঁচড়ায়, কামড়ায়-জ্বালা যন্ত্রণা সইতে না পেরে হুঙ্কার ছেড়ে সামনে যা পায় তাই তছনছ করে বেড়ায় রাক্ষস বেচারা। বদমাস ভূতটা মানুষ জাতটার ওপর প্রতিহিংসা নেয় এইভাবে, কুচুটে পরিকল্পনা হাসিল করে নেয় হিংস্র রাক্ষসকে খেপিয়ে দিয়ে।

এই না শুনেই আমি টেনে দৌড়োলাম। কুলিও দৌড়োলো-তবে আমি যেদিকে গেলাম, ঠিক তার উল্টোদিকে। ফলে, সাগর দানবের খপ্পরে সে পড়েনি। ভাগলবা হয়েছে আমার সমস্ত মালপত্র নিয়ে-বিক্রি করে দুটো পয়সারও মুখ দেখেছে সন্দেহ নেই। তবে এ ব্যাপারটা আদৌ ঘটেছে কিনা, তা সঠিক বলতে পারবো না-কেন না, তার মুখ তো আর দেখিনি।

চোঁ-চাঁ দৌড়েও পালাতে পারলাম না আমি। মানুষ-পোকাগুলো নৌকোয় চেপে এসে ঝপাঝপ করে নেমে পড়লো তীরে, তারপর পাঁই পাঁই করে দৌড়ে ছেঁকে ধরলো আমাকে। বেঁধে ফেললো হাত আর পা। নৌকোয় চাপিয়ে নিয়ে গেল জলের রাক্ষসটার পিঠে। সে বেটাও কম পাজী নয়। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বেগে সাঁতার কেটে চলে গেল মাঝ দরিয়ায়।

এইবার শুরু হলো আমার আফসোস। কেন যে মরতে বাড়ির আরাম ছেড়ে অ্যাডভেঞ্চারের ফিকিরে বাইরে বেরিয়েছিলাম। এ কাদের পাল্লায় পড়লাম রে বাবা!

কিন্তু আমি হলাম গিয়ে সিন্দবাদ। পৃথিবী চুঁড়েছি, অনেক তাজ্জব ব্যাপার দেখেছি। তাই চোঙা-হাতে দাঁড়িয়েছিল যে মানুষ-পোকাটা, তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে

গেলাম। তার কারণও আছে। অন্য সব মানুষ-পোকাগুলো কেঁচোর মতো গুটিয়ে যাচ্ছে এর হুকুম আর তড়পানির সামনে। এই দেখেই ঠিক করলাম, পালের গোদাটাকে আগে কব্জা করা যাক।

পারলামও। দিন কয়েকের মধ্যেই পালের গোদার সঙ্গে রীতিমতো দোস্তি জমিয়ে ফেললাম। আমার ওপর তার মন-ও গলে গেল। একটু একটু করে তার নেকনজরে পড়লাম। অনেক আরাম-টারামের ব্যবস্থাও করে দিলে। এমন কি নিজেদের অখাদ্য ভাষাটার দু-চারটে কথাও শিখিয়ে দিলে। কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো বুকনিবাজি রপ্ত করে নিয়ে ওদেরই ভাষায় ব্যক্ত করলাম আমার মনের প্রচণ্ড ইচ্ছেটা—সে ইচ্ছে একটাই—দুনিয়াটাকে চষে দেখা।

এই না শুনেই একদিন কটর মটর করে সে আমাকে বললে—'ওয়াশিশ কোয়াশিশ কুইক, সিন্দবাদ, হে-ডিড্‌ল্, ডিড্‌ল, গ্রাণ্ট আম্ গ্রাম্বল, হিস্-স্, ফিস্-স্, হুইস্-স্।'

এই কথা হলো রাত্রে ভুরি ভোজের পর। জাঁহাপনা নিশ্চয় কথাগুলোর মানে বুঝতে পারলেন না। পারবেন কী করে? এ যে ঘো-মো'দের ভাষা। ঘো-মো এই বিদঘুটে পোকাগুলোর নাম। ঘোড়াদের চিঁহি-চিঁহি আর মোরগের কোকর-কোঁ—এই ডাকদুটোর মাঝামাঝি আওয়াজের ভাষা যাদের, তাদের নাম ঘোড়া-মোরগ, মানে, ঘো-মো হবে না তো কী হবে বলুন?

বদখৎ বচনটার অর্থটা এবার শুনুন। ঘো-মো বললে—'ওহে সিন্দবাদ, তোমার মতো খাসা লোক আর হয় না। আমরা এই ভূগোলকটাকে চর্কিপাক দিতে সফরে বেরিয়েছি। দুনিয়া দেখবার এতই যখন শখ তোমার, তখন তুমিই বা বাদ যাও কেন? মুফতে চিঁড়িয়ার পিঠে চেপে ঘুরে নেওয়ার সুযোগ তোমাকে দিলাম।'

গল্পের এই পর্যন্ত শুনে পাশ ফিরে শুলেন বাদশা। বললেন শাহরাজাদীকে—'বেড়ে গল্প! আগে বলোনি কেন?'

শাহরাজাদী মনে মনে এক চোট হেসে নিয়ে বলে গেল একই রকম যাদুকরী ঢঙে—'সিন্দবাদের অ্যাডভেঞ্চার তারই জবানিতে বলছি, খোদাবন্দ-মানুষ-পোকার কথায় ধন্য হয়ে গেলাম। পশুর পিঠে যেখানে খুশি যাওয়ার অধিকার পেলাম। পশু লেটাও ছুটলো বটে। দিন নেই, রাত নেই-ছুটছে তো ছুটছেই। পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে গিয়ে জল ভেঙে পড়ছে দু-পাশে। পৃথিবীর এই জায়গাটা কিন্তু চ্যাপ্টা নয় একেবারেই—কুমড়োর মতো গোল। পর্বতপ্রমাণ ঢেউ ভেঙে কখনো ওপরে ওঠে, কখনো নিচে নেমে পশু ব্যাটাচ্ছেলে পাঁই পাঁই করে ছুটলো অজানা এই সাগরের বুকে নাচতে নাচতে।'

বাধা দিয়ে বললেন বাদশা–'এ তো বড় অদ্ভুত কথা, বেগমে।'

তকরার না করে শাহরাজাদীও বলে উঠলো তক্ষণি–'অদ্ভুত তো বটেই, কিন্তু সব সত্যি।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই। তারপর কী হলো?'

'সিন্দবাদ বললে–দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এইভাবে ঢেউ ভেঙে আকাশপানে উঠে গিয়ে, আবার পাতালপানে নেমে গিয়ে শেষকালে এসে পৌছালাম পেল্লায় একটা দ্বীপে। কয়েকশো মাইল বেড় এই একখানা দ্বীপের। সমুদ্রের ঠিক মাঝখানে এত বড় দ্বীপটাকে অনেক মেহনৎ করে বানিয়েছে শুঁয়োপোকারা।'১

'হুঁ!' বললেন বাদশা।

বাদশার বেমক্কা মন্তব্যে বিচলিত হলো না শাহরাজাদী। এ ধরনের অসভ্যতা তার গা-সওয়া হয়ে গেছে।

বললে–'সিন্দবাদ বলছে–এ-দ্বীপ ছেড়ে এসে পড়লাম আর একটা দ্বীপে। এখানে রয়েছে একটা আশ্চর্য জঙ্গল। প্রত্যেকটা গাছ কালো পাথরে গড়া। ভীষণ শক্ত পাথর। ধারালো কুড়ুল দিয়ে কয়েকটা গাছ কাটতে গেছিলাম। থরথর করে কেঁপে উঠে টুকরো টুকরো হয়ে গেল প্রত্যেকটা গাছ।'২

'হুঁ!' –আবার সেই বিটকেল আওয়াজ ছাড়লেন বাদশা। কান না দিয়ে সিন্দবাদের ভাষায় বলে চললো শাহরাজাদী–এই দ্বীপ ছেড়ে এসে পৌছোলাম একটা দেশে। সেখানে রয়েছে একটা মস্ত গুহা। লম্বায় তিরিশ থেকে চল্লিশ মাইল। মাটির ওপর দিয়ে কিন্তু নয়। মাটির তলা দিয়ে। পাতাল-গুহা। বিশাল এই গুহার মধ্যে রয়েছে অজস্র জাঁকালো প্রাসাদ। বাগদাদ আর দামাস্কাসেও নেই এমন গুলজার মঞ্জিল। প্রত্যেকটা ইমারতের ছাদ থেকে ঝোলে অসংখ্য রত্ন–ঝকমক করে ঠিক হীরের মতন। কিন্তু হীরের মতো ঠিক এতটুকু নয়–মানুষের চাইতেও বড়। মিনার, পিরামিড আর মসজিদের আশপাশ দিয়ে বানানো রাস্তাগুলো দিয়ে দিবারাত্র বয়ে যাচ্ছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদী। তাদের জল আবলুস কাঠের মতো কুচকুচে কালো। প্রতিটা নদীতে থিকথিক করছে অজস্র মাছ। চোখ নেই কারোরই।'৩

'হুঁ!'–আবার সেই বিচ্ছিরি আওয়াজ (বাদশার নাকের মধ্যে দিয়ে)।

'বিরাট চিড়িয়া অবিশ্বাস্য বেগে সাঁতার কেটে এবার এলো আর একটা সাগরে। এখানে দেখলাম একটা আকাশছোঁয়া পাহাড়। পাহাড়ের গা দিয়ে বয়ে চলেছে গলা ধাতুর ঝর্ণা আর প্রপাত।৪ চুড়োয় রয়েছে একটা কুয়ো–যা নেমে গেছে পাতাল পর্যন্ত। এই কুয়ো থেকে ঠিকরে ঠিকরে আসছে রাশি রাশি

ছাই। আকাশ ছেয়ে দিচ্ছে-ঢেকে দিচ্ছে জলন্ত সূর্যকেও। মাঝরাতে যতখানি অন্ধকার দেখা যায়-দিনেরবেলাতেও সেইরকম ঘুটঘুটে অন্ধকার বিরাজ করছে চারদিকে। সেই কারণেই, পাহাড়ের দেড়শো ফুট তফাতে এসে ধবধবে সাদা জিনিসও আর দেখতে পাইনি। চোখের সামনে এনেও অদৃশ্যই রয়ে গেছে।'৫

'হুঁ!'-বাদশার বিশ্রী মন্তব্য।

তীরে না নেমে চলে এলাম অন্য দিকে। পেল্লায় পশু যেদিকে নিয়ে গেল-সেইদিকে। এলাম আর একটা সৃষ্টিছাড়া দেশে। সেখানে সব কিছুই উল্টো। যেমন ধরুন, একটা প্রকাণ্ড সরোবরের একদম তলায় দেখলাম একটা বিশাল জঙ্গল। একশো ফুট গভীরে জলের মধ্যেই দিব্যি ডালপালা মেলে রাজত্ব করে চলেছে বেজায় লম্বা আর বেজায় ঝাঁকালো বাদশা-গাছেরা।'৬

'হুঁ!'-ফুৎকার দিলেন যেন বাদশা।

'আরও একশো মাইল এগিয়ে যাওয়ার পর এলাম একটা জায়গায় যেখানে আবহাওয়া অসম্ভব ঘন। এত ঘন যে এখানকার বাতাস যেমন পাখির পালক শূন্যে ভাসিয়ে রাখে, ওখানকার বাতাস তেমনি লোহা অথবা ইস্পাতকে শূন্যে ধরে রেখে দেয়।'৭

'গল্পের গরু গাছে ওঠে!' -বললেন বাদশা শাহরিয়া।

'মহাকায় পশু মহাবেগে ছুটে চললো একই দিকে। দেখতে দেখতে এসে পড়লাম পৃথিবীর সব চাইতে সুন্দর অঞ্চলে। কয়েক হাজার মাইল লম্বা একটা নদী বয়ে চলেছে সে দেশের মধ্যে দিয়ে। সে নদীর জল যে মাটি ছুঁয়েছে কতখানি গভীরতায়-তা বলা মুসকিল। স্ফটিকের চাইতেও স্বচ্ছ তার জল। চওড়ায় তিন থেকে ছ'মাইল, দু'পাশের তীর সোজা উঠে গেছে বারোশো ফুট পর্যন্ত-একেবারে খাড়াইভাবে। সেখানে যেসব গাছ গজিয়েছে তারা বারো মাস ফুল দেয়। বারো মাস তাদের অপূর্ব খুশবুতে পুরো অঞ্চলটা মাতোয়ারা হয়ে থাকে। গোটা তল্লাটটাকে একটা মস্ত বাগান বানিয়ে ফেলেছে এই বারোমেসে ফুলগাছেরা। তা সত্ত্বেও এমন সুজলা সুফলা খুবসুরৎ জায়গাকে লোকে বলে বিভীষিকার রাজ্য। সেখানে ঢুকলে প্রাণ যাবেই।

'হুম!'-বাদশার ফুটুনি।

তড়িঘড়ি চম্পট দিলাম আতঙ্ক-অঞ্চল ছেড়ে। -হাল্লাক আর হয়রানির ভয়ে। দিন কয়েক পরেই পৌঁছোলাম আর একটা জায়গায়। সেখানে গিজগিজ করছে আজব দানব। দেখেই তো চোখ কপালে উঠে গেল আমার। অনেক রকম শিং দেখেছি গরু-ভেড়া-মোষ-হরিণের মাথায়-কিন্তু কাস্তের মতো শিং কখনো

দেখিনি। বিশ্রী বিকট দৈত্যদের মাথায় রয়েছে ঠিক এইরকম শিং-কুচ্ছিৎ মাথা নেড়ে নেড়ে মাটি কুপিয়ে কুপিয়ে গর্ত বানায় বিরাট বিরাট। কুয়োর মতো গর্ত নয় মোটেই-অবিকল ফানেলের মতন। মুখটা চওড়া-তলাটা ছুঁচলো হতে হতে ঠেকেছে একটা বিন্দুতে। পাজীর পাঝাড়াগুলো আলগা পাথর একটার পর একটা সাজিয়ে রাখে গর্তের পাড় ঘিরে। নিরীহ জন্তুরা এসে সেই পাথরে গা অথবা পা ঠেকালেই হড়মুড় করে সবগুলো পাথর আছড়ে পড়ে বেচারাদের মাথায়-সব শুদ্ধ গড়িয়ে যায় গর্তের তলায়। কুচুটে দৈত্যগুলো তখন তাদের রক্ত শুষে খেয়ে নিয়ে লাশগুলোকে বিষম জোরায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় অনেক....... ... অনেক দূরে।'৯

'ছোঃ!'-বললেন বাদশাযশায়।

'ছেড়ে এলাম মৃত্যু-গহ্বরের ভয়ঙ্কর দেশ। এবার এলাম এমন একটা তল্লাটে যেখানে শাকসবজি মাটিতে গজায় না-গজায় বাতাসে।১০ কিছু সবজি আবার অন্য সবজিদের গা থেকেই জন্ম নেয়।১১ আর একরকম সবজি জ্যান্ত জন্তু জানোয়ারদের শরীর থেকে নিজেদের খাবার দাবার টেনে নেয়।১২ এছাড়াও দেখলাম আগুনের মতো জ্বলজ্বলে এক ধরনের সবজি-সত্যিই আগুন লকলক করছে সারা গায়ে-একনাগাড়ে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকাও যায় না।১৩ আর এক জাতের সবজি খেয়াল খুশিমতো এক জায়গা থেকে চলে যাচ্ছে আর এক জায়গায়।১৪ সব চাইতে আক্কেল গুড়ুম হলো বিশেষ এক ধরনের ফুলের কীর্তি দেখে। এরা নিজেদের ইচ্ছে মতো অঙ্গ নাড়ে, বেঁচে থাকে, নিঃশ্বেস নেয়। মানুষ যেমন মানুষকে খাঁচায় পুরে রাখার উৎকট ঝোঁকে ভোগে-এরাও ঠিক তেমনি খাঁচায় পুরে রাখে মানুষ আর জ্যান্ত প্রাণীদের-নিজেদের জাতভাইদের খায় না-খায় খাঁচায় বন্দী জীবদের-অন্ধকারে নির্জনে রেখে হাড়হিম করে দেওয়ার পর।'১৫

'ছিঃ ছিঃ!'-বললেন বাদশা।

'এদেশও ছেড়ে এলাম। পৌঁছোলাম পণ্ডিত মৌমাছি আর পাখিদের অবাক দেশে। এরা গণিত গুলে খেয়েছে। সাম্রাজ্যের বড় বড় পণ্ডিতরা এদের কাছে এসে জ্যামিতি শিখে যায়। মহারাজ একবার একটা পরীক্ষা নিয়েছিলেন। এক জোড়া সমস্যা হাজির করেছিলেন মৌমাছি আর পাখিদের সামনে। হাজির করার সঙ্গে সঙ্গে ওইখানে বসেই একটার সমাধান বাতলে দিয়েছিল মৌমাছিরদল-আর একটার উত্তর যুগিয়েছিল পাখিরা। উত্তর দুটো কিন্তু চেপে গেছিলেন মহারাজা। ঢেঁরা পিটে দেশের সমস্ত পণ্ডিতদের ডেকে এনে ওই সমস্যা দুটোরই সমাধান করে দিতে বলেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেছিল লম্বা লম্বা গবেষণা আর মোটা মোটা বই লেখা। অনেক.........অনেক

বছর পরে মানুষ গণিতবিদরা সমস্যা দুটোর যে সমাধান বের করেছিলেন অনেক.........অনেক মেহনতের পর-মৌমাছি আর পাখিরা হুবহু সেই একই সমাধান বাৎলে দিয়েছিল সমস্যা শোনার সঙ্গে সঙ্গে।'১৫

'আরেব্বাস!'-বললেন বাদশা।

'বিশাল এই সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে এবার আমরা এলাম আর একটা বিরাট দেশে। সেখানে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বুনো পাখির পাল। দুশো চল্লিশ মাইল লম্বা আর এক মাইল চওড়া এই ঝাঁক মিনিটে এক মাইল পথ উড়ে গেলেও আমাদের মাথার ওপর থেকে সরে যেতে সময় নিয়েছিল ঝাড়া চার-চারটে ঘণ্টা। কোটি কোটি বুনো পাখি ছিল সেই ঝাঁকে।'১৭

'ধুস!' বললেন বাদশা।

'বড় বিরক্ত করেছিল এই ঝাঁকটা। বিদেয় হতে বাঁচলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যে। তারপরেই আঁৎকে উঠলাম পাহাড়ের মতো বিরাট আর একটা উড়ন্ত মোরগ দেখে। আগের অভিযানে বেরিয়ে রক পাখি দেখেছি-কিন্তু এই উড়ন্ত মোরগ তাদের প্রত্যেকটাকে টেক্কা দিতে পারে। হে মহামান্য খলিফা, আপনার সাম্রাজ্যে সব চাইতে বড় গম্বুজের চাইতেও পেল্লায় সেই মোরগের মুণ্ডু বলে কিস্সু নেই। আছে শুধু একটা বিশাল পেট। পেটটাই তার সব-আর কিচ্ছু নেই। এরকম নাদা পেট কেউ কখনো দেখেনি-হলপ করে বলতে পারি। নাদুস-নুদুস চর্বিঠাসা প্রকাণ্ড সেই পেট অতিকায় জালা-র মতোই গোলগাল। দেখে তো মনে হলো তুলতুলে নরম জিনিস দিয়ে তৈরী। সারা গায়ে লম্বা লম্বিভাবে ডোরাকাটা-এক-একটা ডোরা-র এক -একটা রঙ। চকচকে, তেলতেলে, রামধনু বপু ঝলসে ঝলসে উঠছিল কড়া রোদে।পায়ের নখ দিয়ে সে ঝুলিয়ে রেখেছে একটা বাড়ি। ঠুকে ঠুকে ভেঙে ফেলেছে তার ছাদ। বাড়ির মধ্যে রয়েছে ক'জন মানুষ। নিশ্চয় চেঁচাচ্ছিল প্রাণের ভয়ে। রাক্ষুসে পাখি কোথায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বেচারিদের-তা বুঝেই বোধহয় হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল বেচারাদের। মেঘলোক থেকে নেমে এসে মেঘলোকেই ফিরে যাচ্ছে দানো-পাখি। সেখানে আছে তার প্রাসাদ। খানা খাবে এই ক'টা মানুষকে দিয়ে। পরিণতিটা কল্পনা করে নিয়ে প্রাণপণে চেঁচিয়ে গেলাম আমরা সব্বাই-কিন্তু পাখি ব্যাটাচ্ছেলে আমাদের চেঁচানিতে ভড়কে না গিয়ে উল্টে রেগেমেগে ভক করে একরাশ ধোঁয়া ছেড়েই দুম করে একটা বস্তা আছড়ে ফেললো আমাদের ঘাড়ে। বস্তা খুলে দেখলাম তার মধ্যে রয়েছে শুধু বালি।'১৮

'স্রেফ গালগল্প!'-বললেন দিন দুনিয়ার মালিক।

দানো পাখি আর কোনো আওয়াজ না করে মিলিয়ে গেল দিগন্তে। আমরাও ভয়ের চোটে আধমরা অবস্থায় পৌঁছোলাম

একটা প্রকাণ্ড মহাদেশে। একেবারে নিরেট সেই মহাদেশকে কিন্তু পিঠে চাপিয়ে রেখেছে আকাশি রঙের একটা গরু-যার মাথায় শিং আছে কম করেও চারশো।'১৯

'তোফা! কোন্ একটা কিতাবে পড়েছি এই ব্যাপারটা-তাই বিশ্বাস করলাম'-ফুটুনি কাটলেন খোদাবন্দ।

'সেখান থেকে ঘণ্টা কয়েক সাঁতরে গেলাম গরুটার দুপায়ের ফাঁক দিয়ে-মাথার ওপর দেখতে দেখতে গেলাম প্রকাণ্ড মহাদেশটাকে। এবার এলাম ভারি আশ্চর্য এক দেশে। মানুষ-পোকা'দের স্বদেশ সেই দেশ। এখানেই থাকে ওদের জবরদস্ত জাতভাইরা। শুনে সমীহ করতে ইচ্ছা হলো পালের গোদা আর তার স্যাঙাৎদের। মনটাও খারাপ হয়ে গেল প্রথম দর্শনে এদের ঘেন্না-ঘেন্না চোখে দেখেছিলাম বলে। শুনলাম, বড় শক্তিমান জাত এই মানুষ-পোকারা। যাদুবিদ্যেতে বড় পোক্ত। বিস্তর যাদুকর আছে তাদের দেশে। ভীষণ শক্তিমান তাদের মগজে নাকি কিলবিল করে পোকা।২০ পোকাগুলো নড়াচড়া করলেই যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে ওঠে যাদুকররা-আর তাতেই নাকি আশ্চর্য অদ্ভুত কল্পনা ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়ে তাদের মগজে। হিকমৎ দিয়ে হিল্লে করে নেয় সমস্ত সমস্যার।'

'বাজে কথা,' বললেন বাদশা।

'ধুরন্ধর এই যাদুকররা কিম্ভুতকিমাকার অনেক জানোয়ারকে পোষ মানিয়ে রেখেছে। যেমন ধরুন, এক ধরনের ঘোড়া। শরীরটা অতিকায় হলে কি হবে, হাড়গোড় সবই তো লোহা দিয়ে তৈরী। অথচ রক্ত নেই একদম-রক্তের বদলে আছে ফুটন্ত জল। ঘোড়া খায় ছোলা-এ খায় শুধু কালো কয়লা। এরকম অখাদ্য হজম করেও সে একাই বইতে পারে একগাদা পাথর-যা এই শহরের সবচাইতে বড় মসজিদেও [illegible] ছোটে এত জোরে যে আকাশের পাখি লজ্জা পেয়ে দৌড় [illegible] উল্টো দিকে।'২১

'ঘোড়ার ডিম!'-বললেন বাদশামশায়।

'অদ্ভুত এই ঘোড়ার জাতভাই দেখলাম আর একটা প্রাণীকে। পালক ছাড়া একটা মুরগি। উটের চাইতেও বড়। গায়ে মাংস আর পালকের বদলে আছে শুধু লোহা আর ইঁট। রক্ত নেই-আছে ফুটন্ত জল। খায় শুধু কাঠ আর কালো পাথর। কিন্তু হরবখৎ জন্ম দিয়ে যাচ্ছে দিনে একশটা বাচ্চাকে। জন্মের পরেই এদের ঠাঁই হয় মায়ের পেটের আঁতুর ঘরে-হপ্তা কয়েকের জন্যে।'২২

'বিলকুল ঝুট!-বললেন বাদশা।'

'ভেল্কিবাজদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। এক-একটা ভেল্কিবাজ এক-এক রকম ম্যাজিক দেখিয়ে চলেছে। একজন তো স্রেফ পেতল, কাঠ, চামড়া জুড়ে জুড়ে এমন একটা বুদ্ধিমান

মানুষ বানিয়েছে যে এই দুনিয়ার তাবড় তাবড় দাবা-খেলোয়ারদের কিস্তিমাৎ করে দেবে নিমেষে নিমেষে। হারাতে পারবে না মহান খলিফা হারুন অলরসিদকে।২৩ আর একজন ভেল্কিবাজ লাগ ভেলকি দেখিয়েছে অদ্ভুত একটা জীব বানিয়ে। পেতল, কাঁসা, চামড়া, আর কাঠ দিয়ে তৈরী হলে কি হবে, রক্তমাংস দিয়ে গড়া পঞ্চাশ হাজার মানুষ এক বছরে যে হিসেব করবে-এই জীব তা করে দেবে এক সেকেণ্ডে। বুঝুন তার বুদ্ধি আর যুক্তি কী সাংঘাতিক।২৪ সব ভেল্কিবাজকে ম্লান করে দিয়েছে একজন শুধু একটা জিনিস বানিয়েই। অবিশ্বাস্য শক্তি সেই জিনিসটার। অথচ তার ব্রেনে সিসে ছাড়া কিস্সু নেই। আলকাতরার মতো একটা বিশ্রী জিনিস চটচটে করে রাখে সিসে-মগজকে। খানকয়েক হাত নেড়ে এই সিসে-মগজ ঘণ্টায় বিশ হাজার কোরান লিখে ফেলতে পারে নিখুঁত ভাবে। প্রত্যেকটা হুবহু এক-চুলচেরা তফাৎও পাবেন না একটার সঙ্গে একটার। অবিশ্বাস্য বেগের জিনিসটার প্রচণ্ড শক্তির কাছে অনায়াসেই ঘায়েল হয়ে যায় বড় বড় সাম্রাজ্য। দরকার হলে খারাপ কাজেও চুটিয়ে লাগানো যায় অদ্ভুত এই জিনিসটাকে।'২৫

'শুনেই হাসি পাচ্ছে!'-বললেন বাদশা।

'তুকতাকে ওস্তাদ এই জাতটার মধ্যে একজনকে দেখলাম শুধু ঘরে বসে গনগনে লাল উনুনে ফুঁ দিয়ে খানা বানিয়ে নিচ্ছে-আগুনে-টিকটিকির বংশধর বললেই চলে। রক্তে রয়েছে আগুন।২৬ আর একজন না তাকিয়েই মামুলি ধাতুকে সোনা করে দিতে পারে-ফিরেও দেখে না কি করে তা হচ্ছে।২৭ একজন বড় ওস্তাদ স্রেফ মন্ত্র পড়েই বোধহয় এমন সরু তার বানাতে পারে যা চোখেও দেখা যায় না।২৮ আর একজন অসামান্য অনুভূতির অধিকারী। টানলে লম্বা হয়, ছাড়লে গুটিয়ে যায়-এরকম একটা বস্তুর আগু-পিছু হওয়ার আলাদা গতিবেগকে নাকি মেপেও ফেলেছে। সেকেণ্ডে তা নব্বই কোটি বার।'২৯

'হতেই পারে না!'-বাদশার মন্তব্য।

'একজন যাদুকর অদ্ভুত একটা তরল পদার্থকে দিয়ে মড়া নাচায় খুশিমতো-অথচ সেই তরল পদার্থ চোখে দেখা যায় না।৩০ আর একজন গলার জোর এত বাড়িয়েছে যে পৃথিবীর একপ্রান্তে বসে কথা বললেও অন্য প্রান্ত থেকে শোনা যায় তার হাঁকডাক।৩১ জবর ভেলকি দেখিয়েছে আর এক ওস্তাদ। এমন লম্বা একখানা হাত বানিয়ে নিয়েছে যে দুনিয়ার যেখান থেকে যেখানে খুশি হাত বাড়িয়ে চিঠির খসড়া করে দিতে পারে ঝটপট। দামাস্কাসে বসে চিঠি লিখবে বাগদাদের ঘরে-কি আরো দূরে।৩২ আর একজন আকাশের বিদ্যুৎকে গোলাম

বানিয়ে ঘরে ডেকে এনে তাকে নিয়ে খেলনা বানায়।৩৩ আর একজন দুটো কানফাটা আওয়াজকে এক করে দিয়ে নৈঃশব্দ্য সৃষ্টি করতে পারে। আর একজন দুটো চোখ ধাঁধানো আলোকে জুড়ে দিয়ে বানিয়ে নিতে পারে মিশমিশে একখানা অন্ধকার।৩৪ আর একজন চুল্লির মধ্যে বানায় বরফ।৩৫ একজন সূর্যকে গোলাম বানিয়ে নিজের ছবি আঁকায়।৩৬ আর একজন চাঁদ আর গ্রহদের ওজন করে বলে দিয়েছে কি আছে তাদের পেটে।৩৭ সব চাইতে তাজ্জব কাণ্ড দেখায় তুকবাজ এই জাতটার প্রত্যেকেই। যা দেখা যায় না, তা কক্ষনো দেখতে পায় না। ভূতপ্রেত তাই এদের কাছে নেই। আবার যা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাদের জন্মের দু'কোটি বছর আগে-তাদের দেখতে পায় স্পষ্ট'।'৩৮

'বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু!'-বললেন বাদশা।

বাদশা নিজেই যে বাড়াবাড়ি অসভ্যতা করছেন, তা আর বললো না শাহরাজাদী। এসব বাঁদরামো তার সয়ে গেছে। তাই অমায়িক মিষ্টি বচনে শেষ ছোঁয়া দিয়ে গেল সিন্দবাদের অভিনব অ্যাডভেঞ্চারে। নিজের নসিব কি হতে চলেছে, তা অবশ্য আঁচ করে নিয়েছিল তক্ষুণি।

বললে-'যাদুকরদের এই দেশে অলৌকিক কাণ্ডকারখানায় পোক্ত স্বামীগুলোর প্রত্যেকের বিবি কিন্তু রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। খামতি থেকে গেছে শুধু একটা ব্যাপারে। মানে, একটা বাড়তি ব্যাপারে। জিনিসটাকে দেখতে অনেকটা কাঁটার মতন।'

'কিসের মতন?'-শুধোলেন বাদশা।

'কাঁটার মতন। অত্যন্ত রূপসী এই বিবিজানরা প্রত্যেকেই মনে করে শরীরে আল্লার দেওয়া এই কাঁটা যার যত বড়, সে তত সুন্দরী। শিরদাঁড়ার তলাটা সরু হয়ে বেরিয়ে থাকে আজকের মানুষের দেহে-মানুষের আদি পুরুষের ক্ষেত্রে এটা ছিল বেশ লম্বা। গেছো হরিণের মতো এটা দিয়ে ডাল জড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়াতো। তুকতাকে পটু যাদুকরের সব বিবি-ই মনে করে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার জন্যেই খোদা সবাইকে দিয়ে রেখেছেন এই জিনিসটা-তবে, কাঁটাটা যদি আর একটু লম্বা হতো, এক-কুঁজ উটের মতো গজিয়ে উঠতো খোদাবন্দ সোয়ামীদের পিঠে-'

'চোপরাও!'-গর্জে উঠলেন বাদশা শাহরিয়া। 'অনেকক্ষণ ধরে সয়েছি-অনেক দমবাজি, অনেক বুজরুকি, অনেক গুলগাপ্পা শুনেছি। ল্যাজউলিদের বাদশা আমি! শেষকালে কিনা এক-কুঁজ উট বলতে চাও-কাকে বলতে চাও, তা কি বুঝিনি? এত বুরবক, এত আহাম্মক আমি নই।আমার নামে ফইজৎ! বেশরম আওরৎ! বহুৎ ইজ্জত করেছো-এবার নাও

ইনাম। কালই নেব তোমার গর্দান!’

কী আর করে শাহরাজাদী। বেতমিজ বাদশার বিলকুল খোশ মেজাজকে সে-ই তো গুল্টি পাকিয়ে ছেড়েছে। তবে হ্যাঁ, অনেক লবেজান আমির-ওমরাহ-র মেয়ের জান বাঁচিয়ে দিয়েছে সে এক হাজার রাত ধরে মুখের ফেনা উঠিয়ে। বুরবক বাদশাটা আর একটু ধৈর্য ধরলে আরও মুখের ফেনা উঠিয়ে আরও খানকতক মারদাঙ্গা অ্যাডভেঞ্চার শুনিয়ে জিন্দিগি কাবার করে দিতে পারতো অনায়াসেই।

কী আর করা যায়। গর্দানটা গেল শাহরাজাদীর পরের দিন সকালেই।

পরিশিষ্ট

কথা শিল্পীর গল্পের ফাঁদে এবং শাহরাজাদীর বুদ্ধির প্যাঁচে যে তত্ত্ব ও তথ্যগুলি বন্দী হয়েছে, তা এই :

১। প্রবাল কীট।
২। টেক্সাসের পাসিগনো নদীর উৎস মুখে আছে এই প্রস্তরীভূত অরণ্য। শন্যাক হিল এবং কায়রো-তেও দেখা গেছে এই ধরনের শিলীভূত জঙ্গল।
৩। কেনটাকির ম্যামথ কেভ।
৪। আইসল্যান্ডে, ১৭৮৩।
৫। হেকলা, ভিসুভিয়স, কাসার্টা আর সেণ্ট ভিন্সেণ্টের অগ্ন্যুৎপাত।
৬। ১৯৭০-তে ভূমিকম্পের ফলে গ্রানাইট জমিসমেত একটা জঙ্গল মাটিতে বসে গিয়ে বিশাল লেক বানিয়ে ফেলেছিল। জলের তলায় সবুজ গাছপালা সবুজ-ই ছিল মাস কয়েক। জায়গাটার নাম ক্যারাক্কাস।
৭। ইস্পাতকে মিহি পাউডার বানিয়ে নিলে, তা শূন্যে ভেসে থাকবে।
৮। নাইজার নদী অঞ্চলে আছে এমন জায়গা।
৯। মিরমেলিয়ন-সিংহ-পিঁপড়ে। ছোট হোক আর বড় হোক-দৈত্য বলা যায় সবাইকে। বিশেষ করে, এরা যখন মামুলি লাল পিঁপড়েদের কাছে দানব-বিশেষ। বড় সাইজের বালুকণা এখানে হয়েছে ‘পাথর’।
১০। এক ধরনের গাছ অন্য গাছ বা বস্তুকে নিজেদের শেকড় ঠেকিয়ে রেখে বাতাস থেকে আহরণ করে পুষ্টি-অন্য গাছ বা বস্তু থেকে নয়।

১১। এক ধরনের উদ্ভিদ।

১২। এক ধরনের উদ্ভিদ-সজীব প্রাণীর শরীরে বৃদ্ধি পায়। নিউজিল্যান্ডের 'হট্টি' পোকা বা শুঁয়োপোকা 'রাটা' গাছের তলায় বড় হয়। মাথায় গজায় গাছ। 'রাটা' গাছ বেয়ে ওঠে মগডালে। সেখান থেকে কুরে কুরে গাছ ফুটো করে গুঁড়ির মধ্যে দিয়ে সুড়ঙ্গ বানিয়ে বেরিয়ে আসে শেকড়ের মধ্যে দিয়ে। মারা যায় তক্ষুণি। মাথার গাছ থেকে নতুন গাছ গজায়। শরীরটা শক্ত হয়ে পড়ে থাকে। জংলীরা সেই দেহ থেকে রঙ তৈরী করে।

১৩। খনি অঞ্চলে আর প্রাকৃতিক গুহার মধ্যে একরকম ছত্রাক আগুনের আভা ছড়ায়।

১৪। তিন জাতের উদ্ভিদ এই ক্ষমতা রাখে।

১৫। মাংসখেকো গাছ।

১৬। মৌচাক তৈরির নির্ভুত জ্যামিতিক ছক থ বানিয়েছে পণ্ডিতদের। নিপাট হাওয়া-কলের নকশা কিরকম হলে ভালো হয়, এই নিয়ে অনেক মাথা ঘামানোর পর বিদ্যের জাহাজরা দেখেছিলেন-অনেক আগেই পাখি সে ব্যবস্থা রেখেছে নিজেদের ডানায়।

১৭। কানাডা আর যুক্তরাষ্ট্র বেড়াতে গিয়ে একজন দেখেছিলেন এইরকম একটা পায়রার ঝাঁক।

১৮। বেলুন।

১৯। 'পৃথিবীকে তুলে রেখেছে নীল রঙের একটা গাভী-মাথায় তার শিং আছে চারশো' Sale s Koran

২০। মানুষের পেশী আর মগজ উপাদানে Entozoa, অর্থাৎ আন্ত্রিক কীট দেখা গেছে।

২১। রেল ইঞ্জিন এবং রেলগাড়ি।

২২। ইনকিউবিটর-এর পূর্বপুরুষ-এক্সালোবিয়ন

২৩। কলের দাবা-খেলোয়াড়-মেলজেল বানিয়েছিলেন।

২৪। ক্যালকুলেটিং মেশিন-ব্যাবেজ তৈরী করেছিলেন।

২৫। ছাপাখানা।

২৬। রাঁধার যন্ত্র।

২৭। ইলেকট্রোটাইপ।

২৮। টেলিস্কোপ লাগানোর জন্যে প্লাটিনাম তার-কে এক ইঞ্চির আঠারো হাজার ভাগের এক ভাগ সরু করে বানিয়েছিলেন ওলাসটোন। এ তার দেখা যেতো শুধু অণুবীক্ষণে।

২৯। নিউটন হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়েছিলেন বর্ণালীর বেগুনি রশ্মির প্রভাবে অক্ষিপট সেকেণ্ডে নব্বই কোটি বার কেঁপে ওঠে।

৩০। ভোল্টেইক ব্যাটারি।

৩১। রেডিও।

৩২। ইলেকট্রো টেলিগ্রাফ প্রিন্টিং যন্ত্র।

৩৩। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশের বিদ্যুৎ টেনে এনেছিলেন।

৩৪। বিজ্ঞানের খেলা।

৩৫। বিজ্ঞানের খেলা।

৩৬। ফটোগ্রাফি।

৩৭। বৈজ্ঞানিক কীর্তি।

৩৮। মানুষ সচরাচর স্বীকার করে না অদৃশ্য অস্তিত্বকে-কিন্তু বহু আগে যে নক্ষত্র বিস্ফোরিত হয়েছে-তার আলো এখন দেখতে পেয়ে মনে করে দেখছে সেই নক্ষত্রকে-আসলে তার আর অস্তিত্বই নেই।

শহরের পাপাত্মা

(দ্য ম্যান অফ দ্য ক্রাউড)

বই পেলেই যাঁরা হুমড়ি খেয়ে পড়েন, তাঁরা কিন্তু একটা বই কখনও পড়তে যাবেন না। লোকে বলে, এ বই নাকি না-পড়াই ভালো। বিশেষ এই বই খানা জার্মান ভাষায় লেখা।

আসলে কি জানেন, অনেক গোপন ব্যাপার না জানাই ভালো। অনেকেই দেখবেন মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে ছটফট করেন মনের বোঝা নামিয়ে ফেলার জন্যে। তাঁদের সেই ব্যাকুলতা চোখে দেখা যায় না। তবুও গুপ্ত রহস্য গুপ্তই থেকে যায়। বিভীষিকার উল্কি আঁকা বিবেক শান্তি পায় শুধু কবরখানায়-তার আগে নয়। সব অপরাধেরই অবসান ঘটে শুধু সেখানেই।

কিছুদিন আগে এক শারদ সন্ধ্যায় লণ্ডন শহরের ডি-কফি হাউসের মস্ত ধনুক-জানলার সামনে আমি বসেছিলাম। দীর্ঘ রোগভোগের পর শরীরটা একটু একটু করে সেরে উঠছে। পায়ে যত জোর পাচ্ছি, মনে ততই ফুর্তির ফুলকি ছুটছে। সেই সময়টা বড় আরামের। ধীরে সুস্থে নিঃশ্বাস নেওয়া আর ছাড়ার মধ্যেও আনন্দ আছে। এমনকি ছোটখাট কষ্টগুলোও এখন কতই না সুখাবহ। কোলের ওপর খবরের কাগজ বিছিয়ে চুরুট কামড়ে ধরে সারা বিকেলটা রাজ্যের বিজ্ঞাপন পড়ে কাটিয়েছি। ঘরে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের হাবভাব কথাবার্তা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছি। বলতে পারেন, নেই কাজ তো খই

ভাজ। তারপর ধোঁয়া লেগে ঝাপসা হয়ে যাওয়া জানলার কাঁচের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে রইলাম রাস্তার দিকে।

লণ্ডন শহরে যে কটা ভীষণ ভিড়ের রাস্তা আছে, এই রাস্তা তাদের অন্যতম। লোক জন আর গাড়ী ঘোড়ার ভিড়ে গমগম করে প্রায় সবসময়ে। দিনের বেলা ধাক্কা বাঁচিয়ে হাঁটা দায়। কিন্তু সন্ধে হতেই ভিড় আরও বেড়ে গেল। ল্যাম্পপোস্টগুলো টুক টুক করে জ্বলে ওঠার পর দেখলাম শুধু কালো মাথা। ঠিক যেন নরমুণ্ডের উত্তাল সমুদ্র ফুলে ফুঁসে ধেয়ে যাচ্ছে ধনুক-জানলার সামনে দিয়ে। পিলপিল করে লোক যাচ্ছে আর আসছে। এর আগে এই জায়গায় বসে এইভাবে কখনো নরমুণ্ডের জোয়ার দেখিনি। হোটেলের সমস্ত আকর্ষণ নিমেষে তিরোহিত হলো মন থেকে। বিচিত্র আবেগে অস্থির হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম বাইরের দিকে।

প্রথমে অতটা খুঁটিয়ে দেখিনি। বিশাল জনসমুদ্রে নর্তন-কুর্দনটাই কেবল উপভোগ করে গেছি। গড়পড়তা আনন্দ পেয়েছি। তারপর নজর গেল চুলচেরা বিচারে। নিবিড় কৌতূহল নিয়ে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে তন্ময় হয়ে গেলাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে গেলাম অগণিত আকৃতি, পরিচ্ছদ, চালচলন, পদবিক্ষেপ এবং মুখভাব।

বেশিরভাগ লোককেই বিলক্ষণ আত্মতুষ্ট মনে হলো। কাজ-কারবারই যেন ধ্যান-জ্ঞান। অন্য ব্যাপারে নিস্পৃহ। জোর কদমে কেবল হেঁটে চললেই বুঝি মোক্ষলাভ ঘটে যাবে। এদের ভুরু গ্রন্থিল, চোখ ঘূর্ণ্যমান, পাশের লোকের গুঁতো খেয়েও এরা নির্বিকার-দ্রুত হাত বুলিয়ে বেশভূষার পারিপাট্য ঠিক করে নিয়ে ফের হনহনিয়ে চলে যাচ্ছে গন্তব্যস্থল অভিমুখে। আর একদল লোক, সংখ্যায় গুনে বের করা যাবে না। এরাও রীতিমতো হন্তদন্ত। মুখ চোখ লাল করে ফেলে হড়বড়িয়ে কথা বলে যাচ্ছে নিজেদের মধ্যে, অঙ্গভঙ্গিরও বিরাম নেই-নিরেট জনতাও যেন এদের নিরিবিলি বোধটাকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে পারছে না।বাধা পেলে এরা আচমকা বিড়বিড় বকুনি বন্ধ করে দিলেও দ্বিগুণ করে তুলছে অঙ্গ সঞ্চালনকে এবং জোর করে কাষ্ঠহাসি হেসে তাকিয়ে আছে বাধার উৎস মানুষটার দিকে। ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ হয়ে গেলে বাতাসে ঠাঁই ঠাঁই করে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানাচ্ছে ধাক্কা দেনেওলা মানুষগুলোকে এবং হকচকিয়ে যাওয়ার নিষ্ফল প্রয়াসে হাস্যকর করে তুলছে নিজেদের। লক্ষণীয় তেমন কিছুই দেখতে পেলাম না এই দুই শ্রেণীর মানুষগুলোর মধ্যে। সব মিলিয়ে এঁরা উত্তম রুচির নর-নারী। এদের মধ্যে কেউ বনেদী, কেউ কারবারি, কেউ উকিল, কেউ শেয়ার-মার্কেটের দালাল। সমাজের সচ্ছল অঞ্চলেই এদের ঘোরাফেরা এবং ব্যস্ত যে যার নিজের কাজ

নিয়ে। হ্যাঁচকা টানে আমার মনোযোগ কেড়ে নিতে পারল না এরা কেউই।

প্রবহমান জনগণের মধ্যে ক্লার্ক জাতটাকে বড় বেশি করে চোখে পড়ছে। এদের মধ্যে আবার দুটো বড় রকমের ভাগ রয়েছে। চোখ ঝলসানো কোম্পানির জুনিয়ার ক্লার্করা টাইট কোট, ব্রাইট বুট, তেল চকচকে চুল আর অতি সচেতন ঠোঁট নিয়ে অতিরিক্ত আড়ষ্ট। তাচ্ছিল্যের চাহনি বর্ষণ করে যাচ্ছে এরা পাশের লোকেদের দিকে এবং এই থেকেই বুঝে নেওয়া যায় মানুষ জাতটার কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এরা।

জবরদোস্ত কোম্পানির উঁচু কেরানিদের চিনতেও ভুল হচ্ছে না মোটেই। পরনের কালো অথবা বাদামি কোট আর পাতলুন দেখেই তা মালুম হচ্ছে। আরাম করে যাতে বসতে পারে, পাতলুন তৈরী হয়েছে সেই মাপে। ওয়েস্টকোট এরা পরবেই-গলার জড়াবে সাদা মাফলার। পায়ের জুতোর চওড়া মুখ দেখলেই মনে হয় একেবারে নিরেট। পুরু মোজা হাঁটু পর্যন্ত টেনে তোলা। প্রায় প্রত্যেকের মাথাই কেশ-বিরল। ডান কানটা অদ্ভুতভাবে ঠেলে রয়েছে বাইরের দিকে-কলম গুঁজে রাখার পরিণাম। টুপি খুলছে আর পড়ছে দুহাতে। কোটে ঝলমল করছে সোনার চেনে বাঁধা মান্ধাতার আমলের ঘড়ি। আভিজাত্যকে ফুটিয়ে তুলতে চাইছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সব জায়গায়-কিন্তু সসম্ভ্রমে সেই আভিজাত্য তাকিয়ে দেখবার মতো কিনা-সেটা একটা প্রশ্ন।

চটপটে চেহারার যাদের দেখলাম, এক নজরেই বুঝলাম, এরা পকেটমার। বড় শহরেই এরা থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে। দেখলেই বোঝা যায় এদের জীবিকা কি, ভদ্রলোক বলে মনে হয় না মোটেই। কোমরের ওই পুরু বেল্ট আর অতিরিক্ত গায়ে-পড়া স্বভাবটাই তো ধরিয়ে দেয় ওদের মূল সত্তা।

সহজেই চেনা যাচ্ছে জুয়াড়িদেরও। হরেক রকমের পরিচ্ছদ এদের পরনে। কেউ ফিটফাট বাবু সেজে রয়েছে, কেউ নিয়েছে পাদরির বেশ। কিন্তু লুকোতে পারেনি চামড়ার ম্যাটমেটে রঙ, চোখের ছলছলানি এবং ঠোঁটের ম্যাড়মেড়ে ভাব। আরও দু'ধরনের জুয়াড়িদের চিনে নিলাম দুটো লক্ষণ দেখে। এক, কথা বলছে চাপা গলায়, দুই, বুড়ো আঙুলটাকে অন্যান্য আঙুল থেকে নব্বই ডিগ্রি কোণে ঠেলে তুলছে মাঝে মধ্যে-তাস সাফাই করার বদভ্যেস যাবে কোথায়। এছাড়াও দেখলাম দু'রকম প্রবঞ্চক-যারা কথা বেচে লোক ঠকায়। এদের একটা দল নবাব-পুত্তুরের মতো সেজেগুজে থাকে; অপর একটা দল তাল ঠোকে মিলিটারির সাজে।

ওপর মহল থেকে জনতার শ্রেণীবিভাগ করতে করতে এসে পৌঁছোলাম ইহুদি ফেরিওয়ালাদের পর্যায়ে। চাহনি এদের

বাজপাখির মতো হলে কি হবে, আর সব দিক দিয়ে যেন মাটির মানুষ। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। দেখলাম নিদারুণ হতাশায় ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েও রাতের আলোআঁধারিতে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ঘুরছে লড়াকু ভিখিরিরা-ভাগ্যের হাতে মার খেয়েও যেন আর মরতে চায়না কিছুতেই। আয়ু ফুরিয়ে এসেছে জেনেও করুণ চোখে পাঁচজনের কাছে সহানুভূতি প্রার্থনা করে ক্লান্ত শরীরে নিরানন্দ গৃহাভিমুখে যাওয়ার পথেও মস্তানদের টিটকিরি আর গুঁতো খেয়ে চোখে জল এনে ফেলছে শান্তশিষ্ট অল্পবয়সী মেয়েরা। রঙ মেখে গয়না পরে সব বয়সী মেয়েরা এই ফাঁকতালেই পাপের পথে পয়সা রোজগারের ধান্দায় ঘুরছে। ঘুরছে মদ্যপরা-কেউ দীনহীন বেশে, কেউ ছিন্নভিন্ন মূল্যবান বেশে, কারও চোখে কালসিটে, কারও পা টলমলে-সংখ্যায় এরা অগণন-চেহারার বর্ণনা তাই নিষ্প্রয়োজন। এছাড়াও পিলপিল করে যাচ্ছে কুলির দল, কয়লা-শ্রমিকের দঙ্গল, ঝাড়ুদার বাহিনী। যাচ্ছে রাজমিস্ত্রী, বাঁদর খেলুড়ে, অর্গান বাজিয়ে, ব্যালে নাচিয়ে। শান্ত অবসন্ন দেহে দিনের শেষে ঘরে ফিরে চলেছে সব রকমের গতর খাটিয়ের দল। সমস্বরে চেঁচিয়ে মেচিয়ে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে জানলার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে।

দিনের শেষে ঘরের পানে এইভাবেই ধেয়ে চলেছে কাতারে কাতারে মানুষ। গ্যাসের আলো একটু একটু করে উজ্জ্বলতর হচ্ছে অন্ধকারের যবনিকা গাঢ়তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে-সেই সঙ্গে শিষ্ট নাগরিকরা সংখ্যায় কমে গিয়ে জায়গা করে দিচ্ছে অশিষ্টদের। সমাজে পাপ আর পাঁক থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলছে রাতের প্রাণীরা। দেখছি আর ঘনীভূত হচ্ছে আমার আগ্রহ। এ যেন মানুষের মিছিল। চরিত্রের শোভাযাত্রা! নয়নের নিরিখে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে লণ্ডন শহরের সম্পূর্ণ চেহারা!

কৌতূহল নিবিড়তর হয়ে উঠতেই জানলার কাঁচে ললাট ঠেকিয়ে ঝুঁকে বসেছিলাম। আর ঠিক তখনি আমার দৃষ্টিশর আটকে গেছিল বিশেষ একটি মুখের ওপর। এ মুখ যার, তার বয়স পঁয়ষট্টি থেকে সত্তরের মধ্যে। ছন্নছাড়া চেহারায় কি যেন আছে-একবার তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিতে পারলাম না কিছুতেই। উল্টে আমার সত্তাটা যেন নিমেষমধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চাইলো আশ্চর্য মুখের অত্যাশ্চর্য অধিকারীর ওপর। সূচ্যগ্র চাহনিতে সংহত হলো আমার মগজের লক্ষ কোটি কোষের বিপুল তৃষ্ণা-জন অরণ্যের ওই বিচিত্র মানব সম্পর্কে আরও কিছু জানবার তৃষ্ণা।

লোকটার মুখের সৃষ্টিছাড়া বিশেষত্বগুলোই আচমকা অতটা উদগ্রীব করে তুলেছিল আমাকে। বিশেষত্বগুলোকে সঠিক বুঝিয়েও বলতে পারবো না। শুধু বলব যে রক্ত চামড়ার ওই মুখখানায় এমন সব ভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল যাদের তুলনীয় ভাব কোন মানুষের মুখে এর আগে কখনো দেখিনি। সহসা দেখেই মনে হয়েছিল যেন বিখ্যাত সেই শিল্পীর তুলিতে জীবন্ত নরকের পিশাচটা হেঁটে নেমে এসেছে ক্যানভাসের বুক থেকে। কেন এরকম ভাবের স্ফুরণ ঘটলো আমার মনের মাঝারে, তা বিশ্লেষণ করতে যেতেই আচম্বিতে একই সঙ্গে অনেকগুলো ভাবধারা প্রবল প্রপাতের শক্তি নিয়ে হুড়হুড় করে আছড়ে পড়ে ভাসিয়ে দিয়ে গেল আমার সমস্ত বিচার বুদ্ধি-আহাম্মকের মতোই চেয়ে রইলাম ফ্যাল ফ্যাল করে-বিপরীতধর্মী এতগুলো ভাবধারার অকস্মাৎ আস্ফালনে তালগোল পাকিয়ে গেল মাথার মধ্যে। একই সাথে আমার মনের মধ্যে আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগলো প্রচণ্ড মানসিক শক্তি, হুঁশিয়ারি, অক্ষমতা, লোভ, তুহিন-ধৈর্য, বিদ্বেষ, রক্ত-লোলুপতা, বিজয়োল্লাস, উৎকট হর্ষ, অতিরিক্ত আতঙ্ক, এবং নিরতিসীম নৈরাশ্য।এতগুলো উল্টোপাল্টা ধারণা বোধের সংঘাত-হুঙ্কারে চকিতে কেটে গেল আমার অনিমেষ-তন্ময়তা, আমি ভয়ানক চমকে উঠলাম, বিপুল বিস্ময়বোধে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। এক সেকেণ্ডের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মধ্যে আমি যেন প্রত্যক্ষ করলাম অখ্যাতির কুটিল ইতিহাসকে, অধর্মের অন্যায়-পুরাণকে। সিদ্ধান্ত নিলাম সঙ্গে সঙ্গে-কেননা বন্যার তোড়ের মতোই বাসনাটা জাগরিত হয়েছিল মনের মধ্যে সেই মুহূর্তেই। অদ্ভুত এই মুখের অধিকারীকে চোখের আড়াল হতে দেবো না কোন ক্রমেই। যাবো এর পেছন পেছন-জানবো আরও অজানাকে। ঝট করে তুলে নিলাম ওভারকোট, খপ করে বাগিয়ে নিলাম ছড়ি-বেগে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। রাতের অতিথি কিন্তু ততক্ষণে পথের গোড়ে মিলিয়ে গেছে। দ্রুত পা চালালাম সেইদিকে। অচিরেই দেখতে পেলাম তার ত্বরিৎ পাদচারণা। নাগাল ধরে ফেললাম অল্পক্ষণেই। কিন্তু একদম কাছে গেলাম না। একটু তফাতে রইলাম। সে যেন না জানতে পারে, ঠিক সেই ভাবে লঘুচরণে তার পেছনে লেগে রইলাম।

এতক্ষণে খুঁটিয়ে দেখতে পেলাম গোটা চেহারাটাকে। মাথায় সে খুব লম্বা নয়-খাটো-ই বলা চলে। নিদারুণ কৃশকায়। আর আপাতদৃষ্টিতে অতিশয় ক্ষীণজীবি। জামাকাপড় নোংরা আর ছেঁড়াখোঁড়া বটে, কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর ডিজাইনের আর দামি কাপড়ের। ছিন্ন বসনের ফাঁক দিয়ে পলকের জন্যে রাস্তার ল্যাম্পের জোরালো আলোয় ঝলসে উঠলো লুকোনো ছোরা আর হীরে। এই দুটো জিনিস দেখেই আরও উদগ্র হলো আমার

অনুসরণের ইচ্ছে। এ লোক কোথায় যায় দেখতেই হবে।

রাত তখন চেপে বসেছে। আর্দ্র কুয়াশাও ঝাঁপাই জুড়েছে। আচমকা ঝমঝম করে আকাশ ফুঁড়ে নেমে এলো নাছোড়বান্দা বৃষ্টি। একেই বলে সোনায় সোহাগা। ঠাণ্ডায় কাঁপতে লাগলো আমার কঙ্কালের সব কটা হাড়-ঠোকাঠুকি লাগল বত্রিশ পাটি দাঁতে। আবহাওয়ার অকস্মাৎ ডিগবাজি কিন্তু ঝটিতি পালটে দিয়ে গেল জনসমুদ্রের চেহারা। চঞ্চল তো হলোই, সেই সঙ্গে ফটাফট করে খুলে গেল অসংখ্য ছাতা। ধাক্কাধাক্কি, গুঁতোগুঁতি আর গুঞ্জনধ্বনি বৃদ্ধি পেল দশগুণ। ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপলেও কিন্তু ঝমঝমাঝম বৃষ্টি বিলক্ষণ পুলকিত করে তুলল আমাকে। বৃষ্টির গান আর নাচ যে উপভোগ করতে না পারে তাকে মনুষ্যপদবাচ্য বলা যায় না। সদ্য অসুখ থেকে উঠেছি, আবার অসুখে পড়তে হবে জেনেও মেতে উঠলাম বৃষ্টির ছন্দে। শুধু একটা রুমাল বেঁধে নিলাম মুখে। মানুষ-জঙ্গলের আশ্চর্য মানুষের পেছন কিন্তু ছাড়লাম না। ঠেলাঠেলি তখন তুঙ্গে উঠেছে, হুটোপাটি ঠেলে এগোতে বেগ পেতে হচ্ছে বিচিত্র বৃদ্ধকে। আধ ঘণ্টা গেল এইভাবে। এই সময়টা আমি রইলাম লোকটার খুব কাছাকাছি-ভিড়ের মধ্যে ছিটকে গেলে আর তো দেখতে পাবো না। বুড়ো কিন্তু একবারও মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকায়নি-আমাকেও দেখতে পায়নি। বড় রাস্তার ভিড় কাটিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওকে ঢুকতে দেখলাম আড়াআড়ি একটা রাস্তায়-এখানে মানুষ-পঙ্গপাল সেভাবে উথলে উথলে উঠছে না। বুড়োর হাবভাবেও পরিবর্তন এলো তক্ষুণি। এখন হাঁটছে অনেক আস্তে-দ্বিধাগ্রস্ত চরণে-উদ্দেশ্যহীনভাবে। যেন নিছক হেঁটে যাওয়াটাই একমাত্র কাজ-আর কোন লক্ষ্য নেই। এই একখানা রাস্তাতেই সে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত টহল দিয়ে গেল বারংবার-পিপীলিকা শ্রেণীর মতো মানুষগুলোকে যেন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছে না। আমি কিন্তু আরো কাছে কাছে চলেছি পাছে তাকে হারিয়ে ফেলি এই ভয়ে। রাস্তাটা যেমন সরু তেমন দীর্ঘ। ঘণ্টা খানেক গেল এই একটা পথেই নিরর্থক চর্কিপাক দিতে গিয়ে। ভিড় কমে এল শেষের দিকে। আর তখনই তাকে যেতে দেখলাম একটা পার্কের দিকে। চৌকোণা বাগিচা, অনেকগুলো জোর আলোয় দিনের মতই ঝলমল ঝলমল করছে। লোকজনও উপচে পড়ছে ভেতরটায়। তৎক্ষণাৎ ফিরে এলো আগন্তুকের আগেকার আচরণ। থুৎনি ঝুলে পড়ল বুকের ওপর, গ্রন্থিল ভুরু যুগলের তলায় ঘূর্ণ্যমান চোখ দুটি ঘুরতে লাগল আগের মতই। আশপাশ দিয়ে যে সব লোক যাচ্ছে, অথবা গায়ে গা লাগিয়ে ফেলছে, তাদের প্রত্যেকের দিকে পাকানো চোখে শাণিত চাহনি হানছে প্রতিবার। ঠেলে গেলে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে এত ছটফটানি যার, সে কিন্তু পার্কের [illegible] দিয়েও [illegible]

ঢুকলো না। পার্কটাতে চর্কিপাক দিয়ে গেল গুনে গুনে সাতবার। তারপর শুরু হলো যে পথে এগিয়েছে, ঠিক সেই পথেই ফিরে আসা। যাচ্ছে আর আসছে-আসছে আর যাচ্ছে। ভিমরতি ধরলো নাকি ! এইসময়ে একবার তো মুখোমুখিই হয়ে গেছিলাম আমি-হঠাৎ পেছনে ফিরেই সটান চলে এসেছিল আমার সামনে। সাঁৎ করে আমিও সরে গেছিলাম একপাশে।

এই রকমভাবে একই পথে ভিড় ঠেলাঠেলি করে মাকুর মতো আসা-যাওয়া করে কাটলো আরও একটা ঘণ্টা। বৃষ্টি আরো জোরে পড়ছে-বাতাসে শৈত্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে-পথের জনসমাগম কিন্তু ফিকে হয়ে এসেছে। এবার তাদের বাড়ি ফেরার পালা। তাই দেখে নিবিড় নৈরাশ্য যেন ফেটে পড়লো বৃদ্ধ আগন্তুকের অস্থির অঙ্গ সঞ্চালনের মধ্যে। ঝটকান মেরে ঢুকে গেল পাশের একটা রাস্তায়-প্রায় জনবিরল বললেই চলে। সিকি মাইলটাক পথ হনহন করে এত বেগে হেঁটে গেল যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম আমি। এই বয়সে এত বেগে কেউ পা চালাতে পারে ? হিমসিম খেয়ে গেলাম তাকে দৃষ্টিসীমার মধ্যে রাখতে গিয়ে। তারপরেই সামনে পড়লো একটা বাজার। গমগম করছে লোকজনের ভিড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আগেকার আচরণ ফিরে এলো বৃদ্ধের মধ্যে। বাজারটা তার খুব চেনাজানা বলেও মনে হলো। ক্রেতা আর বিক্রেতাদের গুঁতো মেরে যেতে যেতে আগের মতই চোখ ঘুরিয়ে চোখ পাকিয়ে তাকাতে লাগলো প্রত্যেকের দিকে-আগের মতই গুটিয়ে মুটিয়ে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে রইলো ভুরুজোড়া।

দেড় ঘণ্টার মতো সময় গেল এই বাজারেই। খুবই হুঁশিয়ার থাকতে হয়েছে আমাকে এই সময়ে। ভাগ্যিস পায়ে প.ড়ছিলাম এমন জুতো যা পরে হনহন করে হেঁটে গেলেও শব্দ হয় না একেবারে। এই সব [illegible]রণেই সে বুঝতেই পারেনি যে আঠার মতন পেছনে লেগে রয়েছি আমি। তার পেছন পেছন ঢুকলাম প্রতিটা দোকানে। গাদাগাদির মধ্য দিয়ে সে দেখে গেল সমস্ত পণ্যবস্তু-কিন্তু দরদাম করলো না কখনোই-কেনা তো দূরের [illegible]। ঘুরন্ত দুই চোখের মধ্যে নিরন্তরের বিস্ময় হয়ে জেগে [illegible]ইল তার সেই শূন্য শূন্য চাহনি। এই সব দেখেই পণ [illegible]রলাম-এ লোকের পেছন ছাড়া চলবে না কিছুতেই-শেষ পর্যন্ত দেখবো, তবে ছাড়বো। ঢং ঢং করে একটা মস্ত ঘড়িতে এগারোটা [illegible]জতেই লোকজন ঝটপট পা চালিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল বাজার থেকে। একজন দোকানদার ঝাঁপ টেনে দেওয়ার আগে ঠেলে বের করে দিল বৃদ্ধকে। আর তাইতেই যেন তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত বয়ে গেল শিহরণের পর শিহরণ। ভয়ানকভাবে কাঁপতে কাঁপতে ঠিকরে বেরিয়ে এলো রাস্তায়, উদ্বেগঘন চোখে তাকিয়ে নিল আশেপাশে, পরক্ষণেই অবিশ্বাস্য

গতিবেগে কুটিল সর্পিল অজস্র গলি পেরিয়ে ধাঁ করে এসে হাজির হলো আগের রাস্তায়-ডি-হোটেলের সামনে। এ অঞ্চল নিঝুম নয় মোটেই। পথঘাট ঝলমল করছে জোরালো আলোয়। বৃষ্টি পড়ছে অবশ্য তেড়েফুঁড়ে। লোকজনের ভিড় কিন্তু তেমন নয়। দেখে ছাই-এর মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল আগন্তুকের মুখখানা। আচ্ছন্নভাবে কয়েক পা হেঁটে গেল বটে, কিন্তু ঘণ্টাখানেক আগের সেই ভিড়ভাট্টা না পেয়ে যেন মিইয়ে গেল বিলক্ষণ। পাঁজরা-খালি করা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মোড় নিয়ে ঢুকে গেল সরু গলিতে। এ গলি সটান গেছে নদীর দিকে। লোকটা কিন্তু গলির গলি তস্য গলি ঘুরে ঘুরে আচমকা পৌঁছে গেল একটা থিয়েটারের সামনে। শো ভেঙেছে সবেমাত্র। পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে প্রমোদ-তৃপ্ত মানুষ। যেন ধরে প্রাণ ফিরে এলো আশ্চর্য আগন্তুকের। খাবি খাচ্ছিল এতক্ষণ-এখন স্বস্তির নিঃশেষ ফেলে মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে। ঠেলাঠেলির মধ্যে পড়ে যেতেই অশান্তির চিহ্ন মুছে গেল মুখ থেকে। নৈরাশ্যের মেঘ কেটে গেল উঠে এলো আশার আলো। আর্তীব্র মনোবেদনায় এতক্ষণ ছটফট করছিল-এখন তার ছায়াটিকুও দেখা গেল না চোখে মুখে। বুকের ওপর থুৎনি ঠেকিয়ে আবার চনমনে চোখে তাকাচ্ছে আশপাশের প্রত্যেকের দিকে। বেশি লোক যেদিকে চলেছে, নিজেকে ভিড়িয়ে দিয়েছে সেই দলে। লোকটার উলটোপালটা কাণ্ডকারখানার মাথামুণ্ড কিস্সু বুঝতে না পেরে বেদম বোকা বনে গিয়ে আমিও পাগলের মতো ছুটলাম তার পেছন পেছন।

থিয়েটার দেখে কেউ আর পথে পথে ঘোরে না-যে যার বাড়ির পথ ধরেছে। ভিড়ও পাতলা হয়ে আসছে। দেখতে দেখতে জনা দশ বারো লোকের মধ্যে মিশে রইল বৃদ্ধ। একে একে লোক খসে যেতে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো মাত্র তিন জনে। একটা ঘুপসি গলির মধ্যে গিয়ে এই তিনজন থেকেও লোক কমে যাওয়া শুরু হতেই থমকে দাঁড়ালো। আশ্চর্য আগন্তুক ক্ষণেকের জন্যে কী যেন ভেবে নিল মনে মনে। পর মুহূর্তেই বিষম উত্তেজনায় ফেটে পড়ে ঝড়ের বেগে একটার পর একটা গলি পেরিয়ে গিয়ে পৌঁছে গেল শহরের একদম উপকণ্ঠে। লণ্ডনের সব চাইতে কুৎসিত অঞ্চল বলতে বোঝায় এই জায়গাটাকেই। এখানে আছে নগ্নতম দারিদ্র্য, জঘন্যতম অপরাধ। হঠাৎই একটা ম্যাড়মেড়ে লণ্ঠন পড়লো পথের ধারে। তারই আলোয় দেখতে পেলাম সেকেলে ধাঁচের, পোকায় খাওয়া কাঠের পড়ো-পড়ো কুঁড়েঘর এলোমেলোভাবে খেয়ালখুশির ছন্দে নির্মিত হয়েছিল যত্রতত্র-ভেঙেও পড়ছে অনাদরে অযত্নে। মাঝখান দিয়ে সরু পথটাকে দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। পথের পাথর খুলে এসে উঁচু হয়ে রয়েছে বিপজ্জনকভাবে-খাঁজে খোঁদলে সবুজ শ্যাওলা আর

ঘাসের দৌরাত্ম্য। খোলা ড্রেনে পচা পাঁকের বিকট দুর্গন্ধ। খাঁ-খাঁ করছে চারিদিক। এরই মধ্যে দিয়েই তেড়েমেড়ে এগিয়ে চলেছে আশ্চর্য আগন্তুক। অচিরেই কানে ভেসে এলো অভুক্ত মানুষের চেঁচামেচি। দেখতেও পেলাম তাদের। শহরের সব চাইতে পাপী আর কুখ্যাত মানুষ তারা। সমাজ পরিত্যক্তদের সমাজ-ছাড়া আস্তানায় এসে পড়েছি অবশেষে। বৃদ্ধের অন্তর আবার উল্লসিত হয়ে উঠলো এই পরিবেশে আসতেই। মরতে মরতেও যেন বেঁচে উঠলো মানুষটা। চোখে মুখে দেখা গেল আবার সেই অননুকরণীয় অভিব্যক্তি। আবার সেই বিচিত্র আশার ব্যঞ্জনা। কোণ ঘুরতেই এক ঝলক আলো এসে পড়লো আমাদের দুজনের ওপরেই। দাঁড়িয়ে গেলাম। সচমকে দেখলাম, থ হয়ে গেছি শহরতলির কুখ্যাত সেই ভজনালয়ের সামনে-যার বেদিতে নিয়মিত উপচার নিবেদন করা হয় খোদ পিশাচকে।

ভোরের আলো ফুটতে চলেছে তখন। পিশাচ প্রকৃতির জনা কয়েক ব্যক্তি তখনও আনাগোনা করছে নিশীথ অপদেবতার মন্দির তোরণ পথে। অস্ফুট একটা হর্ষধ্বনি নিঃসৃত হলো আগন্তুকের কণ্ঠ থেকে। সিৎকারধ্বনিবললেই সঠিক হয়। তরিৎ বেগে মিশে গেল মুষ্টিমেয় ওই পৈশাচিক আকৃতিগুলোর ভিড়ে এবং ক্রমান্বয়ে আসা যাওয়া করে গেল ব্যাদিত তোরণের তলা দিয়ে! চোখে মুখে আবার দেখলাম সেই বন্য, শূন্য চাহনি। বারে বারে ফিরে চাওয়ার মধ্যে সেই একই আকুল আকাঙ্ক্ষার মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ! অপার্থিব সেই ভাবলহরীকে পার্থিব ভাষায় পরিস্ফুট করার যোগ্যতা আমার নেই। এইভাবেই উল্লোল হৃদয়ে উন্মাদের মতোই একবার এদিক একবার সেদিক করে গেল সে বেশ কিছুক্ষণ-তারপরেই প্রবেশ পথের সামনে অকস্মাৎ ছুটোপাটি দেখে বুঝলাম রাতের মন্দিরে তালা ঝুলতে চলেছে এবার। আর ঠিক তখনি নিবিড়তম নৈরাশ্যের চাইতেও অব্যক্ত বেদনার ঝলক দেখলাম আগন্তুকের মুখের পরতে পরতে। পাদচারণায় বিরতি দিল না কিন্তু এক লহমার জন্যেও-চকিতে ঘুরে গিয়ে উন্মত্ত ক্ষিপ্রতায় ধেয়ে গেল বিপুল লণ্ডন শহরের স্পন্দিত হৃৎপিণ্ডের দিকে। পলাতকের পেছন পেছন আমিও ছুটলাম বিমূঢ়ের মতন। সূর্য যখন উঁকি মেরেছে পুব দিগন্তে, ঠিক তখনই পৌঁছে গেলাম ডি-হোটেলের সামনে। আগের সন্ধের মতো জনসমুদ্র তখনও আবির্ভূতহয়নিসেখানে-তবে লোকজনের ভিড় বাড়ছে একটু একটু করে। আর ঠিক এই খানেই মাথার মধ্যে তুমুল বিপর্যয় শুরু হয়ে যাওয়ায় থমকে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। আমি দাঁড়িয়ে গেলেও আগন্তুক কিন্তু বিরতি দিল না তার পদযুগলকে। আগের দিনের মতোই ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো পথে পথে লোকজনকে ঠেলে ঠেলে আর প্রত্যেকের পানে বন্য, শূন্য চাহনি নিক্ষেপ করে করে।

দিন গড়িয়ে সন্ধে ঘনালো-কিন্তু শান্ত হলো না চরণ যুগল। তবে অবসন্ন হলাম আমি। আচমকা পথরোধ করে দাঁড়ালাম। চোখে চোখে তাকালাম। সে কিন্তু আমাকে ফুঁড়ে তাকিয়ে রইল অনেক দূরে। তখনই বুঝলাম, এ লোকের পিছু ধরে কোনোদিনই জানতে পারবো না তার ইতিবৃত্ত, তার রহস্য কাহিনী, তার গুপ্ত কথা। সে যখন আমার পাশ কাটিয়ে হনহনিয়ে চলে গেল লোকজনকে ঠেলতে ঠেলতে, আমি তখন তার পেছন পানে তাকিয়ে মনে মনে বললাম-''চিনেছি তোমাকে চিনেছি। তুমিই এই শহরের পাপাত্মা। জনঅরণ্যের ভবঘুরে অপরাধ। একলা থাকতে চাও না-ভিড়ে মিশে গিয়ে অপরাধকে সঞ্চার করে দিতে চাও। কিছু গ্রন্থের অন্দরে প্রবেশ করা যেমন সমীচীন নয়, ঠিক তেমনি কিছু মানবের ঠিকুজি কোষ্ঠী জানতে না চাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। ঢের হয়েছে, আর না। হে নরকের মত দুরাত্মা-তোমাকে নমস্কার।'
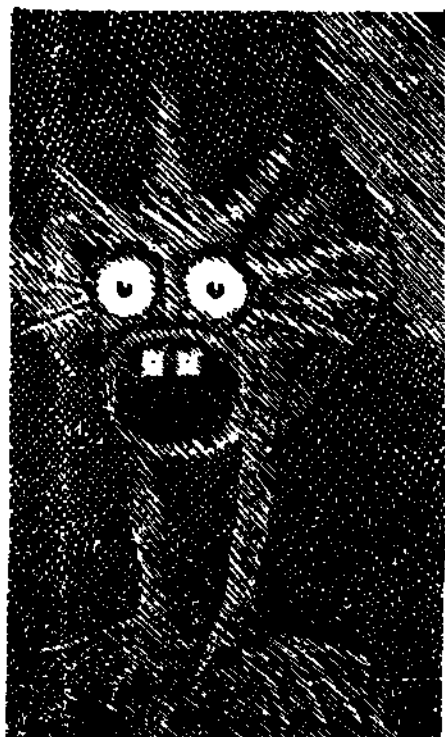
মড়ক রাজা

(কিঙ পেস্ট)

অক্টোবর মাস। রাত বারোটা। লণ্ডন শহরের একটা নোংরা মদের আড্ডায় দেখা গেল এই কাহিনীর দুই নায়ককে। পেশায় তারা খালাসি। পালতোলা জাহাজে গতর খাটিয়ে খায়। জাহাজ ভিড়েছে নদীর পাড়ে। ওরা এসেছে মদ খেতে।

যাদের সঙ্গে মদ গিলছে, তাদের প্রত্যেকের চেহারা দেখবার মতো। আঁতকে উঠতে হয়। কিন্তু এই দুজন টেক্কা দিতে পারে সব্বাইকে।

এদের একজনের নাম লেগস। দুজনের মধ্যে এর বয়স একটু বেশি। লম্বা ঠ্যাং-এর জন্যেই লোকটা নিজেও খুব লম্বা। একটু বেশি রকমের লম্বা, সাড়ে ছ'ফুট তো বটেই। বেধড়ক ঢ্যাঙা বলেই ঝুঁকে চলার অভ্যাস। তাকে চলমান সুপুরি গাছ বললেই চলে। মাথায় লম্বা, অথচ গায়ে গতরে শুকনো। এত রোগা মানুষ চট করে চোখে পড়ে না। কিন্তু পেশী গুলো লোহার মতো শক্ত। গায়ে অসুরের জোর, গালের হাড় তেকোণাভাবে উঁচু, লম্বা চোখা ন্যাকটা যেন বাজপাখীর কাছ থেকে ধার নেওয়া, থুতনি ঠেলে বেরিয়ে না এসে ঢুকে বসে রয়েছে ভেতর দিকে। তলার চোয়ালখানা ঝুলেই রয়েছে অষ্টপ্রহর, বড় বড় সাদা চোখ জোড়া ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর থেকে। গোটা মুখখানায় এমন একটা বেপরোয়া ছাপ যা দেখলেই বুদ্ধিমান

ব্যক্তিরা হুঁশিয়ার হয়, এক পলকেই বুঝে নেয়—এ মানুষ দুনিয়াকে তোয়াক্কা করে না।

বয়সে ছোট খালাসি সব দিক দিয়েই তার সঙ্গীর ঠিক উল্টো। মাথায় সে চার ফুটের বেশি নয় কোনোমতেই। বেঁটে, গোদা ধনুকের মতোই বেঁকানো পা দুখানা কষ্টেসৃষ্টে ঠেকা দিয়ে রেখেছে-বেমাপের বেয়াড়া বপুটাকে। অস্বাভাবিক রকমের খাটো আর মোটা বাহু দুটোকে অনায়াসেই দুখানা গদার সঙ্গে তুলনা করা চলে। মুঠো দুটোকে বলা যায় দুখানা লোহার হাতুড়ি। সামুদ্রিক কচ্ছপের পাখনার মতো সে ভয়ঙ্কর দর্শন এই মুঠো দুটোকে দুপাশে দুলিয়ে দুলিয়ে হেঁটে যায় যখন, তখন ডাকাবুকো মানুষদেরও বুক কাঁপতে থাকে ধড়াস ধড়াস করে। কুতকুতে চোখ দুটোয় কোনো বিশেষ রঙ নেই—কিন্তু মাথার একদম ভেতর থেকে চিকমিক চিকমিক করে চলেছে সর্বক্ষণ। মুখখানা তার গোলগাল, মাংসের ছোট্ট পাহাড় বললেই চলে এবং বেগুনি রঙের। মাংস থলথলে এহেন মুখাবয়বে নাকখানা নিজেকে কোথায় যে লুকিয়ে বসে রয়েছে, তা চট করে খুঁজে পাওয়া যায় না। ওপরের ঠোঁট যত মোটা, তার চাইতেও ঢের বেশি মোটা নীচের ঠোঁট। নীচের ধ্যাবড়া মোটা ঠোঁটের ওপর ওপরের বিচ্ছিরি মোটা ঠোঁটখানা চেপে বসে থাকে সবসময়ে এবং যখন তখন দুটো ঠোঁটকেই জিভ দিয়ে চেটে নেওয়া তার একটা মুদ্রা দোষ। যেন বড়ই তৃপ্ত সে-জীবনে উচ্চতর আকাঙক্ষা আর কিছু নেই। ঢ্যাঙা সঙ্গীকে সে সমীহ করে। কুতকুতে দুই চোখে বিলক্ষণ বিস্ময় আর হেঁয়ালি জমিয়ে এমন ভাবে দৃকপাত করে তাল ঢ্যাঙা স্যাঙাতের পানে যেন অস্তাচলের সূর্য রক্তরাঙা চক্ষু মেলে নিরীক্ষণ করে চলেছে এবড়ো খেবড়ো পর্বতের দুর্বোধ্যতাকে। এর নাম টারপোলিন।

রাত গভীর হতে না হতেই বেশ কয়েকটা মদের আড্ডায় ঢুকে পকেট ফতুর করে এনেছে দুজনে এবং প্রতিটি জায়গাতেই চাঞ্চল্যকর হল্লাবাজির পর এসেছে এই আড্ডায়। দুজনেরই পকেট এখন গড়ের মাঠ।

ঘরের ঠিক মাঝখানে রাখা একটা ওক কাঠের টেবিলের ওপর কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে মুখোমুখি বসে আছে দুই মক্কেল। বিচিত্র এই ইতিহাস শুরু হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই।

ওদের ঠিক সামনেই রয়েছে একটা বিশাল 'ফ্ল্যাগন' অর্থাৎ মদ পরিবেশনের সরু-গলা পাত্র। তার ঠিক পেছনেই দরজার গায়ে খড়ি দিয়ে লেখা রয়েছে শুধু দুটি শব্দ : ধার নেই।

দুই চোখে অপরিসীম বিতৃষ্ণা জমিয়ে লেগস আর টারপোলিন চেয়ে রয়েছে শব্দ দুটোর দিকে।

সব হরফই নাকি এক-একটা ছবি এবং শোনা যায়

পিশাচ-গুরুরা এই ছবি অক্ষরের গূঢ় রহস্য বোঝার বিদ্যে জানে। লেগস আর টারপোলিন পৈশাচিক শাস্ত্রে রপ্ত নয়। তবে খড়ি দিয়ে শব্দ দুটো যেভাবে হেলিয়ে হেলিয়ে লেখা রয়েছে, তা দেখে ওদের মনে হচ্ছে ঝড়ের মুখে জাহাজ যেন গোঁৎ মেরে মেরে চলেছে।

লেগস তো বিড় বিড় করে বলেই ফেললো–'বাঁধো পাল, ধরো হাল-বাতাসকে সামাল!'

এই বলেই পাত্রের বাকি মদটুকু চোঁ করে মেরে দিয়ে প্যাণ্টের পা গুটিয়ে নিলো দুই দোস্ত এবং ছিটকে গেল রাস্তার দিকে। দরজা মনে করে ফায়ার প্লেসের সামনে ঠোক্কর খেয়ে বার দুয়েক মেঝের ওপর গড়িয়ে গিয়ে আবার লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো টারপোলিন এবং পলকের মধ্যে দুজনেই হাওয়া হয়ে গেল আড্ডখানার বাইরে।

রাত তখন সাড়ে বারোটা। ভাঁটিখানার মালিক পাঁই পাঁই করে ছুটেছে দুই পলাতকের পেছন পেছন অলিগলির অন্ধকার ঠেলে ঠেলে এবং ফুর্তিতে ডগমগ দুই দোস্ত তার অনেক আগেই উর্দ্ধশ্বাসে ধেয়ে চলেছে আরও চনমনে বদমায়েসি ফিকিরে।

ঘটনাবহুল এই কাহিনীর আগে এবং পরে গোটা ইংল্যাণ্ড শিউরে উঠতো প্লেগ মহামারীর নাম শুনলেই। বিশেষ করে লণ্ডন শহরের আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই করাল মড়ক। লোকজনও কমে এসেছিল। টেমস নদীর দুপাশে নাকি নোংরা সিপাট্টা গেড়ে বসে গিয়েছিল রোগের রাজা প্লেগ তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে। সেখানকার ঘুপসি গলিঘুঁজির আঁধারে সর্বক্ষণ বিরাজ করতো বিভীষিকার হাওয়া। দানো-ব্যাধির সদর দপ্তর যে সেখানেই।

দেশের রাজার হুকুমে এ অঞ্চলে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ হয়ে গেছে। রাস্তায় ঢোকবার মুখগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চোর-বাবাজিদের তাতে বয়ে গেছে। রাজার হুকুম, পথের বাধা আর রোগের ভয় তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। রাতের অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় তারা এখানে ঢোকে। পাতাল-ঘর থেকে দামি-দামি মদ লুঠ করে। খালি বাড়ির লোহা, তামা, সিসের জিনিসপত্র লোপাট করে দেয়। ভয়-কাতুরে মানুষগুলো কেউ কেউ অবশ্য বলে, রক্ত মাংসের জীবেদের কম্মো নয় এইভাবে চুরি চামারি করা। অদৃশ্যলোকের ভয়ঙ্কররাই নাকি খালি বাড়িগুলোয় নরক-গুলজার করে তুলেছে। এদের কেউ মড়ক-অপদেবতা, কেউ প্লেগ-প্রেত, কেউ জ্বর-দানো। বজ্জাতের ধাড়ি এক-একটা উপদেবতা। রক্ত জল করা সেই সব গল্প শুনলে ডাকাবুকোরা থমকে যায়–সাধারণ মানুষ আঁতকে ওঠে। নিষিদ্ধ অঞ্চলে ভয়ানক বাড়ি ঘরগুলো সম্বন্ধে গা-ছমছমে কল্পনাকে মাথার মধ্যে ঠাঁই দেয়, ফলে, পুরো তল্লাটে অষ্টপ্রহর বিরাজ

করে দম-আটকানো নৈঃশব্দ্য।

এহেন নিস্তব্ধ মহলেই বাধাবন্ধ টপকে ঝড়ের বেগে ঢুকে গেল এই কাহিনীর দুই নায়ক। পিছু ফেরার পথ তো বন্ধ-রে রে করে তেড়ে আসছে ভাঁটিখানার মালিক জনাকয়েক চ্যালাচামুণ্ডা সমেত। তাই চোখের পলকে তক্তা আর বাক্সর বেড়া টপকে বেঁটে আর ঢ্যাঙা দুই দোস্ত লাফিয়ে নেমে গেল মৃত্যু মহলের অন্দরে-এবং কসরতের ব্যায়াম আর সুরার নেশার যুগল ধাক্কায় বেহেড অবস্থায় বিকট বেসুরো হাঁকডাকে কাঁপিয়ে তুললো থমথমে মড়ক-পুরীকে।

মত্ত অবস্থায় না থাকলে, এদের ছুটন্ত বপুর ঘূরন্ত পাগুলো নিশ্চয় থমকে যেতো পথের দুধারে লোমহর্ষক দৃশ্য দেখে। এখানকার বাতাস শুধু ঠাণ্ডা কনকনে নয়-কুয়াশায় স্যাঁতসেঁতেও বটে। রাস্তার পাথর আলগা হয়ে গিয়ে নড়বড় করছে চারপাশে গজানো ঘাসের ওপর এবং পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গিয়ে সরে যাচ্ছে, অথবা দুলে উঠে ছিটকে উঠছে। পড়ো পড়ো বাড়িগুলোর খানকয়েক একেবারেই পড়ে গেছে এবং রাস্তা জুড়ে ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে অসহ্য বদ গন্ধ ছড়াচ্ছে। বিষাক্ত দুর্গন্ধ প্রাণপাখিকে কলজের বাইরে যখন টেনে আনতে চাইছে-ঠিক তখনি চোখে পড়ছে প্রেতলোকের অবর্ণনীয় আলোকচ্ছটার মতো এক ধরনের নীলাভ দ্যুতি-যা মধ্য রাতেও বিচ্ছুরিত হয় বাষ্পঘন আর জীবাণু-কলুষিত আবহাওয়া থেকে। অলিগলি, জানলা বিহীন বসত বাড়ি আর নিশাচর লুঠেরাদের বিগতপ্রাণ শবদেহ থেকে নির্গত হচ্ছে এই হাৎপিণ্ড-কাঁপানো প্রভা। রাতের অন্ধকারে লুঠতরাজের অভিলাষে যারা হানা দিয়েছিল মর্ত্যধামের এই যমলোকে-মড়া হয়ে গিয়ে আজ তারাই গড়াগড়ি খাচ্ছে পথের দুধারে।

দুঃসাহসী এই দুই নাবিক অবশ্য এ দৃশ্য ঠাহর করলেও থমকে দাঁড়াতো না কক্ষনো। দুর্জয় সাহস আর দুরন্ত মদিরা উত্তাল করে তুলেছিল দুই মূর্তিমানকে। ক্ষ্যাপা জানোয়ারের মতো তাই ধেয়ে গেল আতঙ্ক-মহলের আরও অন্দরে। লেগস-এর কর্কশ কণ্ঠের বিকট নিনাদে খান খান হয়ে গেল টুঁটি টেপা নৈঃশব্দ্য এবং হাড়হিম করা এ হেন শব্দতরঙ্গ ছাপিয়ে উঠলো বেঁটে টারপোলিন-এর গর্দভ রাগিনী যে গানের মাথা নেই, মুণ্ডু নেই-আছে কেবল হেঁড়ে গলার জঘন্য গিটকিরি।

মড়ক-মহলের মূল ঘাঁটিতে দুজনে পৌঁছে গেছে ততক্ষণে। রাস্তা ক্রমশ সরু আর জটিল হয়ে আসছে-পদে পদে হোঁচট খাওয়া সামলাতে হচ্ছে। দুই খ্যাটকেলের গলাবাজিতে গমগম করছে শব্দহীন অঞ্চল। দুপাশের বিশাল ইমারতগুলোর ঝুলে পড়া কড়িকাঠ আর বিশাল বিশাল পাথরগুলো যে কোন মুহূর্তে দমাদম শব্দে খসে পড়ে যাবে মনে হচ্ছে শব্দ জগতের এই

বিস্ফোরক আলোড়নের ফলে। দুজনকেই রাবিশ টপকে যেতে হচ্ছে ঘন ঘন-দু হাতে ঠেলে সরাতে হচ্ছে পথের বাধা-তখন কখনো হাতে ঠেকছে নরকঙ্কাল, অথবা থসথসে মাংসল মড়া।

আচমকা দুই মূর্তিমানের নাক ঢুকে যাওয়ার উপক্রম হলো বেধড়ক লম্বা আর বদখৎ চেহারার একটা অট্টালিকার তোরণ পথে। তাই একটু বেশি জোরেই চেঁচিয়ে উঠেছিল লেগস-এতক্ষণের গলাবাজি সে তুলনায় কিছুই নয়।স্বাভাবিক অবস্থায় এহেন মাথার চুল খাড়া করা আর্তনাদ লেগস-এর গলা দিয়ে বেরত না কিছুতেই।

প্রত্যুত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে ঠিকরে এলো বিরস-বদন অট্টালিকার অভ্যন্তর থেকে। রৌরব-নরকের অট্টরোলে মুখর সেই প্রত্যুত্তর। খল-খল হাসি আর পৈশাচিক হুঙ্কারের পর হুঙ্কার। এহেন জায়গায় এ-হেন সময়ে এ-ধরনের অট্টরোল যে কোন দুর্মদ ব্যক্তির রক্ত জমিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু মাতাল এই দুই খালাসির রক্তে যেন দাবানল লকলকিয়ে উঠলো শব্দ পরম্পরাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে। সিধে ধেয়ে গেল দরজার দিকে, প্রচণ্ড ধাক্কায় দড়াম করে খুলে ফেললো দুই পাল্লা এবং টলায়মান অবস্থায় দুই কণ্ঠে গালিগালাজের মুষল বৃষ্টি ঝরিয়ে এসে দাঁড়ালো বিচিত্র এক পরিবেশে।

ওরা এখন দাঁড়িয়ে আছে একটা দোকান ঘরের মধ্যে। এক কোণে রয়েছে একটা পাটাতন দরজা-পাল্লা টেনে তোলা রয়েছে ওপর দিকে। ভেতর তেকে ভেসে আসছে বোতল ফাটার শব্দ। একটু উঁকি দিলেই দেখা যায়, পাতাল ঘরে সারি সারি র‍্যাক আর বাক্সে শোভা পাচ্ছে অগুন্তি মদের বোতল।

ঘরের ঠিক মাঝের বড় টেবিলটার ওপর এলোমেলোভাবে গড়াগড়ি খাচ্ছে মদ খাওয়ার অদ্ভুত দর্শনের অজস্র সরঞ্জাম। বিচিত্র কারুকাজ তাদের সর্বাঙ্গে। ইয়ত্তা নেই মদের বোতলেরও। টেবিল ঘিরে বসে ছয় ব্যক্তি। একে একে প্রত্যেকের বর্ণনা দেওয়া যাক।

দরজার দিকে মুখ করে বসে যে লোকটা, সে অন্য পাঁচজনের চেয়ে একটু উঁচু চেয়ারেই আসীন। যেন, ছোট্ট এই জমায়েতের সভাপতি সে। অতীব দীর্ঘ এবং অতিশয় কৃশ তার বপু। লেগস-এর চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল এত রোগা আর এত ঢ্যাঙা পুরুষ দেখে। ওর ধারণা ছিল, পৃথিবীতে ওর চাইতে হাড়গিলগিলে মানুষ আর নেই। লোকটার গাঢ় পীতবর্ণ মুখ জাফরান-রঙকেও হার মানায়। গোটা মুখাবয়বের একটা বৈশিষ্ট্য এমনই সৃষ্টিছাড়া যে তার সামান্য বর্ণনা দেওয়া দরকার। কপাল বটে একখানা। একতাল মাংস কার্নিশের মতন করে সাজানো। কপাল জুড়ে, চিপি কপাল থাকে

অনেকেরই-কিন্তু এরকম একখানা বিদিকিচ্ছিরি, কদাকার আর অস্বাভাবিক কপাল যে কল্পনাও করা যায় না। থসথসে মাংসের মুকুট বললেই চলে সেই মাংসের ছোট্ট পাহাড়কে।

এই গেল তার আহামরি কপালের বর্ণনা। এবার আসা যাক তার মুখের চেহারায়।

মুখ বিবরের চামড়া তালগোল পাকিয়ে গুটিয়ে মুটিয়ে এমনই এক কুৎসিত রূপ নিয়েছে যে আচমকা দেখলে গা কিরকম করে উঠে। অথচ এহেন মুখ বিবর ঘিরে ভাসছে আদেখলা অমায়িক হাসি-গা-পিত্তি জ্বলে যায়! সেই সঙ্গে একটু গা ছমছমও করে, কেননা, হাসিটার আড়ালে-আবডালে ভাঁজ খাওয়া চামড়ার অন্দরে-কন্দরে প্রচ্ছন্ন অমানুষিক পৈশাচিকতাকেই যেন ঢেকে রাখার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে কাষ্ঠ হাসির এই মুখোশ!

তার চোখ? টেবিলে যে-কজন বসে রয়েছে-সব্বার চোখের মতই তারও চোখ কাচের মতো ঝকঝকে হয়ে রয়েছে নেশার অগ্নিশিখায়।

কালো ভেলভেটের আলখাল্লা টাইট করে জড়ানো তার সারা গায়ে স্পেনিয় কায়দায়। মাথায় গোঁজা একগুচ্ছ পালক-যে ধরনের পালক শোভা পায় শবাচ্ছাদনে। মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে পালকগুলোকে দুলিয়ে যাচ্ছে বিদঘুটেভাবে এবং ডান হাতে ধরা ইয়া লম্বা একটা মানুষের উরুর হাড় ঠুকে ঠুকে হুকুম করছে সঙ্গীদের এক্ষুনি একটা গগনভেদী গান শুরু করার জন্যে।

তার মুখোমুখি টেবিলের এদিকে বসে রয়েছে যে ভদ্র মহিলা-তার পিঠ ফেরানো রয়েছে দরজার দিকে। কিম্ভূতকিমাকার ঢ্যাঙা লোকটার চাইতে কোনো অংশেই সে কম অস্বাভাবিক নয়। একই রকম তালঢ্যাঙা-তবে হাড় গিলগিলে বলা যায় না কোনমতেই। শোথ রোগের চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে নিশ্চয়-জল চপ চপ্ করচে সারা শরীরে। বিয়ার রাখার পেল্লায় পিপের মতোই তার আকৃতি-ঘরের কোণেই রয়েছে এই রকম একটা পিপে। মুখাবয়ব তার অতিশয় গোল, টকটকে লাল এবং মাংস থসথসে। সভাপতি মশায়ের সারা মুখের একটা বৈশিষ্ট্যই যেমন নজর কাড়ে সবার আগে-এই ভদ্রমহিলার সক্রিয়তাও প্রকট হয়ে উঠেছে বিশেষ একটি প্রত্যঙ্গের অস্বাভাবিকতায়। এক কথায় টেবিলে যারা বসে-তাদের প্রত্যেকের রয়েছে একটা না একটা বৈশিষ্ট্য-ব্যাপারটা চট করে লক্ষ্য করে নিয়েছিল মত্ত টারপোলিন ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

এই ভদ্রমহিলাযর ক্ষেত্রে বিকট এই বৈশিষ্ট্য ক্যাট ক্যাট করছে তার মুখবিবরে। ডান কান থেকে শুরু হয়েছে মুখের হাঁ-শেষ হয়েছে বাঁ কানে। অথবা বলা যায়, যেন একটা নিতল খাদ মুখব্যাদান করে রয়েছে ডান কান থেকে বাঁ কান পর্যন্ত। কানের লতি দুটোয় ঝোলানো দুল জোড়া মুহুর্মুহু প্রবেশ করছে পিলে

চমকানো এই হাঁ -এর মধ্যে। মুখ বিবর বন্ধ করে রাখার প্রয়াসে অবশ্য ত্রুটি নেই ভদ্রমহিলার-নিরন্তর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে মুখটা হাঁ না করে এবং হাঁ-এর মধ্যে দুল ঢুকে না যায়।

পরনে তার কড়া মাড় দেওয়া জামা। কলারটা সদ্য ইস্ত্রি করার ফলে খাড়া হয়ে থুতনিকে তুলে রেখে দিয়েছে ওপর দিকে। তা সত্ত্বেও হাঁ-এর আবির্ভাব ঘটছে ঘন ঘন এবং টুস টুস করে দুল জোড়া ঢুকে যাচ্ছে মুখের মধ্যে। ফলে, গাম্ভীরি চালে থাকার বিরামবিহীন চেষ্টাগুলো নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে।

জল ভর্তি এই বিপুলা মহিলার ঠিক ডান পাশে পুঁচকে চেহারার অল্প বয়সের একটি মেয়ে। ছোট্ট বলেই বোধহয় তার দিকে অশেষ কৃপা এবং অনুগ্রহ বর্ষণ করে যাচ্ছে শোথ রোগাক্রান্ত মহিলা। মেয়েটির কাঠির মতো সরু সরু আঙুল কাঁপছে থির থির করে, ছ্যাতলা মুখে রঙের আভা নেই বললেই চলে এবং পলক দর্শনেই মালুম হয় শরীরে তার পুষ্টি নেই একেবারেই। তা সত্ত্বেও যাচ্ছেতাই রকমের হামবড়া ভাব নিজের চারধারে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পরম নিষ্ঠায়। সারা গায়ে অতি-সূক্ষ্ম ভারতীয় শাল জড়িয়ে এমন একটা ভান করছে যেন না জানি কি হয়ে গেলাম। চুলের বোঝা ডগার দিকে গোল হয়ে পাকিয়ে গিয়ে দুলছে ঘাড়ের ওপর। মুখে ভাসছে নরম হাসি। কিন্তু সব মাটি করে দিচ্ছে তার সৃষ্টিছাড়া নাকখানা। যেমন লম্বা, তেমনি পাতলা। রবারের মতো নমনীয়, তুলোর মতো তুলতুলে। ব্রন-দগদগে সুবিশাল এই নাসিকা নিচের ঠোঁট ছাড়িয়ে ঝুলছে অনেক নীচে। জিভের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্যে লীলায়িত ভঙ্গিমায় নাকখানাকে একবার বাঁদিকে, আর একবার ডানদিকে সরিয়ে রেখেও টক্কর এড়াতে পারছে না। আর শুধু এই কারণেই অমানুষিক হয়ে উঠেছে গোটা মুখখানা।

প্রকাণ্ড মহিলার বাঁ দিকে বসে রয়েছে যে বেতো বুড়ো, তার গাল দুখানা দু-দুটো মদ ভর্তি চামড়ার থলির মতো ঠেস দিয়ে রয়েছে নিজেরই দুই ঘাড়ে। হেঁপো রোগী নিশ্চয়-হুস-হাস শব্দে দম টানছে আর ছাড়ছে। ছোটখাট চেহারার এই বৃদ্ধর একটা পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা এবং এই পা-খানাই অম্লান বদনে তুলে রেখেছে টেবিলের ওপর-যেন জখম পা দেখিয়ে সবার সহানুভূতি আকর্ষণ করাটাই তার জীবনের পরম ব্রত। অথচ দেমাক ফেটে পড়ছে তার চোখে মুখে। দেমাক তার শ্রী-অঙ্গের চড়া রঙের ফ্রক-কোটটা নিয়ে। টাইট বহির্বাস তাকে মানিয়েছে ভালো। সিল্কের ওপর ছুঁচের কারুকাজ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় ঠিকই। তবে কিনা, এ পোশাক পরার রেওয়াজ এখন আর নেই ইংলণ্ডে। অভিজাত বাড়িতে কাঁচের শো-কেসে সাজানো থাকে

অতীত-ঐশ্বর্য দেখানোর জন্যে।

এর ঠিক পাশে, সভাপতি মশায়ের ডান দিকে আসীন ভদ্রলোক যেন নিদারুণ আতঙ্কে অবিরাম কেঁপেই চলেছে। সাদা গেঞ্জি আর সুতির শরীর কামড়ে-ধরা পোশাক আরও খোলতাই করে তুলেছে ভদ্রলোকের থরহরি কম্পমান দেহমন্দিরকে। সুক্ষ্ম মসলিন কাপড় দিয়ে এঁটে বাঁধা তার দাড়ি গোঁফ কামানো দুখানা গাল ; হাতের কব্জিতেও চেপে জড়ানো মিহি মসলিন। ফলে, ইচ্ছেমতো হাত ঘুরিয়ে মদের গেলাস তুলতে পারছে না-কসরত দেখে হাসি সামলানো কঠিন হয়ে পড়েছে সদ্য-আগত দর্শক যুগলের। লোকটার কান দুখানাকে অনায়াসেই দুখানা কুলোর সঙ্গে তুলনা করা চলে। খাড়া কান আরও খাড়া হয়ে উঠছে বোতলের ছিপি খোলার সামান্যতম আওয়াজেও।

এহেন ব্যক্তির ঠিক সামনে বসে ষষ্ঠ এবং সর্বশেষ বিচিত্র মানবটি। আশ্চর্য রকমের আড়ষ্ট তার বপু। নিঃসন্দেহে পক্ষাঘাতে পঙ্গু। আড়ষ্ট বপুটাকে ধরে রেখেছে যে বস্তুটি-সেটি একটি কফিন। মড়ার বাক্স। মেহগনি কাঠ দিয়ে তৈরী এবং দেখতে ভারি সুন্দর। শবাধারের শীর্ষদেশ চেপে রয়েছে আড়ষ্ট ব্যক্তির করোটির ওপর এবং ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে সামনের দিকে কার্নিশের আকারে। ড্যাবডেবে সাদা রঙের বিশাল চোখ দুটো সকৌতুকে নিরীক্ষণ করে চলেছে ঘরের কড়িকাঠ-কেননা, কফিনে প্রবিষ্ট অবস্থায় সঙ্গীদের মতো সটান বসে থাকতে না পেরে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে ঢালুভাবে রেখে দিতে হয়েছে শরীরটাকে। এহেন জ্যান্ত মড়া দেখে বিলকুল তাজ্জব হয়ে গেল লেগস আর টারপোলিনের মতো দু-দুজন জোয়ান।

ছ-জনের প্রত্যেকের সামনে টেবিলের ওপর রয়েছে একটা করে মড়ার মাথার খুলি। পান পাত্র হিসেবেই নিশ্চয়ই খুলিগুলোকে এতক্ষণ কাজে লাগিয়ে এসেছে ছয় মূর্তি। মাথার ওপর ঝুলছে একটি প্রকাণ্ড নরকঙ্কাল। একে ঝোলানো হয়েছে খুলি খানাকে নিচের দিকে রেখে-দুই ঠ্যাং-এ দড়ি বেঁধে গলিয়ে দেওয়া হয়েছে কড়িকাঠের আংটার মধ্যে দিয়ে। হাত দুখানা কিন্তু কোথাও বাঁধা নেই।-ধড়ের সঙ্গে সমকোণে ছড়িয়ে রয়েছে দু-পাশে এবং খেয়ালখুশি মতো খটাখট মটামট শব্দে নড়েই চলেছে ঘরের মধ্যে বিন্দুমাত্র হাওয়ার প্রবেশ ঘটলেই, গোটা নরকঙ্কালটা দুলে উঠে ঘুরে যাচ্ছে সেই ফুস-ফুস হাওয়ার ধাক্কায়-ছড়ানো হাতের বাজনায় মুখরিত হয়ে রয়েছে অভিনব এই নরক-কুণ্ড।

কঙ্কাল দুলছে ঠিকই, কিন্তু খুলির ভেতর থেকে ছিটকে যাচ্ছে না জ্বলন্ত কাঠ কয়লাগুলো। খুলিটা যেন একটা আগুনের শালসা। ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে প্রতিটি কাঠ কয়লার গায়ে। আগুনের আভায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে গোটা ঘরখানা। কদাকার

কঙ্কাল নারকীয় বিভীষিকা ফুটিয়ে তুলেছে তার সর্বাঙ্গে। কফিনে শোয়া মানুষটার মাথা সবাইকে ছাড়িয়ে ওপর দিকে উঠে থাকায় লাল আভায় তার শরীরটাকে শরীরী অপচ্ছায়ার মতোই মনে হচ্ছে। জানলার পর্দা ঝুলছে বলে গা-হিম করা এই দ্যুতি ঘরের বাইরে যাওয়ার পথ পাচ্ছে না। টেবিলের পায়াগুলো বেধড়কভাবে উঁচু বলে গোটা টেবিলখানাই বড্ডো বেশি উঁচু হয়ে রয়েছে ওপরদিকে–মালসার অগ্নিপ্রভা তাই ম্লান বিষণ্ণ দ্যুতি বিকিরণ করে চলেছে টেবিলের তলদেশেও।

এ-হেন অসাধারণ মনুষ্য-সমাবেশ এবং ততোধিক অসাধারণ বেশবাস আর বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে শিষ্টাচার-ফিষ্টাচার ভুলে মেরে দিলো লেগস আর টারপোলিন, দু-পা ফাঁক করে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে, চোয়ালখানাকে বেশ খানিকটা ঝুলিয়ে, চোখ দুটোকে কোটর থেকে প্রায় ঠেলে বের করে আনলো ঢ্যাঙা লেগস। বেঁটে টারপোলিন ঘাড় বেঁকিয়ে নাকখানাকে টেবিলের ওপরে তুলে, দু-হাঁটুর ওপর দুই তালু রেখে হাড়-পিত্তি জ্বালানো বিদিকিচ্ছিরি দমকা-দমকা অট্টহাসিতে ভরিয়ে তুললো ঘরের প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটার। অট্ট-অট্ট সেই বিটকেল হাসি একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না–এ ক্ষেত্রেও দেখা গেল জঘন্য হাসির অফুরন্ত ধারায় বিরাম নেই একেবারেই।

খুবই আপত্তিকর এবং আদিম এহেন আচরণে কিন্তু তিলমাত্র রুষ্ট হলো না সুপুরি গাছের মতো রোগা লম্বা সভাপতি মশায়,বরং একটু মুচকি হেসে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, বিলক্ষণ খাতির করে দু-জনের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলো দু-খানা চেয়ারে। সভাপতি ঘাড় দুলিয়ে মাথার পালক নেড়ে স্বাগতম জানিয়ে উঠে দাঁড়াতেই চেয়ার দুখানাকে এনে বসিয়ে দিয়েছিল বিচিত্র মানুষগুলোর কোনো একজন।

লেগস তিলমাত্র আপত্তি জানায়নি। খাতির পেয়েছে এবং তা গ্রহণ করেছে। বিগড়ে গেল কিন্তু বাঁটুল টারপোলিন। কফিনধারীর পাশে না বসে চেয়ারখানাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এলো শুঁটকি নাক-সুন্দরীর পাশে এবং খপাৎ করে মড়ার মাথার খুলিটা তুলে নিয়ে তাতে হড় হড় করে বেশখানিকটা লাল মদ ঢেলে চোঁ করে চালান করে দিলো যথাস্থানে।

বেখাপ্পা এই ব্যবহারে বিলক্ষণ বিচলিত হতে দেখা গেল কফিনে আধশোয়া পক্ষাঘাতে পঙ্গু লোকটাকে,এবং তক্ষুনি একটা দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড ঘটে যেতো যদি না তড়িঘড়ি উরুর হাড় ঠুকে ভাষণ শুরু করে দিত সভাপতি মশায়ঃ 'আজকের এই সুন্দর মুহূর্তে আমাদের পরম কর্তব্য–'

'গোল্লায় যাক সুন্দর মুহূর্ত।' ষাঁড়ের গলায় গর্জন করে উঠে লেগস–'আমি জানতে চাই এতগুলো কুচ্ছিত মানুষ এখানে বসে মস্করাবাজি করছে কোন সাহসে? কার হুকুমে? কে আপনারা?

দেখতে তো পিশাচের মতো প্রত্যেককেই-ভূত প্রেতও ভয় পাবে আপনাদের দেখলে। উইল উইম্বলারের এই দোকান আমি চিনি। উটকো উৎপাত হয়ে এখানে এসেছেন কেন?'

ক্ষমার অযোগ্য এই ধৃষ্টতায় তুলকালাম কাণ্ড তো ঘটবেই। তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো অপচ্ছায়া-সম আকৃতিগুলো এবং হেঁড়ে আর খোনা, মোটা আর চাঁচা গলায় একযোগে অপার্থিব অট্টরোলে কাঁপিয়ে তুললো গোটা ঘরখানা। বাইরে থেকে এই চিৎকারই শুনেছিল লেগস আর টারপোলিন।

সবার আগে ঝট করে নিজেকে সামলে নিয়ে গম্ভীর চালে বললে সভাপতি মশায়-'নিশ্চয়, নিশ্চয়, এত বৃত্তান্ত জানবার অধিকার অবশ্যই আছে আপনাদের। এত কষ্ট করে যখন অতিথি হয়েছেন-যদিও গোড়া থেকেই অনেক অসভ্যপনা করে চলেছেন-তাহলেও শুনুন; আমিই এই অঞ্চলের একচ্ছত্র অধিপতি। আমার এই সাম্রাজ্য ভাগ-বাটোয়ারা করার সাহস নেই কারোর। কারণটা জলের মতো সোজা। আমার খেতাব-'মড়ক রাজা প্রথম'।

'উইল উইম্বলার কোনজন-আমরা তা জানি না। জানতেও চাই না। হতে পারে এ দোকান এক কালে ছিল তার এক্তিয়ারে-এখন রয়েছে আমাদের দখলে। কারণ আমাদের এই মড়ক সাম্রাজ্যের সভাঘর আপাতত এই ঘর-সভা মঞ্চও বলতে পারেন। মন্ত্রী-টন্ত্রীদের নিয়ে মিটিং করতে বসেছি মহৎ উদ্দেশ্যটাকে সফলতর করে তোলার উদ্দেশ্যে।

আমার ঠিক সামনেই বসে এই প্রাসাদের-থুড়ি-এই সাম্রাজ্যের রানী-মড়ক-রানী যার খেতাব। আর যাঁদের দেখলেন, এবং থ হয়ে গেলেন-তাঁরা প্রত্যেকেই একই মড়ক পরিবারভুক্ত। রাজ-রক্ত ঝরিয়েছে প্রত্যেকের শিরায় ধমনীতে-খেতাবগুলো রাজোচিত। এক-একটা মারণ জীবাণু বাহিনীর অধিপতি এঁদের এক-একজন। এঁদেরকে নিয়েই দিনে দিনে বাড়িয়ে চলেছি আমার সাম্রাজ্য।

-'কেন এখানে এসেছি, আপনার এই প্রশ্নের জবাব না দিলেও পারি। কিন্তু অতিথির অসম্মান তো করতে পারি না-অতিথির কৌতূহল মেটানোটাও আমাদের অন্যতম মহান কর্তব্য। বিশেষ করে যখন অতিথি নামক জীবেদের এখানে আগমন ঘটে কালে ভদ্রে-দেখুন মশায়, আজ রাতে আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি পার্থিব সুরার আস্বাদ নিয়ে অপার্থিব মৃত্যুর পথ প্রশস্ত করতে। মৃত্যু আমাদের সকলের অধিপতি-তাঁর রাজত্বেই লম্ফঝম্ফ করে চলেছি আপনি আমি সব্বাই। জগৎ সংসার জুড়ে যাঁর রাজত্ব-তাঁকে যৎকিঞ্চিৎ বন্দনা করছি তাঁরই প্রস্তাবিত উপচারে-মদ না খেলে তো মৃত্যুর কাছাকাছিও হওয়া যায় না।

আকণ্ঠ মদিরা সেবন করে দেখতে চাই তাঁর পিঙ্গলবর্ণ, রক্তজিহ্ব, রক্তাস্য, রক্তলোচন রূপ।'

'মৃত্যুর নিকুচি করেছে।' বলেই করোটি ভরে লাল মদ নিজের গলায় ঢাললো টারপোলিন—খালি খুলিতে আবার ঢাললো লোহিত মদিরা—ঠকাস্ করে ঠুকে নামিয়ে রাখলো পাশের নাক-সুন্দরীর সামনে।

সভাপতি মশায় জবাবটা দিলো এইভাবে—'হে মহান অতিথি, আপনার আকণ্ঠ পিপাসা এখুনি মিটিয়ে দিতে পারি আমৃত্যু অনাবৃষ্টির শাপ দিয়ে। কিন্তু ঢের হয়েছে—এবার ইচ্ছে হলে উঠতে পারেন—নয়তো আমাদের সঙ্গে বসেই মৃত্যুর চরণ-বন্দনা করে যেতে পারেন।'

—'বয়ে গেছে খুলি ভর্তি লাল মদ খেতে।' গর্জে ওঠে লেগস। 'পেট ঠেসে মদ খেয়ে এসেছি ভাটিখানায়—চোলাই মদ খেয়ে মরতে যাবো কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে ডবল তেজে হুঙ্কার ছাড়লো টারপোলিন—কক্ষনো না.........কক্ষনো না.........তোমার খোল মাল ভর্তি হয়ে যেতে পারে—আমার খোলে এখনও জায়গা আছে। অল্প মালেই তুমি ডুবু-ডুবু হও—এ জাহাজ বেশি মালেও খাড়া থাকে!'

কম্বুকণ্ঠে গর্জে উঠলো এবার তালঢ্যাঙা সভাপতি—'ব্যাস, ব্যাস আর না! দুই বাঁদর খালাসিকে হাত-পা বেঁধে এক্ষুনি ফেলে দেওয়া হোক বিয়ার পিপের মধ্যে!'

'শাস্তি! শাস্তি! বাঁদরামোর শাস্তি!' সমস্বরে বলে উঠলো ঘরশুদ্ধ লোক। কফিনধারী সাদা চোখ মেলে চেয়ে রইলো কড়িকাঠের দিকে। নাক-সুন্দরী নাচের মুদ্রায় আঙুল নাড়িয়ে ন্যাকখানাকে ডাইনে বাঁয়ে করে গেল এক নাগাড়ে। ধূপসো বুড়োর গালের হাপর আরও চেপে বসলো কাঁধের ওপর। জল ভর্তি মহিলার শরীরখানা যেন দ্বিগুণ ফুলে উঠলো বিপুল আহ্লাদে। গেঞ্জিধারীর কুলো-কান বিষমভাবে খাড়া হয়ে গিয়ে পৎ পৎ করে নড়তে লাগলো নিশানের মতো। রাজা মশায়ের সারা মুখে আচমকা আবির্ভূত হলো রাশি রাশি বলি রেখা।

'আরে ছ্যাঃ! আরে ছ্যাঃ! আরে ছ্যাঃ!' যেন সিটকিরি দিয়ে উঠলো টারপোলিন বিষম বিকট হেঁড়ে গলায়—'বিয়ারের পিপেতে ফেলে বিয়ার গেলাতে চাও আমাদের? জঘন্য ওই বিয়ার-নরকের কুত্তারাও যা দেখলে নাক সিঁটকোয়!'

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো ছয় মূর্তি। একই সঙ্গে বজ্র গর্জনে বললো ছ-জনে—'বিশ্বাসঘাতক!'

কর্ণপাত না করে আর এক খুলি লাল মদ ঢেলে চুমুক মারতে যাচ্ছিল টারপোলিন—কিন্তু জল ভর্তি প্রকাণ্ড মহিলা সে সময় তাকে দিলো না, কপ করে ঘাড় ধরে তুলে নিলো শূন্যে এবং ছুঁড়ে ফেলে দিলো বিয়ার-পিপের মধ্যে। গব গব গুপুর গুপুর করে খানিকটা

বিয়ার গিলে নিয়ে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে তক্ষুনি বিয়ারের মধ্যেই তলিয়ে গেল টারপোলিন। অত ঝাঁটাঝাঁটির ফলে রাশি রাশি ফেনা পিপের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়লো মেঝের ওপর।

তাল ঢ্যাঙা লেগস-এর অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতা দেখা গেল পরক্ষণেই। ছিটকে গেল সে চেয়ার থেকে, হ্যাঁচকা টানে মড়ক-রাজাকে মাথার ওপর তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো খোলা পাটাতনের ফাঁক দিয়ে নিচের পাতাল ঘরে এবং দমাস করে পাটাতন টেনে ফোকর বন্ধ করে দিলো সঙ্গে সঙ্গে, চিতাবাঘ লাফ মেরে পৌঁছে গেল বিয়ার-পিপের সামনে এবং অতবড় পিপেটাকে উল্টে ফেলে গড়িয়ে দিলো মেঝের ওপর।

বিয়ারের বন্যা বয়ে গেল ঘরের মধ্যে। পিপের ধাক্কায় উল্টে গেল টেবিল–ছিটকে গেল টেবিলের সমস্ত সরঞ্জাম ঘরময়। ডুবে গেল ভয়কাতুরে অপচ্ছায়াসম লোকটা। কফিনধারী ভেসে গেল বিয়ারের স্রোতে।

ততক্ষণে লাফ মেরে মাথার ওপর থেকে কঙ্কালটাকে টেনে নামিয়ে এনেছে লেগস। বন্ বন্ করে ঘোরাচ্ছে মাথার ওপর। ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে জ্বলন্ত কাঠ কয়লা এবং নিভে নিভে যাচ্ছে বিয়ারের বন্যায় পড়তে না পড়তেই। ফলে, একটু একটু করে অন্ধকার হয়ে আসছে ঘরখানা।

শেষ আলোর ম্যাড়মেড়ে আভায় দেখা গেল ঘুরন্ত কঙ্কাল দিয়ে এক ঘা মেরে থুমসো বুড়োর খুলি চুরমার করে দিচ্ছে লেগস। পরক্ষণেই অর্থহীন নিনাদে ঘর প্রকম্পিত করে প্রকাণ্ড মহিলার কোমর জড়িয়ে ধরে ধেয়ে যাচ্ছে রাস্তার দরজার দিকে। পেছন পেছন ছুটছে টারপোলিন। বার দুই-তিন কাশতেই তার পেটের বিয়ার বেরিয়ে এসেছে নাক মুখ দিয়ে। আরও চাঙ্গা, আর তেজে ভরপুর হয়ে গিয়ে সে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে স্বয়ং নাক-সুন্দরীকেই!
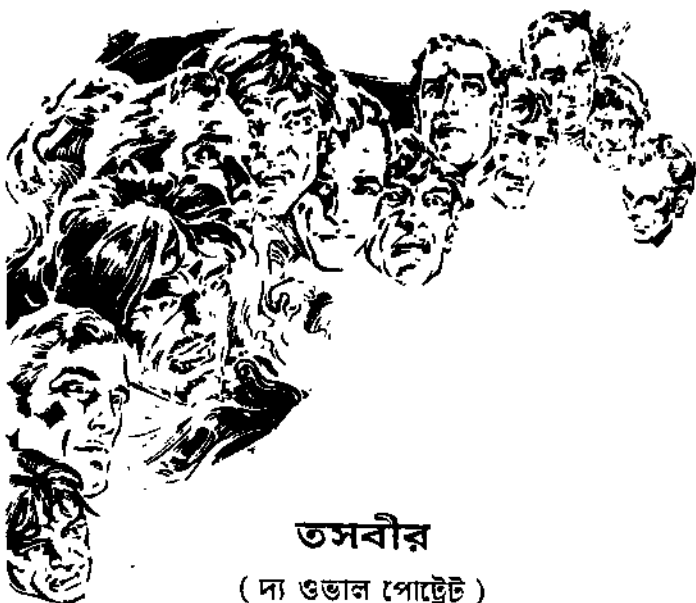
তসবীর

(দ্য ওভাল পোট্রেট)

খুব জখম হয়েছিলাম। খোলা মাঠে রাত কাটাতে পারলাম না। তাই আমার পার্শ্বচর একরকম জোর করেই আমাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ফরাসী পল্লীনিবাসটিতে।

দেখেশুনে মনে হল বাড়িটা সদ্য পরিত্যক্ত। কেউ আর থাকে না। বাড়ীর প্রান্তে একটা মোটামুটি সাজানো ঘরে ঠাঁই নিলাম দুজনে। ঘরের অলংকরণ খুব দামী, কিন্তু সেকেলে। দেওয়াল ঢাকা পর্দার দাম অনেক, বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র ঝুলছে হেথায়-সেথায়, মুল্যবান সোনালী আরব্য ফ্রেমে বাঁধানো বহু তসবীর শোভা পাচ্ছে চার দেওয়ালে। প্রকোষ্ঠটির নির্মাণ কৌশল বিচিত্র-তাই কোণের সংখ্যা অনেক। প্রতিটি কোণে সাজানো রয়েছে ছবির পর ছবি-ঝুলছে দেওয়াল থেকেও।

আমি তসবীর ভালোবাসি। তাই পেড্রোকে বললাম, জানলা বন্ধ করে দিতে। আমার পালঙ্কের পাশেই একটা দীর্ঘ বাতিস্তম্ভ ছিল। সব কটা বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হল সেই শামাদানের। কালো মখমলের পর্দা সরিয়ে দেওয়া হল বিছানার চারপাশ থেকে। এত কাণ্ড করলাম ঘুমোনোর জন্য নয়-খাটে বসে ছবিগুলো দেখব বলে। মাথার কাছে রাখা ছোট্ট পুস্তিকাটি পড়তে পড়তে তসবীর-সুধা উপভোগ করব। বইটিতে লেখা ছিল ছবিগুলোর বৃত্তান্ত।

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে পড়ে গেলাম-তীক্ষ্ণ চোখে ছবি দেখলাম-দেখতে দেখতে রাত দুপুর হয়ে গেল। পার্শ্বচর

ঘুমোচ্ছে। শামাদানের আলো ভালভাবে পাচ্ছি না। নিজেই হাত বাড়িয়ে সরিয়ে আনলাম যাতে বইয়ের পাতায় জোর আলো পড়ে।

এর ফলে কিন্তু অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটল। শামাদানের অগুন্তি মোমবাতির রশ্মিরেখা গিয়ে আলোকিত করল অন্ধকারময় একটি কোণ। জোর আলোয় দেখলাম আর একটা তসবীর রয়েছে সেখানে-অন্ধকার ঢেকে রাখায় দেখিনি এতক্ষণ। ছবিটি একটি সুকুমারী মেয়ের-সবে যৌবনবতী হচ্ছে। দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে চোখ বন্ধ করলাম। কেন করলাম প্রথমে তা নিজেই বুঝিনি। চোখ মুদে মনে মনে ভাবলাম কারণটা। মানুষ গম্ভীরভাবে কিছু ভাবতে গেলেই চোখ বোঁজে-আমিও করেছি। ছবিটা আমায় ঠকায়নি তো? ভুল দেখিনি তো? অলীক কল্পনাকে ধীর মস্তিষ্কে অবদমন করে আবার চোখ খুলে স্থিরভাবে তাকিয়েছি তসবীরের পানে।

এবার আর সন্দেহ রইল না। ছবির ওপর মোমবাতির প্রথম ঝলকে আমার চেতনার ওপর স্বপিল কুয়াশা অপসৃত হয়েছিল-সচমকে ফিরে এসেছিলাম জাগ্রত চেতনায়।

আগেই বলেছি, তসবীরটা একজন সুকুমারী মেয়ের। ভিগনেট কায়দায় শুধু ঘাড় আর মাথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বাহু, বুক, এমনকি দীর্ঘ কেশের প্রান্ত পর্যন্ত ছায়াময় পশ্চাৎপটে হারিয়ে গিয়েছে। ডিম্বাকৃতি ফ্রেম-সোনালী। শিল্প হিসেবে এ ছবির তুলনা নেই। শিল্পচাতুর্য অথবা নারী মূর্তির অসাধারণ ছবি দেখে কিন্তু আমি চমৎকৃত হলাম না। তন্দ্রা টুটে যাওয়ার ফলেই কি ঘুম চোখে মাঝ রাতে ছবির মূর্তিকে জীবন্ত বলে মনে হল? অসম্ভব! ছবির ফ্রেম, ভিগনেটিং, সবই মান্ধাতা আমলের। এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই পুরো একটি ঘণ্টা আধশোয়া, আধবসা অবস্থায় অপলকে চেয়ে রইলাম ছবিটির দিকে। তারপর মাদকতাময় তসবীরের মায়াময় শিল্পশৈলীই যে ইন্দ্রজালের মূলে-তা হৃদয়ঙ্গম করে শুয়ে পড়লাম বালিসে। ছবিটার মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে। সজীব নারী যেভাবে মায়াবিনীর মত প্রভাব বিস্তার করতে পারে পুরুষ হৃদয়ে-এ তসবীর তার ব্যতিক্রম নয়। শংকিত হলাম সেই কারণেই। শামাদানটাকে আগের জায়গায় সরিয়ে রাখলাম। অন্ধকারে আবৃত হল রহস্যময় তসবীর। শান্ত হল আমার বিক্ষুব্ধ মন। বইটা তুলে নিলাম। পাতা উল্টে নম্বর মিলিয়ে বের করলাম ডিম্বাকৃতি তসবীরের বৃত্তান্ত। কাহিনীটা এই :

"মেয়েটি আলোকসামান্যা রূপসী ছিল। শুধু গা ভরা রূপ নয়-প্রাণপ্রাচুর্যে টলমল করত সদা। অশুভ লগ্নে দেখল শিল্পীকে, ভালোবাসল, বিয়ে করল। শিল্পী আবেগপ্রবণ পরিশ্রমী, ছবি পাগল এবং শিল্পই তার মানসসুন্দরী। মেয়েটি কিন্তু আশ্চর্য

সুন্দরী, হাসিখুশী, উচ্ছল, ভালবাসে সংসারের সব কিছু-রঙ-তুলি ক্যানভাস ছাড়া। ওগুলো যে তার সতীন। তাই যেদিন শিল্পী বললে স্ত্রীর ছবি ফুটিয়ে তুলবে ক্যানভাসের বুকে, সেদিন মুখ শুকিয়ে গেল তার। কিন্তু অবাধ্য হতে সে জানে না। তাই নত মুখে পালন করল স্বামীর হুকুম। চিলেকোঠায় অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ক্যানভাসের দিকে মুখ করে বসে রইল ঘণ্টার পর ঘণ্টা-মাথার ওপরকার বাতায়ন থেকে ম্লান আলো এসে পড়ত ক্যানভাসে-শিল্পী কিন্তু ঐ আলোতেই তন্ময় হয়ে ছবি ফুটিয়ে চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন। শিল্পী খাটতে পারে উদয়াস্ত, সে ভাবুক, সুন্দরের উপাসনায় আত্মনিমগ্ন হলে বিস্মৃত হয় পরিপার্শ্ব। তাই খেয়াল হল না নিরালা ছাদের ঘরে ঐ যে বীভৎস আলো আসছে। সে আলোয় দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে সুন্দরী স্ত্রী। তবুও স্বামীর বুকে সুখ জোগাতে মুখে হাসি ফুটিয়ে বসে রইল চেয়ারে। সে যে দেখেছে, স্বামী তাকে ভালোবাসে, তাকে অমর করবার জন্যেই মনপ্রাণ ঢেলে আঁকছে তসবীর দিনের পর দিন, রঙ আর ক্যানভাসের বুকে প্রাণ প্রতিষ্ঠার, এহেন অটল সংকল্প দেখে তাই বিনা প্রতিবাদে সাহায্য করছে স্বামীকে-শরীর না বইলেও। ছবি দেখে অনেকে অবাক হয়ে গিয়েছে। স্ত্রীর মুখটি অবিকল ফুটিয়ে তোলার জন্যে শুধু নয়-শিল্পীর সুগভীর প্রেম বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে প্রতিকৃতির প্রতিটি রেখায়। ছবি যখন শেষ পর্যায়ে, শিল্পী ছাদের ঘরে কাউকে আর যেতে দিলে না। দিনরাত শুধু চেয়ে রইল তসবীরের দিকে-পাগলের মত তুলি বুলিয়ে শেষ করে আনল অতুলনীয় তসবীর-ফিরেও তাকাল না স্ত্রীর মুখের দিকে। তাই দেখতে পেল না, ছবি সুন্দরীর কপোলে যে রক্তরাগ ফুটছে-তা আহরণ করা হচ্ছে জীবন্ত মূর্তির কপোল থেকে-ধীরে ধীরে রক্তশূন্য হয়ে আসছে হতভাগিনীর গণ্ডদেশ। বেশ কয়েক সপ্তাহ অন্তে শুধু বাকী রইল ছবি সুন্দরীর চোখ আর মুখে আর একবার তুলি বোলানোর। প্রদীপ যেমন শেষ বারের মত দপ করে জ্বলে ওঠে, মহীয়সী মহিলার প্রাণপ্রদীপ শেষ জ্বলা জ্বলল সেইভাবে। শেষ বার তুলি বোলানো সাঙ্গ হল ছবি-সুন্দরীর মুখে আর চোখে। তুলি সরিয়ে রেখে ছবির দিকে চেয়ে সহসা ভীষণ ফ্যাকাসে হয়ে গেল শিল্পী। কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে উঠল বুক চাপড়ানো স্বরে-"একী! এ যে জীবন্ত!" প্রিয়তমার দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখল, "সে মারা গিয়েছে!"
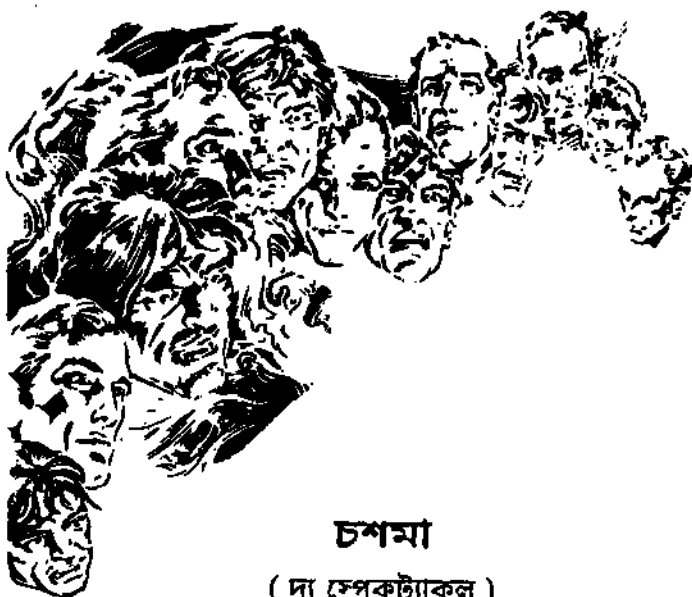
চশমা

(দ্য স্পেকট্যাক্‌ল্‌)

প্রথম দর্শনেই প্রেম ? হাসি টিটকিরির হুল্লোড় আরম্ভ হয়ে যেত কথাটা শুনলেই বেশ কিছু বছর আগে।

কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে যাঁরা তলিয়ে ভাবেন এবং উপলব্ধি করেন, তাঁরা বলেন উল্টো কথা। প্রথম দর্শনেই প্রেমে হাবুডুবু খাওয়ার মধ্যে যথেষ্ট সারবত্তা আছে বৈকি, হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মত বিষয় এটা নয় মোটেই।

প্রথম দর্শনে প্রেম চিরকাল ছিল, আছে, থাকবে। ঝলক দর্শনেই চিত্ত বিমোহন খেলো ব্যাপার নয় মোটেই। অত্যাধুনিক আবিষ্কারের পর জানা যাচ্ছে অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। নৈতিক চৌম্বক ধর্মই বলুন আর চৌম্বক-সৌন্দর্য বিজ্ঞানই বলুন, মোদ্দা বক্তব্যটা চাঞ্চল্যকর। ঝলক দর্শনে দুটি হৃদয়ে যে নিবিড় নৈকট্যবোধ জাগ্রত হয়, তা লোহায় লোহা গলিয়ে জুড়ে দেওয়ার মত চিরস্থায়ী। ঠিক যেন ইলেকট্রিক সহানুভূতি চিড়িক মারে দুটি অন্তরে। প্রেম ভালবাসা অতিশয় তীব্র, অতিশয় নিখাদ ভাবে বিকিরিত হয় প্রথম দর্শনে। এর চাইতে অকৃত্রিম প্রেম আর হয় না। হৃদয়ে হৃদয়ে তাই জোড়া লেগে যায় দু'খণ্ড গনগনে লোহা গলে জুড়ে যাওয়ার মত। যে কাহিনী এক্ষুনি বিবৃত করব, তা পড়লেই বুঝবেন কথাটা কতখানি সত্যি। ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত হাজির করা যায়, কিন্তু এই একটি কাহিনীই যথেষ্ট বলে মনে করি আমার এই বিশ্বাসের সমর্থনে।

গল্পের খাতিরে একটু বিশদ হতে হবে আমাকে। মানে, সবকিছুই খুঁটিয়ে বলতে হবে। বয়সে এখনও আমি নেহাৎই তরুণ। মাত্র বাইশ। এখনকার নামটাও খুব সাদামাটা, একেবারে মামুলি, সিম্পসন। 'এখনকার' শব্দটা বললাম কেন ? কেন না, অতি সম্প্রতি আইনগত ভাবে আমার পদবী বদল করতে হয়েছে। অনেক দূর সম্পর্কের এক পুরুষ আত্মীয়র বিপুল সম্পত্তির ওয়ারিশ হতে হয়েছে, তাই পদবী বদল। এ ঘটনা ঘটেছে গত বছর। আত্মীয়টির নাম অ্যাডলফাস সিম্পসন। সম্পত্তির ওয়ারিশ হওয়ার সর্তই ছিল যাঁর সম্পত্তি, তাঁর পারিবারিক পদবী আমাকেও গ্রহণ করতে হবে। শুধু প্রথম নামটা নিলেই ল্যাটা চুকে যেত, কিন্তু উইলের সর্ত না মানলেই নয়। তাই বাদ গেল আমার জন্মসূত্রে পাওয়া প্রথম নাম, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। আরও সঠিক ভাবে বলতে গেলে, আমার আদি নামের প্রথম আর দ্বিতীয় অংশ ছিল এই নাম।

অনিচ্ছার সঙ্গে সিম্পসন এই নামটা নিয়েছিলাম। পৈতৃক নাম ফ্রয়সার্ট-এর মধ্যে যে গর্ববোধ ছিল, সিম্পসন নামটার মধ্যেও সেই ধরনের গর্ব টেনে আনার চেষ্টা করেছিলাম। মনে মনে ঠিক করেছিলাম, ঠিকুজীকোষ্ঠী ঘেঁটে আদি পুরুষের কৌলিন্য বার করতে পারলেই ঐতিহ্যের ভারে নুয়ে পড়ব, অহঙ্কারে মটমট করব।

নামের প্রসঙ্গ যখন এসেই গেল, তখন আরো একটু বলা যাক। আমার পূর্ববর্তী পুরুষদের নামগুলোর মধ্যে আশ্চর্য একটা কাকতালীয় নজরে এসেছে। আমার বাবা ছিলেন প্যারিসের মঁসিয়ে ফ্রয়সার্ট। আমার মায়ের বয়স যখন মোটে পনেরো তখন বাবা বিয়ে করেন তাকে। বিয়ের আগে মায়ের নাম ছিল কুমারী ক্রয়সার্ট। ব্যাঙ্কার ক্রয়সার্টের বড় মেয়ে। ব্যাঙ্কার ক্রয়সার্ট বিয়ে করেছিলেন যাঁকে তখন তাঁর বয়স মোটে ষোল। ভিক্টর ভয়সার্টের জ্যেষ্ঠা কন্যা। কি আশ্চর্য কাকাতালীয় দেখুন, মঁসিয়ে ভয়সার্ট বিয়ে করেছিলেন যাঁকে, তাঁর নাম ছিল কুমারী ময়সার্ট। কন্যার বিয়ের বয়স এক্ষেত্রেও ছিল খুবই কম, বাচ্চা বললেই চলে। তাঁর মা-ও বিয়ের বেদিতে উঠেছিলেন মাত্র চোদ্দ বছর বয়েসে, নাম তাঁর ম্যাডাম ময়সার্ট।

বাচ্চাবেলায় এই ধরনের বিয়ের রেওয়াজ আছে ফ্রান্সে। বিশেষ এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ময়সার্ট, ভয়সার্ট, ক্রয়সার্ট, ফ্রয়সার্টরা রয়েছে বংশগতির সরাসরি লাইনে। আইনের নিগর আমাকে বাধ্য করেছে বটে সিম্পসন নামটা নিতে, কিন্তু নেওয়ার আগে নাম পাল্টাতে প্রবল আপত্তি ছিল মনের মধ্যে। ফালতু একটা নামের জন্যে বিষয়সম্পত্তি নিতেই হবে ? গোল্লায় যাক

সম্পত্তি, কিছু দরকার নেই, নাম পাল্টাব না। এমন দ্বন্দ্বও গেছে মনের মধ্যে।

ঈশ্বর আমাকে যা দিয়েছেন, তা নেহাৎ কম নয়। বরং একটু বেশিই বলা যায়। শরীর আমার মজবুত। মুখশ্রী সুন্দর, পৃথিবীর নয় দশমাংশ লোক তাই বলবে। উচ্চতায় পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। মাথার চুল মিশমিশে কালো আর কুঁচকোনো। নাকের গড়ন যথেষ্ট ভাল। দুই চোখ বিশাল এবং ধূসর। কিন্তু দুর্বল। খুবই অসুবিধের কারণও বটে, তবে দেখে তা সন্দেহ করা যায় না। চক্ষু প্রত্যঙ্গের এহেন দুর্বলতা বরাবরই বিব্রত করেছে আমাকে, প্রতিকারের উপায় স্বরূপ বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি, চশমা পড়তেও বাকি রাখিনি। কিন্তু যেহেতু তারুণ্যরসে টগবগে আমি এবং দেখতে শুনতেও ভালই, তাই এই সব বস্তুর ব্যবহার অপছন্দ করে এসেছি প্রথম থেকেই, বরদাস্ত করি না বলেই দুর্বলতা কাটাতে সহায়দেরও বর্জন করেছি। যুবাবয়সে এইসব জিনিসগুলো মুখাবয়বের শ্রী একেবারেই নষ্ট করে দেয়। মুখখানাকে উৎকট গম্ভীর করে তোলে। বয়স যা, তার চাইতে ভারিক্কী তো দেখায়ই, উপরন্তু বক-ধার্মিকের মত বিটকেলে দেখায়। চশমার মত বাজে জিনিস আর হয় না এইসব কারণেই। আই-গ্লাস অর্থাৎ দৃষ্টি-সহায় কাচ জিনিসটা পক্ষান্তরে মুখের মধ্যে একটা বিদিগিচ্ছিরি ফুলবাবুগিরি আর গুণ্ডামির ছাপ এনে দেয়। আজ পর্যন্ত তাই এই দুটি বস্তুকেই বর্জন করে চলেছি যতদূর সম্ভব। নিজেকে নিয়ে এত খুঁটিয়ে বলাটা বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছি। তাই নিজের কথায় যতি টানবার আগে শুধু বলব, স্বভাবের দিক দিয়ে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, দুর্বার, একনিষ্ঠ এবং পরমোৎসাহী, এবং সারাটা জীবন মহিলাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে এসেছি অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে।

শীতকালে এক সন্ধ্যায় প্রবেশ করেছিলাম পিউ থিয়েটারের একটা বক্সে। সঙ্গে ছিল আমার এক বন্ধু, মিস্টার ট্যালবট। গীতিনাট্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে মঞ্চে। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা প্রত্যেকেই নামকরা। প্রেক্ষাগৃহে তাই তিল ধারণের জায়গা নেই। সামনের সারি আগে থেকেই রিজার্ভ করা ছিল বলেই শুরু হওয়ার একটু আগে পৌঁছেও কনুইয়ের গুঁতোয় পৌঁছে গেলাম বসবার আসনে।

ঝাড়া দু'ঘণ্টা স্টেজের দিকে তন্নিষ্ঠ হয়ে চেয়ে রইল আমার এই সুহৃদটি। গান-বাজনার পোকা বললেই চলে তাকে। গীতিনাট্যের নামে উন্মাদ। দর্শকের চেহারা দেখতে দেখতেই আমি কাটিয়ে দিলাম এই দুটি ঘণ্টা। মজা পাচ্ছিলাম বলেই দেখছিলাম।বেশির ভাগই তো খানদানী মহলের মানুষ। দেখে-শুনে কিঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হয়ে দৃষ্টি সরিয়ে এনে গীতিনাট্যের

প্রধান অভিনেত্রীর দিকে যেই তাকাতে যাচ্ছি, অমনি আমার দৃষ্টি চুম্বকের মত আটকে গেল একটা মূর্তির ওপর। বেশ কয়েকটা প্রাইভেট বক্সের একটিতে বসেছিল এই মূর্তিটি। নজর এড়িয়ে গেছে এতক্ষণ।

হাজার বছরও যদি বাঁচি, ভুলব না কি আতীব্র আবেগ নিয়ে অবলোকন করেছিলাম অপরূপা এই মূর্তিটিকে। অতুলনীয়া মহিলা মূর্তি, জীবনে এমন সুন্দরী কামিনী আর দেখিনি। অপূর্ব! অপূর্ব! মুখটা সেই মুহূর্তে ফেরানো রয়েছে মঞ্চের দিকে, দেখতে পেলাম না সেই কারণেই। কিন্তু আকৃতি নিঃসন্দেহে স্বর্গীয়। দেবললনা বললেই চলে। স্বর্গের মেয়ে বলেও যেন তার সম্বন্ধে অনেক কম কথা বলা হচ্ছে। অথচ এই দুটি শব্দ ছাড়া আশ্চর্য সেই নারীমূর্তির রূপের বর্ণনা দেওয়াও সম্ভব নয়।

সুন্দরী ললনার সুন্দর আকৃতির মধ্যে একটা ম্যাজিক আছে। মহিলা-সুষমার এই জাদুশক্তি চিরকাল আমাকে দুর্বারবেগে আকর্ষণ করেছে। এ যেন একটা ডাকিনী ক্ষমতা, প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু সেদিন যা দেখলাম, তা আমার স্বপ্নের দেবীমূর্তি, আমার কল্পনার মোহিনী মূর্তি, লাবণ্য আর গরিমা যেন মূর্তিমতী হয়ে বসে আছে অদূরে। নারীর রূপ যদি কখনো আমাকে উন্মাদও করে দেয়, তাহলেও আমার বিভ্রান্ত ধারণায় এই সৌন্দর্য কখনো ফুটে উঠবে না।

বক্সের মধ্যে বসে থাকায় আশ্চর্য এই নারীমূর্তির সর্ব অবয়ব দেখার কথা নয়। কিন্তু বক্সটার নির্মাণ কৌশলের দরুন দেখতে পাচ্ছিলাম তার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত। উচ্চতায় মাঝামাঝি। রানীর মতই গ্রীবাভঙ্গিমা। দেহকান্তি অনবদ্য। দেহরেখা সুস্পষ্ট। ভরাট উদ্ধত বক্ষদেশ অতীব উপাদেয়। মাথার পেছন দিকটাই কেবল দেখা যাচ্ছিল, তাও টুপিতে ঢাকা। কিন্তু গ্রীক পুরাণের সাইকির মত যার মাথার গড়ন, টুপি দিয়ে কি তার মাথার সৌন্দর্য আবৃত করা যায়? মহার্ঘ মস্তকশোভা আরও মোহময় করে তুলেছে মাথার শোভাকে। ডান বাহু শিথিল ভাবে ঝুলছে বক্সের রেলিংয়ের ওপর দিয়ে। নিখুঁত সামঞ্জস্য দেখে শিউরে উঠল আমার দেহমন্দিরের প্রতিটি স্নায়ু। বাহুর উর্ধ্বাংশ এখনকার ফ্যাশন অনুযায়ী ঢিলে হাতা বস্ত্রে আচ্ছাদিত। কনুইয়ের সামান্য নিচ পর্যন্ত নেমে এসেছে হাতার কাপড়। তলায় দেখা যাচ্ছে মিহি কাপড়ের টাইট অন্তর্বাস, কিনারা ঘিরে ঝালর, হাত পর্যন্ত ঝুলছে ঝকমকে সেই ঝালরের সুতো, ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে পেলব আঙুল, এক আঙুলে ঝিলিক তুলছে অতিশয় মূল্যবান একটা হীরের আংটি। মণিবন্ধ ঘিরে রত্নাভরণ মণিবন্ধের সুষমাকে শতগুণ বাড়িয়ে তুলেছে এবং জড়োয়া গয়নার সেই বাহার দেখেই চকিতে বুঝে নিলাম, এ গয়না যার

অঙ্গে, তার ঠাঁই সমাজের অনেক উঁচু থাকে এবং কচিৎ তার সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে।

যেন পাথরের মূর্তি বনে গিয়েছিলাম আধ ঘণ্টার জন্যে। শিলা মূর্তির মত নিথর দেহে বসে ঠায় চেয়েছিলাম রানীর মত অপরূপা নারী মূর্তিটির দিকে। এবং এই আধ ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই হাড়ে হাড়ে টের পেলাম, অণু-পরমাণু দিয়ে উপলব্ধি করলাম, 'প্রথম দর্শনেই প্রেম' কাকে বলে।

জীবনে অনেক লাবণ্যময়ীর সান্নিধ্যে আমি এসেছি, দেশের সেরা সুন্দরী বলা চলে তাদের, কিন্তু অপিচ এরকম অনুভূতি আবেশ বিহ্বল করে তোলেনি আমার সমস্ত সত্তাকে। অবর্ণনীয় একটা আকর্ষণ (যাকে চুম্বকের আকর্ষণ ছাড়া আর কিছু বলতে পারছি না) যেন প্রচণ্ড শক্তি প্রবাহের মত ধাবিত হচ্ছে তার অন্তর থেকে আমার অন্তরের দিকে, অদৃশ্য নিগড়ে যেন বেঁধে দিচ্ছে দুটি আত্মাকে, গলেগলে মিশে যাচ্ছে যেন দুটি সত্তা। আমার সমস্ত চিন্তা আর অনুভূতির শক্তি, আমার সমস্ত দৃষ্টিক্ষমতা যেন পরাভূত হয়েছে সামনের ঐ চমকপ্রদ দেহবল্লরীটির অত্যাশ্চর্য শক্তির কাছে। আমি নজর সরাতে পারছি না, অন্য কথা ভাবতে পারছি না, অন্য অনুভূতিকে মনের মধ্যে ঠাঁই দিতে পারছি না। আমার মন-মন্দির জুড়ে রয়েছে শুধু ঐ মূর্তি, মানবীরূপে যাকে স্বর্গের দেবী বলাই উচিত। মগজের প্রতিটি কোষের মুহ্যমান অবস্থায় স্বপ্নের ঘোরে এইটুকুই শুধু উপলব্ধি করলাম, উন্মাদের মতই গভীর প্রেমে নিমজ্জিত হচ্ছি, ডুবেই যাচ্ছি, উঠে আসা আর সম্ভব নয়, মোহিনী তার অব্যাখ্যাত মোহ দিয়ে আমার সমস্ত সত্তাকে কেড়ে নিয়েছে। তখনও কিন্তু মেয়েটির মুখ আমি দেখিনি, না দেখেই এই অবস্থা। শোচনীয় অবস্থা বলাই ভাল। কেন না, বেশ বুঝলাম, মুখ ফেরানোর পর মুখাবয়বে যদি আহামরি কিছু না দেখি, তাহলেও প্রথম দর্শনেই এই সুগভীর প্রেমের সমুদ্রে আমি হাবুডুবু খাবই। প্রেমের জাদুকরী শক্তি এমনই প্রচণ্ড, বাহ্যিক রূপ থেকে তার জাগরণ ঘটলেও বাইরের অবস্থাকে উপেক্ষা করে যাওয়ার ক্ষমতা সে রাখে। ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে দুর্বোধ্য মহাশক্তি দিয়ে, কিভাবে তা জানা নেই।

তন্ময় হয়ে দেখে যাচ্ছি অনিন্দ্যসুন্দরীকে আর ভাবছি আকাশ-পাতাল, অজস্র প্রশংসায় বুঁদ হয়ে রয়েছি মনে মনে, এমন সময়ে প্রেক্ষাগৃহে হঠাৎ চাঞ্চল্য জাগল। শোরগোলও শোনা গেল। ব্যাপারটা কি, দেখবার জন্যে পরমাসুন্দরীটি মুখ ফেরাল সেই দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম তার পুরো মুখাবয়ব।

অহো! অহো! কিভাবে বর্ণনা দিই সেই অতুলনীয় সৌন্দর্যের? পেছন থেকে মুখের যে রূপ মনে মনে কল্পনা

করেছিলাম, এ যে দেখছি তার চাইতেও সহস্রগুণে রমণীয়! তা সত্ত্বেও অবর্ণনীয় সেই মুখকান্তিতে এমন কিছু একটা ছিল যা একটু হতাশই করেছিল আমাকে সেই মুহূর্তে.........অথচ সেটা যে কী, তা বলতে পারব না।

'হতাশ' শব্দটা বললাম বটে, কিন্তু সঠিক অর্থে এ শব্দ প্রযোজ্য নয় মোটেই। ভাবাবেগ মুহূর্তের মধ্যে থিতিয়ে এল, প্রশান্তির সূচনা ঘটল বিস্ময়বিহ্বল অন্তরপ্রদেশে। হৃদয়জোড়া অচঞ্চল উৎসাহ আবিষ্ট করে রেখে দিল আমার সমস্ত সত্তা! ম্যাডোনার মত মুখ, মুখ ঘিরে গৃহিণী সুলভ গাম্ভীর্যই আমার ভেতরকার আলোড়নকে যেন ধীর-স্থির উচ্ছ্বাসহীন করে আনল নিমেষের মধ্যে। তবুও.........তবুও আমি বলব আমার মনের অকস্মাৎ এই প্রশান্তি কেবলমাত্র এই কারণেই ঘটেনি। রহস্য একটা ছিল.........সে যে কি রহস্য তা বুঝে উঠিনি। পরমার মুখের মধ্যে এমন একটা ভাব আমি দেখেছিলাম যা আমাকে সামান্য বিচলিত করলেও আগ্রহকে ঠেলে তুলে দিয়েছিল তুঙ্গে। এ অবস্থায় সব পুরুষের মধ্যেই বাড়াবাড়ি করে ফেলার প্রবণতা এসে যায়। এসেছিল আমার মধ্যেও। অপরূপা ললনা যদি একা থাকত বক্সে, নিশ্চয় আমি পবনবেগে ধেয়ে যেত্যাম এবং শত বিপর্যয় সত্ত্বেও তার সঙ্গসুখ উপভোগ করতাম। কিন্তু তা করতে পারিনি। কেন না, সঙ্গে ছিল এক ভদ্রলোক, আর একজন অসাধারণ সুন্দরী মহিলা, দেখেশুনে মনে হল অনিন্দ্যসুন্দরীর চেয়ে বয়স একটু কমই হবে।

হাজারখানেক পরিকল্পনা এঁটে ফেললাম মনের মধ্যে। কিভাবে একটু বেশি বয়সী মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করা যায়? অথবা কিভাবে আরও স্পষ্টভাবে মানবীর রূপে এই দেবীমূর্তিকে অবলোকন করা যায়? নিজের বক্স ছেড়ে মেয়েটির কাছের কোনো বক্সে চলে গেলেই পারতাম। কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ থাকায় সে গুড়ে বালি। এ সব পরিস্থিতিতে ছোট দূরবীন ব্যবহার করার ওপর রক্তচক্ষু রেখেছে সমাজের রীতিনীতি, তাই কাছে থাকলেও তা কাজে লাগাতে পারতাম না। বস্তুটি সেই মুহূর্তে অবশ্য আমার কাছে ছিলও না। তাই মুষড়ে পড়লাম খুবই।

অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকার পর ঠিক করলাম বন্ধুবরকে ব্যাপারটা বলা যাক।

ট্যালবট, তোমার অপেরা-গ্লাসটা দাও তো।

অপেরা-গ্লাস! অপেরা-গ্লাস নিয়ে আমি কি করব? না, না, আমার কাছে নেই, বলেই অসহিষ্ণুভাবে মঞ্চের দিকে চেয়ে রইল ট্যালবট।

আমি কিন্তু ছাড়লাম না। কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি মেরে বললাম, শোনো বন্ধু, শোনো। স্টেজ-বক্সটা চোখে পড়ছে? না, না, ওর পাশেরটা। দেখেছো এর চাইতে সুন্দরী নারী?

সুন্দরী তো বটেই, অত্যন্ত সুন্দরী।

মেয়েটা কে জানো?

তাও বলে দিতে হবে? ম্যাডাম ল্যানাডে.........ম্যাডাম ল্যানাডে.........স্বনামধন্যা ম্যাডাম ল্যানাডে, যাঁর মত রূপসী ইদানীংকালে আর নেই, যাঁর নাম শহরের হাটে ঘাটে মঠে মন্দিরে। অসম্ভব ধনবতীও বটে। বিধবা। উপযুক্ত বরের সন্ধানে প্যারিস থেকে সবে এসেছে।

পরিচয় আছে তাহলে?

আছে বইকি।

আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে?

নিশ্চয়ই দেবো, সানন্দে দেবো, কখন বলো?

কাল দুপুর একটায়। বি-তে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

ঠিক আছে। এবার মুখে চাবি এঁটে বসে থাকো।

নিরুপায় হয়েই মুখে চাবি এঁটে থাকতে হয়েছিল। কেন না, বাকি সময়টা আমার অজস্র প্রশ্ন আর প্রস্তাবের একটারও জবাব দেয়নি ট্যালবট। মঞ্চ নিয়ে তন্ময় হয়ে রইল অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

এই সময়টা আমি কিন্তু নিমেষহীন নয়নে চেয়ে রইলাম ম্যাডাম ল্যানাডের দিকে। বেশ কিছুক্ষণ পরে মুখের সামনের দিকটাও চুলচেরাভাবে দেখবার সুযোগ পেলাম। অসাধারণ লাবণ্যময়ী। আগেও অবশ্য তা উপলব্ধি করেছিলাম সমস্ত হৃদয় দিয়ে। ট্যালবটের মুখে শোনবার আগেই মনে মনে জেনে গেছিলাম, এ-সুন্দরীর সমকক্ষ সুন্দরী শহরে আর নেই, পৃথিবীতেও আছে কিনা সন্দেহ। তা সত্ত্বেও অব্যাখ্যাত কি একটা ব্যাপার খচ খচ করতে লাগল মনের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত ভেবেচিন্তে দেখলাম, মুখের গাম্ভীর্য, বিষণ্ণতা, অথবা একটু ক্লান্তির ছাপই বোধহয় মুখাবয়বের যৌবনোচিত সজীবতাকে একটু অপসারণ করেছে, আমার মনে তা কাঁটার মত বিঁধে চলেছে। কিন্তু রমণীয়তা, নমনীয়তা আর রানীসুলভ আচরণ উদ্দীপ্ত করে চলেছে আমার উৎসাহ আর রোম্যান্সবোধে ভরপুর চিত্তকে। আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে শতগুণে।

দুচোখ ভরে পরম উপাদেয় এই সৌন্দর্য যখন হৃদয় জুড়ে পান করে চলেছি, মেয়েটি টের পেল আমি ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে রয়েছি তার দিকে। খুব সামান্য চমকেও উঠল। কিন্তু আমার চাহনির তীব্রতা তখন তুঙ্গে, অন্তর জুড়ে শুধু তারই রূপের বন্দনা, কাজেই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারিনি সেই মুহূর্তে।

পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল অনিন্দ্যসুন্দরী। খোদাই করা মাথার পেছন দিকটাই আবার দেখতে লাগলাম আগের মত। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটির বোধহয় ইচ্ছে হল ঘুরে দেখে এখনও আমি প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছি কিনা। তাই মুখখানা

ঘোরালো খুব আস্তে আস্তে—দেখল, দুই চোখে নিবিড় আগ্রহের রোশনাই জ্বেলে তখনও আমি চেয়ে তার দিকেই। সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিল বিশাল দুই আঁখি এবং রক্তাভা দেখা দিল শুভ্র সুন্দর দুই গালে। অবাক হলাম কিন্তু পরের কাণ্ডটা দেখে। মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে চাওয়ার সময়েও এতটা আশ্চর্য হই নি। হলাম তখনই যখন দেখলাম, কটিবন্ধ থেকে একজোড়া দূরবীন বার করে উঁচু করে ধরল আমার দিকে, ফোকাস ঠিক করে দূরবীনের মধ্যে দিয়ে নিবিড় ভাবে চেয়ে রইল আমার দিকে বেশ কয়েক মিনিট। এবারে আর লুকিয়ে দেখা নয়, খোলাখুলি দেখে যাচ্ছে আমাকে ডবল আই-গ্লাসের মধ্যে দিয়ে।

পায়ের কাছে অকস্মাৎ বজ্রপাত ঘটলেও এতটা হতভম্ব হতাম না। রাগ বা বিরক্তির প্রশ্নই ওঠে না। অন্য কোনো মেয়ে এভাবে আই-গ্লাসের মধ্যে দিয়ে আমার দিকে তাকালে গা-পিত্তি জ্বলে যেত নিশ্চয়ই। বলে বসতাম, একী অভব্যতা! কিন্তু এই দেবীমূর্তির ক্ষেত্রে সে প্রশ্নই ওঠে না, তবে পিলে চমকে গেল তার কাণ্ডটা দেখে। অথচ তার এই সমাজের-রীতিনীতি-ভাঙা আচরণের মধ্যে নেই কোনো ধৃষ্টতা, ঔদ্ধত্য। আছে শুধু তুলনাবিহীন প্রশান্তি আর অতি উঁচু মহলের সংযত কৌতূহল। বিস্ময় আর প্রশান্তিতে তাই আপ্লুত হল আমার হৃদয়-মন্দির।

লক্ষ্য করলাম, প্রথমবার দূরবীনের মধ্যে দিয়ে আমার দেহশ্রী পর্যবেক্ষণ করে সে যেন তুষ্ট হয়েই দূরবীন নামিয়ে নিয়েছিল। পরক্ষণেই আবার কি ভেবে দূরবীনের মধ্যে দিয়ে চেয়ে রইল আমার দেহকান্তির দিকে, এবারে বেশ কয়েক মিনিট।

আমেরিকার থিয়েটারে কোনো সুন্দরী মহিলা যদি এভাবে বারে বারে তাকায় একজন সুন্দর পুরুষের দিকে, সাধারণের টনক নড়বেই। ওদেশে এ ব্যাপার রীতিমত অস্বাভাবিক। কাজেই নড়াচড়ার লক্ষণ দেখা গেল দর্শকবৃন্দের মধ্যে, কানে ভেসে এল চাপা গুঞ্জনও। কিন্তু তাতে ম্যাডাম ল্যালাডে তিলমাত্র বিচলিত হয়েছে বলে মনে হল না, মুখের ভাবে কোনোরকম অপ্রস্তুত ভাব ফুটে উঠল না।

কৌতূহল চরিতার্থ হয়েছিল নিশ্চয়ই। তাই আই-গ্লাস নামিয়ে আবার মঞ্চের দিকে ঘুরে গভীর অভিনিবেশে গীতিনাট্য উপভোগ করে গেল দেবীমূর্তি। মুখের সামনের দিক আর দেখতে পাচ্ছি না, আগের মতই দেখছি কেবল মাথার পেছনটা। আমিও নেহাৎ বর্বরের মত প্যাট প্যাট করে চেয়ে রইলাম সেই দিকেই। অচিরেই বুঝলাম, দেবীমূর্তিটিও স্টেজের দিকে চোখ ফিরিয়ে থাকার ভান করে আড়চোখে দেখে যাচ্ছে আমার অসভ্যতা। একটু একটু করে মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে বসতেই বুঝলাম ব্যাপারটা। চোখের কোণ দিয়ে দেখছে আমি কি

করছি। কোনো অসামান্যা সুন্দরী যদি এইভাবে লুকিয়ে চুরিয়ে তাকায় কোনো পুরুষের দিকে, তাহলে তার যা অবস্থা দাঁড়ায়, আমার অবস্থাও দাঁড়ালো সেইরকম। বিহ্বল হয়ে গেলাম ঐ কয়েক মিনিটের মধ্যেই। মনে হল যেন আমি নেই আমার মধ্যে। একে তো নিরতিসীম উত্তেজনায় খান্ খান্ হয়ে যাচ্ছিলাম, তার ওপরে এই সঙ্গোপন চাহনি-

দফারফা হয়ে গেল আমার ঐটুকু সময়ের মধ্যেই।

মিনিট পনেরো এইভাবে আড়চোখে আমার সুরৎখানা দেখবার পর ম্যাডাম ল্যানাডে কি যেন বলল পাশের ভদ্রলোককে। তারপর দুজনের মধ্যে যে কথাবার্তা চলল, দূর থেকেই বুঝলাম তা হচ্ছে আমাকে নিয়েই।

কথা শেষ করে ফের মঞ্চের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বসে রইল মোহিনীমূর্তি। বেশ কয়েক মিনিট যেন মঞ্চ দৃশ্যই নিবিষ্ট করে রাখল তাকে। তার পরেই আবার সেই কাণ্ড! আবার সটান ঘুরে বসল আমার দিকে। আবার পাশে ঝুলন্ত আই-গ্লাস তুলে ধরল চোখের সামনে। আবার নির্বিকার ভাবে খুঁটিয়ে দেখে গেল আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। প্রেক্ষাগৃহের গুঞ্জনে বিচলিত হল না। ভ্রূক্ষেপও করল না। মুখভাবে বিরাজমান সেই নিবিড় প্রশান্তি আর বিস্ময়কর সংযম। যুগপৎ হর্ষোৎফুল্ল এবং হতভম্ব হয়েছিলাম একটু আগেই এহেন নিরীক্ষণ পর্বের সামনে।

যেন জ্বরাচ্ছন্ন হলাম প্রবল উত্তেজনায়। অপ্সরীর মত যার রূপ, তার কাছ থেকে এতখানি সাড়া পেয়ে দিশেহারা হয়ে গেলাম আমি। প্রেমজ্বরে আক্রান্ত হয়ে যেন বিকারগ্রস্ত হলাম। মেয়েটির বারে বারে চাওয়ায় দমে যাওয়ার বদলে দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হলাম। অদূরের ওই অপরূপা ছাড়া চোখের সামনে থেকে সবকিছুই যেন মুছে গেল। প্রেক্ষাগৃহের সবাই যখন মঞ্চের দিকে চেয়ে, ঠিক সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলাম। ম্যাডাম ল্যানাডের চোখে চোখ রাখলাম এবং বাতাসে মাথা ঠুকে ছোট্ট অভিনন্দন জানালাম এমনভাবে যে ভালভাবে না দেখলে তা নজরে আসার কথা নয়। আর একবার নজরে এলে তার মানে না বোঝারও কথা নয়।

দারুণ ভাবে রক্তিম হয়ে উঠল অপরূপা। আরক্ত হল কর্ণমূল পর্যন্ত। চোখ ফিরিয়ে সন্তর্পণে অতি হুঁশিয়ার ভাবে দেখে নিল চারদিক। আমার হঠকারিতা কারোর নজরে পড়েনি বুঝে নিশ্চিন্ত হয়ে হেসে পড়ল পাশের ভদ্রলোকের দিকে।

চূড়ান্ত মাত্রায় অসঙ্গত আচরণের অপরাধবোধে জ্বলে পুড়ে যেন খাক হয়ে গেলাম। বুঝলাম, এবার আর রক্ষে নেই। হাটে হাঁড়ি ভাঙা হবে। এবং এখুনি এত লোকের সামনে আমাকে বেইজ্জৎ করা হবে। তারপর কালকে পিস্তল নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

পিস্তলের দূর-কল্পনাটা সাঁই-সাঁই করে ভেসে গেল মগজের মধ্যে দিয়ে।

ভীষণ আশ্বস্ত হলাম যখন দেখলাম, মেয়েটি পাশের ভদ্রলোকের হাতে গছিয়ে দিল শুধু গীতিনাট্যের অনুষ্ঠানসূচীটা। একটা কথাও বলল না। কিন্তু এরপর যা ঘটল, তা শুনলে পাঠক-পাঠিকারা অন্ততঃ কিছু মাত্রায় উপলব্ধি করতে পারবেন আমার তখনকার পিলে-চমকানো বিস্ময়বোধ, আমার নিরতিসীম কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা, আমার হৃদয় আর মনের প্রলাপসম উদ্‌ভ্রান্তি।

অনুষ্ঠান সূচীটা ভদ্রলোকের হাতে দিয়েই আশেপাশে চকিত চাহনি বুলিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হল মেয়েটি, না, কেউ চেয়ে নেই তার দিকে। পরক্ষণেই হীরক উজ্জ্বল দুই আঁখি মেলে সটান চাইল আমার দিকে এবং মৃদু একটু হেসে আর মুক্তোর মত দাঁতের ঝিকিমিকি সারি দেখিয়ে পর পর দু'বার অতি স্পষ্টভাবে মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে বসল আমার হঠকারিতায়!

বিপুল উল্লাসে নৃত্য করে উঠিনি এই যথেষ্ট। মনটা যেন ময়ূরের মত পেখম মেলে নেচে উঠেছিল তৎক্ষণাৎ। অতিরিক্ত সুখে মানুষ নাকি পাগল হয়ে যায়। আমিও হয়ে গেলাম সেই মুহূর্তে। ভালবেসেছি। এই আমার 'প্রথম' প্রেম, মনে হল সেইরকমই। স্বর্গীয় প্রেম একেই বলে, অবর্ণনীয়। প্রথম দর্শনে প্রেম জিনিসটার নাম শুনেছিলাম, এখন তা কোষে কোষে টের পেলাম। প্রথম দর্শনেই সেই প্রেমের প্রতিদানও পেলাম, স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে!

স্বীকৃতি তো বটেই। আর কোনো সন্দেহ নেই। ম্যাডাম ল্যানাডে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, রুচিশীলা, ধনবতী, অতীব সুন্দরী, সে যদি এভাবে ঘাড় নেড়ে মেনে নেয় আমার প্রথম দর্শনে প্রেমের আতিশয্যকে, তাহলে তা স্বীকৃতি ছাড়া আর কিছু হতে পারে কী? ভালবাসার বদলে ভালবাসা এইভাবেই তো দিতে হয়। না, আর কোনো সন্দেহ নেই, ম্যাডাম ল্যানাডেও হাবুডুবু খাচ্ছে আমার প্রেমে। হাবুডুবু না খেলে এরকম বেপরোয়া ভাবে প্রেক্ষাগৃহ ভর্তি লোকের সামনে মাথা হেলিয়ে সায় দেয়? ঠিক আমার মতই এত বেহিসেবী হয়? আবোল-তাবোল চিন্তায় মাথার মধ্যে যখন ঘূর্ণিপাকের তাণ্ডব চলছে, ঠিক তখনি যবনিকা পড়ল মঞ্চে। উঠে দাঁড়াল দর্শকরা। যথারীতি ভীষণ হট্টগোলে ঘরের চারটে দেওয়াল ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল।

ধীরস্থির ভাবে ট্যালবটের সান্নিধ্য ত্যাগ করে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম ম্যাডাম ল্যানাডের দিকে। যতটা কাছে যাওয়া যায়। কিন্তু কাতারে কাতারে লোকের স্রোত ঠেলে ধারে কাছেও যেতে পারলাম না। ম্যাডামের পোশাকের

প্রান্ত-প্রদেশও স্পর্শ করতে পারলাম না। রওনা হলাম বাড়ির দিকে। ঠিক করলাম, আগামীকালই ট্যালবটের সাহায্য নিয়ে জমিয়ে আলাপ করব ওই দেবীমূর্তির সঙ্গে।

অসীম অস্থিরতার মধ্যে রজনী বিদায় নিল। সকালটাও কাটল ছটফট করে। সময় যেন আর কাটতে চায় না। অসহিষ্ণুতা যে কত কষ্টকর, তা বড় কষ্টসহ বুঝলাম সেদিন। অবশেষে বেলা একটার মুহূর্ত এল কাছাকাছি। এল শম্বুক গতিতে। কিন্তু সব যন্ত্রণারই শেষ আছে। আমার প্রতীক্ষা-যন্ত্রণারও অবসান ঘটল এক সময়ে। ঘড়িতে বাজল একটা। ঘণ্টাধ্বনির শেষ প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতেই ঢুকে পড়লাম বি-এর মধ্যে। জিজ্ঞেস করলাম, ট্যালবট কোথায়।

বেরিয়ে গেছে, জানাল ট্যালবটেরই নিজস্ব উর্দিপরা ভৃত্য।

বেরিয়ে গেছে! টলমলিয়ে দশ হাত পেছিয়ে এলাম আমি। তার পরেই বললাম তেড়েমেড়ে, হতেই পারে না! অসম্ভব। ট্যালবট বেরিয়ে যায়নি। ব্যাপারটা কী?

ব্যাপার কিছুই নয় স্যার। প্রাতরাশ খেয়েই উনি ঘোড়ায় চেপে চলে গেলেন। বলে গেলেন, এস-এর কাছে যাচ্ছি। দিন সাতেক শহরের বাইরে থাকব।

রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলাম। ম্যাডামের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ এইভাবে বানচাল করে দেওয়ার প্রচণ্ড ক্রোধে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে গেল। মুখের মত জবাব দেব বলে ঠিক করলাম, কিন্তু জিভ ব্যাটাছেলে বেইমানি করে বসল। অবশেষে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই ফিরে গেলাম এবং আগাগোড়া পরিকল্পনা করে গেলাম কিভাবে ট্যালবটের গুষ্টিশুদ্ধু নরকে চালান করা যায়। বেশ বোঝা গেল, আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুটি গীতিনাট্যের মুগ্ধ সমঝদার হওয়ার ফলে অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের কথা ভুলে মেরে দিয়েছে, আমাকে কথা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা বিস্মৃতির কোঠায় পাচার করে দিয়ে তম্ময় হয়ে গীতিনাট্য উপভোগ করে গেছে। কথা দিয়ে কথা রাখার অবশ্য ওর কোষ্ঠীতে লেখা নেই, কথার খেলাপ করে এসেছে চিরটাকাল। কিন্তু এখন তো কিছু করার নেই। খিঁচড়োনো মেজাজটাকে অতি কষ্টে বাগে এনে গুম হয়ে পথ হেঁটে চললাম আর পথিমধ্যে চেনা-অচেনা পুরুষ পেলেই জিজ্ঞেস করতে লাগলাম ম্যাডাম ল্যালাডের কথা। শুনলাম, তার নাম শুনেছে অনেকেই, কিন্তু দেখেছে খুব কম লোকেই, কেননা শহরে তো এসেছে মাত্র ক'সপ্তাহ আগে। আলাপ ঘটেছে মাত্র জনা কয়েকের সঙ্গে। এই জনাকয়েক আমার কাছে এমনই অজানা যে তাদের ল্যাজ ধরে ম্যাডামের কাছে যাওয়া যায় না। হতাশ হয়ে তিন জন বন্ধুর সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছি, তখন হঠাৎই সমাধানটা এসে গেল একেবারে হাতের কাছে।

সবিস্ময়ে বললে একজন, ওই তো যাচ্ছে ম্যাডাম ল্যানাডে!

আশ্চর্য সুন্দরী তো! বললে আর একজন।

ডানাকাটা পরী! বিপুল হর্ষ জাগ্রত হল তৃতীয় জনের কণ্ঠে।

ফিরে তাকালাম। একটা খোলা গাড়ি আসছে আমাদের দিকে। আসছে খুব আস্তে আস্তে। গাড়িতে বসে রয়েছে গত সন্ধ্যার সেই মনোমুগ্ধকর শরীরী রূপরাশি। পাশেই বসে কম বয়সী সেই মেয়েটি, বক্সে পাশাপাশি বসে যে গীতিনাট্য দেখেছিল কাল রাতে। সঙ্গিনী মেয়েটি দেখছি খুবই সুন্দরী, বললে তিন বক্তার প্রথম জন। বিস্ময়কর, দ্বিতীয়জনের সংযোজন, আজও অপরূপা!

যাই বল হে, পাঁচ বছর আগে প্যারিসে যে রূপ দেখেছিলাম, এখন তো দেখছি তা আরও বেড়েছে। অপূর্ব! তাই না ফয়সার্ট, মানে, সিম্পসন?

আজও বললে কেন? বলেছিলাম বিমূঢ় কণ্ঠে–

তবে হ্যা, সঙ্গিনীটি সুন্দরী হতে পারে, কিন্তু জোনাকির কাছে প্রজাপতির মতন।

অট্ট হেসে বিদায় নিল তিনজন। একটা জিনিস কিন্তু আমার নজর এড়ায়নি। পাশ দিয়ে গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে ম্যাডাম ল্যানাডে আমাকে দেখেছিল, চিনতে পেরেছিল এবং মৃদু হেসেছিল।

ট্যালবট ফিরে না আসা পর্যন্ত পরিচিত হওয়ার বাসনা শিকেয় তুলে রাখা ছাড়া আর পথ ছিল না। অবশ্য হাল ছাড়িনি আমি। আমোদ-প্রমোদের সব কটা জায়গায় অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে হানা দিয়ে গিয়েছি। একদিন ফল পেলাম। তাও দিন পনেরো পরে। দেখা মিলল সুন্দরীর। দৃষ্টি-বিনিময়ের রোমাঞ্চে মূর্চ্ছা যাওয়ার অবস্থাও ঘটল। এই পনেরোটা দিন কিন্তু সমানে ট্যালবটের খোঁজ নিয়েছি। প্রতিদিনই উর্দিপরা ভৃত্যের একই জবাব শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছি। এখনো ফেরেননি, এই বাঁধা গৎ শুনতে হয়েছে প্রতিদিন।

এবার বলা যাক আমার দুঃসাহসিকতার ঘটনা। ম্যাডাম ল্যানাডেকে তো দেখলাম প্রমোদ-কেন্দ্রে, দৃষ্টি বিনিময়ও ঘটল, তারপর থেকেই মাথায় ঢুকলো দুশ্চিন্তা। ম্যাডাম থাকে প্যারিসে, এক সময়ে ফিরেও যাবে প্যারিসে। তার আগে যদি ট্যালবট না ফেরে? তাহলে তো আর দেখা হবে না! সুতরাং প্ল্যানটা ছকে ফেললাম তৎক্ষণাৎ। প্রমোদ-কেন্দ্র থেকে ম্যাডাম বাসভবনে ফিরতেই আমিও পেছন পেছন গিয়ে দেখে নিলাম বাড়ির ঠিকানা। পরের দিন সকালেই লিখলাম বিরাট এক চিঠি। জ্বলন্ত ভাষায় প্রকাশ করলাম আমার মানসিক অবস্থা। সেই

সকালেই পত্র প্রেরিত হল যথাস্থানে।

চিঠি লিখলাম খোলাখুলি, সাহসে বুক বেঁধে চয়ন করেছিলাম প্রতিটি শব্দ, আবেগের বন্যা বইয়ে দিয়েছি ভাষায়। লুকোয়নি কিছুই, আমার প্রচণ্ড দুর্বলতার কিছুই বাদ দিইনি। প্রথম দর্শনে যে রোমান্টিক পরিবেশ বিরাজ করেছিল চারপাশে, তার বর্ণনা দিয়েছি প্রাণস্পর্শী ভাষায়। এমন কি ঝলক চাহনির সময়ে চার চোখের মিলনের মাধুর্যও ফুটিয়ে তুলেছি কবিত্বময় ভাষায়। কপাল ঠুকে বলে ফেলেছি আমার প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ার কাহিনী। ম্যাডাম ল্যানাডে যেন আমার এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করে। প্রাণের আবেগে এবং খাঁটি প্রেমে জ্বলেপুড়ে মরছি বলে এ চিঠি না লিখেও পারছি না। কারণ আরও একটা আছে। শুনেছি ম্যাডাম নাকি শহর ছেড়ে চলে যেতে পারে। তার আগেই কি পরিচিত হওয়ার সুযোগটা পাব না ? সবশেষে সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছি আমি নেহাৎ ফেলনা পাত্র নই। টাকা পয়সা আছে বিলক্ষণ। হৃদয় তো সঁপে দিয়েছি, এখন হাত জোড়াও ম্যাডামের দু'হাতে তুলে দিতে ব্যগ্র। চিঠি তো পাঠালাম। তারপর শুরু হল প্রতীক্ষার দুঃসহ যন্ত্রণা। জবাব এল যেন এক শতাব্দী পরে।

সত্যিই এল। রীতিমত রোমাণ্টিক ব্যাপার নিঃসন্দেহে, কিন্তু সত্যি সত্যিই ধনবতী, রূপবতী ম্যাডাম ল্যানাডে জবাব দিল আমার ধৃষ্টতাপূর্ণ চিঠির। মেয়েটার চোখ যেমন সুন্দর, হৃদয়ও তেমনি সুন্দর। চোখের দর্পণে যে প্রতিফলন দেখেছিলাম, তা মরীচিকা নয়। নিখাদ ফরাসী মহিলার মতই অন্তরের আহ্বানে সে সাড়া দিয়েছে, যুক্তির তাড়নায় চালিত হয়েছে, নিজস্ব প্রকৃতির বেগে বিচলিত হয়েছে। দুনিয়ায় চলে-আসা রীতিনীতির ধার ধারেনি। আমার প্রস্তাবে সে নাক সিঁটকোয়নি, ধিক্কার জানায়নি। নৈঃশব্দের গহনে আত্মগোপনও করেনি। আমার চিঠি না খুলে ফিরিয়েও দেয়নি। উল্টে নিজেই একখানা চিঠি লিখেছে নিজের হাতে, পেলব আঙুল দিয়ে কলম ধরে লিখেছে ঃ

মঁসিয়ে সিম্পসন ক্ষমা করবেন তাঁর দেশের অপূর্ব ভাষা আমি লিখতে পারি না বলে। এই তো সেদিন এলাম এদেশে, সাহিত্য চর্চা করবার সুযোগ পাইনি।

অশিষ্টতার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে জানাই, মঁসিয়ে সিম্পসন যা সত্যি, তা বুঝে ফেলেছেন। আর বেশি কিছু বলার কি আছে ? আমিও কি কথা বলার জন্যে ছটফট করছি না ?

ইউজিনি ল্যানাডে

উদার মনের পরিচয় ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত সেই চিঠিতে। চিঠিটাকেই চুম্বন করে ফেললাম দশলক্ষবার। তারপরেও আরও অনেক বাড়াবাড়ি করেছিলাম, এখন আর তা মনে নেই।

এত কাণ্ড ঘটে গেল, কিন্তু ট্যালবট তখনও নিপাত্তা। তার অবর্তমানে আমার মানসিক যন্ত্রণার অবস্থা ছবিও যদি ওর মনের আয়নায় ঝলসে উঠত, ছুটে না এসে পারত না সমবেদনা জানাতে। ওর স্বভাব তো জানি, কেউ ফ্যাসাদে পড়লে বুক দিয়ে পড়ে তাকে বাঁচাবে। কিন্তু টিকি দেখা গেল না ট্যালবটের। চিঠি লিখলাম। জবাবও দিল। জরুরী কাজে আটকে গেছে, শীগগিরই ফিরবে। আমি যেন অধীর না হই। জোড়ে গাড়ি না চালাই, স্নায়ুশীতল রাখার উপযুক্ত বই-টই পড়ি, 'হক' সুরার চাইতে উগ্র সুরা যেন পান না করি, উচ্চদর্শনের সান্ত্বনা-বাণী দিয়ে যেন নিজেকে প্রশমিত রাখি।

মূর্খ! নিজে না আসতে পারলেও একটা পরিচয় পত্র লিখে দিতে কি হয়েছিল? সেই অনুরোধ করেই চিঠি লিখলাম সেদিনই-এক্ষুণি যেন পাঠায় পরিচয় পত্র। ফেরৎ এল চিঠি। সেই সঙ্গে খাস ভৃত্যের একটা চিরকুট। অশুদ্ধ ভাষায় লিখেছে ট্যালবট এখন কোথায় গেছে জানা নেই। ঠিকানা রেখে যায়নি। আমার হাতের লেখা দেখে খাস ভৃত্য বুঝেছে কার চিঠি। তাই ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছে।

এরপর বলা বাহুল্য আমি খাস ভৃত্যসহ ট্যালবটের নরকসন্দর্শনের দ্রুত ব্যবস্থার জন্যে মনে প্রচণ্ড কামনা করেছিলাম। কিন্তু রেগে তো লাভ নেই। অভিযোগ করলেই বা সান্ত্বনা জানাচ্ছে কে?

কিন্তু আমার একগুঁয়ে চরিত্রের দৃঢ়তা তো যাবার নয়। যা গোঁ ধরেছি, তা করব তবে ছাড়ব। একগুঁয়েমির সুফল তো হাতে হাতেই পেয়ে এসেছি, এবার দেখাই যাক না শেষপর্যন্ত কি দাঁড়ায়। তাছাড়া, যে ধরনের পত্র বিনিময় ঘটে গেল আমার আর ম্যাডামের মধ্যে, এরপর যদি আরও একধাপ এগোই, ম্যাডাম নিশ্চয় তা অশোভন বলে মনে করবে না। বাড়ির ঠিকানাটা জানবার পর থেকেই আড়ালে আবডালে থেকে নজর রাখতাম সেদিকে। দেখেছিলাম, গোধূলির আলোয় বাড়ির সামনে পাবলিক পার্কে সান্ধ্য-ভ্রমণ করে অপরূপা। সঙ্গে থাকে একজন নিগ্রো পরিচারক। গাছপালার সবুজ স্নিগ্ধতা আর মধ্য-গ্রীষ্মের সুমিষ্ট দিনাবশেষের ধূসর আলোয় তার সান্নিধ্যে আসার খসড়া ছকে ফেললাম মনে মনে।

চাকরটার চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে ঠিক করেছিলাম এমনভাবে ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলব যেন পরিচয়টা অনেকদিনের। করলামও তাই। খাঁটি প্যারিসবাসীদের মতই উপস্থিত বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখাল ম্যাডাম। চকিতে বুঝে নিলে আমার মতলব এবং সম্বর্ধনা জানাতে তৎক্ষণাৎ বাড়িয়ে ধরল মনোমুগ্ধকর ছোট্ট দুটি হাত। দেখেই পিছিয়ে গেল নিগ্রোভৃত্য। ব্যস আর কে পায় আমাদের! হৃদয়জোড়া প্রেম-তুফান ফেটে

পড়ল সুদীর্ঘ কথোপকথনে।

ম্যাডাম ল্যানাডের ইংরেজি খুবই মন্থরগতি। চিঠির ভাষায় যাও বা গতি ছিল, মুখের কথায় তাও নেই। অগত্যা কথাবার্তা চলল ফরাসী ভাষায়। ঝড়ের মত কথা বলে গেলেও মিষ্টি মিষ্টি শব্দগুলো আউড়ে যেতে ভুল করিনি। প্রচণ্ড উৎসাহ আর আবেগ সত্ত্বেও বাকপটুতায় ঢিলেমি দিইনি। তাই বিয়ের কথা পাড়তে মোটেই জিভ জড়িয়ে যায় নি।

অধীরতা দেখে মিষ্টি মিষ্টি হেসেছিল ম্যাডাম ল্যানাডে। মান্ধাতার আমলের সামাজিক লৌকিকতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল। বহু সুখকে আটকে রেখে দিয়েছে যে লৌকিকতা এবং সময় পার হয়ে যাওয়ার পর সুখ যখন আর সুখ থাকে না-যখন মিলনের পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছে যে লৌকিকতা, এই সেই জঘন্য সামাজিক ব্যাপার। আমি নাকি নিতান্ত অবিবেচকের মত বন্ধুবান্ধবের কাছে বলে বেড়িয়েছি ম্যাডাম ল্যানাডের বৃত্তান্ত। তার সঙ্গকামনায় আমি যে পাগল হতে বসেছি, কারও আর তা জানতে বাকি নেই। তাছাড়া, এই যে পাবলিক পার্কে দেখাটা হয়ে গেল, এটাও আর গোপন থাকবে না। এই পর্যন্ত বলেই মুখ-টুক লাল করে কথা ঘুরিয়ে নিয়ে এমন এক প্রসঙ্গে চলে গেল ম্যাডাম যে প্রসঙ্গে সব মেয়েই আরক্ত হয়ে ওঠে। এত ঝটপট বিয়ে হওয়াটা কি ঠিক? ব্যাপারটা অশালীন, অসঙ্গত এবং অন্যায় হয়ে যাবে না? ভারি মিঠে স্বরেই প্রাণজুড়ানো ভঙ্গিমায় বুকে শেল বেঁধানো কথাগুলো অম্লানবদনে বলে গেল ম্যাডাম। বুক খান্ খান্ হয়ে গেলেও যুক্তির ধারে কাছে হার মানলাম। আমি যে ভয়ানক অবিবেচক, অদূরদর্শী এবং হঠকারী, তাও হাসতে হাসতে ঠাট্টার ছলে বলতে ছাড়ল না ম্যাডাম। ম্যাডাম ল্যানাডে আসলে কে, কি তার ভবিষ্যৎ, তার আত্মীয়স্বজন, সমাজে তার জায়গাটা কোথায়-কিছুই কি জানি আমি? দীর্ঘশ্বাস ফেলে সবশেষে বললে, একটু যেন ভেবে দেখি বিয়ের কথাটা। ভালোবাসা বলে যা নিয়ে পাগল হচ্ছি, হয়তো দেখা যাবে তা মনের মিছে ছলনা আর নিছক আলেয়ার আলো। গোধূলির মধুর ছায়া যখন চারিদিকে ঘনায়মান, তখনই সেই ছায়াঘন মায়াময় পরিবেশে খুব সহজভাবেই হৃদয়বিদারক কথাগুলো বলে নিমেষে যেন নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিল ম্যাডাম।

সত্যিকারের প্রেমিক এই পরিস্থিতিতে যতখানি গুছিয়ে জবাব দিতে পারে, তাই দিয়েছিলাম। এবং অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে গেছিলাম। বলেছিলাম আমার প্রেমের গভীরতা অতুলনীয়, আবেগ অপরিমেয়, নিষ্ঠা অবিচল। বলেছিলাম, ম্যাডাম ল্যানাডেকে আমি অকারণে মনের মণিকোঠায় বসাইনি, তার মত রূপসী ধরাধামে আর দুটি আছে কিনা সন্দেহ। ভূয়সী প্রশংসা কি অকারণে করেছি? প্রেমের পথ চিরকালই

কণ্টকাকীর্ণ, কুসুমাস্তীর্ণ কোনোকালে ছিল? কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত চরণে দীর্ঘপথ চলার চেয়ে পথ চলা কমিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়? খামোকা কষ্ট পেয়ে লাভ কি?

শেষ যুক্তিটা মনে হল ম্যাডামের অনড় মনোভাবকে একটু নাড়িয়ে দিল। একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত হল। কিন্তু আরও একটা বাধা নাকি আছে, আমি তো তলিয়ে ভাবিনি। বিষয়টা খুবই সূক্ষ্ম। মেয়েরা তাই এই নিয়ে চাপ দিতে চায়। আলোচনাও করতে চায় না। কিন্তু আমার খাতিরে ম্যাডামকে এই বাধাও কাটিয়ে কথাটা পাড়তে হচ্ছে। বিষয়টা বয়স নিয়ে। দুজনের মধ্যে বয়সের ফারাকটা কি আমি খেয়াল করেছি? পতিদেবতাদের বয়স জীবন-সঙ্গিনীদের চাইতে একটু বেশিই থাকে। পনেরো কি কুড়ি বছরও বেশি হতে পারে। সমাজ তা মেনে নেয়। বরং আদর্শ বলেই স্বীকার করে। ম্যাডামের কিন্তু বরাবরের বিশ্বাস, মেয়েদের বয়স যেন কখনই স্বামীদের বয়স না ছাড়িয়ে যায়। এর অন্যথা ঘটলে অনেক বিপর্যয় ঘটে। সুখ চোঁচাঁ দৌড় দেয় দেয় দাম্পত্যজীবন থেকে। আমার বয়স যে বাইশ, ম্যাডাম তা আঁচ করে নিয়েছে। আমি কিন্তু বুঝতেই পারিনি ইউজিনির বয়স তার চাইতে অনেক.........অনেক বেশি।

আহো! অহো! অহো! অন্তর কত সুন্দর হলে, নারী কত মহীয়সী তবে এমন কথা বলা যায়! উচ্ছ্বাসে, আবেগে, হর্ষে, বিস্ময়ে আমি আপ্লুত হয়ে গেলাম।

এবং বললাম সোল্লাসে-প্রিয়তমা ইউজিনি, বয়স নিয়ে মাবড়াচ্ছ? আমার চাইতে কয়েক বৎসরের বড় তুমি ঠিকই। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? এই দুনিয়ায় কোনো সামাজিক রীতিনীতি ত্রুটিহীন বলতে পার? তোমার আমার মত প্রেম সাগরে সাঁতার দিয়ে চলেছে যারা, তাদের কাছে একটা বছরের সঙ্গে একটা ঘণ্টার তফাৎ আছে কি? তুমি বললে আমার বয়স বাইশ। তেইশও বলতে পার। কতবড় আমার চাইতে তুমি হতে পার প্রিয়দর্শিণী ইউজিনি? বড়জোর...বড়জোর...বড়জোর বড়জোর-

· এই পর্যন্ত বলেই ক্ষণেকের জন্যে ক্ষ্যামা দিয়েছিলাম। আশা করেছিলাম, ম্যাডাম ল্যানাডে নিজেই আমার মুখ বন্ধ করে দিয়ে নিজের আসল বয়সটা বলবে। কিন্তু ফরাসি মেয়েরা সরাসরি কথা বলে কদাচ। হতবুদ্ধিকর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হাজির করে নিজেরই একটা বাস্তব সমস্যা। এক্ষেত্রে দেখলাম, বেশ কিছুক্ষণ ধরে বুকের বস্ত্রের মধ্যে কি যেন খুঁজছে ম্যাডাম। তার পরেই টুপ করে ঘাসের ওপর খসে পড়ল ছোট্ট একটা ছবি। সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়ে দিলাম ম্যাডামের হাতে।

ইউজিনি কিন্তু দেবীর মত হেসে ছবিটা ফিরিয়ে দিল আমার হাতে। বললে বীণা-ঝঙ্কৃত স্বরে, তোমার কাছেই রাখো। যা জানতে ব্যাকুল হয়েছ, ওর পেছনেই তা দেখতে পাবে। এই অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করে লাভ নেই, সকালের আলোয় ভাল করে দেখ। আজ রাতে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি গীতিসন্ধ্যায়, আমার বাড়িতে। বন্ধুবান্ধবরা আসছে গান গাইতে। তোমাকে আমার পুরনো বন্ধু হিসাবে ভিড়িয়ে দেব।

হাতে হাত দিয়ে ইউজিনি আমাকে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে। রুচিসম্মত বিরাট প্রাসাদ। অন্ধকারে রুচির ব্যাপারে আমি যদিও মাতব্বর নই। কোনটা যথার্থ রুচিপূর্ণ, আর কোনটা নয়, এ বিচারে উত্তম বিচারক হতে অক্ষম আলো কম থাকলে। তখন অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়েছে। আমেরিকার বাড়ির মত এখানে আলোর ঝলমলানিও তেমন নেই, বিশেষ করে এই প্রদোষকালে। ঘণ্টাখানেক পরে একটা মাত্র আলো জ্বলে উঠল মূল বসার ঘরে। সেই আলোয় দেখলাম, বিরাট ঘরটা মূল্যবান এবং রুচিসম্মত আসবাসপত্র দিয়ে সাজানো। কিন্তু অন্য দুটি ঘরে ছায়া বিরাজমান রইল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। অথচ এই দুটো ঘরেই অতিথি সমাগম হল সব চাইতে বেশি। অস্বস্তিকর এই ছায়ামায়া দেখলাম অনেকের কাছেই বেশ ভালো লাগছে। কখনো আলোকিত ঘরে এসেছে, কখনো অন্ধকার ঘরে গিয়ে বসেছে। আমেরিকায় অতিথিদের কিন্তু বাছবিচারে সুযোগই দেওয়া হয় না।

সন্ধ্যাটা কাটল মনোরমভাবে। জীবনে কোনো সন্ধ্যা এত সুখপ্রদ হয়নি আমার কাছে। ম্যাডাম ল্যানাডের বন্ধুরা সত্যিই ভাল গান গায়। ভিয়েনাতেও সখের গাইয়েদের গলায় এমন গান শুনিনি। বাজনাও চমৎকার। অতি উচ্চমানের। মেয়েরাই গান গাইল বেশি। তারপর ডাক পড়ল ম্যাডামের। বিনা দ্বিধায় উঠে গেল ইউজিনি। সঙ্গে গেল গাইয়ে মেয়েদের একজন। এবং আরও দুজন ভদ্রলোক। বসল মূল বসবার ঘরে পিয়ানোর সামনে। আমার ইচ্ছে ছিল সঙ্গে যাওয়ার। কিন্তু বাড়াবাড়ি করাটা ঠিক হবে না বুঝে বসে রইলাম এদিকের ঘরে। ইউজিনিকে না দেখতে পেলেও গানের লহরী মনপ্রাণ জুড়িয়ে দিল আমার।

গান তো নয়, যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ। শ্রোতারা তো অবশ হলেনই, আমার ওপর প্রতিক্রিয়াটা ঘটল আরও বেশি। কিভাবে সে গানের পর্যাপ্ত বর্ণনা দেব, আমার জানা নেই। গানের মধ্যে প্রেমের আবেগ আছে ঠিক, সব চাইতে বেশি আছে যে গাইছে তা প্রাণরসের প্রাচুর্য। উচ্চারণ অসাধারণ। আজও অনুরণিত হচ্ছে কানের মধ্যে। কণ্ঠস্বর যখন নিচে নামছে, তখন বুকের মাঝে যেন মোচড় দিচ্ছে, যখন ওপরে উঠছে, স্মরণীয়

হাহাকারে বক্ষ বিদীর্ণ হতে চলেছে। এত সুর, এত দরদ, এত প্রাণস্পর্শী উচ্চারণ। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। পিয়ানো ছেড়ে আমার পাশে এসে বসেছিল ইউজিনি। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু প্রচণ্ড বিস্ময়বোধকে প্রকাশ করতে পারিনি। এ বিস্ময় ইউজিনির গানের গলা নিয়ে। যখন কথা বলে, তখন যেন সামান্য কাঁপা কাঁপা, ঈষৎ দুর্বলতা জড়ানো। কিন্তু গলা ছেড়ে গান ধরতেই মিলিয়ে গেছে স্বাভাবিক গলা, কি অসামান্য ক্ষমতা থাকলে না জানি এ কাণ্ড সম্ভব হয়।

দুজনে কথা বলেছিলাম অনেকক্ষণ ধরে। কেউ বাধা দেয়নি, বাগড়া দেয়নি। আশ-মিটিয়ে বলে গিয়েছিলাম নিজের কথা। সে তো সাতকাণ্ড রামায়ণ বললেই চলে। কিন্তু হাসি মুখে ধৈর্য ধরে শুনে গিয়েছিল ইউজিনি। একটা কথাও গোপন করব না ঠিক করেছিলাম। তাই হাউ হাউ করে বলে গিয়েছিলাম জীবনে ছোটখাট কত পাপ করেছি, শরীরে এবং বিবেকে কতরকমের দুর্বলতা আছে, কলেজ লাইফে কবার ধার করেছি এবং কাকে ভালোবেসেছিলাম। একবার দারুণ কাশির ব্যায়রাম উঠেছিল, তারপরে ক্রনিক বাতে ভুগেছি। বংশগতির প্রকোপে। সব শেষে বললাম আমার চোখের দুর্বলতার কথা।

এইখানেই হেসে উঠল ইউজিনি। বললে, স্বীকার করে ভালোই করলে। না করলেও তোমার এই শেষ দুর্বলতাটা তো একদিন জানাজানি হবেই, বলতে বলতে গাল লাল করে ফেলল এমন ভাবে যে অন্ধকারেও স্পষ্ট তা দেখতে পেলাম আমি, আমার এই ছোট্ট চক্ষু-সহায়টা দেখেছ নিশ্চয়ই ?

দু'আঙুলে একটা ডবল আই-গ্লাস দোলাতে দোলাতে বলেছিল ইউজিনি, দু'চক্ষের বালি বস্তুটাকে দেখেছিলাম ওর গলায় দুলতে গীতিনাট্যের আসরে।

বলেছিলাম কিন্তু সোল্লাসে, দেখেছি বইকি, দেখা যাক আরও ভাল করে, বলে হাতে নিয়েছিলাম ডবল আই-গ্লাসটা। রত্নখচিত অপূর্ব খেলনা বললেই চলে। অন্ধকারেও বুঝলাম জিনিসটার দাম অনেক। খুশী-উচ্ছল কণ্ঠে বলেছিল ইউজিনি, তোমার প্রেমে আমি মুগ্ধ। কালকেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হব, এই আমার প্রতিজ্ঞা। বিনিময়ে ছোট্ট একটা অনুরোধ রাখবে ?

একশোবার ! এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম যে আশপাশের সবাই চমকে উঠে তাকিয়েছিল আমার দিকে। তাকিয়েছিল বলেই ঝট করে সামলে নিয়েছিলাম নিজেকে, নইলে নির্ঘাৎ আছড়ে পড়তাম ইউজিনির পদতলে। ইউজিনি, প্রিয়তমা ইউজিনি, বলো কি অনুরোধ রাখতে হবে.........শুধু একটিবার বলো।

শুধু এই চশমাটি পড়তে হবে।

চশমা!

ডবল আই-গ্লাস তো। অ্যাডজাস্ট করে নিলেই চশমা হয়ে যাবে। তোমার মহত্ত্ব তাতে আরও বিকশিত হবে। এখন চোখের দুর্বলতার জন্যে যা অপ্রকট রয়েছে, তা প্রকটতর হবে। বলো পারবে? মূল্যবান রত্ন তো, আদর করে কোটের পকেটে রেখে দেবে। রাজী? বলো, রাজী? রাজী হয়ে গেলেই জানব আমাকে সত্যিই তুমি ভালবাস।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, অদ্ভুত অনুরোধটা শুনে একটু গোলমালে পড়েছিলাম। কিন্তু আপত্তির প্রশ্নই ওঠে না, ঐ পরিস্থিতিতে।

রাজী! ভেতরে ভেতরে দমে গেলেও যথাসম্ভব সোৎসাহে বলেছিলাম, রাজী! রাজী! রাজী! সানন্দে রাজী! তোমার জন্যে.........শুধু তোমার জন্যে, শুধু চশমা-বিতৃষ্ণা কেন, সবকিছুই ত্যাগ করতে আমি রাজী। আজ রাতে এই আই-গ্লাস নিছক আই-গ্লাস হিসেবেই ঝুলবে আমার গলায়, বুকের ওপর। কাল সকাল হলেই যখন তোমাকে বধূ বলবার সৌভাগ্য হবে, তখন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই আই-গ্লাস চশমা হয়ে এঁটে বসে থাকবে আমার নাকে।

কথার মোড় ঘুরে গেল এরপরেই। কালকের ব্যবস্থা নিয়ে শুরু হল আলোচনা। ট্যালবট নাকি শহরে ফিরছে এক্ষুনি। আমিও বেরোব এক্ষুনি তার খোঁজে। একটা গাড়ি জোগাড় করতে হবে। গানের সভা রাত দুটোর আগে ভাঙবে বলে মনে হয় না। সেই সময়ে গাড়ি হাজির থাকবে দরজার সামনে। সবাই যখন বেরোচ্ছে, তখনকার সোরগোলে সবার অগোচরে ম্যাডাম উঠে বসবে গাড়িতে। সোজা যাব একজন অপেক্ষমান পাদরীর বাড়িতে। বিয়েটা সেরে নেব। ট্যালবটকে ওর বাড়িতে নামিয়ে দেব। তারপর রওনা হব পূর্বঅঞ্চলে। প্রাচ্যের কোথাও নিরিবিলি সংসার পাতব দুজনে-সৌখিন সমাজ যখন কানাঘুসোয় সোচ্চার হবে, আমরা তখন পগারপার!

পরিকল্পনাটা ঠিক হয়ে যেতেই আর একটা মুহূর্ত বাজে অপচয় করিনি। তক্ষুণি পিঠটান দিয়েছিলাম গাইয়েদের আড্ডা থেকে। ট্যালবটের খোঁজে যাওয়ার আগে একটা হোটেলে ঢুকেছিলাম ছোট্ট ছবিটা আই-গ্ল্যাসের মধ্যে দিয়ে খুঁটিয়ে দেখব বলে। দেখেওছিলাম। মুখাবয়ব বিস্ময়কর ভাবে রূপমণ্ডিত! ভাষায় বর্ণনা করা যায় না দীঘির মত টলটলে বিশাল নয়নযুগলকে! যেন জ্যোৎস্নার কিরণধারায় ঝলকিত। আর নাক? গ্রীক মূর্তিতেই এমন নাকের বাহার দেখেছি এতাবৎকাল! কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ অবর্ণনীয়! পুলকিত হর্ষে আপনমনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে ছবিটা উল্টে পেছন দিকে

দেখলাম লেখা রয়েছে–ইউজিনি ল্যানাডে–বয়স সাতাশ বছর সাত মাস।

ট্যালবট বাড়িতেই ছিল। আমার সৌভাগ্য-কাহিনী শুনিয়ে ছাড়লাম তৎক্ষণাৎ। শুনে একটু বেশি রকমের অবাক হয়ে গেলেও অভিনন্দন জানালো প্রাণ থেকে এবং কথা দিলে যতরকমভাবে সাহায্য করা যায়, তা সে করবে। কথা রইল অক্ষরে অক্ষরে। রাত দুটো নাগাদ দেখা গেল আমি আর ইউজিনি (মিসেস সিম্পসনও বলা যায়) একটা ঢাকা গাড়িতে বসে আছি, গাড়ি ছুটে চলেছে উত্তর পশ্চিম দিকে। দুটোর ঠিক দশ মিনিট আগে বিবাহপর্ব সেরে নিয়েছিলাম পাদরী সাহেবের বাড়িতে।

ট্যালবটই ঠিক করে রেখেছিল, শহর থেকে সাতাশ মাইল দূরে একটা গ্রাম্য সরাইখানায় বাকি রাতটা কাটাতে হবে। কেন না, যেতে হবে অনেকদূরে। একটু জিরিয়ে নেওয়া দরকার। প্রাতরাশ খেয়েই আবার যাত্রা শুরু হবে। ঠিক চারটের সময়ে গাড়ি এসে দাঁড়ালো মূল সরাইখানার সামনে। নতুন বউ-এর হাত ধরে নামিয়ে আনলাম গাড়ি থেকে। ঝটপট প্রাতরাশ আনার হুকুম দিয়ে দুজনে বসলাম ছোট্ট একটা বারান্দায়।

তখন ভোরের আলো ফুটছে। অনিমেষে চেয়েছিলাম পার্শ্ববর্তিনী অনিন্দ্যসুন্দরীর দিকে। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল, এতদিন যাকে বধূরূপে পাওয়ার জন্যে উন্মাদ হয়েছিলাম, আজ সে আমার বধূ, আমার সহধর্মিণী, আমার জীবনমরণের সঙ্গিনী। অতএব কাছ থেকে খুঁটিয়ে অবলোকন করা যাক। দিনের আলোয় এমন সুযোগ তো কখনো পাইনি।

আমার অভিপ্রায় আঁচ করে নিয়ে মধুর হাসি হেসে প্রাণেশ্বরী ইউজিনি বললে, কাল রাতে কি কথা দিয়েছিলে মনে আছে? সকাল হলেই চশমা পরবে আর সারাজীবন নাকে এঁটে রাখবে?

আলবৎ মনে আছে, বলেছিলাম সহর্ষে-প্রতিটি শব্দই মনে আছে। কথা যখন দিয়েছি, রাখব বইকি। এই রাখলাম। নাকে আঁটলাম তোমার দেওয়া চশমা, বলতে বলতে অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে আই-গ্লাসটাকে চশমায় রূপান্তর করে নিয়ে এঁটে বসিয়ে দিলাম নাকে। অমনি ইউজিনিও নড়েচড়ে শক্ত হয়ে বসল চেয়ারে, বসার ভঙ্গিমাটা খুব একটা মহিমময় বলে মনে হল না আমার কাছে।

চশমার রিম নাকে বসতে না বসতেই কিন্তু চিল্লিয়ে উঠেছিলাম আমি-হল কি চশমাটার? বলেই একটানে নাক থেকে খসিয়ে এনে জোরে জোরে কাঁচ মুছেছিলাম সিল্কের রুমাল দিয়ে। আবার লাগিয়েছিলাম নাকে।

প্রথমবার অবাক হয়েছিলাম, দ্বিতীয়বার হলাম হতভম্ব। নিছক হতভম্ব বললে কম বলা হবে। মানুষ যখন চূড়ান্ত মাত্রায় হতভম্ব হয়, তখন তা নিদারুণ আতঙ্কে পর্যবসিত হয়। আমিও চশমার মধ্যে দিয়ে চোখের সামনে যেন এক মূর্তিমতী বিভীষিকাকে প্রত্যক্ষ করলাম। কোনো মেয়ে এত কদাকার হয়? চোখকে বিশ্বাস করব কিনা, এই সংশয় জাগল মনের মধ্যে। ওটা কী? কুঁজ? ওগুলোই বা কী? বলিরেখা? ইউজিনি ল্যানাডের সুন্দর আননে? হে ভগবান! একী দেখছি আমি! দাঁতের এ অবস্থা হল কী করে? টান মেরে চশমা আছড়ে ফেললাম মেঝেতে, তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম চেয়ার ছেড়ে, দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে রেখে দাঁড়ালাম ঘরের ঠিক মাঝখানে। রাগে ফুঁসছি। দেঁতো হাসি হাসতে গিয়ে টের পেলাম কষ বেয়ে লালা গড়াচ্ছে। মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটিও বার করতে পারছি না। মিসেস সিম্পসন বসে রয়েছে অদূরে। কিন্তু আমি একেবারে বাক্যহারা। আতঙ্ক আর ক্রোধ অসাড় করে তুলেছে জিহ্বা প্রত্যঙ্গকে।

আগেই বলেছি ম্যাডাম ইউজিনি ল্যানাডে ইংরিজি ভাষাটা কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে যাও বা লেখে, বলতে গিয়ে হোঁচট খায় আরও বেশি। সেই কারণেই, বিশেষ হেতু না ঘটলে ইংরিজি বলার ধার দিয়েও যায় না। কিন্তু মেয়েরা রেগে গেলে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এ ক্ষেত্রেও মিসেস সিম্পসন একেবারেই তা হারিয়ে ফেলল এবং যে ভাষাটা কানে শুনেও ভালভাবে বুঝতে পারে না, রাগের মাথায় খাঁপাই জুড়ল সেই ভাষাতেই।

বলি ব্যাপারটা কী? ওভাবে নাচছ কেন? পছন্দ হচ্ছে না আমাকে?

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলেছিলাম, ডাইনি! শয়তানী! বুড়ি শুওরনি!

বুড়ি? আমি? বিরাশি বছরের মেয়েকে কেউ বুড়ি বলে?

বিরাশি! টলে উঠে পড়েই যাচ্ছিলাম, দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে খাবি খেতে লাগলাম অতি কষ্টে, ছবিটায় তো লেখা ছিল সাতাশ বছর সাত মাস!

ঠিকই দেখেছিলে। পঞ্চান্ন বছর আগে আঁকা ছবি, দ্বিতীয়বার মঁসিয়ে ল্যানাডেকে বিয়ে করার সময়ে। আমার প্রথম স্বামী মঁসিয়ে ময়সার্টের মেয়ের জন্যে আঁকিয়েছিলাম!

ময়সার্ট!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ময়সার্ট! আমার বিস্ময়াহত সুরটা এমন জঘন্যভাবে অনুকরণ করল ইউজিনি যে গা রি-রি করে উঠল আমার। হয়েছে কি তাতে? ময়সার্টকে চেনো না?

কস্মিনকালেও না। আমার এক পূর্বপুরুষের নাম ময়সার্ট

ছিল, এইটুকুই শুধু জানি। কিন্তু তুই বুড়ি-

চমৎকার নাম, তাই না? ভয়সার্ট নামটাও খাসা। আমার মেয়ে কুমারী ময়সার্ট বিয়ে করেছিল মঁসিয়ে ভয়সার্টকে।

ময়সার্ট! ভয়সার্ট! কী বলতে চাস তুই?

কি বলতে চাই? বলতে চাই ময়সার্ট আর ভয়সার্ট। ক্রয়সার্ট আর ফ্রয়সার্ট। আমার মেয়ের মেয়ে কুমারী ভয়সার্ট বিয়ে করেছিল মঁসিয়ে ক্রয়সার্টকে। আর আমার মেয়ের নাতনি কুমারী ক্রয়সার্ট বিয়ে করেছিল মঁসিয়ে ফ্রয়সার্টকে। খাসা নাম, তাই না?

ফ্রয়সার্ট! মনে হল এবার বুঝি আমি অজ্ঞান হয়ে যাব। ময়সার্ট, ভয়সার্ট, ক্রয়সার্ট, ফ্রয়সার্ট-!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ময়সার্ট, ভয়সার্ট, ক্রয়সার্ট, ফ্রয়সার্ট। মঁসিয়ে ফ্রয়সার্ট একটা আস্ত গাধা। মরতে গিয়েছিল আমেরিকায়। সেখানে তার একটা ছেলেও হয়েছিল, পয়লা নম্বরের উজবুক ছোকরা, আগে কখনো দেখিনি, আমার সঙ্গিনী ম্যাডাম স্টিফানি ল্যানাডেরও সে দুর্ভাগ্য হয়নি, ছোকরার নাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফ্রয়সার্ট! খাসা নাম, তাই না?

বলতে বলতেই যেন হিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হল ইউজিনি। তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে এল ঘরের মাঝে। মনে হল যেন ভূতে ভর করেছে। ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে মাথার টুপি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চুলে টান মারতেই কুচকুচে কালো পরচুলা খসে পড়ল মেঝেতে। বিকট চিৎকার করে পরচুলার ওপর নাচতে নাচতে আস্তিন গুটিয়ে ঘুসি পাকিয়ে নাড়তে লাগল আমার নাকের ডগায়। অব্যাহত রইল কানের পর্দা ফাটানো চিৎকার আর ডাকিনী-নৃত্য, দাঁত খিঁচুনি আর কটমট করে চাওয়া! অকস্মাৎ দাঁত কিড়মিড় করতেই নকল দাঁত ঠিকরে গেল মুখ থেকে!

ইতিমধ্যে আমি বসে পড়েছি একটা খালি চেয়ারে। বিড়বিড় করছি আপন মনে, ময়সার্ট আর ভয়সার্ট! খুবই চিন্তিত মনে বার বার নাম দুটো যখন আওড়ে চলেছি, ইউজিনি তখন উদ্দাম নাচ নাচতে নাচতে এক হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলেছে নকল বুকের একটা দিক। ক্রয়সার্ট আর ফ্রয়সার্ট! নকল বুকের আর একটা দিকও খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল ইউজিনি। ময়সার্ট, ভয়সার্ট, ক্রয়সার্ট আর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফ্রয়সার্ট! আরে, আমিই তো নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফ্রয়সার্ট! শুনছিস? এই বুড়ি কানে শুনছিস? আমিই সে-ই.........আমিই সে-ই.........আমিই সে-ই! ক্ষিপ্তের মত তারস্বরে চেঁচিয়ে গেলাম আমি বিকট বুড়ির ভয়ানক নৃত্য দেখতে দেখতে, আমিই সে-ই! আমিই সে-ই! আমিই সে-ই! নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফ্রয়সার্ট! বিয়ে করে

বসেছি আমারই অতি, অতি পিতামহীকে! একী করলাম আমি!.........

সহজ সত্যি এইটাই। ম্যাডাম ইউজিনি ল্যানাডে, ওরফে সিম্পসন, ভূতপূর্ব ময়সার্ট, আমার ঠাকুমার মায়ের মা! যৌবনে ছিল রূপসী। বিরাশি বছর বয়সেও বজায় রেখেছে রানীর মত খাড়া তনু, কুঁজো হয়নি এতটুকু, অক্ষুণ্ন রয়েছে মাথায় নিখুঁত গড়ন, অতীব সুন্দর চক্ষুযুগল এবং কুমারী বয়সের গ্রীসিয় নাকের শোভা। এর ওপরে চাপিয়েছে মুক্তাচূর্ণ, রুজপাউডার, নকল চুল, নকল দাঁত, নকল বুক। প্যারিসের সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞদের হাতের কারসাজি। বয়স কমিয়ে হাসি মুখে বিচরণ করে এসেছে ফ্রান্সের মাটিতে, এক কথায় ইউজিনিকে ভানুমতী বললেও চলে।

ইউজিনি বসে আছে টাকার পাহাড়ে। দ্বিতীয় বার বিবাহ হয়েছিল নিঃসন্তান অবস্থায়। তাই ঠিক করেছিল আমেরিক্যাবাসী এই উজবুকটিকে উত্তরাধিকারী করবে বিপুল সম্পত্তির। দ্বিতীয় স্বামীর দূর সম্পর্কের এক পরমা সুন্দরী আত্মীয়া ম্যাডাম স্টিফ্যানি ল্যানাডেকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকায় এসেছে এই মতলবেই।

গীতিনাট্যের আসরে আমার অপলক চাহনি সচকিত করে অতি, অতি, পিতামহীকে। আই-গ্লাসের মধ্য দিয়ে আমাকে পর্যবেক্ষণ করার পর অবাক হয় আমার মুখে পারিবারিক আদল দেখে। আগ্রহ জাগ্রত হতেই খোঁজ নেয় আমি এখন কোথায়। এই শহরেই আছি শুনে আরও খোঁজ নেওয়া হয় আমার হালচাল সম্পর্কে। সঙ্গের ভদ্রলোকটি জানতেন আমি কে, খবরটা জানিয়ে দেন তৎক্ষণাৎ। আগ্রহ আরও প্রদীপ্ত হতেই ঠাকুমার মায়ের মা আই-গ্লাস দিয়ে আর একবার দেখে নেয় আমার আগাপাশতলা। এই দেখাই কাল হয় আমার কাছে। আনন্দে ডগমগ হয়ে কি কি করেছিলাম, তা আগেই বলেছি। ঠাকুমার মায়ের মা বাতাসে মাথা ঠুকে অভিনন্দন ফিরিয়ে দিয়েছিল এই মনে করে যে, নিশ্চয়ই যেভাবেই হোক আমিও চিনে ফেলেছি বুড়িকে।

আমাকে ঠকিয়েছে আমারই দুর্বল চোখ আর বুড়ির অসাধারণ প্রসাধন। ট্যালবটের কাছে যখন জানতে চেয়েছি, পরমাসুন্দরীটি মেয়েটিকে, তখন সে বুঝেছে আমি বুড়ির অল্প বয়স্কা সঙ্গিনীর কথা জিজ্ঞেস করছি, জবাবও দিয়েছে সেইভাবে, স্বনামধন্য ম্যাডাম ল্যানাডে। বিধবা। উপযুক্ত বরের সন্ধানে প্যারিস থেকে সবে এসে পৌঁছেছে।

পরের দিন দেখা হয়েছে রাস্তায় বুড়ির সঙ্গে ট্যালবটের। পূর্ব পরিচয় ছিল আগেই। আলোচনা হয়েছে আমাকে নিয়ে। আমার চোখ খারাপ থাকায় প্রেক্ষাগৃহে যা-যা ঘটেছে, তার ব্যাখ্যাও

পাওয়া গেছে। বুড়ি ভেবেছে বুঝি আমি তাকে চিনতে পেরে উল্লসিত হয়েছি। তাই সাড়া দিয়েছে। ফলে খোলাখুলি প্রেমে-পড়ার কাণ্ডকারখানা চালিয়ে গেছি আমি নিতান্ত আহাম্মকের মত। অপরিচিতা কিন্তু সুন্দরী মেয়েদের দিকে আমার এই দুর্বলতার শাস্তি হওয়া দরকার। ট্যালবটের সঙ্গে প্ল্যান কষেছে বুড়ি। গভীর ষড়যন্ত্র। ইচ্ছে করেই ট্যালবট আমার সঙ্গে দেখা করেনি, বুড়ির সঙ্গে পাছে পরিচয় করিয়ে দিতে হয়, এই ভয়ে। রাস্তায় তিন সঙ্গী সুন্দরী বিধবা ম্যাডাম ল্যানাডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও তারা কমবয়সী মেয়েটাকে বুঝিয়েছিল। দিনের আলোয় বুড়িকে কাছ থেকে কোন দিন দেখিনি। গাইয়েদের আড্ডায় অন্ধকারেও কিছু ধরতে পারিনি, তার ওপরে চোখে ছিল না চশমা, যা আমার দু'চক্ষের বিষ। ফলে বুড়ির বয়স ধরতে পারিনি পাশে বসেও। ম্যাডাম ল্যানাডেকে গান গাইতে যখন ডাকা হল, তখন কমবয়সী মেয়েটাকেই ডাকা হয়েছিল। সেও তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিল। প্রতারণায় আর এক পোঁচ রঙ চড়ানোর দুষ্ট মতলবে বুড়িও উঠে দাঁড়ায় সেই সঙ্গে এবং মূল বসবার ঘরে গিয়ে বসে পিয়ানোর সামনে। যদি সঙ্গে যেতে চাইতাম, বুড়ি ভেবেই রেখেছিল সঙ্গে নেবে না আমাকে, বসে থাকতে বলবে পাশের ঘরে। বোকার মত আমি যা নিজেই করেছিলাম। যে গান শুনে আনন্দ পেয়েছিলাম এবং সুরেলা কণ্ঠস্বর শুনে অবাকও হয়েছিলাম, আসলে তা বুড়ির নয়, ম্যাডাম স্টিফনি ল্যানাডের। আই-গ্লাসটা আমাকে উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্য আর কিছুই না, ধাপ্পাবাজির আর একটা ধাপ। বিষম এই প্রতারণার ভয়ঙ্কর ছোবলও বলা যায়। চশমা পড়ে নিজেই যাতে চালাকিটা ধরতে পারি, তাই বুড়ি আগে থেকেই কাঁচ পালটে রেখেছিল আমার ক্ষীণচক্ষুর উপযুক্ত করে। সব দিকেই চোখ ছিল সর্তক চক্ষু বুড়ির, তাই ফাঁদে পা দিয়ে নিজেই আবিষ্কার করেছিলাম কত বড় পাঁঠা আমি !

যে পাদরীমশায় নিছক একটা গিঁট বেঁধে দিয়েছিল আমার সঙ্গে বুড়ির, আসলে সে ট্যালবটের এক প্রাণের বন্ধু, পাদরী নয় মোটেই। গাড়ি চালাতে ওস্তাদ। তাই বিয়ে দেওয়ার ভড়ং শেষ করেই আলখাল্লার ওপর ওভারকোট চাপিয়ে ভোল পাল্টে নিয়েছিল এবং গাড়ি হাঁকিয়ে নতুন বর-বউদের এনে ফেলেছিল সরাইখানায়, শহর থেকে দূরে। ট্যালবট শয়তানটা বসেছিল ওর পাশেই। দুই রাস্কেল সরাইখানার পেছনকার ছোট জানলা দিয়ে ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটনের রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখতে দেখতে নাকি হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল।

যাই হোক, আমার ঠাকুমার মায়ের মায়ের বর আমি নই। এই টুকুই আমার বিরাট সান্ত্বনা। বিয়ে করেছি ম্যাডাম স্টিফানি

ল্যানাডেকে। বুড়ি যদি কোনোকালে অক্কা পায় (পাবে বলে তো মনে হয় না), তাহলে ওর সব সম্পত্তি আমি পাবই পাব।

ও হ্যাঁ, আর একটা কথা। প্রেমপত্র লেখা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি, চশমা জিনিসটাকেও জীবনে বরদাস্ত করব না।
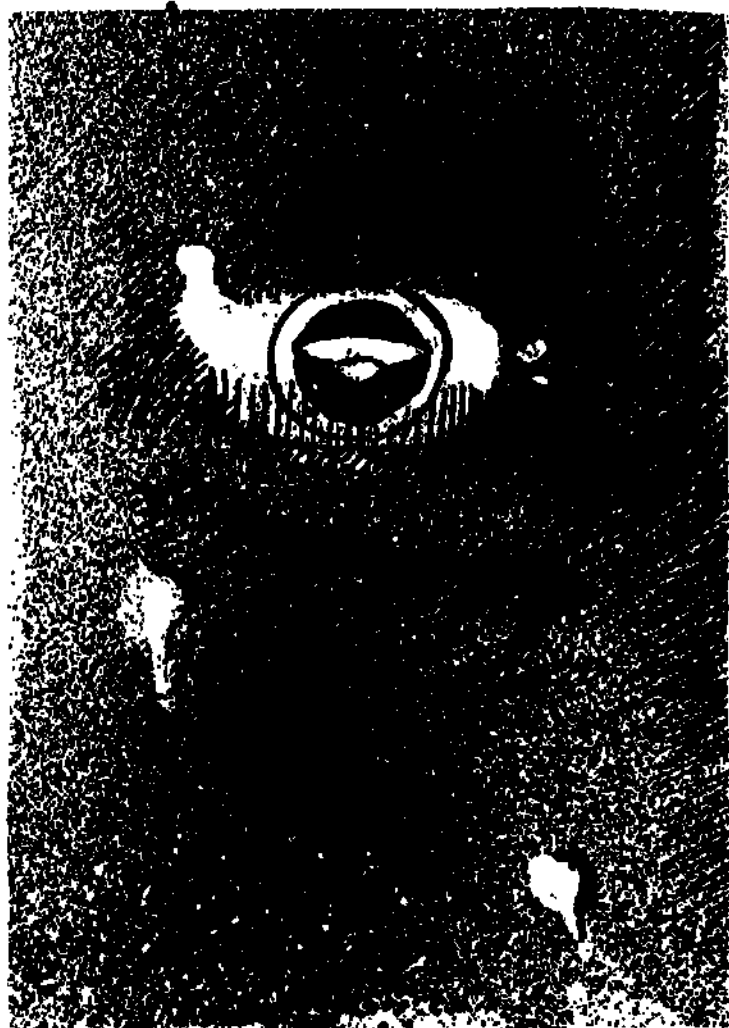
চিড়িয়া চিঠি আর গোঁয়ার গোয়েন্দা

(দ্য পারলয়েন্ড্ লেটার)

শরৎকাল। ১৮– সাল। প্যারিস শহর। সন্ধে ঘনিয়েছে। ঝোড়ো হাওয়া বইছে। ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছি প্রিয় বন্ধু দুপঁর সঙ্গে। দুজনেই বেশ মেজাজে আছি। কেননা, দুজনেই তামাক সেবন করছি মীরশ্যম্ পাইপ থেকে। এ পাইপ তৈরি হয় সাদা কাদার মত নরম পদার্থ দিয়ে।

বসে আছি দুপঁর লাইব্রেরিতে। বই ঠাসা ছোট্ট কুঠরি। বাড়ীর পেছন দিকে। বড় নিরিবিলি জায়গা।

প্রায় এক ঘণ্টা হল, ধূমপান করে চলেছি তন্ময় হয়ে। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছি না। দুজনেই নিবিষ্ট চিত্তে পর্যবেক্ষণ করছি একটাই জিনিস।

ধোঁয়া কিভাবে পাক খেয়ে খেয়ে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে, মিলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। কিভাবে তিল তিল করে কলুষিত হচ্ছে ঘরের হাওয়া।

আমার অলস মনের মধ্যে আরও একটা ব্যাপার ধোঁয়ার সুতোর মত পাক খাচ্ছে। বন্ধুবর দুপঁ কিছুদিন আগে রুমর্গের হত্যারহস্য আশ্চর্যভাবে সমাধান করে দিয়েছিল। তারপরেই মেরি রোজেটের হত্যারহস্য নিয়ে মস্তিষ্ক ঘর্মাক্ত করতে হয়েছে তাকেই। এই দুই রহস্যের মধ্যে কাকতালীয় জাতীয় কিছু আছে কিনা, এইটাই গবেষণা করছি নিমীলিত চোখে। এমন সময়ে.........

দড়াম করে খুলে গেল ঘরের কপাট। আবির্ভূত হলেন মঁসিয়ে জি–। প্যারিস পুলিশের প্রিফেক্ট।

হৃদয়ের সমস্ত উষ্ণতা দিয়ে দুই বন্ধুই বিপুল অভ্যর্থ-জানালাম ভদ্রলোককে। কেননা, এঁর আধখানা সত্তায় আছে মণ্ড মজা, বাকি আধখানায় নিঃসীম নিকৃষ্টতা।

কিন্তু ওঁর ছায়াও তো দেখিনি বেশ কয়েক বছর। তাই এ হেন ধূমকেতসম আগমন আমাদের পুলকিত করল বিলক্ষণ। আগেই বলেছি, সন্ধে হয়েছে। আমরা আলো না জ্বালিয়ে জোড়া ভূতের মত চুপচাপ বসে ছিলাম ছোট্ট কুঠরিতে। প্রিফেক্ট সাহেবকে আলো দেওয়ার জন্যে দুপিঁ উঠে দাঁড়িয়েছিল। লণ্ঠন জ্বালাতে এগিয়েও গেছিল। এমন সময়ে পুলিশ-প্রধান বলে উঠলেন, তিনি নাকি এসেছেন একটা ভয়ানক ঝামেলার ব্যাপারে দুপিঁর কাছে বুদ্ধি নিতে।

দুপিঁ আর আগুন দিল না পলতেতে। বললে–'তাহলে ঘর অন্ধকারেই থাকুক। মাথা খুলবে ভাল।'

'এ হল আপনার আর একটা উদ্ভট ধারণা,' বললেন প্রিফেক্ট। ভদ্রলোকের 'উদ্ভট' বাতিক আছে। যা দেখেন তাই উদ্ভট মনে হয়।

'তা যা বলেছেন,' বলে, প্রিফেক্ট সাহেবকে একটা ধূমপানের নল এগিয়ে দিয়ে দুপিঁ নিজে এসে বসল ওর আরাম চেয়ারে।

আমি বললাম–'গুপ্ত হত্যা-টত্যা কিছু নাকি ?'

'না না ; সে রকম কিছু নয়। ব্যাপার ভারি সোজা। আমি নিজেই সুরাহা করতে পারতাম। তারপর ভাবলাম, দুপিঁ মশায়ের শোনা দরকার–কারণ, ব্যাপারটা বেশ উদ্ভট।'

'সোজা আর উদ্ভট,' বললে দুপিঁ।

'ইয়ে, প্রায় তাই, আবার নাও বটে। ধোঁকায় পড়েছি সকলেই এই কারণে। ব্যাপারটা খু-উ-ব সোজা, অথচ বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকরই।'

'সোজা বলেই হয়ত ভুল করেছেন,' বন্ধুবরের মন্তব্য।

'কি বাজে বকছেন।' প্রাণখোলা হাসি হাসলেন প্রিফেক্ট।

'হয়তো,' বললে দুপিঁ–'রহস্যটা একটু বেশি সোজা।'

'এ আবার কি কথা !'

'চাক্ষুষভাবে সোজা।'

'হা-হা-হা ! হো-হো-হো ! হি-হি-হি ! দুপিঁ, পেট ফাটিয়ে দেবেন নাকি ?'

'ঝেড়ে কাশুন না মশায় ! বললাম আমি।

'বিষয়টা বিষম গোপনীয়,' বেশ কিছুক্ষণ চিমনির মত ধোঁয়া ত্যাগ করার পর বললেন প্রিফেক্ট–'জানাজানি হয়ে গেলে আমার

চাকরি যেতে পারে। তাই কারো কাছে মুখ খুলতে পারিনি।'

'বলে ফেলুন,' বললাম আমি।

'অথবা বোবা হয়ে থাকুন,' বললে দূর্পি।

'ব্যক্তিগত সূত্রে খবরটা এসেছে আমার কাছে। খুবই উঁচু মহল থেকে। রাজপ্রাসাদ থেকে চুরি গেছে একটা দলিল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজ। কে নিয়েছে, তা জানা আছে। সে যে নিচ্ছে, তাও দেখা হয়েছে। জিনিসটা যে তার কাছে রয়েছে, তাও জানা গেছে।'

'কি করে জানা গেছে?' দুর্পির প্রশ্ন।

'চিঠির যা চরিত্র, তা যদি চোরের হাতের বাইরে থাকত, তাহলে যে ফলাফলটা দেখা যেত-তা দেখা যায়নি। অর্থাৎ চোর কাজে লাগাতে চায় চিঠিটাকে-কিন্তু এখনও কাজে লাগায়নি। অর্থাৎ হাতছাড়া করেনি।'

'আরও খুলে বলুন,' বললাম আমি।

'এ চিঠি চোরকে বিশেষ একটা ক্ষমতা এনে দিয়েছে বিশেষ একটা মহলে। এ ক্ষমতার দাম অনেক।'

'বুঝলাম না, এখনও বুঝলাম না,' বললে দুর্পি।

'বুঝলেন না? এ চিঠি যদি তৃতীয় এক ব্যক্তি'র হাতে যায়, তাহলে উঁচু মহলের এক ব্যক্তি'র মাথা ধুলোয় লুটোবে। চিঠির দখলদার এই কারণেই খানদানী এই ব্যক্তি'র মানসম্মানকে সুতোয় ঝুলিয়ে রেখে তাঁর চোখের ঘুম উড়িয়ে দিয়েছেন। তৃতীয় ব্যক্তি'র নামটা বলা যাবে না।'

'কিন্তু মালিক যখন জানেন চোর আসলে কে-কার এত বুকের পাটা-' আমার কথা শেষ করতে দিলেন না প্রিফেক্ট।

বললেন-'চোর হলেন মন্ত্রী ডি-। তাঁর বুকের পাটা আছে। সুনাম আর কুনাম-এই দুই ব্যাপারেই তিনি অকুতোভয়। এ চুরির পেছনে নেই কোনো চাতুরি, কিন্তু আছে দুঃসাহস। চিঠিখানা যাঁর কাছে এসেছিল, তিনি একজন মহিলা। নিজের প্রাইভেট ঘরে বসেছিলেন। একা, চিঠি এসে পৌঁছোনোর পর খুলে পড়ছিলেন। আচমকা ঘরে ঢুকলেন তৃতীয় ব্যক্তি। বিশেষ এই ব্যক্তি'র কাছেই চিঠিখানা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন এই ভদ্রমহিলা। হুড়োহুড়ি করে ড্রয়ারে ঠেসে দিতে গেছিলেন, পারেননি। নিরুপায় হয়ে খোলা অবস্থায় চিঠি রেখে দিয়েছিলেন টেবিলের ওপর। ঠিকানা ছিল ওপর দিকে-চিঠির বয়ান ছিল নিচের দিকে-চোখে পড়ে না। সুতরাং চিঠিও চোখে পড়ার কথা নয়। ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢুকলেন মন্ত্রী মশায়। তাঁর চোখ লিংক্স বেড়ালের চোখের মত তীক্ষ্ণ। চকিতে দেখলেন চিঠির কাগজ। ঠিকানা নজরে আসতেই চিনলেন কার হাতের লেখা। যাঁকে লেখা,

তাঁর হতবুদ্ধি অবস্থাটাও মেপে নিলেন দুচোখ দিয়ে। নিমেষে পৌঁছে গেলেন রহস্যের নিতলে।'

'ফাইন!' দুবার ফুক ফুক করে ধোঁয়া উড়িয়ে দিল দুপিঁ।

প্রিফেক্ট বলে চললেন-'দ্রুত কাজের কথা শুরু করলেন মন্ত্রী। একথা সে কথার পর চিঠির কাগজের কাছাকাছি যায়, এমনি একখানা কাগজ পকেট থেকে বের করে ভাঁজ খুলে পড়বার ভান করলেন, তারপর কথা বলতে বলতে কাগজখানা নামিয়ে রাখলেন চিঠির কাগজের ওপর আড়াআড়িভাবে। জনগণের বিষয় নিয়ে কথা চালিয়ে গেলেন আরও মিনিট পনেরো। যাওয়ার সময়ে কথা বলতে বলতেই নিজের বাজে কাগজটাকে টেবিল থেকে তোলার অছিলায় দামি চিঠিটাকে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। ভদ্রমহিলা দেখলেন-কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারলেন না-বিশেষ করে তৃতীয় ব্যক্তি যখন দাঁড়িয়ে রয়েছে কনুই ঘেঁষে। বিদেয় হলেন মন্ত্রী উ-টেবিলে রেখে গেলেন নিজের অদরকারি চিঠিটা।'

দুপিঁ বললে আমাকে-'এবার বুঝলে? চোর জানেন, চিঠির মালিক জানেন চোর কে।'

প্রিফেক্ট বললেন-'ফলে মাস কয়েক ধরে মন্ত্রী মশায় যে ধরনের ক্ষমতার লাঠি ঘুরিয়ে চলেছেন, রাজনৈতিক ক্ষমতা বুঝতেই পারছেন, এখন তা রীতিমত বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। চিঠি যাঁর কাছ থেকে চুরি গেছে, তিনি রোজই আরও বেশি মাত্রায় বুঝছেন-চিঠি ফিরিয়ে আনতেই হবে যেভাবেই হোক। কিন্তু খোলাখুলিভাবে তা সম্ভব নয়। তাই নিরুপায় হয়ে, মরিয়া হয়ে-আমার শরণ নিয়েছেন।'

'যাঁর চাইতে ভাল লোক কল্পনাতেও আনা যায় না,' গল গল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে দুপিঁ।

প্রিফেক্ট বললেন-'তোমাদের মত শোনালেও এ রকম কথা উঠেছে বটে।'

আমি বললাম-'আপনার কথা শুনে বুঝলাম, চিঠিখানা যতক্ষণ মন্ত্রীর দখলে আছে, ততক্ষণ তাঁর হাতে ক্ষমতার ছড়ি থাকছে-চিঠি যেদিন কাজে লাগাবেন, সেদিনই ক্ষমতা হাত থেকে চলে যাবে।'

'খাঁটি কথাই বলেছেন,' সায় দিলেন প্রিফেক্ট-'মনের মধ্যে এই বিশ্বাস নিয়েই খানাতল্লাসি শুরু করেছিলাম মন্ত্রীর হোটেলে। বড় ঝক্কির কাজ মশায়। কাজটা করতে হয়েছে তাঁর অগোচরে। চিঠি-তল্লাসি চালাচ্ছি, এ খবর তাঁর কানে গেলেই মহাবিপদ ঘটাবে-এ হুঁশিয়ারি পেয়েছিলাম আগেভাগেই।'

'কিন্তু আপনি তো এ ব্যাপারে নিদারুণ নিপুণ,' বললাম আমি-'প্যারিস পুলিশ এর আগেও এরকম কাজ করেছে অনেক।'

'তা ঠিক। তা ঠিক। হাল ছাড়িনি সেই কারণেই। মন্ত্রীর অভ্যেস-উভ্যেসগুলো আমার অনেক সুবিধেই করে দিয়েছে। ...য়ই রাতে বাড়ি থাকেন না। চাকর-বাকরের সংখ্যাও অগুন্তি নয়। রাতে ঘুমোয় মালিকের ঘর থেকে বেশ দূরে-মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে থাকে। আপনারা জানেন, আমার কাছে যেসব চাবি আছে, তা দিয়ে প্যারিসের সমস্ত ঘর আর আলমারি খুলে ফেলতে পারি। গত তিন মাস ধরে একটা রাতও বাদ দিইনি-নিজে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি মন্ত্রীর হোটেল। আমার নিজের সম্মান ছাড়াও, গোপনে বলে রাখি, মোটা পারিতোষিকও রয়েছে। তাই খানাতল্লাসিতে এক রাতের জন্যেও বিরাম না দেওয়ার পর এই ধারণাই আমার হয়েছে যে চোর মহাপ্রভু আমার চাইতেও এককাঠি ওপরে যায়। চিঠি যেখানে যেখানে লুকিয়ে রাখা সম্ভব, সে সবের প্রতিটিতে আমি তন্ন তন্ন করে দেখেছি।'

আমি বললাম-'নিজের বাড়িতে না রেখে অন্য বাড়িতেও তো রাখতে পারেন ?'

'সেটা সম্ভব নয়,' বললে দুপিঁ-'চিঠি যেমন গুরুত্ব, পরিস্থিতিও তেমনি ঘোরালো। খোদ মন্ত্রী যেখানে ষড়যন্ত্রী, সেখানে এমনি দরকারি একটা চিঠি এমন জায়গায় রাখা দরকার যেখান থেকে বের করে আনা যায় ঝট করে-প্রয়োজনের সময় যদি না পাওয়া যায় ?'

'প্রয়োজনের সময়ে যদি না পাওয়া যায় ! মানে ?'

'যদি চিঠি পুড়িয়ে ফেলা হয়।'

'ঠিক। তাহলে চিঠি বাড়ির মধ্যেও কোথাও আছে। সঙ্গেই রাখেন নি মন্ত্রী-একই কারণে।'

প্রিফেক্ট বললেন-'হক কথা বলেছেন মশায়। মন্ত্রীকে দু-দুবার জামা কাপড় পরানো আর ছাড়ানোর অছিলায় আমারই তত্ত্বাবধানে বডিসার্চ করেছিলাম-চিঠি পাইনি।'

দুপিঁ বললে-'এতটা না করলেও পারতেন। মন্ত্রী ডি-নির্বোধ নন বলেই জানি। তিনি আঁচ করেছিলেন বডিসার্চ হতেও পারে।'

'খাঁটি নির্বোধ না হলেও কবি তো বটে। কবিদের থেকে নির্বোধদের দূরত্ব খুব বেশি নয়,' অম্লান বদনে বলে গেলেন প্রিফেক্ট।

মীরশ্যম্ পাইপ থেকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবল দুপিঁ। তারপর বললে-'কথাটা সত্যি। আমার নিজেরও ওই দোষ একটু আছে।'

আমি বললাম-'খুঁটিয়ে বলুন খানাতল্লাসি করলেন কিভাবে।'

'সময় নিয়েছি বটে, কিন্তু খুঁজেছি সব জায়গায়। এ সব

ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা অনেক দিনের। পুরো বাড়ির প্রতিটা ঘর চুলচেরা ভাবে দেখেছি এক সপ্তাহ ধরে–অর্থাৎ সাত রাত ধরে। প্রথমেই দেখেছি ঘরের প্রতিটা ফার্নিচার। যেখানে যত ড্রয়ার আছে, টেনে বের করেছি। গুপ্ত ড্রয়ার পর্যন্ত বাদ দিইনি। জানেন তো, আমাদের মত ট্রেন্‌ড্‌ পুলিশ অফিসারদের চোখে গুপ্ত ড্রয়ার কখনোই গুপ্ত থাকতে পারে না। গুপ্ত-ড্রয়ার রেখে যে লোক মনে করে পার পেয়ে যাবে, সে-ই ফেঁসে যায় আমাদের চোখে। ব্যাপারটা জলের মতই সোজা। প্রত্যেক আলমারির একটা বিশেষ আয়তন আছে–কতখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে সেই আলমারি, তার হিসেব থাকে। এইসঙ্গে আমাদের মগজের মধ্যে গজগজ করে খান কয়েক নিখুঁত নিয়ম। একটা লাইনের পঞ্চাশ ভাগের একটা অংশও যদি বেমক্কা অদৃশ্য হয়ে যায় কোনো গুপ্ত গহ্বরে–সঙ্গে সঙ্গে তা আমাদের নজরে এসে যায়। ক্যাবিনেট আর আলমারি-টালমারি দেখবার পর পড়লাম চেয়ারগুলোকে নিয়ে। খুব সরু ছুঁচ দিয়ে গদি ফুটো করে ভেতরের জিনিস কিভাবে টের পেতে হয়, আগেও তা করতে দেখেছেন আমাকে। টেবিলগুলো মাথার কাপড় ছাড়িয়ে নিলাম।'

'কেন নিলেন?'

'কিছু অতি ধুরন্ধর ব্যক্তি কখনো-সখনো গোপন জিনিস গোপনে রাখবার জন্যে টেবিলের মাথা ছাড়িয়ে, তারি তলায় ফুটোফাটায় জিনিসটা রেখে ফের মাথা চাপা দিয়ে পেরেক মেরে দেয়। ওসব বৈজ্ঞানিক কায়দা আমারও জানা আছে। এমনও করা হয় যে টেবিলের পায়া চারখানা খুলে নিয়ে, পায়াদের পেটের সুড়ঙ্গে জিনিসপত্র ঠুসে দিয়ে ফের টেবিলের তলায় পায়া লাগিয়ে দেওয়া হয়।'

'আপনি সব টেবিলেরই পায়া খুলেছিলেন?'

'নিশ্চয়। কিস্‌সু পাইনি।'

'পায়া না খুলেও তো টোকা মেরে বোঝা যেত ভেতর ফোঁপরা কিনা?'

'দামি জিনিস ঢুকিয়ে রেখে তার চারধারে তুলোর প্যাড দিয়ে ঠেসে দেওয়া হয়–যাতে ফাঁকা জায়গায় শব্দ চলাচল না করতে পারে। মন্ত্রীর বাড়িতে কিন্তু ঠোকাঠুকির প্রশ্নই ওঠে না–আমরা কাজ সারতে চেয়েছি নিঃশব্দে।'

'যাই বলুন, ফার্নিচারের প্রত্যেকটা অংশ তো খুলে দেখা সম্ভব নয়। ধরুন একটা চিঠি সুতোর মত পাকিয়ে উলের বলের মত রেখে দেওয়া হল। সেই কাগজের বল দিয়ে চেয়ারের বসার জায়গাটা অথবা পিঠ দেবার জায়গাটা বুনে নেওয়া হল। অথবা, উল বোনার কাঠির মত লম্বা করে পাকিয়ে চিঠিটাকে চেয়ারের কাঠের ফাঁকে লুকিয়ে রাখা হল। চেয়ার খুলে দেখে আবার তাকে জোড়া লাগাতে গেলে আওয়াজ তো হবেই। শাও কি

করেছিলেন ? প্রত্যেকটার চেয়ারের সমস্ত পার্টস খুলেছিলেন ?'

'কখনোই না। কিন্তু তার চাইতেও উত্তম কাজ করেছিলাম।'

'কি রকম ?'

'মাইক্রোসকোপ দিয়ে প্রত্যেকটা চেয়ার, প্রত্যেকটা ফার্নিচারের কাঠের জোড় মুখ দেখেছিলাম। কোথাও যদি কিছু গোঁজা হয়ে থাকত, কোথাও এক কণা ধুলো ওলোট পালোট অবস্থায় থাকত, কোথাও ক্ষীণতম ঘষটানিও লাগত-মাইক্রোসকোপ বিবর্ধিত আকারে তা তুলে ধরত আমাদের চোখের সামনে। আঠা কোথাও চটে গেলে টের পেতাম, জোড়মুখ অস্বাবিকভাবে কোথাও হাঁ হয়ে থাকলে টনক নড়ত। হে হে হে-এরই নাম বৈজ্ঞানিক তদন্ত।'

'আয়নাগুলো দেখেছিলেন ? আয়নার পেছনের কাঠের বোর্ড আর আয়নার মাঝের জায়গা ? বিছানা, বিছানার চাদর, জানলা দরজার পর্দা, কার্পেট-এসরও নিশ্চয় উল্টে-পাল্টে দেখেছেন ?'

'তন্ন তন্ন করে দেখেছি। বাড়ির সব জিনিস এইভাবে দেখে নেওয়ার পর দেখেছিলাম খোদ বাড়িটাকে। যেখানে যত মেঝে আছে, সমস্ত দেখেছি। ছোট ছোট খুপরিতে ভাগ করে নিয়েছি। প্রতি খুপরির প্রতি বর্গ ইঞ্চি মাইক্রোসকোপ দিয়ে দেখেছি। পাশাপাশি দুটো বাড়ির মেঝেই এইভাবে মাইক্রোসকোপ দিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি রাতের পর রাত।'

'পাশাপাশি দুটো বাড়ি !' সচমকে বলি আমি-'তাহলে তো বেজায় ধকল গেছে আপনার !'

'গেছে বইকি ! পুরস্কারও পেয়েছি বিপুল।'

'দুই বাড়ির আশপাশের জমি পরীক্ষা করেছেন ?'

'করেছি। ইঁট দিয়ে বাঁধানো। এখানে খুব বেশি মেহনত হয়নি। ইঁটেদের ফাঁকে ফাঁকে শ্যাওলা পরীক্ষা করে দেখেছি-শ্যাওলা অক্ষত।'

'মন্ত্রীর কাগজপত্র দেখেছিলেন ? লাইব্রেরির বই ?'

'নিশ্চয়। প্রত্যেকটা প্যাকেট আর পার্সেল খুলেছি। খুলেছি প্রতিটা বই, দেখেছি প্রতিটা পৃষ্ঠা। বইয়ের নড়া ধরে ঝেড়ে ঝেড়ে দেখা নয়-আমাদের ডিপার্টমেন্টের অনেকেই তা করে। আমি কিন্তু মাইক্রোসকোপ দিয়ে প্রতিটি পাতা মেপে মেপে দেখেছি সমান পুরু কিনা। কোনো বই নতুন বাঁধাই হয়ে এসে থাকলে, তাকেও রেহাই দিইনি। এরকম বই ছিল ছটা, দপ্তরীর কাছ থেকে সবে এসে পৌছেছিল। লম্বালম্বিভাবে ছুঁচ ফুটিয়ে দেখে নিয়েছি-ভেতরে চিঠি আছে কিনা।'

'কার্পেটের তলার মেঝে দেখেছিলেন ?'

'অবশ্যই। প্রত্যেকটা কার্পেট সরিয়েছি। নীচের কাঠের পাটাতন দেখেছি মাইক্রোসকোপের মধ্যে দিয়ে।'

'দেওয়ালে থাকে ওয়াল পেপার। তার পেছনে?'

'দেখেছি।'

'পাতাল কুঠরি?'

'দেখেছি।'

'তাহলে আপনার হিসেব ভুল হয়েছে,' বললাম আমি-'চিঠি বাড়িতে নেই।'

প্রিফেক্ট বললেন-'আমারও তাই মনে হয়। এবার দুপিঁ বলুন, কি ভাবলেন?'

'বাড়িটাকে উল্টেপাল্টে দেখতে হবে।'

'তার আর দরকার নেই। হোটেলে যে ও চিঠি নেই, এ ব্যাপারে আমি আমার এই শ্বাসপ্রশ্বাসের মতই নিশ্চিত।'

'তাহলে তো আর কোন উপদেশ দেওয়ার নেই। চিঠিখানা দেখতে কি রকম, সেটা বলতে পারেন?'

'পারি,' বলে, পকেট থেকে নোট বই বের করে নিখোঁজ চিঠির বাইরের চেহারার আর ভেতরের চেহারার নিখুঁত বিবরণ পড়ে গেলেন প্রিফেক্ট। তারপর বিদায় নিলেন বিষণ্ণ মুখে। বুঝলাম, একেবারেই ভেঙে পড়েছেন।

ফিরে এলেন এক মাস পরে। আমরা একইভাবে বসেছিলাম নিরিবিলি ঘরে। একটা ধূমপান-নল তুলে নিয়ে চেয়ারে বসলেন। কিঞ্চিৎ ধানাই-পানাই কথোপকথনের পর আমি জিজ্ঞেস করলাম-'চিড়িয়া চিঠির কি হল?'

'চিড়িয়া চিঠি!' চমকে উঠলেন প্রিফেক্ট।

'যে চিঠি পাখির মত আকাশে উড়ে যায়, তাকে চিড়িয়া ছাড়া আর কি বলব? আপনার মত গোঁয়ার গোয়েন্দাও হার মেনে গেল নাকি?'

মুখ গোঁজ করে প্রিফেক্ট বললেন-'দুপিঁর উপদেশ মত আর একবার বাড়িদুটোকে উল্টেপাল্টে দেখেছিলাম। বৃথা পরিশ্রম। চিড়িয়া চিঠি এখনও নিখোঁজ।'

দুপিঁ বলে-'পারিতোষিকের অঙ্কটা কত?'

'অনেক.........অনেক.........সঠিক কত তা বলতে চাই না.........তবে এখন তা ডবল হয়ে গেছে.........এক-একটা দিন যাচ্ছে, অবস্থা আরও ঘোরালো হচ্ছে-খুব শিগগিরই তিনগুণও হয়ে যেতে পারে। এর সঙ্গে আমার নিজের পকেট থেকে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ দিতে রাজী-আমার মানসম্মান রাখবার জন্যে।'

মীরশ্মু টানতে টানতে দুপিঁ বললে-'জি আপনার যা করা উচিত ছিল, আপনি তা করেননি।'

'কি.........কি বললেন? আর কি করব? কিভাবে

করব ?'

'ফুক, ফুক-আপনি-ফুক, ফুক-বুদ্ধিজীবিকে নিয়োগ করেননি-ফুক, ফুক-কিপটের গল্পটা জানেন ?'

'গোল্লায় যাক কিপটে। না, জানি না।'

'ডাক্তারের কাছে গিয়ে এক কিপটে যেন একটা কাল্পনিক রোগের বিবরণ শোনাচ্ছে, এইভাবে বলেছিল-এ রকমটা হলে আপনি কি করতেন ? ডাক্তার বলেছিলেন-পরামর্শ নিন।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল প্রিফেক্টের-'আশ্চর্য ! পরামর্শই তো চাই আমি। মূল্য দিতেও রাজি। পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ দিয়ে দেব যদি কেউ বাঁচাতে পারে এই বিপদ থেকে।'

'তাহলে চেক বই বের করুন। পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ-র চেক কাটুন। সই দিন। সই শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবেন।'

'কি পাবো ?'

'চিড়িয়া চিঠি। আমিই দেব আপনাকে।'

বিমূঢ় হয়ে গেলাম আমি। প্রিফেক্টের মাথায় বাজ পড়েছে বলে মনে হল। বেশ কয়েক মিনিট বসে রইলেন নিশ্চুপ-নিস্পন্দ। দুই চোখে বিষম অবিশ্বাস ফুটিয়ে তুলে বারে বারে জুল জুল করে তাকাতে লাগলেন দুপিঁর দিকে। চোয়াল ঝুলে রইল আগাগোড়া। চক্ষু গোলকদুটো মনে হল এই বুঝি ফটাং করে ঠিকরে বেরিয়ে আসবে কোটর থেকে। তারপর অনেক মেহনত করে বাহ্যিক বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠে কম্পিত কলেবরে তুলে নিলেন কলম। লিখলেন চেক- ধরে ধরে। সই দিলেন আরো আস্তে। পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ ! কম কথা নয়। আঙুল যেন মুচড়ে যাচ্ছে। চেক ছিঁড়ে টেবিলের ওপর দিয়ে এগিয়ে দিলেন দুপিঁর দিকে।

দুপিঁ চেক তুলে নিয়ে এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত খুঁটিয়ে পড়ে নিয়ে সযত্নে রে খ দিল নিজের পকেট বইতে। চাবি ঘুরিয়ে খুলল একটা ড্রয়ার। টেনে বের করল একটা চিঠি। তুলে দিল প্রিফেক্টের হাতে।

ব্যাদিত মুখে চিঠি হাতে নিলেন প্রিফেক্ট। দেখলাম, থর থর করে কাঁপছে হাতের প্রত্যেকটা আঙুল। চিঠির বিষয়বস্তু পড়ে নিলেন ঝড়ের বেগে। পরক্ষণেই হুড়মুড়িয়ে ছিটকে গেলেন দরজার দিকে। তেড়েমেড়ে বেরিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে এবং বাড়ির বাইরে। দুপিঁ ওঁকে চেক সই করার পর থেকে টুঁ শব্দটি করেননি-এখনও করলেন না।

ভদ্রলোক নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর বিশদ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হল আমার বন্ধু।

বললে-'প্যারিস পুলিশের সব ভাল। যে ধারায় কাজ করতে ওরা শিখেছে, সেই ধারাতেই কাজ করতে ওরা পোক্ত। ছকে বাঁধা কাজ। ছকের মধ্যেই গাধার মত খেটে যায়। ছিনে জোঁকের মত

লেগে থাকে। সেয়ানা নম্বর ওয়ান। ওপরওলা যা চায়, ঠিক তাই করে যায় অক্ষরে অক্ষরে। তাই প্রিফেক্টের তদন্ত বিবরণী শুনে বুঝলাম, মন্ত্রীর বাড়িতে সত্যিই নিখুঁত খানাতল্লাসি করেছেন। শুধু গতর খাটিয়ে।'

'শুধু গতর খাটিয়ে?'

'যা করেছেন তার তুলনা নেই। যেখানে যেখানে দেখেছেন-সেই সেই জায়গায় চিঠি থাকলে নিশ্চয় পেয়ে যেতেন।

শুনে আমি শুধু হাসলাম। দুপিঁ কিন্তু হাসল না।

বললে-'মন্ত্রীমশায় একাধারে কবি এবং গণিতবিদ। কাব্য রচনার কল্পনা আছে, অঙ্ককষার যুক্তি আছে। প্রিফেক্টের প্রথমটা নেই- দ্বিতীয়টা আছে। প্রিফেক্ট পাকা গোয়েন্দা-কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক। পুলিশ মহলের বাঁধাধরা ছক অনুসারে যা-যা করতে হয়, কিছুই করতে বাকি রাখেন না-বিশেষ ক্ষেত্রে আদাজল খেয়ে লাগেন-কিন্তু নিয়মের বেড়াজালেই তদন্ত চর্কিপাক খায়-তার সঙ্গে ছিটেফোঁটাও ক ল্পনা মেশান না। মন্ত্রী মশায় এ সবই জানেন। চিঠি উদ্ধারের কি কি চেষ্টা হবে, তা জেনেই তিনি উদ্ধারকারীদের সব সুযোগ দিয়েছেন। নিজে রাতে বাড়ি থাকেননি। উনি জানতেন, কোথায় কোথায় কিভাবে কিভাবে খানাতল্লাসি চলবে-ঠিক সেই সেই জায়গায় চিঠি রাখেননি। চুল চেরা খানাতল্লাসি হয়ে যাক-এটা তিনি চেয়েছিলেন। সবাই জানুক যে চিঠি তাঁর কাছে নেই।'

'কিন্তু চিঠি তাহলে গেল কোথায়?'

'ম্যাপ দেখার খেলা তুমিও ছেলেবেলায় খেলেছো। যে আনাড়ি, সে ক্ষুদে হরফে লেখা জায়গার নাম বের করতে বলে। যে ঝানু, সে বড় অক্ষরে লেখা জায়গার নাম বের করতে বলে-কেননা বড় অক্ষরগুলো গোটা ম্যাপ জুড়ে ছড়িয়ে থাকে বলে চোখ এড়িয়ে যায়। অর্থাৎ যা বেশি প্রকট, তা ততই চোখ এড়োয়। যখনি শুনলাম, প্রিফেক্ট লুকিয়ে রাখার সব জায়গা দেখেছেন-তখনি বুঝলাম, মন্ত্রী চিঠি লুকিয়ে রাখেননি-প্রকাশ্য জায়গায়,সবার সামনে রেখেছেন। চোখ যেখানে সহজে পড়ছে-প্রিফেক্ট সেখানে দেখেননি-নিয়মে নেই বলে। মন্ত্রী রেখেছেন নিশ্চয় হাতের কাছে-যাতে চট করে টেনে নেওয়া যায়-কসরৎ করে বের করার মত জায়গায় কক্ষনো রাখেননি।

'এইসব ভেবেই একদিন সবুজ চশমা পরে গেলাম মন্ত্রী মশায়ের হোটেলে। উনি তখন হাই তুলছিলেন আর সোফায় গড়াচ্ছিলেন। বাইরে উনি জীবন্ত বিদ্যুৎ, আড়ালে অলস কচ্ছপ।

'সবুজ চশমা পড়ার কারণটা আগেই বলে রাখলাম, চোখে ধাঁধা

দেখছি আলোর তেজে-তাই ঠুলি পড়েছি। ঠুলির আড়ালে নির্নিমেষে দেখে গেলাম ঘরের সবকিছু। বিশেষ করে দেখলাম, তাঁর হাতের কাছের রাইটিং টেবিলের জিনিসপত্র।

'মন্ত্রী মশায় এই টেবিলেই লেখাপড়ার কাজ সারেন। কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। তারপর চোখ গেল ম্যাণ্টলপিসের মাঝে ঝোলানো একটা কার্ডবোর্ডের বাক্সের দিকে। তাতে রয়েছে কয়েকটা খুপরি। প্রতিটি খুপরিতে খানকয়েক ভিজিটিং কার্ড। একটা খুপরিতে হেলাফেলায় ঠুসে রাখা হয়েছে একটা চিঠি-ভালো করেও ঢোকানো হয়নি-প্রায় সবটাই বেরিয়ে আছে। সবুজ কাঁচের মধ্যে দিয়েও দেখতে পেলাম স্পষ্ট গোদা অক্ষরে কালো কালির সীলমোহর-'ডি'। তার তলায় মেয়েলি ছাঁদে লেখা মন্ত্রীমশায়ের নাম। মন্ত্রীর নাম সঙ্কেতে 'ডি' লেখা হয়। অর্থাৎ কোনো এক মহিলা 'ডি'কে চিঠি লিখেছিলেন। 'ডি' কিন্তু সেই চিঠি পড়েননি। খামের ওপর হাতের লেখা দেখেই নিশ্চয় বুঝেছিলেন কার চিঠি। তাই রেগেমেগে খামটাকে চিঠি সমেত দু'টুকরো করতে চেয়েছিলেন। খামের ওপর থেকে মাঝবরাবর ছেঁড়া রয়েছে। তারপর বিরক্ত হয়েই ভিজিটিং কার্ডের কার্ডবোর্ড খুপরিতে অর্ধেক ঢুকিয়ে রেখেছেন-পুরো ঢোকাতে ইচ্ছে হয়নি। ফলে, দূর থেকে গোটা চিঠিটা নজরে আসছে। ঘরে যেই আসুক না কেন, আধছেঁড়া আধগোঁজা এ খাম তার নজরে পড়বেই। সেই সঙ্গে চোখে পড়বে খামের ওপর জমে থাকা ধুলো আর ময়লা। অযত্নের একশেষ।

'আমার খটকা লাগল তখনি। মন্ত্রী মশায় বিলক্ষণ গুছোনো স্বভাবের। এ খামটা তো তাঁর পরিপাটি স্বভাবের সঙ্গে মিলছে না। চিড়িয়া চিঠির ওপর ফ্যামিলি প্রতীকের ওপর লেখা ছিল 'এস'-লাল রঙে ছোট অক্ষরে। ঠিকানা লেখা হয়েছিল গোটা গোটা বড় অক্ষরে-রাজবাড়িতে চিঠি গেলে ঠিকানা লেখার সময়ে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। কার্ডবোর্ডের বাক্সে ধুলোমলিন হতশ্রী আধছেঁড়া খামের দিকে তাই সন্ধানীর চোখ যাবে না কিছুতেই-অথচ তা রয়েছে চোখের সামনে। এক নজরেই বুঝলাম এই সেই চিড়িয়া চিঠি।

'মন্ত্রীকে ওঁর মনের মত কথায় আটকে রেখে দিলাম অনেকক্ষণ। আমার চোখ রইল কিন্তু চিড়িয়া চিঠির দিকে। মনের মধ্যে রেকর্ড করে নিলাম খামের প্রতিটি খুঁটিনাটি। এত ভাল করে দেখেছিলাম বলেই, লক্ষ্য করলাম, চিঠির কাগজ যতখানি দোমড়ানো হয় ভাঁজ করার সময়ে, এ-খামের চিঠি তার চাইতে বেশি মুড়েছে। ধারগুলো ইচ্ছে করেই তেউড়ে দেওয়া হয়েছে। একবার কাগজ ভাঁজ করে ফের যদি উল্টোদিকে সেই কাগজকেই ভাঁজ করা হয় চাপ দিয়ে দিয়ে-এই রকমটাই হয়। আর একটা রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল এই দৃশ্য দেখে। আসল

চিঠিটাকে উল্টো দিকে মুড়ে রেখেছেন মন্ত্রী। বাইরের দিকটা রেখেছেন ভেতরে-ভেতরের দিকটা বাইরে-যাতে সনাক্তকরণ সম্ভব না হয়।

'এই পর্যন্ত দেখেই উঠে পড়লাম আমি, আসবার সময়ে আমার সোনার নস্যির ডিবে রেখে এলাম তাঁর ঘরে।

'পরের দিন গেলাম নস্যির ডিবে নিতে। ওঁর সঙ্গে সবে কথা শুরু করেছি, এমন সময়ে এক তলার রাস্তায় শোনা গেল বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজ-সেই সঙ্গে চেঁচামেচি, হট্টগোল। দৌড়ে গেলেন মন্ত্রী জানলার ধারে-আমিও গেলাম তাঁর পাশে-যাওয়ার আগে অবশ্য কার্ডবোর্ডের খুপরি থেকে ধুলোমলিন খাম টেনে নিয়ে আমার পকেটে রেখে হুবহু নকল একটা খাম রেখে দিয়েছিলাম কার্ডবোর্ডের বাক্সে। নকলটা তৈরী করেছিলাম এই বাড়িতেই বসে। পাঁউরুটির শক্ত খোসা দিয়ে 'ডি' সীলমোহর বানিয়েছিলাম তাড়াহুড়ো করে।

'রাস্তায় গাদা বন্দুক ছুঁড়েছিল এক আধপাগলা বা পাঁড় মাতাল। ভাগ্যিস মেয়ে আর বাচ্ছাদের গায়ে লাগেনি। অবশ্য গুলি ছিল না বন্দুকে। শ্রেফ ভয় দেখাচ্ছিল বদমাসটা। হট্টগোল মিটে গেল অল্পক্ষণেই। মন্ত্রী ফিরে এলেন জানলার কাছ থেকে-সেই সঙ্গে আমিও। চৌকাঠ পেরিয়ে নেমে এলাম নিচে। আধপাগলা বা পাঁড় মাতাল বন্দুকবাজ লোকটা আমারই মাইনে করা। তাকে বখশিস দিয়ে চলে এলাম বাড়িতে।'

আমি বললাম-'কিন্তু দুপিঁ, তুমি নকল চিঠি রাখতে গেলে কেন? আসলটা নিয়ে চলে এলেই তো হত?'

'বন্ধু হে, 'ডি' কে তুমি চেনো না। ডেঞ্জারাস। নজর সব দিকে, হয়তো আমি চৌকাঠ পেরোতেও পারতাম না। হোটেলের লোকজন সব ওঁর কথার বশ। প্যারিসের লোক আর আমাকে দেখতেও পেতো না। আরও কারণ আছে নকল চিঠি রেখে আসার। আসল চিঠি হাতছাড়া করেননি কিন্তু করতে পারেন যে কোন মুহূর্তে-এই সন্ত্রাস জিগিয়ে রেখেই তো উনি হাতে মাথা কেটে বেড়াচ্ছেন। এখনও সেই বিশ্বাস নিয়ে যেই হাতে মাথা কাটতে যাবেন-অমনি তাঁর পতন ঘটবে। আমি চাই উনি নিপাত যাক। ওঁর মত পলিটিসিয়ানের উচিত জাহান্নমে যাওয়া। সেইসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত একটা আক্রোশ মিটিয়ে এসেছি। অনেক বছর আগে ভিয়েনাতে আমাকে একহাত নিয়েছিলেন ইনি। কথা প্রসঙ্গে মস্করা করেছিলাম তাই নিয়ে। নকল চিঠির পেছন দিকটা সাদা না রেখে সেখানে ফরাসী ভাষায় লিখে দিয়ে এলাম একটা বিখ্যাত উদ্ধৃতি। হাতের লেখা দেখেই বুঝবেন, কার হাতের লেখা, এবং বদলা নিয়ে গেল কোন জন!'

অ্যামনটিলাডোর পিপে

(দ্য কাস্ক অফ অ্যামনটিলাডো)

ফরচুনাটো আমার মনে দাগা দিয়েছে হাজারবার-সব সয়েছি। কিন্তু যখন শুরু হল অপমান, পণ করলাম প্রতিশোধ নেব। জানেন তো, হুমকি দেওয়া আমার ধাতে নেই। কিন্তু প্রতিহিংসা আমি নেবই। এমনভাবে নে   যাতে ঝুঁকি না থাকে।

ফরচুনাটোকে কিন্তু আমার মনের কথা বললাম না। আগের মতই দেখা হলেই   লাগলাম। কিন্তু এ-হাসি যে তার সর্বনাশের প্রস্তুতি, তা সে আঁচ করতেও পারল না।

ফরচুনাটোর একটা দুর্বলতা ছিল। খুব বড়াই করত, ওর মত সুরা-রসিক নাকি আর নেই। মদের স্বাদ নিয়েই না ক বলে দিতে পারে কোনটা কোন শ্রেণীর সুরা। অতটা না জানলে ও পুরোনো মদ সম্বন্ধে খবরাখবর রাখত ফরচুনাটো। ইটালিয়ানদের সবার এ গুণ নেই। আমি নিজে ইটালিয়ান সুরায় বিশেষজ্ঞ। সুযোগ পেলেই দামী দামী ইটালিয়ান সুরা কিনে রেখে দিতাম পাতাল ঘরে।

মেলা নিয়ে তখন সারা দেশ মেতেছে। রা ঘাটে উৎসব চলছে। এই সময়ে দেখা হল ফরচুনাটোর সঙ্গে। আকণ্ঠ মদ গিলে সোল্লাসে অভ্যর্থনা জানালে আমাকে। দেখে খুশী হলাম।

বললাম-'মাই ডিয়ার ফরচুনাটো, ভাগ্যিস দেখা হয়ে গেল আজ। এক পিপে অ্যামনটিলাডো পেয়েছি। কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে

আসল মাল কিনা।'

মশালের টিমটিমে আলোয় উঁকি মারল ফরচুনাটো, কিন্তু কিছু দেখতে পেল না।

'অসম্ভব! মেলার সময়ে অ্যামনটিলাডো? পুরো একটা পিপে?'

'বললাম তো আমার নিজেরই সন্দেহ রয়েছে। এমন বোকা আমি, তোমাকে জিজ্ঞেস না করেই পুরো দাম মিটিয়ে দিয়েছি। এখন হাত কামড়াচ্ছি।'-

'অ্যামনটিলাডো!'

'সত্যিই অ্যামনটিলাডো কিনা সে সন্দেহ এখন যায় নি।'

'অ্যামনটিলাডো!'

'যাচাই করতেই হবে।'

'অ্যামনটিলাডো!'

'যাচ্ছিলাম লুচেসি-র কাছে। পুরনো মদের কদর ও বোঝে। তোমাকে পেলে বর্তে যেতাম-কিন্তু যা ব্যস্ত তুমি।'

'লুচেসি জানে কি? ওর কাছে অ্যামনটিলাডো যা, শেরী-ও তাই।'

'কিন্তু বোকা লোকের তো অভাব নেই। তাদের মতে লুচেসি তোমার মতই মদের কদর ভাল বোঝে।'

'চল।'

'কোথায়?'

'পাতাল ঘরে।'

'না হে না। তুমি ব্যস্ত, তাছাড়া লুচেসি-'

'আমি ব্যস্ত নেই। চল।'

'না। তোমার সর্দি হয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। পাতাল ঘরে দারুণ ঠাণ্ডা। সোরা ছড়ানো সর্বত্র।'

'কিসসু হবে না। চলো! চলো! অ্যামনটিলাডো!'

বাড়ীতে সেদিন চাকরবাকর কেউ নেই। ছুটি দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, মেলায় গিয়ে ফুর্তি করতে।

দুটো মশাল জ্বাল্যলাম। একটা দিলাম ফরচুনাটোকে। ঘরের পর ঘর পেরিয়ে পৌঁছোলাম একতলার খিলানে। এখান থেকেই শুরু হয়েছে পাতাল কুঠরী। পেঁচালো সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম পাতাল কুঠরির তলদেশে। দারুণ স্যাঁতসেঁতে কনকনে ঠাণ্ডা মেঝের ওপর দাঁড়ালাম ফরচুনাটোর পাশে।

ফরচুনাটো তখন টলছে। এলোমেলো পা পড়ছে। শঙ্কুর মত টুপিতে লাগানো ঘণ্টাগুলো টুং টাং করে বাজছে।

'পিপেটা কোথায়?'

'আরো ভেতরে। সুড়ঙ্গের দেওয়ালে মাকড়সার জালের মতন সাদা জালগুলো কিন্তু দেখে চলবে।'

'সোরা?' ঢুলুঢুলু চোখে বলল ফরচুনাটো।

'হ্যাঁ সোরা। এভাবে কাশছো কবে থেকে?'

'খক! খক! খক! খক! খক! খক! খক! খক! খক! খক!'

বেচারা! কেশেই গেল, জবাব দিতে পারল না।

বললাম–'থাক, আর এগিয়ে কাজ নেই। তুমি ধনবান, সর্বজন শ্রদ্ধেয়–এ ভাবে জীবনটাকে শেষ করে দিও না। লুচেসি তো রয়েছে–'

'ঢের হয়েছে।' রুখে দাঁড়াল ফরচুনাটো। ও কাশি এমন কিছু নয়। কাশিতে কেউ মরে না।'

'তা ঠিক। তাহলেও সাবধান থাকা ভাল। এক বোতল মেডক দিচ্ছি। খেয়ে নাও। ঠাণ্ডা লাগবে না,' বলে মদের একটা বোতল এগিয়ে দিলাম মদ্যপের হাতে।

তৎক্ষণাৎ বোতল তুলে ঢকঢক করে খালি করে ফেলল ফরচুনাটো–টুং টাং করে বেজে উঠল টুপীর ঘণ্টা।

ফের এগোলাম হাত ধরাধরি করে–ফরচুনাটো বললে–'সুড়ঙ্গটা বেজায় লম্বা দেখছি।'

'আমাদের বংশ যে অনেক পুরোনো।'

সুরার প্রভাবে ফরচুনাটোর চোখে তখন স্ফুলিঙ্গ জ্বলছে। টুং টাং করে বাজছে টুপির ঘণ্টা। দুপাশে থরে থরে সাজানো হাড়। মাঝে মাঝে মদের পিপে। পাতাল সুড়ঙ্গ তো শুধু মদ্যশালা নয়–সমাধি-বিবরও বটে।

বললাম–'ফরচুনাটো, সোরার পরিমাণ কিন্তু বাড়ছে। শ্যাওলার মত সুড়ঙ্গের গা থেকে ঝুলছে। আমরা এখন কোথায় জানো? নদীর তলায়। দেখছো না হাড়ের গা থেকে টস টস করে জল পড়ছে? ফিরে চলো, এত ঠাণ্ডা সইতে পারবে না–।'

'চলো, চলো, সামনে চলো। তার আগে আর এক বোতল মেডক দাও।' এগিয়ে দিলাম আর এক বোতল সুরা। চোঁ-চোঁ করে বোতল খালি করে অদ্ভুত চোখে তাকাল ফরচুনাটো–যেন আগুন জ্বলছে চোখে।

শুধালো–'তুমি গুপ্ত সমিতির সভ্য তো?'

'নিশ্চয়,' বললাম আমি।

'তাহলে চলো! কোথায় তোমার অ্যামনটিলাডো?'

'সামনে,' বলে ওর হাত ধরে নেমে চললাম ঢালু পথ বেয়ে, এঁকে বেঁকে কয়েকটা খিলেন পেরিয়ে অবশেষে পৌঁছোলাম একটা ভূগর্ভ কক্ষে। সেখানকার বাতাস অত্যন্ত দূষিত। অতবড় মশালটাও যেন ধুঁকতে লাগল।

একদম শেষ প্রান্তে আর, একটা সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠ। দেওয়ালের গায়ে নরকংকালের স্তূপ–ছাদ পর্যন্ত। তিন দিকের দেওয়াল শুধু অস্থি দিয়ে ঢাকা–চতুর্থ দেওয়ালের গা থেকে অনেক হাড় সরিয়ে একপাশে স্তূপাকারে রেখে দেওয়া হয়েছে। এই ফাঁক দিয়ে দেখা

যাচ্ছে আর একটা ছোট্ট খুপরি। লম্বায় চার ফুট, চওড়ায় তিন ফুট এবং উচ্চতায় ছ' সাত ফুট। এটাকে ঠিক খুপরি বলা যায় না। ভূগর্ভ অস্থি-গুহার ছাদ ধরে রেখেছে দুটি থাম, মাঝের ফাঁকটাই এই খুপরি। পেছনে গ্র্যানাইট পাথরের নিরেট দেওয়াল।

আমি বললাম—'সামনে চলো। অ্যামনটিলাডো ভেতরে আছে।'

ভেতরে পা দিল ফরচুনাটো। ওকে ঠেলে তুলে নিয়ে গেলাম গ্রানাইট দেওয়ালের গায়ে। তারপর আর পথ নেই। বিমূঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে গেল ফরচুনাটো।

দেওয়ালের গায়ে আটকানো দুটো লোহার পাত থেকে লোহার শেকল আর তালা ঝুলছিল। চক্ষের নিমেষে ওকে বেঁধে ফেললাম সেই শেকলের সঙ্গে।

ভীষণ ঘাবড়ে শুধু চেয়ে রইল ফরচুনাটো। আমি চাবি নিয়ে বেরিয়ে এলাম খুপরির বাইরে।

বললাম—'দেওয়ালে হাত বুলোলে সোরা পাবে না। অবশ্য স্যাঁতসেঁতে খুবই। কি করব বলো। তুমি তো ফিরতে চাইলে না। আমিই ফিরে যাচ্ছি। তার আগে তোমাকে আরামে রাখার ব্যবস্থা করে যাচ্ছি!'

'অ্যামনটিলাডো!' তখনো ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি ফরচুনাটো।

'হ্যাঁ, অ্যামনটিলাডো,' বলে হাড়ের স্তূপ সরিয়ে ফেললাম। তলা থেকে বার করলাম পাথর আর দেওয়াল গাঁথবার মশলা। কর্নিক নিয়ে দেওয়াল তুলতে লাগলাম খুপরির প্রবেশ পথে।

একসারি পাথর বসানোর পর ভেতর থেকে চাপা কাতরানি ভেসে এল। ঘোর কেটেছে তাহলে। এ কান্না তো মাতালের কান্না নয়। তারপর সব চুপচাপ। গাঁথলাম দ্বিতীয় সারি, তৃতীয় এবং চতুর্থ। এবার শুনলাম শেকলের ঝনঝনানি। মিনিট কয়েক হৃষ্টচিত্তে শুনলাম সেই শব্দ। তারপর তা স্তব্ধ হলে ফের কর্নিক তুলে গেঁথে ফেললাম পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম সারি। আমার বুক সমান দেওয়াল উঠতেই মশালটা ভেতরে বাড়িয়ে আলো ফেললাম বন্ধুর মুখে।

সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম পর-পর আর্ত তীব্র চীৎকার। শৃঙ্খলাবদ্ধ মূর্তিটার কণ্ঠদেশ চিরে বেরিয়ে এল সেই ভয়াবহ হাহাকার—অদৃশ্য ধাক্কায় যেন পেছিয়ে এলাম আমি। ক্ষণেকের জন্যে থমকে গেলাম; কেঁপে উঠলাম। হাত বুলিয়ে পরখ করলাম অস্থি-গুহার দেওয়াল—বেশ মজবুত—ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা নেই, আশ্বস্ত হয়ে পাল্টা চেঁচিয়ে গেলাম আমি। মুখ ভেংচালাম, টিটকিরি দিলাম—ও যত চেঁচায়, আমি তার দ্বিগুণ চেঁচালাম। ফলে, ফরচুনাটোর চেঁচামেচি স্তিমিত হল অচিরে।

রাত তখন বারোটা। আমার কাজও শেষ হয়ে আসছে।

অষ্টম, নবম, দশম পাথরের থাক সাজিয়ে ফেললাম। সর্বশেষ থাকটি প্রায় শেষ করে আনলাম-বাকী রইল আর একখানা পাথর বসানো। ভারী পাথরটা টেনেটুনে তুলে সব ঠেকিয়েছি ফাঁকটায়, এমন সময় একটা রক্ত হিম করা চাপা হাসি ভেসে এল খুপরির অন্ধকার থেকে। মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল সেই হাসি শুনে। হাসির পরধ্বনিতহল একটা কণ্ঠস্বর। অদ্ভুত স্বর। ফরচুনাটোর গলা বলে মনেই হল না।

কণ্ঠস্বর বলল-'হাঃ! হাঃ! হাঃ! -হিঃ হিঃ হিঃ!-খুব ঠাট্টা করলে যা হোক! চমৎকার রসিকতা! মদ খেতে খেতে খুব রগড় করা যাবে এই নিয়ে-হাঃ হাঃ হাঃ! হিঃ হিঃ হিঃ!'

'অ্যামনটিলাডো!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ-অ্যামনটিলাডো! হাঃ হাঃ হাঃ! হিঃ হিঃ হিঃ!' সেখানে থাকবে আমার বউ, আরও সকলে। চলো হে, যাই।'

'হ্যাঁ যাই!' বললাম আমি।

'ঈশ্বরের দোহাই!'

'হ্যাঁ ঈশ্বরের দোহাই।'

আমি তখন অশান্ত হয়ে উঠেছি। চীৎকার করে ফের ডাকলাম-'ফরচুনাটো!'

জবাব নেই। আবার ডাকলাম ঃ

কোন জবাব নেই। ফাঁক দিয়ে একটা মশাল ঢুকিয়ে ফেলে দিলাম ভেতরে। প্রত্যুত্তরে শোনা গেল ঘণ্টার টিং টিং শব্দ। অস্থি-গুহার ভয়ংকর স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডার জন্যেই বোধ হয়, বুক শুকিয়ে গেল আমার। দ্রুত হাতে বাকী পাথরটা দিয়ে ফাঁকটা ভরাট করলাম, মশলার পলস্তারা দিয়ে গেঁথে দিলাম। নতুন দেওয়ালের গায়ে পুরোনো হাড়ের স্তূপ সাজিয়ে দিলাম। পঞ্চাশ বছরেও এ হাড়ে কেউ হাত দেয় নি।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!
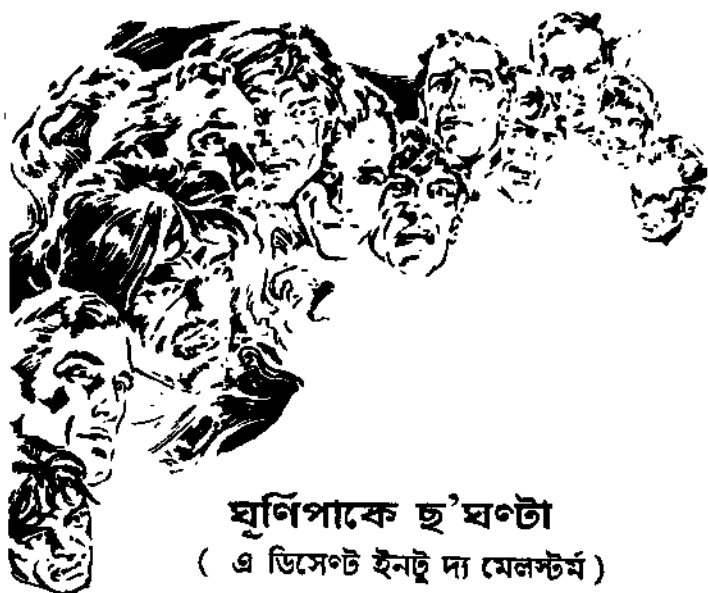
ঘূর্ণিপাকে ছ'ঘণ্টা

(এ ডিসেণ্ট ইনটু দ্য মেলস্টর্ম)

পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু খাঁজে পৌঁছনোর পর হাঁপিয়ে গেলেন বৃদ্ধ। কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না। মুখ খুললেন অনেকক্ষণ পরে-'কিছুদিন আগেও, একটুও না হাঁপিয়ে, নিয়ে আসতে পারতাম আপনাকে এখানে। আমার ছোট ছেলের মতোই বুকের জোর ছিল। কিন্তু বছর তিনেক আগের সেই ঘটনার পর আর পারি না। সেদিন যা দেখেছি যা শুনেছি-তা এমনই লোমহর্ষক যে মুখে বলে আপনাকে বোঝাতে পারব না। মরলোকের কোন মানুষ আজ পর্যন্ত আজ পর্যন্ত সে রকম অভিজ্ঞতা লাভ করেনি। করে থাকলেও প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারেনি জনেজনে সেই কাহিনী শোনানোর জন্যে। ছ-ঘণ্টা ধরে সয়েছিলাম মারাত্মক সেই আতঙ্ক-তাতেই গুঁড়িয়ে গেছে আমার মন আর শরীর। ভাবছেন আমি বুড়ো হয়ে গেছি। না মশাই না। কুচকুচে কালো চুল ছিল আমার। গোড়া পর্যন্ত প্রতিটি চুল ধবধবে সাদা হয়ে গেছে মাত্র একদিনে। অবশ করে দিয়েছে হাত-পা, বারোটা বেজেছে নার্ভের। এখন এমন হয়েছে, একটু মেহনতেই থর থর করে কাঁপি, ছায়া দেখলেই আঁতকে উঠি। এই যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, এখান থেকে যদি নীচে তাকাই, তাহলেও মাথা ঘুরে যায়।'

উনি অবশ্য দাঁড়িয়ে ছিলেন না। আধশোয়া অবস্থায় ঝুলছিলেন বললেই চলে মাটি থেকে ষোলোশো ফুট ওপরে। এক চিলতে সরু ওই খাঁজে শরীরের আধখানা কোনও মতে রাখা যায়-ভারী অংশটা

ঝুলছে খাঁজের বাইরে। হড়হড়ে পাথরের ওপর কোনওমতে কনুই রেখে টাল সামলাচ্ছেন আশ্চর্যভাবে। ও জায়গার দু'গজের মধ্যে যাওয়ার সাহস আমার নেই। বেশ খানিকটা তফাতে জমি আঁকড়ে শুয়ে আছি উপুড় হয়ে-খামচে আছি আগাছা। প্রচণ্ড হাওয়ায় মনে হচ্ছে পাহাড়ের গোড়া পর্যন্ত উপড়ে ছিটকে যাবে। ভয়ের চোটে আকাশের দিকেও তাকাতে পারছি না। অনেকক্ষণ পরে সাহসে বুক বেঁধে তাকিয়েছিলাম দূরদিগন্তের দিকে।

আমার মনের কথা নিশ্চয় টের পেয়েছিলেন বৃদ্ধ গাইড। তাই বলে উঠলেন-'আবোল তাবোল চিন্তা করছেন কেন? ঘটনাটার জায়গাটা আপনাকে দেখাব বলেই তো নিয়ে এলাম। কোথায় জানেন? নীচে তাকালেই দেখতে পাবেন।'

আমি ঝিম মেরে পড়ে রইলাম। কানের ওপর ঝিনঝিনিয়ে বেজেই
চলল বৃদ্ধের কাটাকাটা কথাগুলো-'নরওয়ে উপকূলের খুব কাছেই রয়েছি এখন, আটষট্টি ডিগ্রি ল্যাটিচিউডে- লোফোডেন-এর ধু ধু জেলার বিশাল অঞ্চল নর্ডল্যাণ্ডে। এই যে পাহাড়টার ডগায় আমরা গ্যাঁট হয়ে বসে আছি, এর নাম মোঘলা হেলসেগেন। ও মশাই, এবার একটু উঠুন। কনুইয়ে ভর দিন। খুব যদি মাথা ঘোরে, মুঠোয় ঘাস ধরুন- ঠিক আছে- তাকান.........সমুদ্রের দিকে তাকান......... বাষ্পের ওই যে বলয় রয়েছে ঠিক নীচেই.........তার, ওদিকে তাকান.........কী দেখছেন?'

মুহ্যমানের মতো তাকিয়ে রইলাম ঊষর মহাসমুদ্রের দিকে- যতদূর চোখ গেল দেখলাম শুধুই লবণজল, এবং তা কালির মতো মিশকালো। এরকম পাণ্ডববর্জিত জনহীন জলধি-বিস্তৃত মানুষ দুরন্ত কল্পনাতেও আনতে পারবে না। ডাইনে আর বাঁয়ে যতদূর দু'চোখ যায় ততদূর দেখেছি এবড়ো খেবড়ো কর্কশকালো বিকট গুবরের মতো পাহাড় আর পাহাড়- ঠিক যেন পৃথিবীর প্রান্তে কেল্লা-প্রাচীর মাথা উঁচিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে.........ভয়াল দর্শন সেই পর্বতমালার দিকে তাকালেই বুক ছাঁৎ করে ওঠে ঢেউয়ের মাথায় ফেনার সক্ষোভ আছড়ে পড়া দেখে.......পাহাড়ের ভূর বিকটাকৃতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে ফেনিল জলধি.........মাথা কুটে মরছে শিলাস্তূপের পাদদেশে- টলাতে না পেরে রণেভঙ্গ দিচ্ছে মুহর্মুহ। নিঃশব্দে নয়- সগর্জনে। হতাশার হাহাকার অবিরাম ফেটে পড়ছে প্রতিটি সেকেণ্ডে। সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত থেকে এইভাবেই কেঁদেকেটে ফিরে যাচ্ছে শক্তিশালী ঢেউ-পাহাড় নড়েনি, নড়বে না।

যে পাহাড়ের ডগায় বসে আছি, ঠিক তার সামনে মাইল পাঁচ ছয় দূরে সমুদ্র ঠেলে উঠেছে একটা কেলে কুচকুচে হাড়-হিম-করা চেহারার ছোট্ট দ্বীপ। ফেনিল তরঙ্গ মুড়ে রেখে দিয়েছে পুঁচকে সেই

দ্বীপকে ; আর এই সাদা ফেনার ঘেরাটোপ দেখেই ধরে নিতে হচ্ছে একটা বিদিগিচ্ছিরি প্রস্তরময় দ্বীপ রয়েছে সেখানে।

আরও কাছে, এই পাহাড়ের মাইল দুই তফাতে, দেখা যাচ্ছে আরও একটা ছোট্ট দ্বীপ- দূরের দ্বীপের চাইতেও ছোট- এটাও কেলে কুচ্ছিৎ-অশুভি কৃষ্ণকায় চোখাচোখা পাহাড় মুড়ে রেখেছে তাকে।

এই দুই দ্বীপের মাঝের জল তত অশান্ত নয়, ফেনিল নয়, ফুলে ফুলেও উঠছে না। ফেনা দেখা যাচ্ছে শুধু দু'দিকের পাহাড় আর পাথরের গায়ে ; মাঝের জল বিলক্ষণ স্থির-মাঝে মাঝে, হাওয়ার বেগে কিনা বোঝা যাচ্ছে না-বিষম আক্রোশে তুরন্ত বেগে জল-রেখা যেন ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে চারিদিকে। ঝোড়ো হাওয়া ডাঙার দিকে বয়ে আসছে বলেই অনেক দূরে দেখতে পাচ্ছি একটা জাহাজ তিন তিনটে পাল তুলে দিয়ে উঠছে আর নামছে-মাঝে মাঝে একেবারেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে জল নেমে যাওয়ায়-আবার ঠেলে উঠছে অনেক উঁচুতে জল ফুলে উঠতেই।

বৃদ্ধ গাইড অনিমেষে চেয়েছিলেন দ্বীপ দুটোর দিকে। দুই দ্বীপের মাঝের প্রশান্ত জল যেন তাঁকে টানছে চুম্বকের মতো। তারপর বলে গেলেন দুই দ্বীপের নাম, আশপাশের পাহাড়গুলোর নাম।

সবশেষে বললেন-'শুনতে পাচ্ছেন ? বুঝতে পারছেন ? পরিবর্তন আসছে জলে ?'

পরিবর্তন ? এই তো মিনিট দশেক হল উঠেছি পাহাড়চূড়োয়-সমুদ্র-দৃশ্য তখনি ফেটে পড়েছিল চোখের সামনে- তার আগে চোখেই পড়েনি ধু ধু জলের চেহারা।

কী পরিবর্তনের কথা বলছেন বৃদ্ধ ?

আচমকা কর্ণেন্দ্রিয় সজাগ হল অদ্ভুত একটা আওয়াজে। আমেরিকার সবুজ প্রান্তরে বুঝি হাজার হাজার মোষ ধেয়ে চলেছে গুরু গুরু নিনাদ সৃষ্টি করে। নিম্নগ্রাম থেকে আশ্চর্য চাপা সেই শব্দলহরী শনৈঃ শনৈঃ উচ্চগ্রামে উঠে যাচ্ছে। হাজার হাজার ভয়ার্ত মোষ যেন একযোগে গুঙিয়ে গুঙিয়ে উঠছে।

একই সঙ্গে নীচের সমুদ্র প্রখর স্রোতের চেহারা নিয়ে ধেয়ে যাচ্ছে পূর্বদিকে।

পলকের মধ্যে দানবিক গতিতে পৌঁছে গেল বিচিত্র সেই স্রোতধারা। মুহূর্তে মুহূর্তে বেড়েই চলেছে তার গতিবেগ-আরও একরোখা, আরও পাগলা হয়ে উঠছে নিমেষে নিমেষে। গণ্ডারের গোঁ নিয়ে ছুটছে তো ছুটছেই।

পুরো পাঁচটা মিনিটও গেল না। দূরের দ্বীপ পর্যন্ত সমস্ত সমুদ্র উত্তাল আর রুদ্ররূপী হয়ে উঠল-ভয়ঙ্কর এই রুদ্রনৃত্য এখন সব শাসনের বাইরে। কিন্তু মূল লণ্ডভণ্ড কাণ্ড আর বিকট গজরানির অকুস্থল হয়ে উঠল সামনের ছোট দ্বীপ আর ডাঙার জলধি।

এখানকার জল আচম্বিতে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে অগুন্তি ছোট ছোট ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি করে বিপুল বেগে নৃত্য করতে করতে ধেয়ে গেল পূর্বদিকেই। এ নৃত্যের কোন বর্ণনা হয় না। জল সেখানে ফুলছে, দুলছে, ফুটছে, সোঁ সোঁ নিনাদে আকাশ বাতাস ফাটিয়ে দিতে চাইছে। হাজার হাজার ছোট ছোট জলধারায় নিজেদের ভাগ করে নিয়ে একে আর একটির সঙ্গে ঢুঁ মেরে লড়ে যাচ্ছে-তারপরেই উন্মত্ত ক্রোধে নিজেরাই বিস্ফোরিত হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে। অজস্র ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি হচ্ছে পরক্ষণেই। কেউ বামনাকার, কেউ দানবিক- জল ঘুরিয়ে নিজেদের বানিয়ে নিয়েই কল্পনাতীত বেগে ধেয়ে যাচ্ছে পুবদিকে। জল যখন প্রপাতের আকারে বহু ওপর থেকে নীচে খসে পড়ে- জলের মধ্যে এরকম প্রচণ্ড গতিবেগ দেখা যায় শুধু তখনই।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই আরও বিরাট পরিবর্তন এসে গেল ক্ষুব্ধ উন্মত্ত সেই জলরাশিতে। ধীরে ধীরে প্রশান্ত হয়ে এল জলপৃষ্ঠ-একে একে বিলীন হয়ে গেল বিকটাকার ঘূর্ণিপাকগুলো- এখন সেখানে আবির্ভূত হল বিপুল পরিমাণ ফেনা- যে ফেনার চিহ্নমাত্র এতক্ষণ দেখা জায়নি এই জায়গায়।পুঞ্জ পুঞ্জফেনা কিন্তু আবির্ভূত হয়েছে সরু সরু রেখায়। প্রথম প্রথম বহু দূর বিস্তৃত ছিল প্রতিটি রেখা- তীব্র বেগে ধেয়ে যাচ্ছিল শ্বেত সর্পের আকারে.........তারপরেই তারা একে একে গায়ে গা দিয়ে মিলিত হয়ে অতিকায় অজগরের চেহারা নিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে রচনা করল আর একটি অঙ্কুরিত ঘূর্ণাবর্তের। আচমকা সেই অঙ্কুর রূপান্তরিত হয়ে গেল মহাকায় ঘূর্ণাবর্তে-যার ব্যাস এক মাইলেরও বেশি। অতিকায় এই ঘূর্ণাবর্তের কিনারায় শুধুই বাষ্পকণা- কিন্তু মেঘাকারে সেই বাষ্পকণার বিন্দুমাত্র ছিটকে আসছে না কেন্দ্রের দিকে। কেন্দ্রের জল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে ফানেলের, আকারে নামছে নীচের দিকে। অতীব মসৃণ সেখানকার জলপৃষ্ঠ। ভয়ানক বেগে ঘুরপাক খাচ্ছে বললেই আধা আর্তনাদের মত রক্ত জল করা হাহাকারধ্বনিগগনভেদ করে উঠে যেতে চাইছে বহির্বিশ্বের দিকে। ঘূর্ণ্যমান সেই জলের রং দাঁড়কাকের পালকের মতো কুচকুচে কালো আর রীতিমত চকচকে- ঘোরার গতিবেগের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই নিজের মাথাই বাঁই বাঁই করে ঘুরে উঠছে। দুলছে, ফুঁসছে আর গজরাচ্ছে এই ঘূর্ণ্যমাণ প্রপাত-অতি তীব্র সেই হুঙ্কারের কাছে নায়গ্রাজলপ্রপাতের বিরামবিহীন বুকচাপড়ানির হাহাকারও নিরুতিসীম নগণ্য।

পায়ের তলায় প্রকাণ্ড মজবুত পর্বত এখন থর থর করে কাঁপছে আর দুলে দুলে উঠছে। প্রতিটি প্রস্তরে, থরহরি কম্প প্রকট হয়ে উঠছে। আমি দড়াম করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম, হাতের কাছে ঘাসপাতা আগাছা যা পেলাম- সবলে মুঠোয় আঁকড়ে ধরলাম।

কেবলই মনে হতে লাগল অবর্ণনীয় এই পর্বত-নৃত্য পরিশেষে আমাকেই কামানের গোলার মতোই নিক্ষেপ করবে ঘূর্ণ্যমান মহাভয়ঙ্কর ওই উৎপাতের দিকে।

কর্ণরন্ধ্রে ভেসে এল বৃদ্ধ গাইডের প্রশান্ত কণ্ঠস্বর-'এরই নাম মেলস্টর্ম। প্রবাদপ্রতিম ঘূর্ণিপাক। আমরা যারা নরওয়ের মানুষ- আমাদের কাছে এর আর একটা নাম আছে- মস্কো-স্টর্ম। কাছের দ্বীপটার নাম যে মস্কো।'

বিকট এই জলের ঘূর্ণির মামুলি-বিবরণ বইয়ের পাতায় পড়ে স্বচক্ষে দেখব বলে এসেছিলাম। কিন্তু যা দেখলাম, তার সঙ্গে সেই বিবরণের আকাশ পাতাল তফাৎ। লেখক জোনাস র‍্যামুস মস্কো-স্টর্মের ভয়াবহতা অথবা বিরাটত্বকে ছবির মতো ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। চমকপ্রদ এবং রীতিগত জমকালো এই দৃশ্য তিনি কোন তল্লাট থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন জানি না- তবে তা নিশ্চয় মেঘালো হেলসেগেন-এর চূড়ো থেকে নয়। ঝোড়ো হাওয়াও তখন নিশ্চয় ছিল না। তাঁর লেখা থেকে সামান্য কিছু উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি তফাৎটা বোঝানোর জন্যে।

'লোফোডেন আর মস্কো-র মাঝের জলের গভীরতা পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফ্যাদম। কিন্তু বিপরীত দিকে বড় দ্বীপটার কাছে গভীরতা এতই কম যে জাহাজ গেলে তলা ফেঁসে যেতে পারে চোরা পাথরে লেগে। বন্যার সময়ে জল ফুঁসে উঠে হাঁকডাক ছাড়ে লোফোডেন আর মস্কো-র মাঝের অঞ্চলে। প্রবলতর প্রপাতের নিনাদও সে তুলনায় কিস্সু নয়। আওয়াজ শোনা যায় অনেক লিগ দূর থেকে। কাছাকাছি জাহাজ এসে পড়লে ঘূর্ণি তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেলে ফাঁদলের তলায় চোখাচোখা পাথরে, ভাঙাচোরা কাঠকুটোকে ভাসিয়ে দেয় ঘূর্ণির বেগ কমে এলে। ঘূর্ণির জল-ও মাথা ঠাণ্ডা রাখে বড়জোর মিনিট পনেরো- তারপরেই ফের শুরু হয় পাগলামি। জল যখন ক্ষেপে যায়, আর যদি তখন ঝড় ওঠে- তখন মাইল খানেকের মধ্যে কোনও জাহাজের আসাটা ঠিক নয়। কিন্তু আকছার এরকম ঘটনাই ঘটে চলেছে। তিমির দঙ্গলকে ঘূর্ণিপাক টেনে নিয়ে গেছে অতলের অন্ধকারে। একবার একটা বোকা ভালুক লোফোডেন থেকে সাঁতরে মস্কো ভ্রমণের ফন্দি এঁটেছিল- মাঝজলেই তার ঘূর্ণায়মান কলেবর থেকে আর্তনাদ ঠিকরে এসেছিল ডাঙা পর্যন্ত। বড় বড় ফার আর পাইন গাছগুলো এই ঘূর্ণির জলে পড়লে তলায় গিয়ে যখন ভেসে ওঠে, তখন এমনই ফালি ফালি হয়ে যায় যে, দেখলে মনে হয়, সাগরের বুকে অগুন্তি রোঁয়া গজিয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায় দানবিক এই জলঘূর্ণির নীচে রয়েছে ধারালো ছুরি-কাটারি-বল্লম-বঁটির মত অজস্র চোখা পাথর-গাছ আর জাহাজ, তিমি আর ভালুক- সবাইকেই ঘষটে ঘষটে যেতে হয় এই শাণিত ফলকদের ওপর দিয়ে। ছ'ঘণ্টা অন্তর আবির্ভূত হয় এই মহা-ঘূর্ণি। ১৬৪৫ সালের এক রোববার

সকালে মহাঘূর্ণির উৎকট উল্লাসের আওয়াজে কাঁপতে কাঁপতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছিল উপকূলের বহু প্রস্তর আলয়।'

'জলের গভীরতা চল্লিশ ফ্যাদম।'– জোনাস র‍্যামুসের এই কথাটা সত্যি হতে পারে লোফোডেন অথবা মস্কোশ্ন খুবই লাগোয়া জায়গায়। ঘূর্ণির 'গভীরতা অনেক.........অনেক বেশি। ভালুক বা তিমির উপমা টেনে আমার দরকার ছিল না। পাহাড়চূড়োয় আড় হয়ে শুয়েই তো দেখছি-প্রকৃতই নিতল এই মহাঘূর্ণি-তলদেশটা কোথায়, তা ঈশ্বর জানেন। পেল্লায় জাহাজকেও ঝুঁটি ধরে টেনে এনে ঘুরপাক খাইয়ে আছড়ে আছড়ে ফেলবে নিতল আঁধারের রহস্যাবর্তে।

লোমহর্ষক অথচ প্রকৃতই দর্শনীয় এই ঘূর্ণিপাকের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত আছে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নামক বিশ্ববিখ্যাত বিশ্বকোষ বলছে, 'অনেকগুলো প্রবলস্রোত ধাক্কা খেতে খেতে প্রপাতের আকারে নেমে তো যাবেই-জলও তখন ঘুরপাক খাবে-ল্যাবোরেটরি এক্সপেরিমেণ্টে এমনটা দেখানো যায়।' আর এক দল তাত্ত্বিক বলেন, জলের তলায় মস্ত ফুটো আছে। মস্কো-স্টর্মের জল সেই ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের অন্য অঞ্চলে, এমন একটা অঞ্চল বোথনিয়া উপসাগর।' এই মতে বিশ্বাসী নরওয়ের মানুষরাও।

বৃদ্ধ গাইড আমার মুখে দুটো অভিমত শুনে বললেন, 'বিশ্বকোষের কচকচি মাথায় ঢুকল না। জলের তলায় ফুটো রয়েছে বলেই ঘূর্ণি তুলে জল বেরিয়ে যাচ্ছে-এই মতবাদ অনেকেই মনে করলেও আমি মনে করি না। আমার এই কাহিনী শুনলেই তা বুঝবেন। বুকে হেঁটে খাঁজের ওদিকে গিয়ে সুস্থ হয়ে বসুন। জলের গজরানি শুনতে পাবেন না-কিন্তু আমার রক্ত জল করা কাহিনী আপনার লোম খাড়া করে দেবে।'

বৃদ্ধের নির্দেশ মতো সরে গেলাম খাঁজের ওদিকে। কান ঝালাপালা করা আওয়াজ এখানে পৌঁছচ্ছে না। শুরু হল বৃদ্ধের কাহিনী।

আমরা তিন ভাই পালতোলা নৌকো নিয়ে মাছ ধরতে যেতাম মস্কো-স্টর্মের ওদিকে। দ্বীপের কাছে নোঙর ফেলে প্রচুর মাছ ধরতাম। এত বিপদ মাথায় নিয়ে কেউ ওদিকে যায় না বলেই এত মাছ পেতাম। আমরা জানতাম, কখন সমুদ্র শান্ত থাকে, কখন উত্তাল হয়। ঘড়ি ধরে সেই সময়ে ঘূর্ণিপাককে পাশ কাটিয়ে যাতায়াত করতাম। ছ-বছরে মাত্র দু'বার ভয়ানক ঝড় দেখে নোঙর তুলিনি–দ্বীপে সাত দিন না খেয়ে একবার থাকতে হয়েছে। একবার নোঙর ছিঁড়ে যাবে দেখে নৌকো তুলে নিয়ে গেছিলাম দ্বীপে।

আমার বড়দার ছেলের বয়স ছিল আঠারো। আমার দুই

ছেলেও বেশ শক্ত সমর্থ। তবুও জেনেশুনে এই মহাবিপদের মাঝ দিয়ে ওদের নিয়ে যেতাম না কখনো। নিজেরা না গিয়েও পারতাম না। মাছের লোভ এমন-ই।

১৮-সালের জুলাইয়ের সেই হ্যারিকেন ঝড়ের কথা মনে আছে? বছর তিনেক আগের কথা। জুলাইয়ের দশ তারিখে যেন আকাশ ভেঙে পড়েছিল পৃথিবীর ওপর। অথচ সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ঝড়ের টিকি পর্যন্ত দেখা যায়নি। দিব্বি সূর্য উঠেছিল। ঝিরঝিরে হাওয়ায় গা জুড়িয়ে যাচ্ছিল। বড় ঝড়ের আসন্ন উৎপাতের তিলমাত্র লক্ষণও প্রকাশ পায়নি।

আমরা তিন ভাই নৌকো নিয়ে দুটো নাগাদ চলে গেছিলাম দ্বীপের পাশে। সাড়ে সাতটা নাগাদ দেখলাম নৌকোয় আর মাছ রাখবার জায়গা নেই। নোঙর তুলে ফেললাম। ঘূর্ণির জল এড়িয়ে থাকবে আটটার সময়ে—অঞ্চলটা পেরিয়ে যাব ঠিক তখনি।

নৌকো যাচ্ছে তরতরিয়ে। বেশ ফুর্তিতে আছি তিনজনেই। বিপদের কোনও লক্ষণ নেই কোনও দিকেই।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আচমকা হেলসেগেন-এর দিক থেকে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে আসতেই। এরকম তো কখনো ঘটেনি।

অস্বস্তির শুরু তখন থেকেই। কেন জানি না প্রতিটি লোমকূপে শিহরণ জেগেছিল দামাল হাওয়ার প্রথম ঝাপটা গায়ে লাগতেই। তিন ভাইয়ে মিলে অনেক চেষ্টা করেও যখন নৌকোকে আর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম না, তখন ঠিক করলাম, ফিরে গিয়ে নোঙর ফেলে বসে থাকা যাক। আর ঠিক তখনই চোখ গেছিল গলুইয়ের ওপর দিয়ে দিগন্তের দিকে। আঁতকে উঠেছিলাম আকাশে মেঘের ঝাঁক দেখে। যেন জাদুমন্ত্র বলে অকস্মাৎ অদ্ভুত তামারঙের গাঢ় মেঘপুঞ্জ আবির্ভূত হয়েছে দিগন্ত জুড়ে আর আশ্চর্য গতিবেগে ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে।

যে হাওয়ার ঝাপটায় আচমকা তিড়বিড়িয়ে উঠেছিল নৌকো, হঠাৎ তা তিরোহিত হওয়ায় নৌকোর গতিও হল স্তব্ধ। ঢেউয়ের দোলায় দুলছে তো দুলছেই—কোন দিকেই আর যাবার নাম করে না। কিন্তু তা নিয়ে ভাববার অবসরও পেলাম না—গগনবিদারী চিৎকার ছেড়ে ঝড় লাফিয়ে পড়ল ঘাড়ের ওপর। দু'মিনিটের মধ্যেই সমস্ত আকাশ ঢেকে গেল মেঘে। অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক। সেই সঙ্গে বাষ্পকণা থাকায় তিন ভাই যেন অন্ধ হয়ে গেলাম—কেউ আর কাউকে দেখতে পেলাম না।

প্রলয়ঙ্কর সেই ঝড়ের বর্ণনা নতুন করে আর দিচ্ছি না। নরওয়ের যারা সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়—তাদের প্রত্যেকেই এক লহমার মধ্যেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল ঝড় কাকে বলে। প্রথম দমকেই প্যাঁকাটির মতো মড় করে ভেঙে সমুদ্রে নিপাত্তা হয়ে গেল দুটো

মাস্তুলই-সঙ্গে করে নিয়ে গেল আমার সবচেয়ে ছোট ভাইকে-নিরাপদে থাকবার জন্যে মাস্তুলের গায়ে বেঁধে রেখেছিল নিজেকে।

খুবই হালকা উপাদান দিয়ে তৈরি বলেই আমাদের নৌকো ওরকম প্রলয়ের মাঝে পড়েও ধ্বংস হয়নি। খোলের মধ্যে ঢোকার জন্যে একটাই ঢাকনা ছিল নৌকোর সামনের দিকে। সমুদ্র পাগলা হলেই বন্ধ করে দিতাম ঢাকনা-পাছে জল ঢুকে যায়। সেই মুহূর্তে বন্ধ করার সময় পাইনি-মনেও ছিল না। আমার দাদা নিশ্চয় সেই দিকেই এগিয়েছিল, বন্ধও করেছিল-প্রাণটা যে কেন চলে যায়নি, আজও তাই ভাবি। আমি নিজে তখন উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছি। দু-পা দিয়ে আঁকড়ে ধরেছি পেছনের কাঠ-দু'হাতে প্রাণপণে জড়িয়ে আছি নিখোঁজ মাস্তুলের গোড়ার কাঠ। মাঝে মাঝে হাঁটু মুড়ছি দম নেওয়ার জন্যে-তার বেশি কিছু করার ক্ষমতা নেই-বোঝবার অবস্থাও নেই। মগজের মধ্যে সবাই যেন তালগোল পাকিয়ে রয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবেই ছিলাম জলের তলায়। পুরো নৌকোটা চলে গেছিল মাতাল জলের তলায়। তারপর ঝাঁকুনি মেরে জল ঝেড়ে উঠে এল জলের ওপর-ঠিক যেভাবে ডুব সাঁতার কেটে উঠে আসে ভিজে কুকুর। মাথার ঘোর কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছি যখন, খপ করে কে যেন কাঁধ চেপে ধরল আমার। চমকে উঠে ফিরে দেখলাম। আনন্দে ফেটে পড়েছিলাম তখুনি। দাদাকে জীবন্ত দেখতে পাব ভাবিনি। আনন্দ উড়ে গেল এক নিমেষে কানের কাছে দাদা একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করতেই-মস্‌কো-স্টর্ম!

আপাদমস্তক শিউরে উঠেছিল ওই একটি মাত্র শব্দতেই। পাগলা হাওয়া তাহলে আমাদের ঠেলে নিয়ে চলেছে মূর্তিমান জল বিভীষিকার দিকেই!

মস্‌কো-স্টর্মকে আমরা বরাবর পাশ কাটিয়ে যাই ঘুরপথে গিয়ে। জলের টান যখন থাকে না, পেরিয়ে যাই বিপজ্জনক এলাকা। ঝড় আর তা হতে দিচ্ছে না। উন্মাদের মতো ঠেলে নিয়ে চলেছে খরস্রোতের দিকেই।

প্রভঞ্জনের প্রবল দাপট তখন কিছুটা কমেছে। বড় বড় পর্বতপ্রমাণ ঢেউয়ের ওপর নৌকো উঠছে আর পিছলে নেমে আসছে। আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন। চারিদিকে আঁধারকালো। এরই মাঝে যেন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। মাথার ওপরকার আকাশে একটা গোলাকার জায়গা থেকে কালো মেঘ অদৃশ্য হয়ে গেল-সে জায়গায় দেখা দিল চাঁদ। ফুটফুটে আলোয় চারিদিক স্পষ্ট করে তুলতেই আমি দেখতে পেলাম কোথায় আছি, কিভাবে আছি।

নাগরদোলায় দুলতে দুলতে নৌকো তীব্র বেগে ছুটে চলেছে

ঘূর্ণিপাকের দিকেই। খড় জোর আর মাইল খানেক। ওপরে ঝকঝকে গাঢ় নীল আকাশের বুকে রূপোলী চাঁদ—নীচে মৃত্যুকূপ। পায়ের লোম খাড়া হয়ে গেছিল আমার। দাদার সঙ্গে বৃথাই কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। ঠোঁটে আঙুল টিপে ধরে ইঙ্গিতে দাদা বলেছিল কান খাড়া করে শুনতে।

শুনতে পেয়েছিলাম অপার্থিব সেই শব্দ। জলের গজরানি ডুবিয়ে দিয়ে কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে চাইছে একটা অতি তীব্র আর্ত চিৎকার, একই সঙ্গে হাজার হাজার স্টিম-পাইপ থেকে সবেগে স্টিম বেরিয়ে গেলে বুঝি এই রকম লোমহর্ষক আওয়াজই শোনা যায়। নৌকো এতক্ষণ পর্বতপ্রমাণ ঢেউয়ের ওপর উঠছিল আর নামছিল—এখন একটা দানব ঢেউ এসে আমাদের সোঁ করে তুলে দিলে আকাশের দিকে—হাউইয়ের মতো উঠছি তো উঠছি—তারপরেই খসে পড়লাম বুঝি পাহাড়ের গা বেয়ে—মাথা ঘুরে গেল আমার—মনে হল বমি করে নৌকো ভাসিয়ে দেব।

মস্‌কো-স্টর্মকে দেখতে পেলাম তখনই। রোজ যে ঘূর্ণিপাককে দেখি—এখন যা দেখছি সেরকম নয়। এরকম নারকীয় চেহারা কখনও দেখিনি। আতঙ্কে দু'চোখ মুদে ফেলেছিলাম আর সইতে না পেরে। কানের গোড়ায় তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল হাজার হাজার স্টিম পাইপের সোঁ সোঁ কাতরানি। চোখ খুলেই দেখেছিলাম মস্‌কো স্টর্ম-এর ফেনা-বলয়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। আশ্চর্য বেগে ছুটছে নৌকো—ডুবে যাচ্ছে না—জলের ওপর দিয়ে ঠিক যেন উড়ে যাচ্ছে—আর একটু পড়েই গোঁৎ খেয়ে নেমে যাবে পাতালের অতলে।

ঠিক এই সময়ে একটা বিচিত্র খেয়াল দাপিয়ে বেড়াতে লাগল আমার মগজের কোষে কোষে। বিকট এই ঘূর্ণিপাকের আসল চেহারা দেখবার সুযোগ যখন পেয়েছি, তখন তাকে চোখ খুলেই দেখে যাব। জানি তো প্রাণ নিয়ে ফিরে এসে বর্ণনা দেওয়ার সুযোগ পাবো না—তবুও মহাকায়কে দেখবো মহা কৌতূহলে—এত কাছ থেকে এ সুযোগ পেয়েছি একবারই—মৃত্যুর আগে—সুযোগ হাতছাড়া করতে যাব কেন?

ভয়ের নাগপাশ খসে পড়েছিল উদ্ভট এই বাসনায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতেই। আজ আমার মনে হয়, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছিল আমার কিছুক্ষণের জন্যে।

আরও একটা কারণে সুস্থির হতে পেরেছিলাম। বাতাসের দামালপনা কমে এসেছিল। ফেনাময় বলয় তো সমুদ্রপৃষ্ঠের অনেক নীচে—এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছেন। এই সমুদ্রপৃষ্ঠই তখন গগনচুম্বী হয়ে ওঠায় পাহাড়-প্রাচীরের মতোই রুখে দিচ্ছিল ঝোড়ো হাওয়াকে। পাঁচিল ছাড়া তাকে আর কিই বা বলব। কালো পাহাড়। ঘিরে রেখে দিয়েছে আমাদের ওপর দিক দিয়ে।

ঝড়ের সময়ে সমুদ্রে কখনও থেকেছেন ? বাতাস আর জলকণা মিলেমিশে মাথা খারাপ্ করে দেয়। আচমকা আমরা অব্যাহতি পেয়েছিলাম এই দুই উপদ্রব থেকে। সেটা আরও ভয়ঙ্কর। রাতভোর হলে ফাঁসি হবে যার, সেই আসামীকে খুব তোয়াজ করা হয় আগের রাতে। আমাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল সেইরকমই।

নৌকো কিন্তু ভীষণ বেগে চর্কিপাক দিয়ে চলেছে এই অবস্থাতেই। ঘুরতে ঘুরতে একটু একটু করে নামছে জল-গহ্বরের ভেতর দিকে। অতবড় মৃত্যু কূপের গা বেয়ে বন্‌বন্‌ করে ঘোরা সত্ত্বেও আমি মাস্তুলের গোড়া ছাড়িনি। দাদা কিন্তু পিপে ছেড়ে টলতে টলতে এগিয়ে এল আমার দিকে। চোখ মুখ দেখে বুঝলাম ভয়ে মাথা খারাপ করে ফেলেছে। মাস্তুলের গোড়ায় আছড়ে পড়েই গোড়া থেকে আমার হাত খসিয়ে নিজে সেই গোড়া আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতেই বুঝলাম-দাদা আমাকে মেরে নিজে বাঁচতে চাইছে। গুঁড়িয়ে গেছিল মনটা। কিন্তু আর দ্বিধা করিনি। ওইটুকু ভাঙা গোড়ায় দু'জনের হাত বসবে না। দাদাকে ছেড়ে দিয়ে টলতে টলতে চলে গেলাম। দড়ি দিয়ে মজবুত করে বাঁধা পিপে আঁকড়ে ধরেছিলাম।

এবং চোখ বন্ধ করেছিলাম। মৃত্যুকূপে এইভাবে নেমে যাওয়া দেখা যায় না। চোখ মুদেই টের পাচ্ছিলাম হু-হু করে নেমে যাচ্ছে নৌকো। তারপর একটু কমে এল পতনের বেগ। নৌকোও আর সেরকম দুলছে না। মনে সাহস এনে ভগবানের নাম করে চোখ খুলেছিলাম।

হ্যাঁ, দৃশ্য একখানা দেখলাম বটে। তারমধ্যে বিভীষিকা আছে, স্বর্গীয় সৌন্দর্যও আছে। মাথার ওপরকার গোলাকার মেঘমুক্ত অঞ্চল থেকে পূর্ণচন্দ্র স্নিগ্ধ কিরণ বর্ষণ করে চলেছে। তাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি চারিদিক।

অদৃশ্য এক ম্যাজিশিয়ান নৌকোকে যেন টেনে ঝুলিয়ে রেখেছে মৃত্যুকূপের গায়ে। বিকটকার এই কূপের তলা দেখা যাচ্ছে না। গা চকচক করছে কালো আবলুষ কাঠের মতো। অসম্ভব বেগে জল পাক দিচ্ছে। ফানেলের মাঝামাঝি জায়গায় ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে দেখতে পাচ্ছি কালো দেওয়ালে জ্যোৎস্নার ধারা সোনালি ছটা বিকিরণ করছে দিকে দিকে।

হতবুদ্ধি হয়ে গেছিলাম বিচিত্র সুন্দর অথচ অতীব ভয়ানক এই দৃশ্য দেখে। একটু একটু করে মাথা শান্ত হয়ে এল। অতবড় ফানেলের মাঝামাঝি জায়গা থেকে অকল্পনীয় বেগে পাক দিচ্ছে নৌকো। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে হেলে পড়েছে-অথচ আমরা নৌকো থেকে পড়ে যাচ্ছি না-নিশ্চয় অতজোড়ে নৌকো ঘুরছে বলে-সেঁটে রয়েছি পাটাতন আর পিপের গায়ে।

ঝুলছি বলেই দেখতে পাচ্ছি মৃত্যুকূপের তলদেশ। সেখানে

বিরাজ করছে বাষ্পকণার ওপর অবর্ণনীয় এক রামধনু।

আর এই রামধনুর তলা থেকেই হাড় হিম করা আর্ত চিৎকার বিরামবিহীনভাবে উঠে এসে ধেয়ে যাচ্ছে আকাশের দিকে।

ফেনার বলয় থেকে ঘুরতে ঘুরতে যেভাবে নেমেছি, এখন আর সেভাবে নামছি না। ফানেলের গা বেয়ে পলকে পলকে চর্কিপাক মারছি এখনও–কিন্তু নেমে যাওয়াটা আর আগের স্পিডে ঘটছে না। নামছি এখনও–কিন্তু খুবই অল্পমাত্রায়।

চারদিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম আরও কি-কি জিনিসকে মস্‌কো-স্টর্ম টেনে এনেছে করাল গহ্বরে নিক্ষেপ করবে বলে। গাছপালা, কড়িবরগা, ভাঙা বাক্স, পিপে, জাহাজের টুকরো-টাকরা–সবই দেখতে পাচ্ছি চাঁদের আলোয়। দেখছি আর ভাবছি। মরতে চলেছি জেনেও হঠাৎ ঠাণ্ডা মাথায় অত জিনিস কেন দেখছিলাম, কেনই বা তাদের নিয়ে অত চুলচেরা ভাবনা ভাবছিলাম–আজও আমার কাছে তা রহস্য হয়ে রয়েছে।

ধাবমান একটা ফার গাছকে দেখে সিদ্ধান্তে এসেছিলাম–এইবা র এর পালা! কিন্তু আমার সেই সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণিত করে দিয়ে একটা মস্ত ওলন্দাজ জাহাজ ফার গাছকে দৌড়পাল্লায় টেক্কা মেরে গেল এগিয়ে এবং তলিয়ে গেল নিমেষে!

এই ধরনের ঘটনা আরও বারকয়েক ঘটল চোখের সামনেই। কেন এমন উল্টো ব্যাপার ঘটছে ভাবতে গিয়ে মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল আমার–ভয়ে নয়–আশার আনন্দে!

মস্‌কো-স্টর্ম থেকে ভেঙেচুরে বেরিয়ে আসা বহু বস্তু ল্যেফোডেনের ধারে কাছে ভাসতে দেখেছি। আস্ত অবস্থাতেও দেখেছি অনেক জিনিস। চকিতে মনে পড়ল–আস্তগুলো আকার আয়তনে ছিল ছোট।

অর্থাৎ বড় জিনিসগুলোই গুঁড়িয়েছে–ছোটরা বেঁচে গেছে।

মস্‌কো-স্টর্মের ভেতরেও দেখছি সেই একই কাণ্ড। বড়গুলো হু হু করে নেমে যাচ্ছে–ছোটরা যাচ্ছে ঢিমেতালে। এইভাবে কিছুক্ষণ থাকতে পারলেই তো ঘূর্ণিপাকের ঘুরুনি বন্ধ হবে–ফের জল ঠেলে উঠবে।

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে পিপের দড়ি নৌকোর কিনারা থেকে খুলে নিয়ে নিজেকে সেই দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললাম পিপের সঙ্গে। দাদাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলাম। দাদা এল না। আমি পিপে সমেত গড়িয়ে গিয়ে পড়লাম জলে।

ভাসতে ভাসতে দেখলাম পালা এসে গেছে নৌকোর। আচমকা স্পিড বেড়ে গেছে। নড়া ধরে কে যেন তাকে টেনে নিয়ে গেল রামধনু রঙিন কূপের তলায়। বীভৎস হাহাকার চাপা দিয়ে দিল দাদার শেষ আর্তনাদকে।

আর তার পরেই দম ফুরিয়ে গেল ঘূর্ণিপাকের। আচমকা কমে এল ঘূর্ণির বেগ–স্পষ্ট দেখলাম নীচের জলও ঠেলে উ· ছে ওপর

দিকে। মিলিয়ে গেল আশ্চর্য রামধনু। হু-উ-স করে চলে এলাম সমুদ্রপৃষ্ঠে। প্রচণ্ড স্রোতে গা ভাসিয়ে পৌঁছলাম জেলেদের আড্ডায়। সকাল নাগাদ।

ওরা আমাকে চিনতে পারেনি। মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেছিল। সেই মুহূর্তে কোনও কথা বলতে পারিনি। পরে যখন বলেছিলাম, কেউ বিশ্বাস করেনি।

জানি আপনিও করবেন না।

অদ্রীশ বর্ধন অনূদিত

এডগার অ্যালান পো রচনাসংগ্রহ

ভয়াল রসের গল্প-উপন্যাস

আজও বিশ্বশ্রেষ্ঠ

২

সূচিপত্র

ক্ষণজন্মা লেখক প্রসঙ্গে

এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-৪৯) জন্মেছিলেন আমেরিকার বোস্টন শহরে। বাবা আর মা দুজনেই মঞ্চে অভিনয় করতেন। পো-র বয়স যখন মোটে তিন বছর (কেউ বলেন দু'বছর), মারা যান দুজনেই।

ওইটুকু বয়স থেকেই পো ছিলেন ভয়ানক আবেগপ্রবণ আর নার্ভাস প্রকৃতির। মা-বাপ মরা শিশুকে পালক-পিতা হিসেবে তখন বুকে তুলে নিয়েছিলেন ভার্জিনিয়ার রিচমণ্ড শহরের জন অ্যালান। সম্পর্কে ছিলেন পো-এর কাকা। তামাকের ব্যবসা করতেন।

অ্যালান সাহেব নাকি 'আদর দিয়ে বাঁদর' করে তুলেছিলেন পো-কে। ইংল্যাণ্ডে থাকার সময়ে পো-কে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন লণ্ডনের ম্যানর স্কুলে। ১৮২০তে ফিরে যান যুক্তরাষ্ট্রে। ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে টিকতে পারেন নি, পড়াশোনার চেয়ে বেশি মদ খেতেন আর জুয়ো খেলতেন বলে। ১৮৩৬ সালে বিয়ে করেন তাঁর তেরো বছরের সম্পর্কিত বোন ভার্জিনিয়া ক্লেম-কে। বড় কষ্টে জীবন কেটেছে মেয়েটার। কেননা, লিখে তেমন রোজগার করতে পারেননি পো।

ওয়েষ্ট পয়েন্ট-এর মিলিটারি অ্যাকাডেমি থেকে বিতাড়িত হন ১৮৩৪ সালে ঔদ্ধত্য আর ক্রমাগত নিয়ম শৃঙ্খলা ভাঙার জন্যে। ওই বছরেই পো-এর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখলেন না প্যলক-পিতা। মারাও গেলেন একই বছরে। পো-এর পকেটে তখন কানাকড়িও নেই। আর ঠিক তখনি আবিষ্কার করলেন ওঁর লেখক প্রতিভাকে। তখনকার আমলের পয়লা সারির বহু পত্রিকায় ভাল ভাল আসন দখল করেও কোনোখানেই বেশিদিন টিকে থাকতে পারেননি ইন্দ্রিয়পরবশ স্বভাব চরিত্রের জন্যে।

পো লিখেছেন মনে রেখে দেওয়ার মত কবিতা, ফ্যানট্যাসটিক প্লটের গল্প। তাঁর মৌলিকতা হীরক-উজ্জ্বল, রচনাশৈলী মনের গোড়া পর্যন্ত নাড়িয়ে দেওয়ার মতো। বিদগ্ধ সমালোচকও ছিলেন। *'দ্য র‍্যাভেন'* কবিতা (১৮৪৫) সালে তাঁকে

প্রকৃত খ্যাতি এনে দেয়। কিন্তু এর পরেই ট্রাজেডির পর ট্র্যাজেডি ঘটতে থাকে। স্ত্রী মারা গেলেন স্মরণীয় এই কবিতা লেখার ঠিক দু'বছর পরে। নিজে মারা গেলেন তারও দু'বছর পরে। শেষের দু'বছর ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়ে অমিতাচারী পো কোনো সংযমের ধার ধারেননি, আরও বেশি মদ খেয়েছেন, আরও বেশি জুয়ো খেলেছেন—দিন কেটেছে নিদারুণ দৈন্যদশায়। শেষ অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায় বাল্টিমোরের এক নর্দমায়—মৃত্যু তখন দোরগোড়ায়।

আমেরিকার সাহিত্য-ইতিহাসের কোনো কবি বা গল্প লেখকের জীবন এত অন্ধকারাচ্ছন্ন, এত বিপর্যয়-ভরা নয়। চরিত্রের দোষ আর শৈশবের শিক্ষার অভাব ধ্বংস করেছিল এই সূক্ষ্ম আর মৌলিক বহুমুখী প্রতিভাকে। সারা জীবন মাথা খারাপের পূর্ব লক্ষণ অবস্থা নিয়ে কাটিয়েছেন পো। এই সঙ্গে জুটেছিল বিরামহীন মদ্যপান—নিজেও ভয় পেতেন—এই বুঝি পুরো পাগল হয়ে গেলেন।

সাসপেন্স আর শিহরণ, রোমাঞ্চ আর বিভীষিকা সৃষ্টির জন্যে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন পো। *'দ্য র‍্যাভেন'* বা *'দাঁড়কাক'* কবিতাটা প্রেরণা জুগিয়েছিল ফরাসি কবি বদেলেয়ার-কে। পো মডার্ন ডিটেকটিভ গল্পেরও পথিকৃৎ। তাঁর তৈরী গোয়েন্দা অগাস্ত দুপিঁ ডয়ালের শার্লক হোমস চরিত্রের অগ্রগামী দূত। ১৮৪১ সালে *'দ্য মার্ডার্স ইন দ্য রু মর্গ'* লিখে তাঁকে পো আবির্ভূত করেছিলেন সাহিত্যের মঞ্চে। শার্লক হোমস প্রথম আবির্ভূত হন *'এ স্টাডি ইন স্কারলেট'* উপন্যাসে—ছাপা হয় ১৮৮৭ সালে *'বীটন্‌স্'* পত্রিকার ক্রীস্টমাস বার্ষিকীতে। দুপিঁকে গল্পের আঙিনায় নামানোর ৮ বছর পর যদি পো মারা না যেতেন, তাহলে হয়তো '৪১ থেকে '৮৭-এই ছাব্বিশ বছরে শার্লক হোমসের চাইতেও বড় গোয়েন্দাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারতেন। মেরি রোজার্স নামে নিউইয়র্কের এক মহিলার অমীমাংসিত মৃত্যুরহস্য কাগজে পড়ে, সেই তথ্যের ভিত্তিতে লেখেন গল্প—বহু বছর পরে তাঁর সমাধান প্রায় হুবহু সঠিক বলে প্রমাণিত হয় (দ্য মিস্ট্রি অফ মেরি রোজেট)। এই খণ্ডে প্রকাশিত হলো শ্বাসরোধী সেই গোয়েন্দা কাহিনী।

বেঁচে থাকার সময়ে পো-কে কেউ সঠিক বুঝে ওঠেনি. বরং ভুলই বুঝেছে। অথচ তিনি ছিলেন আমেরিকার সবচেয়ে বড় ছোট গল্প লেখক। একটাই উপন্যাস লিখেছেন মাত্র চল্লিশ বছরে ক্ষণজন্মা এই পুরুষ। তার নাম *'Narrative of A. Gordon Pym'*—যে উপন্যাস পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বের বহু কথাশিল্পী অনেক ধরনের উপসংহার-কাহিনী রচনা করেন; জুল ভের্ণ নিজে লেখেন আশ্চর্য এক আলেখ্য : *'তুহিন তেপান্তরের স্ফিংক্স দানবী'।*

পো-র এই রচনাসংগ্রহের ১ম খণ্ডে মূল্যবান এই উপন্যাসটি রইল মূল আকর্ষণ হিসেবে।

এই উপন্যাস ছাড়াও পো ১৮৩৪ থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মাত্র পনেরো বছরের মধ্যে লিখেছেন ৭২টা গল্প আর নিবন্ধ।

গোটা আমেরিকায় এত ক্ষমতা নিয়ে খুব কম কবি গল্পকার সম্পাদক

জন্মেছেন। অথচ তাঁর গোটা জীবনটাই শোচনীয়। এত বড় সম্পাদক ওই সময়ে আর ছিল না, প্রতিটি লেখার মধ্যে পাণ্ডিত্যের ফুলকি ছিটকে বেরোলেও লিখতেন বেশ গুছিয়ে আর খুঁটিয়ে—অথচ রূঢ় বাস্তবকে সামাল দেওয়ার মত স্নায়ুর ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ফলে ক্রমাগত টাল খেয়েছেন ব্যক্তিত্ব আর সৃষ্টির অন্তর্দ্বন্দ্বে। সত্যিই ফাটা কপাল নিয়ে জন্মেছিলেন পো। সুনামের চেয়ে কুনাম অর্জন করেছেন বেশি—শেষে মরতে বসেছেন নর্দমার পাঁকে।

মৃত্যুর পরেই দুর্নামকে আরও ঢাক পিটিয়ে জানিয়ে ছিলেন এমন এক ভদ্রলোক—যাঁকে পো সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছিলেন। তাঁর নাম রুফুস ডবলিউ গ্রিসওল্ড। পো-র সাহিত্য-সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক; অথচ পো-র মৃতদেহ ঠাণ্ডা-বরফ হওয়ার আগেই এই ভদ্রলোকই আদাজল খেয়ে কাগজে কাগজে শোক-নিবন্ধ লেখার নামে পো-র মুণ্ডপাত করতে শুরু করেন। ভদ্রলোক নিজে ছিলেন প্রতিভাধর—কিন্তু ঈর্ষার ফণা তাঁর প্রতিভাকেও ডিঙে গেছিল—তাই জিনিয়াস পো-কে ছোবলের পর ছোবল মেরেছিলেন পো মারা যাওয়ার পর থেকেই। যথেষ্ট কাদা ছিটিয়ে ছিলেন পো-র চরিত্রে। লেখার অপবাদও করেছিলেন। সমগ্র সাহিত্য একেবারে প্রকাশ না করে নিজের পছন্দমত লেখা বের করেছিলেন। এমনিতেই শেষের কয়েকটা বছর পো আর গুছোনি থাকতে পারেননি। নানা পুস্তিকা, পত্রিকা এবং হাবিজাবি জায়গায় লিখে গেছিলেন বলে সে সব লেখা জোগাড় করতেও কালঘাম ছুটে গেছিল। তার ওপর সাহিত্য তত্ত্বাবধায়কের এহেন বিশ্বাসঘাতকতা। মরেও নিশ্চয় শান্তি পাননি পো।

এইভাবে রেখে ঢেকে বেছে বেছে লেখা প্রকাশ করারও একদিন অবসান ঘটেছিল। লেখার মধ্যে দিয়ে লেখককে চিনুন—এই নীতি অনুসরণ করে তাঁর সমস্ত লেখা প্রকাশের উদ্যোগপর্ব যেদিন থেকে শুরু হয়েছিল আমেরিকায়—সেইদিন থেকে জানা গেল, পো কি ছিলেন।

মজা হচ্ছে, পো-র প্রতিভা আমেরিকায় প্রথম স্বীকৃতি না পেলেও পেয়েছিল ইউরোপে। ইউরোপ থেকে পো-ফুলকি আমেরিকায় ঢুকতেই টনক নড়ে মার্কিনীদের।

এ কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন দুই ফরাসী কবি-বদেলেয়ার আর ম্যালারমি। বিশেষ করে বদেলেয়ার পো-অনুবাদ করতে গিয়ে নিজেই প্রভাবিত হয়ে পড়েন। আধ-পাগল (!) পো তাঁকে এমনই আচ্ছন্ন করেছিল যে তাঁর ফরাসী অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রে মূল পো-কেও ছাড়িয়ে গেছিল—একথা বলেন সাহিত্য বোদ্ধারা।

বাংলায় পো-এর কিছু অনুবাদ বেরিয়েছে। যে লেখাগুলোর নামও শোনা যায়নি—অথচ অসাধারণ সেগুলোকেই আনা হল এই রচনাসংগ্রহের দুটি খণ্ডে।

অদ্রীশ বর্ধন
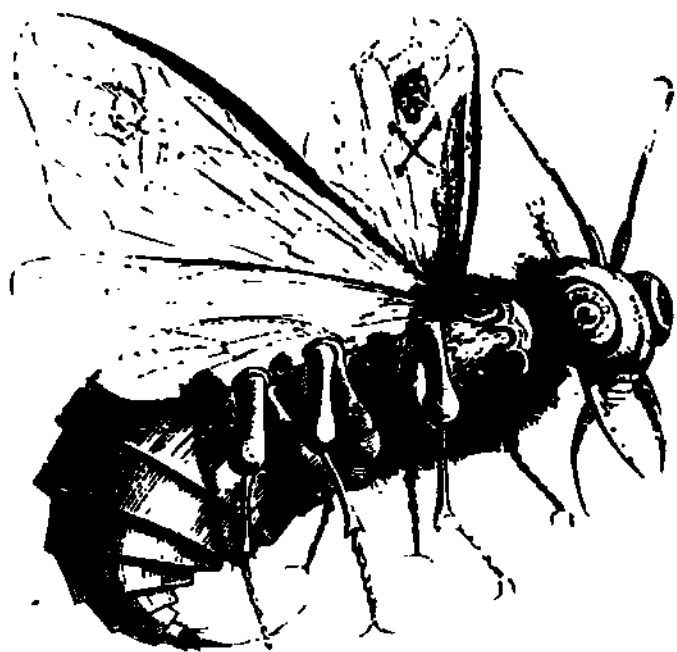
এডগার অ্যালান পো রচনাসংগ্রহ
২য় খণ্ড

প্রেতাবিষ্ট প্রাসাদ

[দ্য ফল অফ দ্য হাউস অফ আশার]

শরৎকালের এক শব্দহীন, আভাহীন, ছায়ামায়ার দিনে ঘোড়ায় চেপে সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছেছিলাম 'আশার প্রাসাদে'। সারাদিন দেখেছি আকাশ থেকে ঝুলে পড়া রাশিরাশি কালো মেঘ। যেন বুকের ওপর চেপে বসেছিল। দেখেছি প্রান্তরের ওপর দীর্ঘ পথ—অসাধারণ নির্জন— খাঁ-খাঁ করছে দিক-দিগন্ত। এত কষ্টে তেপান্তর পেরিয়ে এসে দেখলাম, 'আশার প্রাসাদ'ও বিরস বদনে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। এরকম বিষণ্ণ ভবন কখনও দেখিনি।

দেখেই বুক দমে গেছিল আমার। জানি না কেন এমন হলো। অসহ্য নৈরাশ্য নিমেষে পাষাণের মতই চেপে বসল আমার সমস্ত আশা-উৎসাহের ওপর। আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম অন্তহীন বিষাদে।

অসহ্য বলার কারণ আছে। ভয়ঙ্করতম পাণ্ডববর্জিত পরিবেশেও হাঁপিয়ে না ওঠার মত সরসতার সন্ধান করে নিতে পারে মানুষের মন। বিশুষ্ক প্রকৃতির বুকে খুঁজে নেয় সৌন্দর্যের খনি। মন তখন নিজেই হাল্কা হয়ে যায়। একথা বলেন কবিরা। কিন্তু 'আশার প্রাসাদ'-এর দিকে তাকিয়ে আমার মনের অকস্মাৎ গুরুভার অসহ্য হয়ে উঠেছিল—কারণ নিরানন্দ সেই নিকেতনের কোথাও

কোনো আনন্দের আভাস আমি পাইনি। 'আশার প্রাসাদে' বুঝি আছে শুধু নিরাশা—আশা-র বিপরীত বস্তু।

নিমেষহীন নয়নে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়েছিলাম নিঝুম প্রেতচ্ছায়ার মত জীর্ণ ভবন আর তার জমি-জায়গার অবসন্ন প্রকৃতির দিকে। বিবর্ণ প্রাচীর। শূন্য চক্ষু গহ্বরের মতন খানকয়েক বাতায়ন। পচা নল খাগড়ার কয়েকটা ঝোপ। অন্তিমদশায় উপস্থিত কয়েকটা সাদাটে বৃক্ষ। অহিফেনসেবী যেমন প্রথমদিকে হই-হুল্লোড় করার পর একেবারেই নেতিয়ে পড়ে হতাশার হুতাশনে—এবাড়ির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে যেন সেই অবসাদ আর নৈরাশ্য— এ ছাড়া আর কোনো পার্থিব উপমা আমার মাথায় আসছে না। আফিংখোরের দুঃস্বপ্ন যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে আমার বিস্ফারিত দুই চক্ষুর সামনে—দৈনন্দিন জীবনে হঠাৎ স্মৃতি-বৈকল্যের মতন এই প্রাসাদও যেন এক বিস্মৃতি-বিভ্রাট। মনের ভেতর পর্যন্ত দমিয়ে দেয় ঝলক দর্শনেই।

অদ্ভুত এক শৈত্যবোধ সহসা আঁকড়ে ধরল আমার হৃৎপিণ্ডকে—যেন তুহিন-শীতল নিষ্পেষণে বিবশ আর বিকল হয়ে এলিয়ে পড়তে চাইছে আমার বুকের খাঁচার পাখি; বিচিত্র সেই উপলব্ধিকে বোঝাই কি করে ভেবে পাচ্ছি না। এই নয় যে লাগাম ছাড়া চিন্তার ধুধু শূন্যতা আমারই বেসামাল কল্পনা দিয়ে হটিয়ে দিয়েছিল মনের আনাচের কানাচের সমস্ত সুস্থ স্বাভাবিক বোধশক্তিকে। ক্ষণেকের জন্যে তাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম—কেন এমন হলো? কেন এতো ঘাবড়ে গেলাম? 'আশার প্রাসাদ' কেন এমন হতোদ্যম করে তুলছে আমাকে? নিতল সেই রহস্য শেষ পর্যন্ত তিমিরাবৃতই রয়ে গেছিল আমার কাছে। ঠায় দাঁড়িয়েছিলাম বেশ কিছুক্ষণ; অজস্র ছায়াসম কুহেলী-কল্পনা ভিড় করে আসছিল মনের মধ্যে—বুঝে উঠিনি আচম্বিতে কেন শিউরে উঠছি অকারণ কু-কল্পনায়। নিরুপায় হয়ে শেষে ভেবেছিলাম, প্রকৃতির অনেক বস্তুই সময়বিশেষে একযোগে মনের মধ্যে এহেন কায়াহীন আতঙ্কবোধ সৃষ্টি করে বটে—বিশ্লেষণ দিয়ে কিন্তু তাদের বুঝে ওঠা যায় না। বিভীষিকা সঞ্চারী অদৃশ্য সেই শক্তি অব্যাখ্যাতই থেকে যায় শেষ পর্যন্ত। প্রকৃতির যে দৃশ্য সমাহারের দরুন নামহীন এই শিহরণবোধ জাগ্রত হচ্ছে, সেই দৃশ্য-সমাহারকে একটু অদলবদল করে নিলেই নিশ্চয় শিহরণবোধও চম্পট দেবে—এই আশায় ঘোড়ার লাগাম ধরে এগিয়ে গেছিলাম জলভর্তি সরোবরের পাড়ে—দৃশ্যান্তরে মনোনিবেশ করে মনের বিভীষিকাকে খেদিয়ে দেওয়ার আশায় চেয়েছিলাম নিথর জলের দিকে। ফল হয়েছিল উল্টো। মসীকৃষ্ণ জলে জীর্ণ প্রাসাদের উলটোনো শায়িত প্রতিবিম্ব আরও রোমাঞ্চকর মনে হয়েছিল—ধূসর নলখাগড়া আর মড়ার মত বিকটাকার গাছের গুঁড়ি, শূন্যগর্ভ চোখের মতো ফাঁকা জানলা, শিহরণের তরঙ্গ বইয়ে দিয়েছিল পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

এ সব সত্ত্বেও বুক-দমানো এই প্রাসাদপুরীতেই তো থাকতে হবে কয়েকটা সপ্তাহ। এ বাড়ির মালিক, রোডরিক আশার, আমার ছেলেবেলার বন্ধু। বহু বছর

ছাড়াছাড়ি গেছে। দেশের অন্য প্রান্তে বসে হঠাৎ একটা চিঠি পেলাম। রোডরিকের চিঠি। স্নায়বিক উত্তেজনায় ঠাসা প্রতিটি পংক্তি। ওর নাকি কি এক কঠিন ব্যাধি হয়েছে। ব্যাধিটা শরীরের। মনটাও গোলমাল করছে। বড় যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছে। আমি গিয়ে ওকে যদি হপ্তাকয়েক সঙ্গ দিয়ে যাই—তাহলে আমার সমাজের কিছুটা প্রসন্নতা ওর অপ্রসন্ন পরিবেশকে তাড়িয়ে দিতে পারবে—মনের ভার লাঘব হবে—রোগও পালাবে। প্রাণের বন্ধু হিসেবে আমাকে করতেই হবে। হৃদয়-ঢালা এই চিঠির উত্তাপ আমাকে স্পর্শ করেছিল। ওর ব্যাকুল আহ্বান আমি না রেখে পারিনি। ছুটে এসেছিলাম অনেকদূর থেকে ছেলেবেলার বন্ধুর অদ্ভুত আমন্ত্রণ রাখবার অভিলাষ নিয়ে।

যখন ছোট ছিলাম, তখন রোডরিকের সঙ্গে বন্ধুত্বটা লতায় পাতায় নিবিড় হয়ে উঠলেও ওর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতাম না। নিজেকে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় রেখে ঢেকে দেওয়ার স্বভাব ওর জন্মগত। ওর সুপ্রাচীন বংশ গরিমা সম্বন্ধে যা জেনেছিলাম, তা এই : এ বংশের সবাই বড় বিচিত্র ধাতু দিয়ে তৈরি হয়, আশ্চর্য অনুভূতি এদের অস্থিমজ্জায় অষ্টপ্রহর সঞ্চরণ করে; যুগে যুগে অদ্ভুত এই অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটেছে বহু প্রশংসিত শিল্পকর্মে, সম্প্রতি ঘটছে দানধ্যানে, আর সঙ্গীতবিজ্ঞানের ধ্রুপদী সৌন্দর্যের সন্ধানে। জেনেছিলাম আরও একটা অসাধারণ ব্যাপারে। 'আশার' বংশবৃক্ষ যুগে যুগে ডালপালা মেলে ছড়িয়ে মহীরুহে পরিণত হয়নি—বংশগতি অব্যাহত রেখেছে সরাসরি নিচের দিকে—সাময়িকভাবে সামান্য এদিক ওদিক করা ছাড়া বংশধারা এগিয়ে চলেছে একই লাইন ধরে। পুরুষানুক্রমে এই বংশ একটা রেখা ধরে একই বাড়ির মধ্যে পদবী টিকিয়ে রাখার ফলেই বোধহয় জায়গাজমির নামের সঙ্গে বংশের নামও মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে 'আশার প্রাসাদ'-কে ভীতিকর সম্ভ্রমবোধে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

সরোবরের পাড়ে দাঁড়িয়ে জলের দিকে তাকিয়ে মনের ভয় কাটাতে গিয়ে আরও ভয় পেয়েছিলাম—আগেই তা বলেছি। কুসংস্কার দ্রুত বেড়ে গেছিল নিশ্চয় জলের মধ্যে বাড়ির উল্টো ছায়া দেখে। আতঙ্ক থেকে যে সব অনুভূতির জন্ম, তারা প্রত্যেকেই এই ধরনের আপাতবিরোধী নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ বলেই আমি মনে করি। নইলে এক ভয় থেকে আর এক ভয়—এক দুর্বার কল্পনা থেকে আর এক দুর্বারতর কল্পনা মনের মধ্যে শেকড় চালিয়ে দেবে কেন? নিথর কালো জলের দিকে তাকিয়ে সেই মুহূর্তে নতুন যে ছমছমে অনুভূতিটা এমনই অতীন্দ্রিয়ভিত্তিক যে, লিখতে গিয়েও হাসির উদ্রেক ঘটছে। তাহলেও লিখব—নইলে বোঝাতে পারব না কি ধরনের জীবন্ত বিভীষিকাবোধ স্থাণু করে তুলছিল আমার চেতনার গোড়া পর্যন্ত। কল্পনাকে নিশ্চয় বেশি প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। তাই হঠাৎ মনে হয়েছিল জীর্ণ কিন্তু প্রায়-জীবন্ত এই প্রাসাদপুরী আর এই তল্লাটে পরিব্যাপ্ত পুরো পরিবেশটাকে স্বর্গীয় বলা যায় না মোটেই—কেননা, পচা গাছপালা, ধূসর প্রাচীর আর নিথর সরোবর থেকে নিরন্তর কুণ্ডলী দিয়ে

শূন্যে ধেয়ে যাচ্ছে একটা অপ-বায়ু—দুর্বোধ্য গুচ্চচ রহস্যবহ একটা বাষ্প—মন্থরগতি, ক্লেদাক্ত, ক্ষীণভাবে দৃশ্যমান এবং বিষাদবর্ণে রঞ্জিত—ধূসর সিসের মতই চেপে বসতে চায় বুকের মাঝে।

যা দেখেছি, তা নিশ্চয় স্বপ্ন। খারাপ স্বপ্ন মনকে তো দমিয়ে দেবেই। এই ভেবে প্রাসাদপুরীর প্রকৃত তাৎপর্য তলিয়ে দেখবার প্রয়াসে আরও সন্ধানী চোখে প্রতিটি দুনিরীক্ষ দৃশ্যকে চুলচেরাভাবে দেখে গেছিলাম। অতি-বার্ধক্য এ বাড়ির মূল বৈশিষ্ট্য। শুধু প্রাচীন বললে অসঙ্গত হবে—অতিরিক্তমাত্রায় প্রাচীন। বয়সের ভার যখন অতিশয় হয়—তখন তা প্রথমেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে বিবর্ণতার মধ্যে দিয়ে। এ বাড়ির সঙ্গেও লেপে রয়েছে সেই কালিমা। কার্নিশের কিনারা থেকে শৈবাল ঝুলছে ঘনবুনটের ঝালরের মতন, অথচ অসাধারণ জীর্ণাবস্থার পদচিহ্ন তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। কোথাও তো খসে পড়েনি প্রকাণ্ড ইমারতের কণামাত্র অংশ। পলস্তারা অক্ষত, গাঁথনি অটুট। বিপুল অসামঞ্জস্য বিধৃত হয়ে রয়েছে পরস্পরবিরোধী এই দুই অবস্থার মধ্যে; প্রতিটি প্রস্তর গুঁড়িয়ে যাওয়ার মতন অবস্থায় পৌঁছেও গুঁড়িয়ে যায় নি—খসেও পড়েনি—গোটা বাড়িটা রয়েছে আশ্চর্যভাবে অটুট—কোনো অংশই স্খলিত হয়নি—অথচ স্বাভাবিকভাবেই তা হওয়া উচিত ছিল। ঠিক যেন পাতলা সমাধির কারুকাজ করা দারুময় খিলেন—বাইরের বাতাসের নিঃশ্বাসের ছোঁয়া না পেয়ে কাঠের সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম অক্ষত রয়ে গেছে; ভাঙনের মুখে এসেও কিন্তু ভাঙন যে রোধ করে দিয়েছে প্রহেলিকাসম এই প্রাসাদপুরী—সেটা অবশ্য সুস্পষ্ট ভবনের সর্বত্র। পারলে যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলোয় পরিণত হয় এখুনি—অবস্থা সেই রকমই—অথচ কি এক নিগূঢ় শক্তি তাকে ধরে বেঁধে অটুট অক্ষত রেখে দিয়েছে জোর করে। চোখের তারা সঙ্কুচিত করে দীর্ঘক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করেছিলাম বলেই অবশ্য একটা ক্ষীণকায় ফাটল চোখে পড়েছিল—শুধু একটা ফাটল—এত সরু যে চোখে পড়ার কথা নয়—বাড়ির ছাদ থেকে শুরু হয়ে দেওয়ালের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে বিদ্যুতের মতন গতিপথে নেমে এসে মিলিয়ে গেছে তড়াগের স্থির জলে এতসব খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখবার পর ঘোড়ার মুখ ফিরিয়েছিলাম। কদমচালে এগিয়ে গেছিলাম পাথর-বাঁধাই উঁচু জঙ্গল বেয়ে প্রাসাদপুরীর দিকে। আমার পথ চেয়ে দাঁড়িয়েছিল এক ভৃত্য। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে ঘোড়া ছেড়ে দিলাম তার জিম্মায়। গথিক খিলেনের তলা দিয়ে ঢুকলাম হলঘরে। চোরের মত পা টিপে টিপে এগিয়ে এল খাস ভৃত্য। সতর্ক পদবিক্ষেপে আমাকে নিয়ে আঁধার ঘেরা অনেক জটিল গলিপথের মধ্যে দিয়ে পৌঁছোলো মনিবের স্টুডিওতে। সেই সব গলিঘুঁজি করিডর পেরিয়ে আসবার সময়ে শতগুণে বৃদ্ধি পেল গা ছমছমে অনুভূতি—এ বাড়িকে বাইরে থেকে দেখে অব্যক্ত যে অনুভূতি নাগপাকে ঘিরে ধরেছিল আমাকে—অন্দরমহলেও বিরাজমান অস্বস্তিকর সেই পরিবেশ, কি যেন দেখা যাচ্ছে না—অথচ তা রয়েছে। ইন্দ্রিয় দিয়ে যাকে গোচরে আনা যাচ্ছে না—অতীন্দ্রিয় তাকে টের পাচ্ছে। আশপাশের প্রতিটি বস্তু,

কড়িকাঠের অপূর্ব শিল্পকর্ম, দেওয়াল-ঢাকা উৎকৃষ্ট পর্দা, আবলুস কালো মেঝে, চোখে-বিভ্রম-জাগানো জয়ের স্মারকচিহ্ন হিসেবে অগুন্তি ট্রফি—এ সবই তো ছেলেবেলায় আমি দেখেছি। অথচ যখন হাঁটছিলাম নিঃশব্দ চরণে, পা ফেলেছিলাম ভয়ে ভয়ে—খটখট করে নড়ে উঠেছিল বিদ্‌ঘুটে ট্রফিগুলো অমনি অস্বস্তির সেই আবর্ত আমার সমস্ত পুরোনো ধ্যানধারণাকে ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইছিল। জিনিসগুলোকে দেখেছি আশৈশব—কিন্তু অবাঞ্ছিত যে কল্পনা সমগ্র এদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে কাঁকড়ার কর্কশ কঠিন দাড়ার মত আঁকড়ে ধরেছে আমার চিন্তা জগৎকে—তার কবল থেকে তো মুক্তি পাচ্ছি না। এই বিদঘুটে বিকট কল্পনার বাল্যে অপরিচিত ছিল আমার কাছে। হঠাৎ এদের আবির্ভাব ঘটছে কেন?

একটা সোপানশ্রেণীর পাদদেশে দেখা গেল গৃহচিকিৎসকের সঙ্গে। মুখ দেখে কেন জানি মনে হল, ভদ্রলোক খুব ঘাবড়ে রয়েছেন—তাঁর কপালজোড়া ধূর্ততাও যেন হালে পানি পাচ্ছে না—যদিও সেই ধূর্ততা খুব একটা উঁচুদরের বলে মনে হয়নি আমার। আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন ঈষৎ সন্ত্রস্তভাবে, উধাও হলেন পরক্ষণেই। তারপরেই মস্ত পাল্লা খুলে ধরে মনিবের ঘরে আমাকে ঢুকিয়ে দিল খাসভৃত্য।

ঘরটা খুবই বড়। কড়িকাঠ অনেক উঁচুতে। জানলাগুলো লম্বাটে, সরু প্যাটার্নের, ওপরদিকে ছুঁচোলো—কালো ওক কাঠের পাটাতন মোড়া মেঝে থেকে এতই উঁচুতে যে হাত বাড়িয়ে নাগাল ধরা মুস্কিল, কাঁচের জাফরি দিয়ে যে আলো ঢুকছে ঘরে—তার রঙ গাঢ় রক্তের মতন লাল—কিন্তু সে আলোয় শুধু বৃহদাকার বস্তুগুলোকেই দেখা যায়। ঘরের কোণের বস্তু অথবা কড়িকাঠের কারুকাজ অথবা খিলেনের ফাঁকফোকর দেখতে মেহনৎ করতে হয় চোখকে—দেখা যায় না কিছুই। দেওয়ালে দেওয়ালে ঝুলছে গাঢ়বর্ণের বিশাল বিশাল পর্দা। আসবাবপত্র বিস্তর। মান্ধাতার আমলের। আরামদায়ক নয় কোনোটাই। ঘরময় যত্রতত্র ছড়ানো। প্রচুর বই আর বাজনার সরঞ্জাম ফেলে রাখা হয়েছে যেখানে সেখানে, কিন্তু তাদের কেউই নির্জীব ঘরটাকে প্রাণরসে ভরপুর করে তুলতে পারছে না। এ ঘরে ঢুকেই মনে হল যেন বাতাস থেকে একরাশ দুঃখ টেনে নিলাম আমার ফুসফুসের মধ্যে। বিষাদ-বায়ুতে ভারাক্রান্ত এ ঘরের সব কিছুই—নিরেট, নিশ্ছিদ্র, নিশ্চল সেই বায়ু এখানে জাঁকিয়ে বসেছে—তাকে হঠিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা নেই কারোরই।

ঘরে ঢুকতেই সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো আশার। এতক্ষণ লম্বা হয়ে শুয়েছিল অতিশয় দীর্ঘ এই সোফায়, আমাকে দেখেই বিষম উল্লাসে অভ্যর্থনা জানালো বটে, উল্লাসের আধিক্য দেখে আমার কিন্তু মনে হল, এ ঘরের নাছোড় একঘেয়েমিকে জোর করে কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। মুখের পানে ঝলক দর্শন ফেলেই অবশ্য উপলব্ধি করলাম—অভিনয় করছে না—আন্তরিকতা রয়েছে যথেষ্ট। বসলাম পাশাপাশি। কিছুক্ষণ কেউই কোনো কথা বললাম না।

আমি যে চোখে ওকে দেখছিলাম, তার মধ্যে ছিল বিমিশ্র অনুভূতি : অর্ধেক অনুকম্পা, অর্ধেক ভীতি।

রোডরিক আশার এত অল্প সময়ের মধ্যে এরকম ভয়ানকভাবে পালটে গেছে! এ যে ভাবাও যায় না! ছেলেবেলায় যাকে দেখেছিলাম, তাকে তো সামনের এই মানুষটার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না! মুখের চেহারাচরিত্র কিন্তু আগে যা ছিল, এখনও তাই আছে—কোনোকালে পালটাবে বলেও মনে হয় না। বড়ই অসাধারণ সেই মুখাকৃতি। মৃত ব্যক্তির গায়ের রঙের সঙ্গে কিস্তুত মিল আছে ওর চামড়ার রঙের। মুখ দেখলে মনে হয় যেন মড়ার মুখ। একটা চোখ কিন্তু অন্য চোখের চেয়ে বড়, ছলছলে আর বেশিমাত্রায় প্রদীপ্ত। ঠোঁট পাতলা আর পাণ্ডাসপানা—কিন্তু অধরোষ্ঠের বঙ্কিমতা বিস্ময়করভাবে সুন্দর। হিব্রু ছাঁচে গড়া সূক্ষ্ম নাক। নাসিকারন্ধ্র গড়ন যদিও অসাধারণ প্যাটার্নের। চিবুক পাতলা আর নয়ন সুন্দর—কিন্তু নৈতিক দুর্বলতার অভিব্যক্তি ঘটায় তা অতীব ক্ষীণকায়। মাথার চুল মাকড়শার জালের তন্তুর মতন পাতলা, মিহি আর অতিসূক্ষ্ম। রগের দুপাশ মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বিস্তৃত। সব মিলিয়ে এ মুখ দেখলে আর সহজে ভোলা যায় না। কিন্তু যে মুখ ছেলেবেলায় দেখেছি, যে রকম ভাবের প্রকাশ সেই মুখের রেখায় রেখায় ফুটে বেরোতে দেখেছি—এখনকার এই মুখে আর ভাবের অভিব্যক্তিতে পুরোনো সেই স্মৃতির সঙ্গে তো কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছি না। কথা বলতে যাচ্ছি—কার সঙ্গে? রোডরিক আশার-এর সঙ্গে তো? ওর চামড়া এখন মৃতবৎ পাণ্ডুর বর্ণের, চোখে দেখা যাচ্ছে অলৌকিক প্রকৃতির চেকনাই—এ সব তো আগে ছিল না। হেঁয়ালির জবাব না পেয়ে ধাঁধায় পড়লাম, ভয় পেলাম। রেশম-মিহি চুলের বোঝা অযত্নবর্ধিত এবং অবিন্যস্ত; উদ্দাম ঊর্ণনাভদের সূক্ষ্ম জালের মতই তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে লেপটে রয়েছে মুখাবয়বে—মুখজোড়া চুলের বন্য নকশা দেখে খেয়ালী প্রকৃতির হাতে গড়া উদ্ভট কোনো গাছের পাতার কথা মনে ভেসে আছে—সেইরকম বিচিত্র কারিকুরি আর জটিল জটাজাল দিয়ে আবৃত মুখের গোটা চেহারাটা! এ মুখভাবের সঙ্গে সহজ সরল মানবিক মুখভাবের কোনো আদল তো খুঁজে পাচ্ছি না।

প্রথম থেকেই লক্ষ্য করলাম বন্ধুবরের হাবভাবে রয়েছে অসঙ্গতি আর অসংলগ্নতা। সন্ত্রাসবোধ এমনই অভ্যাসগত হয়ে গেছে যে তা পাকাপাকি বাসা বেঁধেছে অস্থিমজ্জায়—স্নায়কবিক উত্তেজনার আধিক্য এক্ষেত্রে ঘটবেই, ওরও তাই হয়েছে—আর এই ভয়বোধ আর নার্ভাসনেসকে কাটিয়ে ওঠার ব্যর্থ আর দুর্বল প্রয়াস থেকে জন্ম নিচ্ছে যত কিছু অসঙ্গতি আর অসংলগ্নতা। এর কিছুটার জন্যে তো আমি তৈরি হয়েই এসেছি; আভাস পেয়েছিলাম চিঠির ভাষায়; মনে পড়েছিল ওর ছেলেবেলার স্বভাবচরিত্র; শরীর আর, মনের, অদ্ভুত অবস্থাটা কিরকম দাঁড়াতে পারে—তা আঁচ করে নিয়েছিলাম আগে থেকেই। কখনও প্রাণরসে টগবগিয়ে ফুটে উঠছে—পরক্ষণেই ঝিমিয়ে নেতিয়ে পড়ছে আবার একটু পরে উথলে উঠছে প্রাণ প্রাচুর্য। পর-পর আসছে আর যাচ্ছে উচ্ছ্বাস আর

বিষাদ। যে মাতালরা মদের দাসানুদাস হয়ে পড়ে, অথবা যে আফিংখোররা অফিফেনসেবন ছাড়া জীবনটাকে নিষ্প্রাণ বলে মনে করে—তারা যেমন কখনও গলা কাঁপিয়ে অহেতুক আওয়াজ করে যায় জান্তব প্রেরণায়, অতর্কিতে মেপে মেপে, তাড়াহুড়ো না করে, বেশ ওজন করে, ফাঁকা বুলি আওড়ে যায়—আশ্যার-এর কথাবার্তার মধ্যে লক্ষ্য করলাম হুবহু সেই লক্ষণ। কখনও উত্তাল, কখনও নিশ্চল। কখটনও প্রাণময়, কখনও নিষ্প্রাণ। কখনও বেসামাল, কখনও হুঁশিয়ার। এই রকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে ও বলে গেল আমার আসনের উদ্দেশ্য। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে ব্যাকুল হয়েছে শুধু আমার মুখে কান্ত্বনার কথা শোনার জন্যে। আগড়ুম-বাগড়ুম অনেকক্ষণ এইভাবে বকে যাওয়ার পর শুরু করল ওর, অদ্ভুত অসুখ-বিসুখের কথা। ওর মতে, এ ব্যাধি ওর বংশগত। রক্তের পাপ। নার্ভের বারোটা বেজে গেলে যা হয়। তবে হ্যাঁ, আশার মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, খুব শিগগিরই রাহুর দশা কেটে যাবে—স্নায়ুর ওপর যাচ্ছেতাই এই ধকলের অবসান ঘটবে। স্নায়ু আর সইতে পারছে না বলেই তো নানাভাবে তা প্রকাশ করে চলেছে। অনুভূতি এরকম অতীক্ষ্ণ তো কখনো হয়নি। লক্ষণগুলো শুনে আমি কৌতূহলী যেমন হয়েছিলাম, ঠিক তেমনি হতবুদ্ধিও হয়েছিলাম। আশার কিন্তু বেশ গুরুত্ব নিয়েই বর্ণনা করে গেছিল প্রতিটি কষ্ট আর অনুভূতির কথা—হাল্কাভাবে বলেনি—আমিও হাল্কাভাবে নিতে পারিনি। মানুষ যখন মুমূর্ষু হয়, তখন তার অনুভূতি-টনুভূতিগুলো যেরকম ধারালো আর টানটান হয়ে থাকে—আশার এর অনুভূতি নাকি এখন সেই অবস্থায় চলে এসেছে। কোনো সুখাদ্যই মুখে রোচে না—যত ভাবেই রাঁধা হোক না—তা বিষবৎ মনে হয়—সহ্য হয় শুধু অত্যন্ত বিস্বাদ আহার্য। বিশেষতভাবে বোনা কয়েকটা বস্ত্র ছাড়া অন্য কোনো পরিধেয় ওর সহ্য হয় না। সব ফুলের সবাসই ওর কাছে অসহ্য—মনে হয় যেন পূতিগন্ধ নাকে ঢুকে শরীর অস্থির করে দিচ্ছে। আলো একদম সইতে পারে না—খুব নরম আলোই গ্রহণ করতে পারে ওর চক্ষু প্রত্যঙ্গ। তাদেরর বাজনার অদ্ভুত আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ বরদাস্ত করতে পারে একেবারেই। কারণটা আরও অদ্ভুত। খুটখাট শব্দও আতঙ্ক সঞ্চার করে মগজের মধ্যে। নামহীন আতঙ্কের কাছে যেন মাথা বিকিয়ে বলে আছে আশার। বিভীষিকার ক্রীতদাস হয়ে গেছে। জড়িত অস্পষ্ট স্বরে বারবার বলতে লাগল—' বাঁচব না···আমি বাঁচব না···এ অবসথায় বেঁচে থাকা যায় না। ঠিক এই ভাবেই সব শেষ হয়ে যাবে আমার। ভবিষ্যৎকে ভয় পাই যমের মত—ভবিষ্যতের ঘটনার জন্যে নয়—ঘটনাগুলোর পরিণামের জন্যে। আত্মার ওপর শেষকালে যে কি ধরনের নিপীড়ন চলবে—তা ভাবতে গেলেই শিউরে উঠি—সে ঘটনা তুচ্ছাতিতুচ্ছ হলেও শিহরণ রোধ করতে পারি না। বিপদকে আমি পরোয়া করি না—বিপদ সম্বন্ধে কোনো বিতৃষ্ণা আমার নেই—আসন্ন আতঙ্কের কল্পনাই আমাকে কুরে কুরে মেরে ফেলছে। এই অবস্থা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে এমন একটা সময় আসবে, তখন ভয় নামক করাল দানবের সঙ্গে

লড়তেই আমি পাগল হয়ে যাবো—প্রাণও হারাবো।"

কিছুক্ষণ অন্তর, ভাঙাভাঙা ভাবে দ্ব্যর্থক ইঙ্গিতের মধ্যে থেকে, আবিষ্কার করলাম ওর বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থার আর একটা অত্যাশ্চর্য দিক। অদ্ভুত একটা কুসংস্কারের নিগড় ওকে বেঁধে ফেলেছে। এই প্রাসাদপুরীতে ওর জন্ম, এইখানেই আছে সারা জীবন, এর বাইরে কখনও বেরোয়নি। ছায়াচ্ছন্ন একটা প্রভাব বিরাজ করছে পূর্বপুরুষদের এই ভিটের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে—ছায়াময় অব্যাখ্যাত সেই শক্তির তাড়নাকে মুখে বলে বোঝানো যায় না। এই ভিটেতে জীবন কাটিয়ে গেছেন ওর পূর্বপুরুষরা—তাঁদের দুঃখকষ্ট ভোগান্তি নানা আকার আর বস্তুর মধ্যে দিয়ে সজীব হয়ে রয়েছে এ বাড়ির সর্বত্র। এ বাড়ির প্রতিটি ধুলোর মধ্যে রয়েছে অস্পষ্ট কিন্তু অমোঘই সারা। ধূসর প্রাচীর আর বুরুজ সবাই যুগযুগ ধরে অনিমেষে চেয়ে রয়েছে সারোবরের কালো জলের দিকে। এ বাড়ির গোটা ইতিহাসটা জ্যান্ত হয়ে রয়েছে ওই হ্রদের জলে। রোডরিক আশার-এর গোটা অস্তিত্বের প্রাণভোমরা ধরে রেখেছে এরাই।

অনেক দ্বিধার পর অবশ্য এটাও স্বীকার করেছিল আশার যে, ওর এহেন অদ্ভুত বিষাদরোগের মূলে রয়েছে একমাত্র সহোদরার অনেক বছরের একটা কঠিন রোগ। স্বাভাবিক কারণ হয়তো এইটাই। বোনটি তার বড় আদরের। রক্তের সম্পর্ক বলতে তো ওই একজনই। বছরের পর বছর ধরে আশারকে সঙ্গ দিয়ে গেছে শুধু এই সহোদরা। বোনের ব্যাধির কথা বলতে গিয়ে বন্ধুর গলায় যে ধরনের তিক্ততার ব্যঞ্জনা শুনেছিলাম সেদিন, আজও তা ভুলিনি। বলেছিল—"আমার দিন তো ফুরিয়ে এল। বোনকেও কালব্যাধি একদিন নিয়ে যাবে—সেদিনই খতম হয়ে যাবে সুপ্রাচীন আশার বংশ।"

একথা যখন ও বলছে, ঠিক সেই সময়েই ঘরের অনেক দূরের কোণ ঘুরে চলে গেছিল লেডি ম্যাডেলিন—রোডরিক আশার-এর সহোদরা। আমাকে দেখতে পায়নি। আমি কিন্তু অতিশয় অবাক হয়েছিলাম তার আসা আর যাওয়া দেখে—আমার তখনকার বিস্ময়বোধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশেছিল বেশ খানিকটা বিভীষিকাবোধ। অথচ বুঝিনি কেন অত অবাক হলাম, কেন আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেলাম। স্তম্ভিত চোখে দেখেছিলাম দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল রোগশীর্ণা একটি নারী মূর্তি। দরজা বন্ধ হতেই চোখ ফিরিয়েছিলাম রোডরিকের দিকে। দেখেছিলাম দুই করতলে মুখ ঢেকে ঝরঝর করে কাঁদছে সে। শীর্ণ আঙুলের ফাঁক দিয়ে টপ টপ করে অশ্রু পড়ছে কোলের ওপর। নিছক রোগজনিত অবসাদ যে এই ভেঙে পড়ার পেছনে নেই—তা কিন্তু উপলব্ধি করেছিলাম তৎক্ষণাৎ।

লেডি ম্যাডেলিনের ব্যাধি দীর্ঘদিন ধরেই হার মানিয়েছে ডাক্তারদের হাজারো দক্ষতাকে। অনীহা আর ঔদাস্য মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসেছে ভদ্রমহিলার স্নায়ুতন্ত্রে। সেই সঙ্গে ভাঙছে শরীর—তিলতিল করে, বিরামবিহীন ভাবে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ধ্বংসের পথে চলেছে প্রতিটি কোষ-এইসঙ্গে মাঝেমধ্যেই চড়াও হচ্ছে মৃগী

রোগরে খিঁচুনি—তারপরেই মূর্ছা। অদ্ভুত এই রোগেদের নিদান করতেই পারছেন না জ্ঞান-গুণী বিচক্ষণ ডাক্তাররা। তা সত্ত্বেও এতদিন সিধে থেকেছে ভদ্র মহিলা—বিছানায় শুয়ে থাকতে চায়নি —চলেফিরে বেড়িয়ে লড়ে গেছে রোগের প্রকোপের সঙ্গে—কিন্তু আর পারছে না। এইবার নিল শেষ শর্য্যা। আমিই তাকে শেষ দেখা দেখলাম। জীবদ্দশায় নিশ্চয় আর দেখতে পাব না। আমি যেদিন যে সন্ধ্যায় প্রাসাদে পা দিয়েছি, ঠিক তখন থেকেই একেবারে ভেঙে পড়েছে লেডি ম্যাডেলিন—ভয়ানক উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে এত কথা নিবেদন করে গেল রোডরিক, একটু ধাতস্থ হওয়ার পর।

এরপরের কয়েকদিন লেডি ম্যাডেলিনের নাম মুখে আনিনি আমি অথবা রোডরিক। বিষাদ-মেঘ কাটিয়ে ওকে উৎফুল্ল রাখার সহস্র প্রয়াস চালিয়ে গেছি এই ক'দিনে। দুজনেই ছবির পর ছবি এঁকে গেছি পাশাপাশি বসে, অথবা বহুবিধ বইয়ের পাতায় নাক ডুবিয়ে রেখেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কখনও যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে শুনে গেছি ওর গীটার বাজনার কথা বলা। হ্যাঁ, কথাবলা। গীটার শুধু সুর রচনা করেনি বুঝি বাক্য রচনাও করেছে—দুঃস্বপ্ন তো সেই কারণেই। তারের যন্ত্র আমার মনের তার ছুঁয়ে ছুঁয়ে বলে গেছে অনেক···অনেক কথা। এইভাবেই এক-একটা দিনের শেষে দুই বন্ধু আরও কাছাকাছি চলে এসেছি····একটু একটু করে খসে পড়েছে ওর মনের আগল···কখনও ওর মুখের কথা না শুনেও অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছি ওর মনের অতলান্ত বিষাদ—স্বর-সপ্তকের সপ্তম সুর নিষাদের মতই তা এতই চড়ায় বাঁধা যে ওর সত্তার অণু-পরমাণু পর্যন্ত নিয়ত অনুরণিত হয়ে চলেছে এই বিষাদ সুরে—হিমালয় প্রতিম তিমির-পাহাড় বুঝি চেপে বসেছে ওর মনের আনাচে-কানাচে—বস্তুময় বিশ্ব তার নিজস্ব যাবতীয় বস্তু থেকেও যেন ক্রমাগত বিষাদ-বর্ষণ করে চলেছে রোডরিক আশার-এর পঞ্চভূতের শরীরটার ওপর—এ সবের কবল থেকে ওকে বাঁচাই কি করে? অসম্ভব?

আমার স্মৃতির খাতায় চিরকাল অমলিন থেকে যাবে কিন্তু ভাবগম্ভীর মিনিট-ঘণ্টা-দিবস-রজনীগুলো কিভাবে কাটিয়েছিলাম 'আশার প্রাসাদ'-এর শেষ অধিপতির সান্নিধ্যে। অথচ অত পর্যবেক্ষণ করেও সারকথায় উপনীত হতে অক্ষম হয়েছি, ওরই কথামত রকমারি কাজে মেতে থেকেও কোনো কাজ থেকেই আসল ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারিনি। উত্তেজনা আর আদর্শবোধে আচ্ছন্ন ছিলাম বলেই বোধহয় গন্ধকময় কটু আবরণের মত ওর মূল হেঁয়ালির অবগুণ্ঠন খসাতে পারিনি। ওর কাঁচা হাতের মৃতের স্মরণগীতি চিরকাল জড়িয়ে থাকবে আমার কানের পর্দায়। ফন ওয়েবারের ওয়ল্‌স্ নাচের বন্য উদ্দামতা আর বিকৃত বিবর্ধিত রূপ একবারই দেখেছিলাম—যন্ত্রণার সঙ্গে বাকি জীবনটা তা মনে রেখে দিতে হয়েছে। রোডরিকের আঁকা তৈলচিত্রগুলো আমার মনের মধ্যে প্রায় একই রকম যন্ত্রণার সঞ্চার করে গেছে। দুর্বার কল্পনা দিয়ে তুলির পর তুলি বুলিয়ে, রঙের পর রঙ চাপিয়ে, ও যে আবিলতা রচনা করে গেছে—তা প্রকৃতই

রোমাঞ্চকর—যতবার দেখেছি, ততবারই শিউরে উঠেছি। অথচ বুঝিনি শিহরিত হচ্ছি কেন। চোখের সামনে এখনও ভাসছে প্রতিটি তৈলচিত্র। কোনো ছবিরই সামান্যতম অংশকেও কথার ছবি দিয়ে বুঝিয়ে তুলতে আজও আমি অপারগ। অথচ ছবি আঁকার কায়দায় নেই কোনো চালিয়াতি অথবা মস্ত মুন্সিয়ানা; সাদাসিধে সোজা তুলির পোঁচে ও ফুটিয়ে তুলেছে যেসব নকশার নগ্নতা—তা মুহূর্তের মধ্যে মনকে পেঁচিয়ে ধরে, ভয়ের বাঁধনে বেঁধে ফেলে। মরজগতের মানুষ হয়ে রোডরিক আশার এঁকে গেছে মরলোকেরই ছবি—কিন্তু ওর চিত্রে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে উন্মাদ মস্তিষ্কের বিকৃত বিষণ্ণতা আর অসীম অন্যমনস্কতা—ক্যানভ্যাস জোড়া পাগলামির ভয়াবহতা এমনই তীব্র যে সহ্য করা যায় না; হেনরি ফুসেলি বিভীষিকা-জাগানো ফ্যানট্যাসটিক চিত্রকল্পের জন্যে বিখ্যাত হতে পারেন। মিলটন আর সেক্সপীয়রের অনেক রচনার ছবি তো ইনিই এঁকেছেন। উইলিয়াম ব্লেক-এর ওপরেও প্রভাব ফেলেছেন। আমি কিন্তু বলব, খোদ হেনরি ফুসেলিও রোডরিকের মত আতঙ্কসঞ্চারী ছায়াজগৎ ক্যানভ্যাসের বুকে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি।

বন্ধুবরের উদ্দাম বীভৎস ধ্যানধারণার একটিকে দ্বিধাগ্রস্ত শব্দ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা যায়। ছবিটা ছোট্ট। দূরবিস্তৃত একটা আয়তাকার সুড়ঙ্গ আঁকা হয়েছে ছবিতে। ছাদ খুব নিচু। দেওয়াল মসৃণ আর সাদা। কারুকাজের বালাই নেই—চোখ আটকে যাওয়ার মত খাঁজখোঁজও নেই। দু'চারটে বৈশিষ্ট্য দেখে বোঝা যায়, এ সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়েছে অনেক গভীর পাতাল প্রদেশে। সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো পথ কোনোদিকে নেই। মশাল বা কৃত্রিম আলোর চিহ্নমাত্র নেই। অথচ তীব্র রশ্মির বন্যা বয়ে যাচ্ছে গোটা সুড়ঙ্গপথে। অপার্থিব আভার এত ধুমধাম সত্ত্বেও কিন্তু মনে হচ্ছে এ আলো মড়ার দেশের আলো—আলোর ঐশ্বর্য বলতে যা বোঝায়—তা নয়—নেহাৎই খাপছাড়া।

আগেই বলেছি, রোডরিকের কানের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। স্নায়ু মুমূর্ষু হলেই বুঝি এমন হয়। তারের বাজনার কয়েকটা সুর ছাড়া কান আর কোনো গানবাজনা বা আওয়াজ সইতে পারে না। গীটারের বাজনার দৌড় বেশি নয়। কিন্তু সঙ্কীর্ণ ওই সুর অঞ্চলেই অনেক ফ্যানট্যাসটিক কথা আর সুরের জন্ম দিতে ওকে দেখেছি। উচ্ছ্বাসপূর্ণ অসংলগ্ন একটা রচনা আমার মনে গেঁথে আছে। মনে আছে বোধহয় একটাই কারণে। কাব্যের অতীন্দ্রিয় অর্থের জন্যে যতটা না হোক—এই প্রথম এবং এই একবারই প্রাসাদ-রহস্যের ব্যাখ্যা দিয়ে গেছে কথার মালা সাজিয়ে। কবিতাটার নাম 'প্রেতাবিষ্ট প্রাসাদ'। হুবহু মনে নেই, যতটা মনে পড়ছে, লিখে যাচ্ছি শুধু মর্মার্থ ঃ

সবুজ এই অধিত্যকার সবচেয়ে মরকত-সবুজ অঞ্চলে নিবাস ছিল উচ্চমার্গের দেবদূতগণের। সবুজ-সুন্দর সেই অঞ্চলেই একদিন মাথা তুলেছিল পরীর মত সুন্দরী এক রাজপ্রাসাদ—আলো ঝলমলে অপরূপ সেই প্রাসাদের ভিত গাঁথা

হয়েছিল কিন্তু চিন্তা নৃপতির খাস-মুলুকে! ঊর্ধ্বতম স্বর্গের দেবদূতরাও বিস্মিত হয়েছে মনোহর প্রাসাদের মহিমা দেখে—সৌন্দর্যের আকর সঞ্চিত যেখানে—সেইসব জায়গায় ইতিপূর্বে তাদের সূক্ষ্ম স্বচ্ছ ডানার আন্দোলন ঘটেছে চিরকাল—অথচ সৌন্দর্যের বিচারে কোনোটাই এই প্রাসাদের সৌন্দর্যের অর্ধেকও নয়।

অনেক-অনেক বছর আগে ঝকমকে হলুদ আর সোনা রঙের পতাকা উড়তো এই প্রাসাদের শীর্ষে। প্রতিটি মধুর দিবসে সুমিষ্ট সমীরণ ডানা মেলে উড়ে যেত গড়ের প্রাচীরের ওপর দিয়ে, কেল্লাপ্রাসাদের সুবাসও পাখির পালকের মত বাতাসে ভর দিয়ে চলে যেত দূর হতে দূরে।

নিখাদ সুখের নিকেতন ছিল সেই অধিত্যকা। পথভোলা পথিক সেখানে এসে একজোড়া আলোকময় উন্মুক্ত বাতায়নের মধ্যে দিয়ে দেখতে পেত শরীরী স্বর সপ্তক বীণাবাদনের নির্দেশে নেচে নেচে ঘুরছে নিয়মের ছন্দে; দেখতে পেত অঞ্চল-অধিপতি আসীন রয়েছেন সবচেয়ে কঠিন পাথর দিয়ে তৈরি সিংহাসনে—আনন্দময় প্রাসাদের আনন্দ-মুকুট তো তিনিই—স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত থাকতেন আনন্দ-সিংহাসনে।

মুক্তো আর চুনি ঝিকিমিকি রোশনাই বিতরণ করে যেত অপরূপ প্রাসাদের সদর দরজায়, দু-পাল্লার ফাঁক দিয়ে নিরন্তর উড়ে আসত অবিরাম প্রতিধ্বনি লহরী—তাদের মধুর কর্তব্য ছিল শুধু গানে গানে ভুবন ভরিয়ে তোলা—মাণিক্যদ্যুতিতে সমুজ্জ্বল সেই প্রতিধ্বনি-সঙ্গীতের প্রতিটিতে কীর্তিত হত আনন্দ-রাজার গৌরব গাথা, তাঁর প্রজ্ঞা আর পাণ্ডিত্য, ধীশক্তি আর উপস্থিত বুদ্ধির চিক্কণ বিবরণ।

আর তারপর একদিন মহাদুঃখের অধিপুরুষ হানা দিল সিংহাসনে অধিরূঢ় নৃপতির খাসমুলুকে—অজস্র অশুভ ক্রিয়াকলাপের পরিণামে যার আবির্ভাব ঘটে সর্বত্র। মহিমময় অধিরাজার জন্য বিলাপ করা ছাড়া আর কি-ই বা করা যায়—আগামী দিনের সূর্যরশ্মি আর তো তাঁকে দেখতে হয়নি। তারপর থেকেই গৌরবময় এই ভবন ঘিরে অস্পষ্ট স্মৃতি বাষ্পের মত শুধু আবর্তিত হয়ে চলেছে অতীতের সুখের দিনের অগুন্তি ছবি—একদিন যা ছিল সত্যি—ছিল আনন্দ-কিরণে উদ্ভাসিত মণিময় আলেখ্য।

আর আজ? রক্তাভ গবাক্ষ পথে দৃষ্টি সঞ্চালন করে অধিত্যকার পর্যটকরা দেখতে পায় বেতাল সুরের বিশাল ছায়া—কদর্য আকৃতির নিয়ত সঞ্চরমান অপচ্ছায়া; মলিন বিবর্ণ পাণ্ডুর সদর দরজা দিয়ে বেগে বয়ে চলে এক কদাকার জনস্রোত—কণ্ঠে তাদের অট্ট অট্ট হাস্যরোল—নেই সেই মৃদু মধুর স্মিত হাস্য।

রোডরিক যেভাবে এই গাথা রচনা করে আমাকে শুনিয়েছিল, সেভাবে গুছিয়ে লিখতে আমি অক্ষম। তবে তার ভাবার্থ থেকে অনুমান করে নেওয়া যায় রোডরিকের আর একটা বদ্ধ বিকৃত উন্মাদ ধারণাকে। অজস্র চিন্তার হুড়োহুড়ি

দেখেছি ওর মগজের মধ্যে। তাদের মধ্যে থেকে মহীরুহ হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা উৎকট বিশ্বাস। উদ্ভট এই বিশ্বাসটার অভিনবত্ব নিয়ে অনেকেই পঞ্চমুখ হলেও আমি নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করি।

রোডরিকের বিশ্বাস, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দৌলতে উদ্ভিদ জগৎ সব বুঝতে পারে। তাদের বোধশক্তি আছে, চেতনা আছে। অদ্ভুত এই ধারণা আরও এক পাক মোচড় মেরে আরও বিকট রূপ পরিগ্রহ করেছে ওর আবিল মস্তিষ্কে। শুধু উদ্ভিদ জগৎ নয়—সব জড় পদার্থই চৈতন্যময়—বোধশক্তির অদৃশ্য স্ফুলিঙ্গ কল্পনা থেকে প্রস্রবণের মত উৎসারিত হচ্ছে বন্য বিশ্বাসের প্রচণ্ড তাড়না—আমার অভিমত ধোপে টেঁকে না তার মতামতের কাছে। শত চেষ্টা করলেও ওর সেই ব্যাকুল বিশ্বাসকে আমি কথা দিয়ে বুঝিয়ে উঠতে পারব না। যদিও আমাকে ওর মতে টেনে আনবার জন্যে ও কম চেষ্টা করেনি। ওর সেই প্রপাতসম প্রচণ্ড বিশ্বাস যত প্রমাদেই ভরা হোক না কেন, তবুও তা জেনে রাখা দরকার ওর ধোঁয়াটে মনের নাগাল ধরার জন্যে।

এই প্রাসাদপুরীর প্রতিটি পাথরের বিন্যাস লক্ষ্য করার মত। শ্যাওলা গজিয়েছে পাথর ঘিরে—তাদের বিন্যাসের মধ্যেও রয়েছে একই নিয়ম নিষ্ঠা। বাড়ির চারদিকের পচা গাছগুলিও সুবিন্যস্ত। যে বিন্যাস নিয়ে এদের জন্ম—সেই বিন্যাস রক্ষা করে চলেছে যুগ যুগ ধরে—তাল কেটে যায়নি কোথাও। সবচেয়ে লক্ষণীয়, সরোবরের জলের প্রাণময়তা। পাথর আর শৈবাল যেমন তাদের প্রাণময়তা অক্ষুণ্ণ রেখেছে পতন ধ্বংস আর জরাকে ঠেকিয়ে রেখে—এতটুকু ধসে না গিয়ে—একইভাবে জীবন্ত হয়ে রয়েছে হ্রদের জল এদের আস্ত প্রতিবিম্বকে বুকে ধরে রেখে। জল আর দেওয়াল নিজস্ব বায়ুমণ্ডল নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছে যুগ যুগ ধরে। বিশেষ এই বায়ুমণ্ডলই এদের প্রাণবায়ু—এই জড়দের প্র'-ভোমরা। এই বংশের প্রতিটি মানুষের ওপর করাল ছায়াপাত করে গেছে মহাকুটিল এই প্রাণবাষ্প—প্রাণবাষ্প যে অলীক কল্পনাপ্রসূত নয়—বংশধরদের শোচনীয় পরিণতিই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। অদৃশ্য প্রভাব থেকে রেহাই পায়নি কেউই—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জড় জগতের অদৃশ্য এই প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে বংশের প্রতিটি মানুষের নিয়তিকে। এদেরই প্রভাবে রোডরিকের কি হাল হয়েছে—তা নাকি আমি চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

উদ্ভট এই বিশ্বাস নিয়ে আর কোনো কথা আমি বলতে চাই না। গাছপালা-শ্যাওলা-বাড়ি-সরোবর যদি পুরুষানুক্রমে বংশের মানুষদের অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে বলে মনে করা হয়—তাদের তৈরি বায়ু যদি বিষ-বায়ু হয়ে বংশধরদের তিল তিল করে ধ্বংস করছে বলে কেউ মনে করে থাকে—তাহলে থাকুক সে তার অলীক বিশ্বাস নিয়ে।

তবে হ্যাঁ, এহেন বাতুল বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ওয়াটসন, ডক্টর পার্সিভাল, স্পালাঞ্জানি, ল্যাণ্ডফে'র

পাদরী—'Chemical Essays' গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে এই অদ্ভুত বিশ্বাসকে নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। আমি নেই এ দলে। স্নায়ুর রাসায়নিক প্রভাব বলে চালিয়ে দিলেও আমি মানতে রাজী নই।

বই পড়ার বাতিক রোডরিকেরও আছে। গ্রন্থাগারে দেখেছি এই জাতীয় অনেক বই। তাদের নাম লিখে এই রচনাকে আর বাড়াতে চাই না। কিম্ভূতকিমাকার ধারণাগুলো ওর মাথায় ঢুকেছে এই সব বইয়ের পাতা থেকেই। বইয়ের পোকা নড়িয়ে দিয়েছে ওর মাথার পোকাকে। তাই বলে পাথর-শ্যাওলা-জল-গাছ অতীন্দ্রিয় নয়নে নিরীক্ষণ করে চলেছে প্রাসাদের প্রত্যেককে—ইন্দ্রিয়াতীত শক্তি প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের ভাগ্য—এবম্বিধ কল্পনা মাথায় আসে কি করে!

অসুস্থ চিন্তাধারাকে কিভাবে দিনে দিনে উদ্দীপ্ত করেছে অসংখ্য উদ্ভট গ্রন্থের কিম্ভূত আলোচনা, আমি যখন সেই সব নিয়ে নিজস্ব ভাবনায় তন্ময় হয়ে রয়েছি, ঠিক তখনি খবর এল—ধরাধাম ত্যাগ করেছে লেডি ম্যাডেলিন

তারপরেই শুনলাম, রোডরিকের বিকৃত বাসনার আর একটা নমুনা।

সহোদরার মৃতদেহকে আনুষ্ঠানিকভাবে গোর দেবে পনেরো দিন পরে। এই পনেরোটা দিন মৃতদেহ রেখে দেওয়া হবে ভূগর্ভের কবরখানায়। কারণটা বড় বিচিত্র! বোনের রোগ নিয়ে যেহেতু ধাঁধায় পড়েছিলেন মহা মহা ডাক্তাররা—তাই তাঁরা মৃতদেহ পরীক্ষা করতে চান পনেরো দিন ধরে। ফ্যামিলি কবরখানাও তো বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে এবং খোলামেলা। তাই দেহ থাকুক বাড়িতেই।

পুরো দু'সপ্তাহ একটা ডেডবডিকে কবর না দিয়ে ফেলে রাখা হবে এই বাড়িরই নিচে পাতাল ঘরে—ভাবতেই কিরকম লেগেছিল আমার। অস্বাভাবিক সিদ্ধান্ত থেকে এক তিলও নড়েনি গোঁয়ার রোডরিক। রোগটাই যখন অত্যাশ্চর্য, তখন ডাক্তাররা ছিনে জোঁকের মত যদি বায়না ধরেন—কি আর করা যায়।

ডাক্তার! ডাক্তার তো দেখেছি একজনকেই এ বাড়িতে ঢুকেই সিঁড়ির গোড়ায়। পৈশাচিক ধূর্ততা দেখেছি তার চোখে মুখে। কুটিল বুদ্ধির সেই ডাক্তার কি এক্সপেরিমেন্ট করতে চান মড়া নিয়ে?

চুলোয় যাক! ক্ষতি যখন কোনো নেই, বাধা দিতেই বা যাবো কেন। যা খুশি করুক রোডরিক।

বন্ধুর অনুরোধেই সাময়িক সমাধির আয়োজনে সাহায্য করেছিলাম। কফিনে শোয়ানো ছিল মৃতদেহ। দুজনে মিলে কফিন বয়ে নিয়ে গেলাম পাতাল ঘরে। অনেকদিন সেখানে কেউ যায়নি। দরজা খোলাও হয় নি। বদ্ধ বাতাসে মশাল নিভু-নিভু। খুঁটিয়ে দেখতেও পাচ্ছি না। তবে আলো ঢোকে না কোন দিক দিয়েই। প্রকৃতই অন্ধকূপ। ছোট্ট ঘর। ভয়ানকভাবে স্যাঁৎসেঁতে। ওপরতলায় যেখানে আমার শোবার ঘর—ঠিক তার নিচে, মাটির অনেক তলায়—এ ঘর মধ্যযুগে ব্যবহার করা হতো নিশ্চয় পাতাল-কারাগার হিসেবে। তারপর

অন্যভাবেও কাজে লাগানো হয়েছে। নিশ্চয় বারুদ বা ওই জাতীয় দাহ্য পদার্থ রাখা হতো। তাই গোটা মেঝে আর ধাঁকানো খিলেন আগাগোড়া তামার পাত দিয়ে মোড়া। প্রকাণ্ড দরজার পাল্লা মজবুত লোহা দিয়ে তৈরি হলেও একইভাবে পুরু তামার পাত দিয়ে মোড়া। পেল্লায় পাল্লা ওজনে এত ভারি যে কব্জার ওপর যখন ঘোরে, তখন অস্বাভাবিক কর্কশ ঘষটানির আর্তনাদে লোমকূপে শিহরণ জাগে।

এহেন বিভীষিকা বিবরে কাঠের ঢালু পাটাতনের ওপর রেখে হড়কে নামিয়ে দিলাম শোকাধার। কফিনে তখনও স্ক্রু আঁটা হয়নি। খুলে ফেললাম ডালা। শবাধারেই এখন থেকে যার নিবাস, দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম তার মুখের ওপর। সেই প্রথম লক্ষ্য করলাম, চমক সৃষ্টি করার মত সাদৃশ্য রয়েছে ভাই আর বোনের মুখাবয়বে। আমার মনের কথা অবশ্যই টের পেয়েছিল রোডরিক। তাই বিড়বিড় করে যা বললে, তা থেকে বুঝলাম, ওরা যমজ। অদ্ভুত মিল আছে দুজনের প্রকৃতিতে—সহানুভূতির নিবিড় নিগড় বেঁধে রেখেছে দুটি সত্তাকে—বিচিত্র বন্ধনকে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বুঝে ওঠা যায় না। দুই বন্ধুই কিন্তু নিস্পলকে দীর্ঘক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলাম মৃত মহিলার মুখের ওপর। না রেখেও পারছিলাম না। কারণ লোমহর্ষক অনুভূতি শিরশির করছিল প্রতিটি লোমকূপ রন্ধ্রে। ভরাট যৌবনেই সমাধিস্থ হয়েছে লেডি ম্যাডেলিন। বিচিত্র ব্যাধি স্বাভাবিকভাবেই তার পদক্ষেপের স্বাক্ষর রেখে গেছে মুখের রেখায় রেখায়। মৃগী আর মূর্চ্ছা রোগে যা দেখা যায়। বুকে আর মুখে ভাসছে ক্ষীণ রক্তাভা। ঠোঁটের কোণে কোণে জেগে রয়েছে হাল্কা হাসির বিদ্রূপ—মরণের পর যে ব্যঙ্গ মড়াদের মুখে দেখে থ হয়ে যা না এমন মানুষ নেই ধরাধামে। ভয়ানক সেই চাপা হাসি দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে ডালা নামিয়ে দিলাম শবাধারে, এঁটে দিলাম স্ক্রু, শক্ত করে বন্ধ করলাম লৌহকপাট, পরিশ্রান্ত শরীরে উঠে এলাম ওপর তলার প্রকোষ্ঠে—যেখানে বিষাদ-বায়ু অতটা নিরেট নয়।

প্রিয়জন বিয়োগের পর শোকাচ্ছন্নতা স্তিমিত হতে বেশ কটা দিন যায়। স্থবির আর স্থাণু হয়ে থাকে মনের অন্তরতম প্রদেশ। রোডরিকের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আর তারপর থেকেই একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন আবির্ভূত হলো বন্ধুবরের অসুস্থ মনের প্রতিটি বাহ্যলক্ষণে। তিরোহিত হলো ওর স্বাভাবিক আচরণ। স্বাভাবিকভাবে যা নিয়ে মেতে থাকত, সে সবে আর আকর্ষণ রইল না—অথবা তাদের বিস্মৃত হলো। এক প্রকোষ্ঠ থেকে আর এক প্রকোষ্ঠে বিচরণ করত দ্রুত পদক্ষেপে; কখনো জোরে পা ফেলত, কখনো আস্তে। উদ্দেশ্যহীন পদচারণায় বিরাম দিত না নিমেষের জন্যেও। আরও মৃতবৎ বিবর্ণতা জাগ্রত হল পাণ্ডুর মুখে—একেবারেই নিভে গেল কিন্তু চোখের সেই অস্বাভাবিক দ্যুতি। ঘষা গলায় আগে যেভাবে মাঝে মধ্যে মুখ খুলত—বন্ধ হলো তাও। এখন কণ্ঠস্বরে জাগ্রত হতো থর-থর স্বর-কম্পন—যেন নিঃসীম আতঙ্কে গলার স্বরকে আয়ত্তে রাখতে পারছে না কিছুতেই। মাঝে মাঝে আমার স্পষ্ট মনে হতো, মনের সঙ্গে ও নিরন্তর

লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে একটা গুপ্ত কথা বলে ফেলে মনের বোঝা কমানোর জন্যে—কিন্তু সাহসে কুলোচ্ছে না কিছুতেই। আবার কখনো সখনো মনে হত, বিদঘুটে এই হাবভাব বদ্ধ উন্মাদের ক্ষেত্রেই তো ঘটে। বিশেষ করে ও যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা শূন্যের পানে চেয়ে থেকে উৎকর্ণ হয়ে থাকত—তখন ওকে বিকট পাগল ছাড়া আর কিছুই মনে হত না। শূন্যগর্ভ চাহনি মেলে কি যে ছাই শুনতে চায়— তা বুঝতাম না। উন্মাদের মনের গতি বোঝার ক্ষমতা আমার তো নেই। কল্পনায় অনেক শব্দ এরা গড়ে নেয়—কানের পর্দায় সেই শব্দ বাজছে কিনা পরখ করতে চায়। মনগড়া সেই অশ্রুত শব্দের প্রত্যাশায় ব্যাকুল রোডরিককে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এই অবস্থায় দেখতে দেখতে ভয়ের নাগপাশে বাঁধা পড়লাম আমিও। অনুভব করলাম, গুঁড়ি গুঁড়ি আতঙ্ক প্রবেশ করছে আমার মনের মধ্যেও। বন্ধুবরের ফ্যানট্যাসটিক অথচ মনে-দাগ-রেখে-যাওয়া কুসংস্কারগুলোও জাল মেলে দিচ্ছে আমার মনের ওপরেও। তিল তিল করে একই ব্যাধিতে সংক্রামিত হচ্ছি আমিও।

লেডি ম্যাডেলিনকে পাতাল-কারাগারের কফিনে রেখে আসার দিন সাত আট পরের এক রাতে শুরু হলো সেই বিশেষ ঘটনা। বিচিত্র উপলব্ধির পূর্ণ শক্তি টের পেলাম সমস্ত সত্তা দিয়ে। কোচে শুয়ে ছিলাম ঘুমোবো বলে। কিন্তু নিদ্রাদেবী কোচের ধারেকাছেও এলেন না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দু'চোখ খুলে শুয়ে রইলাম কাঠ হয়ে। যুক্তি দিয়ে বুঝতে চাইলাম, এত ভয়কাতুরে হচ্ছি কেন? কেন এই নার্ভাসনেস? ভয়ের খপ্পর থেকে বেরোনোর কোনো পথ কিন্তু আবিষ্কার করতে পারলাম না। মনকে বোঝালাম, এ ঘরের বিষাদ-নিমজ্জিত আসবাবপত্রের হতবুদ্ধিকর প্রভাবের জন্যেই মন আমার শিউরে শিউরে উঠছে। মনকে বোঝানোর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য উপলব্ধিও করছিলাম সেই একই ব্যাপার। বাইরে ঝড় উঠছে। তার প্রবল নিঃশ্বাস ঢুকছে ঘরের মধ্যেও। অস্থির হচ্ছে স্থির বাতাস। ঝাপটা লাগছে দেওয়ালে। দুলছে দেওয়াল জোড়া ছেঁড়া ময়লা পর্দা। দুলে দুলে উঠছে শয্যার বাহারি কারুকাজ—কানে ভেসে আসছে কাপড়ে-কাপড়ে ঘষটানির খস্ খস্ শব্দ। চেষ্টা করেও তাই মনকে কিছুতেই বাগে রাখতে পারিনি। একটু একটু করে অদম্য কাঁপুনি ছেয়ে ফেলল আমার গোটা শরীরটাকে। অবশেষে হৃৎপিণ্ডের ওপর গ্যাঁট হয়ে চেপে বসল নিতান্ত অহেতুক হুঁশিয়ারির এক দুঃস্বপ্নবোধ। এতক্ষণ দম বন্ধ করে এই দুস্বপ্নবোধকে প্রশ্রয় দিয়েছিলাম। এবার গা ঝাড়া দিলাম। যেন খাবি খেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম বালিশের ওপর। বেশ বুঝছি, গোটা শরীরটা কাঁপছে ঠক ঠক করে। সূচ্যগ্র চোখে চেয়ে রইলাম ঘরের নিরেট অন্ধকারের দিকে। কান খাড়া করে শিহরিত কলেবরে এমন কয়েকটা শব্দ স্পষ্টভাবে শোনার চেষ্টা করলাম, যারা অতি-অস্পষ্টভাবে মাঝে মাঝে জেগে উঠছে ঝড়ের দমকা হাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে। কেন যে শুনতে চাইছি, কি শুনতে চাইছি—তা জানি না; কিন্তু আমার সত্তা আর স্থির থাকতে পারছে না—অস্ফুট ওই শব্দনিচয়ের উৎসরহস্য জানবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠছে। জানি না সে সব

শব্দ আসছে কোত্থেকে। কিন্তু তবুও ঝড়ের গজরানি যখন স্তিমিত হচ্ছে, অমনি গা-হিম-করা শব্দগুলো ক্ষীণ ভাবে প্রবেশ করছে আমার কর্ণকুহরে।

আতীব্র সেই আতঙ্কবোধ অবর্ণনীয়, অথচ অসহ্য। আমি ভেঙে পড়েছিলাম। তাড়াতাড়ি গায়ে পোশাক চড়িয়েছিলাম। বেশ বুঝলাম, এরাতে আর ঘুমোনো সমীচীন হবে না। ভয়ের নাগপাশ খসিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে ঘরের এদিক থেকে সেদিকে পায়চারি শুরু করেছিলাম।

বারকয়েক ঘরের এমুড়ো থেকে সেমুড়ো পর্যন্ত ঘুরে আসার পরেই হাল্কা পায়ের আওয়াজ শুনে চমকে উঠেছিলাম। আওয়াজটা আসছে এ ঘরের লাগোয়া সিঁড়ি থেকে। কান খাড়া করতেই ঝড়ের হুহুঙ্কারের মধ্যেই চিনে ফেললাম কার পায়ের আওয়াজ।

রোডরিকের। দাঁড়ালাম দরজার সামনে। আলতো টোকা পড়ল কপাটে—খুলে দিলাম তক্ষুণি। জ্বলন্ত লম্ফ নিয়ে ঘরে ঢুকল বন্ধুবর। মুখাবয়ব আগের মতই। মড়ার মুখের মতন বিবর্ণ—কিন্তু এখন সেখানে দেখা দিয়েছে নতুন একটা উপসর্গ।

দুই চোখে নৃত্য করছে উন্মত্ত উল্লাস। সমস্ত শরীর দিয়ে বুঝি আটকাতে চাইছে হিসটিরিয়ার আক্রমণকে—অদম্য ভাবাবেগ ফুটে বেরোচ্ছে চোখ দিয়ে।

দেখে তো আমার আত্মারাম শুকিয়ে গেল। কিন্তু এই নিরন্ধ্র তমিস্রায় একা-একা উদ্ভট বিকট কল্পনায় অধীর হয়ে থাকার চেয়ে তো ভালো। সঙ্গী পেয়ে তাই বর্তে গেলাম। সাদরে ঘরে ডেকে নিলাম।

ও কিন্তু ঘরে ঢুকেই আচমকা জুল জুল করে দেখতে লাগল ঘরের আনাচে কানাচে পর্যন্ত। বললে তারপরেই—"দেখেছো?"

আমার হতভম্ব মুখভাব দেখেই বললে পরক্ষণে—"ঠিক আছে, ঠিক আছে, দেখতে পাবে, এখুনি!"

বলেই, লম্ফের আড়াল দিয়ে, এক ঝটকায় খুলে দিল একটা জানলার পাল্লা। মত্ত প্রভঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে লম্ফ দিয়ে প্রবেশ করল ঘরের মধ্যে। ভয়ানক এক ধাক্কায় মনে হলো যেন মেঝে থেকে ছিটকে গেলাম শূন্যে।

জানলা দিয়ে দেখলাম ঝড়ের রাতের দৃশ্য। রক্ত জমানো সন্দেহ নেই—আশ্চর্য সুন্দরও বটে। আতঙ্ক আর সৌন্দর্যকে পাশাপাশি সাজিয়ে অপরূপা হয়ে উঠেছে অমানিশা। নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও ঘূর্ণিঝড়ের অভ্যুত্থান ঘটেছে। মাঝে মাঝেই তাই দিক পরিবর্তন ঘটছে পাগলা হাওয়ার—ঘটছে আচমকা, বিনা নোটিশে। ঘন মেঘ ঝুলে পড়েছে প্রাসাদের ওপর। ঝড় তাদের নিয়ে লোফালুফি খেললেও তারা যেন জীবন্ত শরীরে রুখে দাঁড়াচ্ছে ঝড়ের বিরুদ্ধে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েও বারে বারে ফিরে এসে জড়ো হচ্ছে বাড়ির ঠিক মাথায় আর বাড়ির চারধারে—হুড়োহুড়ি দাপাদাপি করে ঘিরে রাখছে আশার প্রাসাদকে ছিনে জোঁকের মত—ঝড় তাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়েও হেরে যাচ্ছে বার বার। পণ করেছে মেঘের দল, এ বাড়ি ছেড়ে বেশি দূরে যাবে না

কিছুতেই—মাতাল হাওয়ার মাতলামিতেও ছাড়ছে না একগুঁয়েমি। হুল্লোড়বাজ মেঘের দলের গায়ে গা লাগিয়ে জমাট হয়ে এমন নিরেট চন্দ্রাতপ রচনা করেছে মাথার ওপর যে, চাঁদ অথবা তারাদের দেখতে পাচ্ছি না কিছুতেই—বিদ্যুৎবাজিও থেমে গেছে অলক্ষ্যে। কিন্তু বিষম উল্লাসে ফেটে পড়ছে বুঝি বাড়ি ঘিরে থাকা বাষ্প-বলয়ের তলদেশ; ধিকিধিকি আভা জাগ্রত হয়েছে অদৃশ্য বাষ্পে; শুধু কি বাষ্প, প্রাসাদ ঘিরে রয়েছে যা কিছু পার্থিব বস্তু—তাদের প্রত্যেকে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে অপ্রাকৃত প্রভায়; ফিকে দ্যুতি স্পষ্ট ঠিকরে আসছে গ্যাস থেকে—বাড়ি ঘিরে জমে থাকা সমস্ত গ্যাস বিপুল আনন্দে জ্বলে উঠে আবর্ত রচনা করে চলেছে মেঘ আর ঝড়ের নৃত্যের তালে তালে।

শিউরে উঠেছিলাম। রোডরিককে জোর করে টেনে এনেছিলাম জানলার সামনে থেকে। চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে পাল্লা এঁটে দিয়ে বলেছিলাম—"দেখবার কি আছে? এ-তো বিদ্যুতের খেলা—প্রাকৃতিক তড়িৎপ্রবাহ—অপ্রাকৃত নয়—অবাক হওয়ার মত ঘটনা নয়। সুতরাং জানলা খুলে আর দেখতে যেও না। সরোবরের পচা গাছপালার দূষিত গ্যাসের জন্যেও এরকম হতে পারে। জঘন্য!—এই ঠাণ্ডায় খোলা জানলার সামনে দাঁড়ালে রোগে পড়বে যখন? চুপ করে বসে থাকো। বই পড়ে শোনাচ্ছি—শুনে যাও। তোমারই প্রিয় রোমান্স-উপন্যাস। দেখবে ভয়ানক এই রাতভোর হয়ে যাবে।"

স্যার লন্সলট কানিং-এর লেখা 'ম্যাড ট্রিস্ট' বইটা পেলাম হাতের কাছে। মান্ধাতার আমলের বই। কিন্তু অন্য বই এখন পাচ্ছি কোথায়? ঝড় তো মাথা কুটে যাচ্ছে বন্ধ কপাটে—খট খট খটাখট করে নড়ছে সব কিছুই। এ বইকে রোডরিকের অতি-প্রিয় রোমান্সের বই বলেছিলাম খানিকটা ঠাট্টার ছলে—সত্যি সত্যি তো নয়। কুচ্ছিত আর কষ্টকল্পিত এই কাহিনী কখনোই ওর উঁচু মন আর দার্শনিক চিন্তাধারার যোগ্য নয়—তা জেনেও বই খুলে বসেছিলাম তৎক্ষণাৎ আর একটা ক্ষীণ অভিপ্রায় নিয়ে। বিষের ওষুধ বিষ। পাগলামির ওষুধ পাগলামি। ক্ষিপ্ত মস্তিষ্কে যে ব্যক্তি অলীক দর্শন করছে, উদ্ভট কল্পনার বাতিকে ভুগছে—তাকে অনুরূপ বস্তু উপহার দিলেই টোটকার কাজ দেবে। বিকৃত মস্তিষ্কদের ক্ষেত্রে এরকম চিকিৎসার রেওয়াজ আছে বলেই আমি জানি। ও কিন্তু কান খাড়া করে অসীম মনোযোগ দিয়ে শুনে গেছিল কাহিনীটা—তখন অবশ্য বুঝিনি কতটা নিবিষ্ট হয়েছে গল্পের মধ্যে—বুঝতে পারলে বাহবা জানাতাম নিজেকেই সঠিক দাওয়াই দিতে পেরেছি বলে।

কাহিনীর যেখানে ট্রিস্ট-এর নায়ক এথেলরেড জোর করে ঋষি-র ঘরে ঢুকবে বলে মন ঠিক করেছে, একটু পড়েই আমি এসে গেলাম সেখানে। উপন্যাসের কথাগুলোই লিখে যাচ্ছি হুবহু :

"কাকুতি মিনতিতে যখন কান দিল না ঋষি, তখন এথেলরেড ঠিক করল গায়ের জোরে ঘরে ঢুকবে। বাইরে বৃষ্টি ঝরছে অনিবার, ভিজে চুপসে যাচ্ছে বেচারি—অথচ একগুঁয়ে ঋষি তাকে ঢুকতে দেবে না। কড়া মদের নেশায়

কাঁহাতক আর সহ্য করে এথেলরেড। ঝড়ের মাতনও বেড়েছে। তাই গদা তুলে পাল্লায় দু-চার ঘা মারতেই কাঠ উড়ে গেল। দস্তানাপরা হাত কাঠের ফাঁকে ঢুকিয়ে গোটা পাল্লাই উপড়ে আনল এথেলরেড। মড় মড় মচাৎ শব্দের প্রতিধ্বনি কাঁপতে কাঁপতে ধেয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।"

এই পর্যন্ত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল লেখক বর্ণিত হুবহু সেই আওয়াজ যেন ভেসে এল প্রাসাদের নিচ থেকে। ঝড়ের দামালির জন্যে সে আওয়াজ খানিকটা চাপা পড়ে গেলেও, কাঠ ভাঙা মড়মড় মচাৎ শব্দ চিনতে পারা যায় বৈকি। হতে পারে, আমি নিজেও তখন উত্তেজিত অবস্থায় ছিলাম বলে ভুল শুনেছি। ঝড়ের দাপটে জানলার কপাটও তো সমানে খট খট খটাং খটাং আওয়াজ করে যাচ্ছে। পাতালপুরী থেকে ভেসে-আসা আওয়াজটা কানের ভুল নিশ্চয়। গলা-টিপে-ধরা প্রতিধ্বনির রেশকে তাই আর আমোল দিই নি। কাহিনীর খেই তুলে নিয়েছিলাম ঃ

"ভাঙা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে মহাবীর এথেলরেড কিন্তু ঋষিকে দেখতে পায়নি। দেখেছিল এক ড্রাগনকে। তার গায়ে চকচকে আঁশ, জিভটা লকলকে অগ্নিশিখার। ভয়ানক চেহারায় সে আগলাচ্ছে একটা সোনার প্রাসাদ—যে প্রাসাদের মেঝে তৈরি হয়েছে রুপো দিয়ে। দেওয়ালে ঝুলছে চকচকে পেতলের একটা ঢাল। ঢালের গায়ে লেখা রয়েছে ঃ ড্রাগনকে বধিবে যে,
আমারে লভিবে সে।

"এথেলরেড তৎক্ষণাৎ গদা তুলে পিটিয়ে মেরেছিল ড্রাগনকে। প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়ার সময়ে ড্রাগনের গলা চিরে বেরিয়ে এসেছিল রক্ত-জমানো এমন এক ভয়াল চিৎকার—যা পৃথিবীর কেউ কখনো শোনেনি। এথেলরেডের মত মহাবীরও সইতে না পেরে হাত চাপা দিয়েছিল কানে।"

আবার আমাকে থমকে যেতে হয়েছিল এই পর্যন্ত পড়েই। আবার আমি শুনেছিলাম বীভৎস শব্দের পর শব্দ—ঈশ্বর জানেন সে শব্দ পরম্পরা আসছিল কোন দিক থেকে। ঝড়ের গজরানিকে ম্লান করে দিয়ে লেখক-বর্ণিত প্রায়—সেই হুহুঙ্কার নিদারুণ কর্কশ নিনাদে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির রেশ তুলে গমগমে আওয়াজে প্রবেশ করেছিল আমার কর্ণরন্ধ্রে। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছিলাম। ড্রাগনের অপ্রাকৃত হাহাকার তো নিছক কল্পনাপ্রসূত—কিন্তু এখুনি আমি যা শুনলাম, তা কিসের আক্রোশ-ধ্বনি? কোত্থেকে আসছে নরক-গুলজার-করা এই অপার্থিব গজরানি? খুবই দমে গেছিলাম অসাধারণ এই দ্বিতীয় ঘটনায়। হাজার হাজার পরস্পরবিরোধী অনুভূতি লড়াই লাগিয়ে দিয়েছিল মনের মধ্যে। কখনও অবাক হয়েছি, কখনও ভয় পেয়েছি। কিন্তু মনের হাল ছাড়িনি। চোখে চোখে রেখেছিলাম রোডরিককে। আমার চাইতে অনেক বেশি অনুভূতি সচেতন আর ভিতু আমার বন্ধুটি কি এই আওয়াজ শুনতে পেয়েছে? সঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে লক্ষ্য করলাম, গত কয়েক মিনিটের মধ্যেই অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে ওর আচরণে। আগে বসেছিল আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে—একটু একটু করে

চেয়ারের ওপর দিয়ে ঘুরে গিয়ে এখন মুখ ফিরিয়ে রয়েছে দরজার দিকে—তাই সোজাসুজি ওর মুখ দেখতে পাচ্ছি না—দেখছি পাশ থেকে; পাশ থেকে দেখেই বুঝতে পারছি, ঠোঁট নড়ছে অল্প অল্প, যেন অশ্রুত শব্দে কথা বলে যাচ্ছে নিজের সঙ্গে, দেখতে পাচ্ছি দু'চোখ পুরো খুলে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে দরজার বন্ধ কপাটের দিকে—সেই সঙ্গে অল্প অল্প সারা শরীর দোলাচ্ছে ডাইনে আর বাঁয়ে—শরীর দুলছে কিন্তু নিয়মিত ছন্দে—ঠোঁটও নড়ছে তালে তাল রেখে—চোখদুটোই কেবল আড়ষ্টভাবে চেয়ে রয়েছে দরজার দিকে। এইটুকু দেখেই আমি স্যার লন্সলট রচিত কাহিনী পাঠ শুরু করেছিলাম জোর গলায় ঃ

"ড্রাগন নিধনের পর মহাবীর এথেলরেড দানবদেহকে পথ থেকে সরিয়ে রুপোর মেঝে মাড়িয়ে ঢুকে গেছিল সোনার প্রাসাদে। পেতলের ঢালকে দেওয়াল থেকে খসিয়ে নামানোর সময়ে হাত ফসকে ঢাল আছড়ে পড়েছিল রুপোর মেঝেতে। প্রচণ্ড ঝনঝন ঝনাৎ শব্দে মুখরিত হয়েছিল দিকবিদিক।"

শেষ শব্দটা মুখ দিয়ে বের করতে না করতেই সত্যিই যেন একটা পেতলের ঢাল ঝনঝন ঝনাৎ শব্দে আছড়ে পড়ল রুপোর মেঝেতে—স্পষ্ট শুনতে পেলাম একটা ধাতব ঝনঝনানি—চাপা আওয়াজ—কিন্তু পায়ের তলার মেঝে কেঁপে উঠল আওয়াজের রেশে। ভয়ে দিশেহারা হয়ে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম চেয়ার ছেড়ে। রোডরিকের নিয়মিত ছন্দের দেহ-দুলুনি কিন্তু স্থগিত হয়নি। ক্ষণেকের জন্যেও। দৌড়ে গেছিলাম ওর পাশে। দেখেছিলাম, দুই নয়নে নিবিড় তন্ময়তা জাগিয়ে নিথর চাহনি মেলে রেখেছে বন্ধ কপাটের ওপর—গোটা মুখটায় কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছে আশ্চর্য আড়ষ্টতা—রক্ত মাংসের মুখ এত শক্ত হয় কি করে! কাঁধের ওপর আমি হাত রাখতেই শিহরণের পর শিহরণ বয়ে গেল সারা শরীরের ওপর দিয়ে; ঠোঁটের কোণায় ভেসে উঠল রুগ্ন পাণ্ডুর ক্ষীয়মান হাসির আভা—যা দেখলে গা হিম হয়ে যেতে বাধ্য, তখনও ঠোঁট নড়ে চলেছে দেখে কান নামিয়ে এনেছিলাম ওর ঠোঁটের কাছে—শুনেছিলাম, খুব নিচু গলায়, খুব দ্রুত টানে, খুব জড়ানো গলায় বিড়বিড় করে চলেছে রোডরিক—আমি যে রয়েছি ঘরের মধ্যে, তা যেন ভুলেই গেছে। কদাকার শব্দস্রোতটা এইরকম ঃ

"পাচ্ছো শুনতে?—আমি কিন্তু শুনেছি—অনেক আগেই শুনেছি। অনেক...অনেক...অনেক মিনিট, অনেক ঘণ্টা অনেকদিন ধরে শুনেছি—বলার সাহস হয়নি—জ্বলে পুড়ে মরেছি, তবুও মুখ ফুটে বলতে পারিনি! জ্যান্ত কবর দিয়েছি মেয়েটাকে! বলিনি, আমার অনুভূতির ধার অনেক বেশি? বলিনি, আমি যা টের পাই তা তুমি টের পাও না? এখন তাহলে বলি, ফাঁপা কফিনের মধ্যে ওর নড়াচড়ার প্রথম আওয়াজ আমি ঠিকই শুনেছিলাম—অনেক, অনেক দিন আগে—বলতে কিন্তু পারিনি—বলবার মত বুকের পাটা আমার ছিল না! আর আজ—এই রাতে এথেলরেড—হা! হা! ঋষির ঘরের দরজা ভেঙে পড়ল না, ম্যাডেলিনের কফিনের ডালা উড়ে গেল? ড্রাগনের মরণ-চিৎকার নয়—ম্যাডেলিন লোহার কপাট খুলে ফেলল হ্যাঁচকা টানে!—পেতলের ঢাল

আছড়ে পড়ল রুপোর মেঝেতে? মূর্খ! ও আওয়াজ পেতলমোড়া খিলেনের তলায় ওর দাপাদাপির আওয়াজ! যাই কোথা? পালাই কোথায়? জেলখানা ভেঙে উঠে আসছে--সিঁড়িতে পেয়েছি পায়ের আওয়াজ। এসে পড়ল বলে। সাজা দিতে আসছে! জ্যান্ত পুঁতে ফেলতে যাচ্ছিলাম—সহ্য করবে কেন? ওই তো শোনা যাচ্ছে হৃৎপিণ্ডের রক্ত জমানো ধুকপুকুনির আওয়াজ—ম্যাডেলিনের বুকের খাঁচায় লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে হৃৎপিণ্ড—আমরা ভেবেছিলাম নিথর হৃৎপিণ্ড—আর নড়বে না! উন্মাদ!" বলতে বলতে তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সমস্ত শক্তি দিয়ে—"উন্মাদ! ওই তো এসে দাঁড়িয়েছে দরজার ওদিকে!"

অতিমানবিক এনার্জি ফেটে পড়েছিল শেষ এই শব্দ ক'টার মধ্যে। আর এই অতিমানবিক শক্তির বিচ্ছুরণেই যেন দমাস করে খুলে গেল আবলুস কাঠের বিরাট কপাট। আসলে খুলল হাওয়ার ধাক্কায়। কিন্তু মনে হলো যেন, রোডরিক তর্জনী তুলে দরজা দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য শক্তি আঙুলের ডগা থেকে ধেয়ে গিয়ে দুহাট করে দিল পাল্লাজোড়া।

বাইরে দাঁড়িয়ে সাদা শব-বস্ত্র পরা একটি নারীমূর্তি। লেডি ম্যাডেলিন। আস্তে আস্তে দুলছে সামনে আর পেছনে। লাল রক্ত লেগেছে সাদা বস্ত্রে, ক্ষীণ আর শীর্ণ তনুর ওপর দিয়ে ধস্তাধস্তির ঝড় যে বয়ে গেছে—তার চিহ্ন সুস্পষ্ট সারা দেহে। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্যে সামনে পেছনে শরীর দুলিয়ে ছিটকে এল ঘরের মধ্যে—গলা চিরে বেরিয়ে এল চাপা গোঙানি—চেয়ারে আসীন ভাইয়ের ওপর আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই ঠিকরে গেল মেঝের ওপর। চরম মৃত্যুকালীন সেই কাৎরানি আর খিচুনিই মরণের ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে গেল রোডরিকের প্রাণের খাঁচায়। দু-দুটো নিষ্প্রাণ দেহ স্থির হয়ে পড়ে রইল মেঝের ওপর।

পালিয়ে এলাম আমি সেই ঘর আর সেই প্রাসাদ থেকে। পাথরে বাঁধনো উঁচু জঙ্গলের ওপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে দৌড়োতে দেখলাম পাগলা ঝড়ের পাগলামি এতটুকু কমেনি। আচমকা পথের ওপর ঝলকে উঠল উদ্দাম এক আলোকরশ্মি। সচমকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম আলো আসছে কোথেকে—তা দেখবার জন্যে। আমার পেছনে প্রকাণ্ড ওই প্রাসাদ আর তার মহাকায় ছায়া ছাড়া তো কিছুই থাকার কথা নয়। দেখেছিলাম প্রাসাদের বুক চিরে রক্তলাল, অস্তগামী পূর্ণ চন্দ্রকে; যে ক্ষীণ ফাটলের কথা আগে উল্লেখ করেছিলাম—প্রায়-অদৃশ্য যে ফাটল-টা ছাদের কার্নিশ থেকে শুরু করে এঁকে বেঁকে বিদ্যুল্লতার ভঙ্গিমায় মেঝে পর্যন্ত পৌঁছেছিল—অকস্মাৎ তা উদার হয়ে চন্দ্ররশ্মির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। আমার স্তম্ভিত চাহনির সামনেই দেখতে দেখতে আরও চওড়া হয়ে গেল ফাটল-পথ—হু-হু করে দামাল ঝড় পথ করে নিল সেই ফাঁক দিয়ে—ফাটলকে আরও ব্যাদিত করে দিয়ে তুলে ধরল উপগ্রহের পূর্ণ অবয়বকে। মাথা ঘুরে গেল আমার। কর্ণকুহরে ভেসে এল বিশাল প্রাসাদের প্রকাণ্ড দেওয়াল একে একে ধসে

আর আছড়ে পড়ছে দু'পাশে—লক্ষ করতালি বাজিয়ে বুঝি উত্তাল অট্টহেসে নৃত্য জুড়েছে জলোচ্ছ্বাস—নিমেষ মধ্যে পায়ের তলার নিতল সরোবর প্লাবন ঘটিয়ে আশার প্রাসাদ-এর ভগ্নাবশেষের ওপর—এখন তার অথই জলের চাদরে নিস্তব্ধ বিষাদ ছাড়া আর কিছুই নেই।

ছাগল ছানার গুপ্তধন

[দ্য গোল্ড বাগ]

'সর্বনাশ ! এযে বদ্ধ উন্মাদ।
কামড়েছে নিশ্চয় টারানটুলা!'

—একটি উদ্ধৃতি

অনেক—অনেক বছর আগে বেশ দহরম মহরম ঘটিয়ে বসেছিলাম মিস্টার উইলিয়াম লে গ্র্যাণ্ড নামে এক চমৎকার ভদ্রলোকের সঙ্গে। হুগুনট নামে একটা জেলার প্রাচীন বংশের উপযুক্ত বংশধর তিনি। এক সময়ে বিলক্ষণ বড়লোকও ছিলেন। কিন্তু পর-পর বেশ কয়েকটা দুর্ভাগ্য তাঁর পয়সাকড়ি উড়িয়ে দেয়। টাকার টানাটানি শুরু হতেই উনি ফটাফট ব্যয়সংকোচ শুরু করে দিলেন। নিউ অর্লিয়েন্সে ওঁর পূর্বপুরুষরা রাজার মতই থেকেছিলেন এতদিন। উনি সেখান থেকে পাতাড়ি গুটিয়ে চলে এলেন সুলিভান দ্বীপে। জায়গাটা সাউথ ক্যারোলিনার চার্লসটনের কাছেই।

দ্বীপটা অতীব সুন্দর এবং পরমাশ্চর্য বললেই চলে। লম্বায় মাত্র মাইল তিনেক। সমুদ্রের বালি ছাড়া সে দ্বীপে আর কি-ই বা থাকতে পারে। মূল ভূখণ্ড থেকে দ্বীপকে আলাদা করে রেখেছে ঝিরঝিরে একটা স্রোতস্বিনী। এতই ক্ষীণকায়া যে চোখ পাকিয়ে না দেখলে তাকে এক নজরে ঠাহর করা যায় না।

নলবন, কাদাডোবা আর পাঁকের মধ্যে দিয়ে কোনমতে বয়ে চলেছে ঝিরঝির করে। জলায় মুরগিদের তোফা আড্ডাখানা কিন্তু এই কাদাডোবা আর পাঁকের আড়ৎ। গাছপালা? নেই বললেই চলে। চোখে যদিও বা পড়ে দু-একটা তাও বামনাকার। মহীরুহ তো দূরের কথা, গাছ পদবাচ্য সেরকম উদ্ভিদ ঠাঁই পায়নি কোথাও। দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে একটা কেল্লা। নাম, ফোর্ট মোলট্রি। এইখানেই খানকয়েক যাচ্ছেতাই রকমের কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে। দেখলে চোখে জল আসে। অথচ বেশ কিছু লোক এইগুলোকেই ভাড়া নিয়ে মাথা গুঁজে থাকে গরমকালে। চার্লসটনের ধুলো আর জ্বর এড়িয়ে পালিয়ে আসে। খোঁচা খোঁচা তালবনটা রয়েছে এই দিকেই।

পশ্চিমের এই কেল্লা, শ্রীহীন বাড়ি, আর তালবন ছাড়া গোটা দ্বীপে দেখতে পাবেন শুধু নিবিড় মেদি গাছের ঝোপ। মিষ্টি উদ্ভিদ। ইংল্যাণ্ডের বাগান-বিশেষজ্ঞরা বর্তে যেতেন এত সুন্দর মেদি গাছ এক সঙ্গে এক জায়গায় দেখতে পেলে। এ গাছ নেই শুধু সমুদ্রের ধারে—সেখানে শুধু সাদা সৈকত। বাকি যেখানে যাবেন, সেখানেই নিরেট পাঁচিলের মত আপনার পথ জুড়ে দাঁড়াবে মেদি ঝোপ কোথাও কোথাও তা পনেরো থেকে বিশ ফুট উঁচু। হাওয়া পর্যন্ত আটকে দিচ্ছে। মিষ্টি সুবাসে ভরিয়ে তুলছে গোটা দ্বীপটা।

এ দ্বীপের সবচেয়ে দুর্গম দিক হচ্ছে পুবদিক। মেদি ঝোপ এখানে এমন পাঁচিল তুলেছে যে আঙুল পর্যন্ত গলে না। চোখ চলে না। এইখানেই নিজের হাতে একটা ছোট্ট কুটির বানিয়েছিলেন লেগ্রাণ্ড। দৈবাৎ ওঁর সঙ্গে যখন আমার পরিচয় ঘটে, তখন উনি থাকতেন এই কুঁড়েতেই। প্রথম পরিচয় একটু একটু করে পাকা বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল। হবেই তো। সংসার আর লোকালয় ছেড়েছুড়ে যাঁরা নির্জন জায়গায় বাসা বাঁধেন, তাঁরা শ্রদ্ধা জাগায় অন্তরে—সেই সঙ্গে জাগায় আগ্রহ।

লেগ্রাণ্ডকে আমি যেভাবে দেখেছিলাম, তা খোলাখুলি বলে ফেলি। বেশ শিক্ষিত। মনের ক্ষমতা অসাধারণ। কিন্তু মনুষ্যবিদ্বেষী। কখনো বিকট উত্তেজনায় ছটফট করছেন, কখনো বিষম বিষাদে একেবারে মুষড়ে রয়েছেন। 'মুড' যখন বিকৃত রূপ ধরে, তখন তো এই রকমই ঘটে। বইয়ের পাহাড় জমিয়ে রেখেছিলেন কুটিরে, কিন্তু পড়তেন সামান্যই। আনন্দের খোরাক জুগিয়ে যেত শুধু তিনটে পাগলামি ঃ বন্দুক ছোঁড়া, মাছ ধরা আর ঝোপেঝাড়ে ঘুরে ঘুরে পোকামাকড়ের খোলা জোগাড় করা—নমুনা জমানো ছিল ওঁর মস্ত বাতিক। বিখ্যাত কীটবিশেষজ্ঞরাও চমৎকৃত হতেন তাঁর নমুনা মিউজিয়াম দেখলে।

এই তিন পাগলামির জন্যে হরবখৎ তাঁকে অভিযানে বেরোতে হতো। তখন তাঁর সঙ্গী থাকত একজনই। এক বুড়ো নিগ্রো। তার নাম জুপিটার। ফ্যামিলির কপাল পোড়ার অনেক আগেই তাকে গোলামি থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে যায়নি। হাজার লোভ দেখালেও অথবা মেরে ফেলার ভয় দেখালেও সে লেগ্রাণ্ডকে ছেড়ে যেতে রাজি নয়। লেগ্রাণ্ডকে ও ডাকত 'মাসা উইল' বলে।

'মাসা উইলের পায়ের ছাপ পড়বে যেখানে, জুপিটারের পায়ের ছাপও পড়বে ঠিক সেই-সেই জায়গায়। এরকম একটা আকাট গাড়লের দরকার আছে আধপাগলা লেগ্রাণ্ডকে আগলে রাখার জন্যে। ফ্যামিলির লোক তা বুঝেছিল। তাই জুপিটারের জেদে তারাও ইন্ধন জুগিয়েছিল। পাগলা ভবঘুরের একজন অভিভাবক তো দরকার। জুপিটারই হোক সেই অভিভাবক।

সুলিভান দ্বীপে শীতের কামড় ততটা কাহিল না করলেও বছরের শেষ দিনগুলোয় মাঝে মাঝে আগুনের চুল্লি জ্বালানোর দরকার হয়। ১৮—সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি কিন্তু ঠাণ্ডা পড়ল অসাধারণ রকমের। এই সময়ে আমি ছিলাম সুলিভান দ্বীপ থেকে ন'মাইল দূরে চার্লসটনে। এখনকার মত সেখান থেকে দ্বীপে যাতায়াতের এত সুবিধেও ছিল না। যে সব হাঙ্গামা পুইয়েও আমি পৌঁছেছিলাম দ্বীপে। হাড়কাঁপানো সূর্যাস্তের সময়ে চিরহরিৎ ঝোপঝাড় ঠেলে এগোচ্ছিলাম বন্ধুর কুঁড়ের দিকে। বেশ কয়েক হপ্তা দেখা হয়নি। মন ব্যাকুল হয়েছিল সেই কারণেই।

কুঁড়ের দরজায় পৌঁছে টকাটক টোকা মারলাম পাল্লায়। এইটাই আমার রীতি। গলা চিরে হাঁকডাক করা আমার পোষায় না। কিন্তু কেউ যখন ভেতর থেকে সাড়া দিল না, তখন চাবি খুঁজে নিলাম। কোথায় চাবি লুকোনো থাকে, আমি তা জানতাম। খুললাম দরজা। ঢুকলাম ভেতরে। দেখলাম, ভারি আরামের চুল্লি জ্বলছে এক কোণে। এ কুঁড়েতে এ জিনিস নতুন বিস্ময় নিঃসন্দেহে। তবে এমন বিস্ময় এই মুহূর্তে আমার প্রতিটি লোমকূপে পরম আরাম জাগ্রত করেছিল। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম গায়ের ওভারকোট। চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম জ্বলন্ত চুল্লির কাছে। গোদাগোদা কাঠের গুঁড়ি পুড়ছিল পট্ পট্ শব্দে। হিমেল রাতে কাঠের আঁচ যে কত মধুর, সেই মুহূর্তে তা সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করলাম। মৌজ করে বসে রইলাম বন্ধুবরের পথ চেয়ে।

অন্ধকার বেশ ঘন হতেই ফিরে এল দুই মক্কেল। হৈ হৈ করে উঠল আমাকে দেখে। জুপিটারের সেকি হাসি! এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত সবকটা সাদা দাঁত ঝিকঝিক করতে লাগল আগুনের আলোয়। নিশ্চয় আমার খিদে পেয়েছে এতটা পথ আসায়? কাজেই জলার মুরগি রাঁধতে বসে গেল তক্ষুনি। ডিনার যেন আকণ্ঠ হয়—সেদিকে ব্যাটার নজর সব সময়ে।

লেগ্রাণ্ড উত্তেজনার ঘোরে রয়েছে দেখলাম। এরকম ঘোর মাঝে মধ্যেই আসে। জ্বরের প্রকোপের মতই কখনও উত্তেজনা, কখনও বিষণ্ণতা—পালা করে আসে আর যায় ওর ভীষণ তাজা মনটার ওপর দিয়ে।

সেদিনকার ভয়ানক উত্তেজনা ঘটেছে ডবল কারণে। দু'খোলাওলা একটা পোকা ও আবিষ্কার করেছে। তারপরেও পেয়েছে এমন একটা গুবরে পোকা যা এর আগে কেউ কখনো দেখেনি। জুপিটার বুড়ো অবশ্য যথেষ্ট সাহায্য করেছে উদ্ভট এই গুবরেকে জুটিয়ে আনতে। লেগ্র্যাণ্ড এত উত্তেজনার মধ্যেও কিন্তু বলে রাখল—"বন্ধু হে, গুবরে সম্বন্ধে এখন কিছু জানতে চেও না। তোমার মতামত

প্রার্থনা করব কাল সকাল হলেই। তখনি সব জানবে; যা বলবার বলবে।"

আমি তখন আগুনের মিষ্টি আঁচ পোয়াতে ব্যস্ত। নারকীয় গুবরে নরকে থাকলেও ক্ষতি কী? তবুও কথার পিঠে বললাম—"ভালো জ্বালা! একটা গুবরে বই তো নয়। তার জন্যে গোটা রাত প্রতীক্ষা করতে হবে? এখনি হয়ে যাক না!"

লেগ্রাণ্ড বললে—"আমি কি জানতাম আজ তুমি আসছো? ডুমুরের ফুল হয়ে গেছো তো—টিকিই দেখা যায় না। যদি জানতাম, তাহলে অমূল্য সেই গুবরে-কে সঙ্গে নিয়েই আসতাম।"

"কোথায় রেখে এলে তোমার অমূল্য পোকাকে?"

"লেফটেন্যান্ট জি—এর কাছে। চিনতে পারলে না? কেল্লার লেফটেন্যান্ট। ফেরার পথে দেখা হয়ে গেল। ফুর্তির চোটে নেচে নেচে ফিরছিলাম তো, তাই বোকার মত গুবরে দিলাম তাঁকে দেখতে। তাই বলছিলাম, সকালের আগে সে গুবরে আর দেখা যাবে না। রাতটা থাকো। সূর্য উঠলেই পাঠাবো জ্যাপ-কে। সৃষ্টিকর্তার হাতে গড়া অপূর্ব সৌন্দর্যকে মুঠোয় করে নিয়ে আসবে।"

"সূর্যোদয়কে নিয়ে আসবে?"

"কি যে বলো! গুবরেকে আনবে। আহা! কি রঙ গো! চোখ ধাঁধানো সোনা যেন! হিকরি বাদামের সাইজ—তবে একটু বড় বাদাম। দু'দিক সরু। একটা সরু দিকে দুটো কুচকুচে কালো দাগ। আর একটা কালো দাগ রয়েছে অন্য সরু দিকটায়—এ দাগটা অবশ্য একটু লম্বাটে। শুঁড়টা—"

"মাসা উইল," বলে উঠল জুপিটার—"কতবার বলব তোমাকে, এ হলো গিয়ে সোনা-পোকা, এক্কেবারে নিরেট, খাঁটি সোনা—ভেতরেও সোনা, বাইরেও সোনা—ডানা দুটো ছাড়া—এরকম ভারি পোকা জীবনে দেখিনি বাপু।"

জ্যান্তি পোকা কখনও সোনা দিয়ে তৈরি হয় না। বাচ্ছা ছেলেও তা জানে। সুতরাং জুপিটারের গেঁইয়া কথায় দাবড়ানি দেওয়া উচিত ছিল লেগ্রাণ্ডের। সে কিন্তু যেন মেনেই নিল জুপিটারের অদ্ভুত কথা।

বললে—"বেশ বেশ, ধরেই নেওয়া গেল খাঁটি আর নিরেট সোনায় তৈরি গুবরে। কিন্তু গুবরের কথা বলতে গিয়ে মুরগি পুড়িয়ে ফেললে যে!—রঙটা অবশ্য জুপিটারের কথাই সত্যি করে তুলছে। আঁশ চকচক করে ঠিকই। কিন্তু এরকম চোখ ধাঁধানো সোনা রঙ কোনো আঁশ থেকে ঠিকরে আসতে কক্ষনো দেখিনি। নিজেই দেখবে'খন—সকাল হোক। তার আগে গুবরের আকারটা কিরকম, সেটা তোমাকে দেখাতে পারি।"

বলে, লেখবার টেবিলে গিয়ে বসল লেগ্রাণ্ড। এ টেবিলে কলম আছে, কালি আছে, কিন্তু কাগজ নেই। কাগজের সন্ধানে একটা ড্রয়ার টেনে দেখল ভেতরে। সেখানেও নেই কাগজ।

তখন বললে—"ঠিক আছে, কাগজের অভাব মিটিয়ে নিচ্ছি," বলতে বলতে ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে টেনে বের করল এক টুকরো কাগজ। দেখে তো মনে হল অতি নোংরা এক তা ফুলস্ক্যাপ কাগজ। খচাখচ করে [illegible] দিয়ে তার

ওপরেই এঁকে ফেলল একটা খসড়া ছবি।

ও যখন ছবি আঁকা নিয়ে তন্নিষ্ঠ, আমি তখন তন্নিষ্ঠ হয়ে আগুন পোহাচ্ছি চুল্লির ধারে। শীতে কাঁপছিলাম হি-হি করে। ও কি হাবিজাবি আঁকছে, তা নিয়ে বিন্দুমাত্রও মাথাব্যথা ছিল না আমার।

স্কেচ আঁকা সাঙ্গ হতেই চেয়ার ছেড়ে না উঠেই হাত বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিল লেগ্রাণ্ড।

ঠিক তখনি দারুণ ঘেউ ঘেউ আর গররর আওয়াজ শোনা গেল দরজায়। সেই সঙ্গে থাবার নখ দিয়ে পাল্লা আঁচড়ানো চলছে সমানে। জুপিটার উঠে গিয়ে কপাটি ফাঁক করতে না করতেই পেল্লায় সাইজের একটা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুত্তা তীর বেগে ঘরে ঢুকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল আমার ওপর। দুজনে মিলেই ঠিকরে গেলাম মেঝের ওপর।

বিরাট এই সারমেয়টি লেগ্রাণ্ডের বড় প্রিয় সঙ্গী। অষ্টপ্রহর থাকে সঙ্গে। গত কয়েকবার এই কুঁড়ের অতিথি হওয়ার পর থেকেই তার সঙ্গে আমার মিতালি জমে উঠেছে বিলক্ষণ। সুতরাং দীর্ঘ অদর্শনের পর আমার ওপর তার সারমেয়-প্রেম দেখানোর ঘটা দেখে অন্য কেউ চমকে উঠলেও, আমি তা মেনে নিলাম।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁচড়পাঁচড়, ঝুটোপুটি, ঘেউ ঘেউ ইত্যাদির পর গায়ের ধুলো-টুলো ঝেড়ে যখন ফের চেয়ারে আসীন হলাম, তখন ফুলস্কেপ কাগজের দিকে তাকিয়ে মনে হলো যেন মাথার মধ্যে চক্কর দিয়ে উঠল! একি এঁকেছে লেগ্রাণ্ড!

বেশ কিছুক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করার পর বলেছিলাম—"ওহে লেগ্রাণ্ড, এরকম সৃষ্টিছাড়া গুবরে যে ধরাতলে আছে, তা তো জানা ছিল না। এটা কি? মড়ার খুলি, না, মড়ার মুখোশ?"

"মড়ার মুখোশ বলেই মনে হচ্ছে? আশ্চর্য কী! ওপরের কালো দাগদুটো যদি দুটো চোখ, নিচের কালো দাগটা তাহলে মুখ! মুখোশের মতই ডিম্বাল্।"

"কিন্তু তুমি তো আর আর্টিস্ট নও—খোদ গুবরেকে না দেখা পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না।"

দমে গেল লেগ্রাণ্ড। বললে—"ছবি আঁকাটা ভালো গুরুর কাছেই শিখেছিলাম। আঁকিও মোটামুটি ভাল। মাথায় গোবর আছে, তাও মনে করি না।"

"ঠাট্টাও বোঝে না? মড়ার খুলি বলেই চালিয়ে দেওয়া যায়। নিখুত করোটি। সেক্ষেত্রে বলতে হবে, গুবরে মহলে বিলক্ষণ আতঙ্ক জাগায় তোমার এই সোনা-পোকা। রোমাঞ্চকর কুসংস্কার পর্যন্ত তৈরি করে নেওয়া যায়। জুৎসই একটা নামও দিয়ে দিও—স্কারাবাস স্ক্যাপুট হোমিনিস—কেমন হবে? ভাল কথা, শুঁড়টার কথা বলতে বলতে থেমে গেল কেন?"

"শুঁড়টা তো এঁকেই দিয়েছি! গুবরের শুঁড় ঠিক যেখানে যেভাবে ছিল, ঠিক সেখানে সেই ভাবে এঁকেছি ছবিতে।"

"কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।"

বাস্তবিকই স্কেচে শুঁড়-ফুঁড়ের কোনো চিহ্ন নেই, শুধু একটা মড়ার মুখোশ। লেগ্রান্ড নিজের শিল্পী সত্তা নিয়ে যতই তাল ঠুকুক না কেন—এঁকেছে কিন্তু একটা বিলকুল মড়ার মুখোশ!

একেবারেই মিইয়ে গেল লেগ্রাণ্ড। কাগজটা আমার হাত থেকে নিয়ে ভেবেছিল দলা পাকিয়ে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দেবে—কিন্তু তার আগেই চোখ গিয়ে পড়েছিল কাগজের বুকে।

সঙ্গে সঙ্গে পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল ওর সর্বাঙ্গ। চোখের পাতা না ফেলে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল কাগজের ছবির দিকে। যেন হিপনোটাইজড্ হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে শরীরের সমস্ত রক্ত বুঝি জড়ো হলো মুখে—লাল হয়ে গেল মুখের চামড়া—তারপরেই অবশ্য রক্ত নেমে গেল মুখ থেকে—ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুখের চেহারা।

বেশ কয়েক মিনিট ধরে চেয়ারে একইভাবে বসে থেকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল নিজের আঁকা ছবির দিকে। দেখছে তো দেখছেই। দেখে দেখে যেন তৃপ্তি মিটছে না।

তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, টেবিল থেকে একটা মোমবাতি তুলে নিয়ে, গিয়ে বসল দূরের একটা চা-বাক্সর ওপর। সেখানে বসেই আবার বিষম উদ্বেগ আঁকা মুখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ছবির প্রতিটি অংশ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, উল্টেপাল্টে—কতরকমভাবে যে তার ইয়ত্তা নেই। মুখে কোনো কথা নেই—আমার সঙ্গে মিলমাত্র বাক্যালাপ নেই—শুধু সেই কাগজ দেখে যাচ্ছে তন্ময় হয়ে।

ভীষণ অবাক হলাম ওর কাণ্ডকারখানা দেখে। কিন্তু ওর মেজাজ তো জানি—তাই বাগড়া দিলাম না। কথাও বললাম না। ঝোঁক এসেছে—আসুক। যখন কেটে যাবে—তখন নিজেই কথা বলবে।

কিছুক্ষণ পরে পকেট থেকে চামড়ার চ্যাপ্টা মানিব্যাগ বের করে, কাগজখানা অতি সন্তর্পণে তার ভেতরে রেখে, ড্রয়ার খুলে মানিব্যাগ আর কাগজ দুটোই রেখে দিল ভেতরে এবং চাবি দিয়ে দিল ড্রয়ারে।

এবার কিন্তু দেখলাম ওর হাবভাব অনেকটা সংযত। এতক্ষণ যেন সব বেসামাল হয়ে যাচ্ছিল—এবার সামলে নিয়েছে। তবে প্রথমদিককার সেই উত্তেজনার হাওয়া একেবারেই উবে গেছে। তাই বলে যে মুখে চাবি দিয়ে বোবা মেরে রয়েছে তাও নয়। কিন্তু রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে বেড়েই চলল ওর অন্তর্মুখিতা—একটু একটু করে তলিয়ে যেতে লাগল নিজের মনের নিতলে—আমার চৌদ্দপুরুষও ওকে সেই গহন কন্দর থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করত পারেনি কক্ষনো—পারবেও না। জেনে চুপ মেরে গেলাম আমি। ভেবেছিলাম, রাতটা কাটিয়ে যাব কুঁড়েতে—আগেও তাই করেছি। কিন্তু গৃহস্বামী ক্রমশ অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে দেখে সরে পড়াই সঙ্গত মনে করলাম। লেগ্রাণ্ড

তাতে বাধা দিল না। তবে যাওয়ার সময়ে করমর্দনের সময়ে উষ্ণতা প্রকাশ করল স্বাভাবিকের চাইতে বেশিভাবে।

এই ঘটনার একমাস পরে জুপিটার আমার কাছে এল চার্লসটনে। লেগ্রাণ্ড একবারও আসেনি এই একমাসে। জুপিটারের মুখ দেখে কিন্তু চমকে উঠলাম। বুড়ো নিগ্রোকে তো এত দমে যেতে কখনো দেখিনি। লেগ্রাণ্ডের নিশ্চয় কিছু হয়েছে!

"খবর কি তোমার মনিবের?" প্রথম প্রশ্নেই ছুঁড়ে দিয়েছিলাম মনের উদ্বেগ।

"ভাল নয়।"

"গোলমালটা কি?"

"কিছু তো বলছে না—কিন্তু খুব অসুখ।"

"অসুখ? বিছানায় পড়েছে নাকি/"

"না··· না··· চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে··· কিন্তু আমি যে উদ্বেগে মরছি।"

"যাচ্চলে! তবে যে বললে অসুখ করেছে? বলেছে তোমাকে?"

"কিছুই বলছে না। শুধু হুড়োহুড়ি করে বেড়াচ্ছে···খরগোশের মত দৌড়োচ্ছে··· কখনো হেঁট হয়ে দৌড়োচ্ছে··· কখনো আকাশের দিকে চেয়ে দৌড়োচ্ছে···সবসময়ে সাইফন নিয়ে কি যে ছাই করছে···"

"সাইফন?"

"মন্তর···মন্তর···স্লেটেতে আঁকিবুঁকি কাটে—ডাইনির মত কত কি লিখছে···সবসময়ে চোখে চোখে রাখতে হচ্ছে···সেদিন সকালে ভোর হতে না হতেই আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছিল···সারাদিন আর টিকি দেখা গেল না···আমি লাঠি ঠিক রাখলাম···ফিরে এলেই পিটিয়ে দিতাম···কিন্তু এমন চেহারায় ফিরল যে ভয়ের চোটে পেটের মধ্যে হাত-পা ঢুকে গেল আমার—ইস! সে কি অবস্থা মাস্টারের।"

"খবরদার! মারধর করতে যেও না। এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা কি ধরতে পারছো না? মাথাটা বিগড়োলো কেন? আমি চলে আসার পর আজেবাজে কিছু কি ঘটেছে?"

"না, মাসা, তারপরে আর কিছু ঘটেনি—ঘটেছে আগে—যেদিন আপনি গেছিলেন—সেইদিনই।"

"তার মানে?"

"গুবরে পোকা।"

"গুবরে পোকা?"

"সোনা-পোকার জন্যেই মাথা বিগড়েছে মাসা উইলের।"

"কি করে বুঝলে?"

"গুবরের মুখ আছে, থাবা-নখ আছে। এরকম গুবরে কখনো দেখিনি মাসা। যা পায় তা লাথায়, কামড়ায়। মাসা উইল তাকে খামচে ধরলে এমন কামড়ে দেয় যে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিতে হয়। কামড় খেয়েছে নিশ্চয়—নইলে অমন আঁতকে

উঠে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে কেন। আমি কিন্তু খালি হাতে গুবরে ধরার লোক নই। এক টুকরো কাগজ দিয়ে চেপে ধরেছিলাম, মুখের মধ্যে কাগজ ঠেসে দিয়েছিলাম, যাতে আর কামড়াতে না পারে।"

"গুবরের কামড় খেয়েই কি রোগে পড়েছে লেগ্রাণ্ড?

"অত জানি না। তবে কামড় খাওয়ার পর থেকেই শুধু সোনার স্বপ্ন দেখে কেন?"

"তুমি জানলে কি করে স্বপ্নে সোনা দেখছে?"

"ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সোনার কথা বলে যে।"

"আজ এলে কি শুধু এই কথা বলতে?"

"মাসা উইল একটা চিঠি দিয়েছে। এই নিন।"

লেগ্রাণ্ড লিখেছে :

"মাই ডিয়ার—

"অ্যাদ্দিন দেখিনি কেন? আমার মেজাজ দেখে ক্ষুব্ধ হওয়ার মত মূর্খ তো তুমি নও। তবে আসছো না কেন?

খুব উদ্বেগে আছি। অনেক কথা বলার আছে। কিভাবে বলব বুঝতে পারছি না—আদৌ বলতে পারব কিনা, তাও জানি না।

বেশ কিছুদিন ধরেই ভাল নেই। জাপ বড় জ্বালাচ্ছে। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ও চায় আমাকে সেবা করতে। সব সময়ে নজরে থাকলেই মহাখুশি। একদিন তা হয় নি। চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছিলাম। গেছিলাম মূল ভূখণ্ডের পাহাড়ে। ন্যাতানো অবস্থায় ফিরে এসে দেখি ইয়ামোটা লাঠি বানিয়ে রেখেছে আমাকে পিটবে বলে। শোচনীয় অবস্থা দেখে শেষ পর্যন্ত মায়া হয়েছিল বলেই পেটেনি।

আর কোনো কথা নয়। বাকিটা এলে বলব।

জুপিটারের সঙ্গেই চলে এসো। আজ রাতেই তোমাকে দেখতে চাই। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা আছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ—এলেই বুঝবে।

চিরকালের তোমার
"উইলিয়াম লেগ্রাণ্ড"

চিঠির সুরটা যেন কিরকম। অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল পড়ার পর থেকেই। এরকম স্টাইলে লেগ্রাণ্ড তো কখনো চিঠি লেখে না। কিসের স্বপ্ন দেখছে? উত্তেজনাপ্রবণ মগজে আবার কোন্ পোকা নড়ে উঠল? 'খুবই গুরুত্বপূর্ণ' বলতে কি বোঝাতে চায়? জুপিটারের কথাবার্তা শুনেও কিছুই বোঝা গেল না। ভয় হল, যদি না যাই, উত্তেজনা বেড়ে গিয়ে লেগ্রাণ্ডের মাথার গোলামাল জটিল করে তুলতে পারে। তাই আর দ্বিধা করলাম না। নিগ্রো জুপিটারের সঙ্গে রওনা হলাম।

জেটিতে এসে দেখলাম, নৌকোর মধ্যে রয়েছে একটা কাস্তে, আর তিনটে কোদাল। সবকটাই নতুন।

"এগুলো কেন, জ্যাপ?" শুধিয়েছিলাম আমি

"কাস্তে আর কোদাল, মাসা।"

"তাতো বুঝলাম। কিন্তু নৌকোয় কেন?"

"মাসা উইল কিনতে দিয়েছিল।"

"কাস্তে-কোদাল নিয়ে করবে কি তোমার মাসা উইল?"

"মাসা উইল নিজেই জানে কিনা সন্দেহ। আমি জানব কি করে? তবে যত নষ্টের গোড়া ওই গুবরে।"

জুপিটারের মাথায় এখন 'গুবরে' ছাড়া কিচ্ছু নেই। সুতরাং কথা না বাড়িয়ে নৌকো চালাতে বললাম। পাল তুলে দিয়ে টানা বাতাসে চলে এলাম মোলট্রি কেল্লার উত্তর দিকের খাঁড়িতে। মাইল দুই হেঁটে পৌঁছোলাম কুটিরে। তখন বিকেল তিনটে। লেগ্রাণ্ড বসেছিল আমার পথ চেয়ে। আমি ঘরে ঢুকতেই লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে। লক্ষ্য করলাম, ওর হাত কাঁপছে। মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে। চোখের কোলে কালি পড়েছে। চাহনি অস্বাভাবিক।

ঠিক এই সন্দেহই করেছিলাম। লেগ্রাণ্ড বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছে।

একথা সেকথার পর জিজ্ঞেস করলাম, লেফটেন্যান্ট জি—এর কাছ থেকে সোনা-গুবরেকে এনেছে কিনা।

"নিশ্চয়। পরের দিন সকালেই এনেছি। গুবরে ছাড়া বাঁচা যায়?" বলতে বলতে মুখ-টুখ লাল করে জুপিটারের দিকে জুল জুল করে চেয়ে রইল লেগ্রাণ্ড।

তড়িঘড়ি করে বললে তারপরেই— "ঠিকই বলেছিল জুপিটার।"

"কি বলেছিল জুপিটার?"

"খাঁটি সোনা। এ গুবরে খাঁটি সোনা।"

"কি বলছ!"

"ঠিকই বলছি। সোনা-পোকা এসেছে আমার ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে। হারানো ঐশ্বর্য ফিরে পাব এরই দৌলতে। জুপিটার, নিয়ে এসো গুবরেকে।"

"পারবো না।" সাফ জবাব জুপিটারের।

গম্ভীরভাবে নিজেই উঠে গেল লেগ্রাণ্ড। নিয়ে এল একটা কাঁচের আধার। বিউটিফুল গুবরে পোকা রয়েছে তার মধ্যে। কোনো প্রকৃতিবিদ কোনোদিন দেখেনি এই গুবরে—এই ঘটনার পর তাঁরা খবর পেতে পারেন। পেছনের সরু দিকে দুটো গোল কালো ফুটকি—অন্যদিকে একটা লম্বাটে কালো দাগ। আঁশগুলো ভীষণ শক্ত আর চকচকে—পালিশ করা সোনার মতন। ওজনে আশ্চর্য ভারি। এইসবের জন্যেই জুপিটার বলেছিল—এ গুবরে সোনার তৈরি এবং যত নষ্টের গোড়া। কিন্তু এরপর লেগ্রাণ্ড যা বললে, তার জন্যে আমি তৈরি

ছিলাম না। বললে—"আমার ভাগ্য এই গুবরের ওপর নির্ভর করছে।"
আমি বললাম— "লেগ্রাণ্ড, তুমি অসুস্থ।"
ও বললে—"নাড়ি দ্যাখো।" দেখলাম, জ্বরের চিহ্ন নেই। তখন বললাম—"নাড়ি ঠিক আছে। জ্বরও নেই। কিন্তু তুমি শুয়ে পড়ো। আমি আছি তোমার পাশে।"
"তুমি তো থাকবেই। আমার উত্তেজনা শুধু তুমিই কমাতে পারবে।"
"কি ভাবে?"
"জুপিটারকে নিয়ে মূল ভূখণ্ডের পাহাড়ে যাচ্ছি। সঙ্গে তুমি যাবে। কারণ শুধু তোমাকেই বিশ্বাস করে সব কথা বলা যায়। অভিযান সফল হলে আমার এই উত্তেজনা চলে যাবে, বিফল হলেও চলে যাবে।"
"তা না হয় যাচ্ছি। কিন্তু এই গুবরে হারামজাদার সঙ্গে তোমার পর্বত অভিযানের কোনো সম্পর্ক আছে কি?"
"আছে।"
"তাহলে সে অভিযানে আমি নেই।"
"কপাল খারাপ আমার। দুজনেই যাই তাহলে।"
"পাগল! কদ্দিনের জন্যে যাচ্ছো?"
"আজকের সারা রাতের জন্যে। এখুনি বেরোচ্ছি। কাল সকালে ফিরব।"
"ফিরে এসে ডাক্তার দেখাবে? আমার কথা শুনবে?"
"কথা দিচ্ছি।"
"তাহলে আমিও যাচ্ছি।"
"এখুনি। আর দেরি নয়।"
বুকটা দমে গেলেও চললাম লেগ্রাণ্ডের পেছন পেছন। বেরোলাম বিকেল চারটে নাগাদ। কুকুরটাও এল সঙ্গে। কাস্তে,কোদাল আরও অনেক জিনিস একাই ঘাড়ে করে নিয়ে চলল জুপিটার—মনিবকে বইতে দিল না কিছুই—পাছে আরও মাথা বিগড়ে যায়। মাঝে মাঝেই তিক্ত মেজাজ মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে দুটি মাত্র শব্দের মাধ্যমে—" হারামজাদা গুবরে!" ব্যস, আর কিচ্ছু না। গুবরে এ মনিবের মাথা খেয়েছে—এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই জুপিটারের। ক্ষিপ্ত লোকটাকে নজরছাড়া করতেও পারছে না। আমাকে বইতে দিয়েছে শুধু দুটো লণ্ঠন—ঠুলি লাগানো লণ্ঠন—যাতে আলো না ছড়ায়।
লেগ্রাণ্ডের হাতে রয়েছে একটাই জিনিস। এই মুহূর্তে বুঝি ওর প্রাণের চাইতেও বেশি দাম সেই জিনিসটার। সোনা গুবরেকে লাঠির ডগায় সুতোয় ঝুলিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে এগিয়ে চলেছে। জাদুকররাই এরকম ম্যাজিক দেখাতে দেখাতে যায়। পোকা-মাহাত্ম্যে মোহিত করতে চায় গবেট জনগণকে। লেগ্রাণ্ডের মাথা যে এতটা খারাপ হয়েছে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। চোখে জল এসে গেল প্রিয় বন্ধুর এ হেন অবস্থা দেখে।

ঝিরঝিরে স্রোতস্বিনী পেরিয়ে এলাম। মূল ভূখণ্ডে পৌঁছে উঁচু জমি বেয়ে উঠতে লাগলাম। ঘন জঙ্গল। মানুষের পা এদিকে কখনো পড়েছে বলে মনে হয় না। লেগ্রাণ্ড কিন্তু এ জায়গা চেনে বলে মনে হলো। মাঝে মাঝে দাঁড়াচ্ছে। পথ চিনে নিয়ে ফের এগোচ্ছে।

এই সময়ে ওকে দিয়ে কথা বলাতে চেয়েছিলাম। কথা বলিয়ে উত্তেজনার লাঘব ঘটাতে চেয়েছিলাম। অভিযানের উদ্দেশ্য জানতে চেয়েছিলাম। ও শুধু বলেছে—"দেখোই না কি হয়!"

এইভাবেই গেল দুটো ঘণ্টা। সূর্য যখন ডুবছে, তখন এসে পড়লাম আরও বুনো একটা অঞ্চলে। মস্ত পাহাড়ের চ্যাটালো শীর্ষদেশ বলেই মনে হলো। পাহাড়টার সানুদেশ থেকে শীর্ষদেশ পর্যন্ত জঙ্গলে ঠাসা—ছুঁচ গলানোর জায়গা আছে কিনা সন্দেহ। মাঝে মাঝে বিরাট হাঁ হয়ে রয়েছে পায়ের তলার মাটি—বিশাল গাছ নিজের গুঁড়ি ঠেকিয়ে ধসে পড়া আটকে রেখেছে—নইলে খাদের সংখ্যা আরও বেড়ে যেত।

প্রকৃতির হাতে তৈরি এই মঞ্চে উঠতে হয়েছে গভীর জঙ্গলের ঝোপঝাড় কেটেকুটে পথ করে নিয়ে। জুপিটার একাই কাস্তে চালিয়ে গেছে। এমন অবস্থায় পৌঁছেছিলাম যখন কাস্তেও হার মেনেছে। তখন পথ দেখিয়েছে লেগ্রাণ্ড। সেই পথ দিয়ে অল্প-স্বল্প ঝোপ কেটে পৌঁছেছিলাম বিরাট লম্বা টিউলিপ গাছটার কাছে। আশপাশে রয়েছে আট দশটা ওক গাছ। সবই সমতল ভূমিতে। টিউলিপ মাথা ছাড়িয়েছে প্রত্যেকের। সুন্দর আর মহানও বটে। ঝাঁকালো ডালাপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে সম্রাটের মতন—পুঁচকে আর নগণ্য প্রজারা যেন কুর্নিশ করছে চারপাশে।

বিশাল এই টিউলিপের সামনে পৌঁছে লেগ্রাণ্ড জিজ্ঞেস করল জুপিটারকে, গাছে উঠতে পারবে কিনা। প্রথমটা হকচকিয়ে গেছিল বুড়ো। জবাব দিতে পারেনি। তারপর টিউলিপকে একপাক ঘুরে এসে বললে —"হ্যাঁ, পারব।"

"তাহলে ওঠো, এখুনি। অন্ধকার হবে—যা দেখতে এসেছি, তা আর দেখা যাবে না।"

"কদ্দূর উঠবো?"

"গুঁড়ি বেয়ে আগে তো ওঠো। তারপর বলবো কোন দিকে যেতে হবে।—এই নাও, একে নিয়ে যাও।"

আঁৎকে উঠল জুপিটার—"সোনা-গুবরে! না··· না··· ওকে নেব না!"

"তোমার মত দুর্দান্ত নিগ্রো সামান্য একটা পোকাকে এত ভয় পায়! ছিঃ ছিঃ! এই তো এইভাবে সুতোয় ঝুলিয়ে নিয়ে যাবে। যদি না নাও, কোদাল মেরে মাথা দু'ফাঁক করে দেবো।"

"মাসা!" ককিয়ে ওঠে জুপিটার—" পোকাকে আমি ভয় পাই না—ভয় তোমার কোদালকে। পোকা আমার কচু করবে!"

বলেই, মুখ কুঁচকে সুতোর একটা দিক দু'আঙুলে ধরে গাছের গুঁড়ির দিকে

এগিয়ে গেল জুপিটার। গুবরে রইল ওর শরীর থেকে বেশ তফাতে—গুবরের হাওয়াও যেন গায়ে না লাগে!

আমেরিকান অরণ্যে এই জাতীয় টিউলিপ যখন বড় হয়ে ওঠে, তখন তার গুঁড়ির গা থাকে তেলতেলে; খুব বুড়ো হলে গায়ে ফাট ধরে, ছোট ছোট ডালও বেরোয়—ধরে ধরে ওঠা যায়। বিশাল এই টিউলিপের কেঁদো গুঁড়ির গায়ে তাই চার হাত পা মেলে লেপটে গেল জুপিটার—ঠিক টিকটিকির মতন। ফাটাফুটোয় আঙুল চেপে ধরে ঘষটে ঘষটে উঠতে গিয়ে হড়কে নেমেও এল অনেকবার। অনেক কষ্টে অনেকবার আছড়ে পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে অবশেষে উঠে গেল গুঁড়ি যেখানে প্রথম গুলতির মত দু'ভাগ হয়েছে—সেইখানে। জায়গাটা মাটি থেকে ষাট সত্তর ফুট উঁচু।

"মাসা, এবার কোনদিকে?" হেঁকে বললে ওপর থেকে।

"ডানদিকের বড় ডাল ধরে এগোও।"

ঝটপট হুকুম তামিল করে গেল বুড়ো নিগ্রো। এবার ও উঠছে আরও ওপর দিকে। তেমন কষ্ট আর হচ্ছে না। ঘন পাতার আড়ালে শেষ পর্যন্ত ওকে আর দেখাও গেল না। অনেক উঁচু থেকে শোনা গেল কণ্ঠস্বর।

"আর কদ্দূর উঠবো?"

"কতদূরে উঠেছো?" জিজ্ঞেস করলে লেগ্রাণ্ড।

"প্রায় মগডালে। আকাশ দেখতে পাচ্ছি পাতার ফাঁক দিয়ে।"

"আকাশ দেখতে হবে না। নিচে তাকাও। এদিকে কটা ডাল বেরিয়েছে গুণে বলো। কটা ডালের ওপর দিয়ে উঠেছিলে?"

"এক-দুই- তিন-চার-পাঁচ··· পাঁচটা ডাল পেরিয়েছিলাম এদিক দিয়ে।"

"আর একটা ডাল ওপরে ওঠো।"

মিনিট কয়েক পরেই ফের শোনা গেল জুপিটারের চিৎকার। হুকুম তামিল হয়েছে।

লেগ্রাণ্ড বেশ উত্তেজিত হয়েছে লক্ষ্য করলাম। গলার শির তুলে চেঁচিয়ে বললে— "এই ডাল ধরে এগিয়ে যাও। অদ্ভুত কিছু দেখলেই বলবে আমাকে।"

আর সন্দেহ নেই। লেগ্রাণ্ড সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। কিভাবে ওকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, যখন ভাবছি, জুপিটারের চিৎকার ভেসে এল শূন্য থেকে।

"আর যাওয়া যাচ্ছে না। মরা ডাল। ভেঙে পড়বে।"

চেঁচাতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল লেগ্রাণ্ডের— "কি বললে? মরা ডাল?"

"হ্যাঁ, মাসা।"

"যাচ্চলে! কি করি এখন!" নিজের মনে বললে লেগ্রাণ্ড।

এই তো সুযোগ!

আমি বললাম— "বাড়ি ফিরে গিয়ে শোবে চলো। কথা দিয়েছিলে মনে আছে?"

যাকে বলা, সে তখন আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে চেঁচাচ্ছে— "জুপিটার, কানে কথা যাচ্ছে?"

"হ্যাঁ, মাসা।"

"ছুরি বসিয়ে দেখো তো ডালটা সত্যিই পচা কিনা।"

জবাব এল একটু পরেই— "তেমন পচা নয়...একটু একটু করে একাই এগোতে পারি।"

"একাই এগোতে পারো! তার মানে!"

"গুবরেটাকে ফেলে দিলেই হাল্কা হয়ে যাবো। যা ভারি!"

গুবরে ফেললেই তোমার মাথা ভাঙবো।—শুনতে পাচ্ছো?"

"পাচ্ছি, মাসা। ওভাবে বকবে না। বুড়ো হইছি না?"

"গুবরেকে না ফেলে দিয়ে, নিজেকে বাঁচিয়ে, যতটা যেতে পারো যাও। নগদ পুরস্কার পাবে। আস্ত একটা ডলার!"

"যাচ্ছি...যাচ্ছি...মাসা...ডালের শেষ পর্যন্ত যাচ্ছি!"

"শেষ পর্যন্ত পৌছেছো?"

"এইবার পৌছোচ্ছি...ওরে বাবা! ...একী! গাছের ওপর একি জিনিস!"

"কি দেখছো?" ফুর্তিতে যেন ফেটে পড়ল লেগ্রাণ্ড।

"মড়ার মাথা। গাছের মাথায় কেউ রেখে গেছিল—কাকে মাংস ঠুকরে খেয়ে গেছে।"

"মড়ার খুলি! চমৎকার! গাছে আটকে আছে কিভাবে? গর্ত-টর্ত কিছু দেখতে পাচ্ছো?"

"মস্ত পেরেক দিয়ে খুলি আটকানো রয়েছে ডালে।"

"জুপিটার, এখন যা বলব, ঠিক তাই করবে। শুনছো?"

"শুনছি, মাসা।"

"খুলির বাঁ চোখটা দেখো।"

"বাঁ চোখই নেই।"

"স্টুপিড! নিজের ডান হাত বাঁ হাতের তফাৎ জানো না?"

"জানবো না কেন? এই তো আমার বাঁ হাত। এই হাত দিয়েই তো কাঠ কোপাই।"

"ঠিক। তুমি ল্যাটা। তোমার বাঁ হাত যেদিকে, বাঁ চোখও সেদিকে। এবার বের করো মড়ার খুলির বাঁ চোখের গর্ত। পেয়েছো?"

অনেকক্ষণ পরে বললে নিগ্রো—"খুলির বাঁ চোখ খুলির বাঁ হাতের দিকেই থাকবে তো? পেয়েছি। এই তো বাঁ চোখ। এবার কিরব, মাসা?"

"চোখের ফুটো দিয়ে গুবরেকে গলিয়ে ঝুলিয়ে দাও—একেবারে ছেড়ে দিও না—যতটা সুতো ছাড়া যায়, ছেড়ে যাও।"

"দিলাম। দ্যাখো নিচ থেকে!"

এতক্ষণের এত কথা শুধু কানেই শুনেছি—জুপিটারের চেহারার কণামাত্রও

দেখা যায়নি। এবার পাতার ফাঁক দিয়ে সড় সড় করে নেমে এল সোনা-গুবরে। পাহাড়ের মাথায় আছি বলে পড়ন্ত রোদ এখানে এখনও রয়েছে। সেই রোদ গুবরের গায়ে লেগে ঠিকরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন একটা সোনার ফানুস সোনালি আলো ছড়াচ্ছে। আলো ছড়াতে ছড়াতে আশ্চর্য গোলক নেমে এল আমাদের কাছে। থেমে গেল। সুতো ধরে নিল লেগ্রাণ্ড। গুবরে যেখানে ঝুলছে, তার তলার মাটিতে চার ফুট ব্যাসের একটা বৃত্ত এঁকে নিল। জুপিটারকে বললে সুতো ছেড়ে দিয়ে নেমে আসতে।

গুবরেকে এবার আস্তে আস্তে মাটির ওপর নামিয়ে দিল লেগ্রাণ্ড। যেখানে মাটিতে পড়ল সোনা-পোকা, ঠিক সেইখানে অনেক যত্নে পুঁতে দিল একটা খুঁটি। পকেট থেকে বের করল একটা মাপবার ফিতে। গুঁড়ির গায়ে ফিতের একদিক চেপে ধরে খুলে এনে ঠেকালো খুঁটির গায়ে, তারপর আরও খুলতে খুলতে চলে গেল একই দিকে গুঁড়ি থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে। সেখানে পুঁতল আর একটা খুঁটি। দুটো খুঁটি আর গুঁড়ি রইল একই লাইনে। তৃতীয় খুঁটির চারধারে একটা বৃত্ত টেনে নিয়ে কোদাল কুপিয়ে মাটি খোঁড়া শুরু করে দিল তক্ষুনি। হাত লাগালো জুপিটারও। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম শুধু আমি।

জুপিটারকে যদি দলে টানতে পারতাম, তাহলে জোর করে পাগল বন্ধুকে বাড়ি নিয়ে যেতাম। কিন্তু বেশ বুঝলাম, খাঁটি সোনায় তৈরি গুবরে'র কুসংস্কার লেগ্রাণ্ডের মাথা যেমন খারাপ করেছে, ঠিক তেমনি ঘোরের মধ্যে এনে দিয়েছে তার অনুচরকেও। দুজনেই এখন গুবরের দৌলতে গুপ্তধন প্রাপ্তির স্বপ্নে বিভোর।

কি আর করা যায়। এই ভোগান্তির ঝটপট অবসান তো দরকার। কোদাল কোপানোয় হাত লাগালাম আমিও।

লণ্ঠন জ্বালানো হয়েছে। তিন মূর্তিমান ঝপাঝপ কোদাল মারছি। তিন-তিনটে প্রেত বললেই চলে। হঠাৎ কেউ দেখে ফেললে আঁৎকে উঠে চম্পট দিত নিশ্চয়।

নৈঃশব্দ ভঙ্গ হচ্ছে শুধু কুকুরটার বিকট চেঁচানিতে। ঝাড়া দু'ঘণ্টা ধরে মাটি কোপানি কাঁহাতক আর সহ্য করে বেচারি? বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচে। লেগ্রাণ্ডের ভয় হচ্ছিল, ওর চেঁচানি শুনে কেউ না এসে পড়ে। জুপিটার তাই গর্ত ছেড়ে উঠে এসে কুকুরের মুখ কাপড় দিয়ে কষে বেঁধে দিয়ে ফের নেমে গেল গর্তে।

দু'ঘণ্টা যখন পূর্ণ হল, তখন গর্ত গভীর হয়েছে পাঁচ ফুট। ধনরত্নের চিহ্ন নেই। কপাল মুছে একটু বিরতি দিল লেগ্রাণ্ড। দমে গেছে বুঝলাম। আবার কোদাল তুলে নিয়ে কোপাতে লাগল গর্তের চারদিকে। এবার আর চারফুট ব্যাস নয়—আরও বড় ব্যাসের গর্ত। তুলে ফেলা হলো আরও দু'ফুট মাটি। তা সত্ত্বেও যখন সোনাদানার চিহ্ন দেখা গেল না, তখন সোনা-সন্ধানী বন্ধুটি গর্ত ছেড়ে উঠে এসে কোট চড়িয়ে নিল গায়ে, নীরবে ইঙ্গিত করল জুপিটারকে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে। খুলে দেওয়া হলো কুকুরের মুখের বাঁধন। শুরু হল ফিরে চলা।

দশ পা যেতে না যেতেই আচমকা বিকট চেঁচিয়ে উঠে ধেয়ে গেল

লেগ্রাণ্ড—খামচে ধরল জুপিটারের গলা।

"বল বুড়ো, ঠিক করে বল, বাঁ চোখ তোর কোনটা?"

"আঁ... আঁ... এই তো...এইটা।" বলে জুপিটার চেপে ধরল তার ডান চোখ—এত জোরে চেপে রইল যেন লেগ্রাণ্ড সে চোখ খুবলে না নিতে পারে।

"এইটাই ভেবেছিলাম। চল। ফিরে চল। এখনও খেল খতম হয়নি।"

টলতে টলতে ফিরে এলাম টিউলিপের তলায়।

ভ্যাবাচাকা জুপিটারের গলা খামচে ধরে ফের হেঁকে ওঠে লেগ্রাণ্ড—"খুলির চোখ ছিল কোনদিকে? বাইরের দিকে না ডালের দিকে?"

"বাইরের দিকে মাসা, তাই তো মাংস ঠোকরাতে কাকের সুবিধে হয়েছে।"

"কোন ফুটো দিয়ে গুবরে গলিয়েছিলি?"

"এই ফুটো দিয়ে," বলে ফের নিজের ডান চোখটা চেপে ধরল জুপিটার। সোল্লাসে বললে লেগ্রাণ্ড—"তাহলে তো হয়েই গেল! পেরেক দিয়ে খুলি পোঁতা আছে ডালে—চোখ দুটো আছে বাইরের দিকে। তখন গলিয়েছিলি যে ফুটো দিয়ে, তার পাশের ফুটো দিয়ে গলালে গুবরে এসে ঠেকবে এখানে—"

বলে, প্রথমে যেখানে গুবরে মাটি স্পর্শ করেছিল, সেখান থেকে ইঞ্চি তিনেক পশ্চিমে আর একটা খুঁটি পুঁতল লেগ্রাণ্ড। আগের মতই ফিতে দিয়ে মেপে পঞ্চাশ ফুট দূরে গিয়ে যে বৃত্ত আঁকল—তা প্রথম বৃত্ত আর গর্ত থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে। কোট খুলে রেখে শুরু হলো কোদাল দিয়ে কুপোনো।

এবার কিন্তু গুপ্তধনের রোগসংক্রামিত হয়ে গেল আমার মধ্যেও। তিনজনেই ঝপাঝপ কোদাল মেরে গেলাম। এবার আরও চড়া ব্যাসের গর্ত। ঘণ্টা দেড়েক পরেই ভীষণ চেঁচাতে লাগল কুকুরটা বিরক্ত হয়ে জুপিটার উঠে এসেছিল ওর মুখে বাঁধবার জন্যে। কিন্তু হাত ছাড়িয়ে গর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে আঁচড়ে এই কুকুরই লণ্ঠনের আলোয় এনে ফেলল কয়েকটা হাড়গোড়, দুটো মানুষের কঙ্কাল, ধুলো হয়ে যাওয়া পশম বস্ত্র, আর তিন চারটে সোনার মুদ্রা!

জুপিটার আহ্লাদে ফেটে পড়েছিল এই সব দেখে। কিন্তু নিঃসীম হতাশা ঘনিয়ে এল ওর মনিবের চোখে মুখে। তা সত্ত্বেও যখন বললে কোদাল মেরে যেতে, ঠিক তখনি আমি হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লাম বুটের ডগা একটা মস্ত লোহার আংটায় আটকে যাওয়ায়। আংটাটা আধপোঁতা অবস্থায় মাথা উঁচিয়ে ছিল ঝুরো মাটির মধ্যে থেকে।

এরপর থেকেই মনপ্রাণ দিয়ে কোদালের কোপ মেরে গেলাম তিনজনেই। মিনিট দশেক কাটল নিঃসীম উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে। এ রকম অসহ্য উৎকণ্ঠা জীবনে ভোগ করতে হয়নি। আমাকে। এইটুকু সময়ের মধ্যেই মাটির মধ্যে থেকে উদ্ধার করলাম একটা আয়তাকার কাঠের সিন্দুক। একেবারে আস্ত অবস্থায়। রীতিমত শক্ত কাঠ। খনিজের বিক্রিয়া সত্ত্বেও সিন্দুক অটুট রয়েছে। খুব সম্ভব মার্কারি বাইক্লোরাইড কারিকুরি এঁকে গেছে কাঠের গায়ে। লম্বায় সাড়ে তিন ফুট, চওড়ায় তিন ফুট, আড়াই ফুট উঁচু। ঢালাই লোহার পাটা দিয়ে আগাগোড়া

মোড়া। রুচিসম্মতভাবে পাত মারা হয়েছে—বাহারি নক্সা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাক্সের গায়ে ঠুকে ঠুকে মেরে দেওয়া হয়েছে প্রতিটা লোহার পাত। বাক্সের ওপরের দিকে, দু'পাশে রয়েছে তিনটে করে লোহার আংটা। মোট ছটা। দুজন মানুষ যাতে ধরে তুলতে পারে। আমরা মোটে তিনজন। সমস্ত শক্তি দিয়েও সামান্যই নড়াতে পেরেছিলাম ভারি সিন্দুককে। তবে আমাদের কপাল ভাল। বাক্সর ডালা আঁটা হয়েছিল দু'পাশে মাত্র দুটো হুড়কো দিয়ে—যে হুড়কো ঠেলে দিলে হড়কে সরে যায়। আমরা টেনেমেনে ঠেলেঠুলে খুলে ফেললাম দুটো হুড়কোই। এই সামান্য কাজটুকু করবার সময়েই প্রত্যেকেরই পা থেকে মাথা পর্যন্ত থর থর করে কাঁপছিল অসহ্য উৎকণ্ঠায়। হাঁপাচ্ছিলাম জীবন্ত হাপরের মতন।

আর তারপরেই চোখ ঝলসে গেল তিনজনেরই।

কুবেরের সম্পদ লণ্ঠনের আলোয় ঝকমক করছে সামনেই। এ সম্পদ যে কি বিপুল পরিমাণ, তা হিসেব করে বের করা সাধ্য নেই কারোরই। লণ্ঠন ছিল গর্তের পাড়ে। সেখানে থেকেই ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে গর্তের মধ্যে—ধনভাণ্ডারের ওপর। রাশিরাশি সোনা আর রত্ন লক্ষ রামধনু বিতরণ করছে গর্তের তলদেশ থেকে।

আমরা বিমূঢ় হয়ে শুধু চেয়ে রইলাম। অবিশ্বাস্য এই রত্নস্তূপ থেকে চোখ সরাতে ভুলে গেলাম, চোখের পাতা তার অহর্নিশ কর্তব্যকর্ম বিস্মৃত হলো।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকার সময়ে যে-যে অনুভূতি আমার মনের কন্দরে তুরঙ্গ নৃত্য নেচে চলেছিল তাদের বর্ণনা দেওয়ার ধৃষ্টতা আর দেখাব না। অনুভূতি-টনুভূতিকে স্রেফ দাবিয়ে রেখেছিল বিপুলতম বিস্ময়বোধ। উত্তেজনা দীর্ঘদিন ধরে একনাগাড়ে কুরে কুরে খেয়েছিল লেগ্রাণ্ডকে—তাই বাকশক্তি প্রায় হারিয়ে এসেছিল বললেই চলে—অস্ফুটভাবে কি যে ছাই বলে যাচ্ছিল আপনমনে—তা শুধু যাচ্ছিল ওর নিজেরই কানে। এমতাবস্থায় যে কোনো নিগ্রোর মুখচ্ছবি যে আকার ধারণ করে, জুপিটারের মুখাবয়বে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি : কুচকুচে কালো মুখটা সহসা মড়ার মুখের মতন রক্তহীন হয়ে গেছিল কিরকম, তা যদি ও নিজে আয়নার বুকে দেখত—আঁৎকে উঠে অজ্ঞান হয়ে যেত নিশ্চয়। আচমকা মাথায় বাজ পড়লে মানুষ যেমন থ হয়ে যায়, জুপিটারের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল সেইরকম। বেশ কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকবার পর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে দু'হাতের কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়েছিল ধনরত্নের স্তূপের গভীরে—হেঁট হয়ে বসেছিল চুপ করে—যেন রত্ন অবগাহনে জুড়িয়ে যাচ্ছে ক্লান্ত অবয়ব। তারও অনেকক্ষণ পরে, পাঁজর খালি করে মস্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে গেছিল নিজের মনে :

"হায়! হায়! এ সবই তো সোনা-পোকার দয়া! সোনা দেবতাকে কতই না দূর-ছাই করেছি আমি! আমার মরণ হয় না কেন!"

এইভাবে কাঁহাতক আর রত্নের রোশনাই উপভোগ করা যায়। মনিব আর

ভৃত্য দুজনেই যখন বিহ্বল, তখন আমাকেই উদ্যোগ নিয়ে ধনরত্ন সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে। রাত বাড়ছে। ভোরের আলো ফোটবার আগেই কুবের সম্পদের প্রতিটি কণা তুলে ফেলতে হবে কুটিরের চার দেওয়ালের মধ্যে। কি করা উচিত, এই কথা কাটাকাটিতেই গেল অনেকটা সময়—কারোরই মাথা তো ঠিক ভাবে কাজ করছে না। শেষকালে, সিন্দুকের তিনভাগের দু'ভাগ ধনরত্ন নামিয়ে রাখতেই সিন্দুক অনেক হাল্কা হয়ে গেল—হাল্কা সিন্দুককে টেনে হিঁচড়ে তুলতে পারলাম গর্তের ওপরে। কাঁটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রাখলাম বের করে আনা সোনাদানা; কুকুরটাকে বসিয়ে রাখলাম পাশে; পই পই করে তাকে বলে দিলে লেগ্রাণ্ড আর জুপিটার দুজনেই—এ জায়গা ছেড়ে যেন একদম না নড়ে আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত—চেঁচামেচিও যেন না করে।

আর দেরি করিনি। সিন্দুক বয়ে তিনজনেই রেসের ঘোড়ার মতন পা চালিয়েছিলাম কটেজের দিকে। একেবারে বেদম হয়ে রাত একটা সময়ে পৌঁছেছিলাম কটেজে। এমনই নেতিয়ে পড়েছিলাম যে তক্ষুনি আর কিছু করবার মত অবস্থায় ছিলাম না। এক ঘণ্টা জিরিয়েছিলাম, কিছু খেয়ে নিয়েছিলাম, তারপর খানকয়েক চটের বস্তা নিয়ে ফের রওনা হলাম। কপাল আমাদের ভালই বলতে হবে, নইলে অসময়ে কুটিরের মধ্যে বইয়ের গাদার আনাচে কানাচে অতগুলো অমূল্য বস্তা পেয়ে যাবো কেন। ভোর চারটের একটু আগে পৌঁছোলাম কাঁটাঝোপের কিনারায়। তিনজনে ভাগাভাগি করে নিলাম সোনাদানা হিরে জহরৎ। কুটিরে যখন নির্বিঘ্নে ফিরে এলাম, তখন ঊষার প্রথম আভা পূবের আকাশে সবে উঁকি দিতে শুরু করেছে। গাছের মাথাগুলো একটু একটু প্রদীপ্ত হতে শুরু করেছে।

প্রদীপ্ত হয়েছিল আমাদেরও অন্তরের আকাশ। কিন্তু শরীর আর বইছিল না। এত ধকল কোনো রক্ত মাংসের দেহযন্ত্র সইতে পারে না। কিন্তু নিদারুণ উত্তেজনায় মাত্র ঘণ্টা তিন চারের বেশি কেউ ঘুমোতে পারিনি। ঘুম ভাঙার ঐকতানের সুর আর সময় যেন আগেই বাঁধা ছিল। তাই একই সময়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম তিন মূর্তিমান।

এবার গুণে গেঁথে দেখতে হবে একরাতে রোজগার করলাম কত ধনরত্ন।

কানায় কানায় ভর্তি ছিল সিন্দুক। সারা দিন তো গেলই, রাতেরও বেশির ভাগ গেল হিরে মানিক সোনাকে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে। কিছুই তো সাজানো গোছানো অবস্থায় ছিল না —তাগাড় করে শুধু ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল সিন্দুকের গর্ভে। ডেলা-সোনা আর গয়না-সোনা, হিরে আর মুক্তো—সব মিলেমিশে গায়ে গা লাগিয়ে গর্তের তলায় সিন্দুকের অন্ধকারে পড়েছিল বছরের পর বছর। আমরা তাদের প্রত্যেকের আলাদা স্তূপ রচনা করলাম। এইটা করবার পর বুঝলাম, আগে যা ভেবেছিলাম তার চাইতেও অনেক বেশি সম্পদের মালিকানা এসে গেছে আমাদের মুঠোর মধ্যে। চার লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার ডলারের শুধু মুদ্রাই রইল একটা স্তূপে। ওই সময়ে প্রতিটি মুদ্রার দাম ডলারের হিসেবে কত হতে পারে, তা

চার্ট দেখে দেখে মোটামুটি হিসেব করে বের করতে পেরেছিলাম। রুপোর টাকা একটাও পাইনি। সবই মোহর। খুবই প্রাচীন। অনেক দেশের। ফ্রান্সের, স্পেনের, জার্মানীর, ইংল্যাণ্ডের। খানকয়েক মুদ্রা একেবারেই অন্য ধরনের—কোন দেশে চালু ছিল, তা আঁচ করতে পারলাম না কিছুতেই। কিছু সোনার মুদ্রা রীতিমত পুরু আর ভারি—দুদিকই ক্ষয়ে গেছে; ফলে, সাল তারিখ তো দূরের কথা, কোন দেশের টাকশালে তাদের উৎপাদন—তাও জানতে পারিনি। মার্কিন মুদ্রা পাইনি একটাও।

রত্নদের দামের হিসেব কষতে গিয়ে কালঘাম ছুটে গেছিল। হিরেই পেয়েছিলাম একশ দশটা; খান কয়েক হিরে রীতিমত পেল্লায় আর অত্যন্ত ভাল জাতের; ছোট হিরে পাইনি একটাও। প'দ্মরাগমণি পেয়েছিলাম আঠারোটা—অসাধারণ তাদের ঝিকমিকিনি। অতীব সুন্দর পান্না পেয়েছিলাম তিনশ দশটা—কোনোটাই কম সুন্দব নয়। নীলকান্ত মণি পেয়েছিলাম একুশটা—একটা ওপ্যাল মণি।

দামিদামি এই সব পাথরই এক সময়ে জড়োয়া গয়নায় সেট করা ছিল। তা থেকে ভেঙে বের করে আনা হয়েছে। ছুঁড়ে ফেলে রাখা হয়েছে সিন্দুকের গর্ভে। সোনার গয়না থেকে রত্নদের ছাড়িয়ে নেওয়ার পর প্রতিটি স্বর্ণালঙ্কার হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিণ্ডি পাকানো হয়েছে—যাতে গয়নাদের চেহারা দেখে বিন্দুমাত্র শনাক্ত করা না যায়।

পেটাই গয়না ছাড়াও আস্ত আর নিরেট সোনার গয়না পেয়েছিলাম অনেক : প্রায় দু-শটা প্রকাণ্ড আংটি—আঙুলের আর কানের; তিরিশটা ভারি সোনার চেন; তিরাশিটা খুব বড় সাইজের আর বিপুল ওজনের ক্রুসিফিক্স; পাঁচটা অত্যন্ত মূল্যবান সোনার ধুনুচি; বিরাট আকারের একটা পানপাত্র—সারা গায়ে আঙুর লতা আর সুন্দরী নারীমূর্তির অপূর্ব কারুকাজ; আশ্চর্য সুন্দর দুটো তরবারি-হাতল—খোদাই কর্ম দেখবার মত; এ ছাড়াও ছিল ছোটখাট অজস্র সোনার জিনিস—সব মনে নেই।

অ্যাভারডিউপয়েজ পাউণ্ডে ষোল আউন্স দাঁড়ায়। এই যে এত সোনার হিসেব লিখে গেলাম, এদের মোট ওজন দাঁড়িয়েছিল সাড়ে তিনশ অ্যাভারডিউপয়েজ পাউণ্ডেরও বেশি। এ হিসেবে কিন্তু একশ সাতানব্বইটা অপরূপ সোনার ঘড়ির ওজন ঢোকাইনি; এদের মধ্যে তিনটে ঘড়ি এতবড় যে প্রতিটার দাম হবে কম করেও পাঁচশ ডলার। বেশির ভাগই মান্ধাতার আমলের—সময়ের হিসেব রাখার যন্ত্র হিসেবে একেবারেই অচল; যন্ত্রপাতি ক্ষয়ে যাওয়ায় বিকল প্রত্যেকেই—কিন্তু প্রতিটির মধ্যে ঠাসা রয়েছে দামি দামি রত্ন—সেইদিক দিয়ে তারা অমূল্য।

সেই রাতেই সিন্দুকে পাওয়া সমস্ত সোনাদানার দাম বের করেছিলাম। দেখলাম, একরাতেই মাটির তলা থেকে উঠে এসেছে পনেরো লক্ষ ডলারের সম্পদ। খানকয়েক মণিবসানো ট্রিংকেট গয়না আর রত্ন নিজেদের জন্যে

রেখেছিলাম, তাতেই বুঝেছিলাম সম্পদের হিসেব করেছি অনেক কম। আসল দাম পনেরো লক্ষ ডলারেরও অনেক বেশি।

দাম যাচাই পর্ব শেষ হওয়ার পর একেবারেই হেদিয়ে পড়েছিলাম তিনজনেই। উত্তেজনাও শেষ করে এনেছিল ভেতরে ভেতরে। আমি কিন্তু নেতিয়ে পড়েও খাড়া হয়ে বসেছিলাম লেগ্রাণ্ডের মুখে অসাধারণ এই রত্ন-প্রহেলিকা উদ্ধারের কাহিনী সমগ্র শোনবার প্রত্যাশায়। লেগ্রাণ্ড আমাকে হতাশ করেনি, পাটে পাটে ভেঙে ধরেছিল আশ্চর্য ধাঁধার অত্যাশ্চর্য সমাধান সমাচার।

বলেছিল—"মনে পড়ে সেই রাতের ঘটনা? কাগজে গুবরের খসড়া ছবি এঁকে তুলে দিয়েছিলাম তোমার হাতে। তুমি বলেছিলে, গুবরে কই? এতো মড়ার মুখোশ! খুব খারাপ লেগেছিল তোমার কথা। প্রথমে ভেবেছিলাম রঙ্গ করছো। তারপর নিজেই ভেবে দেখলাম, পোকার মাথায় কালো ফুটকি দুটো যেভাবে রয়েছে, তাতে ছবিটাকে মড়ার মুখোশ মনে হতেও পারে। সুতরাং তোমার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু আমার ছবি আঁকার কৃতিত্ব নিয়ে টিটকিরি দেওয়ায় হাড়-পিত্তি জ্বলে গেছিল। কারণ আমি জানি আমি ভাল আঁকি। শিল্পসত্তা নিয়ে শিল্পীকে খোঁটা দিলে সে সহ্য করতে পারে না। মনে কষ্ট পায়। তাই তোমার হাত থেকে পার্চমেন্টটা ছিনিয়ে নিয়ে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে পুড়িয়ে দিতে গেছিলাম আগুনের শিখায়।"

"পার্চমেন্ট নয়—বলো কাগজের সেই টুকরোটা," বললাম আমি।

"নাহে, ওটা পার্চমেন্ট। প্রথমে দেখলে মনে হয় বটে মামুলি কাগজ। বাজে কাগজ। কিন্তু যেই স্কেচ আঁকতে বসেছিলাম, তখনি বুঝেছিলাম, সাধারণ কাগজ নয়—খুব পাতলা পার্চমেন্টের ওপর চলছে আমার কলম। ধুলোময়লা লাগায় নোংরা অবস্থায় ছিল বলে প্রথম নজরে তা মনে হয় না—নোংরা চেহারা তুমি নিজেও দেখেছো। রাগে কষ্টে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার ঠিক আগেই আমার চোখ পড়েছিল সেই স্কেচে—যে স্কেচ দেখে তুমি ব্যঙ্গ করেছিলে আমার শিল্পী সত্তাকে। মনে আছে কি রকম অবাক হয়ে গেছিলাম? কারণ, আমি দেখেছিলাম—একটা মড়ার মুখোশ আঁকা রয়েছে ঠিক সেইখানে যেখানে একটু আগেই আমি এঁকেছি সোনা-গুবরেকে। ভয়ানক অবাক হয়ে গেছিলাম বলেই কিছুক্ষণ চুলচেরা চিন্তা করবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছিলাম। একদৃষ্টে তাকিয়েছিলাম বলেই বুঝতে পারছিলাম, আমার আঁকা ছবি চোখে দেখা এই ছবির মতো নয়, হুবহু খুঁটিনাটিতে তফাৎ রয়েছে অবশ্যই। তা সত্ত্বেও কিন্তু ছাঁদ আর আউটলাইনে সাদৃশ্য রয়েছে বিলক্ষণ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাতেই একটা মোমবাতি তুলে নিয়েছিলাম। ঘরের কোণে গিয়ে টেবিলে বসে আরও কাছ থেকে দেখছিলাম পার্চমেন্টকে। উল্টে দেখতেই চোখে পড়েছিল আমারই হাতে আঁকা গুবরের স্কেচ। ঠিক যেভাবে এঁকেছি, সেইভাবে। যে শুঁড় দেখতে না পেয়ে তুমি টিটকিরি মেরেছিলে, সে শুঁড়ও রয়েছে স্কেচে।

"আউটলাইনের এ হেন অসাধারণ সাদৃশ্য দেখে প্রথমটা বিস্ময়ে বোবা হয়ে

কাকতালীয়র ঘটনা আমার জীবনে কখনো ঘটেনি। আমার আঁকা স্কেচের ঠিক পেছনে—পার্চমেন্টের উল্টো দিকে রয়েছে একটা মড়ার খুলি—রয়েছে আমার আঁকা গুবরের ঠিক নিচে—শুধু আউটলাইনই মিলে যাচ্ছে না, দুটোর সাইজ পর্যন্ত হুবহু এক! আমার স্কেচ যেন আঁকা খুলির লাইনে লাইন মিলিয়ে রয়েছে!

"কাকতালীয়র এবম্বিধ অত্যাশ্চর্য সংঘটন প্রত্যক্ষ করে স্থাণু হয়ে গেছিলাম আমি—বিলকুল অবশ হয়ে গেছিল আমার সুস্থ মস্তিষ্কের প্রতিটা কোষ—তাই তোমার মনে হয়েছিল বুঝি অসুস্থ হয়েছে আমার মস্তিষ্ক।

"এইরকমটাই হয় অসাধারণ কাকতালীয় আচমকা ঘটে গেলে। মন প্রাণপণে চেষ্টা করে যায় কোথাও একটা সম্পর্কসূত্র বের করার—কার্য আর কারণের মধ্যে যোগাযোগ আবিষ্কারের ধস্তাধস্তিতে হেদিয়ে পড়ে মন—সাময়িক পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে মগজের সমস্ত স্নায়ু।

"স্পষ্ট মনে পড়ল, গুবরের স্কেচ যখন এঁকেছিলাম তখন ও-পিঠে কোনো কিছুই আঁকা ছিল না—বিলকুল সাদা—মড়ার মাথা তো ছিলই না। থাকলে আমার চোখে পড়তই। কেন না, স্কেচ আঁকবার আগে কাগজটাকে উল্টেপাল্টে দেখে নিয়েছিলাম। খুঁজছিলাম সবচেয়ে কম নোংরা আছে কোনদিকে। মড়ার খুলি যদি আঁকা থাকত, চোখে আমার পড়তই।

"নিগূঢ় এই রহস্যের সমাধান অসম্ভব বলেই মনে হয়েছিল সেই মুহূর্তে। অথচ, অমন রহস্য-কুয়াশার মধ্যেই একটা ক্ষীণ দ্যুতি টিমটিম করে উঠেছিল আমার বুদ্ধিমত্তার গহনতম আর গোপনতম কন্দরে—জোনাকির মতন দূরায়ত এই দ্যুতি যে বিরাট সত্যকে আমার মনের আঙিনায় এনে ফেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল তখন থেকেই—কাল রাতের অ্যাডভেঞ্চারে পেলে তার চমকপ্রদ চাক্ষুষ প্রমাণ।

"মনের এই দ্বন্দ্ব নিয়েই অবশেষে পার্চমেন্টকে সযত্নে রেখে দিলাম টেবিলের টানায়—যতক্ষণ একা না হচ্ছি, ততক্ষণ এ প্রসঙ্গে আর মাথায় ঠাঁই দেব না ঠিক করলাম।

"তুমি চলে যাওয়ার পর মড়ার মত ঘুমিয়ে পড়ল জুপিটার। রহস্যজনক ব্যাপারটাকে নিয়ে পদ্ধতিমাফিক তদন্ত শুরু করলাম তখনি। প্রথমেই ভাবতে বসলাম একটাই ব্যাপার। পার্চমেন্টটা আমার হাতে এল কি করে?

"গুবরেকে আবিষ্কার করেছিলাম মূল ভূখণ্ডের সমুদ্র-সৈকতে, দ্বীপ থেকে প্রায় এক মাইল পুবদিকে। জোয়ারের জল যেখানে সব চাইতে ঠেলে উঠে জলের দাগ রেখে যায়, সেই দাগ থেকে একটু ওপর দিকে। খামচে ধরেছিলাম দেখামাত্র, সঙ্গে সঙ্গে কামড় বসিয়েছিল হাতে। পোকার কামড় যে এত জোর হবে, তা ভাবিনি। তাই চমকে উঠে গুবরেকে ফেলে দিয়েছিলাম বালির ওপরেই। জুপিটার এ সব ব্যাপারে বরাবর হুঁশিয়ার। মাটিতে আছড়ে পড়েই যদিও গুবরে উঠে গেছিল ওর দিকেই—ও কিন্তু তাকে খপ্ করে ধরতে যায়নি। এদিক ওদিক

তাকাচ্ছিল গাছের পাতার মতন কিছু একটার খোঁজে—যা দিয়ে পাকড়ে ধরবে গুবরেকে।

"একই সঙ্গে আমার আর জুপিটারের চোখ পড়েছিল পার্চমেন্টটার ওপর। তখন ভেবেছিলাম বাজে কাগজের টুকরো। আধপোঁতা অবস্থায় বালির মধ্যে একটা কোণা উঁচিয়ে রয়েছে ওপর দিকে। কাগজ যেখানে রয়েছে, সেখানেই দেখতে পেলাম আর একটা জিনিস। নৌকোর গলুইয়ের একটা ধ্বংসাবশেষ। এরকম গলুই থাকে কাঠের জাহাজের লম্বা নৌকোয়। নিশ্চয় অনেক··· অনেক বছর ধরে ধস্যাপচা এই কাঠের টুকরো পড়ে রয়েছে সেখানে—চেহারা এমনভাবে পালটে গেছে যে তার সঙ্গে নৌকোর গলুইয়ের কোনো সাদৃশ্য আবিষ্কার করা চট করে সম্ভব নয়।

"জুপিটার পার্চমেন্ট তুলে নিয়েছিল। গুবরেকে তাই দিয়ে মুড়ে ধরে আমাকে দিয়েছিল। বাড়ি ফেরার পথে দেখা হয়ে গেল লেফটেন্যান্ট জি-এর সঙ্গে। তাঁকে দেখালাম সোনা-গুবরে। উনি ছিনেজোঁকের মতো লেগে রইলেন—অদ্ভুত সুন্দর কাঞ্চন-কীটকে কেল্লায় নিয়ে যাবেনই। রাজি না হয়ে পারলাম না। তক্ষুণি উনি গুবরে চালান করে দিলেন নিজের মেরজাই-এর পকেটে—পার্চমেন্ট রয়ে গেল আমার হাতে। প্রাকৃতিক ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা আর গবেষণা ওঁর কাছে নেশার সামিল। বিরল কীট দেখেই তাই হাতে নিয়ে এমনভাবে দেখছিলেন—যেন পোকা নয়, সাগর ছেঁচা মাণিক। হাতছাড়া করছিলেন না কিছুতেই পাছে আমি না দিতে চাই। শুধু পার্চমেন্ট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম সেই কারণেই। আমার সম্মতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুবরে ঢোকালেন পকেটে। আমিও একথা সেকথায় তন্ময় হয়ে রইলাম পার্চমেন্ট হাতে করেই—কখন যে তাকে পকেটে পুরে ফেলেছি, তা নিজেরই মনে নেই।

"টেবিলে বসে গুবরের ছবি আঁকতে গিয়ে কাগজ খুঁজেছিলাম টেবিলের টানায়—পাইনি। টেবিলের ওপরে থাকার কথা—সেখানেও নেই। পকেটে হয়তো পুরোনো চিঠি-ফিঠি থাকতে পারে, এই আশায় পকেটে হাত পুরতেই হাতে ঠেকেছিল পার্চমেন্ট। কিভাবে অসাধারণ এই পার্চমেন্ট এসেছিল আমারই হাতে মুঠোয়—পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করে গেলাম। অদৃশ্য এক অদ্ভুত শক্তি যে আমাকেই জড়িয়েছে এ ব্যাপারে—এ ঘটনা তার প্রমাণ।

"কি ভাবছো? উদ্ভট কল্পনায় মেতেছি? আমি কিন্তু একটা 'সংযোগসূত্র' আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম এইসব ভাবতে ভাবতেই। দুটো শেকল বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল—মনে হচ্ছিল; আমি দুটোকে জুড়ে দিলাম সংযোগ-আংটা দিয়ে। এখন তারা একটাই শেকল। সমুদ্র-সৈকতে পড়েছিল একটা নৌকো—এই নৌকার কাছেই ছিল একটা পার্চমেন্ট—'কাগজ নয়'—মড়ার খুলি আঁকা পার্চমেন্ট। এই পর্যন্ত শুনেই নিশ্চয় বলবে, 'আরে গেল যা! সংযোগ-সূত্রটা কোথায়?' আমার জবাব এইঃ মড়ার খুলি যে বোম্বেটেদের প্রতীক, তা বিশ্বশুদ্ধ মানুষ জানে। শত্রু অথবা মিত্রর মুখোমুখি হওয়ার আগে বোম্বেটে জাহাজে

উড়িয়ে দেওয়া হত মড়ার খুলি আঁকা কালো পতাকা।

"বালির মধ্যে থেকে পাওয়া কাগজের টুকরোটা যে কাগজ নয়, পার্চমেন্ট, তা কিন্তু বলা হয়ে গেছে। পার্চমেন্ট টেঁকসই হয়- —বয়সের ভারে জীর্ণ হয়ে ধুলো হয়ে যায় না বললেই চলে। অর্থাৎ প্রায় অমর আর অক্ষয়। ছোটখাট বিষয় কদাচিৎ লেখা হয় পার্চমেন্টে। ছবি অথবা লেখার মত মামুলি ব্যাপারে কাগজে যতটা সুবিধে হয়, পার্চমেন্টে ততটা হয় না। এই ব্যাপারটা জানা থাকলেই আঁচ করা যায় মড়ার খুলি কেন আঁকা হয়েছিল পার্চমেন্টে। পার্চমেন্টের আকারটা কি রকম, সে ব্যাপারেও মাথা ঘামিয়েছি গোড়া থেকে। যে কোনো কারণেই হোক একটা কোণ যদিও নষ্ট হয়ে গেছে, তবুও চেহারা দেখে বোঝা যায় আদতে পার্চমেন্টটা ছিল আয়ত আকারের। স্মারক-লিপি লেখবার সময়ে এই আকারের কাগজেই লেখা হয়—এমন কিছু নথিভুক্ত করার কাজে ঠিক এই আকাব দরকার যে বিষয়টা বহু বছর ধরে মনে রাখার প্রয়োজন আছে—আর সেই কারণেই আয়তাকার কাগজকে গুটিয়ে সযত্নে রেখে দেওয়া যায়।"

আমি বললাম—"তুমি কিন্তু নিজেই একটু আগে বললে, গুবরের ছবি আঁকতে বসে পার্চমেন্টের কোনোদিকেই মড়ার খুলির ছবি তুমি দেখতে পাওনি। তাহলে নৌকো আর খুলির মধ্যে সম্পর্ক সূত্র আঁচ করে নিচ্ছ কি ভাবে? তোমার কথাতেই তো জানা যাচ্ছে খুলি আঁকা হয়েছিল গুবরে আঁকার অনেক আগে—কে এঁকেছিল তা শুধু ঈশ্বর জানেন আর যে এঁকেছিল সে নিজে জানে।"

"এই তো আন্দাজ করে ফেললে! গোটা রহস্যটাই রয়েছে ঠিক এইখানে। এ রহস্যর সমাধান করতে পারিনি অবশ্য সেই মুহূর্তে। ধাপেধাপে যুক্তির সোপান বেয়ে এগিয়ে পৌঁছেছিলাম একটা সিদ্ধান্তে। এবার বলি যুক্তিগুলোকে পর-পর সাজিয়েছিলাম কি ভাবে ঃ গুবরের ছবি যখন এঁকেছিলাম, তখন পার্চমেন্টে খুলির ছবি ছিল না। ছবি আঁকা শেষ করে পার্চমেন্ট দিয়েছিলাম তোমাকে। তুমি আমার আঁকা ছবি দেখেছিলে বেশ মন দিয়ে তারপর ফিরিয়ে দিয়েছিলে আমাকে। তুমি তাহলে আঁকোনি খুলির ছবি। ওই সময়ে হাজির ছিলাম তিনজনে—তিনজনের কেউই আঁকিনি। তাহলে মানুষের হাত আঁকেনি মড়ার খুলি। তা সত্ত্বেও দেখা গেল খুলি আঁকা হয়ে গেছে পার্চমেন্টে।

"এই অলৌকিক আর আপাততঃ করাল ঘটনা যখন ঘটেছিল তখনকার প্রতিটি ছোট ঘটনাও মনের মধ্যে পর-পর সাজাতে হয়েছিল এরপর। বোম্বেটেদের মড়ার খুলি চোখের সামনে হঠাৎ উড়িয়ে দেওয়া মানেই নিজেই যে এবার মড়ার খুলি হতে যাচ্ছি, তাতে সন্দেহ নেই। এইরকমই ঘটত আগে। এক্ষেত্রে করাল খুলি আচমকা জেগে উঠল সোনা-গুবরের পেছনে: অলৌকিক ব্যাপারই যদি হয়, তাহলে কি আমাদের মৃত্যু আসন্ন, এই করাল গুবরেকে বন্দী করে রেখেছিল বলে?

"ছোট ছোট ঘটনাগুলো একটু একটু করে মনে করে মাথার খাতায় সাজিয়ে গেলাম পর-পর। হাঁড় কাঁপানো ঠাণ্ডা পড়েছিল সে রাতে—ঠিক সেই সময়ে।

খুব বিরল ঘটনা, অথচ খুবই সুখের [illegible]
জ্বলছিল কাঠের গুঁড়ি। এতখানি পথ [illegible]
ফেলেছিলাম—তাই আমি বসেছিলাম আগুন থেকে তফাতে টেবিলের কাছে। তুমি কিন্তু ঠাণ্ডায় কাঁপছিলে বলে চেয়ার টেনে নিয়েছিলে চিমনির ধারে। পার্চমেন্ট তোমার হাতে দিয়েছি, তুমিও তা দেখতে যাচ্ছো, এমন সময়ে আমার নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুরটা ঘরে ঢুকেই ঝাঁপিয় পড়ল তোমার ঘাড়ের ওপর। বাঁ হাত দিয়ে তুমি তাকে আদর জানিয়ে গেলে, তাকে একটু তফাতে রাখার চেষ্টা করলে, ডান হাতে রইল কিন্তু পার্চমেন্ট—যে হাত শিথিলভাবে পড়েছিল তোমার দু'হাঁটুর ফাঁকে—আগুনের ধার ঘেঁষে। ভয় হলো পার্চমেণ্টে এই বুঝি আগুন লেগে যাবে। হুঁশিয়ার করার জন্যে চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময়ে তুমি নিজেই পার্চমেন্ট সরিয়ে নিলে লকলকে শিখার পাশ থেকে। চেয়ারে বসে ছবি দেখা শুরু করলে।

"ছোট্ট ছোট্ট এই ঘটনা পরম্পরা যখন লাইন দেওয়া ছবির মতই মাথার মধ্যে দিয়ে সরে সরে চলে গেল, তখনই বুঝলাম আসল ঘটনাটা কি ঘটেছে।

"আগুনের আঁচ পার্চমেণ্টের বুকে আঁকা অদৃশ্য মড়ার খুলিকে দৃশ্যমান করে তুলেছে।

"তুমি তো জানোই, এমন অনেক রাসায়নিক আছে যা দিয়ে পার্চমেণ্ট বা বাছুরের চামড়ার ওপর কিছু লিখলে বা আঁকলে তা অদৃশ্যই থেকে যায়—ফুটে ওঠে শুধু আগুনের আঁচে। বালি মেশানো কোবাল্টকে সেঁকলে যে কোবাল্ট অক্সাইড পাওয়া যায়, সেই জিনিস যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণে ফোটানো যায়, তারপর তাতে চার গুণ জল মেশানো হয়, তাহলে অদৃশ্য কালি বানানো যায়। সবুজ রঙের লেখা হয় এই কালি দিয়ে। কোবাল্ট-অ্যান্টিমনি সোরা-সুরায় গুলে নিলে লেখার রঙ হবে লাল। ঠাণ্ডায় রেখে দিলে সঙ্গে সঙ্গে অথবা অনেক সময় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় লেখা—তাপ দিলেই ফের ফুটে ওঠে।

"এবার পড়লাম মড়ার খুলি নিয়ে। বাছুরের চামড়ার কিনারার কাছাকাছি গেছে মড়ার খুলির যে সব বাইরের লাইন, সেই লাইনগুলো অন্য লাইনদের চেয়ে বেশি স্পষ্ট। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আগুনের তাপ সব জায়গায় সমানভাবে পড়েনি বলেই সমান কাজ করতে পারেনি।

"সঙ্গে সঙ্গে একটা আগুন জ্বালালাম। গনগনে আগুনের আঁচে সেঁকে নিলাম পার্চমেন্টের প্রতিটা অংশ। প্রথমদিকে দেখা গেল একটাই প্রতিক্রিয়া ঃ খুলিতে যে কটা লাইন খুব অস্পষ্ট ছিল—সেগুলো স্পষ্টতর হয়ে উঠল, এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যাবার পর কিন্তু দেখা গেল মড়ার খুলি কাগজের যে কোণে আঁকা হয়েছে, কোণাকুণিভাবে ঠিক তার উল্টোদিকের কোণে আঁকা রয়েছে একটা ছাগল; প্রথমে তাকে ছাগল বলেই মনে হয়েছিল। আরও খুঁটিয়ে দেখবার পর ভুল ভেঙে গেল; ছাগল নয়—যা দেখছি, তা একটা ছাগলছানা।"

"হা! হা!" বললাম আমি—"হাসবার অধিকার আমার নেই যদিও—তবুও না হেসে পারছি না। দেড় লাখ ডলার দামের এই ফূর্তি একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু তুমি কি তোমার যুক্তির শেকলে তিন নম্বর সংযোগ-আংটা লাগাতে যাচ্ছো? বোম্বেটেদের সঙ্গে ছাগলের কি সম্পর্ক? কোনো সম্পর্কই নেই। বোম্বেটেরা ছাগল নিয়ে মাথা ঘামায় না—ঘামায় শুধু চাষীভাইরা।"

"ছবিটা যে ছাগলের নয়—এইমাত্র তা বললাম।"

"ছাগল ছানার, এই তো? দুটোই একই প্রাণি।"

"একই প্রাণি হতে পারে—কিন্তু একই প্রতীক নয়।"

"কি বলতে চাও?

"Captain kidd-এর নাম শোনোনি?"

"বোম্বেটে ক্যাপ্টেন কিড?"

"ইংরেজি 'কিড' মানে ছাগল ছানা। ক্যাপ্টেন কিড-এর নামের উচ্চারণের সঙ্গে ধ্বনিগত সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্যে অথবা তাঁর নামের সাঙ্কেতিক চিত্রলেখ স্বাক্ষর হিসেবে ছাগলছানা আঁকা হয়েছে, এ বিষয়ে আর তিলমাত্র সন্দেহ রইল না আমার মনের মধ্যে।"

"সাঙ্কেতিক চিত্রলেখ স্বাক্ষর?"

"সোজা কথায়, ক্যাপ্টেন কিড সই করেছেন ছাগলছানা এঁকে— কারণ তাঁর নামের মানে তাই। বাছুরের চামড়ার যে কোণে রয়েছে ছাগলছানার ছবি, সে জায়গাটা সই করারই জায়গা। ওপরের বাঁ কোণে রয়েছে মড়ার খুলি। চিঠির কাগজে যেমন সীলমোহর বা ছাপ থাকে—ঠিক তাই। তাহলে মাঝে নিশ্চয় একটা বয়ান আছে। অনেক কিছু লিখে তবেই তো সই দিয়েছেন খুনে বোম্বেটে। কিন্তু কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। বিলকুল সাদা রয়েছে বাছুরের চামড়ার মাঝের জায়গাটা। আমার মাথার পোকা নড়ে উঠল তক্ষুণি। যেভাবেই হোক আবিষ্কার করতে হবে চিঠির অথবা দলিলের আসল বয়ান।"

আমি বললাম—"সীলমোহর আর সইয়ের মাঝে লেখা ক্যাপ্টেন কিডের চিঠি!"

"প্রায় তাই। মোদ্দা কথা এই, আমার সমস্ত সত্তার মধ্যে উপলব্ধি করলাম একটা প্রচণ্ড তাড়না। এই তাড়না, অথবা এই আবেগ,অথবা এই গভীর উপলব্ধিকে দমন করে রাখার কোনো শক্তি আমার মধ্যে ছিল না। আমার অণু-পরমাণু মুহুর্মুহু গর্জে উঠে যেন বলে যেতে লাগল আমারই সত্তার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে—'ওহে, অকল্পনীয় এক বৈভব হাতছানি দিচ্ছে তোমাকে। তুমি আর তিষ্ঠ অবস্থায় থেকো না—অগ্রসর হও।' কেন যে আচমকা এই উম্মাদনা আমাকে অন্তরের অন্তরতম কেন্দ্র থেকে অস্থির করে তুললো, তা তোমাকে ভাষা দিয়ে বোঝাতে পারবো না। একে নিছক ইচ্ছা বললে কম বলা হবে—একটা পরম বিশ্বাস সহসা আমাকে এমনই আকুল করে তুলল যে আমি আর একটা মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারলাম না। আর এই ঘটনা পরম্পরাটা ঠিক সময় বুঝেই

ঘটেছে—একদিন আগে পিছে ঘটলে এমনটা হত না। জুপিটারের বোকার মত মন্তব্যটা মনে পড়ে? গুবরে নাকি খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি! আমার কল্পনাকে আরও উদ্দাম করে তুলেছিল ওর নির্বোধ উক্তি। ঘটনা আর কাকতালীয়গুলো পরের পর ঘটে গেছিল এমন একটা বিশেষ দিনে, যেদিন হাড়ের ভেতর পর্যন্ত ঠকঠকিয়ে কেঁপে চলেছিল নিদারুণ শীতে—যদি তা না হত...যদি হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা না পড়তো...তাহলে তো আগুন জ্বালানোর দরকার পড়ত না...আগুনের আঁচও পাওয়া যেত না... অদৃশ্য লেখাও ফুটে উঠত না! অদৃশ্য করোটিকে দৃশ্যমান করার জন্যেই যেন ইতর সারমেয় তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তোমাকে মেঝেতে কুপোকাৎ করে ফেলেছিল এমনভাবে যাতে রহস্যময় পার্চমেন্ট কিছুক্ষণের জন্যে থাকে আগুনের লকলকে শিখার গা ঘেঁষে।... কনকনে ঐ শীতের দিনেই বালির মধ্যে পেলাম পার্চমেন্ট আর অদ্ভুত গুবরে....যদি না পেতাম? যদি না সেদিন ঠাণ্ডা পড়ত? মড়ার খুলিকে দেখতেও পেতাম না....বোম্বেটের ঐশ্বর্য মাটির কারাগারে রয়ে যেত!"

"লেগ্রাণ্ড—আমার ধৈর্য ফুরিয়েছে। এবার শুরু করো।"

"আটলান্টিকের উপকূলের কোনো এক জায়গায় বিস্তর টাকাকড়ি পোঁতা আছে, এরকম গল্প নিশ্চয় তুমিও শুনেছো। এই কাহিনী ডালপালা মেলে ছড়িয়ে গিয়ে কয়েক হাজার অস্পষ্ট গুজব সৃষ্টি করে ফেলেছে। ক্যাপ্টেন কিড আর তাঁর গুণধর সাঙ্গপাঙ্গ নাকি সারাজীবনের উঞ্ছবৃত্তির উপার্জন এইভাবেই ধরণীর কোলে সঁপে দিয়ে নিজেরাও ঠাঁই নিয়েছে ধরণীর কোলে। বন্ধু হে, যা রটে, তার কিছু তো বটে। সব গুজবেরই একটা বীজ থাকে। হাজার হাজার রোমাঞ্চকর গুজবও অকারণে নিশ্চয় জন্ম নেয় নি। এতবছর ধরে এতগুলো গুজব যখন পুরোদমে নিজেদের টিকিয়ে রেখেছে, এবং এখনও তাদের শোনা যাচ্ছে—তাহলে তো ধরে নিতেই হয়—গুপ্তধন এখনও গুপ্তই হয়ে গেছে—কারও হাতে পড়েনি। যদি কেউ পেয়ে যেত সেই গুপ্তসম্পদ—গুজবগুলোর কণ্ঠরোধ ঘটে যেত তৎক্ষণাৎ। গুজব এমনি জিনিস—যখন রটে, মহাবেগে রটে; যখন মরে আচমকাই মরে যায়। ক্যাপ্টেন কিড নিজেও যদি নিজের পোঁতা গুপ্তধন পরে তুলে নিতেন—গুজবগুলো অন্য চেহারা নিত। যে চেহারায় আশ্চর্য এই গুজব কানে আসছে, সেই চেহারাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখবে—সবই টাকা-যারা-খুঁজছে, তাদের সম্পর্কে; টাকা-যারা-পেয়েছে—তাদের নিয়ে কোনো গুজব নেই; অর্থাৎ টাকা এখনও কেউ পায়নি। গুপ্তধনের নকশা নিশ্চয় কোনো এক দুর্বিপাকের দরুন ক্যাপ্টেন কিডের হাতছাড়া হয়েছিল; যে কোনো কারণেই হোক কিড নিজে আর সেই গুপ্তধনকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনবার সুযোগ পাননি। তাঁর চ্যালাচামুণ্ডারা কিন্তু জানত—গুপ্তধন আছে আটলান্টিক উপকূলের কোনো এক জায়গায়। নকশা নিখোঁজ হওয়াও তারাও তা উদ্ধার করতে পারেনি। তাই মুখে মুখে যুগ যুগ ধরে গুজব জ্যান্ত হয়ে থেকেছে। আটলান্টিকের উপকূলে মস্ত এক সম্পদ

পাওয়া গেছে মাটির তলা থেকে—এমন কোনো খবর কি তোমার কানে এসেছে?"

"মোটেই না।"

"অথচ সবাই জানে, কিড যা জমিয়ে গেছেন নরহত্যা করে আর জাহাজ ডুবিয়ে—তা গুণে গেঁথে শেষ করা যায় না। সেই কারণেই আমার মন বললে, বিপুল সেই ঐশ্বর্যকে ধরণী এখনো সযত্নে লুকিয়ে রেখেছেন নিজের কোলে। প্রিয় বন্ধু, অত্যাশ্চর্য ভাবে পাওয়া এই পার্চমেন্টই সেই অতুলনীয় গুপ্তধনের ঠিকানা। অত অবাক হয়ো না—খাঁটি কথাই বলছি। দুর্ঘটনায় ভেঙে পড়া নৌকো থেকে ঠিকরে পড়েছিল গুপ্তধনের নকশা—বালির তলায় চাপা পড়েছিল এত বছর—আমার কপালে তা নাচছে বলেই গুবরের কামড় খেয়েছি—গুবরের কামড় না খেলে গাছের পাতা বা কাগজের খোঁজ করতাম না—নকশা মাড়িয়ে চলে যেতাম অন্য কোথাও!"

"লেগ্রাণ্ড, বাছুরের চামড়া থেকে ঠিকানা পেলে কি করে, এবার তা বলবে?"

"বলব, বন্ধু, বলব। একটু ধৈর্য ধরো। আগুনে আরও কাঠ ঠেসে দিলাম। আঁচ আরও বাড়লো। বাছুরের চামড়াকে আরও ভাল করে সেঁকে নিলাম। কিন্তু আর কোনো লেখাই ফুটলো না। তখন মনে হল, ধুলোর স্তর জমে গেছে বাছুরের চামড়ায়; নিশ্চয় এই ধুলোর স্তরই ফুটতে দিচ্ছে না গোপন নকশাকে। তাই সন্তর্পণে জল ঢেলে ধুয়ে নিলাম পার্চমেন্ট; টিনের সসপ্যানে বিছিয়ে রাখলাম—মড়ার খুলি রইল নিচের দিকে। কাঠকয়লার আঁচে বসিয়ে দিলাম সসপ্যান। গুমে গুমে গরম হতে হতে মিনিট কয়েকের মধ্যেও বেশ তেতে উঠল সসপ্যান। তুলে নিলাম বাছুরের চামড়া। সহর্ষে দেখলাম, বেশ কয়েকটা জায়গায় ফুটকি ফুটকি দাগ দেখা যাচ্ছে—যেন লাইন বন্দী সংখ্যার কয়েকটা সংখ্যা আগুন খেয়ে অদৃশ্য কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছে। তক্ষুণি ফের পার্চমেন্ট রাখলাম সসপ্যানে। এক মিনিট পরে তুলে নিতেই দেখলাম কিম্ভূতকিমাকার ভাবে সংখ্যা আর চিহ্ন সাজানো লাইনে লাইনে। এই সেই নকশা।"

এই পর্যন্ত বলে, লেগ্রাণ্ড বাছুরের চামড়াকে তাতিয়ে নিলে আগুনে—তুলে দিলে আমার হাতে। মড়ার খুলি আর ছাগল-ছানার মাঝের জায়গায় লাল রঙে মোটা সোটা কায়দায় লেখা রয়েছে নিচের লাইনগুলো :

" 53‡‡†305))6*;4826)4‡.)4‡);806*;48†8¶60))85;1‡(;:‡*8†83
5*†;46(;88*96*?;8)*‡(;485);5*†2:*‡(;4956*2(5*—4)8¶8*;4
85);)6†8)4‡‡;1(‡9;48081;8:8‡1;48†85;4)485†528806*81(‡9;4
8;4(‡?34;48)4‡;161;:188;‡?;"

পার্চমেন্ট ফিরিয়ে দিলাম লেগ্রাণ্ডকে। বললাম—"এ প্রহেলিকার অন্দরে প্রবেশ করবার ক্ষমতা আমার নেই। এই ধাঁধা যদি গোলকুণ্ডার সমস্ত হিরের ঠিকানাও হয়, তাহলেও তা আমার নাগালের বাইরে থেকে যাবে চিরকাল।"

লেগ্রাণ্ড বললে—"অত তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে কি ধাঁধার জট ছাড়ানো যায়? দেখতে বিকট, কিন্তু সমাধান খুব সহজ। তুমি নিজেও পারবে। এও এক ধরনের গুপ্ত সংকেত—লেখার অর্থ লুকিয়ে রাখার জন্যে সংকেতের মুখোশ পরানো হয়েছে। কিড-কে যারা জানে, তারা বুঝবে, খুব জটিল সংকেত ব্যবহারের ক্ষমতা তাঁর নেই। চোয়াড়ে নাবিকের মাথায় সাদাসিধে সংকেতগুলোই আসে। কিড-ও যে সোজা সংকেত ব্যবহার করেছেন—তা বুঝলাম নিমেষে।"

"সমাধানও করলে?"

"সঙ্গে সঙ্গে করলাম। এর চাইতে দশ হাজার গুণ কঠিন সংকেতের সমাধান বের করেছে এই শর্মা—আমার কাছে এ ধাঁধা নেহাৎ ছেলেখেলা। নানারকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে, আমার মনে গড়নও এমনি যে ধাঁধা যে পেলেই জট ছাড়িয়ে ফেলতে চায়; তাই দেখেছি, একজন মানুষ যে সংকেতের জট বানাতে পারে—আর একজন মানুষ সেই সংকেতের জট ছাড়াতেও পারে।

"সব গুপ্ত লিখনেই সংকেতের একটা ভাষা থাকে। এই নকশায় সংকেতের ভাষাটা কি, প্রথমেই তা জানতে হয়েছে। সমাধানের মূলসূত্র কিন্তু ভাষা। নকশার সই আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে সেই ভাষাটা কি। সই মানে ছাগল-ছানা। ইংরেজি ভাষা। কিড স্পেনের লোক। তাই প্রথমে ভেবেছিলাম, হয়তো মাতৃভাষা বা ফরাসী ভাষাকে সংকেত হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু সইয়ের মানে যখন ইংরেজিতে তাঁরই নাম—তখন সাংকেতিক লিপির মূলেও নিশ্চয় আছে ইংরেজি।

"লক্ষ্য করে দেখো, দুটো পাশাপাশি শব্দের মধ্যে কোনো ভাগাভাগি করা হয়নি। ভাগাভাগি থাকলে কাজটা সহজতর হতো। সংখ্যা আর চিহ্নগুলোকে গুণে ফেলে লিখলাম এইভাবে:

Of the character			
	8	there are	33.
	;	"	26.
	4	"	19.
	‡)	"	16.
	*	"	13.
	5	"	12.
	6	"	11.
	†1	"	8.
	0	"	6.
	92	"	5.
	:3	"	4.
	?	"	3.
	¶	"	2.
	—	"	1.

ইংরেজিতে e অক্ষরটা সবচেয়ে ঘনঘন দেখা যায়। ঘন ঘন ব্যবহারের পর্যায়ক্রম দাঁড়ায় এই রকম : e o i d h n r s t u y c f g l m w b k p q x z; E-র আবির্ভাব ঘটে সবচাইতে বেশি; যে কোনো দৈর্ঘ্যের একটা বাক্য নিলেই দেখবে, E তার মধ্যে রেখে গেছে নিজের আধিপত্য। E-এর আধিপত্য নেই এরকম ইংরেজি বাক্য তুমি পাবে না বললেই চলে।

"সাংকেতিক লিপিটা দেখো। সব চাইতে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে ইংরেজি ৪ অর্থাৎ আট সংখ্যাকে, তাহলে ধরে নিতে পারো ৪ মানে।

"ইংরেজিতে the শব্দটার চল সবচাইতে বেশি—খুব স্বাভাবিক ভাবেই the চলে আসে কথায় কথায়। কিড নিশ্চয় the ব্যবহার করেছেন। ক'বার করেছেন, সেটা জানা যাবে পর-পর তিনটে সাংকেতিক চিহ্ন-সমাহার ক'বার ব্যবহার করা হয়েছে খুঁজে বের করলেই। মোট সাতবার। দেখছো? একই বিন্যাস যদি সাতবার দেখা যায় অথবা সবচাইতে বেশিবার দেখা যায় এইটুকু লিপির মধ্যে, তাহলে তা নিশ্চয় the ছাড়া কিছুই নয়। বিন্যাসটা এই " ; 4 ৪'। ৪ যদি e হয়, তাহলে ' ;' হচ্ছে t, '4' হচ্ছে h। 'the' পাওয়া গেল তাহলে? মস্ত একটা ধাপ এগোনোও গেল।

"এইভাবেই ধাপে ধাপে এগিয়ে পেলাম :

5 মানে a
+ " d
৪ " e
3 " g
4 " h
6 " i
. " n
" o
(" r
; " t
? " u

"গুপ্ত সংকেত লিপির মানে দাঁড় করালাম এইরকম :

"A good glass in the bishop's hostel in the devil's seat forty-one degrees and thirteen minutes northeast and by north main branch seventh limb east side shoot from the left eye of the devil's head a bee-line from the tree through the shot fifty feet out."

আমি বললাম—"মানেটাই একটা ধাঁধা। কিছু বুঝছি না।"

লেগ্রাণ্ড বললে—"আগেই বলেছি সাংকেতিক চিহ্নগুলোর মাঝেমাঝে ভাগাভাগি নেই। রাখা হয়নি ইচ্ছে করেই—যাতে মানে বের করার পরেও বোঝা

না যায়। বার বার পড়তে পড়তে যখন দেখলাম ভাগাভাগি যেখানে থাকা দরকার, ঠিক সেই সব জায়গায়তেই বেশি করে ঘেঁষাঘেঁষি করা হয়েছে—তখনি বুঝলাম, অতি-হুঁশিয়ার কিড বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। আমি সেই সব জায়গা ভাগ করলাম। লিপি দাঁড়াচ্ছে এইরকম :

"A good glass in the bishop's hostel in the devil's seat—forty one degrees and thirteen minutes—northeast and by north—main branch seventh limb east side—shoot from the left eye of the death's-head—a bee-line from the tree through the shot fifty feet out."

আমি বললাম—"এত ভাগাভাগির পরেও আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।"

"আমার মাথাতেও ঢোকেনি," বললে লেগ্রাণ্ড। "বেশ কয়েকদিন আঁধারে ছিলাম। এই ক'দিন সুলিভান দ্বীপের ধারে কাছে খুঁজেছি 'বিশপস্ হোটেল' নামে কোনো বাড়ি আছে কিনা। 'হোস্টেল' শব্দটা এখন আর চলে না—তার বদলে 'হোটেল' ধরে নিয়েছিলাম। কোথাও এরকম বাড়ি পাইনি। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছি, এমন সময়ে একদিন সকালে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল. 'বিশপস্ হোস্টেল' বলতে বোধহয় কোনো পুরোনো পরিবারকে বোঝানো হয়েছে। হয়তো তাদের নাম 'বিশপ'। এ নামে একটা খামার বাড়ি আছে এখান থেকে উত্তরে চার মাইল দূরে। গেলাম সেখানে। বুড়ো নিগ্রোদের কাছে খোঁজ নিলাম। একজন বুড়ি বললে, 'বিশপস্ কাসল্' বলে একটায় জায়গায় আমাকে সে নিয়ে যেতে পারে—কিন্তু সেখানে কোনো কাসল্ বা কেল্লাবাড়ি নেই, সরাইখানাও নেই—আছে একটা উঁচু পাহাড়।

এন্তারসটাকা পয়সা খাইয়ে থুত্থুরে বুড়িকে নিয়ে গেলাম সেখানে। জায়গাটা চিনে নিয়ে তাকে বিদেয় করলাম। নিজেই উঠলাম পাণ্ডববর্জিত সেই পাহাড়ে। তারপর বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে গেল। এরপর কি করব ভেবে পেলাম না।

"এমন সময়ে দেখতে পেলাম পাহাড়ের পূর্বদিকের খাদের গায়ে রয়েছে একটা খাঁজ। ঠিক যেন একটা পাথরের চেয়ার। যে চুড়োয় দাঁড়িয়ে আছি, তার এক গজ নিচে। খাঁজটা বেরিয়ে আছে আঠারো ইঞ্চির মত, চওড়ায় এক ফুটের বেশি নয়। হয়তো আমাদের কোনো পূর্বপুরুষ পাথরে ঠেস দিয়ে বসে থাকত সেখানে। দেখেই বুঝলাম, এই সেই 'ডেভিল্‌স্ সিট' যার কথা পাণ্ডুলিপিতে লেখা হয়েছে। গোটা ধাঁধাটা পরিষ্কার হয়ে গেল তক্ষুনি।

'গুড গ্লাস' বলতে নিশ্চয় টেলিস্কোপ বোঝানো হয়েছে। জাহাজের নাবিক ছাড়া 'গ্লাস' শব্দটা সচরাচর কেউ ব্যবহার করে না। অর্থাৎ টেলিস্কোপ একান্তই দরকার। টেলিস্কোপ কোন দিকে কতখানি উঁচুতে ধরতে হবে, সে হিসেবও লেখা আছে পাণ্ডুলিপিতে। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। টেলিস্কোপ নিয়ে আবার পাহাড়ে উঠলাম।

"বসলাম পাথরের খাঁজে। বসেই বুঝলাম, বিশেষ একটা অবস্থায় বসতে না

পারলে এ চেয়ারে বসা যায় না। তাই করলাম। চোখে টেলিস্কোপ লাগালাম। সাংকেতিক লিপির নির্দেশ অনুযায়ী 'উত্তর পুব আর উত্তরে' টেলিস্কোপের নল ঘোরালাম। পকেট-কম্পাসই বলে দিল এদিকে ঠিক কোনদিকে। তারপর আশাজে টেলিস্কোপ তুললাম দিগন্ত রেখা থেকে এক চল্লিশ ডিগ্রী ওপরে। তারপর খুব আস্তে আস্তে ওঠাতে আর নামাতেই টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলাম একটা ঝাঁকালো গাছ; গাছের মাঝে একটা গোলাকার ফোকর—নিচর পাতা নেই সেখানে; ফোকরের মাঝে একটা সাদাটে জিনিস; টেলিস্কোপের ফোকাস ঠিক করতেই চিনতে পারলাম সাদা জিনিসটাকে—একটা মড়ার মাথার খুলি।

"ব্যস, প্রহেলিকার চিচিং ফাঁক হয়ে গেল তক্ষুনি। খুলিটা আছে 'মূল শাখার সপ্তম উপশাখার পুব পাশে'। গুপ্তধন পেতে হলে 'খুলির বাঁ চোখ দিয়ে বুলেট ফেলতে হবে। যাতে সেটা সোজা এসে গুঁড়ির কাছে মাটিতে পড়ে। যেখানে পড়বে, সেখান থেকে পঞ্চাশ ফুট গিয়ে মাটি খুঁড়লেই উঠবে করাল পন্থায় অর্জিত কিড-এর গুপ্তধন।"

আমি বললাম— 'এ তো দেখছি জলের মত সোজা। তারপর?"

লেগ্রাণ্ড বললে—'ডেভিল্‌স্ সিট' ছেড়ে উঠে আসতেই গাছের গায়ে সেই গোলাকার ফোকরটা আর দেখতে পেলাম না। এদিকে ওদিকে ক'ৎ হয়েও কোনো জায়গা থেকেই দেখা যায় নি। তখন কিডের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়েছিল। খুনে বোম্বেটের জানা ছিল, শয়তানের এই চেয়ারে না বসলে, পাহাড়ে টহল দিয়েও, মড়ার খুলি কেউ দেখতে পাবে না। চুড়োর একগজ নিচে খাদের গায়ে পাথরের চেয়ারে বসবার দুঃসাহসও কারো হবে না।"

"তারপর? তারপর?"

"সেদিন জুপিটার গেছিল আমার সঙ্গে। আমার হাবভাব দেখে ওর ঘোর সন্দেহ হয়েছিল। ঠিক করেছিল, একা আর বেরোতে দেবে না। তাই পরের দিন ভোরে কাক ডাকার আগেই সরে পড়লাম। গাছের খোঁজে পাহাড়ে পাহাড়ে উঠলাম। খুঁজে পেলাম বটে, কিন্তু হাড়গুলো সব সন্ধিজোড় থেকে আলগা হয়ে গেছে মনে হচ্ছিল।

কটেজে ধুঁকতে ধুঁকতে ঢুকেই দেখি লাঠি বাগিয়ে, জুপিটার দাঁড়িয়ে আছে আমাকে পিটুনি-দাওয়াই দেবে বলে।'

অ্যাডভেঞ্চারের বাকিটুকু তোমার জানা।"

আমি বললাম—"প্রথমবার জুপিটারের ভুলে গুপ্তধন না পেয়ে মুখ চুন করে ফিরে আসছিলে?"

"গাধা কোথাকার। বাঁ চোখের ফুটো দিয়ে না গলিয়ে ডান চোখের ফুটো দিয়ে গুবরে গলিয়েছিল—সঠিক জায়গা থেকে থেকে সরে গিয়ে গুবরে পড়েছিল আড়াই ইঞ্চি দূরে। কম তফাৎ নয়! পঞ্চাশ ফুট দূরে গিয়ে ব্যবধান বেড়েছে অনেকটা—তাই মাটি খুঁড়ে মাটিই পেয়েছি—গুপ্তধন পাইনি।"

"গুবরে পোকাকে সুতোয় ঝুলিয়ে ফেলার দরকার ছিল কি? খুলির মধ্যে দিয়ে একটা বুলেট ফেলে দিলেই তো হতো?"

"বন্ধু হে, তোমাকে একটু শিক্ষা দেওয়ার জন্যে সামান্য রহস্যের অবতারণা করেছিলাম। আমাকে তুমি পাগল ভাবছিলে—তাই ওই শাস্তি দিলাম। ওজনে বেশ ভারি বলেই রাজমিস্ত্রীদের ওলোন-এর কাজ করেছিল সোনা পোকা।"

"বেশ করেছো। গর্তের মধ্যে নরকঙ্কালগুলো কাদের বলে মনে হয়?"

"নিশ্চয় ক্যাপ্টেন কিড-এর স্যাঙাৎদের। যাদের দিয়ে গর্ত খুঁড়িয়েছেন, সিন্দুক নামিয়েছেন, তাদেরকে খুন করেছেন নিজের হাতে যাতে তিনি ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানতে না পারে কোথায় আছে নারকীয় রত্ন ভাণ্ডার।"

****
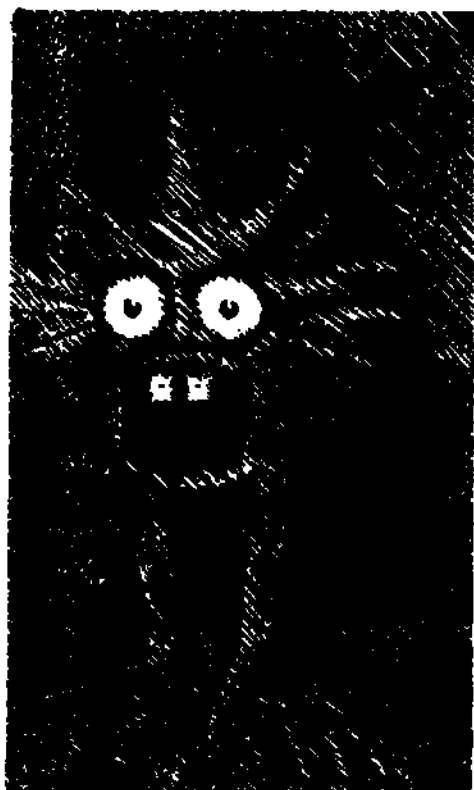
জব্বর জেনারেল

[দ্যা ম্যান দ্যাট ওয়াজ ইউজ্‌ড্‌ আপ]

বিগ্রেডিয়ার-জেনারেল জন এ· বি· সি· স্মিথের সঙ্গে কবে কখন, কিভাবে জান পহচান হয়েছিল, এখন তা ঠিক মনে নেই। বড় খানদানি চেহারা ভদ্রলোকের—নিখুঁত পুরুষমানুষ বলতে যা বোঝায়। কেউ না কেউ নিশ্চয় আলাপ করিয়ে দিয়েছিল—খুব সম্ভব কোনও পাবলিক মিটিঙে—সদাশয় সেই ব্যক্তিটির নামও ভুলে মেরে দিয়েছি। আলাপের সময়ে খুবই ঘাবড়ে গেছিলাম। তাই কিছুই মনে রাখতে পারিনি। মনে আর কোনও দাগ-ই পড়েনি। এমনিতে আমি বিলক্ষণ নার্ভাস—জন্মসূত্রে ভিতু প্রকৃতির—আমার আর দোষ কি। রহস্যের তিলমাত্র ছোঁয়া যদি লাগে আমার এই ভিতু মনে, উদ্বেগ আর উত্তেজনায় প্রাণ যা-যাই করতে থাকে।

যাঁর কথা লিখতে বসেছি, এক কথায় তিনি এক অত্যাশ্চর্য পুরুষ। 'অত্যাশ্চর্য' শব্দটাও আমার মনের আশ্চর্য ভাবকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারছে না। মাথায় তিনি ছ'ফুট লম্বা, প্রচণ্ড দাপুটে আকৃতি—হুকুম করার জন্যেই যেন অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন মর্তে। জন্মসূত্রে তিনি যে অতিশয় উঁচু মহলের মানুষ এবং শিক্ষা-দীক্ষাও সেই মহলেই—তার মুহুর্মুহু প্রমাণ অদৃশ্য বিকিরণের মতোই নির্গত হয় তাঁর গোটা অবয়ব ঘিরে। তাঁর পাশে আমাকে পিগমি মানুষ বলেই মনে হয় এবং সেটাই আমার চিত্তে বিষণ্ণ তৃপ্তির সঞ্চার ঘটিয়ে চলে। মাথায় তাঁর চুলের পাহাড়—ওই চুল যদি ব্রুটাস পেতেন, ধন্য হয়ে যেতেন; যেমন চকচকে ঝকঝকে, তেমনই লীলায়িত পারিপাট্য। রঙ কুচকুচে

কালো—অকল্পনীয় গালপাট্টার রঙও তাই (জানি না একে আদৌ রঙ বলবেন কিনা—বিরঙ বললে ক্ষতি কি?)। গালপাট্টার বর-বর্ণনা দিতে গিয়ে খুব যে পুলকিত হচ্ছি না, তা নিশ্চয় টের পাচ্ছেন। এইটুকুই শুধু বলতে পারি, সূর্যালোকিত এই গ্রহে এমন সুন্দর পুরুষোচিত গোঁফ আর জুলপি কক্ষনো দেখা যায়নি। গোটা মুখখানাকেই ঘিরে থাকত এই দুটি বস্তু—মাঝে মাঝে মুখের বেশির ভাগই ছায়াচ্ছন্ন হয়ে থাকত গোঁফ আর জুলপির প্রতাপে। এ মুখ ভূ-পৃষ্ঠে অদ্বিতীয়। ঝকঝকে দাঁতের সারি দেখলে চোখ কপালে উঠে যাবে—অসমান নয় একখানা দাঁতও। দু'পাটি দাঁতের ফাঁক দিয়ে নিনাদিত হয় যে কণ্ঠস্বর, তা একাধারে গানের মতো মিষ্টি, বাজের মতো কড়া, জলের মতো পরিষ্কার; কোনও মানুষের কথা যে এত মিষ্টি মধুর শক্ত-কড়া আর নিখাদ-স্পষ্ট হয়—তা শুনলে প্রত্যয় হবে না। চোখ তো নয়—যেন দু'টুকরো কমল হিরে : চক্ষুরত্নই বলা সমীচীন—চক্ষুযন্ত্র বললে এক চোখকে হেয় করা হয়। আকারে বিশাল, রোশনাই সমুজ্জ্বল; ভাবগম্ভীর তো বটেই, মাঝে মধ্যে রহস্যমদির—যা গভীর ভাবরাশির অভিব্যক্তি ছাড়া কিছুই নয়।

এরকম বপুও অপিচ দেখিনি আমি। নিঃসন্দেহে পুরুষোত্তম। হাজার চেষ্টা করলেও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুপাতে কণামাত্র ত্রুটি আবিষ্কার করতে পারবেন না। অ্যাপোলো-র সাদা মর্মর মূর্তিও লজ্জায় লাল পাথর হয়ে যাবে জেনারেলের স্কন্ধ যুগল দেখলে। অহো! কি কাঁধ! পুরুষোচিত কাঁধ অন্বেষণ করা আমার একটা বদ অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে—নির্দ্বিধায় তাই আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন—বিধাতা এমন নিখুঁত একজোড়া কাঁধ পৃথিবীতে শুধু একটা পুরুষ মানুষের জন্যেই বানিয়েছিলেন—এবং সেই পুরুষ মানুষটি জব্বর জেনারেল স্মিথ সাহেব। বাহু দুটিও কোনও অংশেই নিম্ন মানের নয়। পা বটে দু'খানা। বেশি মাংসল নয়, কম মাংসলও নয়; বেশি রূঢ় নয়, বেশি কোমলও নয়; বেশি খাটো নয়, বেশি দীর্ঘও নয়। সমানুপাত ব্যাপারটা এঁর সর্ব অঙ্গে বিধৃত। উরু, হাঁটু, পায়ের ডিম, গোড়ালি—সর্বত্রই এই অঙ্কের মাপ; বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কারিগরও এমন পা গড়তে পারবে না—পেরেছেন শুধু বিশ্বকর্মা।

এঁর চলাফেরায় কিন্তু একটা অদ্ভুত সংযম প্রকাশ পেত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন যেন ছকের বাইরে যেতে চায় না। আড়ষ্টতা বললে ভুল বলা হবে। ও রকম জমকালো বপু জ্যামিতিক নিয়মে নড়াচড়া করবে, এটাই তো স্বাভাবিক। পিগমি চেহারায় ব্যাপারটা বেমানান লাগতে পারে, দশাসই বপুতে ওইটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে আশ্চর্য এক গাম্ভীর্যি স্টাইল। যাঁকে যা মানায়।

যে বন্ধুপ্রবরের কৃপায় এ হেন জেনারেলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটেছিল, তিনি শুধু আমার কানে কানে পরিচয়ের প্রস্তাবনাস্বরূপ বলে গেছিলেন এই ক'টি কথা—"আশ্চর্য মানুষ ইনি, আশ্চর্য সব দিক থেকেই, আশ্চর্য এঁর কথাবার্তা, আশ্চর্য এঁর চলাফেরা—আশ্চর্য শব্দটাকে হাজার গুণ বাড়িয়ে নিলে যা দাঁড়ায়—উনি তাই। মহিলাদের চোখের মণি ইনি আরও একটি কারণে—ওঁর

অসমসাহসিকতা। এরকম দুর্জয় সাহস কোনও পুরুষ সিংহও আজও দেখাতে পারেনি। বিলকুল বেপরোয়া—প্রাণের মায়া একেবারেই নেই—আগুনও গিলে নেন কোঁৎ করে মণ্ডা-মিঠাইয়ের মতো।" বলতে বলতে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে গলা সরু হয়ে গেছিল বন্ধুবরের—শেষ পর্যন্ত আর শোনাই যায়নি। আমারও গা ছমছম করে উঠেছিল কণ্ঠস্বরের বিলীয়মান রহস্যাভাসে।

শিবনেত্র হয়ে কিছুক্ষণ বুঁদ হয়ে থাকার পর ফের বলেছিলেন প্রিয় বন্ধু—"সত্যিই আগুন গেলেন জেনারেল—বুগাবু আর কিকাপু রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়েছিলেন তো এই ভাবেই। আকাশের বাজ-কেও গলা দিয়ে নামিয়ে দিতে পারেন ইচ্ছে করলে। উনি মানুষ নন, উনি—"

এই পর্যন্ত বলেই থেমে গেছিলেন বন্ধু। কেননা, স্বয়ং জেনারেল এসে গেছেন সামনে। বন্ধুর সঙ্গে বিপুল বেগে করমর্দন করছেন। দাঁতের বাহার, চোখের জলুস আর গলার গানে আমি মোহিত হয়ে যাচ্ছি। আর আপশোসে মরছি—আহারে, বন্ধুবরের শেষ কথাটা যদি শুনতে পেতাম, তাহলে এই রহস্যের উৎকণ্ঠায় আধমরা হয়ে থাকতে হতো না।

পরিচয় করিয়ে দিয়েই বন্ধু মিশে গেছিল ভিড়ের মধ্যে। আজও তার চুলের ডগা আর দেখিনি (নামও মনে নেই সেই কারণে)। আমি গল্পে জমে গেছিলাম জবরদস্ত জেনারেলের সঙ্গে। কথার ধোকড় বটে। আমাকে মুখ খুলতেই দিলেন না। যদি দিতেন, তাহলে আমি জিজ্ঞেস করতাম দুর্ধর্ষ রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে তাঁর লড়াইটা হয়েছিল কি ধরনের। গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো নিশ্চয়। উনি কিন্তু লড়াই-ফড়াইয়ের ধারকাছ দিয়েও গেলেন না। দর্শনশাস্ত্র আর আধুনিক যান্ত্রিক আবিষ্কার নিয়েই মেতে রইলেন। বুগাবু যুদ্ধের রহস্য আমার মনকে টেনেছিল ঠিকই—কিন্তু স্রেফ শিষ্টাচার হেতু সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাইনি। অথচ মনটা হেদিয়ে মরছিল বুগাবু রণক্ষেত্রের ভয়াবহ প্রহেলিকা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করার। কিন্তু যখন দেখলাম মহাবীর জেনারেল দর্শন শাস্ত্রে বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন আর যন্ত্রযুগের বিপুল প্রগতি নিয়ে মেতে উঠেছেন, তখন গল্পের লাগাম ছেড়ে দিলাম ওঁরই হাতে। উনিও পরম উৎসাহে ঝটিকাবেগে চালিয়ে গেলেন আশ্চর্য গমগমে গলায় অত্যাশ্চর্য যন্ত্র আবিষ্কারের কথাবার্তা।

বললেন—"যাই বলুন না কেন, সত্যিই আমরা ওয়াণ্ডারফুল মানুষ, রয়েছি এক ওয়াণ্ডার যুগে। প্যারাসুট আর রেলপথ—কলের ফাঁদ আর স্প্রিং-বন্দুক! সাত সাগরে টহল দিচ্ছে আমাদের স্টীম-বোট, খুব শিগগিরই লণ্ডন আর আর টিমবাকটু-র মধ্যে রেগুলার ট্রিপ দেবে ন্যাশো বেলুন। ভাড়া তো লাগবে মোটে বিশ পাউণ্ড স্টার্লি—এক পিঠের ভাড়া। তারপর ধরুন ইলেকট্রো-ম্যাগনেট—সমাজ, কলাশিল্প, বাণিজ্য-সাহিত্য—সব কিছুর ওপরেই নিদারুণ প্রভাব ফেলবেই! আরও আছে, আরও আছে মিস্টার··· মিস্টার থমসন, আপনারই তো নাম?···আবিষ্কারের কুচকাওয়াজ কিন্তু এইখানেই হল্ট করেনি···চলেছে···কদম কদম এগিয়েই চলেছে···আরও ওয়াণ্ডারফুল···কাজে

কিরকম বিপ্লব চলেছে আবিষ্কারের জগতে, তা বোঝাবার ভাষা আমার নেই. মেক্যানিকাল আবিষ্কার! ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে রোজই! ওঃ! ওঃ! কি আরাম! না···না···ব্যাঙের ছাতা বললে ছোট করা হয়—এ যেন গঙ্গাফড়িং···লম্ফনবাজ ফড়িং-এর মতোই টকাটক লাফিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা মেক্যানিক্যাল উদ্ভাবন! ভাবতে পারেন? মি··· মি···মিস্টার থমসন···রোজই আ···আ···আমাদের চারদিকে আসছে···আসছে এই আবিষ্কাররা!"

মিস্টার থমসন আমার নাম নয় মোটেই। তাতে কিছু মনে করিনি। উনি যে ভুল নামের লোককেই উদ্দেশ করে মনের স্ফূর্তিতে ডগমগ হয়েছেন, তাতেই কৃতার্থ হয়েছি। পরিষ্কার বুঝেছি, জেনারেল স্মিথ মানুষের মঙ্গল চান, মানুষ জীবটাই তাঁর যত কিছু ধ্যান, আলাপচারিতায় অতীব সিদ্ধহস্ত এবং মেক্যানিক্যাল আবিষ্কারগুলো যেভাবে আশেপাশে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়ে চলেছে—তা প্রবল আলোড়ন তুলেছে তাঁর ব্রহ্মরন্ধ্রে। আমার কৌতূহল-অগ্নি কিন্তু পুরোপুরি প্রশমিত হয়নি এত কথা শোনবার পরেও। তাই জেনারেল স্মিথ সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেওয়া আরম্ভ করলাম পাঁচজনের কাছে। বিশেষ করে জানতে চেয়েছিলাম একটাই বিষয়। কি সেই কুহেলী-আচ্ছন্ন ঘটনাবলী যা ঘটেছে বুগাবু আর কিকাপু অভিযানে—যার ছোঁয়ায় জেনারেল স্মিথ এমন একখানা জব্বর ব্যক্তিত্ব হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন সমাজে!

মেয়ে-মহলে জেনারেলের প্রতাপ নাকি নিদারুণ। মেয়েরা তাঁর নাম শুনলেই নাকি অজ্ঞান হয়ে যায়। তাই কৌতূহল চরিতার্থ করতে গেছিলাম সেই মহলেই। বেছে বেছে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের পাকড়াও করেছি। তাদের মধ্যে মিস আছে, মিসেসও আছে—প্রত্যেকেই জব্বর জেনারেলের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুযুগলকে প্রায় কপালে তুলে ফেলেছে, বীরত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে, ভদ্রলোকের ভয়ঙ্কর সাহসের ঢক্কানিনাদে আমার কান ঝালাপালা করে দিয়েছে—সর্বশেষে প্রত্যেকেই কিন্তু একটি কথা আধখানা বলেই থেমে গেছে। যে কথাটা আমার বন্ধুও শুরু করে আর শেষ করেনি, এই সেই কথা : "উনি মানুষ নন। উনি—"

কী জ্বালা! গুচ্ছের মহিলার মুখে একই 'ফিনিশিং' শোনবার পর পুরুষ বন্ধুদের কাছেও শুনলাম সেই একই কলসি-বাজানো প্রশস্তি; শেষকালে সেই আধখানা কথা : "উনি মানুষ নন। উনি—"

আপনিই বলুন, এইরকম কথা শুনলে কৌতূহল কখনও মেটে? বেড়েই যায়। আমারও হলো তাই অবস্থা। কৌতূহলের গ্যাসে পেট ফুলে ওঠায় ছটফট করতে করতে একদিন সোজা চলে গেলাম জব্বর জেনারেলের বাসা ঘরে। আগেই শুনেছিলাম, উনি থাকেন একা; একজন মাত্র বুড়ো নিগ্রো তাঁর দেখভাল করে। দরজার কড়া নাড়াতেই এই বুড়োই মুখ বাড়িয়ে বললে, এখন দেখা হবে না।

জেনারেল সাজগোজ করছেন।

ধেত্তেরি সাজগোজ! বুড়োকে জপিয়ে সোজা চলে গেলাম জেনারেলের শোবার ঘরে। বুড়োও রইল আমার সঙ্গে। ঘরে ঢুকেই ইতিউতি চাইলাম ঘরের মালিককে দেখবার আশায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম না উনি অবস্থান করছেন কোথায়। আমার পায়ের কাছেই মেঝের ওপর পড়েছিল একটা বিরাট অদ্ভুত-দর্শন কোনও কিছুর বাণ্ডিল। মেজাজ এমনিতেই টং হয়ে থাকায় কষে লাথি ঝেড়েছিলাম এই বাণ্ডিলেই। লাথিয়ে পায়ের কাছ থেকে সরিয়ে দেব—এই ছিল অভিলাষ।

অমনি কথা বলে উঠেছিল বাণ্ডিল—"একী অভব্যতা! শিষ্টাচারের কিছুই জানেন না!"

এরকম কণ্ঠস্বর জীবনে শুনিনি। কুঁই-কুঁই আর শিস দেওয়ার মাঝামাঝি যে শব্দ—এও তাই। ভারি মজার আওয়াজ। কিন্তু শব্দ যে এরকম বিটকেল হতে পারে, তাতো জানতাম না।

তাই ভয়ে পেয়েছিলাম। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। একলাফে ছিটকে গেছিলাম ঘরের দূরতম কোণে।

আবার শিস দেওয়ার সুরে পিঁপি-কোঁ কোঁ-সু-সু শব্দে বলেছিল বাণ্ডিল—"ভায়া, ব্যাপারটা কি? এমন করছেন যেন জীবনে আমাকে দেখেননি।"

এ কথার কোনও জবাব হয়? কাঁপতে কাঁপতে টলতে টলতে বসে পড়েছিলাম হাতলওলা একটা চেয়ারে। দুই চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল কোটর থেকে। চোয়াল ঝুলে পড়ায় সিংদরজার মতো হাঁ হয়ে গেছিল মুখবিবর। এমন অবস্থাতেও ওৎ পেতে রইলাম—খাড়া হয়ে রইল দুই কান—এইবার...এইবার নিশ্চয় সব রহস্যের সমাধান দুম করে ফেটে পড়বে আমার সামনেই।

আবার সেই বিচিত্র শব্দ উত্থিত হলো মেঝের বাণ্ডিলের দিক থেকে। বাণ্ডিল এখন নড়ছে। ক্রমবিবর্তিত হচ্ছে বলা যায়। আরও খোলসা করে বলা যায়—বাণ্ডিল যেন মোজা পরছে। একখানা পা শুধু দৃশ্যমান হয়েছে। বলছে—"আশ্চর্য! চেনা তো উচিত ছিল এতক্ষণে! পম্পি—পাখানা নিয়ে আয়!" পম্পি এগিয়ে দিল একটা ছিপি-পা, পোশাক পরানোই ছিল, ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে, পেঁচিয়ে লাগিয়ে দিতেই তড়াক করে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে উঠল বাণ্ডিলের মতো দেখতে আজব সেই বস্তু।

বলে গেল স্বগতোক্তির সুরে—"রক্তাক্ত সেই অভিযান কি ভোলা যায়? একটা শিক্ষাই হয়েছে আমার। কেউ যেন ভুলেও বুগাবু আর কিকাপু-দের সঙ্গে লড়তে না যায়। গেলে আর আস্ত ফিরতে হবে না। পম্পি, হাতটা দে। থ্যাংকিউ। টমাস" [আমার দিকে ফিরে] "ছিপি-পায়ের সঙ্গে তাল ঠুকে চলতে পারে এই হাত। তবে ভায়া, হাতের যদি কখনও দরকার হয়, বিশপ-এর কাছে নিয়ে যাবেন আমার সুপারিশ।" কথা শেষ হলো, পম্পিও পেঁচিয়ে হাত লাগিয়ে দিল

বাণ্ডিলের বগলে।

"কুত্তার বাচ্চা, হাঁ করে দেখছিস কি? লাগা কাঁধ আর বুক। বেস্ট কাঁধ বানায় পেটিট, তবে চ্যাটালো বুক যদি চান—চলে যান ডুক্রো-র দোকানে।"

"চ্যাটালো বুক?" বলেছিলাম আমি।

"পম্পি, এত দেরি কেন? পরচুলা লাগাতে এত সময় লাগে? গাধার বাচ্চা কোথাকার! ছাল ছাড়ানো মাথা ঢাকা চাট্টিখানি কথা নয়—এলেম থাকা চাই। তবে বেস্ট সার্ভিস পাবেন ডা এল ওর্মস-এর কারখানায়।"

"ছাল ছাড়ানো মাথা!"

"দাঁড়কাকের বাচ্চা কোথাকার! দাঁত দে, দাঁত! ভাল দাঁত যদি পেতে চান, সোজা চলে যান পার্মলি-র কাছে—ঠকবেন না। দাম আগুন যদিও—জিনিস খাসা। বুগাবু রাক্ষসটা বন্দুকের কুঁদো দিয়ে গুঁতিয়ে বেশ কয়েকটা আসল দাঁত পেটে চালান করে দিয়েছিল বলেই তো এমন দাঁত পেলাম। তোফা!"

"বন্দুকের কুঁদো! পেটে দাঁত চালান! আমার চোখ কি ঠিক আছে?"

"আছে ভায়া, আছে। ওর চাইতেও ভাল চোখ অবশ্য আমার আছে। এখুনি তা দেখবেন। পম্পি হারামজাদা, শুওরের নাদি কোথাকার! পেঁচিয়ে লাগাতে এত সময় লাগে? কিকাপু র‍্যাস্কেলটা অবশ্য চোখ খুবলে নিয়েছিল চক্ষের নিমেষে—ডক্টর উইলিয়াম তা বানিয়েছেন বড্ড বেশি সময় নিয়ে—কিন্তু রত্ন বানিয়েছেন বটে। আপনার চাইতেও ভাল দেখছি—আপনার চোখ আর এই মেক্যানিক্যাল চোখের মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ!"

এবার ভবনা স্পষ্ট দেখলাম। দেখলাম, আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কিম্ভূত জিনিসটা জবর জেনারেল স্মিথ-ই বটে। দুর্দান্ত সাহসী সেই সৈনিকপুরুষ। পম্পির হাতের কায়দার তারিফ না করে পারলাম না। এইটুকু সময়ের মধ্যে একটা নিছক বাণ্ডিলকে ফ্রেশ মানুষ বানিয়ে ছেড়েছে। বিচ্ছিরি গলার আওয়াজটা যদিও ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছিল তখনও—কিন্তু সে ধাঁধাও কেটে গেল চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতেই।

"পম্পি, কালো মোষ," পিঁপি-কোঁকোঁ-চিঁ চিঁ গলায় বললেন জেনারেল—"কি চাস তুই? তালু ছাড়াই বেরিয়ে পড়ব?"

বিজির-বিজির করে ক্ষমা চাইতে চাইতে ঝটিতি মনিবের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল পম্পি; ঘোড়ার নাল খোলা যায় যে যন্ত্র দিয়ে, অনেকটা সেই জাতীয় যন্ত্র মুখবিবরে চাড় মেরে ঢুকিয়ে মুখটা হাঁ করিয়েই খট করে ভেতরে লাগিয়ে দিল ভারি অদ্ভুত আর জটিল একটা কল—এত তাড়াতাড়ি ফিট করে দিল যে দেখতেও পেলাম না কলকব্জা কি ধরনের। জেনারেলের গোটা মুখের চেহারা অত্যাশ্চর্যভাবে পাল্টে গেল তৎক্ষণাৎ। কথা যখন বললেন, কণ্ঠস্বরে শুনলাম সেই গানের গমক আর বাজের ধমক। প্রথম পরিচয়ে এই গলা শুনেই মোহিত হয়েছিলাম। তখন কল্পনাও করতে পারিনি—কলের গলা থেকেই এমন মিঠেকড়া গানে ভরা আওয়াজ বেরতে পারে।

জেনারেল বললেন, মিছরির দানার মতো স্পষ্ট আর মিষ্টি অথচ রুক্ষ আর তেজিয়ান গলায় বললেন—"চাল নেই চুলো নেই হারামজাদার দল! মুখ থেকে শুধু তালু-টাই চেঁচে বাদ দিয়ে খুশি হয়নি—জিভের আটভাগের সাতভাগই কেটে ফেলে দিয়েছিল। টেনে জিভটাকে লম্বা করে তবে কেটেছিল! ভ্যাগাবণ্ড, নরাধম, উল্লুক কোথাকার! তবে কি জানেন, সব বিপত্তিরই মেক্যানিক্যাল সুরাহা আছে। বরাবর বলে এসেছি আপনাকে। সাঁড়াশি দিয়ে জিভ টেনে কেউ যদি ছিঁড়েও ফ্যালে—দৌড়ে চলে যাবেন বোনফানতি-র চেম্বারে। গোটা আমেরিকায় এমন মিস্ত্রি আর পাবেন না। যেমনটি বলবেন, তেমনটি বানিয়ে দেবে: গলা হবে তখন এই রকম! হাঃ হাঃ হাঃ!"

বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানালেন জেনারেল। আমিও নমস্কার ঠুকে কেটে পড়লাম ঘর থেকে। হাড়ে হাড়ে বুঝে গেলাম ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল জন এ· বি· সি· স্মিথ পুরোপুরি মানুষ নন। উনি—

অর্ধেক কলের মানুষ। □

উইলিয়াম উইলসন

[উইলিয়াম উইলসন]

উইলিয়াম উইলসন নামেই এখন আমাকে চিনে রাখুন। আসল নামটা বলব না। আমার সামনেই রয়েছে এক দিস্তে সাদা কাগজ। আসল নামের কালি দিয়ে কাগজগুলোকে আর নোংরা করতে চাই না। যে-নাম শুনলে আমার জাতভাইরা শিউরে ওঠে, ঘৃণায় মুখ বেঁকায়—সে নাম আপনাকে শুনতে হবে না। সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক কুৎসিত কদাকার কাজ করে বেরিয়েছি, অনেক অপবাদ হজম করেছি; অনেকের সর্বনাশ করেছি। কেউ আমাকে আর চায় না। আমার মত একঘরে এখন আর কেউ নেই। এত কুকর্মও কেউ করেনি। দুনিয়ার মানুষের সামনে আমি তো এখন মরেই রয়েছি। আমার মান-মর্যাদা ধুলোয় মিশেছে, আশা-আকাঙ্ক্ষা শূন্যে মিশেছে; এখন যেন একটা ঘন কালো বিষণ্ণ মেঘ ঝুলছে সামনে; হতাশার এই মেঘের বুঝি আর শেষ নেই; আমার সমস্ত ইচ্ছেগুলোকে আড়াল করে রেখেছে এই ভ্রূকুটি কুটিল কৃষ্ণকায় মেঘ। নিঃসীম নিরাশার এ-রকম দমিয়ে দেওয়া চেহারা কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারবে না।

শেষের বছরগুলোর ইতিহাস লিখতে বসিনি। লিখতে পারব কিনা, সেটাও একটা প্রশ্ন। অকথ্য কষ্ট পেয়েছি শেষের দিকে—ভাষা দিয়ে সে দুর্ভোগকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা আমার নেই। অপরাধের পর অপরাধ করে গেছি—সে-সবের কোনো ক্ষমাও হয় না। আর তার পরেই ঝুঁকে পড়লাম চরম

লাম্পট্যের দিকে। কিভাবে তা ঘটল, শুধু সেইটুকুই লিখব বলেই আজ আমি বসেছি কাগজ-কলম নিয়ে।

মানুষ একটু একটু করে খারাপ হয়। আমি হলাম আচমকা। যা কিছু ভালো ব্যাপার ছিল আমার মধ্যে, সমস্তই টুপ করে খোলসের মতই খসে পড়ে গেল। অল্প-সল্প খারাপ কাজ করে যাচ্ছিলাম এই ঘটনার আগে; দুম করে শয়তান-শিরোমণি হয়ে যেতেই যেন বিশাল এক লাফ মেরে পৌঁছে গেলাম নরকের রক্ত-জল-করা উপত্যকায়, সেখান থেকে বেরিয়ে আসবার সুযোগ পেয়েছিলাম একবারই—বিশেষ সেই ঘটনাটাই গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করছি। একটু ধৈর্য ধরুন।

আমি জানি, মৃত্যু পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। মৃত্যু যখন এগিয়ে আসে, তখন তার করাল ছায়া পড়ে তার আগেই। সেই ছায়া পড়েছে আমার ওপর। মন মেজাজ তাই ঝিমিয়ে পড়েছে। নারকীয় সেই উপত্যকার মধ্যে আমি যখন দিশেহারা, তখন পাঁচজনের অনুকম্পা চেয়েছিলাম আকুলভাবে; এক ফোঁটা সহানুভূতি আদায়ের জন্যে নানা ছল চাতুরি করে জাতভাইদের বোঝাতে চেয়েছিলাম, অদ্ভুত কতকগুলো ঘটনা আমাকে টেনে এনেছে এই অবস্থায়—আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই; এ-সব ঘটনার ওপর মানুষের কোনো হাত নেই—এমন ধারণাটাও ঢোকাতে চেয়েছিলাম জাতভাইদের মগজের মধ্যে। ভুল করেছি ঠিকই, ঘটনা পরম্পরার গোলাম হয়ে গিয়ে নরক-কুণ্ডে হাবুডুবু খাচ্ছি—কিন্তু সবাই মিলে হাত লাগিয়ে যদি আমাকে টেনে তোলে, তাহলে আবার সুখের মুখ দেখতে পাবো, ভুলের মরীচিকা মিলিয়ে যাবে—সত্যিকারের মরূদ্যানে পৌঁছে যাব। প্রলোভনই মানুষকে অধঃপাতে নিয়ে যায়। কিন্তু আমার মত অধঃপতন আর কারও হয়নি। এত কষ্টও কেউ পায়নি। ঠিক যেন স্বপ্নের ঘোরে রয়েছি। তিল তিল করে মরছি। অতি বড় দুঃস্বপ্নেও যে বিভীষিকা আর রহস্যকে কল্পনা করা যায় না—আমি সেই অবিশ্বাস্য আতঙ্ক আর প্রহেলিকার বলি হতে চলেছি নিরতিসীম নিষ্করুণভাবে!

আমি যে জাতের মানুষদের মধ্যে জন্মেছি, কল্পনাশক্তির বাড়াবাড়ি আর ঝট করে ক্ষেপে ওঠার দুর্নাম তাদের আছে। ছেলেবেলা থেকেই বংশের নাম রেখেছি এই দুই ব্যাপারেই। আমার দুর্বার কল্পনা বাগ মানে না কিছুতেই; ঠিক তেমনি মাথায় রক্ত চড়ে যায় যখন তখন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও ঝাঁকালো হয়ে উঠেছে এই বদ দোষগুলো। তাতে বন্ধুবান্ধবদের অশান্তি বাড়িয়েছি, নিজেরও ক্ষতি করেছি। আমার ইচ্ছের ওপর কারো ইচ্ছেকে মাথা তুলতে দিইনি, অদ্ভুত খেয়াল খুশি নিয়ে মেতে থেকেছি, প্রচণ্ড ঝোঁকের মাথায় অনেক কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি করেছি। আমার বাবা আর মা-এর মন এবং শরীর তেমন মজবুত নয়; তাই কিছুতেই রাশ টেনে ধরতে পারেননি আমার দুর্দান্তপণার। খারাপ কাজে আমার প্রবণতা দিনে দিনে লক্ষমুখ নাগের মত ফণা মেলে ধরেছে—তাঁরা সামাল দিতে পারেননি নিজেদের ধাত কমজোরি বলে। চেষ্টা যে করেননি, তা নয়। কিন্তু সে

চেষ্টার মধ্যে জোর ছিল না। বজ্জাত ঘোড়াকে লাগাম পরাতে গেলে কায়দা জানা দরকার। ওঁরা তা জানতেন না। ভুল করেছিলেন বলেই আমাকে টিট করতে তো পারলেনই না—উল্টে জিতে গিয়ে আমি আরও উদ্দাম হয়ে উঠলাম। তখন থেকেই কিন্তু আমার ওপর আর কারও কথা বলার সাহস হয়নি। আমি যা বলব, তাই হবে। আমি যা চাই, তাই দিতে হবে। যে বয়েসে ছেলেমেয়েরা বাবা-মা-এর চোখে চোখে তাকাতে পারত না—সেই বয়স থেকেই আমি হয়ে গেলাম বাড়ির সর্বেসর্বা। আমিই সব। আমার ওপর আর কেউ নেই।

স্কুলের কথা ভাবলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা বিরাট বাড়ি। রাণী এলিজাবেথের আমলের প্রাসাদ। ইংল্যাণ্ডের একটা ছায়ামায়ায় ভরা কুহেলী ঘেরা গ্রাম। সেখানকার গাছপালাগুলো দৈত্যদানবের মত আকাশছোঁয়া আর ভয়ানক; হাড়গোড় বের করে যেন দাঁত খিঁচিয়েই চলেছে সবসময়ে। সেখানকার সব কটা ইমারতই বড় বেশী প্রাচীন। স্বপ্ন দেখছি বলে মনে হয়। মনের জ্বালা জুড়িয়ে আসে। এই মুহূর্তে ছায়াস্নিগ্ধ পথগুলো শান্তির ছায়া ফেলছে আমার মনের মধ্যে। পথের দু'পাশে ঝাঁকালো গাছ। ঠাণ্ডা হাওয়ায় যেন গা জুড়িয়ে যাচ্ছে। নাকে ভেসে আসছে ঝোপঝাড়ের সোঁদা গন্ধ। হাজার হাজার ফুলের সৌরভে মনে ঘনাচ্ছে আবেশ। দূরে বাজছে গির্জের ঘণ্টা। গুরুগম্ভীর নিনাদ রোমাঞ্চকর আনন্দের শিহরণ তুলছে আমার অণুপরমাণুতে। আমি বিভোর হয়ে যেন স্বপনের ঘোরে দেখছি ঘণ্টায় ঘণ্টায় সময়ের বাজনা বাজিয়ে গথিক ভাস্কর্যের বিশাল ওই গির্জে সজাগ প্রহরা দিয়ে চলেছে ধূসর পরিবেশে ঘুমন্ত প্রাসাদের পর প্রাসাদকে।

মনে পড়ছে স্কুলের ছোট ঘটনাগুলো। এত কষ্টে আছি যে খুঁটিয়ে সব কথা বলতে পারব না। সে ক্ষমতা আর নেই। তবে হ্যাঁ, তখন যে ব্যাপারগুলোকে তুচ্ছ আর হাস্যকর মনে হয়েছিল, পরে বুঝেছিলাম, সেগুলো আমোঘ নিয়তির পূর্ব ছায়া। নিষ্ঠুর নিয়তির সেই ছায়াভাস এখন আমার দিগদিগন্ত জুড়ে রয়েছে। আমি শেষ হতে চলেছি।

আগেই বলেছি, স্কুল বাড়িটা রীতিমত বুড়ো। ছিরিছাঁদের বালাই নেই বাড়ির নকশার মধ্যে। মাঠময়দানের কিন্তু অভাব নেই। নেচেকুঁদে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাড়ি আর মাঠ-টাঠগুলোকে ঘিরে রেখেছে খুব উঁচু একটা নিরেট ইঁটের পাঁচিল। পাঁচিলের মাথায় চুন-সুরকি বালির পুরু পলস্তারা। সেই পলস্তারায় গাঁথা রয়েছে খোঁচা খোঁচা ভাঙা কাঁচ। পুরো তল্লাটটা কেল্লার মত করে তৈরি। আমাদের কাছে মনে হত ঠিক যেন একটা পেল্লায় কয়েদখানা। এবং পাঁচিলের ভেতরের অঞ্চল টুকুই ছিল আমাদের জগৎ। হপ্তায় তিনবার দেখতে পেতাম পাঁচিলের বাইরের জগৎটাকে। শনিবার বিকেলে দুজন মাতব্বরের সঙ্গে দল বেঁধে হন হন করে হাঁটতে যেতাম আশপাশের মাঠে। রবিবারে বেরোতাম দুবার—একইভাবে মাতব্বর দুজন চরাতে নিয়ে যেত স্কুলের সব্বাইকে। একবার বেরোতাম সকালে মাঠে-মাঠে চর্কিপাক দিতে; আর একবার বেরোতাম সন্ধ্যানাগাদ—তখন যেতাম

গাঁয়ের একমাত্র গির্জের উপাসনায় অংশ নিতে। গির্জের পুরুতঠাকুর ছিলেন আমাদেরই স্কুলের অধ্যক্ষ মশাই। গ্যালারীতে বসে অনেক দূর থেকে দেখতাম তিনি পায়ে পায়ে উঠছেন বেদীর ওপর। অবাক হয়ে চেয়ে থাকতাম সেদিকে। কিরকম জানি সব গোলমাল হয়ে যেত মাথার ভেতরটা। দেবদূতের মত ওঁর চেহারাটা দেখে মনে হতো যেন দেবলোক থেকে নেমে এলেন এইমাত্র। কিন্তু ভাবতেও পারতাম না দেবসুন্দর এই মানুষটাই বেত নাচিয়ে অত নির্দয় ভাবে কি ভাবে শাসন করেন আমাদের স্কুলে পৌঁছেই।

চীনের প্রাচীরের মত টানা লম্বা বিশাল এই পাঁচিলের এক জায়গায় যেন ভুরু কুঁচকে কপালে অজস্র ভাঁজ ফেলে কটমট করে আমাদের দিকে চেয়ে থাকত পাঁচিলের চাইতেও প্রকাণ্ড একটা ফটক। ফটক না বলে তাকে লোহার পাত আর বল্টু আঁটা একটা বিকট দৈত্য বলা উচিত। কাঁটাওলা দৈত্য বললে আরও ভাল হয়। কেননা, তার সারা গা থেকে ঠেলে বেরিয়ে থাকত খোঁচা খোঁচা বল্লমের ফলা। ভয়ঙ্কর চেহারার এই ফটকটাকে দেখলেই বুক গুর গুর করে উঠত আমার। সপ্তাহে তিনবার ছাড়া কক্ষনো খোলা হত না এই ফটক। বরং বলা যায় ছ-বার। তিনবার আমাদের কুচকাওয়াজ করে বের করার জন্যে, তিনবার একই ভাবে ঢোকাবার জন্যে। সেই সময়ে বিশাল কব্জাগুলোর প্রতিটার ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ কান পেতে শুনতাম আমি। অদ্ভুত সেই আওয়াজে আমার গা শিরশির করত ঠিকই—তবুও কান খাড়া করে থাকতাম। কেন জানি মনে হত, ক্যাঁচ ক্যাঁচানিগুলো আসলে কাঁটাকার ওই গেট-দানবের মনের কথা—অনেক রহস্য কথা লুকিয়ে আছে প্রতিটা বিশ্রী শব্দের মধ্যে।

বেজায় বুড়ো স্কুল বাড়িটার কোথাও যে কোন ছন্দ ছিল না, আগেই তা বলেছি। পুরো স্কুল চৌহদ্দিটাই ঠিক এইভাবে ছন্দহীন, বেখাপ্পা, এলোমেলো। এরই মধ্যে তিন-চারটে বড়-সড় মাঠকে আমরা খেলার মাঠ বানিয়ে নিয়েছিলাম। খুব মিহি কাঁকর দিয়ে সমতল করে রাখা হয়েছিল মাঠগুলোকে। আশ মিটিয়ে লাফ ঝাঁপ করতাম এখানেই। অন্য কোথাও নয়।

খেলার মাঠগুলো ছিল বেধড়ক স্কুল-বাড়ির পেছন দিকে। এখানে কাঁকর ছাড়া আর কিছুর বালাই সেখানে ছিল না। গাছ বা বেঞ্চি তো নয়ই। সে তুলনায় বেশ সাজানো-গোছানো ছিল বাড়ির সামনের দিকটা। বাক্সের মধ্যে থাকত ফুলগাছ, ঝোপঝাড়গুলোও কেটে ছেঁটে কায়দা করে রাখা হয়েছিল। কালেভদ্রে এখান দিয়ে যেতাম আমরা। যেমন ধরুন, স্কুলে প্রথম ভর্তি হওয়ার সময়ে, অথবা স্কুলের পাঠ চুকিয়ে একেবারে চলে যাওয়ার সময়ে, অথবা কারও বাবা-মা কিম্বা বন্ধুবান্ধব এলে। ছুটিছাটার সময়ে অভিভাবকদের সঙ্গে বাড়ি ফেরার সময়ে খুশির প্রাণ গড়ের মাঠ হয়ে যেত এক টুকরো সাজানো এই বাগানটার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে।

মাঠ-ঘাট, পাঁচিল আর ফটককে কিন্তু টেক্কা দিয়েছে খোদ বাড়িটা। আদ্দিকালের এই বাড়ির আগাপাশতলা আজও একটা বিরাট রহস্য হয়ে রয়ে

গেছে আমার কাছে। মোট পাঁচটা বছর কাটিয়েছি এই বাড়িতে। পাঁচ বছরেও ভালভাবে চিনে উঠতে পারিনি ঠিক কোন চুলোয় আছে আমার নিজের ঘর, অথবা আরও আঠারো জন ছেলের ঘর। বিদঘুটে এই বাড়ি যাঁর পরিকল্পনায় তৈরি হয়েছে, তাঁর মাথার গোলমাল ছিল নিশ্চয়। নইলে এত সিঁড়ি বানাতে গেলেন কেন? একটা ঘর থেকে বেরোতে গেলে, অথবা একটা ঘরে ঢুকতে গেলে কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা না করলেই নয়। গলিপথেরও অন্ত নেই। বুড়ো বাড়ির শাখাপ্রশাখার যেমন শেষ নেই, অলিগলিরও তেমনি গোনাগাঁথা নেই। কে যে কখন কোন দিকে মোড় নিচ্ছে, কোথায় শুরু হয়ে কোথায় শেষ হচ্ছে—তা পাঁচ বছরেও হিসেবের মধ্যে আনতে পারিনি বলেই আজও মনে হয় আদি অন্তহীন অসীমকে কেউ যদি কল্পনায় আনতে চান বুড়ো বিটকেল স্কুল-বাড়িটায় ঢুকে যেন একবার পথ হারিয়ে আসেন। যেমন পথ হারাতাম আমি—বহুবার—বহুবার!

বটবৃক্ষের মতন সুপ্রাচীন এই স্কুল-ইমারতের মধ্যে সবচেয়ে বড়ঘর ছিল একটাই—স্কুল-ঘর। আমার তো মনে হয়, তামাম দুনিয়া ঢুঁড়লেও এতবড় স্কুল-ঘর আর পাওয়া যাবে না। শুধু বড় বলেই নয়—পেল্লায় এই ঘরখানাকে কোনোকালেই ভুলতে পারব না এর হাড়-হিম করা চেহারাখানার জন্যে। ঘরটা খু-উ-উ-ব লম্বা, বেজায় সরু এবং দারুণ নিচু। একটা মাত্র ওক কাঠের কড়িকাঠ ঠেকিয়ে রেখেছে মাথার ওপরকার ছাদখানাকে। দু'পাশের গথিক জানলাগুলো দেখলেই মনে পড়ে যায় সেকালের অসভ্য বর্বর 'গথ' মানুষগুলোর কথা—যাদের নাম থেকে এসেছে 'গথিক' শব্দটা। টানা লম্বা এই তেপান্তর-সম ঘর অনেক দূরে যেখানে একটি মাত্র মোড় নিয়েছে, ঠিক সেইখানে আছে একটা চৌকোনা ঘেরা জায়গা—তার এক-একটা দিক আট থেকে দশ ফুট তো বটেই। 'পবিত্র' এই ঘেরাটোপে বসে গুরুগিরি করার সময়ে চেলাদের সামনে বেত আছড়াতেন আমাদের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ডক্টর ব্রান্সবি। ঘেরাটোপের দরজাটাও বিদঘুটে—যেমন বিরাট, তেমনি কদাকার, এ-দরজা যখনই খুলে যেত, বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠত আমাদের প্রত্যেকের। দূর থেকে অবশ্য রীতিমত সমীহ করে চলতাম গুরুমশায়ের এই 'পবিত্র' জায়গাটাকে।

ভীষণ ভয় হতো প্রায় এই রকমই আরও দুটো ঘেরা জায়গা দেখলে। যে দুজন মাতব্বর আমাদের মার্চ করিয়ে চরাতে নিয়ে যেত মাঠে ঘাটে, তারা বসত এইখানে। অধ্যক্ষমশায়ের ঘেরাটোপের অনেক দূরে দূরে এই দুটো ঘেরা জায়গায় একটায় বসত ইংরেজি শেখানোর মাস্টার, আর একটায় অঙ্ক শেখানোর মাস্টার। মাস্টার না বলে রাখাল বলাই উচিত এদের—মাঠে চরানোর সময় তাই তো মনে হত আমাদের।

টানা লম্বা ঘরখানার বাকি অংশ জুড়ে রয়েছে রাশিরাশি বেঞ্চি, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড—ভাঙাচোরা এবং বইয়ের পাহাড়ে ঢাকা। একদিকে বিরাট একটা বালতি ভর্তি জল, আর একটা মান্ধাতার আমলের দানবিক আকৃতির ঘড়ি।

বেঞ্চিগুলোর সারা গায়ে ছুরি দিয়ে খোদাই করা কিম্ভূতকিমাকার ছবি আর অদ্ভুত অদ্ভুত নামধাম নিয়ে গবেষণা করতে করতেই সময় কেটে যেত আমাদের। এ ঘর থেকেও অলিগলি বেরিয়েছে অসংখ্য—প্রতিটির ভেতরেই পোকায় খাওয়া, রঙজলা বই আর বেঞ্চি। ঝাঁকে ঝাঁকে কত ছেলেই এসেছে এখানে—টেবিলে বেঞ্চিতে খোদাই করে গেছে তাদের কীর্তিকাহিনী। বিকট লম্বা এই ঘরের প্রতিটি ধুলোর কণা যেন তাদের আজও মনে রেখেছে, মনে রাখবে ভবিষ্যতে.....

অতিকায় পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এইরকম একটা বিদ্যে অর্জন করবার জায়গায় আমার সময় কেটে যেত হু-হু করে। পালাই-পালাই ইচ্ছেটা একেবারেই ছিল না মনের মধ্যে। দিনগুলোকে একঘেয়ে মনে হত না কখনোই, অথবা মেজাজও কখনো খিচড়ে থাকত না। এইভাবেই হৈ-চৈ করে এসে পড়লাম তৃতীয় বছরে। ছেলেমানুষের মগজে খেয়াল খুশির শেষ হয় না বলেই দিনগুলো উড়ে যেত প্রজাপতির মত পাখনা মেলে। বাইরের জগতের হাসি-হররা'র দরকার হত না মনটাকে ফুর্তির সায়রে ডুবিয়ে রাখার জন্যে। এটা ঠিক যে স্কুলের জীবনে হাজারো বৈচিত্র্যের ঠাঁই নেই। কিন্তু আমি ওই বয়সেই এমন পেকে উঠেছিলাম যে রোজই কিছু না কিছু আনন্দের খোরাক জুটিয়ে নিতাম। তাছাড়া, অপরাধ করার প্রবণতা তখন থেকেই উঁকিঝুঁকি দিতে আরম্ভ করেছিল আমার চলনে-বলনে-চাউনিতে। আমার সেই দিনগুলোর স্মৃতি সেই কারণেই এত জ্বলজ্বল করছে মনের অ্যালবামে। ছোট বয়সের সব কথা বড় বয়সে অক্ষরে অক্ষরে সচরাচর কারও মনে থাকে না, জড়িয়ে মড়িয়ে একটা আবছা বাল্যস্মৃতি হয়ে থেকে যায় এবং তা আরও অস্পষ্ট হয়ে যেতে থাকে একটু একটু করে চুল-দাড়ি পাকার সঙ্গে সঙ্গে। আমার ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। কারণ আমি ছিলাম সৃষ্টিছাড়া। আমি ছিলাম অকালপক্ক।

কাক-ডাক ভোরে ঘুম থেকে ওঠা, রাত নামলেই বিছানায় ঢুকে পড়ার হুটোপাটি, মেপেজুপে আবৃত্তি করা, হাফ-হলিডে, খেলার মাঠে দামালিপণা, সঙ্গীদের নিয়ে ষড়যন্ত্র—ঘটনাগুলো নেহাৎই একঘেয়ে আর পাঁচজনের কাছে—প্রত্যেকটাকে আলাদা করে মনে রাখার কোনো কারণ নেই—মনেও থাকে না—স্মৃতির খাতায় সব একাকার ধূসর ধোঁয়াটে হয়ে যায়। আমি কিন্তু সব কিছুই মনে রেখেছি আজও। কেননা, রোজকার এই সব ঘটনার মধ্যেই মিশিয়ে রেখেছি আমার আবেগ, উত্তেজনা, উন্মাদনাকে। বৈচিত্র্যকে আমি আবিষ্কার করেছি মুহূর্তে মুহূর্তে। গলা টিপে শেষ করে দিয়েছি একঘেয়েমির।

আমার এই অফুরন্ত উৎসাহই আমাকে আরও আঠারোটা ছেলের মধ্যমণি করে তুলেছিল। আমার কথাবার্তা চালচলনই বুঝিয়ে দিত, কেউকেটা আমি নই। বয়সে যারা আমার চাইতে বড়, একটু একটু করে তারাও হাড়ে হাড়ে বুঝে গেছিল আমার চরিত্রটাকে—তাই ঘাঁটাতে চাইত না। শুধু একজন ছাড়া।

এই একজন স্কুলেরই একটি ছেলে। তার সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা আমার নেই। অথচ আমার যা নাম, তারও তাই নাম। মায় পদবীটা পর্যন্ত। হেঁজিপেঁজি

ঘরে জন্ম নয় আমার— সাধারণ মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার মতো! নামই পাইনি বাবা আর মায়ের কাছ থেকে। তা সত্ত্বেও নামের এই মিলটা এমনই পিলে চমকানো যে ভেবে কুলকিনারা পাওয়া যায় না। এই সব ভেবেই এই কাহিনীতে 'উইলিয়াম উইলসন' নামে আমার পরিচয় দিয়েছি— মনগড়া নাম ঠিকই—তবে আসল নামটা থেকে খুব একটা দূরে নয়।

যা খুশি করব কে বাধা দেবে আমাকে—আমার এই স্বেচ্ছাচারীমানসিকতা থেকেই এসেছে দাপুটে স্বভাবটা। স্কুলের অন্য কোনো ছেলে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস পেত না—রুখে দাঁড়াতো কেবল একজনই—আশ্চর্যভাবে যার পুরো নামটা আমারই পুরো নাম। কি পড়াশুনায়, কি খেলাধুলায়—আমার জবরদস্তির কাছে নতি স্বীকার করেছে প্রত্যেকে—এই ছেলেটি ছাড়া। পদে পদে আমার যা-খুশি হুকুমকে থোড়াই কেয়ার করেছে।

হ্যাঁ, সে আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে—কিন্তু প্রকাশ্যে নয়। পাঁচজনকে দেখিয়ে দেখিয়ে টেক্কা মারতে যায়নি আমাকে। সবার সামনে অপদস্থ করে বাহাদুরি নিতেও কখনো যায়নি। আর শুধু এই একটা কারণেই আমার সঙ্গে তার সম্পর্কটা থেকেছে বন্ধুত্বের সম্পর্ক—লাঠালাঠির সম্পর্ক তো নয়ই।

উইলসনের বিদ্রোহটা তাই আমার কাছে বড় গোলমেলে ঠেকেছিল। ও যে আমার থেকে সব দিক দিয়েই বড়, তা বুঝতাম বলেই মনে মনে ভয় করতাম। গোটা স্কুলে আমার সমান-সমান হওয়ার ক্ষমতা যে শুধু ওরই আছে, এমনকি আমাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও ওর আছে—তা শুধু নজরে এনেছিলাম আমিই—স্কুলের বোকাপাঁঠা বন্ধুগুলো তা খেয়ালই করেনি। ও আমার সঙ্গে টক্কর দিয়েছে, আমাকে বাধা দিয়েছে, আমার বহু ষড়যন্ত্র ভণ্ডুল করে দিয়েছে—কিন্তু কখনোই তা পাঁচজনের সামনে করেনি। আমি দেখেছি, উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিক দিয়ে আমারই মতো ও বেপরোয়া, আমার মতনই তার মন বল্গাছেঁড়া বাঁধনহারা। তার খেয়ালখুশির চরমতা আমাকেও চমকে দিয়েছে বারে বারে। অবাকও হয়েছি আমার ওপর ওর একটা চাপা স্নেহ দেখে। সে আমাকে অপমান করেছে, মনে ঘা দিয়েছে, নানা রকমভাবে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করেছে—কিন্তু আমার ওপর চাপা স্নেহের ভাবটা সর্বক্ষেত্রেই ফুটে ফুটে বেরিয়েছে। একই সঙ্গে লড়েছে, আবার আগলেও রেখেছে—শায়েস্তা করেছে, আবার জ্বালা জুড়িয়েও দিয়েছে। ওর এই লুকোচুরি খেলাটাই আমার কাছে বিরাট রহস্য হয়ে উঠেছিল। ভেবে পাইনি এটা কি ধরনের আত্ম-প্রবঞ্চনা।

স্কুলের সব্বাই কিন্তু ধরে নিয়েছিল আমরা যমজ ভাই। একে তো দুজনেরই নাম হুবহু এক, তার ওপরে ঠিক একই দিনে দুজনেই ভর্তি হয়েছি এই স্কুলে। স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর খোঁজখবর নিয়ে জেনেছিলাম আরও একটা চক্ষুস্থির করার মত ঘটনা। একই দিনে ভূমিষ্ঠ হয়েছি আমরা দুজনে—১৮১৩ সালের জানুয়ারি মাসের বিশেষ একটি দিনে!

আমার পয়লা নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এই উইলসন। অথচ শুনে রাখুন, একটা

দিনের জন্যেও ওকে দু'চক্ষের বালি মনে করতে পারিনি। এমন একটা দিনও যায়নি যেদিন ঝগড়া হয়নি দুজনের মধ্যে। অথচ কথাবার্তা বন্ধ থাকেনি একটা মুহূর্তের জন্যেও। ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে গো-হারান হেরেছি আমি—কিন্তু ও টিটকিরি দেয়নি—নীরবে নিঃশব্দে শুধু বুঝিয়ে দিয়েছে শুধু আমাকেই—আমি ওর যোগ্য পাল্লাদার নই কোন মতেই। রেষারেষি ছিল বটে দুজনের মধ্যে—কিন্তু শত্রুতা ছিল না। আমারই মত সে মেজাজী, দাপুটে, দুর্দান্ত—অথচ কখনোই আমার ঘাড় মুচড়ে মাথা নিচু করতে যায়নি। এই সব কারণেই ওকে মনে মনে ভয় করতাম, সমীহ করতাম, ওর সম্বন্ধে অগাধ কৌতূহলে ফেটে পড়তাম। সব মিলিয়ে স্কুল জীবনে আমরা দুজনে ছিলাম একটা প্রচণ্ড জুটি। প্রবল প্রতাপের মানিকজোড়।

অথচ আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলতে কখনোই ছাড়েনি আমার এই হুবহু জোড়া-টি। চোট দিয়ে গেছে স্রেফ মজা করার ভঙ্গিমাতে—কিন্তু দাগা দিয়েছে মনের একদম ভেতরে। শত্রুতার ছিটেফোঁটাও থাকত না এইসব গাড়োয়ালি ঠাট্টা ইয়ার্কির মধ্যে। আমি কিন্তু পাল্টা ঘা মারতে পারতাম না ঠিক ওরই কায়দায়। আগেভাগে আঁচ করে নিত উইলসন। যত রেখে ঢেকেই ফন্দী আঁটি না কেন—ওর তা অজানা থাকত না কক্ষনো। জন্মসূত্রে কিছু কিছু ত্রুটি আছে আমার শরীরের গঠনে—ও তা জানত। এগুলোকে নিয়ে মস্করা করাটা ঠিক নয়। কেউ তা করত না। কিন্তু ও ঠিক এইসব ব্যাপারেই বেশি উৎসাহ দেখাত—যেমন, চাপা ফিসফিসানির স্বরে কথা বলা আমার স্বভাব। আমার গলার দোষও বলতে পারেন। উইলসন ঠিক এইভাবে, চাপা ফিসফিসানির সুরে কথা বলে যেত আমার সঙ্গে।

শুধু এই নয়, আমাকে খোঁচা মারার আরও অনেক পন্থা মাথায় এনেছিল এই উইলসন। ঠিক আমার মত কেউ হাঁটুক, কথা বলুক—এটা আমি সহ্য করতে পারতাম না কোনদিন। বিশেষ বিশেষ কিছু শব্দ অন্য কেউ বললে আমার গা-পিত্তি জ্বলে যেত। এগুলো ছিল আমার একেবারেই নিজস্ব। উইলসন অনায়াসে এই শব্দগুলো উচ্চারণ করত, একইভাবে হাঁটত, একইভাবে কথা বলত। নাম যার এক, একই দিনে যার একই স্কুলে আগমন, সে যদি এইভাবে আমাকে নকল করে যায় দিনের পর দিন—মাথা কি ঠিক রাখা যায়?

তখনও তো জানতাম না—দুজনের বয়সও এক। শুধু দেখতাম, মাথায় দুজনেই সমান ঢ্যাঙা, মুখের চেহারাও বলতে গেলে একই রকম—কথাও বলত আমার কথা বলার ঢঙে—চাপা ফিসফিসানির সুরে। ও জানত, এই সব ব্যাপারই আমার অ-পছন্দ, রেগে যাচ্ছি মনে মনে—তা সত্ত্বেও খুব সূক্ষ্মভাবে খোঁচা মেরে যেত আমার মনের একদম মধ্যিখানে। তাইতেই ওর তৃপ্তি। তাইতেই ওর শান্তি।

আমি যে-ধরনের জামাকাপড় পরতাম, সেগুলোকে পর্যন্ত নকল করত এই উইলসন। হুবহু 'আমি' হয়ে হাঁটত, হাসত। কথা বলত আমারই ভাঙা গলার অনুকরণে। কাঁহাতক এই ব্যঙ্গ সহ্য করা যায়?

অথচ একে ঠিক ব্যঙ্গও বলা যায় না। ও তো পাঁচজনকে দেখিয়ে দেখিয়ে আমার 'নকল' সাজতে যায়নি। শুধু আমাকে গোপনে গোপনে বুঝিয়ে দিয়েছে—অনায়াসেই ও আমার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে—আমাকে ছাড়িয়েও যেতে পারে। বহু ব্যাপারে জিতে গিয়ে সবার সা মনে নিজেকে জাহির করতে চায়নি—জয়ের পুরস্কার ছিল ওর কাছে পরম তাচ্ছিল্যের ব্যাপার—কিন্তু আড়ালে আমাকে ঘা মেরে বুঝিয়ে দিয়েছে, পদে পদে এইভাবেই ও জয়ের মুকুট পরে যাবে—আমাকে একধাপ নিচে নামিয়ে রাখবে। তখন দেখেছি ওর ঠোঁটের কোণে কোণে অতি মিহি অতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি। আমার মনের ভেতরে ভয়ানক বিষ ছোবল মেরে মেরে ঢুকিয়ে দিয়ে ও যে কি আনন্দ পেত তা বলে বোঝাতে পারব না।

আগেই বলেছি আমার সব কাজে বাগড়া দিলেও এই উইলসনই কিন্তু আগলেও রেখে দিত আমাকে বিপদ-আপদ থেকে। যত দিন গেছে, ততই দেখেছি, ওর এই উপদেশ দেওয়ার ঝোঁকটা বেড়েই চলেছে। উপদেশগুলোও হতোনিখাদ—বয়েসের অনুপাতে সব দিক দিয়েই অদ্ভুতভাবে অনেক জ্ঞান আর বুদ্ধি মাথার মধ্যে ঠেসে রেখে দিয়েছিল উইলসন। যখন তখন জ্ঞানবুদ্ধির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিত আমার ওপর। আজ বুঝছি, ওর সেই ধারালো বুদ্ধির কথামত যদি জীবনটাকে চালাতাম, তাহলে এত ভোগান্তিতে পড়তে হতো না। অনেক সুখে থাকতাম।

যাইহোক, উইলসনের এই খবরদারি শেষ পর্যন্ত চরমে উঠল। আর আমি মুখ বুঁজে সয়ে যেতে পারলাম না। মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে গেছি রোজই। মুখের ওপরেই বলে দিয়েছি, ঔদ্ধত্য সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। স্কুল জীবনের প্রথম দিকে মোটামুটি একটা বনিবনা ছিল দুজনের মধ্যে—আগেই তা বলেছি। কিন্তু শেষের দিকে ক্রমশঃ তিক্ত হয়ে উঠল সম্পর্ক। ধীর স্থিরভাবে ও যতই খবরদারি চালিয়ে গেছে আমার ওপর, ততই বিদ্বেষ জমাট হয়েছে আমার মনের মধ্যে। ধীরে ধীরে বিদ্বেষের বিষ ঘৃণার রূপ নিয়েছে। মনে প্রাণে ঘৃণা করতে শুরু করেছি উইলসনকে। ও তা লক্ষ্য করেছে বিশেষ একটা ঘটনার সময়ে এবং তার পর থেকেই এড়িয়ে থেকেছে আমাকে, অথবা এড়িয়ে থাকার অভিনয় করে গেছে।

যতদূর মনে পড়ে, প্রায় এই সময়েই, একবার কি একটা ব্যাপারে ভয়ানক কথা কাটাকাটি হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। রেগে গেলে আমি কোনদিনই মাথার ঠিক রাখতে পারি না—সেদিনও পারিনি। কিন্তু রীতিমত চমকে উঠেছিলাম উইলসনকেও মাথা গরম করে ফেলতে দেখে। আর ঠিক তখনি ও যেভাবে যে-ভাষায় আমার সঙ্গে ঝড়ের বেগে কথা চালিয়ে গেছিল, তার সঙ্গে আশ্চর্য মিল খুঁজে পেয়েছিলাম আমার একদম ছেলেবেলার দিনগুলোর। ভীষণভাবে চমকে উঠেছিলাম আসলে এই কারণেই। ভুলে যাওয়া দিনগুলোয় আমি ঠিক যেরকম ছিলাম, যেভাবে হাত-পা ছুঁড়তাম, যেভাবে গলাবাজি করতাম, যেভাবে চোখ পাকাতাম—হুবহু সেই-সেই ভাবে উইলসনকেও তর্জন গর্জন করতে

দেখে আমি হকচকিয়ে গেছিলাম। ছোট্ট বয়সের 'আমি'কেই আমি দেখেছিলাম আমার সামনে—পাল্লা দিয়ে যে দাঁত কিড়মিড়িয়ে যাচ্ছে আমারই সঙ্গে! আশ্চর্য! অদ্ভুত! অবিশ্বাস্য!

বিশাল কিম্ভূতকিমাকার বাড়িটায় শাখা-প্রশাখা ছিল অগুন্তি—আগেই বলেছি। চারদিকে ডালপালা ছড়িয়ে দেওয়া একটা মহীরুহ বললেই চলে। এক-একটা শাখা আবার মহলের পর মহল জুড়ে এগিয়েই গেছে দূর হতে দূরে। ঘরের পর ঘর। যাতায়াতের রাস্তাও ঘরগুলোর মধ্যে দিয়ে। এ ধরনের বিদঘুটে ছকে তৈরি বাড়ির আনাচে কানাচে খাঁজ থাকবে অগুন্তি—এটাই তো স্বাভাবিক। অদরকারী কোণ আর ফাঁকগুলোকেও কাজে লাগিয়েছিলেন মিতব্যয়ী অধ্যক্ষমশায়। প্রতিটায় তৈরি করেছিলেন একটা করে খুপরি-ঘর। এই রকমই একটা পায়রার খোপে থাকত উইলসন। একাই থাকত। এ সব ঘরে একজনের বেশি থাকা সম্ভব ছিল না।

আমি তখন পঞ্চম বছরে পড়ছি। এই সময়েই একদিন তুমুল বচসা হয়ে গেছিল উইলসনের সঙ্গে। মাথায় আগুন জ্বলে গেছিল আমার। স্থির থাকতে পারেনি উইলসন নিজেও। ঘটনাটা একটু আগেই বলেছি। সেইদিন রাত ঘনাতেই আমি ঠিক করলাম উইলসনের ঘরে হানা দেব। স্কুলের সব্বাই তখন ঘুমিয়ে কাদা। মটকা মেরে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর উঠে পড়লাম। একটি মাত্র লম্ফ হাতে নিয়ে অলিগলির গোলকধাঁধা পেরিয়ে পা টিপে টিপে চললাম আমার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘরের দিকে। অনেক সয়েছি—এবার এক হাত নেবই নেব। ফন্দীটা মাথার মধ্যে ঘুরছিল অনেকদিন ধরেই। সাহসে কুলিয়ে ওঠেনি এতদিন। সেই রাতে মন শক্ত করলাম। বিদ্বেষ-বিষ আমার মধ্যে কতখানি জমেছে, তা ওর জানা দরকার। ছোবল মেরে মেরে অনেক বিষ ঢেলেছে আমার মনের মধ্যে—তার কিছুটা উগরে দেবই দেব। এবং তা ভয়ানক ভাবে।

খুপরি ঘরের সামনে পৌঁছে লম্ফটা রাখলাম বাইরে। কাগজের ঢাকা দিয়ে রাখলাম ওপরে। তারপর ঠিক বেড়ালের মত এতটুকু শব্দ না করে ঢুকলাম ঘরের ভেতরে।

একটা পা সামনে ফেলেই কান খাড়া করে শুনেছিলাম ধীর স্থির শান্তভাবে নিঃশ্বেস নিচ্ছে আর ফেলছে উইলসন। বুঝলাম, ঘুমোচ্ছে অঘোরে। তাই বেরিয়ে এলাম বাইরে। লম্ফটা তুলে নিয়ে এগোলাম ওর খাটের দিকে। পর্দা ঝুলছিল বিছানার চারপাশে। ফন্দীমাফিক একহাতে লম্ফ ধরে, আর এক হাতে একটু একটু করে একটু করে সরালাম পর্দা। লম্ফের জোরালো আলো গিয়ে পড়ল ওর ঘুমন্ত মুখের ওপর—একই সঙ্গে আমার চাহনিও আটকে গেল ওর মুখে।

যা দেখলাম, তা দেখার সঙ্গে সঙ্গে যেন বরফের মত কনকনে ঠাণ্ডায় মুহূর্তের মধ্যে অসাড় হয়ে গেল আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। ঘন ঘন উঠতে আর নামতে লাগল বুকের খাঁচা। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল দুটো হাঁটু। নামহীন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল আমার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে নিমেষের মধ্যে। নিঃশ্বেস

নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। খাবি খাচ্ছিলাম। সেই অবস্থাতেই লম্ফটা আরও একটু নামিয়ে এনেছিলাম ঘুমন্ত মুখখানার আরও কাছে। সারা মুখ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সুস্পষ্ট রেখাগুলোর দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়েছিলাম····· আর চেয়েছিলাম। মুখাবয়বের পরতে পরতে এই যে এই দাগ আর রেখা—এগুলো কি সত্যিই উইলিয়াম উইলসনের? এত কাছ থেকে চোখের ভুল হতে পারে না। স্পষ্ট দেখছি, দাগ আর বিশেষ বিশেষ রেখাগুলো সবই জ্বলজ্বল করছে ওরই মুখ জুড়ে—তবুও ঘোরের মধ্যে মনে হচ্ছে যেন ভুল দেখছি—এই দাগ, এই রেখা, এই তিল, এই চিহ্ন কখনোই থাকতে পারে না উইলিয়াম উইলসনের মুখে। মাথাব মধ্যে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেল মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে। তবুও চেয়ে রইলাম ফ্যাল ফ্যাল করে—চোখের পাতা ফেলতেও ভুলে গেলাম। এ আমি কি দেখছি! লক্ষ লক্ষ উদ্ভট চিন্তা তালগোল পাকিয়ে ধেই ধেই নাচ শুরু করে দিলে মগজের কোষে কোষে। কক্ষনো না····· কক্ষনো এই মুখ, এই সব চিহ্ন উইলিয়াম উইলসনের হতে পারে না। জেগে থেকে পদে পদে আমাকে অনুকরণ করার পরিণামই কি এহেন রূপান্তর! এক নাম! এক উচ্চতা! মুখের আদল একই রকম! একই দিনে স্কুলে ভর্তি হওয়া! তারপর থেকেই ছিনে জোঁকের মত আমার মতই হতে চেয়েছে; আমার চলাফেরা, আমার কথা বলা, আমার স্বভাবচরিত্র, আমার গলার স্বর হুবহু নকল করে গেছে শাণিত শ্লেষের হাসি হেসে। ও যা হতে চেয়েছে, ঘুমন্ত অবস্থায় অবিকল তাই হয়ে গেছে! কিন্তু তাও কি সম্ভব? জাগ্রত অবস্থায় মন প্রাণ দিয়ে কারও সব কিছু নকল করে গেলেই কি ঘুমন্ত অবস্থায় নকলটা আসল হয়ে যেতে পারে? পার্থিব দুনিয়ায় কি এমনটা হতে পারে? নাকি, আমি নিজেই পাগল হয়ে গেছি! অপার্থিব বিভীষিকা দেখছি বলেও তো মনে হয় না!

বিষম ত্রাসে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল আমার সারা শরীর। লম্ফটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে পেরিয়ে এলাম চৌকাঠ এবং আর একটা মিনিটও দেরি না করে তৎক্ষণাৎ চম্পট দিলাম স্কুল থেকে—জীবনে আর ফিরে যাইনি সেখানে।

কয়েকটা মাস স্রেফ শুয়ে বসে কাটিয়ে দিলাম বাবা আর মায়ের কাছে। সীমাহীন আলসেমি আমাকে কুঁড়ের বাদশা করে তুলেছিল এই সময়ে। তারপর ভর্তি হলাম ইটন শিক্ষামন্দিরে। ডক্টর ব্রান্সবি'র স্কুলের ছুঁচফোটানো স্মৃতিগুলো তদ্দিনে ফিকে হয়ে এসেছে। অথবা বলা যায়, স্মৃতিগুলোকে কল্পনার বাড়াবাড়ি বলেই ধরে নিয়েছি। গোড়াতেই বলেছি, মনে মনে তিল-কে তাল করে নেওয়ার প্রবণতা আমার রক্তেই রয়েছে। নিশুতি রাতে লম্ফর আলোয় যা দেখেছি, তাকে কল্পনাশক্তি দিয়ে নিশ্চয় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিয়ে অযথা ভয়ে মরেছি। দুঃসহ স্মৃতিগুলোর যে-টুকু রেশ মনের মধ্যে ইনিয়ে বিনিয়ে রয়ে গেছিল—ইটনে বেপরোয়া জীবনযাপন করার ফলে তা একেবারেই ধুয়ে মুছে গেল।

তিন-তিনটে বছর যেন ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে গেল আমার জীবনের খাতা

থেকে। উচ্ছৃঙ্খলতা কাকে বলে, তা দেখিয়েছি এই তিনটে বছরে। ডুবে থেকেছি পাপ কাজের পাঁকে। তাতে লাভ কিছুই হয়নি—ক্ষতি ছাড়া শরীরেও ভাঙন ধরেছিল একটু একটু করে। শেষের দিকে একটা গোপন আড্ডায় জমায়েৎ করলাম আমার খারাপ কাজের সঙ্গীদের। আড্ডা বসল আমারই ঘরে—গভীর রাতে। তাসের জুয়োয় উন্মোল হলাম, মদের নেশায় চুর চুর হলাম। শিরায় উপশিরায় রক্তের মধ্যে যখন তুফান জেগেছে, উন্মাদের অট্টহাসি হেসে ঘরের চার দেওয়ালে প্রায় চৌচির করে দিয়ে 'আরও মদ, আরও মদ' করে চেঁচাচ্ছি—ঠিক সেই সময়ে ভয়ানক শব্দে আছড়ে খুলে গেল ঘরের দরজা এবং চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল গলায় হেঁকে বললে একজন ভৃত্য—এক্ষুনি আমাকে আসতে হবে নিচের হলঘরে—দেখা করার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন এক ভদ্রলোক—তাঁর আর তর সইছে না।

আচমকা বাধা পাওয়ায় মোটেই অবাক হইনি—বরং মজা পেয়েছিলাম। মদিরার প্রলয়-নাচন যখন মগজের প্রতিটি কোষকে বেদম বেহেড করে তুলেছে, ঠিক সেই সময়ে কে এই উটকো উৎপাত, তা দেখবার জন্যে তক্ষুনি ছুটে বেরিয়ে গেছিলাম ঘর থেকে। টিমটিম করে একটা মাত্র বাতি জ্বলছিল বাইরের গলিপথে। সে আলোয় একহাত দূরেও কিছু দেখা যায় না। তবে ঘুলঘুলি দিয়ে আসছিল ভোরের আলো। সেই দেখেই বুঝলাম, মদ খেয়ে আর তাস খেলে রাত ভোর করে দিয়েছি

নিভু-নিভু আলোয় হলঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম একজন যুবাপুরুষকে। উচ্চতায় সে আমার মতনই। পরনে যে হালফ্যাশনের সাদা রঙের ফ্রক-কোট রয়েছে, সেটাও হুবহু আমার গায়ের ফ্রক-কোটের মতনই। আধো-অন্ধকারে শুধুথএই টুকুই দেখেছিলাম। তার মুখ দেখতে পাইনি। কেননা, আলো পড়ছিল না মুখে

আমাকে দেখেই সে ত্রস্তে ছুটে এল আমার দিকে। অধীর ভাবে খামচে ধরল আমার বাহু। কানের কাছে মুখটা এনে বললে চাপা, ভাঙা 'গলায়'—'উইলিয়াম উইলসন।'

পলকের মধ্যে নেশা ছুটে গেল আমার।

আগন্তুক সেই মুহূর্তে তার তর্জনী তুলে ধরেছে আমার চোখের সামনে। ব্রেনের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে তার চাপা শাসানি। কিন্তু এ যে সেই গলা, সেই সুর, সেই উচ্চারণ। কেটে কেটে প্রতিটি অক্ষরের ওপর জোর দিয়ে কথা বলার এই ঢঙ তো ভোলবার নয়। চোখের সামনে আঙুল নেড়ে বাহু খামচে ধরে আমার ঘোর কাটিয়ে দেওয়ার এই পন্থা তো আগেও ঘটেছে! আজ থেকে তিন বছর আগে! অনেক উদ্দামতার তলায় চাপা পড়া অতি-ক্ষীণ স্মৃতিগুলো অকস্মাৎ আশ্চর্য রোশনাই ছড়িয়ে ভেসে উঠল আমার মনের ওপর। চকিতের জন্যে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলাম। নিঃসাড় হয়ে গেছিল আমার সব কটা ইন্দ্রিয়। পরক্ষণেই ধাতস্থ হলাম বটে—কিন্তু তাকে আর দেখতে পেলাম না। প্রভঞ্জণ বেগে উধাও

হয়ে গেছে আমার হুঁশ ফেরার আগেই।

ঘটনাটা প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে গেল আমাকে। মদিরায় আচ্ছন্ন ছিলাম ঠিকই, পাগলা ঘোড়ার মতই আমার কল্পনাশক্তি দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে, তবে যা দেখেছি আর যা শুনেছি—তা ভুল নয়। চোখের বা কানের বিভ্রম নয়। কে এই উইলিয়াম উইলসন? আমি যেদিন ডক্টর ব্রান্সবি'র স্কুল ছেড়ে চম্পট দিই—তার পরের দিনই উইলসনও স্কুল ছেড়ে বাড়ি চলে গেছিল ফ্যামিলিতে একটা দুর্ঘটনার খবর পেয়ে। এইটুকু খবরই শুধু রাখতাম। তারপর সে কোন চুলোয় আছে, কি করে বেড়াচ্ছে—কিস্‌সু খবর পাইনি। রাখবার চেষ্টাও করিনি। কিন্তু সেদিন রাতভোরে আমি যখন নরক-গুলজার করে চলেছি—ঠিক সেই সময়ে ধূমকেতুর মত এসে অতীত দিনগুলোর মতই আমার সুবুদ্ধি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেই চকিতে আবার উধাও হয়ে গেল কেন?

চকিত-ধাক্কা হলেও, নড়ে গেছিল আমার মনের ভিত পর্যন্ত। ইটনের শিক্ষায়তন ছেড়ে দিলাম এর পরেই— গেলাম অক্সফোর্ডে। আমার কোনো অভিলাষেই অন্তরায় হন নি আমার দুর্বলচিত্ত বাবা আর মা। সেবারও হতে পারলেন না। উল্টে থাকা খাওয়ার মাসিক ব্যবস্থা করে দিলেন। গ্রেট বৃটেনের আমীর ওমরাদের উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলেদের সঙ্গে মিশে গোল্লায় যাওয়ার পথ এই ভাবেই তৈরী করে দিলেন আমার জনক এবং জননী।

চুটিয়ে কাজে লাগালাম সব কটা সুযোগ সুবিধেকে। গ্রেট ব্রিটেনের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এত বেলেল্লাপনা হয়নি—যা আমি করে গেছি অক্সফোর্ডে। নষ্টামির নানান ফন্দী রোজই গড়িয়ে উঠত আমার কু-মগজে এবং তার প্রতিটিতে ইন্ধন জুগিয়ে গেছে আমার নারকীয় সহচরেরা। টাকা পয়সা উড়িয়েছি খোলামকুচির মত—একটার পর একটা পাপ কাজ করে গেছি মনের আশ মিটিয়ে। সে·সবের ফিরিস্তি দিয়ে পাঠকের পরিচ্ছন্ন রুচিবোধকে আঘাত দিতে চাই না।

শুধু এইটুকু বলব যে, এই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতেই পঙ্কিল জীবন যাপনের নরক-আনন্দকে আরও তুঙ্গে পৌঁছে দেওয়ার জন্যেই তাসের হাত-সাফাই জুয়োয় ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলাম আমি। উৎকট আনন্দ পেতাম এই নোংরামিতে— সেই সঙ্গে ঝমঝমিয়ে টাকার স্রোত ঢুকে যেত আমার সব ক'টা পকেটে। টাকার তো আমার অভাব ছিল না। আমাকে গুড়ের কলসী মনে করে যে নির্বোধগুলো ভনভনিয়ে ঘুরতো আমার চারপাশে, তাসের জুয়োয় জোচ্চুরি করে তাদেরকেই দোহন করতাম। এইভাবেই দিনে দিনে উঁচু হচ্ছিল আমার টাকার পাহাড়। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছিলাম জোচ্চুরি খেলায় এবং আবিষ্কার করেছিলাম বহুবিধ কুসরৎ।

তাসের ভেল্কী আর নানান পাপাচারে পোক্ত হতে হতেই কেটে গেল দুটো বছর। তারপর ইউনিভার্সিটিতে এল বেজায় সম্ভ্রান্ত এক যুবাপুরুষ। তার নাম লর্ড গ্লেনডিনিঙ। দেদার টাকার মালিক—গুনে গেঁথেও নাকি শেষ করা যায় না। এই

সব খবর কানে আসতেই চনমনে হল আমার লোভী সত্তা। নতুন কুবেরকে কায়দায় আনবার ফন্দীফিকিরে ব্যস্ত হল মগজ। বার কয়েক টেনে আনলাম তাকে আমার তাসের জুয়োয়। জুয়ারী-কৌশল বিস্তার করে প্রতিবারেই কিছু টাকা জিতিয়েও দিলাম। জুয়া-শিল্পের চৌকস শিল্পীরা এইভাবেই শিকারকে ফাঁদে ফেলে। তারপর যখন দেখলাম, জুয়োর নেশা বেশ জমেছে এবং তাস খেলে টাকা উপায় করার শিল্পে নিজেকে বড় শিল্পী বলে মনে করছে গ্রেনডিনিঙ, তখন একটা ছোট্ট পার্টির আয়োজন করলাম আমারই এক দোস্ত মিস্টার প্রেসটন-এর বাড়িতে। সেখানে যে শেষকালে তাসখেলা হবে, তা ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানতে দিলাম না। এমনকি মিস্টার প্রেসটন আমার হরিহরাত্মা বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে তাঁকে অন্ধকারেই রেখে দিলাম। সবাই জানল, পার্টিতে শুধু খাওয়া-দাওয়া হবে, একটু-আধটু হৈ-হল্লা ফূর্তি হবে—তার বেশি কিছু না। সাত-আট জন কলেজ-বন্ধুকে নেমন্তন্ন করলাম বটে—কিন্তু তাদেরও কেউ জানল না আমার মূল অভিপ্রায়টা কি।

শুধু আমিই জানলাম আমার ক্রূর অভিসন্ধির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। টাকার কুমীর গ্রেনডিনিঙকে ভেঙে চুরমার করে দেব এই খেলায়।

খানাপিনা শেষ হলে পর আকণ্ঠ মদিরা-সেবন করে গেলাম প্রত্যেকেই। মাথার মধ্যে রিমঝিম রিমঝিম বাদ্যি শুরু হয়ে যেতেই তাসের নেশা মাথাচাড়া দিল গ্রেনডিনিঙ-এর মগজে। আলগা কথার মধ্যে দিয়ে জুয়োর প্রসঙ্গটা আমিই এনে দিয়েছিলাম মদের আড্ডায়। সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল টাকার কুমীর। শুরু হয়ে গেল সর্বনাশা খেলা। শুরু হয়েছিল সবাইকে নিয়েই। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ছলচাতুরির জাল বিছিয়ে আমার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করালাম শুধু গ্রেনডিনিঙ-কেই। দেখলাম, ওর সারা মুখ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মদের নেশায় আর খেলার উত্তেজনায়। পর-পর কয়েক হাত খেলে গেলাম ঠাণ্ডা মাথায়। প্রতিবারেই বাজি হারল গ্রেনডিনিঙ এবং গনগনে হয়ে উঠল গোটা মুখখানা। জেতবার নেশায় ও তখন আত্মহারা। ওষুধ ধরেছে বুঝলাম এবং আর খেলতে চাইলাম না। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল ধনকুবের প্রতিদ্বন্দ্বী। আমি বেঁকে বসলাম—খেলব না কিছুতেই। হেরে যাওয়ার এই ঝোঁক কাটিয়ে ওঠা উচিত গ্রেনডিনিঙের। ও কিন্তু তারস্বরে বাজি ধরল দ্বিগুণ। আর সবাই অবাক হলেও আমি হলাম না। আমি তো জানি, এ-রোগের এই পরিণতিই হয়। যতই নিঃস্ব হতে চলেছে, ততই রোখ চেপে যাচ্ছে গ্রেনডিনিঙের। যেন নিমরাজী হয়ে তাস ভাগ করলাম। খেলা শুরু করলাম। শেষও করলাম। গো-হারান হেরে গেল গ্রেনডিনিঙ। এবং সেই প্রথম অবাক হলাম ওর মুখের রক্তরাঙা ভাবটা লক্ষ্য করে। একী নিছক মদের রক্তোচ্ছ্বাস, না, ফতুর হওয়ার পূর্বাভাস? আবার তাস সরিয়ে নিলাম—কিন্তু গোঁ ধরে বসল ধনকুবের-নন্দন। খেলতেই হবে। এবার আরও দ্বিগুণ বাজি। ঘরশুদ্ধ সবাই হতভম্ব। আমি নিজেও একটু হকচকিয়ে গেলাম গ্রেনডিনিঙে মুখের অকস্মাৎ পাণ্ডুরাভা লক্ষ্য করে। ছাইয়ের মত

ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে মুখখানা। ও যে বেজায় বড়লোক, এ খবর নিয়েই তো জালে জড়িয়েছি—এত অল্পে ভেঙে পড়বে, তাতো জানতাম না। এ-খেলাও শেষ হলো আমার হাতের কারসাজি মতই। সমস্ত রক্ত নেমে গেল গ্রেনডিনিঙের মুখ থেকে।

ঘর নিস্তব্দ। প্রত্যেকেই নিশ্চুপ। ভর্ৎসনা মিশোনো জোড়া জোড়া চোখ নিবদ্ধ আমার ওপর। অসহ্য উদ্বেগ চেপে বসেছে আমার বুকের মধ্যে। দুঃসহ এই বোঝা ক্ষণেকের জন্যে লঘু হয়ে গেল আচম্বিতে ঘরের ভাবি দরজার পাল্লা দুটো দু-হাট হয়ে খুলে যাওয়ায়। দমকা হাওয়ায় একই সঙ্গে নিভে গেল ঘরের সব ক'টা মোমবাতি। নেভবার মুখেই দেখতে পেলাম খোলা দরজা দিয়ে মূর্তিমান প্রহেলিকার মতই ঝড়ের বেগে ঘরে আবির্ভূত হয়েছে একটা লোক। মাথায় সে আমার সমান। আমার আলখাল্লার মতনই একটা আলখাল্লা দিয়ে ঘিরে রয়েছে অবয়ব। মোমবাতিগুলো ততক্ষণে নিভে গেছে। সলতেগুলোয় মরা আগুন লেগে রয়েছে। সেই আলোতেই নিবিড় তিমির ঘরের মধ্যে চেপে বসতে পারছে না। তাই ঠাহর করেছিলাম আমাদের ঠিক মধ্যিখানে এসে খাড়া হয়ে রয়েছে অন্ধকারের আগন্তুক। নিতান্ত অসভ্যের মত এহেন অনধিকার প্রবেশের জবাবদিহি চাইবার আগেই শুনতে পেলাম তার কণ্ঠস্বর।

এ-সেই কণ্ঠস্বর যার ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি একবার শুনলে আর ভোলা যায় না। এ-সেই নিচু খাদের অতি-সুস্পষ্ট চাপা ফিসফিসানি যার প্রতিটি অনুরণন কাপালিকের মন্ত্রোচ্চারণের অমোঘ প্রতিক্রিয়ার মতনই হাড় হিম করে দিল আমার। কেটে কেটে অন্তরের গহনতম অন্দরেও বসে গেল এই ক'টি কথা!

'জেন্টলমেন, অসৌজন্যের জন্যে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু এই অভব্য আচরণ করতে বাধ্য হয়েছি শুধু একটা কর্তব্য পালনের জন্যে। আপনারা জানেন না, কেউই জানেন না—আজ রাতের খেলার নায়কের সত্যিকারের চরিত্রটা কি। অত্যন্ত বিনীতভাবে শুধু এই তথ্যটি পরিবেশন করার জন্যেই আমার আগমন। অনুগ্রহ করে এবং অবসরমত আপনারা উইলিয়াম উইলসনের বাঁ আস্তিনের ভেতরকার আস্তর পরীক্ষা করে দেখবেন। এমব্রয়ডারী করা আলোয়ানের মধ্যে লুকানো পকেটগুলো দেখতেও ভুলবেন না। চললাম।'

ঘূর্ণিঝড়ের মতই নিমেষে উধাও হয়ে গেল ক্ষণিকের অতিথি। স্তম্ভিত করে গেল ঘরশুদ্ধ সবাইকে। তারপরেই অবশ্য উচ্চনিনাদী সোরগোলে ফেটে পড়ল ছোট কামরা-খানা। দপ্ দপ করে জ্বলে উঠল সব কটা মোমবাতি। আমি যখন নিঃসীম আতঙ্কে জবুথবু হয়ে বসে—ওরা তখন তল্লাসি চালিয়ে যাচ্ছে আমার কোটের বাঁ আস্তিনের ভেতরের আস্তরে। সেখানকার চোরা পকেট থেকে বের করে ফেলেছে নকল তাস। আলোয়ানের ফুলের কারুকাজের গায়ে গায়ে লুকানো থুপরিগুলো থেকেও বেরিয়েছে জুয়াচোরের জন্য বিশেষ ধরনের তৈরী সব ক'টা তাস।

নিঃশব্দ সেই ধিক্কারের চাইতে বুঝি একপশলা গালিগালাজ অনেক সহনীয় ছিল।

হেঁট হয়ে নিজের পায়ের কাছ থেকে অত্যন্ত মূল্যবান পশুর লোমের আলখাল্লাটা কুড়িয়ে নিয়ে আমার হাতে দিতে দিতে ব্যঙ্গবঙ্কিম কণ্ঠে বলে উঠলেন গৃহস্বামী মিস্টার প্রেস্টন—'মিঃ উইলসন, আপনার এই সম্পত্তিটাও নিয়ে যান— জানি না এর ভেতরে আরও কটা খুপরি বানিয়ে রেখেছেন। দয়া করে আপনি অক্সফোর্ড ত্যাগ করবেন কালকেই, এবং তার আগে, এক্ষুনি বেরিয়ে যাবেন এই ঘর থেকে।'

কাঁটছাঁট কথায় এই ভাবে গলাধাক্কা দেওয়ার জবাবটা আমি মুখের ওপরেই ছুঁড়ে দিতাম, যদি না আর একটা অতি অদ্ভুত ব্যাপার আমার নজরে আসত। মিস্টার প্রেস্টন যে-আলখাল্লাটা কুড়িয়ে নিলেন ওঁর পায়ের কাছ থেকে, ঠিক অনুরূপ আলখাল্লা তো আমার হাতেই রয়েছে। হুবহু এক! আমি যে অত্যন্ত খরুচে আর খুঁতখুঁতে স্বভাবের, তা নিশ্চয় এই কাহিনী পড়ে বোঝা যাচ্ছে। আমার মগজখানাও তো উর্বর কল্পনা আর বিচিত্র খামখেয়ালিপনার একটা মস্ত কারখানা। অতিশয় দুষ্প্রাপ্য পশুর লোম থেকে তৈরী আশ্চর্য ডিজাইনের এই আলখাল্লা তৈরী হয়েছিল শুধু আমারই ফরমাশ অনুযায়ী। বলাবাহুল্য যে এ-জিনিসের মত 'কপি' আর কোথাও থাকতে পারে না। অথচ রাতের আগন্তুক যেখানে এসে দাঁড়িয়ে বচনসুধা শুনিয়ে গেল—ঠিক সেইখান থেকেই অবিকল সেইরকম একটা আলখাল্লা তুলে বাড়িয়ে ধরেছেন মিঃ প্রেস্টন।

উপর্যুপরি এতগুলো হাড়-হিম-করা কাণ্ড ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও উপস্থিত বুদ্ধি হারাইনি আমি। ঘরের কাউকে দেখতেও দিলাম না যে ঠিক ওইরকম আলখাল্লা ইতিপূর্বেই অন্যমনস্কভাবে হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছি আমি। নীরবে দু-নম্বর আলখাল্লাটা মিঃ প্রেস্টনের হাত থেকে টেনে নিয়ে চাপা দিলাম আমার নিজের আলখাল্লাটাকে এবং মুচকি হেসে বেপরোয়া ভঙ্গিমায় গটগট করে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে। পরের দিনই ভোরের আলো ফোটবার আগেই অক্সফোর্ড ত্যাগ করলাম চিরতরে এবং বেরিয়ে পড়লাম মহাদেশ সফরে।

পালালাম কিন্তু বৃথাই। বিভীষিকার উল্কি-আঁকা আমার এই হৃদয়খানা সেইদিন থেকে ভয়-তরাসে হয়ে থেকেছে প্রতিটি পল-অনুপল-বিপল। যেখানেই গেছি, সেখানেই ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি রূপে হাজির হয়েছে এই উইলিয়াম উইলসন। প্রতিবারেই নাক গলিয়েছে আমার ব্যাপারে— নাটকীয় ভাবে বানচাল করে দিয়েছে আমার সমস্ত পরিকল্পনা। রহস্যময় এই সত্তা আমারই প্রতিচ্ছায়া হয়ে ঘুরেছে আমার পেছন পেছন এবং কাজ হাসিলের ঠিক মুহূর্তটিতে উল্কাবেগে উপস্থিত হয়ে চুনকালি দিয়ে গেছে আমার মুখে। আমার অপকর্ম নিয়ে যত মাথাব্যথা যেন শুধু ওরই। প্যারিসে পা দিতে না দিতেই হাড় জ্বালিয়েছে। একটার পর একটা বছর অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু নিদারুণ বিরক্তিজনক উইলিয়াম উইলসন নিষ্কৃতি দেয়নি আমাকে। সীমা পরিসীমা নেই তার শয়তানির, তার নিরন্তর ধূর্ততার। পালিয়ে গেছি রোমে— সেখানেও সে রেহাই দেয়নি আমাকে। কুটিল ইচ্ছাপূরণের ঠিক মুহূর্তটিতে বিনা নোটিসে আচমকা

আবির্ভূত হয়ে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে আমার পরিকল্পনা! জাল পেতেছি বার্লিনে—ছিঁড়ে খুঁড়ে উড়িয়ে দিয়েছে শয়তান শিরোমণি এই উইলিয়াম উইলসন। ঠিক একই ভাবে আমার সাজানো ঘুঁটি কাঁচিয়ে দিয়েছে মস্কোতে। এ হেন পিশাচকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে ঘৃণা করেছি, ভয়ও পেয়েছি। জঘন্য পোকামাকড়কেও মানুষ বুঝি এত ঘেন্না এত ভয় করে না। কখন কোন্ মুহূর্তে করাল সেই অপচ্ছায়া দেখা দেবে— এই ভয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে পালিয়েছি— কিন্তু বৃথা— বৃথা—বৃথা! সে আমার পেছন ছাড়েনি!

মনকে শুধিয়েছি বহুবার— কে এই উইলিয়াম উইলসন? কোথায় তার প্রকৃত নিবাস? কি উদ্দেশ্য নিয়ে মুহুর্মুহু হানা দিয়ে যাচ্ছে আমার প্রতিটি কুকর্মে? কোনো জবাবই পাইনি। খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করেছি আমার ওপর তার খবরদারির অভিনব পদ্ধতিগুলোকে। লক্ষ্য করেছি যখনই আমি ভয়ানক ভাবে ফেঁসে যাওয়ার মত খারাপ কাজ করে চলছি ঠিক তখনই সে না বাগড়া দিলে কিন্তু কুখ্যাতির অতলে তলিয়ে যেতাম নির্ঘাৎ।

এটাও লক্ষ্য করেছি—খুব ভালভাবেই লক্ষ্য করেছি—হুবহু আমার মতনই জামাকাপড় পড়ে এলেও কোনোবারেই সে আমাকে তার মুখ দেখায়নি। হতে পারে, আলো পড়েনি তার মুখে। কিন্তু প্রতিবারেই কি কৌশলে তার মুখবয় ঢেকে রেখে দিয়েছিল আমার দৃষ্টিসীমার বাইরে—সেটাও তো একটা অতলান্ত প্রহেলিকা। ইটনে তর্জনী তুলে শাসিয়ে গেছে— কিন্তু মুখ দেখায়নি; অক্সফোর্ডে আমার মানইজ্জৎকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে গেছে— সেখানেও তার অতর্কিত আবির্ভাবের পূর্ব মুহূর্তে নিভে গেছে সব ক'টা মোমবাতি যেন এক দানবিক ফুৎকারে; রোমে সে যেন স্বয়ং বজ্র হয়ে নেমে এসে ধ্বংস করে গেছে আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্যারিসে নিতে দেয়নি প্রতিশোধ, নেপলস-য়ে ফাঁসিয়ে দিয়েছে আমার কপট প্রেমের খেলা, মিশরে টেনে ধরেছে আমার লালসার লাগাম। কিন্তু কোনোবারেই সে তাকে চেনবার সুযোগ দেয়নি। এত বড় ধুরন্ধর প্রতিভাটা যে আমার স্কুল জীবনে পরম প্রতিদ্বন্দ্বী উইলিয়াম উইলসন স্বয়ং— একবারও সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার ক্ষীণতম সুযোগও সে আমাকে দেয়নি।

যাক সে কথা। এবার আসা যাক ঘটনাবহুল এই নাটকের শেষ পর্বে।

এতক্ষণ পর্যন্ত শুধু লিখে গেলাম আমার ওপর উইলিয়াম উইলসনের বাদশাহী প্রতাপের জাঁকালো বর্ণনা। তার দাপটের বেলায় ভয়ে কেঁচো হয়ে যেতাম প্রতিবার। তার শুভ্র সুন্দর চরিত্র, তার হিমালয় প্রতিম প্রজ্ঞা, তার সর্বত্র উপস্থিত হওয়ার ক্ষমতা এবং সর্ববিষয়ে তার অবিশ্বাস্য পারদর্শিতা আমাকে লৌহ-মুদ্গরের মতই ঘা মেরে মেরে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে প্রতিবার। আমার অস্থিমজ্জায় অপরিসীম আতঙ্ক সঞ্চার করে দিয়ে গেছিল সে তার নিজস্ব দুর্মদ শক্তি দিয়ে—আর সীমাহীন দুর্বলতা নিয়ে আমি কেবলই নুয়ে পড়েছি তার উদ্ধত আকৃতির সামনে, হজম করেছি তার দর্পিত শাসানিকে। যত বেশী সঙ্কুচিত হয়েছি ততই সে হামলে পড়েছে। তিল তিল করে পরিত্রাণের একটা ক্ষীণ

সম্ভাবনাকে সযত্নে লালন করে গেছি মনের মধ্যে। এর ঠিক উল্টোটা ঘটালেই তো হয়! নিজেকে একটু একটু করে দাপুটে আর মরিয়া করে ফেললেই তো সে গুটিয়ে যাবে আমার সামনে— ঠিক যে ভাবে আমাকে তার ইচ্ছার গোলাম বানিয়ে রেখেছে—হুবহু সেই ভাবে আমিও তাকে বানিয়ে ফেলব আমার ইচ্ছার গোলাম। মন শক্ত করলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, এইবার তাকে গুঁড়িয়ে দেবই আমার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দিয়ে। ইদানীং বড্ড বেশী সুরাপান করছিলাম। ছেলেবেলা থেকেই আমি চড়া মেজাজী। সুরা তাতে ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন প্রতিরাত। তরল আগুনের প্রকোপে পড়েই বলা যায় পৌঁছে গেলাম পথের কাঁটা তুলে ফেলার চরম সিদ্ধান্তে।

সুযোগটা পেলাম রোম শহরে। ১৮—সালের সেই কার্নিভ্যালের কথা মনে পড়ে? আমি ছিলাম সেখানে। ডিউক ডি-ব্রগলিও একটা মস্ত মাসকারেড পার্টির আয়োজন করেছিলেন তাঁর প্রাসাদে। এ পার্টিতে ছদ্মবেশ পরে যেতে হয়। মুখে থাকে মুখোশ। পরনে অদ্ভুত বেশ। স্রেফ মজা করার জন্যে এই ধরনের আসরে ভিড়ও হয় খুব। আমার যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল বুড়ো ডিউকের তরুণী ভার্যার সঙ্গে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করা। মেয়েটি পরমাসুন্দরী, কিন্তু পতিভক্তি তেমন নেই। উড়ে উড়ে বেড়াতে চায়। পার্টিতে যেতেই চোখ নাচিয়ে গাঢ় সুরে আমাকে জানিয়ে দিলে, একটু ফাঁক পেলেই তার এই বিচিত্র ছদ্মবেশের রহস্যকথা ফাঁস করবে শুধু আমার কাছেই। ইঙ্গিতটা বিলক্ষণ তাৎপর্যপূর্ণ। মদ খেয়ে যখন চোখ লাল করে ফেলেছি, অদ্ভুত অদ্ভুত পোশাক আর মুখোশ পরা মেয়ে পুরুষদের বিরাম বিহীন গুঁতো খেয়ে মেজাজটাকেও ঠিক রাখতে পারছি না—ঠিক এইসময়ে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলাম বৃদ্ধ ওমরাহ-র তরুণী ভার্যাকে। মদির চোখের সাংঘাতিক কটাক্ষ আমাকে নিমেষে চুম্বকের মত টান মারল সেদিকে। গুঁতোগুঁতির ঠেলায় আমি তখন অস্থির পঞ্চানন। তা সত্ত্বেও অধীর ভাবে যেই পা বাড়িয়েছি মোহিনী অভিমুখে—অমনি কে যেন আলতোভাবে হাত রাখল আমার কাঁধে—একই সঙ্গে কানের পর্দায় বর্ষিত হল চাপা, ভাঙা গলায় সেই পৈশাচিক ফিসফিসানি।

প্রতিটি রক্ত কণিকা তখন উত্তাল হয়ে উঠেছে আমার শিরায় ধমনীতে, কামিনী-পিপাসা বন্য হস্তীর বল এনে দিয়েছে পেশীতে পেশীতে, ধাবমান শোণিতের সুগম্ভীর গর্জন ধ্বনিত হচ্ছে মাথার মধ্যে— ঠিক এই সময়ে ঘটল এই বিপত্তি।

বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। খপাৎকরে আঁকড়ে ধরে ছিলাম মূর্তিমান উৎপাতটার কলার। পরণে তার নীল মখমলের স্পেনীয় আলখাল্লা—কোমরে ঘোর রক্তবর্ণের বেল্ট। সারা মুখ ঢাকা কালো রেশমের মুখোশে। ঠিক এই বেশ আর এই মুখোশই দেখব—এই আশা নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম সবেগে।

বিষম ক্রোধে ফুঁসে উঠেছিলাম একই সঙ্গে। বিতৃষ্ণা আর বিদ্বেষ আগুনের

ফুলকির মতই ছিটকে ছিটকে এসেছিল দাঁতে দাঁত পিষে প্রতিটি অক্ষর উচ্চারণের সময়ে। আমি বলেছিলাম—'স্কাউড্রেল! জালিয়াৎ! পিশাচ! কি চাও তুমি? আমার মৃত্যু? সেটি হতে দিচ্ছি না!' বলেই, হিড় হিড় করে শয়তান শিরোমণিকে বলরুম থেকে টেনে এনেছিলাম পাশের ছোট্ট ঘরটায়।

ধাক্কা মেরে দেওয়ালের ওপর আছড়ে ফেলেছিলাম তৎক্ষণাৎ। কপাট টেনে বন্ধ করে দিয়েই কোষমুক্ত করেছিলাম তরবারি। বলেছিলাম সাপের মতই হিসহিসিয়ে—'দেখি এবার কার প্রতাপ বেশী! বার করো তোমার হাতিয়ার।'

ক্ষণেক দ্বিধা করেছিল সে। তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খাপ থেকে টেনে বের করেছিল ইস্পাতের তলোয়ার।

শুরু হয়েছিল দ্বন্দ্বযুদ্ধ। শেষ হয়েছিল অচিরেই। রুধিরধারা তখন প্রলয় নাচন নেচে চলেছে আমার রক্তবহা নালীগুলোর মধ্যে—দিয়ে। মত্ত ঐরাবতের শক্তি ভর করেছে হাতে-পায়ে। স্রেফ দানবিক শক্তি দিয়ে মারের পর মার মেরে তাকে আমি কোণঠাসা করেছিলাম চক্ষের নিমেষে এবং কলজে ফুটো করবার এমন সুবর্ণ সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে ছিলাম তৎক্ষণাৎ। একবার নয়, বার বার, সর্বশক্তি দিয়ে তরবারি প্রবেশ করিয়েছিলাম তার বুকের খাঁচায়।

ঠিক তখনই তুমুল চেঁচামেচি শুনেছিলাম বাইরে—ঘন ঘন ধাক্কায় থরথর করে কেঁপে উঠেছিল দরজার কপাট। মুহূর্তের জন্যে পেছন ফিরে চেয়েছিলাম আমি।

পরক্ষণেই সামনে চোখ ফিরিয়ে এনে দেখলাম, ওইটুকু সময়ের মধ্যেই যেন পট পালটে গেছে একেবারে। আসলে কিছুই পালটায়নি— কিন্তু আমার উদ্দাম অলীক কল্পনা দিয়ে আমি মনে করে নিলাম —যেখানে দেওয়াল ছিল, সেখানে রয়েছে বিশাল একটা দর্পণ। সেই দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে রয়েছে আমারই অবয়ব। শোণিতরঞ্জিত দেহে বিহ্বল মুখে আমি টলতে টলতে এগিয়ে আসছি আমারই দিকে। মুখের মুখোশ আর হাতের তরবারির এখন মেঝেতে নিক্ষিপ্ত। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মুখের ভাঁজ, খাঁজ, রেখা আর তিল। এ যে আমারই প্রতিচ্ছায়া—একই পরমাণু দিয়ে গড়া একই আমি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই আর তিলমাত্র। রক্তমাখা এই আশ্চর্য কায়া-কে আমি 'উইলিয়াম উইলসন' নামেই চিনে এসেছি এতগুলো বছর।

হাহাকার-স্বরে শেষ কথাগুলো যখন বলেছিল উইলসন, তখন গলা চেপে, গলা ভেঙে ফিসফিস করার চেষ্টা করেনি এতটুকুও। একটা একটা শব্দ বলার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে শূন্যে বিলীন হচ্ছিল ওর প্রাণবায়ু এবং চমকে চমকে উঠছিলাম আমি আমারই কণ্ঠস্বর ওর কণ্ঠে বর্ণে বর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে শুনে। ও বলেছিল :

"জিতে গেলে ঠিকই—কিন্তু নিজের প্রাণ দিয়ে জিতলে। কারণ আমিই তোমার সব কিছু। আজ থেকে সমস্ত দুনিয়ার কাছে, সমগ্র স্বর্গলোকের কাছে, যাবতীয় আশার জগতের কাছে নিহত হয়ে রইলে তুমি! দেখছো কি? এতো তোমারই ছায়া! ছায়াকে হত্যা করে ডেকে আনলে তোমার নিজেরই মৃত্যু!" □

তঞ্চকতা

[ডিডলিং]

সৃষ্টির শুরু থেকেই দুটি বিষয় পণ্ডিতমহলের টনক নড়িয়েছে। প্রথমটা, অবৈধ সুদ। দ্বিতীয়টা তঞ্চকতা। মানে, কৌশলে কার্যসিদ্ধি বা লোক ঠকানো বা প্রবঞ্চনা; যাই বলুন না কেন, তঞ্চকতা যে কট্টর বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে এবং এই বিদ্যে নিয়ে শাস্ত্র রচনা করে বিশ্ববিখ্যাত হওয়া যায়, তাতে নেই কোনো সন্দেহ। প্রাচ্যে এই বিদ্যেকেই বোধহয় চৌষট্টি কলার অন্যতম বলা হয়। চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ো ধরা!

ডিক্সনারি খুলে দেখা যায়, তঞ্চ মানে হলো গিয়ে প্রতারণা, কৌশল, চাতুরি; তঞ্চক মানে, বঞ্চক, সত্য-গোপন, ফাঁকি। তঞ্চন শব্দটার মানে কিন্তু জমাট বাঁধা। তাহলেই দেখুন, ধড়িবাজি কতখানি জমাট বাঁধলে একটা মানুষ তঞ্চক বা বঞ্চক হয়ে গিয়ে তঞ্চকতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারে! তঞ্চকতার সাধনার সিদ্ধিলাভ করে তঞ্চক নামক বৈজ্ঞানিক হওয়া তাই চাট্টিখানি কথা নয়!

তঞ্চকতার মানে কি, তা বোঝা গেলেও এর সংজ্ঞা লিখতে গেলে হিমসিম খেতে হয়। তঞ্চকতার সংজ্ঞা লেখা মুশকিল হলেও তঞ্চক-এর সংজ্ঞা লেখা সহজ। মানে, বিজ্ঞানটার সংজ্ঞা খটমট হলেও বিজ্ঞানীকে বোঝানো অনেক সহজ। প্লেটো যদি এই আইডিয়া মাথায় আনতে পারতেন, তাহলে দ্বিপদ জীব হিসেবে পালক মুরগিকে কেন মানুষ বলা যাবে না—এই কথা বলার ধৃষ্টতা

দেখাতেন না। কিন্তু আমি এ সব বিতর্কের মধ্যে যেতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই, মানুষই শুধু তঞ্চক হতে পারে অন্য কোনো জন্তু পারে না।

তঞ্চকতার সার বুঝেছে কেবল জামাকাপড় পরা জীব। কাক চুরি করে, শেয়াল ঠকায়, বেজি টেক্কা মেরে যায়, মানুষ তঞ্চকতা করে। তঞ্চকতাই তার অদৃষ্ট। কবি বলেছেন, 'মানুষকে তৈরি করা হয়েছে হা-হুতাশ করবার জন্যে।' আমি বলি, মানুষকে গড়া হয়েছে তঞ্চকতা করার জন্যে। তঞ্চকতাই জীবনের লক্ষ্য—তার জীবনের শেষ। এই জন্যেই কোনো মানুষ তঞ্চকতা করেছে শুনলে সঙ্গে সঙ্গে বলি—'কাম ফতে!' মানে, সব কাজ শেষ!

তঞ্চকতা একটা যৌগ পদার্থ। এর উপাদান অনেক। সামান্য বিষয়ে অসামান্যতা, স্বার্থ, ছিনেজোঁক হওয়া (অধ্যাবসায়), মৌলিকতা, ধৃষ্টতা, বেপরোয়া থাকা, উদ্ভাবনশক্তি, ঔদ্ধত্য এবং দাঁত বের করে হাসা।

উপাদানগুলোকে নিয়ে এবার দুচার কথা বলা যাক।

সামান্য বিষয়ে অসামান্যতা : বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করতে পারে তঞ্চক। দারুণ সূক্ষ্মদর্শী। ছোট মাপের ব্যাপার নিয়ে তার কারবার। খুচরো কেনাবেচা, নগদ বা দরকারি কাগজ দেখলেই হাওয়া করে দেবে। জমকালো ব্যাপারে প্রলুব্ধ যখন হয় এই একই ব্যক্তি, তখন সে তার বৈশিষ্ট্য হারায়—হয়ে যায় মহাজন। এক্ষেত্রেও তঞ্চকতা চলে পুরোদমে—কিন্তু ক্ষুদ্র আকারে আর নয়—ব্যাপক আর বিশাল চেহারায়। তঞ্চকের সঙ্গে মহাজনের তফাৎ ততটুকুই যতটুকু তফাৎ ম্যামথ হাতির সঙ্গে ইঁদুরের, ধূমকেতুর পুচ্ছের সঙ্গে শুওরের।

স্বার্থ : স্বার্থ-ই তঞ্চকের মূল চালিকা-শক্তি। স্বার্থটা অবশ্যই বিলকুল নিজের স্বার্থ। লক্ষ্য তার একটাই—পকেট: নিজের এবং আপনার। এক নম্বর পকেট তার নিজের—দু'নম্বর পকেট আপনার। তার নজর এক নম্বরের দিকে অর্থাৎ নিজের দিকে।

অধ্যবসায় : তঞ্চক হয় পয়লা নম্বরের ছিনে-জোঁক। তাকে দমানো যায় না হতাশ হওয়ার বান্দা সে নয়। ব্যাঙ্ক যদি লাটে উঠে যায়, তাহলেও সে ভেঙে পড়ে না। লেগে থাকে আঠার মতো—শেষ খেলা খেলে নিয়ে কাজ হাসিল করে।

মৌলিকতা : প্রচণ্ড মৌলিক চিন্তাধারার অধিকারী হয় প্রতিটি তঞ্চক। ফাঁদ পাতে সে বড় করে। ষড়যন্ত্র কাকে বলে এবং কিভাবে চক্রান্তের জাল গড়তে হয়—তা সে নিজের বুদ্ধি দিয়ে অবস্থা বুঝে তৈরি করে নেয়। সে সব সময়ে নতুন প্যাঁচ বানিয়ে চলেছে—দরকার হলেই নিষ্ফল প্যাঁচ বরবাদ করে দিয়ে নতুন প্যাঁচের আশ্রয় নিচ্ছে। আলেকজাণ্ডার হওয়ার ক্ষমতা না থাকলেও সে গ্রীক দার্শনিক ডায়োজিনিস হতে পারত। তঞ্চক হয়ে না জন্মালে সে ইঁদুর-ধরা কল অথবা ছিপ আর বঁড়শি হতে পারত।

ধৃষ্টতা : তঞ্চকের ধৃষ্টতার সীমা নেই—অসম্ভব ডাকাবুকো সে। আফ্রিকার গহন অঞ্চলেও লড়াই চালিয়ে যাওয়ার হিম্মৎ তার আছে। যুদ্ধে জেতার তার মন্ত্র

একটাই—প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়া। ছোরার খোঁচা খাওয়ার ভয় তার নেই। ইংরেজ ঘোড়সওয়ার ডাকাত ডিক টারপিনের যদি আর একটু বেশি বিচক্ষণতা থাকতো—ভাল তঞ্চক হতে পারতো। আইরিশ জাতীয় নেতা ড্যানিয়েল ও-কোনেল যদি একটু কম তোষামুদে হতেন, উত্তম তঞ্চক হতে পারতেন। সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লস-এর মগজটা আরও দু-এক পাউণ্ড বেশি ভারি হলে, তঞ্চক শিরোমণি হতে পারতেন।

বেপরোয়া থাকা : তঞ্চক কারো ধার ধারে না—সে বিলকুল বেপরোয়া। নার্ভাস মোটেই নয়। নার্ভ বলে কোনো বস্তু কোনোকালেই তার ছিল না। কোনো ব্যাপারেই ব্যাকুল হওয়ার পাত্র সে নয়। তঞ্চকতার আসর থেকে পিঠ টান দেওয়ার বান্দাও সে নয়—যতক্ষণ না তাকে রদ্দা মেরে চৌকাঠ পার করে দেওয়া হচ্ছে। ভীষণ ঠাণ্ডা মাথা তার—শশার মতো ঠাণ্ডা বলতে পারেন।
উদ্ভাবনীশক্তি : নকলিবাজি নেই তঞ্চকতার কোষ্ঠীতে—সে যা করে, তা সব সময়েই আনকোরা নতুন। সে যা ভাবে, তা তার নিজস্ব—ধার করা নয়। কারও প্ল্যান সে চুরি করে না—নিজের প্ল্যান নিজেই বানিয়ে নেয়। তঞ্চকতার প্ল্যান চুরিকে ঘেন্না করে তঞ্চক। বাসি প্যাঁচ দেখলেই তার গা গুলিয়ে ওঠে। টাটকা ফন্দী নইলে সে হাত নোংরা করে না। অ-মৌলিক তঞ্চকতার দৌলতে যদি কারও মানিব্যাগ হাতিয়ে ফেলে এবং জানতে পারে যে তঞ্চকতাটা মৌলিক নয় (তার নিজস্ব নয়)—মানিব্যাগ ফিরিয়ে দিতে সে দ্বিধা করবে না।
ঔদ্ধত্য : ঔদ্ধত্য ছাড়া তঞ্চকের একদণ্ডও চলে না। বুক ফুলে বড়াই করতে ওস্তাদ। হাতের গুলি ফুলিয়ে হুঙ্কার ছাড়তে অদ্বিতীয়। প্যাণ্টের দু-পকেটে হাত গুঁজে মস্তানি মেরে সে বড় আনন্দ পায়। সে আপনার ডিনার কপাকপ খেয়ে নেয়, আপনার মদের বোতল চোঁ-চাঁ করে শেষ করে দেয়, আপনার কষ্টের টাকা জোর করে ধার নেয়, আপনার নাক মলে দেয়, আপনার লোমশ ক্ষুদে কুকুরকে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে লাথি মারে এবং আপনার বউকে সবেগে চুম্বন করে।
দেঁতো হাসি : সব খেলার শেষ খেলা তঞ্চকের দেঁতো হাসি। এ হাসি সে হাসে খেল খতম করে দেওয়ার পর। কিন্তু তার এই দাঁতালো হাসি সে ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না। সারাদিনের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে দাঁত বের করে হাসতে থাকে। হাতের কাজ সাঙ্গ হলে, নিজের খুপরি ঘরে ঢুকে বসে, মনের আনন্দে (খুবই গোপনে) দাঁত বের করে নিঃশব্দে হা-হা করে হাসতে থাকে। বাড়ি ফিরে জামাকাপড় পাল্টে নিয়ে জ্বালিয়ে নেয় মোমবাতি। বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে বালিশে রাখে মাথা। তারপর শুরু হয় তঞ্চকের দাঁত বের করে শব্দহীন অট্টহাস্য। হাসি তাকে হাসতেই হয়। যে হাসে না, সে তঞ্চকই নয়।

মানুষ জাতটার বাচ্ছাবেলা থেকেই তঞ্চকতার রেওয়াজ রয়েছে। প্রথম তঞ্চক ছিল বোধহয় আদম নিজেই। পুরাকালে এই বিজ্ঞানের ভূরি ভূরি নিদর্শন মেলে। আধুনিককালে অবশ্য এ-বিজ্ঞানটাকে বেশ চৌকস করে তোলা হয়েছে। খানকয়েক অত্যাধুনিক উদাহরণ ছাড়া যাক।

পরিপাটি তঞ্চকতা বলা যায় এই কৌশলটাকে : ধরুন, বাড়ির গিন্নীর দরকার হয়েছে একটা সোফা-র। বেশ কয়েকটা ফার্নিচার বিক্রেতার দোকানে তিনি টহল দিলেন। একটা দোকানে অনেক রকম ভালো ভালো সোফা দেখতে পেলেন। চৌকাঠ পেরোনোর আগেই তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালো এক অমায়িক বচনবাগীশ; ভেতরে নিয়ে গিয়ে দেখালো বেশ কয়েকটা ভালো সোফা; যেটা পছন্দ হলো গিন্নী সাহেবার, সেটির দাম বললো অত্যন্ত কম—বাজারে যা দাম, তার এক পঞ্চমাংশ কম শুনে তাজ্জব হলেন গিন্নী, সোফা কিনতে চাইলেন তৎক্ষণাৎ, দাম মিটিয়ে দিলেন তৎক্ষণাৎ, রসিদ নিলেন এবং বলে গেলেন সন্ধে নাগাদ যেন সোফা পৌঁছে যায় বাড়িতে—বিস্তর সেলাম ঠুকে দোকানদার আকর্ণ হেসে বিদায় দিল গিন্নীকে। সন্ধে এল—সোফা এল না; রাত পার হয়ে গেল—সোফা এল না। পরের দিনও কেটে গেল—সোফা এল না। তখন চাকর পাঠানো হলো দোকানে—জানা গেল, কোনও সোফাই বিক্রি হয়নি। দোকানদার যেন আকাশ থেকে পড়লো সোফা বিক্রির কথা শুনে। টাকা সে নেয়নি—নিয়েছে তো তঞ্চক মহাপ্রভু—দোকানদারকে অবশ্য কাজে লাগিয়েছে গিন্নীর সামনে। রসিদ দিয়েছে তঞ্চক—দোকানদার তো দেয়নি!

এই কাণ্ডই ঘটে ফার্নিচারের দোকানে। খদ্দের ঢোকে, নিজেই ঘুরে ঘুরে পছন্দ করে, কেউ তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় না—তক্কে তক্কে থাকে কিন্তু তঞ্চক—মওকা বুঝেই কোপ মারে।

এবার বলা যাক সম্মানজনক এক ধরনের তঞ্চকতা কাহিনী। ফুলবাবু সেজে একব্যক্তি এক দোকানে ঢুকে এক ডলার দামের একটা জিনিস পছন্দ করে পকেটে হাত ঢুকেই দেখেই মানিব্যাগ ফেলে এসেছে বাড়িতে। বেজায় বিরক্তিতে কুঁচকে যায় মুখ; বলে দোকানদারকে—"প্যাকেটটা দয়া করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন? ওহো, মানিব্যাগেও তো রয়েছে পাঁচ ডলারের নোট—এক ডলারের নোট তো নেই! এক কাজ করুন—প্যাকেটের সঙ্গে চার ডলারের খুচরো পাঠিয়ে দিন।"

খদ্দেরের মিষ্ট বচন এবং উদার মনোভাবে তুষ্ট হয়ে যায় দোকানদার। বলেও ফেলে পাশের ছোকরাকে—"লোক চিনি রে! এই হলো খাঁটি খদ্দের।"

ছোকবা চলে যায় প্যাকেট আর চার ডলারের খুচরো নিয়ে। পথেই হঠাৎ দেখা হয়ে যায় ফুলবাবুর সঙ্গে। ছোকরাকে দেখেই ফেটে পড়ে উল্লাসে—"আমার প্যাকেট নিশ্চয়? আমি তো ভেবেছিলাম অনেক আগেই বাড়ি পৌঁছে গেছিস! যা, যা, দৌড়ে যা—আমার স্ত্রীকে দেখতে পাবি—মিসেস ট্রটার—পাঁচ ডলার তোকে দিয়ে দেবে। এইমাত্র তাই বলে এলাম। খুচরোটা আমাকে দিয়ে যেতে পারিস—পোস্টাপিসের খরচ আছে। বাঃ! এক, দুই, এটা চলবে?—তিন, চার সব ঠিক! মিসেস ট্রটারকে বলিস, পথেই দেখা হয়ে গেছে, রেজকি দিয়ে দিয়েছি...যা ছোট...বেড়াতে বেরিয়েছিস নাকি?"

কাজ নিয়ে যখন রাস্তায় নামে, ছোকরা তখন বেড়ায় না—এক ছুটে যায়,

এক ছুটে ফিরে আসে। এ যাত্রায় কিন্তু তার ফিরতে সময় লাগল অনেক। লাগারই কথা। যে ঠিকানায় প্যাকেট ডেলিভারি দেওয়ার কথা—সে ঠিকানাই খুঁজে পেল না—মিসেস ট্রটারকে না পাওয়ায় প্যাকেট ডেলিভারিও হলো না। তাই খুশি মনেই ফিরেছিল দোকানে, বগলে প্যাকেট নিয়ে—তারপর যখন ধুমধাড়াক্কা কাণ্ড ঘটে গেল চার-চারটে ডলার হাতছাড়া করার অপরাধে—তখন তার মুখের অবস্থাটা কল্পনা করে নিন।

আরও সহজ একটা তঞ্চকতা কাহিনী শুনুন। জাহাজঘাটা ছেড়ে যাওয়ার একটু আগেই জাহাজে এল এক বন্দর-কেরানি। সামান্য পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে এখুনি—এই তো তার বিল। এত সহজে পার পাওয়া যাবে ভেবে খুশিতে নেচে উঠলেন ক্যাপ্টেন—মাথায় রাশি রাশি শেষ মুহূর্তের কাজের চাপ—তাই সামান্য পাওনা মিটিয়ে দিলেন তক্ষুনি। সেই লোক নেমে যেতে না যেতেই এল আর একটা লোক। তারও হাতে একটা বিল। আসল বিল নিয়ে এসেছে আসল লোক। আগের লোকটা তঞ্চক—তঞ্চকতা করে ক্যাপ্টেনকে টুপি পরিয়ে দিয়ে গেল সামান্য সময়ের ব্যবধানে!

প্রায় এইরকমই আর একখানা প্রবঞ্চনা কাহিনী শোনাই। জাহাজঘাটা ছেড়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়েছে স্টীমবোট। এমন সময়ে দেখা গেল হন্তদন্ত হয়ে ব্যাগ নিয়ে দৌড়ে আসছে একজন যাত্রী—এই স্টীমবোটেই যেতে হবে তাকে। আচমকা থমকে গিয়ে হেঁট হয়ে তুলে নিল একটা পকেটবুক। সঙ্গে সঙ্গে সে কি চিৎকার—"কার পকেটবুক! আরে সব্বোনাশ—টাকা ঠাসা রয়েছে যে! ক্যাপ্টেন, একটু দাঁড়ান—যাঁর নোট বুক, তাঁকে খুঁজে ফেরৎ দিয়ে যাই!"

"এক সেকেণ্ডও নয়," হুঙ্কার ছাড়লেন ক্যাপ্টেন—"তোলো নোঙর!"

ককিয়ে ওঠে সাধু যাত্রী—"যাচ্চলে! আমাকেও তো এই বোটে যেতে হবে! পরের টাকা সঙ্গে নিয়ে যাই কি করে? একটু দাঁড়ান প্লীজ! কার নোটবুক? কার টাকা?"

কেউ জবাব দিল না। শোনা গেল শুধু ক্যাপ্টেনের বজ্রগর্জন—"তোলো নোঙর!"

"আরে! আরে করেন কি! পরের টাকা পকেটে নিয়ে যাবটা কোথায়? এই যে আপনি—(সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোককে সম্বোধন করে)—আপনাকে সজ্জন ব্যক্তি বলেই মনে হচ্ছে—পকেটবুকটা কাইণ্ডলি আপনার কাছে রাখবেন? যাঁর টাকা তাঁকে ফিরিয়ে দেবেন?"

আমতা আমতা করে সজ্জন ব্যক্তি বললেন—"আ-আমি এত টাকার দায়িত্ব—"

"তোলো নোঙর!" আবার ধ্বনিত হয় ক্যাপ্টেন-নিনাদ।

"বেশ, বেশ, আমাকে না হয় এ থেকে গোটা পঞ্চাশ টাকা পুরস্কারই দিয়ে গেলেন—যাঁর টাকা, তিনিই দেবেন আপনাকে—যাচ্চলে, এ তো দেখছি সব একশ ট্যাকার নোট—ও ক্যাপ্টেন, প্লীজ একটু দাঁড়ান!"

সজ্জন ব্যক্তি সমস্যার সুরাহা করে দিলেন তক্ষুনি। বললেন—"এই নিন, আমার কাছে আছে পঞ্চাশ টাকার নোট।"

পকেটবই তাঁর হাতে দিয়ে, পঞ্চাশ টাকার নোটখানা নিজের পকেটে গুঁজতে গুঁজতে বায়ুবেগে স্টীমবোটে উঠে গেল যাত্রী। জাহাজঘাটা ছেড়ে গেল জলপোত।

আর তারপরেই পকেটবুকে নোটের গোছা দেখলেন সজ্জন ব্যক্তি। একশ টাকার নোটই বটে! কিন্তু সব জাল নোট!

দুঃসাহসের তঞ্চকতা হয় এইরকম ঃ ক্যাম্প মিটিং বা ওই জাতীয় সমাবেশ হতে চলেছে এমন একটা জায়গায়, যেখানে পৌঁছতে হলে একটা সাঁকো পেরোতেই হবে। এক তঞ্চক ঘাঁটি গাড়লো সাঁকোর পাশে। যে-ই আসে, তার কাছ থেকেই নেয়, এক টাকার টাকা; মানুষ হোক কি গাধা হোক, কি ঘোড়া হোক—মাথা পিছু একটা করে টাকা ছেড়ে যেতেই হবে। গজর গজর করলেও তাড়াহুড়ো করে যেতে হচ্ছে বলে মাশুল দিয়ে যায় প্রত্যেকেই। দিনের শেষে দেখা গেল পঞ্চাশ ষাট টাকার মালিক হয়ে, দেঁতো হাসি হাসবার জন্যে, বাড়ি ফিরছে হঠাৎ-বড়লোক তঞ্চক মহাপ্রভু।

ছিমছাম তঞ্চকতা শোনা যাক। ছাপা হুণ্ডির কাগজে সই দিয়ে বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার নিল এক তঞ্চক। একই কাগজ খানকয়েক কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরে রোজ একটা করে কাগজ মাংসর ঝোলে ডুবিয়ে বাড়িয়ে দিল নিজের পোষা কুকুরের দিকে। কুকুর লাফিয়ে পড়ল ঝোলমাখা কাগজে, চেটেপুটে নেওয়ার পর উপহার পেল পুরো কাগজখানাই, যাতে মুখে নিয়ে দৌড়ে পালায় খেলার জন্যে। রোজ চলল এই প্র্যাকটিশ। তারপর একদিন শিক্ষিত কুকুরকে নিয়ে তঞ্চক এল বন্ধুর বাড়িতে টাকা শোধ দেওয়ার জন্যে। বললে, সই করা হুণ্ডি বের করতে। বেরোলো সেই হুণ্ডি—তঞ্চকের দিকে বাড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ল হুণ্ডির ওপর—মুখে নিয়েই দে ছুট! দে ছুট! দুঃখিত বন্ধু বললে—"আমার টাকা?" তঞ্চক বললে—"নিশ্চয় দেব। হুণ্ডিটা ফেরৎ পেলেই দেব!" বলাবাহুল্য, হুণ্ডিও ফেরৎ এল না—বন্ধুকে টাকা শোধ দিতেও হলো না।

মিহিমাজা তঞ্চকতার একটা নিদর্শন ঃ তঞ্চকেরই এক সাগরেদ খোলা রাস্তায় যাচ্ছেতাই অপমান করে বসল খানদানি এক মহিলাকে। এগিয়ে এল তঞ্চক। আড়ং ধোলাই দিয়ে শুইয়ে দিল সাগরদকে। তারপর মহিলাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এল ভয় কাটানোর জন্যে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মহিলা বললেন—"এতই যখন করলেন, প্লীজ ভেতরে চলুন। বাবা আর ভাইদের সঙ্গে আলাপ করে যান।" কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে তঞ্চক মহাশয় বললে—"তা হবার নয়, ম্যাডাম।" কুণ্ঠিত গলায় বললেন মহিলা—"এতটা করলেন—" তঞ্চক বললেন—"কৃতজ্ঞতার নিদর্শনে একটা উপকারই করতে পারেন আমার। দশটা টাকা ধার দিতে পারেন?" সঙ্গে সঙ্গে হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে বাঞ্ছিত অর্থ দিলেন মহিলা। এই তঞ্চকতায়

খুঁত থাকছে শুধু এক জায়গায়—অর্ধেক টাকা দিতে হয় সাগরেদকে—মুখ বুঁজে আড়ং ধোলাই সহ্য করতে হয়েছে যাকে।

খুব ছোট্ট, কিন্তু বেজায় বৈজ্ঞানিক একটা তঞ্চকতা উপাখ্যান শুনুন। পানশালায় এলেন রাশভারি এক ব্যক্তি। জমকালো চেহারা। চাইলেন দামি চুরুট। চুরুট এল টেবিলে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ফেরৎ দিলেন খদ্দের। চাইলেন ব্র্যান্ডি আর জল। এই দুটি বস্তুই তিনি উদরস্থ করে উঠে পড়ে পা বাড়ালেন দরজার দিকে।

পানশালার মালিক বললেন—"স্যার, ব্র্যান্ডি আর জলের দামটা দিতে বোধহয় ভুলে গেছেন।"

"ভুলে গেছি মানে?" তেড়ে ওঠেন খদ্দের—"ব্র্যান্ডি আর জলের দাম হিসেবে চুরুট দিলাম না আপনাকে। ওই তো রয়েছে আপনার সামনে।"

"কিন্তু চুরুটের দাম তো আপনি দেননি।"

"যা খাইনি, তার জন্যে দাম দিতে যাব কেন?"

"কিন্তু—"

"কোনও কিন্তু নয়?" মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেওয়ার আগে পানশালার সব্বাইকে শুনিয়ে চিৎকার ছেড়ে গেলেন খদ্দের—"মদের নেশা ধরিয়ে দিয়ে খদ্দের ঠকানোর এসব চালাকি ছাড়ুন"

অত্যন্ত সরল ধাঁচের কিন্তু ধড়িবাজিতে ঠাসা একটা তঞ্চকতার ব্যাপার শ্রবণ করুন। পকেটবুক বা টাকার ব্যাগ হারিয়েছেন এক ভদ্রলোক। তিনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন—ফিরিয়ে যে দেবে, তাকে 'এত' টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

বিজ্ঞাপনটা নজরে এল এক তঞ্চকের এবং কপি করে নিল তক্ষুনি। আসল বিজ্ঞাপনে ছিল বাগাড়ম্বর—নকল কপিতে তা রইল না। ঠিকানাও একটু বদলে দেওয়া হলো—আসল মালিকের পাড়াতেই অমুক ঠিকানায় হারানো জিনিস ফেরৎ দেওয়া হলেই পুরস্কার মিলে যাবে। বড় শহরে কাগজ বেরয় অনেক—ঘণ্টা কয়েক পর-পর। তঞ্চক তার নকল বিজ্ঞাপন বের করে দিল মূল বিজ্ঞান যে-কাগজে যে-সময়ে বেরিয়েছে—তার কিছু সময় পরে প্রকাশিতব্য কাগজে।

তারপর, ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে রইল নকল ঠিকানার দোরগোড়ায়। প্রাপক হারানো বস্তু নিয়ে আসতেই বর্ণনা মিলিয়ে নিয়ে পুরস্কার হাতে গুঁজে দিল তঞ্চক এবং হাওয়া হয়ে গেল তল্লাট থেকে। অনেকগুলো বিজ্ঞাপন যখন একই দিনে অনেক কাগজে বেরিয়ে যায়—প্রাপকের মনে থাকে না বড় বিজ্ঞাপনের বাগাড়ম্বর—ছোট বিজ্ঞাপনের ঠিকানায় চলে যায় বলেই পোয়াবারো ঘটে তঞ্চকের।

অনুরূপ আর একটা তঞ্চকতা শোনাই। দারুণ দামি হিরের আংটি হারিয়েছেন এক ভদ্রমহিলা। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে বিজ্ঞাপন দিলেন কাগজে। জানিয়ে দিলেন, জিজ্ঞাসাবাদ না করেই হিরের আংটির প্রাপককে মোটা টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

বিজ্ঞাপনের বর্ণনা অনুযায়ী আংটি নিয়ে ভদ্রমহিলার বাড়িতে দিন কয়েক পরে এল এক ভদ্রলোক—এমন সময়ে এল, যখন ভদ্রমহিলা নেই বাড়িতে। কিন্তু হিরের আংটি দেখেই চিনতে পেরেছে বাড়ির চাকর, সেই ভদ্রমহিলার ভাই-টাই এবং অনেকেই। কিন্তু ভদ্রমহিলা বাড়ি নেই শুনেই ভদ্রলোক বেজায় বিরক্ত হয়ে চলে যাচ্ছে যে! এতটা সময় খামোকা নষ্ট করে এসে শেষে কিনা মালিক বাড়ি নেই।

শশব্যস্ত হয়ে বাড়ির লোক 'পুরস্কারের টাকা ভদ্রলোককে মিটিয়ে দিয়ে নিয়ে নিল হিরের আংটি।

যথাসময়ে বাড়ি ফিরলো ভদ্রমহিলা। আংটি দেখলেন এবং বাড়ির লোকদের ঘুম ছুটিয়ে দিলেন।

কারণ, আংটিটা নকল। বিজ্ঞাপনের বিবরণ পড়ে হুবহু সেই ভাবে তৈরি। আসল-নকলের তফাত ধরবে কে? একমাত্র মালিক ছাড়া? তাই মালিকের অবর্তমানেই এসেছিল তঞ্চক শিরোমণি।

শেষ নেই, শেষ নেই তঞ্চকতার—শেষও হবে না এই রচনার, অর্ধেক তঞ্চকতার কাহিনীও শোনাতে গেলে। তার চেয়ে বরং অতিশয় সুসভ্য আর সুপরিকল্পিত একটা তঞ্চকতা-আখ্যান শুনিয়ে যবনিকা টানা যাক এই নিবন্ধে। বিশেষ এই তঞ্চকতা পরেও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এখনও হয়ে চলেছে ধরণীর সব বড় বড় শহরে—আজও কারও চৈতন্য হয়নি।

আমেরিকার এক বড় শহরেএলেন মার্জিত চেহারার এক মানুষ। চেহারায় শুধু নয়, চলনে বলনে প্রকৃতই-নিয়মনিষ্ঠ সজ্জন পুরুষ। তিনি পোশাক পরেন নিখুঁত ভদ্রব্যক্তির মতো, কথা বলেন রুচিশীল পুরুষের মতো, কথা রাখেন হৃদয়বান মানুষের মতো।

শহরের পা দিয়েই তিনি সম্ভ্রান্ত এলাকায় একটা বাসস্থান খুঁজে নিলেন। বাড়িউলির সঙ্গে কথা হয়ে গেল, প্রতি মাসের পয়লা তারিখে কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময়ে যেন বাড়ি ভাড়া নিয়ে যান ন্যায্য রসিদ দিয়ে। প্রথম মাসের ভাড়াও অগ্রিম দিলেন পয়লা তারিখের সকাল দশটায়।

এরপর তিনি নামী খবরের কাগজে অগ্রিম টাকা দিয়ে ফলাও করে একটা বিজ্ঞাপন দিলেন—যার সারমর্ম এই ঃ জনা তিন চার ক্লার্ক নেওয়া হবে। প্রার্থীরা যেন শিক্ষিত আর সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে হয়। কারণ মোটা টাকা নাড়াচাড়া করতে হবে তাদের। তাই চাকরি পাওয়ার আগে নির্বাচিত ক্লার্কদের মাত্র হাজার দেড়েক টাকা জমা রাখতে হবে। কোম্পানীটার নাম ঃ Bogs, Hogs, Logs, Frogs & Co., 110, Dog Street।

নামের বহর দেখেও কেউ বুঝে উঠল না যে শূন্য কলসিই বাজে বেশি। চটক যেখানে অধিক, তার নিচেই শূন্যতা অধিকতর। প্রায় পঞ্চাশ জন প্রার্থী ধর্না দিল একমাসে। কাউকে সঙ্গে সঙ্গে চাকরিতে নেওয়ার আগ্রহ দেখাল না 'জলা, শুওর, কাঠের গুঁড়ি, ব্যাঙ কোম্পানী'—ঠিকানা যার 'কুত্তা রাস্তায়'। মাসের

শেষদিনে দফায় দফায় পঞ্চাশজনকেই দেওয়া হলো চাকরি—রীতিমত ঝকঝকে রসিদ গছিয়ে দিয়ে গুছিয়ে নেওয়া হলো মাথা পিছু দেড় হাজার টাকা।

পয়লা তারিখে সকাল দশটায় দেখা গেল, কোম্পানীর দরজা বন্ধ। বাড়িউলি কাঁটায় কাঁটায় দশটায় রসিদ নিয়ে আসতে না পারার জন্যে হাত কামড়াতে লাগলেন—এক মিনিট আগে এসেও নিয়মনিষ্ঠ, পরিচালনা-নিপুণ ভদ্র-তঞ্চককে তিনি দেখতে পেতেন না। □

নিতল গহ্বর, নিঠুর দোলক

[দ্য পিট অ্যান্ড দ্য পেন্ডুলাম]

ব্যায়রামে ধুঁকছিলাম। মরতে বসেছিলাম। যন্ত্রণায় মনের ভেতর পর্যন্ত মোচড় দিচ্ছিল। ওরা যখন আমার বাঁধন খুলে দিল—উঠে বসার অনুমতি দিল—মনে হল, এই বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবো। প্রাণদণ্ডের হুকুমটুকুই কেবল শুনতে পেয়েছিলাম। তারপর সব শব্দ মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। শেষ মুহূর্তে বিচারকের ঠোঁটের রঙ দেখতে পেয়েছিলাম। সাদা হয়ে গেছে। নারকীয় নিপীড়নের এই দণ্ড তাদের মুখ দিয়ে বের করতে গিয়েই অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। আমার তাহলে কি হবে। জ্ঞান হারালাম তারপরেই।

পুরোপুরি জ্ঞান ফেরার আগে আবছা একটা অনুভূতি মন আর শরীরের ওপর অসহ্য চাপ সৃষ্টি করে গেছিল। সব মনেও করতে পারছি না। বড় অস্পষ্ট। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যেন ফেটে যাচ্ছিল।

চোখ খুলিনি এতক্ষণ। তবে বুঝতে পারছিলাম, শুয়ে আছি চিৎ হয়ে। বাঁধন নেই। হাত বাড়ালাম। শক্ত আর ভিজে মত কি যেন হাতে ঠেকল। কি হতে পারে জিনিসটা, এই ভাবনাতেই কয়েকটা মিনিট কাটিয়ে দিলাম। চোখ মেলার সাহস হল না।

এক ঝটকায় দু'চোখের পাতা খুলে ফেললাম আর সইতে পারলাম না বলে। নিঃসীম অন্ধকার। পাতাল কারাগার নিশ্চয়। মেঝে তো পাথরের।

তবে কি আমাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে গেল? নিদারুণ ভয়ে ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে টলেটলে এগিয়ে গেছিলাম। কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু সমাধি গহ্বরের দেওয়াল তো হাতে ঠেকবে।

ঠেকেছিল হাতে। পাথরের দেওয়াল নিশ্চয়। মসৃণ, হড়হড়ে, ঠাণ্ডা। হাত বুলিয়ে একপাক ঘুরে এসেছিলাম। প্রতি পদক্ষেপে গা শিরশির করে উঠেছিল। টোলেডো-র এই পাতাল কারাগারের অনেক গা-হিম-করা গল্পমাথায় ভিড় করে আসছিল। তাই পা টিপে টিপে অনেকক্ষণ যাওয়ার পর মনে হল, গোল হয়েই ঘুরছি দেওয়াল ধরে।

কিন্তু শুরু করেছিলাম কোত্থেকে? পকেট হাতড়ালাম। ছুরিটা নেই। আমার নিজের জামাকাপড় নেই। আলখাল্লার মত কি একটা পরিয়ে রেখেছে—অজ্ঞান অবস্থায় টের পাইনি। ছুরিটা থাকলে দেওয়ালের খাঁজে গুঁজে রেখে একপাক ঘুরে এসেই বুঝতে পারতাম—শুরু করেছিলাম কোথা থেকে।

আলখাল্লা থেকে একটা লম্বা উল টেনে নিলাম। বিছিয়ে রাখলাম মেঝের পপর দেওয়াল থেকে লম্ব ভাবে। মেঝেতে পা রগড়ে রগড়ে এক পাক ঘুরে আসতেই পা ঠেকল উলে।

কিন্তু ক-পা হাঁটলাম? এত কাহিল বোধ করছি যে মাথাও ঠিক রাখতে পারছি না। স্যাতসেঁতে হড়হড়ে মেঝের ওপর দিয়ে আবার পা রগড়ে এগোতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লাম। পড়েই রইলাম—এত অবসন্ন। ঘুমিয়ে পড়লাম ওই ভাবেই।

ঘুম ভাঙার পর আবার দেওয়াল ধরে টল দেওয়া শুরু করলাম। মুখ থুবড়ে পড়ার আগে আটচল্লিশবার পা ফেলেছিলাম—এখন বাহান্ন বার পা ফেলেই উলের ওপর এসে গেলাম। তার মানে, কারাগারের বেড় একশ পা। অর্থাৎ পঞ্চাশ গজ তো বটেই। তবে আকৃতিটা কিরকম, তা বুঝতে পারলাম না। হাত বুলোনোর সময়ে অবশ্য অনেকগুলো কোণে হাথ ঠেকেছিল। তা থেকে পাতাল-সমাধির আকার ধারণায় আনা যায়নি।

এই যে এত গবেষণা করে যাচ্ছিলাম, এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল সামান্য—আশা ছিল না একেবারেই। তবে একটা আবছা কৌতূহল আমাকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল নিরন্ধ্র এই তমিস্রার মধ্যে। প্রথম-প্রথম খুব হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলেছিলাম। কেন না, মেঝে তো শ্যাওলা-হড়হড়ে—রীতিমত বিশ্বাসঘাতক। যদিও শক্ত মেঝে, তাহলেও পা ফেলতে ভয় হয়। তারপর অবশ্য ভয় কেটে গেছিল। ফটাফট পা ফেলে এগিয়ে গেছিলাম—মতলব ছিল সমাধি গহ্বরের ব্যাস কতখানি, তা হেঁটে দেখে নেব। তাই আড়াআড়িভাবে হাঁটছিলাম সীমাহীন আঁধার ভেদ করে। দশ বারো পা এই ভাবে যাওয়ার পরেই, আলখাল্লা থেকে টেনে ছিঁড়ে নেওয়া উএলর খানিকটা পায়ে জড়িয়ে যাওয়ায়, হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিলাম কঠিন শিলার ওপর।

ধড়াম করে আচমকা আছাড় খেয়েছিলাম বলেই চমকে দেওয়ার মত

পরিস্থিতিটা সেই মুহূর্তে খেয়াল করতে পারিনি। সেকেণ্ড কয়েক ওইভাবে মুখ থুবড়ে ধরাশায়ী থাকবার পর ব্যাপারটা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

ব্যাপারটা এই আমার চিবুক কারাগারের পাথুরে মেঝেতে ঠেকে আছে ঠিকই, কিন্তু ঠোঁট আর মুখের ওপর দিকের অংশ কিছুই স্পর্শ করছে না। যদিও মনে হচ্ছে, থুৎনি থেকে বেশ উঁচুতেই রয়েছে এরা—অথচ ছুঁয়ে যাচ্ছে না কিছুই। একই সঙ্গে মনে হচ্ছে যেন কপালে এসে লাগছে পাঁকের বাষ্প—নাকে ভেসে আসছে পচা ফাঙ্গাসের অদ্ভুত গন্ধ।

দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম সামনে—শিউরে উঠেছিলাম তৎক্ষণাৎ। আমি মুখ থুবড়ে পড়েছি একটা গহ্বরের কিনারায়—সে গহ্বরের তলদেশ কোথায়, তা তো জানিই না—গোলাকার গহ্বরের পরিধি কতটা, তাও বোঝবার উপায় আমার নেই। কিনারার ধার থেকে হাতড়ে হাতড়ে এক টুকরো পাথর খসিয়ে এনে ফেলে দিয়েছিলাম গহ্বরের মধ্যে। গহ্বরের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে পাথরের টুকরো বেগে নেমে গেছিল পাতাল-প্রদেশে—ধাক্কার শব্দ ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির ঢেউ তুলে এনে আছাড় দিয়ে দিয়ে ফেলে গেছিল কানের পাতায়—তারপর পাথর নিজেই চাপা শব্দে গোঁত খেয়েছিল জলের মধ্যে—প্রবলতর প্রতিধ্বনি গুমগুম শব্দে ধেয়ে এসেছিল ওপর দিকে। একই সঙ্গে আচমকা একটা শব্দ ভেসে এসেছিল মাথার ওপর দিক থেকে। ঠিক যেন একটা দরজা খুলেই বন্ধ হয়ে গেল। চকিতের জন্য আলোর রেখা নিরন্ধ্র আঁধারকে চমকিত করে দিয়ে আঁধারেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

কি ধরনের মৃত্যুর ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছিল আমার জন্যে; তা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছিলাম। নিজের গলার আওয়াজ শুনেও তখন চমকে উঠেছিলাম। দু'ধরনের মৃত্যুর ব্যবস্থা আছে শুনেছিলাম এই ভূগর্ভ কারাগারে। প্রথমটা নিষ্ঠুর নির্যাতন সইতে না পেরে যেন তিল তিল করে মরতে হয়। দ্বিতীয়টা আরও ভয়াবহ; আমাকে এই দ্বিতীয় মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দেওয়া হচ্ছিল। আমার কপাল ভাল। তাই আর এক পা এগোইনি। মুখ থুবড়ে পড়েছিলাম বলেই গহ্বরের মধ্যে তলিয়ে যাইনি।

আতঙ্কে আমার প্রতিটি স্নায়ু থর থর করে কেঁপে উঠেছিল নারকীয় গহ্বরের তলিয়ে যাওয়ার পরের অবস্থাটা কল্পনা করতে গিয়ে। নিপীড়নের আরও অঢেল ব্যবস্থা নিশ্চয় মজুদ রয়েছে গহ্বরের তলদেশে—বেঁচে গেছি ভাগ্য সহায় হয়েছিল বলে।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। ঠক ঠক করে কাঁপছিল পা থেকে মাথা পর্যন্ত। কিভাবে যে হাতড়ে হাতড়ে পাথুরে দেওয়ালের পাশে ফিরে এসেছিলাম, তা শুধু আমি জানি আর ঈশ্বর জানেন। পণ করেছিলাম, এই দেওয়ালের আশ্রয়েই থাকব এখন থেকে—মরতে হয় এখানেই মরব—নিতল গহ্বরের আতঙ্কঘন তলদেশে আছড়ে পড়ার চেয়েও তা শতগুণে শ্রেয়। যেহেতু গহ্বরের তলায় কি আছে তা জানি না—তাই অজানা বিভীষিকধার কল্পনা ডালপালা

মেলে ধরে পঙ্গু করে তুলল আমার মস্তিষ্ককে। না জানি এই কারাগারের নানা দিকে এই ধরনের আরও কত কুৎসিত আর বীভৎস মৃত্যুর ফন্দি পেতে রেখে দিয়েছে অমানুষ জল্লাদরা। আমার মনের অবস্থা তখন যদি অন্য রকম হত, তাহলে বোধহয় গহ্বরে ঝাঁপ দিয়েই সব উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে দিতাম। সেটাও যে সহজতর হত না—সে ভাবনাও কুরে কুরে খাচ্ছিল মাথার কোষগুলোকে। কেননা, আমি তো শুনেছি, এই পাতাল-কারাগারে যাদের আনা হয়—নিমেষ মৃত্যু তাদের কপালে লেখা থাকে না—এদের পৈশাচিক প্ল্যানই হল একটু একটু করে মারো কয়েদীকে—প্রক্রিয়াগুলো শুনলেও নাকি গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়। নিদারুণ উত্তেজনার দরুণ জেগেছিলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তারপর ঘুম নামল চোখে। ঘুম ভাঙার পর হাতের কাছেই পেলাম এক জগ জল আর এক টুকরো রুটি। প্রথমবার যখন ঘুমে বেহুঁশ হয়েছিলাম, তখনও এই দুটো জিনিস পেয়েছিলাম ঘুম ভাঙার পরেই। এখনও কেউ এসে রেখে গেছে আমাকে ঘুমে অচেতন দেখে—আড়াল থেকে তাহলে দেখছে আমার মৃত্যু যন্ত্রণা! পিশাচ কোথাকার!

ক্ষিদের চোটে কোঁৎ কোঁৎ করে গিলে নিয়েছিলাম রুটি, ঢকঢক করে খেয়েছিলাম জল। তারপরেই আশ্চর্য ঘুম নামল দু'চোখে। নিশ্চয় ঘুমের আরক মিশোনো ছিল জলে। ঘুমোলাম তাই মড়ার মত। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম, তা বলতে পারবো না। তবে ঘুম যখন উড়ে গেছিল চোখের পাতা থেকে—তখন আশপাশের দৃশ্য আর ততটা অদৃশ্য থাকেনি। যেন গন্ধক-দ্যুতির মধ্যে দিয়ে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল প্রতিটি বস্তু। বিচিত্র এই প্রভাব উৎস কোথায়, প্রথমে তা ঠাহর করতে পারিনি—কেননা আমি তখন আবিষ্ট হয়ে দেখছিলাম কারাগারের চেহারা।

ভুল করেছিলাম কারাগারের সাইজের আন্দাজি হিসেবে। দেওয়ালের পরিধি পঁচিশ গজের বেশি নয় কোনমতেই। ছোট হলেও পরিত্রাণের পথ যখন নেই, তখন খামোকা তা নিয়ে আর ভেবে লাভ কি। তাই ছোটখাট ব্যাপারগুলোর দিকে কৌতূহল জাগ্রত করেছিলাম। পরিধির মাপে হিসেবে ভুল করেছিলাম কিভাবে, তাও বুঝেছিলাম। প্রথমবারে প্রায় এক চক্কর ঘুরে এসে হোঁচট খেয়ে পড়েছিলাম উলের কয়েক পা দূরেই। তারপর টেনে ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠেই আবার উল্টোদিকে হেঁটেছিলাম। ঘুমের ঘোরে বাঁ দিকে না গিয়ে ডানদিকে হেঁটেছিলাম। তাই দ্বিগুণ মনে হয়েছিল গহ্বরের বেড়।

কারাগারের আকৃতি নিয়েও ভুল ধারণা করেছিলাম। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে (ঘুমের ঘোরে) যেগুলোকে কোণ বলে মনে হয়েছিল—আসলে তা খাঁজ। অজস্র খাঁজকাটা দেওয়াল। দেওয়াল ঢুকে রয়েছে এই সব খাঁজের মধ্যে। অন্ধকারে তাই মনে হয়েছিল, দেওয়াল বুঝি গোল হয়ে ঘুরে গেছে। এখন আর সে বিভ্রান্তি নেই। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, ঘরটা চৌকোনা। দেওয়ালও পাথর দিয়ে তৈরি নয়। লোহা বা অন্য কোনো ধাতু দিয়ে গড়া। অজস্র কিম্ভূত ছবি আঁকা রয়েছে

চার দেওয়ালেই। কুসংস্কারে ডুবে থাকা মঠের সন্ন্যাসীদের মগজ থেকেই কেবল এরকম উদ্ভট কল্পনার আকৃতি সম্ভবপর হয়। প্রতিটি মূর্তিই অপার্থিব, অমানুষিক, পৈশাচিক—কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেই মাথার মধ্যে ঘোর লেগে যায়—রক্ত হিম হতে শুরু করে। যদিও পাতালের স্যাঁৎসেঁৎতেনির জন্যে বিদঘুটে আকৃতিদের রঙ ফিকে হয়ে এসেছে—বিকট অবয়বগুলোও আর তেমন স্পষ্ট নয়—তা সত্ত্বেও যা দেখতে পাচ্ছি ওই অপার্থিব আলোর মধ্যে দিয়ে—তার প্রতিক্রিয়াতেই তো আমার মাথার চুল খাড়া হবার উপক্রম হয়েছে।

পাথুরে মেঝের ঠিক মাঝখানে রয়েছে পাতাল কূপ। গোটা ঘরে গহ্বর ওই একটাই। গোলাকার।

আমি চিৎ হয়ে শুয়ে আছি একটা কাঠের কাঠামোর ওপর। ঘুমে অচেতন থাকার সময়ে আমাকে এই অবস্থায় আনা হয়েছে। মজবুত পটি দিয়ে এই কাঠামোর সঙ্গে আমাকে পেঁচিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। বেরিয়ে আছে শুধু মুণ্ড আর বাঁ হাতের একটুখানি—যাতে কষ্টেসৃষ্টে হাত বাড়িয়ে মাটির থালায় রাখা মাংস টেনে নিয়ে মুখে পুরতে পারি। জলের জগ উধাও। ভয়ানক ব্যাপার সন্দেহ নেই। কারণ, তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। তেষ্টা আরও বাড়বে ওই মাংস খেলে—কারণ ওতে প্রচুর ঝালমশলা চর্বি দেওয়া হয়েছে পিপাসা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। অথচ জল সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যন্ত্রণা সৃষ্টির আর এক পরিকল্পনা! কশাই কোথাকার!

এরপর তাকিয়েছিলাম কারাগার-কক্ষের কড়িকাঠের দিকে। প্রায় তিরিশ চল্লিশ ফুট ওপরে দেখতে পাচ্ছি ধাতুর চাদর দিয়ে মোড়া সিলিং—দেওয়াল চারটে যেভাবে তৈরি, প্রায় সেইভাবে। দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল একটাই জিনিস। মহাকালের একটা প্রতিকৃতি। তবে গতানুগতিক কাস্তে নেই হাতে। তার বদলে রয়েছে একটা দোলক। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো। দোলকটা যেন একটা ক্ষুরধার কাস্তে। ঠায় চেয়েছিলাম বলেই মনে হয়েছিল, শাণিত কাস্তে যেন অল্প অল্প দুলছে। চোখের ভুল ভেবে আরও খুঁটিয়ে চেয়েছিলাম। এবার আর ভুল বলে মনে হয়নি। কাস্তে-দোলক সত্যিই দুলছে। খুব আস্তে। চোখ সরিয়ে নিয়ে তাকিয়েছিলাম দেওয়ালের অন্যান্য দৃশ্যের দিকে।

খুটখাট খড়মড় আওয়াজ শুনেই চোখ ঠিকরে এসেছিল মেঝের দিকে। ডানদিকের কোনো গর্ত থেকে পালে পালে ধেড়ে ইঁদুর আগুন-রাঙা বুভুক্ষু চোখে ধেয়ে আসছে মাংসখণ্ডর দিকে। অতি কষ্টে খাবার বাঁচালাম শয়তানদের ধারালো দাঁতের খপ্পর থেকে। তাড়িয়েও দিলাম কুচুটে করাল প্রাণি বাহিনীকে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে (একঘণ্টাও হতে পারে—সময়ের হিসেব রাখার কোনো উপায় তো ছিল না), ওপরে সিলিং-এর দিকে চাইতেই খটকা লেগেছিল। স্পষ্ট দেখলাম, পেণ্ডুলাম আরও বেশি দুলছে—প্রায় গজখানেক জায়গা জুড়ে দুলেই চলেছে। হতভম্ব হলাম (ভয়ার্তও হলাম) পেণ্ডুলামের চেহারা দেখে। তলার দোলকটা একটা ভারি ক্ষুরের মত ধারালো কাস্তে ছাড়া কিছুই নয়। দু'পাশের

শিং-য়ের মত উঁচু হয়ে থাকা অংশ দুটোর তলার দিকে মস্ত দোলকটার তলার অংশ বেঁকানো ফলক—যা বাতাস কেটে আসছে যাচ্ছে—সাঁ সাঁ শব্দে। রক্ত হিম হয়ে গেল আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে। শাণিত এই দোলক বেশ খানিকটা নিচেও নেমে এসেছে!

পিশাচসম ঘাতকরা তাহলে আমাকে দগ্ধে দগ্ধে মারার নতুন প্ল্যান এঁটেছিল। এ গহ্বরে যাদের আটক রাখা হয়, তাদেরকে মারা হয় তিল তিল করে—এটা আমি জানি। ওরা তাই কুয়োয় নিজেরাই ছুঁড়ে দেয়নি আমাকে—ভেবেছিল আমিই হেঁটে গিয়ে ঢুকে যাবো নিঃসীম অন্ধকারে—আমার সেই পতন-দৃশ্য দেখবার জন্যেই ওপরের দরজা ফাঁক করেছিল নিমেষের জন্যে। যখন দেখল, কপাল জোরে বেঁচে গেছি—তখন আয়োজন হয়েছে আর এক মানসিক অত্যাচারের। ধারালো দোলকের দুলে দুলে নেমে আসা! অমানুষ না হলে এমন অভিনব ফন্দী কারও মাথায় আসে!

কত ঘণ্টা, কত দিন যে এই নির্মম মানসিক ধকল সয়ে গেছিলাম, সে হিসেব দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। সমস্ত বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। সভয়ে বিস্ফারিত চোখে শুধু দেখেছিলাম, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, দুলে দুলে, রক্তলোলুপ খড়্গ নেমে আসছে নিচের দিকে। নামতে নামতে এসে গেছিল বুকের এত কাছে যে, ইস্পাতের গন্ধ ভেসে আসছিল নাসিকারন্ধ্রে। দমকে দমকে, এক এক ঝটকান দিয়ে, ধারালো খড়্গ আমার নাকের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে গেছে ইস্পাতের শীতল গন্ধ—মৃত্যুর হাতছানি প্রকট হয়ে উঠেছিল তার মধ্যে। নির্নিমেষে সেই দুলন্ত মৃত্যুদূতকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন দেখতে দেখতে সহসা আমি সর্বাঙ্গ এলিয়ে দিয়ে শিথিল হয়ে পড়েছিলাম। আসন্ন ঝকমকে মৃত্যুকে দেখে অকস্মাৎ প্রশান্তির ঢল নেমেছিল আমার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে।

বোধহয় জ্ঞানও হারিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ আর কোনো খেয়াল ছিল না। মর্মান্তিক যাতনা থেকে মুক্তি পেয়েছি দেখে অন্তরালের পিশাচ ঘাতকরা নিশ্চয় মুষড়ে পড়েছিল। তাই পেণ্ডুলামের দুলুনিও বন্ধ করে রেখেছিল। কতখানি বিকট কুটিল মন থাকলে এইভাবে দগ্ধে দগ্ধে মারার ইচ্ছেটা হয়, সে ভাবনারও আর সময় পাইনি; কেননা, খড়্গ-দোলক আবার দুলতে শুরু করেছিল। আবার সাঁই সাঁই শব্দে বাতাস কেটে আমার বুকের ঠিক ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল লৌহ-কারাগারের এদিক থেকে সেদিকে—প্রায় তিরিশ ফুট জায়গা জুড়ে অবিরাম চালিয়ে যাচ্ছে দুলুনি..... নামছে একটু একটু করে..... লক্ষ্যস্থল আমার বুকের মধ্যপ্রদেশ।

এ অবস্থায় ক্ষিদে তেষ্টা উড়ে যাওয়ার কথা। আমার কিন্তু পেট চুঁইয়ে উঠেছিল। বাঁ হাত বাড়িয়ে মাংসর টুকরো ধরে মুখের কাছে টেনে এনেছিলাম। ইঁদুর শয়তানরা টুকরে টুকরে বেশির ভাগই খেয়ে গেছে। খেতে গিয়েও বিদ্যুতের মতই একটা বুদ্ধি ঝলসে উঠেছিল মাথার মধ্যে। ক্ষীণ আশার প্রদীপ টিমটিম করে উঠেছিল মগজে। স্নায়ুমণ্ডলী বুঝি নৃত্য করে উঠেছিল এই আশার ম্লান

আড্ডায়। কাঠ হয়ে পড়ে থেকে ছল ছল করে দেখে গেছিলাম খড়্গের আনাগোনা—

ডাইনে বাঁয়ে…… ডাইনে বাঁয়ে…… দুলে দুলে বাতাস কেটে কেটে লোলুপ খড়্গ নামছে শনৈঃ শনৈঃ…… তালে তালে আমি অট্টহাসি হাসছি উন্মাদের মত—কখনো হুঙ্কার দিচ্ছি বিকৃত উল্লাসে…

নামছে…… নামছে…… রক্তপিপাসু খড়্গ নামছে তো নামছেই…… বিরামবিহীন ছন্দে নির্ভুল লক্ষ্যে নেমে আসছে আমার বক্ষদেশ লক্ষ্য করে…… এসে গেছে ইঞ্চি তিনেক ওপরে…… আর একটু নেমে এসে প্রথমেই কাটবে আমার আলখাল্লা…… আলখাল্লার ওপর আছে পটির বাঁধন…… একটাই পটি দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা হয়েছে কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে…… এক জায়গা কেটে গেলেই বাঁ হাত দিয়ে টেনে সমস্ত বাঁধন খসিয়ে ফেলতে পারব? আশা আমার সেইটাই। কিন্তু…… পটি বুকের ওপর আছে তো? খড়্গের ফলক বুকের যেখানটা আগে স্পর্শ করবে—পটি কি সেখানে আছে। মাথা উঁচু করে দেখেছিলাম বুক। নেই। পটি নেই বুকের ঠিক সেই জায়গায়! পটি আছে আশপাশে—খড়্গ যেখানে বুক কাটবে—সেই জায়গায় রাখা হয়নি পটির ফাঁস।

ইঁদুরের দল তখন আমাকে ছেঁকে ধরেছে। কনুই পর্যন্ত বাঁ হাত আলগা করে এতক্ষণ মাটির থালার ওপর হাত নেড়ে নেড়ে ওদের ঠেকিয়ে রাখছিলাম। একটু একটু করে বেপরোয়া হয়ে উঠছিল বুভুক্ষুর দল। রক্তরাঙা চোখে ধারালো দাঁত দেখিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল আমার হাতের ওপর। আঙুলে কামড় বসিয়ে টুকরে টুকরে খেয়ে যাচ্ছিল থালার মাংস। মাংস আর নেই এখন। আছে শুধু চর্বি। আচমকা আবার আশার বিজলী চাবুক মেরে চালু করে দিয়েছিল আমার ভয়-নিস্তেজ মগজকে। হাত বাড়িয়ে চর্বি তুলে নিয়ে মাখিয়ে দিয়েছিলাম পটিতে। তারপর হাত রেখেছিলাম বুকের ওপর। শুয়েছিলাম মড়ার মত নিস্পন্দ দেহে। আকুল প্রতীক্ষায় নিঃশ্বেস ফেলতেও বুঝি ভুলে গেছিলাম।

সহসা আমি নিশ্চল হয়ে যেতে নিশ্চয় ধোঁকায় পড়েছিল মাংসলোভী ইঁদুর বাহিনী। রান্না' মাংস ফুরিয়ে যাওয়ার পর আমার কাঁচা মাংস তো রয়েছেই। এরকম কাঁচা নরমাংস এর আগেও ওরা অনেক খেয়েছে। কিন্তু আমি যে এখনো মরিনি, অথচ চুপচাপ শুয়ে রয়েছি—হাতও নাড়ছি না—এই অবস্থাটা বুঝতেই যেটুকু সময় ওরা নিয়েছিল। তারপরেই ডাকাবুকো দু-একটা ধেড়ে ইঁদুর গন্ধে গন্ধে উঠে এসে দাঁত বসালো চর্বি মাখা পটিতে। দেখাদেখি এলো বাকি সবাই। দেখতে দেখতে ঝাঁকে ঝাঁকে ছেয়ে ফেলল আমার সর্বাঙ্গ! হেঁটে গেল আমার গলার ওপর দিয়ে—ঠোঁট মেলালো আমার ঠোঁটের সঙ্গে। কি কষ্টে যে নিজেকে ওই পূতিগন্ধময় বিবরবাসীদের সান্নিধ্যে রেখেও স্থির হয়েছিলাম, তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না। সুচতুর শয়তানের দল নখর বসিয়ে বসিয়ে আমার চোখ মুখ কান গলা পা হাত দিয়ে হেঁটে গেলেও বুকের ঠিক যেখানে খড়্গের কোপ নেমে আসছে—পা দিল না সেখানে। টের পেলাম পটির নানান জায়গায় কুটকুট করে

দাঁত বসছে···· পটি খসেও পড়ছে নানান জায়গায়—তবুও আমি নড়লাম না····
জোরে নিঃশ্বেস ফেললাম না— অমানুষিক প্রচেষ্টায় নিজেকে নিশ্চল রেখে দিলাম।

খড়্গা কিন্তু ইতিমধ্যে আরও নেমে এসেছে। আলখাল্লা কেটে কেটে যাচ্ছে। স্নায়ুর মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলাম চামড়ায় পরশ বুলিয়ে যাওয়ায়। বাঁ হাতের এক ঝটকায় ফেলে দিলাম সমস্ত ইঁদুর। খচমচ শব্দে হটে গেল হতচকিত বিবরবাসীরা। অতি সন্তর্পণে একপাশে সরে সরে গিয়ে খসিয়ে নিলাম একটার পর একটা বাঁধন। তারপর একেবারেই গেলাম কাঠের ফ্রেমের বাইরে। খড়্গের কোপ থেকে এখন আমি অনেক দূরে। আমি মুক্ত! সাময়িক হলেও স্বাধীন!

স্বাধীন হলেও খুনেগুলোর খপ্পর থেকে এখনও কিন্তু নিষ্কৃতি পাইনি। তা সত্ত্বেও বিপুল উল্লাসে অট্ট অট্ট হেসে যখন নৃত্য করছি পাষাণ কারাগারে, ঠিক সেই সময়ে স্তব্ধ হলো মারণ-দোলকের দুলুনি—অদৃশ্য এক শক্তি তাকে টেনে তুলে নিল সিলিং-এর কাছে। এই দেখেই চরম শিক্ষা হয়ে গেছিল আমার। নরকের পিশাচগুলো তাহলে আড়াল থেকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল আমার প্রতি মুহূর্তের মরণাধিক যন্ত্রণা!

এ স্বাধীনতা তাহলে টিকবে কতক্ষণ?একটার পর একটা অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সরিয়ে দিচ্ছি—পরক্ষণেই ততোধিক যন্ত্রণার যন্ত্র হাজির করছে পিশাচ-হৃদয় বিচারকরা। তাই নিঃসীম আতঙ্কে কাঠ হয়ে গিয়ে জুল জুল করে তাকিয়ে ছিলাম চারপাশের চার দেওয়ালের দিকে। প্রথমে যা টের পাইনি—এখন তা শিহরণের ঢেউ তুলে দিয়ে গেল আমার প্রতিটি স্নায়ুর ওপর দিয়ে।

বিচিত্র একটা পরিবর্তন আসছে ঘরের আকৃতিতে। পরিবর্তনটা কি, তা ধরতে পারছি না। কিন্তু তা আঁচ করতে গিয়েই ঠকঠক করে কাঁপছে আমার সর্বাঙ্গ। ভয়ের ঘোরের মধ্যে দিয়ে সেই প্রথম আবিষ্কার করলাম গন্ধক-দ্যুতির উৎস। এ আলো আসছে আধ ইঞ্চি ফাঁক থেকে। চারটে দেওয়াল যেখানে মেঝেতে লেগে থাকার কথা—সেখানে রয়েছে আধ ইঞ্চি ফাঁক; অর্থাৎ চারটে ধাতব দেওয়ালই ঝুলছে মেঝে থেকে আধ ইঞ্চি ওপরে; গন্ধক-দ্যুতি তার অনির্বাণ আভা নিক্ষেপ করে গেছে এতক্ষণ এই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে। ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করছিল বলে সাহস হল না ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে ওদিকের দৃশ্য দেখবার। তারপর অবশ্য চেষ্টা করেছিলাম। মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে উঁকি মারতে গেছিলাম। কিন্তু কিছুই দেখতে পাইনি।

উঠে দাঁড়িয়েই আচমকা দেওয়ালের চেহারা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছিলাম। কিছুক্ষণ আগে আবছাভাবে আঁচ করেছিলাম, কোথায় যেন কি পালটে যাচ্ছে। পরিবর্তনের স্বরূপ আন্দাজ করতে গিয়েই অজানা আতঙ্কে প্রাণ উড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

এখন স্বচক্ষে দেখলাম সেই পরিবর্তন। আগেই বলেছি, এ ঘরের লোহার দেওয়ালে দেওয়ালে আঁকা আছে কিম্ভূত উদ্ভট বিদঘুটে বীভৎস মূর্তি—তারা

কেউই পার্থিব প্রাণি নয়—অদৃশ্য লোকের আততায়ী প্রত্যেকেই—তাদের বিকট চেহারা এতক্ষণ প্রকট হয়ে ওঠেনি রঙ ফিকে হয়ে গেছিল বলে।

এখন সেই নিষ্প্রভ দানবদল উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। প্রতিটি রঙের রেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। কোটরাগত নারকীয় চোখে দেখা দিয়েছে স্ফুলিঙ্গ।

হ্যাঁ, সত্যিই আগুন লকলকিয়ে উঠছে প্রতিটি বিকটাকারের চোখে। সেই সঙ্গে লালাভ হয়ে উঠছে অবয়ব। দেওয়াল তেতে উঠছে—লাল হয়ে উঠছে—লোহা তেতে লাল হয়ে গেলে ঠিক যা হয়!

জানোয়ার! জানোয়ার! এরা মানুষ না পশু! এইভাবেই শেষে নিকেশ করতে চায় আমাকে! দু-দুবার ওদের পাতা মৃত্যুর ফাঁদ টপকে গিয়ে বেঁচে গেছি—তাই এবার চার দেওয়ালের দানবদের লেলিহান করে তুলছে লোহা তাতিয়ে দিয়ে। উৎকট বাষ্পে নিঃশ্বেস নিতেও কষ্ট হচ্ছে আমার। নিদারুণ আঁচে চামড়া ঝলসে যাবে মনে হচ্ছে!

উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে আগুনের আঁচ। চার দেওয়ালের দানবদল লোল জিহ্বা আর আগুন চোখ মেলে যেন আরও কাছে এগিয়ে আসছে। দৃষ্টি বিভ্রম নাকি?

আঁৎকে উঠলাম পরক্ষণেই ঘরের আর একটা নারকীয় পরিবর্তন দেখে। ঘরটা ছিল চৌকোনা। এখন তা দ্রুত বরফির মতো হয়ে যাচ্ছে। ঘরের বিপরীত দুটো কোণ ছোট হচ্ছে যে হারে, মুখোমুখী অন্য দুটো কোণ বড় হচ্ছে সেই একই হারে। দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে মেঝের ছোট হয়ে যাওয়া—সঙ্কীর্ণ হচ্ছে বরফি-মেঝে—দুদিক থেকে আগুন রাঙা দেওয়াল আমাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে....

মাঝের ওই .নিতল গহ্বরের দিকে!

হায় ভগবান! আর তো পরিত্রাণের পথ নেই। ওরা আমাকে এই কারাগারে এনেছিল একটাই উদ্দেশ্যে—পাতাল-কূপে ফেলে দেবে বলে। দু-দুবার ওদের ফাঁকি দিয়েছি। এবার আর রক্ষে নেই। তেতে-লাল লোহার দেওয়াল বার কয়েক ছ্যাঁকা দিয়ে ফোসকা রচনা করে গেল গায়ে। দম আটকে আসছে উগ্র কটু গন্ধে। পিছনের দুই দেওয়াল ক্রমশ এগিয়ে এসে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে অতলান্ত ওই বিভীষিকার দিকে....

কুয়ো!

কি আছে ওই কুয়োয়? কেন ওরা আমাকে ওরা ফেলে দিতে চায় কুয়োর গর্ভে? উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে উঁকি মেরেছিলাম তলদেশে। শিহরণের পর শিহরণ ঘূর্ণিপাকের মতো আবর্ত রচনা করে আমাকে ছিটকে সরিয়ে এনেছিল কুয়োর পাড় থেকে।

যা দেখেছি, তা আর যেন ইহজীবনে দেখতে না হয়। আগুনের লাল আভা সিলিং থেকে ঠিকরে গিয়ে প্রদীপ্ত করে তুলেছিল কুয়োর তলদেশ। সেখানে

বিরাজ করছে যে বিভীষিকা, তা কল্পনায় আনার ক্ষমতা আছে শুধু নরকের বাসিন্দাদের—সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়নি পার্থিব চোখ···· করাল ওই বিভীষিকার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আশঙ্কাই তো মস্তিষ্ক বিকৃত করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট!

আমি তাই ছিটকে সরে এসেছিলাম পেছনে—পরক্ষণেই তপ্ত লৌহ দেওয়ালের ছ্যাঁকা খেয়ে কাৎরে উঠে আছড়ে পড়েছিলাম সামনে। পেছোনোর আর জায়গা নেই। হয় চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে জ্যান্ত ঝলসাতে হবে—নয়তো পাতাল-কূপের মরণাধিক শৈত্য শরণ করতে নিতে হবে!

আমি যখন টলছি···· ঠিক সেই সময়ে যেন সহস্র দামামা ধ্বনিত হল বাইরে কোথায়···· সম্মিলিত কণ্ঠের বজ্ররোষ বুঝি বিদীর্ণ করে দিল দূর গগন···· পাষাণ মেঝের ওপর লোহা টেনে নিয়ে যাওয়ার কর্কশ নিনাদে ঝালাপালা হয়ে গেল কানের পর্দা···· টলে গিয়ে কুয়োর গর্ভে যখন পড়ে যাচ্ছি—শক্ত হাতে কে যেন আমার বাহুমূল খামচে ধরে টেনে নিয়ে এল মৃত্যু-গহ্বরের কিনারা থেকে।

এসে গেছেন জেনারেল ল্যাসালে। টোলাডো দখল করেছে ফরাসী সৈন্য। ব্যর্থ হয়েছে চক্রান্ত! □

প্রবীণ জাহাজের প্রহেলিকা

[এম-এস ফাউণ্ড ইন এ বটল]

আমার দেশ আর বংশপরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার নেই। স্বদেশ-ছাড়া আমি অনেকদিন—পরিবারের সঙ্গেও নেই কোনো যোগাযোগ। বাপ ঠাকুর্দার বৈভবের দৌলতে শিক্ষা লাভ করেছিলাম উঁচুদরের। আমার মন গড়ে উঠেছে সেইভাবে। জার্মান নীতিবাগিশদের বচনমালা আমাকে মজা দিয়েছে, তাঁদের বাকচাতুরির উন্মত্ততার প্রশংসা করেছি, তাঁদের ভুলও ধরেছি। আমার ধীশক্তির শুষ্কতার জন্যে হামেশাই ধিকৃত হতে হয়েছে। কল্পনাশক্তির অভাব থাকায় আমাকে ক্রিমিন্যালও বলা হয়েছে। নাস্তিক মতবাদের দরুন অর্জন করেছি বিপুল কুখ্যাতি। দেহী দর্শনে আসক্তি এই বয়সের মস্ত প্রমাদ এবং এই প্রমাদের দরুন সব ব্যাপারেই বিজ্ঞানের নিয়ম-নিষ্ঠার দিকে ঝুঁকেছি। কুসংস্কারকে বর্জন করেছি চিরকাল। অসম্ভব এই কাহিনী তাই হয়তো আমার স্থূল কল্পনাশক্তির পরিণাম। তাই বা বলি কি করে। উদ্দাম কল্পনাকে কোনোদিনই তো আমার যুক্তিনিষ্ঠ মন পাত্তা দেয়নি।

বহু বছর ধরে বিদেশ ভ্রমণের পর ১৮—সালে বাটাভিয়া বন্দর থেকে উঠে বসলাম এক পালতোলা জাহাজে। জনবহুল জাভাদ্বীপের সমৃদ্ধি ছুঁয়ে রয়েছে বিশাল এই বন্দরকেও। ইচ্ছে ছিল যাবো দ্বীপপুঞ্জে। স্নায়বিক অস্থিরতা ছাড়া আর

কোনো প্রলোভন ছিল না মনের মধ্যে। মূর্তিমান পিশাচের মতন অদম্য এই তাড়নাই আমাকেই উঠিয়ে নিয়ে গেছিল জাহাজের আরোহী হিসেবে।

উঠেছিলাম ভারি সুন্দর এক জাহাজে। চারশ টন ওজনের জল সরিয়ে ভেসে থাকার মতন মস্ত জাহাজ। তামার পাটি মেরে মজবুত। তৈরি হয়েছে বোম্বাই শহরে—মালাবার সেগুন কাঠ দিয়ে। খোলে ছিল নারকোলের ছোবড়া, তালের গুড়, ঘি, নারকোল আর কয়েক পেটি আফিং। মালপত্র ঠাসা হয়েছিল বেধড়কভাবে, ফলে মচমচ করছিল জাহাজ।

রওনা হয়েছিলাম ফুরফুরে হাওয়ায়। বেশ কয়েকদিন ধরে ভেসে গেছি জাভা-র পুব উপকূল বরাবর। দ্বীপপুঞ্জ থেকে আসা কয়েকটা জাহাজের সঙ্গে মোলাকাৎ ঘটেছে মাঝেসাঝে—এ ছাড়া একঘেয়েমি কাটিয়ে ওঠার মত কোনো ঘটনা ঘটেনি।

একদিন সন্ধে নাগাদ ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলাম জাহাজের পেছন দিককার ঘেরা গরাদে। অত্যন্ত অসাধারণ একটা দলছাড়া মেঘ দেখতে পেয়েছিলাম ঈশান কোণে। বাটাভিয়া থেকে বেরিয়ে ইস্তক এহেন অত্যাশ্চর্য মেঘ দেখিনি। এ মেঘের রঙটাই সৃষ্টি ছাড়া। সূর্য না ডোবা পর্যন্ত নিমেষহীন নয়নে নজরে রেখেছিলাম অদ্ভুত সেই মেঘকে।

চঞ্চল হয়েছিলাম আরও দুটি কারণে। আচমকা পালটে গেছিল চাঁদের আর সমুদ্রের চেহারা। গা ছমছম করে উঠেছিল চাঁদের ধোঁয়াটে-লাল রঙ দেখে। ঘন ঘন মূর্তি বদলাচ্ছিল সমুদ্র—যা তার চরিত্র নয়। সবচাইতে বিচিত্র লাগছিল সমুদ্রের স্বচ্ছতা—সমুদ্র তো এত স্বচ্ছ কখনো হয় না। তলদেশ স্পষ্টভাবে না দেখতে পেলেও ষাট হাত নিচে দেখতে পাচ্ছিলাম জাহাজের ছায়া।

হাওয়াও অসহ্যভাবে তেতে উঠেছিল ঠিক এই সময়ে। তপ্ত লোহার ওপরকার বাতাস যেভাবে পাক মেরে মেরে উঠে যায় ওপর দিকে—হাওয়ার মধ্যেও দেখছিলাম সেই ধরনের অস্থির ঊর্ধ্বগতি।

রাত বাড়ার পর হাওয়ার মৃদুতম ফিসফিসানিও আর কানে আসেনি। দিগন্তব্যাপী এরকম প্রশান্তি কল্পনাতেও আনা যায় না। জাহাজের পেছনদিকের সবচেয়ে উঁচু পাটাতনে জ্বলছিল একটা মোমবাতি—তার শিখাকে এতটুকুও হেলতে দুলতে কাঁপতে দেখলাম না। দু'আঙুলে লম্বা চুল ঝুলিয়ে রেখেও দেখেছি, চুল হেলে পড়ছে না কোনোদিকেই। কাঁপছেও না।

ক্যাপ্টেন কিন্তু তিলমাত্র বিপদের আশংকা করেননি। গোটা জাহাজটাই তীরের দিকে ভেসে যেতে চাইছে দেখে উনি পাল গুটিয়ে রেখে নোঙর ফেলে দিতে বলেছিলেন। পাহারায় রাখা হয়নি কাউকে। খালাসীরাও লম্বমান হয়েছিল ডেকের ওপর—তাদের বেশির ভাগই মালয়দেশী।

আমি নিচে নেমে গেছিলাম মনের মধ্যে একরাশ নামহীন আতঙ্ক নিয়ে। কেবলি মনে হচ্ছিল, ভয়ানক অশুভ কিছু একটা ঘটতে আর দেরি নেই। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছিল, আরবদেশের মরুঝড় সিমুন-এর মত মস্ত প্রভঞ্জন

হানা দিল বলে। ক্যাপ্টেনকেও তা বলেছিলাম। কিন্তু উনি কর্ণপাত করেন নি। কথার জবাবও দেন নি। মুখ ফিরিয়ে চলে গেছিলেন নিজের কেবিনে।

নিদারুণ অস্বস্তির দরুন ঘুমোতে পারছিলাম না। মাঝরাত নাগাদ উঠে এসেছিলাম ডেকে। ছোট সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রেখেই চমকে উঠেছিলাম অতিশয় উচ্চ গ্রামের একটা গুণগুণ আওয়াজে। কলের চাকা খুব জোরে ঘুরলে অনেকটা এই ধরনের আওয়াজ হয়। আওয়াজটার অর্থ কি, তা বোঝবার আগেই গোটা জাহাজের মাঝখান পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল থর থর করে। পরের মুহূর্তেই রাশিরাশি ফেনা আছড়ে পড়েছিল জাহাজের ওপর—ডুবিয়ে দিয়েছিল পেছন থেকে সামনে পর্যন্ত সবকিছুই।

বাতাসের ঝাপটার প্রচণ্ড উগ্রতা একদিক দিয়ে কিন্তু বাঁচিয়ে দিয়ে গেল জাহাজকে। পুরোপুরি ডুবে যাওয়া সত্ত্বেও, দুটো মাস্তুলই ভেঙে জলে ঠিকরে যাওয়ার ফলে, মিনিট খানেক পরেই টলতে টলতে জাহাজ উঠে এল জলের তলা থেকে—প্রভঞ্জনের প্রবল চাপের মধ্যে থেকেও শেষ পর্যন্ত সামলে নিল নিজেকে।

কোন্ অলৌকিক শক্তির দৌলতে আমি প্রাণে বেঁচে গেছিলাম, তা বলতে পারব না। জলের উন্মত্ত ধাক্কায় সম্বিৎ হারিয়ে না ফেললেও থ হয়ে ছিলাম বেশ কিছুক্ষণের জন্যে—জড় ভাবটা কেটে যাওয়ার পর দেখলাম আটকে রয়েছি জাহাজের পেছন দিককার খুঁটি আর হালের চাকার মাঝখানে।

অনেক কষ্টে পাটাতনের ওপর পা রেখে ঘূর্ণিত মস্তককে আবছা চাহনি মেলে ধরেছিলাম সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে। দেখেছিলাম শুধু ভাঙা ঢেউয়ের পর ভাঙা ঢেউ। পর্বতপ্রমাণ সফেন সেই সমুদ্র যে কি আতঙ্কঘন, দুর্বারতম দুঃস্বপ্ন দিয়েও তা কল্পনাতে আনা যায় না। ভয়ানক সেই ঢেউয়ের পাহাড় চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে জাহাজকে।

একটু পরেই কানে ভেসে এসেছিল এক বৃদ্ধ সুইডেনবাসীর কণ্ঠস্বর। বন্দর ছাড়বার একটু আগেই ইনি জাহাজে উঠেছিলেন। তারস্বরে ডেকেছিলাম তাঁকে। জাহাজের পেছনদিক থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে উনি এলেন আবার কাছে।

তারপরেই বুঝলাম, দুর্ঘটনার পর জাহাজে জীবিত প্রাণি বলতে রয়েছি আমরা দুজন। সমুদ্র বাকি সবাইকে ধুইয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে নিজের বুকে। ঘুমন্ত অবস্থাতেই নিশ্চয় গতায়ু হয়েছেন ক্যাপ্টেন আর তাঁর সহযোগীরা—কেননা, সবকটা কেবিনেই তো প্লাবন বয়ে গেছে।

পাকা লোক কেউ বেঁচে না থাকায় জাহাজকে সুস্থির করার চেষ্টা যে নিছক বাতুলতা, তা অচিরেই বুঝলাম। মেহনত করার মত মনের অবস্থাও তখন নেই—প্রতি মুহূর্তেই ভয় হচ্ছিল, এই বুঝি সলিল সমাধি ঘটে গেল। যেন পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছিল স্নায়ুতন্ত্র।

কপাল ভাল, হারিকেন ঝড়ের প্রথম ঝাপটাতেই নোঙরের কাছি ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছিল—নইলে দমবন্ধ হয়েই মরে যেতাম তৎক্ষণাৎ।

বুক কাঁপানো গতিবেগে সমুদ্র চিরে ধেয়ে যাচ্ছিল জাহাজ। যাচ্ছেতাইভাবে ভেঙে গেছিল পেছনদিকের গলুই। ক্ষতবিক্ষত হয়েছি দুজনেই। তা সত্ত্বেও উল্লসিত হলাম পাম্পগুলো অটুট রয়েছে দেখে। ভারী জিনিসপত্রগুলোও খোলের মধ্যে খুব বেশি নড়ে আর সরে যায় নি।

প্রভঞ্জনের প্রথম চোট চলে গেছে ঠিকই, হাওয়াও আর বিপজ্জনকভাবে দামালি জুড়বে না—কিন্তু এরপরেই সমুদ্রের ওপর দিয়ে ধেয়ে যাবে ভয়ানক লম্বা ঢেউ বিরামবিহীনভাবে—আমরা খতম হয়ে যাব তার মধ্যেই।

কিন্তু এই আশংকা খুব তাড়াতাড়ি সত্যি হবে বলেও মনে হলো না। আমাদের সমস্ত হিসেব চুরমার করে দিয়ে পাঁচ দিন পাঁচ রাত ধরে ভীমবেগে জাহাজ ছুটে চলল ঢেউ আর হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করে। ঝড় থেমে গেলেও হাওয়ার পাগলামি ছিল আগের মতই। হাওয়ার এরকম গতিবেগ কল্পনাও করা যায় না। এই কদিন আমরা খেয়েছি শুধু তালের গুড়—অতি কষ্টে জোগাড় করেছিলাম। সামনের পাটাতনের তলা থেকে।

প্রথমে চারটে দিন জাহাজের গতিমুখ খুব একটা পালটায়নি; দক্ষিণ পূব আর দক্ষিণ দিকেই থেকেছে। নিউ হল্যাণ্ডের উপকূল বরাবর উড়ে এসেছিলাম বললেও চলে। পঞ্চম দিনে অসহ্য হল শৈত্যরূপী দৈত্য। বাতাস তখন প্রায় উত্তর দিকেই মুখ ফিরিয়েছে। রুগ্ন হলদেটে দ্যুতি গায়ে মেখে আকাশে দেখা দিয়েছে তপনদেব। দিগন্ত ছেড়ে সামান্য কয়েক ডিগ্রীর বেশি ওপরে উঠতে পারেনি। কিরণ বিচ্ছুরণ ঘটছে না তার বিশ্রী অঙ্গ থেকে। মেঘের চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না কোথাও। অথচ বাতাসের বেগ বেড়েই চলেছে। অস্থির আর উগ্রভাবে রয়েই চলেছে।

আন্দাজে যখন বুঝলাম এবার নিশ্চয় দুপুর হয়েছে, সূর্যের আক্কেল দেখে আবার তাজ্জব হতে হলো। রশ্মি নিক্ষেপ মোটেই করছে না, যেন একটা ম্যাড়মেড়ে মরা গোলক। রশ্মিগুলো যেন সহসা মেরু-অভিমুখী হয়ে গেছে। ফুলে ওঠা সমুদ্রে গোৎ মারার ঠিক আগে আচমকা নিভে গেল তার কেন্দ্রের আগুন—অবর্ণনীয় এক শক্তি বুঝি হুটোপাটি করে নিভিয়ে দিল অগ্নির উৎসকে। রুপো দিয়ে তৈরি যেন একটা ম্যাড়মেড়ে আংটি; দিগন্তে দোল খেয়ে একাই ধেয়ে গেল নিতল সমুদ্রের গর্ভে।

ষষ্ঠ দিবসের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়েছিলাম বৃথাই। সে দিন আজও আসেনি আমার জীবনে—কখনোই আসেনি সুইডেনবাসীর জীবদ্দশায়।

সূর্যের অন্তর্ধানের পর আলকাতরার মত ঘন আঁধার ঘিরে ধরেছিল জাহাজকে—বিশ হাত দূরের জিনিসও আর দেখতে পাচ্ছিলাম না। অনন্ত রজনীর মোড়ক-বন্দী হয়ে শুধু দেখতে পাচ্ছিলাম ফসফরাস-প্রজ্জ্বলন্ত সমুদ্র—গরম দেশের সমুদ্রে যা দেখেছি। আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। ঝড়ের দাপট কমেনি, কিন্তু ফেনা দেখা যাচ্ছে না—অথচ স্বাভাবিকভাবেই এই ক'টা দিন ঝড় আর ফেনা মিতালি পাতিয়ে ভয় দেখিয়ে

চলেছিল আমাদের। যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি শুধু বিভীষিকা, নিরেট তমিস্রা, কৃষ্ণকালো স্ফীতকায় আবলুস মরু। একটু একটু করে কুসংস্কার-কুটিল আতঙ্ক পেঁচিয়ে ধরছিল সুইডেনবাসীর অন্তর—আমার নিজের অন্তরাত্মাও শুকিয়ে যাচ্ছিল নিঃশব্দ বিস্ময়বোধে। জাহাজের যত্ন নেওয়ার চেষ্টা আর করিনি—তার অবস্থা তো আমাদের চেয়েও খারাপ—পেছনকার নিরুদ্দেশ মাস্তুলের ভাঙা খুঁটিতে বেঁধে রেখেছিলাম নিজেদের। সভয়ে চেয়েছিলাম মহাসমুদ্রের পানে। সময়ের হিসেব রাখার কোনো উপায় ছিল না—অনুমান করতেও পারছিলাম না কি পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছি। শুধু বুঝতে পারছিলাম, আজ পর্যন্ত কোনো খালাসী যেদিকে যেতে পারে নি—আমরা সে জায়গাও পেরিয়ে ধেয়ে চলেছি আরও দক্ষিণ দিকে। অথচ বরফের বাধার মুখোমুখি হতে হয়নি এখনও। ভীষণ অবাক হচ্ছিলাম এই একটা কারণে। প্রতি মুহূর্তটাকেই মনে হচ্ছে, সেই বুঝি এ জীবনের শেষ মুহূর্ত—প্রতিটা পাহাড়-প্রমাণ তরঙ্গকেই মনে হচ্ছে, যমালয় থেকে আসছে বুঝি আমাদের যমলোকে নিয়ে যেতে। এরকম ফুলে ওঠা সমুদ্র আর টানা লম্বা ঢেউ প্রকৃতই অতুলনীয়। আমরা যে তলিয়ে যাইনি এতক্ষণে, সেটাও একটা অলৌকিক কাণ্ড। বৃদ্ধ সুইডেনবাসী বলছিলেন, মালপত্র হালকা বলেই জাহাজ ডুবছে না; রীতিমত মজবুতও বটে এ জাহাজ। কিন্তু কোনো আশাই আর আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে পারছিল না নিঃসীম নৈরাশ্যের তিমিরে। এক-একটা সমুদ্র-মাইল পেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেভাবে কালো দানবাকার সমুদ্র আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে, টিকে থাকব বড় জোর আর একটা ঘণ্টা। কখনো অ্যালবেট্রস-উচ্চতাও ছাড়িয়ে গিয়ে নিঃশ্বেস নিতে হচ্ছে, কখনো ভয়ানক বেগে পতন ঘটছে নরক-সদৃশ সমুদ্র-অতলে—মাথা ঘুরে যাচ্ছে পতনের বেগে—বাতাস সেখানে বিকট বদ্ধ, শব্দ সেখানে নিষিদ্ধ—যাতে নিতল সমুদ্র দানবের নিদ্রা বিঘ্নিত না হয়।

গভীর জলরাশির অতল গহ্বরে একবার যখন তলিয়ে গিয়ে হাঁকপাক করছি অন্তহীন আতঙ্কবোধে, এমন সময়ে পরিত্রাহি চিৎকার করে উঠলেন সুইডেনবাসী বৃদ্ধ—"দেখো! দেখো! দেখো!"

দেখলাম। যে গহ্বরের গা বেয়ে হড়কে নেমে এসেছি একটু আগেই, সেখানে একটা নিষ্প্রভ লাল আলো মরা কিরণ বিতরণ করছে, এবার বুঝি ভীমবেগে নেমে আসছে নিচের দিকে—আমাদের জাহাজের দিকে। অপচ্ছায়ার মত লালাভ কিরণে ভেসে যাচ্ছে আমাদের ডেক। ঘাড় উঁচিয়ে ওপর পানে চেয়ে যে দৃশ্য দেখলাম, তা জমিয়ে দিল আমার রক্তস্রোত।

আমাদের মাথার ঠিক ওপরে, অনেক অনেক উঁচুতে, খাড়াই ঢাল বেয়ে নামবার উপক্রম করছে একটা দানবিক জাহাজ। খুব সম্ভব হাজার টন জল সরিয়ে ভেসে থাকার মত অতিকায় জাহাজ। ঢেউয়ের মাথায় থেকেও দৈত্যাকার চেহারার জন্যে ম্লান করে দিয়েছে শত গুণ বৃহৎ তরঙ্গকেও। পুবদেশে এতবড়

জাহাজ কেউ কখনো দেখেনি। প্রকাণ্ড খোল কুচকুচে কালো—খোদাইকর্ম বা কারুকাজের বালাই নেই—সচরাচর যা থাকে। এত নিচ থেকেও দেখতে পাচ্ছি রেলিং বরাবর সাজানো রয়েছে লাইনবন্দী চকচকে পেতলের কামান—নলগুলো বেরিয়ে রয়েছে জাহাজের বাইরে—অসংখ্য লড়াকু-লণ্ঠনের আলো ঠিকরে যাচ্ছে তাদের পালিশ করা পেতল থেকে। রক্ত হিম হয়ে গেছিল জাহাজের দুঃসাহস দেখে। অবাধ্য এই হ্যারিকেন ঝড় আর অতিপ্রাকৃত সমুদ্রের করাল দংষ্ট্রার তোয়াক্কা না রেখে সব ক'টা পাল তুলে দিয়েছে মহাকায় জলপোত। অতল গহ্বর থেকে উঠে এসে, তরঙ্গশীর্ষে দাঁড়িয়ে, ক্ষণেকের জন্যে নিজের গরিমার আত্মপ্রসাদ অনুভব করে নিয়ে, থর থর করে কেঁপে উঠেই নামতে শুরু করেছিল স্খলিত শিলাখণ্ডের মতন।

আচমকা কোত্থেকে এত সাহস আমার বুকের মধ্যে জড়ো হয়েছিল, তা বলতে পারব না। মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনে টলে-মলে এগিয়ে গেছিলাম ভগ্নপ্রায় পেছন দিককার গলুইয়ের কাছে। আমাদের জাহাজ নিজেও তখন অতল গহ্বরের গর্ভে নেমে যাচ্ছে সাঁ-সাঁ করে। বিচিত্র বিশাল জলপোত সোজা এসে পড়ল আমাদের জাহাজের যেদিকটা জলে ডুবেছিল—সেইদিকে। অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ আমি আমাদের ডেক থেকে ছিটকে গিয়ে পড়লাম আগন্তুক জাহাজের ডেকের দড়িদড়ার ওপর।

পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্ত জাহাজ দুলে উঠে ঘুরে গেছিল। হট্টগোলের সুযোগ নিয়ে মাঝিমাল্লাদের চোখ এড়ানোর জন্যে পালিয়েছিলাম আলগা পাটাতনের কাঠ সরিয়ে জাহাজের খোলে। পলকের জন্যে নাবিকদের চেহারা দেখেই আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে গেছিল বলেই বোধহয় চম্পট দিয়েছিলাম নিমেষে। এরকম জাতের মানুষ এর আগে আমি দেখিনি। মনটা দ্বিধা আর সংশয়ে ভরে উঠেছিল বলেই তাদের চোখে পড়তে চাইনি। খোলের কড়িবরগার ফাঁকে লুকিয়ে থাকার জায়গা বের করে নিয়েছিলাম।

লুকোতে না লুকোতেই কানে ভেসে এসেছিল পায়ের শব্দ। দুর্বল, টলায়মান পদবিক্ষেপে পাশ দিয়ে হেঁটে গেছিল এক বৃদ্ধ। মুখ দেখতে পাইনি—আকৃতির আদলটা শুধু দেখেছিলাম। মনে হয়েছিল বয়স খুব বেশি—অতিশয় কাহিল সেই কারণেই। হাঁটু বেঁকে যাচ্ছে বয়সের ভারে; শরীরের কাঠামো ভেঙে পড়তে চাইছে বোঝা আর বইতে না পেরে। বিড় বিড় করে কথা বলছিলেন আপন মনে। ভাঙা গলায় খাটো সুরে বললেও শুনতে তো পাচ্ছিলাম—অথচ সে যে কোন্ দেশের ভাষা তা বুঝতে পারিনি। কোণের দিকে গিয়ে অত্যাশ্চর্য একগাদা যন্ত্রপাতি নেড়েচেড়ে দেখলেন। জীর্ণ চার্ট দেখলেন। হাবভাব দেখে মনে হল যেন দ্বিতীয় শৈশব যাপন করছেন। অথচ ঈশ্বরের মহিমা ঘিরে রয়েছে জ্যোতির্বলয়ের মতন। বেশ কিছুক্ষণ পরে উঠে গেলেন ডেকে। আর তাঁকে দেখিনি।

* * *

একটা নতুন উপলব্ধি আমার সত্তায় ঠাঁই করে নিচ্ছে। এতদিন যা জেনেছি, যা দেখেছি, যা শিখেছি—সে-সবের নিরিখে এই উপলব্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া মহা পাপ। কিন্তু হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও বুঝতে পারছি, আমি আর আগের মত হতে পারব না। আমি পালটে যাচ্ছি—। নামহীন এই উপলব্ধিকে বিশ্লেষণ করার মুরোদ আমার নেই। বুঝিয়ে বলা আমার সাধ্যাতীত। শুধু টের পাচ্ছি আমার আত্মায় প্রবেশ করেছে এক নতুন সত্তা।

* * *

আশ্চর্য লোক তো এরা। বুঝে ওঠা ভার! ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছে—এ যে কি ধরনের ধ্যান, তাও বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই। সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেও নজরে আনে না যখন, লুকিয়ে থাকার কোনো মানেই হয় না। এরা আমাকে যখন দেখবেই না, তখন বোকার মত খোলের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকতে যাবো কেন? মেট-এর চোখের সামনে দিয়েই তো এখুনি গটগটিয়ে চলে এলাম। সোজা ঢুকে গেলাম ক্যাপ্টেনের প্রাইভেট কেবিনে। সেখান থেকেই লেখার সরঞ্জাম এনে এই ধারা-বিবরণী লিখতে বসেছি। বিশ্বের কারোর হাতে পাঠাতে পারবো কিনা জানি না—লিখে তো যাই—শেষ মুহূর্তে বোতলে ভরে ভাসিয়ে দেব জলে।

* * *

কেন যে কথাটা লিখতে গেলাম। হাজার ভেবেও কিনারা করতে পারছি না। জাহাজের খোলে দড়িদড়া আর পালের স্তূপের ওপর শুয়েছিলাম। হাতের কাছে পড়েছিল আলকাতরা আর বুরুশ। ভাঁজ করা পালটার এককোণে আপন মনে বুরুশ বুলিয়ে গেছিলাম। কি লিখছি, কেন লিখছি—কোনো খেয়াল ছিল না। সেই পাল এখন মাস্তুলে খাটানো হয়েছে। লেখাটা ছড়িয়ে পড়েছে। জ্বলজ্বল করছে কালো অক্ষরগুলো ঃ

'পুনরাবিষ্কার'

দিন কয়েক একটা নতুন নেশায় মেতেছি। খুঁটিয়ে দেখছিলাম মস্ত জাহাজের আপাদমস্তক। অস্ত্রশস্ত্রের যদিও অভাব নেই, তাহলেও এ জাহাজে যুদ্ধ জাহাজ নয়। কি নয়, তা আঁচ করা যাচ্ছে; আসলে যে কি, তা বলতে পারছি না। অদ্ভুত মডেল, লম্বা কাঠের গঠন, বিরাট আকার, বিশাল ক্যানভ্যাস, সাদাসিধে গলুই দেখে অস্পষ্টভাবে মনে হচ্ছে এ রকম জাহাজের কথা বিদেশের প্রাচীন কোন্ গ্রন্থে যেন পড়েছি—মনে করতে পারছি না কিছুতেই।

* * *

জাহাজের কাঠ দেখে অবাক হচ্ছি। চেনাজানা কোনো কাঠ নয়। জাহাজে এ কাঠ লাগানো হয় কিভাবে, ভেবে পাচ্ছি না। এ তো রন্ধ্রময় কাঠ। বয়স হলে পুরোনো জাহাজের কাঠ পচে গেলে এরকম ফুটো ফুটো হয়ে যায়। পোকায় খেলেও হয়। স্পেনের সেগুন কাঠের সঙ্গে মিল আছে। অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সেই কাঠকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এই কাঠে দাঁড় করানো হয়েছে।

এক বৃদ্ধ ওলন্দাজ নাবিকের কথা মনে পড়ে গেল। প্রায় বলত —"সমুদ্র যেমন সত্যি, সমুদ্রবাসী মানুষদের জ্যান্ত দেহগুলো যেমন সত্যি, ঠিক তেমনি সত্যি সমুদ্রের বুক থেকে জাহাজের সৃষ্টি হওয়া।"

* * *

ঘণ্টাখানেক আগে ইচ্ছে করেই এক দঙ্গল খালাসীর ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। খোলে যে বৃদ্ধ আকৃতি দেখেছিলাম, প্রায় সেই রকম আকৃতি প্রত্যেকেরই। আমাকে নজরেই তুলল না কেউ। আমি যে দাঁড়িয়ে আছি সবার সামনে, তাও জানে বলে মনে হল না। বয়সের ভারে প্রায় ন্যুব্জ প্রত্যেকেই, হাঁটু কাঁপছে, পা সঠিক ভাবে পড়ছে না, কপালের বলিরেখায় অজস্র অভিজ্ঞতার ছাপ, কণ্ঠস্বর ভাঙা-ভাঙা কাঁপা-কাঁপা, চোখে প্রাচীনতার চেকনাই, ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ছে সাদাচুল। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অদ্ভুত, সেকেলে, বরবাদ গণনা-যন্ত্র।

* * *

যেদিকে তাকাই, সেদিকেই দেখছি আকাশছোঁয়া ঢেউ। জাহাজ তীরবেগে ছুটে চলেছে দক্ষিণ দিকে। কখনো গোঁৎ মেরে নেমে যাচ্ছে গভীর জল-গহ্বরে, কখনো নক্ষত্রবেগে উঠে যাচ্ছে ঢেউয়ের মাথায়। ডুবে যাচ্ছে না কেন এটাই আশ্চর্য। নিশ্চয় চোরাস্রোতের খপ্পরে পড়েছে মস্ত জাহাজ। অদ্ভুত নাবিকরা নির্বিকার ভাবে ডেকে দাঁড়িয়ে থাকলেও আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। খোলের মধ্যে পালিয়ে এসেছি।

* * *

ক্যাপ্টেনকে সামনাসামনি দেখলাম—তাঁর কেবিনের মধ্যে। উচ্চতায় প্রায় আমার সমান—পাঁচফুট আট ইঞ্চি। মোটামুটি গড়ন পেটন। দেখলে শ্রদ্ধা হয়। গোটা অবয়ব ঘিরে যেন স্বর্গীয় কান্তি বিরাজমান—ভয়ও হয়। চোখমুখের ভাব অসাধারণ। বয়স সেখানে প্রতিটি লোমকূপে নিজের পায়ের ছাপ এঁকে গেছে। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেই রোমাঞ্চ জাগে সর্ব অঙ্গে, গা শিরশির করে ওঠে। সাদা চুলে রয়েছে অতীতের ছায়া, ধূসর চোখে ভাসছে ভবিষ্যৎ। কেবিনের মেঝেতে ছড়ানো অজস্র, অদ্ভুত, লোহা দিয়ে বাঁধানো ফাইল, বিজ্ঞানের জীর্ণ কলকব্জা, বহুবিস্মৃত অচল চার্ট। মাথা ঝুঁকিয়ে দু'হাতে ধরা একটা কাগজের দিকে চেয়ে রয়েছেন নির্নিমেষে। রাজার সই দেওয়া হুকুমনামা বলেই মনে হলো। বিড় বিড় করে বিদেশী ভাষায় কি যেন বলে গেলেন আপন মনে—বিন্দু বিসর্গ বুঝলাম না—জাহাজের খোলে প্রথম দেখা বৃদ্ধ নাবিকের কণ্ঠে শুনেছিলাম এই অচেনা ভাষা। কথাগুলো বললেন আমার সামনেই—কিন্তু মনে হল যেন ভেসে এল মাইলখানেক দূর থেকে।

* * *

এ জাহাজের সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে বহু দূর অতীতের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। কবরস্থ শতাব্দীর প্রেতচ্ছায়ার মত এদিকে সেদিকে বিচরণ করছে খালাসীরা।

লড়াকু-লন্ঠনের সামনে যখন আঙুল মেলে ধরছে—তখন আমার মত প্রাচীন সামগ্রীর ব্যবসাদারকেও বিস্ময়ে বোবা হয়ে থাকতে হচ্ছে।

* * *

খামোকা ভয় পেয়েছিলাম। ঝড় কোথায়? জাহাজের চারপাশে এখন অনন্ত রাতের অন্ধকার—ফেনাহীন জল। কিন্তু ডাইনে আর বাঁয়ে এক লীগ দূরে দেখতে পাচ্ছি বরফের পাহাড়। আকাশ ছুঁয়ে রয়েছে। যেন বিশ্ব প্রাচীর।

* * *

সত্যিই চোরাস্রোত টেনে নিয়ে যাচ্ছে জাহাজকে ভীমবেগে বরফ পাহাড়দের মধ্যে দিয়ে আরও দক্ষিণ দিকে। জলপ্রপাতের জল আছড়ে পড়ার সঙ্গেই শুধু তুলনা করা যায় এই ঝুঁকে ছুটে যাওয়ার গতিবেগের।

* * *

কোথায় যাচ্ছি? দক্ষিণ মেরুর ধ্বংসকেন্দ্র অভিমুখে নাকি? ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছি। চোখের সামনে নতুন জ্ঞানের জগৎ খুলে যাবে মনে হচ্ছে—উত্তেজনায় কাঁপছি সেজন্যেও বটে।

* * *

অস্থির চরণে ডেকে পায়চারি করছে খালাসীরা। ওদের চোখেমুখে কিন্তু হতাশার অন্ধকার নেই—রয়েছে আশার আলো। সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে আসন্ন এক ঘটনার।

পাল ফুলে উঠেছে। আমার লেখা 'পুনরাবিষ্কার' শব্দটা দুলে দুলে উঠছে। সবকটা পাল-ই তুলে দেওয়া হয়েছে। তারই মাঝে মাঝে গোটা জাহাজটাকেই জল থেকে শূন্যে তুলে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে! বিভীষিকার পর বিভীষিকা!

আচমকা বরফ সরে গেল ডানদিক আর বাঁ দিক থেকে··· জাহাজ চক্রাকারে ঘুরছে···ঘুরতে ঘুরতে কেন্দ্রবিন্দুর দিকে এগোচ্ছে···দানবাকার রঙ্গস্থলে পাক দিচ্ছে মস্ত জাহাজ····এরকম নাট্যশালার বৃত্তাকার আসনগুলো ধাপে ধাপে নেমে যায় নিচের দিকে···জাহাজও ঘুরতে ঘুরতে নামছে নিচের বিন্দুতে····নিয়তি কোথায় নিয়ে চলেছে, এখন তা বুঝতে পারছি! আর সন্দেহ নেই! একটু একটু করে ছোট হচ্ছে বৃত্তগুলো···উন্মত্তবেগে নেমে যাচ্ছি ঘূর্ণিপাকের অভ্যন্তরে···খলখল অট্টহাসি হেসে লক্ষ লক্ষ করতালি বাজিয়ে করাল জলধি ধেই ধেই নৃত্য জুড়েছে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে মাথার ওপরে···ঝড়ের হুহুঙ্কার আর সমুদ্রের রণদামামার ঐকতান বধির করে তুলছে আমাকে···থর থরিয়ে কেঁপে উঠল জাহাজ—ওঃ ভগবান!—নামছি এইবার!

বিশেষ বক্তব্য।—১৮৩১ সালে এই কাহিনী যখন প্রথম প্রকাশ পায়, তখন আমি জানতাম না উত্তর মেরু উপসাগরে চার মুখ দিয়ে সমুদ্র প্রবেশ করে ধরণীর গহ্বরে।—লেখক □

****

মেরি রোজেট রহস্য

[দি মিস্ট্রি অফ মেরি রোজেট]

খুব ঠাণ্ডা মাথায় যাঁরা চিন্তাভাবনা করতে পারেন, তাঁদের মধ্যেও কিছু ব্যক্তি আছেন, যাঁরা অতিপ্রাকৃত ব্যাপার-স্যাপারে অর্ধ-বিশ্বাস নিয়েও আবছা শিহরণ অনুভব করেন মাঝেমধ্যেই। হয়ত তা নিছক কাকতালীয়, হিসেবের মধ্যে আসে না—বুদ্ধি দিয়েও সে সবের ব্যাখ্যা হয় না।

নিউইয়র্কের মেরি সিসিলিয়া রোজার্স-এর সাম্প্রতিক হত্যারহস্য পাঠকদের বিলক্ষণ নাড়িয়ে দিয়ে গেছিল। প্রথম পর্যায়ে ঘটেছিল পর-পর কয়েকটা দুর্বোধ্য কাকতালীয় ঘটনা। দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাপারটাই শুধু হাজির করা হয়েছিল পাঠকদের সামনে। পুরো বিষয়টার খুঁটিনাটি বিবরণ জনসমক্ষে হাজির করার অনুরোধ এসেছে আমার কাছে।

বছরখানেক আগে 'রু মর্গ হত্যা' সম্পর্কে যে লেখাটা লিখেছিলাম, তাতে আমার প্রাণের বন্ধু স্যার সি আগস্ট দুপির আশ্চর্য মনের গঠনের কিছু তথ্য নিবেদন করেছিলাম। তখন কিন্তু মনেই হয়নি যে তাকে নিয়ে আবার লিখতে বসতে হবে। চরিত্র চিত্রণই আমার মূল লক্ষ্য। খেয়ালি দুপির মধ্যে যা পেয়েছি, তাকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি আর কেউই—নইলে অন্য চরিত্র নিয়েই লিখতাম। এই সঙ্গে জুটেছে অনেকগুলো আশ্চর্য স্বীকারোক্তি আর অনেক বিশদ ব্যাপার। সব মিলিয়ে অদ্ভুত ঘটনাগুলোকে পাঠকের সামনে হাজির না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না।

রুমর্গের হত্যা রহস্যের কিনারা হয়ে যেতেই দুপিঁ পুরো ব্যাপারটাকে মন থেকে ঝেড়ে পুঁছে ফেলে আবার নিজের মধ্যে ডুবে গেছিল। দুজনেই ছিলাম একই ডেরায়—আগের মতোই।

প্যারিস পুলিশ কিন্তু ভোলেনি দুপিঁকে। দেশশুদ্ধ লোক জেনে গেছিল ওর কীর্তিকলাপ। জ্ঞানীগুণীরা খটমট ঘটনায় ভাবতেন কী করে দুপিঁর বিশ্লেষণী বুদ্ধিকে কাজে লাগানো যায়। এইভাবেই মেরি রোজেট নামে মেয়েটার রহস্যজনক খুনের কিনারা করতে ডাক পড়েছিল আমার এই আত্মবিভোর বন্ধুটির।

রু মর্গের বিশ্রীব্যাপ্যারটার দু-বছর পরে ঘটে এই ঘটনা। মেরি ধর্মে খ্রিস্টান। মা বিধবা। তাঁর নাম এসটোলি রোজেট। মেরি যখন একেবারেই খুকি, তখন মারা যান তার বাবা। তখন থেকেই মায়ের সঙ্গে থেকেছে রু প্যাভি সেণ্ট আঁদ্রে-তে। সংসার চলে যেত পেনশনের টাকায়—এ টাকা আসত মায়ের নামে। মেরি বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত এই ভাবেই চলছিল। তারপর তার ডানাকাটা পরির মতো রূপলাবণ্য টনক নড়ায় একজন সুগন্ধি দোকানির। খদ্দের পাকড়ানোর জন্যে দোকানে চাকরির অফার দেয় মেরিকে। মেরি লুফে নেয় সেই প্রস্তাব। কিন্তু বিলক্ষণ দ্বিধা জানিয়ে ছিলেন তার মা।

সুগন্ধি বিক্রেতার নাম মঁসিয়ে লা ব্লাঙ্ক। ভদ্রলোকের দূরদৃষ্টি সফল হয়েছিল। সুগন্ধির চাইতে সুন্দরীর আকর্ষণ বেশি কাজ দিয়েছিল। দুদিনেই কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল তাঁর দোকানঘর। স্তাবকদের নিয়ে এইভাবে একটা বছর কাটানোর পর রূপসী মেরি হঠাৎ একদিন তাবৎ স্তাবকদের হতভম্ব করে দিয়ে উধাও হয়ে গেল দোকান থেকে। মঁসিয়ে লা ব্লাঙ্ক বিমূঢ় হলেন—মেরি তো তাঁকে কিছু বলে যায়নি। শ্রীমতী রোজেট আতঙ্কে আর উদ্বেগে আধখানা হয়ে গেলন। হইচই পড়ে গেল স্থানীয় পত্রপত্রিকায়। পুলিশ আর নির্বিকার থাকতে না পেরে কোমর বেঁধে যেই তদন্ত শুরু করতে যাচ্ছে। অমনি ফুস করে দোকানঘরে ফের আবির্ভূত হল ডানাকাটা পরি। কিন্তু মাসের এই সাতটা দিন ছিল কোন চুলোয়, তার জবাবে শুধু বললে—গ্রামের আত্মীয়র বাড়িতে। পুলিশ তদন্ত শিকেয় উঠল তৎক্ষণাৎ। কিন্তু কৌতূহলের বিরাম ঘটল না। সাতদিন পরে বহাল তবিয়তে ফিরে এলেও তার চোখেমুখে অমন বিষাদের ছায়া ভাসছিল কেন—এ সব প্রশ্নের জ্বালায় জেরবার হয়ে মেরি ইস্তফা দিয়েছিল দোকানের চাকরিতে—রু প্যাভি সেন্ট আঁদ্রে-তে মায়ের আস্তানায় ঢুকে বসে রইল লোকচক্ষুর আড়ালে।

বাড়ি ফিরে আসার পাঁচ মাস পরে বন্ধুবান্ধবকে রীতিমত ঘাবড়ে দিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো সহসা উধাও হয়ে গেল মেরি। তিনদিন কোনও খবরই পাওয়া গেল না। চতুর্থ দিনে পাওয়া গেল তার দেহটাকে। নিষ্প্রাণ। ভাসছিল সেইন নদীর জলে—বাড়ি যে তীরে, তার উল্টোদিকের তীরের কাছে।

খুনই হয়েছিল মেরি—কোনও সন্দেহই নেই তাতে। অমন একটা মিষ্টি মেয়েকে নৃশংসভাবে খুন করা, তার রূপলাবণ্যের সুখ্যাতি এবং তার চরিত্রের

কুখ্যাতি—এই সব মিলেমিশে দারুণ নাড়া দিয়েছিল অনুভূতিসচেতন প্যারিসবাসীদের চিত্তকে। গোটা শহরকে তাতিয়ে দেওয়ার মতো এরকম ঘটনা আগে ঘটেছে বলে আমার তো মনে পড়ে না। কয়েক হপ্তা ধরে শুধু মেরির কথাই মুখে মুখে ফিরছে শহরের সব জায়গায়—মানুষ ভুলেই গেছিল অন্যান্য গরম-গরম বিষয় গুলো—এমন কি রাজনীতির মতো সরেশ সংবাদও আর কল্কে পায়নি তামাম প্যারিসে। জীবনে যা করেননি, তাই করেছিলেন পুলিশ প্রিফেক্ট—হত্যা রহস্যের কিনারা করতে গিয়ে নিজের হাড় কালি করে ফেলেছিলেন; গোটা পুলিশ বাহিনীকে অষ্টপ্রহর খাটিয়ে তাদেরও কালঘাম ছুটিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু স্রেফ মেহনত করলেই যে সব রহস্যের সমাধান হয় না, সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া গেল সাত দিন পর যখন এত মেহনত স্রেফ অশ্বডিম্ব প্রসব করে গেল। বেগতিক দেখে হাজার ফ্রাঁ-র পুরস্কার ঘোষণা করা হল পুলিশের তরফ থেকে। অজস্র মানুষকে জেরায় জেরায় নাস্তানাবুদ করে দিয়েও যখন তিলমাত্র সূত্রও পাওয়া গেল না এবং পাবলিক বড় নোংরা নোংরা বিশেষণের অলঙ্কার পরিয়ে দিতে লাগল পুলিশ প্রিফেক্টের গলদেশে, তখন তিনি পুরস্কারের পরিমাণ ডবল করে দিলেন দশম দিবস অতিক্রান্ত হওয়ার পর। আরও চারটে দিন কেটে গেল—রহস্য যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। পাবলিকের ধারালো জিভে তখন আর কোনও কথাই আটকাচ্ছে না দেখে পুলিশ প্রিফেক্ট নিজেই পুরস্কারের অঙ্কটা বাড়িয়ে দাঁড় করালেন বিশ হাজার ফ্রাঁ-য়ে। সেই সঙ্গে অভয় দিলেন খুনির সাকরেদকে বিলকুল ক্ষমা করার —যদি সে এগিয়ে এসে পুলিশকে খবর-টবর দিয়ে যায়। পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে দেওয়া হলো প্যারিস শহরকে। সেই সঙ্গে শহরের নাগরিক কমিটিও ঘোষণা করল দশ হাজার ফ্রাঁ-র পুরস্কার।অর্থাৎ মোট পুরস্কারটার পরিমাণ দাঁড়াল তিরিশ হাজার ফ্রাঁ। নিতান্ত দীনহীন এবং নিরতিসীম রূপবতী অথচ কলঙ্কময়ী একটা মেয়ের হত্যারহস্য ভেদ করার জন্যে এত রুপোর প্রস্তাব কখনও দেখা যায় নি।

খুনের রহস্য এবারর পরিষ্কার হবেই, সে বিষয়ে কারও মনেই রইল না আর কণামাত্র সংশয়। দু-একটা গ্রেপ্তারের ঘটনাও ঘটে গেল; কিন্তু কারও বিরুদ্ধেই কেস টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয় বিবেচনা করে তৎক্ষণাৎ ছেড়েও দেওয়া হলো তাদের। মৃতদেহ আবিষ্কারের তিন হপ্তা পরে খুনের খবর পৌঁছল আমার আর দুপিঁর কানে। অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রায় একমাস দুজনের কেউই খবরের কাগজে চোখ বুলোইনি, কারো সঙ্গে দেখা করিনি। বুঁদ হয়েছিলাম যে-যার আত্মচিন্তায়। পুলিশ প্রিফেক্ট নিজেই এলেন এবং তাঁর মুখেই সেই প্রথম জানলাম কুমারী মেরির নৃশংস হত্যার খবর।

ভদ্রলোক এলেন ১৮—সালের জুলাই মাসের তেরো তারিখে বিকেল নাগাদ এবং রইলেন গভীর রাত পর্যন্ত। ঘাতকের অন্বেষণে বিলকুল বার্থ হওয়ায় তাঁর দু চোখের ঘুম উড়ে গেছে, মাথার মধ্যে আগুন জলছে। মান-সম্মান, যশ-খ্যাতি

ধুলোয় লুটিয়েছে। প্যারিসের প্রতিটি মানুষ এখন তাঁকে ধিক্ ধিক্ করছে। মানী লোকের মান চলে যাওয়া মানে মৃত্যুর সামিল। সর্বস্ব দিয়েও এই হত্যারহস্যর কিনারা করতে তিনি প্রস্তুত। দুপির কৌশল যদি এই কেসে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে সুরাহা হবেই। সরাসরি একটা প্রস্তাবও রাখলেন দুপির কাছে—অত্যন্ত উদার সেই প্রস্তাবের প্রকৃত স্বরূপ কী, তা নিয়ে ব্যাখ্যানা-র মধ্যে আমি যেতে নারাজ। যে কাহিনী লিখতে বসেছি, তার সঙ্গে এই প্রস্তাবের কোনও সম্পর্কও অবশ্য নেই।

দুপিকে খোশামোদে গলানো যায় না। পুলিশ প্রিফেক্ট কত কথাই না বলে গেলেন বন্ধুবরের অসামান্য কর্মকুশলতা নিয়ে। এত খোশামোদ শুনলে মানুষ মাত্রই একটু না একটু গলে যায়। মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ঠিক ভেজে। কিন্তু দুপি যে একেবারেই আলাদা জাতের চিঁড়ে। এত প্রশংসা-বচন শোনাবার পর সে তো গদগদ হলই না, উল্টে কোনও কৃতিত্বই তার নিজের নয় বলে স্রেফ উড়িয়ে দিলে।

তাই বলে কি পুলিশ প্রিফেক্টকে ফিরিয়ে দিয়েছিল? না, মশাই না। কঠিন এই দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করেছিল। তিলমাত্র দ্বিধা বা গড়িমসি দেখায়নি—দর বাড়ানোর কোনও চেষ্টাই করেনি। প্রিফেক্ট মশায় তখন বিলক্ষণ প্রীত হলেন। দুপিকে যে বিশেষ ধরনের অনেক রকম সুযোগ সুবিধে দেওয়া হবে—তা জানালেন।

এইভাবে একটা রফায় আসার পর পুলিশ প্রিফেক্ট শুরু করলেন কেসটার বিবরণ। উনি নিজে বিচিত্র এই রহস্য নিয়ে যা-যা ভেবেছেন, যে সব প্রমাণ-টমান সাক্ষীসাবুদ পেয়েছেন—সমস্ত নিবেদন করলেন। আমরা অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে সমস্ত শ্রবণ করলাম। কিন্তু অন্ধকারে আলো দেখতে পেলাম না—তদন্ত শুরু করার মতো কোনও মূল্যবান তথ্যই তাঁর দীর্ঘ বক্তিমে থেকে উদ্ধার করা গেল না। অপরাধী নেড়েচেড়ে যিনি পণ্ডিত হয়ে গেছেন, তাঁর লেকচারে পাণ্ডিত্যের ছটা তো থাকবেই। তা সত্ত্বেও গোমূর্খ আমি টুকটাক প্রশ্ন করে যাচ্ছিলাম—নিজের মন্তব্যও ছাড়ছিলাম। এদিকে রাত বেড়েই চলেছে। দুপি তার আরামে বসার চেয়ারে পরম আরামে বসে আছে। প্রিফেক্টের বিষম পাণ্ডিত্য যেন তাকে বিপুল শ্রদ্ধায় অবনতমস্তক করে ছেড়েছে। আসলে কিন্তু ও টুকটাক করে ঘুমিয়ে নিচ্ছিল। আমি দেখতে পেয়েছিলাম মাঝেমাঝে আমার দিকে চটকা ভেঙেই তাকাচ্ছিল বলে। পুলিশ প্রিফেক্ট দেখতে পাননি কেননা ঠিক এই সময়েই ধুরন্ধর দুপি চোখে সবুজ চশমা এঁটে নিয়েছিল বলে।

যাইহোক, মহাপণ্ডিত পুলিশ প্রিফেক্ট রাত্রি নিশীথে বিদেয় হতেই আমরা টেনে ঘুম দিলাম। পরের দিন রোদ উঠতে আমিই গেলাম ভদ্রলোকের দপ্তরে। প্রমাণ আর সাক্ষীদের যেসব কাগজপত্র জমিয়ে রেখেছিলেন, সেগুলো হাতিয়ে নিলাম। সাময়িক কাগজটাগজগুলোয় যত রকম গরম গরম খবর বেরিয়েছিল, সেগুলোও জোগাড় করলাম ভদ্রলোকের হেফাজত থেকে। বাড়ি এসে দেখা

গেল, যে-সব তথ্যদের কোনও রকমেই প্রমাণ করা যায়নি—সেগুলোকে বাদ দিলে মস্ত এই হত্যারহস্য দাঁড়াচ্ছে এইরকম :

১৮—সালের ২২ জুন। রবিবার সকাল ন'টা। মেরি রোজেট বেরিয়ে এল তার মায়ের বাড়ি থেকে। এ বাড়ি রু পাভি অঞ্চলের সেন্ট আঁদ্রে-তে। যাবার সময়ে দেখা করে গেল মঁসিয়ে জ্যাক্স সেন্ট ইউসট্যাচে-র সঙ্গে। একমাত্র এই ভদ্রলোককেই জানিয়ে গেল—ঠিক একদিনের জন্যে সে যাচ্ছে রু দ্য দ্রোম্‌স্-এ তার এক মাসিমার কাছে।

রু দ্য দ্রোম্‌স্ জায়গাটা ছোট্ট হলেও লোকবসতি প্রচুর। লোক প্রায় পিলপিল করছে বললেই চলে। সেইন্ নদী থেকে বেশি দূরে নয়। রোজেটের মায়ের বাড়ি থেকেও উজানে মাইল দুয়েকের বেশি নয়।

কে এই ইউসট্যাচে? সে যে মেরির হবু বর। থাকত মেরির মা-জননীর কাছে। বিয়ের কথাও হয়েছিল সেই বাড়িতে। সন্ধে নাগাদ হবু বর গিয়ে হবু বউকে নিয়ে আসবে রু দ্য দ্রোম্‌স্ থেকে—এইরকমই একটা মধুর ব্যবস্থা হয়েছিল ভাবী দম্পতিদের মধ্যে। কিন্তু বিকেল নাগাদ প্রলয় ঝড় আর বৃষ্টির তুফান বয়ে যাওয়ায় ইউসট্যাচে ধরে নিয়েছিল এমন বাদলা রাতে বোনঝি থেকেই যাবে মাসির কাছে—তাই আনতে যায়নি।আগেও এরকম ছুতোনাতা করে মাসির হাতে মোয়া খাবার লোভে সে বাড়িতে থেকে গেছে মেরি।

মেরির মায়ের কিন্তু হঠাৎ মন কেমন করে উঠেছিল মেয়ের জন্য। রাত গভীর হলে হঠাৎ বলে উঠেছিলেন—'আর ফিরে পাওয়া যাবে না মেরিকে।'

ভদ্রমহিলার বয়স সত্তরের ধারেকাছে। কিছুদিন ধরে আর চলাফেরাও করতে পারছিলেন না।

যাইহোক, মায়ের মন সব সময়ে উচাটন থাকে সোমত্ত মেয়ের জন্যে—এইভেবেই ইউসট্যাচে তাঁর তখনকার কথাটাকে স্রেফ অর্থহীন বকুনি ভেবেই উড়িয়ে দিয়েছিল। সোমবারেই কিন্তু জানা গেল আসল খবরটা।

মাসির বাড়িতেই যায়নি মেরি!

সর্বনাশ! তাহলে গেল কোথায় সোমত্ত মেয়েটা? সারাদিন হাপিত্যেস করে বসে থাকার পরেও যখন তার টিকির সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন শুরু হল খোঁজ খবর নেওয়ার পালা। শহর আর শহরতলির নানা জায়গায় লোক গেল মেয়ের খবর নিতে।

কিন্তু যেন স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে কুমারী মেরি রোজেট। খোঁজ-খোঁজ করে ক'টা দিন কাটিয়ে দেওয়ার পর পঁচিশে জুন বুধবার খবর পাওয়া গেল, সিয়েন নদী থেকে জেলেদের জালে একটা মড়া উঠে এসেছে। নদীতে ভেসে যাচ্ছিল গতায়ুকলেবরটা—জীবদ্দশায় যাকে মেরি রোজেট বলেই সবাই চিনত.

কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে ডাকসাইটে সেই সুন্দরীর! মুখ ভর্তি কালো রক্ত—বোঝাও যাচ্ছে এ রক্ত উঠেছে মুখের ভেতর থেকে। গাঁজলার চিহ্ন নেই মুখে—অথচ জলে ডুবে গতায়ু হলে মুখে গাঁজলা থাকবেই। শরীরটাও তো

তেমন বিরক্ত পাঁশুটে মেরে যায়নি। গলা ঘিরে রয়েছে আঙুলের দাগ আর অনেক ক্ষতচিহ্ন। হাত দুটোকে বেশ শক্ত করে নুইয়ে রাখা হয়েছে বুকের ওপর। বাঁ হাতের মুঠো শিথিল, কিন্তু ডান হাতের মুঠো এঁটে বন্ধ। যে হাতের মুঠো শিথিল, সেই হাতটাকে যে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল—তা বোঝা যাচ্ছে কব্জি ঘিরে থাকা একটা দাগ দেখে। আর যে হাতের মুঠো বেশ শক্ত, সেই হাতের পেছনে আর কাঁধে রয়েছে ঘষটানি দাগ—জেলেরা দড়ি বেঁধে মড়া টেনে তুলেছিল বটে—কিন্তু এ দাগগুলো সে জন্যে হয়নি। বেশ খানিকটা মাংস দলা পাকিয়ে ফুলে উঠেছিল গলার কাছে। অথচ চোট লাগার কোনও চিহ্ন নেই। তবে হ্যাঁ, একটা ফিতে কষে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল গলা ঘিরে—এত জোরে যে ফিতে ঢুকে গেছিল মাংসের মধ্যে—বাইরে থেকে দেখাই যাচ্ছিল না। ফিতের গিঁটটা ছিল বাঁ কানের আড়ালে। তবে কি শুধু ওই ফিতের বাঁধনেই নিষ্প্রাণ করা হয়েছে মেরিকে? অসম্ভব নয়। ডাক্তাররা কিন্তু একবাক্যে বলেছিল একটা মস্ত কথা : মেরির ওপর জঘন্য অত্যাচার করা হয়েছিল মৃত্যুর আগে।

পোশাকের অবস্থা পাশবিক অত্যাচারের সাক্ষ্যই বহন করছে। ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার। লাটঘাট। প্রায় এক ফুট চওড়া এক ফালি কাপড় ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে ওপরের পোশাক থেকে—ছেঁড়া হয়েছে কোমরের কাছে সেলাই পর্যন্ত—তারপর ছেঁড়া সেই ফালিতে কোমরে তিনপাক জড়িয়ে গিঁট বেঁধে দেওয়া হয়েছে পেছনে।

মিহি মসলিনের পোশাকটা ছিল তার নিচেই। এ থেকেও খুব যত্ন করে ছেঁড়া হয়েছে আঠারো ইঞ্চি চওড়া একটা ফালি—এ ফালিকে সমান করে আর সযত্নে টেনে একদম ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে, তারপর জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মেরির গলদেশে, ঝুলছে শিথিলভাবে, বেঁধে রাখা হয়েছে একটা গিঁট দিয়ে। মাথার টুপির সুতো বাঁধা ছিল এই ফালি আর গলায় কেটে বসা ফিতের সঙ্গে যে ধরনের গিঁট দিয়ে—সে গিঁট বাঁধা মেয়েদের কর্ম নয়—পারে শুধু জাহাজি নাবিকরাই।

ডেডবডি ঝটপট কবর দিয়ে দেওয়া হয় জল থেকে যেখানে পাওয়া গেছে—তার কাছেই। মর্গে নিয়ে যাওয়ার কথা—কিন্তু নিয়ে যাওয়া হয়নি। পুরো ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেওয়ার ব্যাপারেও কোনও ত্রুটি রাখা হয়নি। জেলেদের জাল থেকে ডেডবডি ডাঙায় ওঠার পর মেরিকে চিনতে পেরেছিলেন মঁসিয়ে বোভেই—তিনিই কোমর বেঁধে মৃতদেহকে মাটির তলায় চালান করে দিয়ে ব্যাপারটাকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা করেন। দিন কয়েক কেটে যায় এইভাবেই—পাবলিক প্রক্ষোভ জাগ্রত হয় তারপর। সবার আগে বিষয়টাকে নিয়ে মাতামাতি শুরু করে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা। তখন মৃতদেহকে কবর খুঁড়ে ফের তোলা হয়। ফের মৃতদেহকে চুলচেরা চোখে দেখা হয়; কিন্তু ইতিপূর্বে যা জানা গেছে—তার বেশি কিস্‌সু জানা যায়নি। জামাকাপড়গুলো জমা দেওয়া হয় মায়ের আর মেরির বন্ধুদের কাছে। প্রত্যেকেই বলেছে—হ্যাঁ, এ জামাকাপড় হতভাগিনী মেরি রোজেটেরই বটে।

ইতিমধ্যে কিন্তু ঘণ্টায় ঘণ্টায় উত্তেজনা বেড়েই চলেছে। বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ সন্দেহের আওতায় এসেছে সেন্ট ইউসট্যাচে। রবিবার মেরি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিল—সেইদিন ইউসট্যাচে কোথায় ছিল, কি করেছিল—তার সদুত্তর দিতে পারেনি। পরে অবশ্য পুলিশ প্রিফেক্টের কাছে যে-সব কাগজপত্র দাখিল করেছিল, তা থেকে তার গতিবিধির সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রহস্য নিবিড় থেকে নিবিড়তর হতে থাকে, তিলমাত্র সূত্র আবিষ্কৃত না হওয়ার ফলে গুজব যেন হাজার ডানা মেলে উড়তে থাকে এবং মওকা বুঝে জার্নালিস্টরা নানারকম সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতে শুরু করে। চমকপ্রদ গল্পকথাগুলোর সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর সম্ভাবনাটা হইচই ফেলে দেয় গোটা শহরে—মেরি রোজেট নাকি মরে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়নি, বহাল তবিয়তে আড়াল থেকে রগড় দেখছে এবং এই হতশ্রী মৃতদেহটা মোটেই তার নয়! লা এতোয়াল পত্রিকায় এই সম্পর্কে যে খবরটি বেরিয়েছিল, আমি তার হুবহু অনুবাদ নীচে তুলে দিচ্ছি ঃ

কুমারী রোজেট রোববার সকালে ২২ জুন, ১৮—, কোনও এক মতলবে মাসির কাছে গেছিল। তারপর থেকে কেউ তাকে দেখেনি। তার কোনও হদিশই পাওয়া যায়নি। এখন বেঁচে আছে কিনা তার কোনও প্রমাণ না পাওয়া গেলেও রোববার সকাল নটা পর্যন্ত প্রাণময় এই পৃথিবীতে সে যে ছিল, সে প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। বুধবার, দুপুরে একটা নারীদেহ পাওয়া গেছে নদীর জলে। ধরে নেওয়া যাক, সকাল নটায় বাড়ি ছেড়ে বেরনোর তিনঘণ্টার মধ্যে তাকে খুন করে ফেলে দেওয়া হয়েছে নদীর জলে—এখানে হিসেবের সুবিধের জন্যে ঘণ্টায় একদিন ধরা হচ্ছে, অর্থাৎ তিনদিনে তিনঘণ্টা। কিন্তু খুন যদি আদৌ হয়েই থাকে, তাহলে মধ্যরাতের আগে সেই দেহ নদীবক্ষে নিক্ষেপ করেছিল খুনের দল—এমনটাও তো ভাবা একেবারেই আহাম্মুকি। এভাবে যারা খুন করে, তারা লাশ পাচার করে রাতের অন্ধকারে—দিনের আলোয় কখনই নয়। তাহলে যদি ধরে নেওয়া যায়, নদীর জলে পাওয়া লাশটা হতভাগিনী মেরি রোজেটেরই, তাহলে সেই দেহ জলে ছিল নিশ্চয় আড়াইদিন—বড়জোর তিনদিন। ছয় থেকে দশ দিনের আগে মড়া কখনও জলের ওপর ভেসে ওঠে না। কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন দেহও যদি পাঁচ ছ'দিনের মাথায় ভেসে ওঠে—ফের তা ডুবে যায় যথেষ্ট পচন না ধরা পর্যন্ত। মৃত্যুর দুদিন পরেও যদি মৃতদেহ জলে ফেলা যায়, এত তাড়াতাড়ি তো ভেসে ওঠার কথা নয়। তার চেয়েও বড় কথা, খুনিরা কি এতই বোকা যে মৃতদেহ ওজন বেঁধে ভারি না করে ফেলে দিল জলে?

সম্পাদক মশায় এরপর অনেক যুক্তিতর্ক দেখিয়ে প্রমাণ করে ছেড়েছেন যে, মৃতদেহ তিনদিন নয়, তিন পাঁচে পনেরো দিন ছিল জলের মধ্যে—ফলে তা এমনভাবে ফুলে ঢোল হয়ে গেছিল যে স্বয়ং বোভেই পর্যন্ত ঢোঁক গিলেছেন তাকে সনাক্ত করার আগে। সম্পাদকের যুক্তির কচকচি অনুবাদ করে দিচ্ছি

পাঠকের বোঝবার জন্যে :

কোন যুক্তিতে মঁসিয়ে বোভেই মৃতদেহটা মেরির মৃতদেহ বলে সনাক্ত করলেন জানতে পারি? ওঁর মোক্ষম প্রমাণটা এই : গাউনের হাতা গুটিয়ে এমন একটা চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন যা নাকি মেরির শ্রীঅঙ্গেই ছিল। পুরনো ক্ষতচিহ্ন থেকেই বড় বড় লোম গজায়—এই ক্ষেত্রেও তা ছিল। এটা কি একটা প্রমাণ হলো? এদিয়ে কোনো অকাট্য সিদ্ধান্তে পৌঁছন কি উচিত? কারোর জামা বা হাত দেখে মৃতদেহ সনাক্ত করা যায়? মেরিকে যদি চিনতেই পেরে থাকেন তো, সেই রাতেই মেরির মা-কে খবর দিতে তাঁর বাড়ি ছুটে যাননি কেন? উলটে লোক মারফত মাদাম রোজেটকে শুধু জানিয়েছিলেন—মেয়ের খোঁজ এখনও চলছে! মাদাম রোজেটের না হয় বয়স হয়েছে—তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কারও তো যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কেউ জানত না খবরটা। এমনকি মেরির হবু বর ইউসট্যাচেও জানত না। জানল পরের দিন সকালবেলা। মঁসিয়ে বোভেই নিজে এসে খবরটা ভাঙলেন। মাদাম রোজেট তো মনে হয় সহজভাবেই নিয়েছিলেন সেই খবর। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই : মৃতদেহ যখনই পাওয়া গেল তখনই তার যথার্থ সনাক্তকরণের জন্যে বাড়ির লোককে কেন খবর দেওয়া হয়নি?

কাগজের খবর পড়ে মনে হয় যেন মেরির বাড়ির লোকের চিত্ত মোটেই বিচলিত হয়নি মেরির পরলোক প্রাপ্তির সংবাদ শুনে। অর্থাৎ, মৃতদেহটা যে প্রাণাধিকা কন্যার মৃতদেহ, মেরির মা তা মেনে নিতে পারেননি।

পত্রিকা আরও ইঙ্গিত রেখেছিল সংবাদ পরিবেশনার প্রথাগত কায়দায় : মেরি তো আর ধোয়া তুলসীপাতা ছিল না—কাজেই সে চম্পট দিয়েছে অগুন্তি প্রাণেশ্বরদের একজনের সঙ্গে!

তার বন্ধুর অভাব নেই। এরাই যখন দেখল সিয়েন নদীতে একটা মেয়ের মড়া পাওয়া গেছে, অমনি রটিয়ে দিলে—এই তো সেই ডানাকাটা পরি! দেখ, দেখ, কুলটা-র পরিণামটা কী দাঁড়িয়েছে—দেখে যাও!

'লা এতোয়াল' কাগজের এ জাতীয় সিদ্ধান্ত খুবই অনুচিত। বাড়ির লোক মোটেই নির্বিকার থাকেনি। মায়ের যা বয়স, তাঁর পক্ষে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো আচমকা এই সংবাদে শোকে পাথর হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তদন্তের সময়ে এই জন্যেই উনি যেতে পারেননি।

আর ইউসট্যাচে? খবর পেয়েই একেবারে ভেঙে পড়েছিল—পাগলের মতো হয়ে গেছিল। মঁসিয়ে বোভেই তখন একজনকে রেখে যান ইউসট্যাচের কাছে এবং ব্যবস্থা করে যান যাতে সে তদন্তের সময়ে যেতে না পারে। কবর থেকে মৃতদেহ বের করার পর ইউসট্যাচে মৃতদেহকে দেখতে যেতে পারেনি এই কারণেই।

পত্রিকায় আরও একটা খবর বেরয়। জনসাধারণ চাঁদা তুলে মেরির মৃতদেহকে দ্বিতীয়বার কবর দেয়। এক ব্যক্তি সাহায্য করতে চেয়েছিলেন টাকাকড়ির ব্যাপারে। মেরির আত্মীয়স্বজন তাঁর সেই প্রস্তাব নেয়নি। তার চেয়েও

বড় কথা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে আত্মীয়স্বজন কেউই যায়নি!

আমার কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাস, লা এতোয়াল পত্রিকা নিজেদের প্রথম প্রকাশিত খবর আর সিদ্ধান্তকে জোরদার করার জন্যেই পরের পর এত কাণ্ড ছাপিয়ে গেছে।

দিন কয়েক পরে এই পত্রিকাতেই সরাসরি সন্দেহ করা হল মঁসিয়ে বোভেইকে। সম্পাদকের অভিমতে, ঘটনার স্রোত নাকি এখন মোড় নিয়েছে। তিনি খবর পেয়েছেন, কে এক মাদাম বি— নাকি মাদাম রোজেটের বাড়ি এসেছিলেন। ঠিক সেই সময়ে মঁসিয়ে বোভেই যাচ্ছিলেন বাড়ির বাইরে। মাদাম বি—কে বলে যান, একজন চৌকিদারের আসার কথা আছে—সে এলে তার কাছে যেন কিছু ফাঁস করা না হয়। মঁসিয়ে বোভেই যা বলবার তা বলবেন। তাহলে নিশ্চয় বোভেই মশায় সব ব্যাপারই জানেন। উনিই তো আত্মীয়স্বজনদের মৃতদেহ দেখতেও দেননি। ঘুরে ফিরে আসতে হচ্ছে তাহলে এই মঁসিয়ে বোভেই-এর কাছে—রহস্যের চাবিকাঠি যিনি ধরে রেখেছেন নিজের মুঠোয়!

আরও একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা ছেপে লা এতোয়াল পত্রিকা মঁসিয়ে বোভেই-এর ওপর সন্দেহকে ঘনীভূত করে তোলে। উনি যখন অফিসে ছিলেন না, তখন এক ব্যক্তি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে চাবির ফুটো দিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে নাকি একটা গোলাপ ফুল দেখতে পায়। পাশে রাখা ছিল একটা শ্লেটে লেখা একটিই নাম : মেরি!

মেরি উধাও হয়ে যায় এর দিনকয়েক পরেই।

আর যে সব কাগজ মাতামাতি জুড়েছিল কুমারী মেরির হত্যারহস্য নিয়ে, তারাও ধরেছিল একই সানাইয়ের পোঁ। একদল বাজে ছেলে মেরিকে গায়েব করে নিয়ে গিয়ে লালসা মিটিয়ে নিভিয়ে দেয় তার প্রাণের প্রদীপ—তারপর ফেলে দেয় গাঙের জলে।

এহেন ধারণাকে কিন্তু আমল দেয়নি নামি পত্রিকা লা কমার্শিয়াল। তাদের বিশ্বাস, গোড়া থেকেই তদন্ত চলছে ভুল পথে। রূপের চকমকি মেরিকে চিনত অনেকেই—অথচ সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এতটা পথ হেঁটে গেল—তথাপি কেউ তাকে চোখের দেখাও দেখল না? দেখলে অবশ্যই মনে রাখত। বিশেষ করে তখন তো লোক গিজগিজ করছে পথে ঘাটে। আদৌ কি সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল? গাউন ছিঁড়ে ফালি বের করে মেরিকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? নদীর যেখানে মৃতদেহ পাওয়া গেছে, সেইখানেই যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তার কী প্রমাণ? আর সেইখানেই যদি খুন করা হয়ে থাকে তো এত সব করার দরকার ছিল কি? ভেতরের জামা থেকে যে ফালিটা ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছিল—সেটা তার মুখ বেঁধে রাখার জন্যে—যাতে চেঁচাতে না পারে। তার মানে এই : খুনেদের পকেটে রুমাল-টুমাল ছিল না।

লা কমার্শিয়াল কাগজের খবরগুলো যে অসত্য, তার প্রমাণ বেরয় আর একটা খবরে। নদীর যেখানে মড়া ভাসতে দেখা গেছিল, সে জায়গাটার নাম ব্যারিয়ার দ্য রুল। এইখানে একটা জঙ্গল আছে। দুটি বাচ্চা ছেলে জঙ্গলে ঢুকে

একটা ঝোপের মধ্যে পাথর দিয়ে তৈরি বসবার জায়গা দেখতে পায়। ঠেস দিয়ে বসা যায়, নীচের পাথরে পা-রাখাও যায়। মেয়েদের একটা অন্তর্বাস পড়েছিল ওপরের পাথরে—আর একটা রেশমি গলাবন্ধ পড়েছিল নীচের পাথরে। এই সঙ্গে পাওয়া যায় একটা রঙিন ছাতা, একজোড়া দস্তানা আর একটা ছোট রুমাল—যে রুমালের ওপর লেখা ছিল 'মেরি রোজেট' নামটা। পোশাক-আশাকের কিছু ছেঁড়া টুকরো পাওয়া যায় পাশের কাঁটা-ঝোপে। ধস্তাধস্তির চিহ্নও পাওয়া যায়—যেমন ঝোপ ভেঙে তছনছ হয়েছে, মাটিতেও পায়ের দাগ চেপে বসে গেছে। ঝোপ আর নদীর মাঝখানের বেড়া টান মেরে তুলে ফেলা হয়েছিল। মাটিতে পাওয়া যায় ঘষটানির দাগ। ঠিক যেন একটা গুরুভার বস্তুকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

লা সোলে কাগজে যে খবরটা বেরয়, তাতে প্যারিসের লোকের মনের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, তিন চার সপ্তাহ ধরে এই সব প্রমাণ পড়ে থেকেছে জঙ্গলে, বৃষ্টি হওয়ায় ছ্যাংলা পড়ে কিছু নষ্টও হয়েছে, ঘাস গজিয়েছে, রঙিন ছাতার সেলাই নষ্ট হয়ে গেছে, ছাতা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভাঁজের কাছে ছিড়েও গেছে। কাঁটা ঝোপে আটকে থাকা ছেঁড়া টুকরোগুলো চওড়ায় তিন ইঞ্চি, লম্বায় ছ'ইঞ্চি। মাটি থেকে ফুটখানেক উঁচুতে লেগেছিল টুকরোগুলো। কোনও সেলাই ছিল না স্কার্টে, ছিল ফ্রকের টুকরোয়। মেয়েটার ওপর ঠিক এইখানেই পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে, সে বিষয়ে নেই আর কোনও সন্দেহ।

যে বাচ্চা ছেলে দুটি মোক্ষম এই আবিষ্কারটি করেছে, তাদের মায়ের নাম মাদাম দেলুক। ভদ্রমহিলা ওই অঞ্চলেই একটা সরাইখানার মালিক।নদীর পাড়ের রাস্তার ঠিক পাশেই। নিরিবিলি। এই কারণেই রোববার হলেই প্যারিসের বদ ছেলেরা নৌকোয় চেপে সেখানে যায় ফুর্তি করতে। বিশেষ সেই রোববারে বিকেল তিনটে নাগাদ গাঢ় বর্ণের এক ব্যক্তির সঙ্গে ফর্সা টুকটুকে একটি মেয়ে আসে সরাইখানায়। তারপর যায় ঘন ঝোপের দিকে। মেয়েটির গলাবন্ধ আর গায়ের জামাটি বিশেষ করে মনে আছে মাদাম দেলুকের। এরপরেই একদল বেসামাল ছেলে এসে সরাইখানায় বসে মদ-টদ গিলে পয়সা না ঠেকিয়ে চম্পট দেয় ঠিক সেই দিকেই যেদিকে একটু আগে গেছে রূপসী তার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে। সন্ধে নাগাদ ফিরে আসে ছোকরার দল—হুটোপুটি করে চলে যায় নদী পেরিয়ে।

অন্ধকার একটু গাঢ় হতেই নারীকণ্ঠে অতি তীব্র কিন্তু ভয়ানক আর ছোট্ট একটা আর্তনাদ শোনা যায় সরাইখানার পাশে।

গলাবন্ধ আর জামা চিনতে পেরেছেন মাদাম দেলুক। বাসের ড্রাইভারও বলেছে, রোববারে মেরি গাঢ়বর্ণের এক ছোকরার সঙ্গে গেছে নদীর ওপারে। মেরিকে সে চেনে। ঝোপে পাওয়া জামাকাপড়গুলোকেও সনাক্ত করে মেরির আত্মীয়স্বজন।

খবরের কাগজ থেকে আমি আর দুর্পি আরও একটা খবর উদ্ধার করলাম।

মেরির জামাকাপড়ের টুকরো-টাকরা খুঁজে পাওয়ার পরেই একই জায়গায় পাওয়া গেছে সেন্ট ইউসট্যাচের ডেডবডি। পাশে পড়েছিল 'লডেনাম' লেখা একটা খালি শিশি। বিষের শিশি। বিষ খেয়েই আত্মহত্যা করেছে সেন্ট ইউসট্যাচে—চিঠিতে লিখে গেছে শুধু একটা কথা : মেরিকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল বলে বেছে নিয়েছে এইভাবে আত্মহননের পথ।

কাঁড়ি কাঁড়ি খবর থেকে দরকারি তথ্যগুলোকে গুছিয়ে লিখে রেখেছিলাম। দুপি সে সব পড়ে বললে—'রু মর্গের খুনখারাবির চেয়েও দেখছি বেশ জট পাকানো এই ব্যাপারটা। অথচ খুনের ধরন দেখে সহজ আর সাধারণ ব্যাপার মনে করা হয়েছে। রু মর্গের খুনখারাবিতে ছিল অসাধারণ কাণ্ড কারখানা—তাই তা জটিল মনে হয়েছিল—এবং, সহজ ব্যাপারগুলোর দিকে নজর যায়নি। মেরির খুনের ক্ষেত্রে ঠিক তার উলটো ঘটেছে। মাথা ঘামানো হচ্ছে শুধু কী ঘটেছে তাই নিয়ে—কিন্তু কেউ ভাবছে না এমন কী ঘটেছে যা এর আগে ঘটেনি—এই নিয়ে। মনে হচ্ছে ভারি সোজা, আসলে ভীষণ জটিল।

'প্রথমেই নিশ্চিত হতে হবে একটি ব্যাপারে—মৃতদেহটা নিখোঁজ মেরিরই তো? এই নিয়েই কিন্তু সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কাগজওয়ালারা চায় সাড়া জাগানো খবর ছাপিয়ে কাগজের বিক্রি বাড়াতে। পাবলিক কী বলছে, তা ছাপলে তো তেমন দর পাওয়া যাবে না—তাই ইঙ্গিতের রঙ চড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রেও অনেক রহস্য রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে কাগজওলা বলতে চাইছে, ছিঃ, ছিঃ, দিব্যি বেঁচে রয়েছে মেরি রোজেট—অথচ দেশ জুড়ে বলা হচ্ছে অক্কা পেয়েছে মেয়েটা! ফলে, কাটতি বেড়েছে কাগজের।

'অনেক কাগজই মেরি রোজেটকে নিয়ে বাজার গরম করেছে। এর মধ্যে শুধু কাগজের কথা নিয়ে আলোচনা করছি।

'লা এতোয়াল' চাইছে যে, লোকে বিশ্বাস করুক—মেরি বেঁচে আছে। মড়াটা অন্য মেয়ের। অনেক আগেই এই দোসরা মেয়েকে খুন করা হয়েছিল। জলে ফেলা হয়েছিল। ছ' থেকে দশ দিন পর ভেসে উঠেছে। এই পত্রিকাই আবার দফায় দফায় উলটোপালটা কথা বলে চলেছে। মঁসিয়ে বোভেই-কে মেরির প্রেমাস্পদ খাড়া করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেদিন এই ভদ্রলোকের ঘরে গোলাপ ফুলের পাশে শ্লেটে লেখা 'মেরি' নামটা দেখা গেছিল, তার দিনকয়েক পরেই মেরি নিখোঁজ হয়েছিল। এছাড়াও আরও পরস্পর বিরোধী কথা এই কাগজ বাজার তাতিয়ে রাখার জন্যে বের করে গেছে।

'একমাত্র লা মোনিকোয়ার' কাগজটাই লা এতোয়ালের চাঞ্চল্যকর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। মৃতদেহ ছ' থেকে দশ দিনের আগে ভেসে উঠতে পারে বইকি—বলেছে লা মোনিতোয়ার। অনেক কারণেই তা ঘটতে পারে—আমিও তা বলি। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলো তোমাকে অন্য এক সময়ে বলব। শুধু বলে রাখি, মৃতদেহ তিন চার দিনেও ভেসে উঠতে পারে। কাজেই মৃতদেহ মেরির হওয়া বিচিত্র নয়। অর্থাৎ মেরি খুনই হয়েছে।

আর মিশিয়ে বোতেই? ভদ্রলোক খুন করার মতো লোক নন। রোমান্টিক মানুষ হতে পারেন, সুন্দরীর নাম প্লেটে লিখে তার পাশে গোলাপ ফুল রেখে প্লেটোনিক লাভ-এর পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারেন—কিন্তু খুনি নন। দেহটা যে মেরির—একথা তিনি বেশ জোর দিয়েই বলেছেন লা এতোয়াল পত্রিকার বিরূপ মন্তব্য শোনবার পরেও। উনি যদি খুনিই হতেন, তাহলে লুফে নিতেন এই মন্তব্য—তাহলে তো ওঁর ওপর থেকে সন্দেহ সরে যাওয়ার কথা। তবুও সত্যকে আঁকড়ে থেকেছেন। আর এই লা এতোয়াল পত্রিকাই তাঁকে খুনি বলেছে পরে! বাহবা সম্পাদক

'লা কমার্শিয়াল' ধুয়ো ধরেছে একেবারে অন্য লাইনে। মেরিকে একজন খুন করেনি—অনেকে মিলে খুন করেছে। তারা তাকে বাড়ি থেকে বেরতে না বেরতেই ধরে, মুখ বেঁধে, তিনটে এলাকা পার করে নিয়ে গিয়ে, খুন-টুন করে জলে ফেলে দিয়েছে। তাই মেরির মতো পপুলার মেয়েকে রাস্তাঘাটের কেউ দেখতে পায়নি! অদ্ভুত কল্পনাশক্তি বটে! রোববার যে সময়ে মেরি বাড়ি থেকে বেরিয়েছে—সে সময়ে এমনিতেও রাস্তাঘাটে লোকজন থাকে কম—আর যদি সে ঠিক করেই থাকে যে তাকে একটু ঘুর পথে চেনাজানাদের চোখ এড়িয়ে যেতে হবে—তাহলে তাকে দেখে ফেলার প্রশ্নই ওঠে না। আরও হাসির কথা এই যে, একদল বদমাস যদি আগেভাগেই ফন্দি এঁটে থাকে যে, রোববার সকালেই মেরিকে নিয়ে যাবে চ্যাংদোলা করে—তাহলে তার মুখ বাঁধবার জন্যে রুমালটাও নিশ্চয় পকেটে করে আনতো—মেরির জামা ছিঁড়তে যাবে কেন? যত্তো সব পাগলের কারখানা!

'লা সোলে' পত্রিকায় কে একজন বিজ্ঞের মতো একটা প্রবন্ধ লিখে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, মেরি মোটেই খুন হয়নি, তিন চার সপ্তাহ ধরে খুনের সাক্ষ্য প্রমাণ অকুস্থলেই পড়েছিল। এই প্রাবন্ধিক ভদ্রলোক তোতাপাখি হয়ে জন্মালে ভাল করতেন। অন্যান্য কাগজগুলোয় যা ছাপা হয়েছে, সেগুলোকেই সাজিয়ে গুছিয়ে জুড়ে পাবলিকের মন্তব্যের খোলস পরিয়ে জাহির করেছেন নিজের মন্তব্যটি—মেরি মরেনি! মরতে পারে না! আহা! দরদ উঠলে উঠেছে দেখছি! এই ভদ্রলোকের ঠিকানাটা জোগাড় করতে হবে—কেন, তা পরে বলছি।

এই গেল কাগজপত্রের মনগড়া তদন্ত সম্পর্কে আমার মন্তব্য। এবার এসো ইউসট্যাচের ব্যাপারে। এই ছোঁড়া চরিত্রহীনা হবু বউকে খুন করে নি তো? আমার কিন্তু কোনও সন্দেহ নেই ছোকরার ওপর। তবুও তাকে নিয়ে ভাবা যাবে, তদন্ত করা যাবে। তার গতিবিধি সম্পর্কে যে-সব কাগজপত্র দিয়েছে পুলিশ প্রিফেক্টকে—তা থেকেই বোঝা যায়—ছেলেটা নির্দোষ। তাই হবু-বউয়ের নৃশংস হত্যা-সংবাদে অত ভেঙে পড়েছিল। হত্যার জায়গাটার খবর পেয়েই সেখানে ছুটে গিয়ে বিষ খেয়ে প্রাণের জ্বালা জুড়িয়েছে।

দিন কয়েক আরও বিচার বিশ্লেষণ করা যাক কাগজের খবর-টবরগুলোকে—তারপর আসা যাবে আমার নিজস্ব সিদ্ধান্তে।

সাতদিন গেল দুপিঁর নিজের কায়দায় সন্দেহ ভঞ্জনের তদন্ত। আমি টো-টো করে জেনে গেলাম—ঠিকই বলেছে দুপিঁ—ইউসট্যাচে বেচারা একেবারে নির্দোষ। দুপিঁ কিন্তু ডুবে রইল খবরের কাগজের ফাইলগুলো নিয়ে।

সাতদিন পরে বললে আমাকে—শোনো হে, রূপসী বোম্বেটে মেরি রোজেট পাঁচ মাস আগে আর একবার দুম করে উধাও হয়ে গেছিল আতরের দোকান থেকে—শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় ফ্যাকাশে মুখে হঠাৎ ফিরে এসেছিল সাতদিন পরে। কোথায় ছিল এই সাতদিন? পাড়াগাঁয়ের এক বন্ধুর বাড়ি। এটা ছিল মেরির মা আর আতরের দোকানদারের কৈফিয়ৎ। গুজবের গলা টিপে দেওয়া হয় এইভাবে।

এই খবর এই সেদিন নতুন করে ছাপা হয়েছে ইভনিং পেপারে—সোমবার ২৩ জুন তারিখে। পরের দিনই আরও একটা আশ্চর্য খবর দিয়েছে লা মারকিউরি পত্রিকা। পাঁচ মাস আগে মেরি সুগন্ধি দোকান থেকে চম্পট দেবার পর তাকে ঘুর ঘুর করতে দেখা গেছিল এক লম্পট নেভি অফিসারের সঙ্গে। নিশ্চয় ঝগড়া করেই শুকনো মুখে বাড়ি ফিরেছিল মেরি। অফিসারটি আবার প্যারিসে এসেছেন—কিন্তু তাঁর নাম প্রকাশ করা যাচ্ছে না।

মোক্ষম ক্লু তুলে ধরা হয়েছে সর্বশেষ এই সংবাদে কিন্তু তা তোমারও চোখ এড়িয়েছে—পুলিশ প্রিফেক্টেরও চোখ এড়িয়েছে। নেভি অফিসারকে আগে জেরা করা উচিত ছিল। তিনি তা করেন নি। এবারেও মেরি তাঁরই সঙ্গে উধাও হওয়ার প্ল্যান আঁটেনি তো?

চমকে উঠছ কেন? রূপের দেমাকে যারা ফেটে পড়ে, তারা নাগর নাচাতে গিয়ে শেষকালে নিজেরাই নেচে মরে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এইভাবেই নেচেছে মেরি এবং মরেছে অকালে। কীভাবে এলাম এই সিদ্ধান্তে, তা কান খাড়া করে শুনে যাও।

আগে যে সময়ে মেরি পালিয়েছিল প্রথমবার, সেই সময়টা আর এবারের চির নিখোঁজের সময়টার মধ্যে তফাৎ মোটে কয়েক মাসের। যুদ্ধ জাহাজগুলো বন্দরে এসে যদ্দিন জিরিয়ে নেয়—এই সময়ের ব্যবধানটা তার চেয়ে একটু বেশি গতবার তাহলে হঠাৎ সমুদ্রে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল নেভি অফিসারকে। মনোকষ্ট দিয়ে গেছিলেন মেরিকে—এবারে কি প্যারিসেই পাকাপাকি ভাবে রয়ে গেলেন.মনস্কামনা পূরণের জন্যে? যুদ্ধজাহাজ তো জিরিয়ে নিয়ে ফের পাড়ি জমিয়েছে—সাত সাগরে—এই ভদ্রলোক যে তারপরেও আছেন—খবরের কাগজ সেই ক্লু ধরিয়ে দিয়েছে।

অতএব ধরে নেওয়া যায়, খবরটা পেয়েই মেরি ঠিক করেছিল ধামাধরা ইউসট্যাচের চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে ঘর থেকে। এইজন্যেই স্তোকবাক্য দেওয়া হয়েছিল ইউসট্যাচেকে, সে যেন সন্ধে নাগাদ যায় মাসির বাড়িতে। প্রেমান্ধ ইউসট্যাচে তাতেই গদগদ হয়ে গেছিল!

কিন্তু মায়ের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না। তাই তিনি ফস করে বলে

ফেলেছিলেন—আর ফিরে পাওয়া যাবে না মেরিকে। এ কথাটা কেন হঠাৎ বললেন—কেউ তা নিয়ে এতদিন ভাবেনি কেন? কেন খুঁচিয়ে কথা বের করেনি মেরির মায়ের পেট থেকে? খুনির সন্ধান তাহলে পাওয়া যেত।

মেরির প্ল্যানটা যা ছিল, তা আমি যেভাবে মনে মনে সাজিয়েছি, তা বলছি শোন। ইউসট্যাচেকে সন্ধ্যে নাগাদ যেতে বলায় সারাদিনটা হাতে পেয়েছিল মেরি। সারাদিনে গোপন প্রণয়ীর সঙ্গে চুটিয়ে সময় কাটানো যাবে—তারপর মতলব ঠিক হয়ে গেলে বাড়ি ছেড়ে লম্বা দেওয়া যাবে—ইউসট্যাচে মাসির বাড়ি গিয়ে মুখ কালো করে ফিরে আসুক না—বয়ে গেল মেরির।

মেরির মৃতদেহ পাওয়ার পর জানা গেল, নদীর পাড়ে জঙ্গলে পাথরের আসনে বসেছিল মেরি আর তার প্রণয়ী—যার গায়ের রং ময়লা। একদল বদ ছোকরা মদ-টদ খেয়ে পয়সা না দিয়ে সেইদিকেই যায়—সন্ধ্যে নাগাদ তাড়াহুড়ো করে ফিরে এসে নদী পেরিয়ে চলে যায়।

সরাইখানার মালিক ভদ্রমহিলার জবানি থেকে সকলেরই মনে হবে—ওই ছোকরার দলই মেরিকে খুন করে তাড়াহুড়ো করে নদী পেরিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, তাড়াহুড়ো করছিল সন্ধে ঘনিয়ে আসছে বলে, ঝড়-বৃষ্টি আসতে পারে, নদী পেরনো তখন মুশকিল হবে যে?

তাছাড়াও, নারী কণ্ঠের যে তীক্ষ্ণ ভয়ানক, ছোট্ট চিৎকারটা সরাইখানার মালিক ভদ্রমহিলা শুনেছিলেন, তা তো ছেলের দল চলে যাওয়ার পর। তাহলে ছোকরাদের খুনি বলা যায় কি?

আরও একটা রীতিমত অদ্ভুত ব্যাপার শুনে নাও। মেরির জিনিসপত্র বড় সুন্দর ভাবে পড়েছিল পাথরের আসনে মাটিতে—সত্যিই ধস্তাধস্তি হলে কি এইভাবে পরিপাটি করে জিনিসপত্র কেউ রেখে দেয়? ওপরের পাথরে একটা অন্তর্বাস, আর তলার পাথরে রেশমি গলাবন্ধ। পাশেই মেরির নাম লেখা রুমাল।। রঙিন ছাতা আর দস্তানা।

মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, জিনিসগুলো যদি রোববার থেকেই ওখানে পড়ে থাকত, তাহলে মাদাম দেলুকের ছেলেরাই দেখতে পেত। গাছের ছাল খুঁজতে প্রায় ঢুকত জঙ্গলে—অমন সুন্দর পাথরের সিংহাসনের ধারে কাছে যায়নি অথবা তাতে একবারও বসেনি—এমনটা তো হতে পারে না। তাহলে?

খুনের জায়গা আসল জায়গা থেকে ঘুরিয়ে এনে ওই ঝোপের মধ্যে টেনে ফেলার জন্যেই জিনিসগুলো রাখা হয়েছিল বিশেষ সেই ঝোপে। কাগজে খবর পাঠানোর আগে জিনিসগুলো ফেলা হয় সেই ঝোপে—তারপর খবর যায় কাগজে। তারিখগুলো খেয়াল করে দেখো হে!

ঝোপের মধ্যে সদ্য যুবকের দল যদি মেরিকে হত্যাই করে থাকে, তার নাগরটিকেও নিশ্চয় খুন করেছে। তাহলে তার মরদেহ গেল কোন চুলোয়? আর যদি খুন না-ই হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় বেঁচে আছে আর গা-ঢাকা দিয়ে আছে। কেন সে এগিয়ে আসছে না? মনে পাপ না থাকলে আর ছোকরাদের হাতে মেরি

খুন হয়েছে—এই খবরটা চাউড় হয়ে যাওয়ার পর সে তো নির্ভয়ে এসে জবানি দিয়ে যেতে পারত। কেন দেয়নি? কারণ তার মনে পাপ আছে।

ছোকরার দল যদি খুন করেই থাকে, পুরস্কারের ঘোষণা বেরিয়ে যাওয়ার পর তাদের মধ্যে অন্তত একজনও তো রাজ সাক্ষী হয়ে গিয়ে পুরো পুরস্কারের টাকা লুঠে নিয়ে বাকি সবাইকে ফাঁসিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তা হয় নি।কারণ তারা খুনি নয়। উচ্ছৃঙ্খল যুবকরা সব্বাই খুনি হয় না।

ময়লা রঙের সেই লোকটা তাহলে গেল কোথায়? সরাইখানার মালিক ভদ্রমহিলা আর বাসের ড্রাইভারকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করে গেলে তাদের মুখ থেকেই এমন সব তথ্য বেরিয়ে পড়বে—যে গুলো অসীম গুরুত্বপূর্ণ—কিন্তু তাদের কাছে নিতান্ত তুচ্ছ বলেই আগ বাড়িয়ে বলেনি।

কাঁটা ঝোপে ছেঁড়া কাপড় পাওয়া গেছে। হে বন্ধু, কাঁটা ঝোপে কাপড় আটকালে ও ভাবে নিখুঁত ভাবে ছিঁড়ে ঝুলতে থাকে না। এত ব্রেন নেই কাঁটা ঝোপের।

খুনি নিজেই ছিঁড়েছে মেরির জামাকাপড়। গলায় আর কোমরে না বাঁধলে ঝুলিয়ে নিয়ে যাবে কী করে? গিট দিতে গিয়ে নাবিকি গিট দিয়ে ফেলেছে। অতএব, মেরির এই গোপন নাগরটি একজন নেভি অফিসার। অফিসারই বলব তাকে, কেননা মেরির মতো সুন্দরী আর উঁচু নজরের মেয়ে খালাসির সঙ্গে ঘরকন্না করার স্বপ্ন নিশ্চয় দেখেনি। জাহাজি মানুষদেরই গায়ের রঙ কিন্তু ময়লা আর গাঢ় হয়। পয়েন্টটা মনে রেখ।

এই নেভি অফিসারই নৌকো জুটিয়ে সেই রাতেই মেরির মৃতদেহ নৌকোর খোলে রেখে মাঝ নদীতে নিয়ে গিয়ে জলে ফেলে দিয়েছে। ডেডবডিতে ওজন বেঁধে ভারি করার দরকার হত যদি নদীর পাড় থেকে ফেলা দেওয়া হত—কিন্তু গভীর জলে যখন ফেলা হচ্ছে, তখন ওজন বাঁধবার দরকার কী?

নৌকোর খোলের ঘষটানিতেই মেরির শরীরে এই ভাবে অত ক্ষত দেখা গেছিল—টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নয়। খুনি তো মেরিকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে বেড়া পর্যন্ত খুলে ফেলেছিল—মনে পড়ে?

'লা ডিলিজেন্স' পত্রিকা খবর দিয়েছে, সোমবার অর্থবিভাগের একজন বজরা চালক নদীতে একটা খালি নৌকো ভেসে যাচ্ছে দেখে এনে রাখে অফিসে। মঙ্গলবার কাউকে না জানিয়ে কেউ ওখান থেকে নৌকো নিয়ে চলে যায়। হাল নিয়ে যায়নি—পড়েই আছে। কেন? অর্থাৎ হালহীন নৌকোকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে—যায় যাক যেখানে খুশি।

"একটা বেওয়ারিশ নৌকো দপ্তরে রয়েছে—মঙ্গলবার তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হল। খবরটা তাহলে গেল কি করে? নেভির লোকদের মধ্যে খবর চালাচালি তো হয়ই। তাহলে ভেতরের লোকই জেনেছে ভাসমান নৌকো জমা পড়েছে দপ্তরে। যেখানে সে থাকে বা যেখানে কর্মসূত্রে যেতে হয়—সেখানেই নৌকোটাকে দেখে ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে হালের খোঁজ না নিয়েই চুপিসাড়ে

নৌকো ভাসিয়ে দেয় নদীর স্রোতে। সেই নৌকো এখন কোথায় খোঁজ নিতে হবে। তাকে পাওয়া গেলেই সেই জড় পদার্থটাই কশাই খুনির হদিশ বাৎলে দেবে।

আর একটা কাজ করতে হবে। 'লা সোলে' পত্রিকার সেই তোতাপাখি মার্কা প্রাবন্ধিক ভদ্রলোকের হাতের লেখা আর লেখার স্টাইলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে নেভি অফিসারের হাতের লেখা আর লেখার স্টাইল। এই লেখকই তো বোঝাতে চেয়েছেন যে মেরি নামে রূপসী বোম্বেটে মোটেই খুন হয়নি! এ ছাড়াও নানান কাগজে নানান জায়গা থেকে চিঠি লিখে জানানো হয়েছে, মেরি নিশ্চয় গুণ্ডাদের হাতে খুন হয়েছে। এই সবকটি লেখাই নেভি অফিসারের হতে পারে।

দুপিঁ অকুস্থলে না গিয়ে, কাউকে কোন জেরা না করে, স্রেফ খবরের কাগজের রিপোর্টগুলো পড়ে, অঙ্কের হিসেবে যে বিশ্লেষণ করে ছেড়েছিল পুলিশের বড়কর্তার সামনে—তা শুনে চোখে মুখে বিস্তর অবিশ্বাস ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি। খুব একটা ইচ্ছে না থাকলেও দুপিঁ-নির্দিষ্ট পথেই তদন্তকে এগিয়ে নিয়ে গেছিলেন, এবং....

হাতে হাতে ফল পেয়েছিলেন।

[মেরি সিসিলিয়া রজার্স নামে একটি মেয়ে খুন হয় নিউইয়র্কের শহরতলীতে। রহস্য তিমিরাবৃত থেকে গেছিল পো সাহেবের এই লেখা ১৮৪২ সালের নভেম্বর মাসে ছাপার আগে পর্যন্ত। পো-র সিদ্ধান্ত এবং সবকটা অনুমিতি যে অভ্রান্ত তা বেশ কিছু সময়ের ব্যবধানে প্রমাণিত হয়েছে দু'জনের স্বীকারোক্তিতে—এদের একজন মাদাম দেলুক।]

****

অজ্ঞাতের অদৃশ্য সংকেত

[এ টেল অফ দ্য র‍্যাগ্‌ড্‌ মাউনটেন্স]

১৮২৭ সালের হেমন্তকালে আমি থাকতাম ভার্জিনিয়া-র চার্লট্‌স্‌ভিল-এর কাছে। তখন হঠাৎ আলাপ হয়ে যায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। তাঁর নাম মিস্টার অগাস্টাস বেডলো। সব দিক দিয়েই অসাধারণ ছিলেন এই যুবাপুরুষ, তাই বিলক্ষণ কৌতূহল আর আগ্রহের সঞ্চার করতে পেরেছিলেন আমার মনের কন্দরে কন্দরে। ভদ্রলোকের নৈতিক অথবা দৈহিক সম্পর্কের কোনো ঠিক ঠিকানা আমি খুঁজে পাইনি। বংশপরিচয় যা জেনেছিলাম, তা সন্তোষজনক নয় মোটেই। আগে থাকতেন কোথায়, তাও জানতে পারিনি। এমন কি তাঁর সঠিক বয়স আঁচ করতে গিয়েও মহা ধাঁধায় পড়েছিলাম। দেখে তো মনে হতোযুবাপুরুষ—যৌবনের গৌরবে স্ফীত থাকতেও ভালবাসতেন—মাঝে মাঝে কিন্তু তাঁকে কয়েকশ বছরের প্রাচীন পুরুষ কল্পনা করে নিলেও খুব একটা অবাক হতাম না। সবচেয়ে অদ্ভুত ছিল তাঁর আকৃতি। অসাধারণ দীর্ঘকায় এবং কৃশকায়। বেশ ঝুঁকে হাঁটতেন। হাত-পা অতিরিক্ত লম্বা আর শীর্ণ। ললাট প্রশস্ত তার সরল। গায়ের রঙ একেবারেই রক্তহীন। মুখের হাঁ বড় আর অনাড়ষ্ট। দাঁত বন্যের মত অসমান হলেও বেশ শক্ত—কোনো মানুষের মুখে এ ধরনের দাঁত আমি কখনো দেখিনি। হাসলে গা শিরশির না করুক, ভিন্ন ভাবের উদ্রেকও ঘটত না। নিঃসীম বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন—বিরামহীন আর নিরন্তর অবসাদে নিমজ্জিত। চোখ

অস্বাভাবিক রকমের বড়। গোলাকার। বেড়ালের চোখের মতন। আলো বাড়লে বা কমলে, তারারন্ধ্র সঙ্কুচিত অথবা বিবর্ধিত হতো অবিকল বেড়াল-জাতীয় প্রাণিদের মতন। উত্তেজিত হলেই ঝকঝক করত চোখের তারা—এই ঝিকিমিকি কিন্তু বাইরের আলোর প্রতিফলনে ঘটত না—ভেতর থেকে জাগত মোমবাতি অথবা সূর্যের আলোর মতন। মনে হতো যেন রশ্মি ঠিকরে বেরোচ্ছে দু'চোখ থেকে। সাধারণ অবস্থায় এই চোখই কিন্তু একেবারে দীপ্তিহীন, নিষ্প্রভ, ভ্যাপসা আর ছলছলে হয়ে থাকত—ঠিক যে রকমটা দেখা যায় কবরিস্থ মরা মানুষের চোখে।

এতগুলো অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য বেশ বিরক্ত করে মারতো খোদ মানুষটাকেই—কষ্টেসৃষ্টে এদের ব্যাখ্যা করতেন অর্ধেক ক্ষমাসূচক ভঙ্গিমায়—প্রথম-প্রথম যা শুনে কষ্টই হতো আমার। দুদিনেই অবশ্য এসব সয়ে গেছিল বলে অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম। এ জন্যে সোজাসুজি তাঁর স্নায়ু রোগকে দায়ী করতে না পারলেও দোষের ভাগী করতেন এই রোগের পর-পর কয়েকটা আক্রমণকে। প্রকৃতই নাকি সুন্দর দেহের অধিকারী ছিলেন এক সময়ে—পাজীর পা ঝাড়া এই রোগই শরীরের এহেন দশা করেছে। টেম্পলটন নামে এক চিকিৎসক তাঁর শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলেন বহু বছর ধরে। বৃদ্ধ। বয়স প্রায় সত্তর বছর। প্রথম দেখা সারাটোগায়। সেইখানেই চিকিৎসার সুফল হাতে হাতে পেয়েছিলেন বলে মনে করেন মিস্টার বেডলো। বিত্তের জোরেই টেম্পলটনের সঙ্গে পাকাপাকি ব্যবস্থা করে নেন। বছরে মোটা দক্ষিণা দিতেন ডাক্তারকে। ডাক্তারও এঁকে ছাড়া অন্য রুগী দেখতেন না।

তরুণ বয়সে বিলক্ষণ দেশভ্রমণ করেছিলেন ডক্টর টেম্পলটন। প্যারিসে থাকার সময়ে মেসমারের মতবাদে বেশ বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। শুধু ম্যাগনেটিক দাওয়াই দিয়ে একমাত্র রুগীর তীব্র যন্ত্রণার লাঘব ঘটাতে পেরেছিলেন। ফলে আরও বেড়েছিল গুরু মেসমারের ওপর শ্রদ্ধা-ভক্তি আস্থা-বিশ্বাস। সব উৎসাহীর মতো ডক্টরকেও বেশ বেগ পেতে হয়েছে শিষ্যকে পুরোপুরি বিশ্বাসী করে তুলতে গিয়ে—তারপর এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন যখন অসংখ্য এক্সপেরিমেন্টে নিজে থেকেই অংশ নিয়েছেন রোগাক্রান্ত মানুষটা। ঘন করে যাওয়ার ফলে যে ফল পেয়েছিলেন, আজকের দিনে তা এতই মামুলি হয়ে গেছে যে, কেউ আর তা নিয়ে লাফালাফি করে না। কিন্তু যে সময়ের কথা আমি লিখছি, তখন আমেরিকায় এ হেন ফলাফল ছিল নিতান্তই বিরল ঘটনা। আজও সোজাভাবে বলি, ডক্টর টেম্পলটন আর বেডলো-র মধ্যে তিলতিল করে গড়ে উঠেছিল একটা অত্যন্ত স্পষ্ট আর অতিশয় নিবিড় বনিবনা অথবা ম্যাগনেটিক সম্পর্ক। এই নিবিড় সম্পর্ক যে শুধু ঘুম-আকর্ষণ-করা শক্তিতেই সীমিত ছিল না—তার ঊর্ধ্বে চলে যায়নি—সে বিষয়ে জোর দিয়ে কিছু বলব না; শুধু বলব, শক্তিটা নিজেই ক্রমশ সুগভীর আর অতি-তীব্র হয়ে উঠেছিল। ম্যাগনেটিক তন্দ্রাচ্ছন্নতা সৃষ্টি করার প্রথম প্রয়াসে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিলেন মেসমেরিস্ট। অনেকক্ষণ ধরে

একনাগাড়ে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার পর কিছুটা সফল হয়েছিলেন পঞ্চম আর ষষ্ঠবারে। সম্পূর্ণ সফলতা এসেছিল দ্বাদশ প্রয়াসে। তারপর থেকেই চিকিৎসকের ইচ্ছাশক্তির কাছে দ্রুত হার মানতে থাকে রুগির ইচ্ছাশক্তি—এমনও হয়েছে যে, ঘরের মধ্যে চিকিৎসক হাজির হয়েছে, রুগি তা জানতেও পারেননি—নিমেষে ঘুমিয়ে পড়েছেন চিকিৎসকের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে। আমি এই কাহিনী লিখতে বসেছি ১৮৪৫ সালে, এ ধরনের ঘটনা এখন প্রত্যক্ষ করছেন হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু ১৮২৭ সালে এ জিনিস ছিল প্রায় অসম্ভব কাণ্ড। সিরিয়াস ঘটনা বলে কেউ মনেই করতে পারত না।

বেডলো-র দেহের তাপমাত্রা ছিল খুবই উঁচুমাত্রায় অনুভূতিপ্রবণ, উত্তেজনা-কাতর আর উৎসাহী। কল্পনাশক্তি ছিল অসাধারণ রকমের প্রবল আর সৃজনশীল। মরফিনের মৌতাত বাড়তি শক্তি জুগিয়ে যেত কল্পনার উনুনে। মরফিন গিলত প্রতিদিন। বেশ বেশিমাত্রায়। রোজ সকালে প্রাতরাশের ঠিক পরে। তারপর গিলত এক কাপ কড়া কফি। দুপুরে কিচ্ছু খেত না। মরফিন আর কফি উদরস্থ করেই চলে যেত পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে। কখনো যেত একা। কখনো সঙ্গে যেত একটা কুকুর। চার্লটসভিলের পশ্চিম আর দক্ষিণ দিকের বহুদূর বিস্তৃত উদ্দাম, বন্য আর বুক-দমানো এই নিরানন্দ পর্বতমালার নাম র‍্যাগড় মাউন্টেন্স। কর্কশ কালো পাহাড়ের সারির এর চাইতে ভাল উপাধি আর হতে পারে না।

আমেরিকায় সারা বছরের মধ্যে একটা সময় আছে, যখন ঋতু পরিবর্তন ঘটে অদ্ভুত ভাবে; এই সময়টাকে বলা হয় 'ইণ্ডিয়ান গ্রীষ্ম'। এহেন গ্রীষ্মের এক ম্যাড়মেড়ে, উষ্ণ, কুয়াশাময় প্রভাতে, নভেম্বরের শেষের দিকে, প্রতিদিনের অভ্যেসমত পাহাড় অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন মিস্টার বেডলো। দিন ফুরিয়ে গেল। উনি কিন্তু ফিরলেন না।

রাত আটটা নাগাদ আমরা ঠিক করলাম, এবাব ওঁর খোঁজে বেরোনো যাক। নৈশ অভিযানের তোড়জোড় করতে করতেই বেডলো কিন্তু ফিরে এলেন। শরীর বিধ্বস্ত। মন তথৈবচ। যে কারণে ফিরতে এত দেরি হলো—তা যখন বললেন—আমরা থ হয়ে গেলাম। এহেন অসাধারণ ঘটনা তো কখনো শুনিনি।

বেডলোর জবাবনিতেই শোনাই সেই কাহিনী :

মনে আছে নিশ্চয়, চার্লটসভিল থেকে রওনা হয়েছিলাম সকাল নটায়। সোজা চলে গেলাম পাহাড়ের দিকে। দশটা নাগাদ ঢুকলাম একটা গিরিসংকটে। এর আগে কখনো এদিকে আসিনি। নতুন জায়গা একেবারেই। তাই পাকদণ্ডী বেয়ে এগিয়ে চললাম খুব উৎসাহ নিয়ে। এঁকেবেঁকে যেদিকে যাচ্ছি, সেদিকেই দেখছি নতুন নতুন দৃশ্য। ধু ধু নির্জনতা আছে ঠিকই—এরকম পাণ্ডববর্জিত পাহাড়-অঞ্চলও এর আগে কখনো চোখে পড়েনি—তবুও তার মধ্যেই রয়েছে আশ্চর্য সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। 'গ্র্যাণ্ড' না বলা গেলেও অবর্ণনীয়। বিচিত্র স্বাদে ভরিয়ে তুলল আমার উপোসি মনটাকে। কোথাও কোনো শব্দ নেই—এ নৈঃশব্দ

যেন কুমারীর মতই অপাপবিদ্ধ। যে সব সবুজ ঘাসের চাপড়া আর ধূসর পাহাড় মাড়িয়ে এগিয়ে চললাম, ইতিপূর্বে সে সব জায়গায় মানুষের পায়ের চিহ্ন কখনো পড়েছে বলে তো মনে হল না। শুধু দুর্গম নয়—বাইরের জগৎ থেকে নিখুত ভাবে বিচ্ছিন্ন। বিপজ্জনক সঙ্কীর্ণ সেই গিরিসংকটে ঢোকবার পথ খুঁজে পাওয়া কঠিন—যদি না উপর্যুপরি কয়েকটা দুর্ঘটনা সহায় হয়। আমার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। তাই অসম্ভবও সম্ভব হয়েছিল। সেই কারণেই বলছি, প্রকৃতির সেই আলোয়ে আমিই প্রথম অ্যাডভেঞ্চার করে এলাম আজকে। একা আমি। দুর্গমের অভিযাত্রী হতে পারেনি কেউই এর আগে।

ইণ্ডিয়ান সামার-এর বৈশিষ্ট্য এই সময়কার ঘন আর অদ্ভুত কুয়াশা। ধোঁয়ার মতন তা ঢেকে রেখে দেয় সবকিছুই। সাদা, অস্পষ্ট অবগুণ্ঠনের তলায় প্রতিটি অদেখা বস্তুকে মনে হয় অতীব রহস্যময়। পাহাড়ের সর্বত্র দেখলাম সেই ঘন কুয়াশা।এই রহস্যময়তা আমার কিন্তু ভালই লাগছিল। যদিও বারো গজ দূরের পথও দেখতে পাচ্ছিলাম না, মাঝে মাঝে কুয়াশা অতিশয় নিবিড় হয়ে যাওয়ার ফলে। পথটা অতিরিক্ত মাত্রায় সর্পিল। কুয়াশার আবরণ ভেদ করে সূর্যদেবকেও দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাই কিছুক্ষণ পরেই বুঝলাম—পথ হারিয়েছি। কোনদিকে যাচ্ছি, সে হিসেব গুলিয়ে ফেলেছি। ইতিমধ্যে মবফিনও তার চিরাচরিত কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে—বাইরের জগৎটায় যেন গয়না পরাতে পরাতে যাচ্ছে—সব কিছুকেই মনোরম মোহনীয় করে তুলছে—আতীব্র করে তুলছে আমার আগ্রহের রোশনাইকে—যা দেখছি, তাই ভাল লাগছে—আরও খুঁটিয়ে দেখতে ইচ্ছে যাচ্ছে। এ যেন এক মহাকাব্য দর্শন করে চলছি—গাছের পাতার থিরথির শিহরণের মধ্যে, ঘাসের ফলকের বিচিত্র বর্ণ সমাহারের মধ্যে, ত্রিপত্র উদ্ভিদের তিন-পাতা-আকৃতি নকশার মধ্যে, মধুমক্ষিকার গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে, শিশিরকণার ঝিকিমিকির মধ্যে, বাতাসের ফিসফিসানির মধ্যে, জঙ্গলের ফিকে সুবাসের মধ্যে—যেন আমার বিশ্বকে দেখতে পাচ্ছি—মন-ময়ূর পেখম মেলে ধরে নেচে নেচে উঠতে চাইছে বিশ্বদর্শনের তালে তালে—অথচ গোটা চিন্তাধারাটাই অবিন্যস্ত, অসংলগ্ন—সাজানো গোছানো নয় মোটেই।

তন্ময় হয়ে এইভাবে হেঁটে গেছিলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একটু একটু করে আরও নিবিড়, আরও দুর্ভেদ্য, আরও রহস্যময় উঠেছিল আশপাশের কুহেলী—শেষে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে দু'হাত সামনে বাড়িয়ে অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে এগোতে হয়েছে আমাকে। আর তারপরেই বর্ণনাতীত এক অস্বস্তি পাকসাট দিয়ে ধরল আমার সত্তাকে—সে এক আশ্চর্য স্নায়বিক দ্বিধা। গা ছমছম করছে, ভয়-ভয় করছে, চামড়ায় শিহরণ জাগছে—থেকে-থেকে কেঁপে-কেঁপে উঠছি। সামনে পা ফেলতেও ভয় পাচ্ছি—পাছে গিরিখাদে তলিয়ে যাই। ঠিক এই সময়ে মনের কোণায় কোণায় লুকিয়ে থাকা অদ্ভুত কাহিনীগুলোও বেরিয়ে এল দুপদাপ করে—একে একে মনে পড়ে গেল কত কি-ই না শুনেছি কর্কশ-কালো পাহাড় সম্বন্ধে। এখানে নাকি নিবাস রচনা করেছে যারা, তারা

অতিশয় কদাকার মানুষ। প্রকৃতি তাদের নৃশংস। যুগ যুগ ধরে দুর্গম এই পর্বতমালার গুহায় আর খাঁজে থেকে তারা অতন্দ্র প্রহরীর মতই আগলে রেখেছে গোটা তল্লাটটাকে—এ পাহাড়শ্রেণীর গুপ্ত কথা তারা ছাড়া আর কেউ জানে না। হাজার খানেক আবছা আতঙ্ক ধীরে ধীরে হাজার কুটিল সাপের মত পেঁচিয়ে ধরল আমার ভয়ার্ত মনটাকে—কল্পনায় এনে ফেললাম আরও হাজারখানেক দুঃস্বপ্নকে—স্পষ্ট করে মনের আঙিনায় কোনোটাকেই দেখতে পাচ্ছি না বলে তাদের প্রত্যেকেই মনে হচ্ছে আরও ভয়াবহ, আরও লোমহর্ষক। ঠিক এই সময়ে চমকিত হলাম হাজার হাজার ঢাক পেটানোর শব্দে। গুর গুর গুম গুম শব্দ লহরী ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে, গিরিখাত, পর্বত ঢাল আর অরণ্যশীর্ষ মথিত করে। শুনে আরও ভয় পেলাম। নামহীন আতঙ্কে অবশ হয়ে এল সর্বাঙ্গ।

একই সঙ্গে আচ্ছন্ন হলাম অপরিসীম বিস্ময়বোধে। কুহেলীময় হাজার কিংবদন্তীর পীঠস্থান এই পর্বতমালা সম্বন্ধে শুনেছি অনেক গা-শিউরোনো কাহিনী—কিন্তু ঢাকের আওয়াজ শোনা যায় বিজন এই অঞ্চলে—এমন উপকথা তো কখনো শুনিনি। শিরোমণি দেবদূতের তূরী নিনাদ শ্রবণ করলেও তো এতটা অবাক হতাম না।

আর ঠিক সেই সময়ে আর একটা আওয়াজ আছড়ে পড়ল আমার কানের পর্দায়। আরও বেড়ে গেল বিমূঢ় অবস্থাটা। মস্ত রিং-এর মধ্যে অনেকগুলো চাবি নিয়ে ঝাঁকুনি দিলে যে রকম ঝন-ঝন-ঝনাৎ আওয়াজ হয়—ঠিক সেই রকম একটা আওয়াজ কুয়াশার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেল একেবারেই অভিনব এই শব্দ পরম্পরা শুনে। একদিকে দূরায়ত ঢাকের বাদ্যি, আর একদিকে আগুয়ান ঝনৎকার। তালগোল পাকিয়ে গেল মাথার মধ্যে। তারপরেই দেখলাম নতুন শব্দলহরীর কিস্তূত উৎসকে।

কুহেলী আবরণ ভেদ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে উদভ্রান্তের মত আমার দিকেই ধেয়ে আসছে একটা নরাকার বিস্ময়। নরলোকের জীব নিঃসন্দেহে। কিন্তু যে মানুষদের আমি চিনি, জানি, দেখি—তাদের সঙ্গে তো কোনো মিল নেই। অঙ্গে পোশাকের বালাই এতই কম যে তাকে অর্ধ-উলঙ্গই বলা চলে; তার মুখের গঠনও অন্য রকমের—যেন অমাবস্যার অন্ধকারে ঢাকা জমাট-তমিস্রা কেটে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ধড়ের ওপর; হাতে রয়েছে একটা মস্ত আংটা—তাতে পরানো অনেকগুলো ইস্পাতের চাকতি; এই আংটাটা সে এত জোরে নাড়তে নাড়তে হরিণবেগে দৌড়ে আসছে যে বিচিত্র ঝনৎকার আর ঠনৎকারের বিদঘুটে ঐকতান স্থাণু করে তুলেছে আমাকে। বায়ুবেগে লোকটা বেরিয়ে গেলে আমার পাশ দিয়ে। সেই সময়ে তার নাকের ফোঁস ফোঁস গরম নিঃশ্বাসও আমার গায়ে ঠেকলো। আরও স্পষ্ট দেখতে পেলাম তার মুখের চেহারা। নিদারুণ ভয়ে মুখ বিকৃত—দুই চোখ কোটর থেকে নির্গতপ্রায়। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল আমার পাশ দিয়ে বেগে উধাও হয়ে যাওয়ার সময়ে—দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়াশার মধ্যে। পরক্ষণেই হাঁপাতে হাঁপাতে ঠিক তার পেছনেই লকলকে জিভ দুলিয়ে

আবির্ভূত হল একটা বিকটাকার পশু। চোখে তার নরকের আগুন। ব্যাদিত মুখগহ্বরে ঝক ঝক করছে শোণিত লোলুপ দংষ্ট্রা। দেখেই চিনেছি তাকে। এ যে হায়না।

মূর্তিমান সেই রাক্ষসকে দেখেই নিশ্চয় ধাত ছেড়ে গেছিল আমার—সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিলাম বলেই নিমেষে কাটিয়ে উঠেছিলাম কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাটা। রুধির লালসায় রঞ্জিত ওই গনগনে চক্ষু যুগল দেখেই আমার আতঙ্কবোধ লাগামছাড়া হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। হলো ঠিক উল্টো।

সত্য নয়—স্বপ্ন দেখছি—নিশ্চিত হলাম এ বিষয়ে। নিশ্চতবোধটাকে দৃঢ়তর করবার মানসে জোর কদমে এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে। দু'হাতের চেটো দিয়ে বেশ করে দু'চোখ রগড়ে নিলাম। হাতে পায়ে কষে চিমটি কাটলাম। চোখে পড়ল একটা ঝিরঝিরে পাহাড়ি ঝরনা বয়ে যাচ্ছে সামনে দিয়ে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে শীতল জলে মুখ ধুলাম, ঘাড়ে আর কানে জল চাপড়ে দিলাম। ব্যামিশ্র যে শব্দনিচয় দুই রকমের অর্থ বহন করে সংশয়াকুল করে তুলছিল চিত্তকে—নিমেষে রেহাই পেলাম তার করাল খপ্পর থেকে। সিধে হয়ে যখন দাঁড়ালাম, তখন যেন নিজেকে মনে হলো আর এক মানুষ। একেবারে নতুন অন্য এক মানুষ। দৃঢ় পদক্ষেপে, বিকারবিহীন মনে অগ্রসর হলাম অজ্ঞাত পথ বেয়ে।

অনেকক্ষণ পরে খুবই ক্লান্ত আর অবসন্ন হয়েছিলাম বলে বসে পড়েছিলাম একটা গাছতলায়। পরিবেশটাও চেপে বসছিল মনের মধ্যে—ফলে হতোদ্যম মনে করছিলাম নিজেকে। একটু পরেই আবছা রোদের ম্লান আভায় গাছের ছায়া পড়ল মাটির ওপর। নির্নিমেষে চেয়েছিলাম সেদিকে। একটু পরেই খটকা লাগল মনে। গাছের ছায়ার এরকম আকৃতি তো কখনো দেখিনি। এরকম পাতাবাহার কখনো চোখে পড়েনি। বেশ কয়েক মিনিট ডালপাতার সেই বিচিত্র ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বিস্ময়বোধকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালাম ওপব দিকে। দেখলাম, বসে রয়েছি একটা তাল গাছের নিচে।

তাল গাছ! আমেরিকার পাহাড়ি জঙ্গলে তাল গাছ!

উঠে পড়েছিলাম ধড়মড়িয়ে। এ তো নিছক উত্তেজনা নয়—এর সঙ্গে আশঙ্কাও মিশেছে। ভয়ে গা ছমছম করছে, উত্তেজনায় গা কাঁপছে। কল্পনার আকাশের যে সব চিন্তা ভিড় করে আসছে, তারা আমাকে স্থির থাকতে দিল না। অথচ আমার শরীর আর মন রয়েছে আমারই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে উপলব্ধি করছি অভিনব আর অত্যাশ্চর্য এক অনুভূতিকে। আমার অণু পরমাণুতে অনুরণিত হয়ে চলেছে আর এক সত্তা।

আচমকা অসহ্য হয়ে উঠল তাপমাত্রা। গরমে যেন গা পুড়ে যাচ্ছে। বাতাসে যেন হলকা ছুটছে। সেই সঙ্গে নাকে ভেসে আসছে অদ্ভুত একটা সুগন্ধ। তপ্ত বাতাস মদির হয়ে রয়েছে সেই সুবাসে। কানে ভেসে আসছে একটানা ছলছলাৎ ধ্বনি—অস্পষ্ট গুঞ্জনগান শোনা যাচ্ছে প্রকৃতির কুঞ্জে—ঠিক যেন মৃদুমন্দ গতিবেগে বিরাট নদী বয়ে চলেছে কোথাও—স্রোতধারার ছলছল শব্দের সঙ্গে

মিলেমিশে রয়েছে অগণিত মনুষ্য কণ্ঠের সম্মিলিত গুন-গুন-গুন শব্দতরঙ্গ।
অপরিসীম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে কান পেতে এই আওয়াজ যখন শুনছি, ঠিক সেই সময়ে কোত্থেকে এক দামাল হাওয়া ধেয়ে এসে যেন ঝুঁটি ধরে উড়িয়ে নিয়ে গেল ত্যাঁদোড় কুয়াশার ঘোমটাকে। জাদুকরের জাদুদণ্ড ছাড়া এমন ম্যাজিক কখনো সম্ভব হয় না।
দেখলাম আমি বসে রয়েছি এক সুউচ্চ পর্বতের সানুদেশে। তাকিয়ে রয়েছি আরও নিচের বিশাল উপত্যকার পানে—সেখানে রাজার মত বয়ে চলেছে এক মস্ত নদী। নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছে এক পুব-মুখো শহর—ঠিক যেরকম পড়েছি 'আরব্য রজনী' কাহিনীতে। কিন্তু এ শহরের চরিত্র আরও সৃষ্টি ছাড়া—আরব্য রজনীর কোনো কাহিনীতেই কোনো শহরের এরকম বর্ণনা পাইনি।
শহরের অনেক উঁচুতে বসে রয়েছি বলে ঠিক যেন ম্যাপে আঁকা অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি শহরের প্রতিটি অঞ্চল। রাস্তার সংখ্যা যেন গুণে বের করা যাবে না। একটা রাস্তার ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে আর একটা রাস্তা চলে গেছে—তারপরেই আবার রাস্তা, আবার কাটাকুটি—এলোমেলোভাবে গজিয়েছে অলিগলি—যে যেদিকে পারে, সেই দিকে ছুটেছে অন্য গলি আর পথের ওপর দিয়ে। কোনো রাস্তাই কিন্তু রাস্তাপদবাচ্য নয়—রাজপথ তো নয়ই—সবই গলি; এঁকেবেঁকে চলেছে তো চলেছে। লোকজন থুকথুক করছে সব গলিতেই। উদ্দাম নকশায় গড়ে উঠেছে অজস্র বাড়ি এবং প্রতিটির পরিকাঠামো নজর কাড়ার মতো। বেধড়ক বৃদ্ধি যেন প্রত্যেকটা নিকেতনের সহজাত প্রবৃত্তি। লম্বা লম্বা বারান্দা ঝুলছে চারপাশেই, কোথাও ঘরকেই করা হয়েছে বারান্দা, কোথাও ঝকমক করছে মিনার আর বুরুজ, কোথাও ওপরতলার ঘর ঠিকরে বেরিয়ে খাড়া হয়ে রয়েছে নিচ থেকে গাঁথা থামের ওপর। সব কিছুর ওপর খোদাই আর নকশার অপূর্ব কারুকাজ। বাজার হাটের যেন সীমা সংখ্যা নেই। প্রতিটি গঞ্জেই ঢেলে সাজানো রয়েছে অজস্র রকমের দামি দামি জিনিস; সিল্ক, মসলিন, চোখ-ধাঁধানো বাসন, নয়ন জুড়োনো জড়োয়া, সূর্যসমান মণিরত্ন। এদের পাশেই জমায়েত হয়েছে কাতারে কাতারে সোনা বাঁধাই পালকি, উড়ছে রঙ ঝলমলে প্রতীকযুক্ত পতাকা, ডুলি আর শিবিকায় বসে ওড়নায় মুখ ঢেকে রয়েছে রাজরানির মত সুন্দরীরা, জমকালো ভাবে সাজ পরানো হাতির দল শুঁড় দোলাচ্ছে তাদেরই পাশে; কিম্ভূত গড়নে কাটাই বিদঘুটে দারুমূর্তি মাথায় করে নিয়ে চলেছে অনেকেই; ঢোল আর পেটাঘণ্টা নিয়ে বর্শা আর রুপোলি আসাসোঁটাধারী পাহারাদাররা গিজ গিজ করছে পুরো অঞ্চলটায়। এত মানুষ যেখানে পিলপিল করছে, সেখানে অট্টরোল তো জাগবেই—জট আর জটিলতায় চোখে ধাঁধাও লেগে যাচ্ছে—লক্ষ লক্ষ হলদে আর কালো মানুষ যেখানে কেউ পাগড়ি মাথায়, কেউ আলখাল্লা গায়ে লম্বা দাড়ি ঝুলিয়ে টহল দিচ্ছে—সেখানেই কিন্তু চরে বেড়াচ্ছে মাথায় মালা জড়ানো অগণন পবিত্র ষাঁড়। একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে মন্দিরে লাফিয়ে উঠছে আর নামছে অসংখ্য কুঞ্চিত

বিরাটদেহী হনুমান—তারস্বরে চেঁচিয়েই চলেছে অট্টরোলকে শতগুণে বাড়িয়ে দিয়ে; ঝুলছে মন্দিরের চুড়ো থেকে—লাফিয়ে যাচ্ছে পাশের গাছে। অলিগলি হাট-গঞ্জের এই গাদাগাদা মানুষ আর পশুর ভিড় শহর উপচে নেমে এসেছে নদীর তীরেও—সেখানে টানা লম্বা সোপানশ্রেণী ধাপেধাপে নেমে গেছে নদীবক্ষে—নদী নিজেও নিরালা নয়—অসংখ্য মালবাহী আর মানুষঠাসা জলপোত গাদাগাদি করে বহুদূর পর্যন্ত নদীর জল আটকে ভেসে থাকায় নদীপ্রবাহও বুঝি বিঘ্নিত হচ্ছে; সোপানশ্রেণীর নিচেই স্নানঘাট থেকে শুরু হয়েছে নৌকো আর জাহাজের মাতামাতি। শহর যেখানে থমকে গেছে, তারও ওদিকে গায়ে গা লাগিয়ে মাথা তুলে রয়েছে অজস্র তালগাছ আর নারকোল গাছ, রয়েছে আরও কিম্ভূত আকৃতি প্রাচীন বৃক্ষ, রয়েছে বহু-ঝুরি-নামানো থুত্থুরে বটগাছ; মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে ধানের ক্ষেত, চাষীদের খড়ের কুঁড়ে, পুকুর, দলছাড়া মন্দির, বেদেদের তাঁবু, নিঃসঙ্গ গ্রাম্যবালা—মাথায় ব্যালেন্স করে নিয়ে চলেছে জলের কলসি—চলেছে রাজার মত বহমান ওই নদীর দিকে।

ভাবছেন নিশ্চয়, স্বপ্ন দেখছিলাম। কিন্তু তা নয়। যা দেখেছি—যা শুনেছি—যা ভেবেছি—যা অনুভব করেছি—তার কোনোটার মধ্যেই নেই স্বপ্নের অবাস্তবতা। অথবা অলীকদর্শনের অসারতা। সবই বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ—খাপছাড়া কেউই নয়। সত্যিই জেগে আছি কিনা, তা পরখ করার জন্যে তক্ষুনি পর-পর কয়েকটা পরীক্ষা নিরীক্ষাও চালিয়েছিলাম—দেখেছিলাম জাগ্রতই রয়েছি বটে। ঘুমিয়ে যখন কেউ স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নের মধ্যেই সন্দেহ করে বসে নিশ্চয় দেখছে স্বপ্ন, সন্দেহ কখনোই অমূলক হয় না স্বপ্ন দেখা অবস্থাতেই—সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত মানুষটার ঘুম ছুটে যায় চোখের পাতা থেকে। জার্মান কবি নোভালিস এই কারণেই বলেছিলেন, 'স্বপ্নের মধ্যে যখনি স্বপ্ন দেখছি বলে মনে হয়, তখন কিন্তু ঘুম ছুটে যেতে বেশি দেরি নেই।' তাই বলছিলাম, ওই অবস্থায় যা কিছু দেখেছি, তা যদি তখন স্বপ্ন বলেই মনে হতো—তাহলে তা সত্যিই স্বপ্নই ছিল। কিন্তু স্বপ্ন দর্শন যখন ঘটছে, তখনই সেই দৃশ্যকে স্বপ্ন বলে সন্দেহ করে নানানভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও সেই দৃশ্য যখন স্বপ্নের মত মিলিয়ে যায়নি—তখন তাকে অন্য ধরনের প্রপঞ্চ, অন্য জাতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্য, পৃথক শ্রেণীর দৃশ্যমান বস্তু ছাড়া আর কিছুই আমি বলব না।"

এই পর্যন্ত শুনে বললেন ডক্টর টেম্পলটন—"আপনি ভুল দেখেছেন বলে মনে করছি না। তারপর? উঠে দাঁড়ালেন তো? শহরে নেমে গেলেন?"

বিষম বিস্ময়ে ডাক্তারের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন বেডলো—"ঠিক বলেছেন। তাল গাছের ছায়া ছেড়ে বেরিয়ে এসে নেমে গেলাম শহরের বুকে। পথেঘাটে তখন প্রপাতের মত মানুষের স্রোত বয়ে চলেছে, প্রতিটি রাস্তা আর অলিগলি দিয়ে পিলপিল করে মানুষ গুঁতোগুঁতি করতে করতে চলেছে একই দিকে—নিদারুণ উত্তেজনায় টগবগ করছে প্রত্যেকেই। আচমকা আমি এদেরই একজন হয়ে গেলাম। যুক্তি বুদ্ধির অগ্রাহ্য, অকল্পনীয় এক তাড়না

নিমেষের মধ্যে আমার সমস্ত চাওয়া-পাওয়াকে মিলিয়ে মিশিয়ে দিল জনতার চাওয়া-পাওয়ার স্বার্থে। আমার স্বার্থ তখন জনতার স্বার্থ—জনতার স্বার্থ আমার স্বার্থ। আমার ভেতর পর্যন্ত মুচড়ে উঠল, কি ঘটছে তা জানবার জন্যে। সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে উপলব্ধি করলাম, মস্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকায় এখুনি অবতীর্ণ হতে হবে আমাকে—কিন্তু আমি জানি না সে ভূমিকাটা কি ধরনের—জানি না কি কাজে ব্রতী হতে হবে এখুনি। জনতা তখন আমাকে ছেঁকে ধরেছে বলেই তাদের মনের তাপ আর উষ্মা, ক্রোধ আর ভাবাবেগ সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে আমার মনের মধ্যেও—অতলস্পর্শী এক বৈরিতা একটু একটু করে তাতিয়ে তুলছে আমাকে। ঝটিতি এদের সান্নিধ্য ত্যাগ করে সবেগে অলিগলির ঘুর পথ দিয়ে পৌঁছে গেলাম শহরের ভেতরে। এখানে চলছে তুমুল হট্টগোল—অস্থির পঞ্চানন প্রত্যেকেই—দিশেহারা নয় এমন নেই একজনও। আধা-ভারতীয় আধা-ইউরোপীয় পোশাক পরা একদল লোক ছুটে চলেছে গলিঘুঁজির গোলকধাঁধা পেরিয়ে। এদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আংশিক ব্রিটিশ ইউনিফর্ম পরা এক ভদ্রলোক। কাতারে কাতারে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ছে ছোট্ট এই দলটার ওপর সবদিক দিয়ে—কিন্তু প্রবল বিক্রমে লড়ে যাচ্ছে এই ক'জন মানুষ।

আমি ভিড়ে গেলাম ছোট্ট, দুর্বল দলটায়। নিহত এক অফিসারের অস্ত্র তুলে নিয়ে উন্মাদের মত লড়ে গেলাম শত্রুদের সঙ্গে—যদিও জানি না কেন লড়ছি। পাছে হেরে যাই, এই ভয়ে আমি তখন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছি। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ-এর মত আগুয়ান শত্রুদের সঙ্গে পেরে উঠলাম না—প্রাণ বাঁচানোর জন্যে সবাই মিলে পালিয়ে গেলাম সামিয়ানা টাঙানো একটা মণ্ডপে—গরুর গাড়ি, পিপে, বাক্সে কাঠ জড়ো করে বাধা বানিয়ে তখনকার মত আত্মরক্ষা করতে পারলাম। ব্যারিকেডের ওপর উঠে কাঠের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম উন্মত্ত জনতা পিলপিল করে ঘিরে ধরেছে ভারি সুন্দর একটা প্রাসাদ—নদীর তীরেই রয়েছে ঝলমলে সেই প্রাসাদ। জনতা প্রাসাদের ভেতরে ঢোকবার জন্যে ভাঙচোর আরম্ভ করে দিয়েছে। অচিরে, প্রাসাদের ওপর-জানলা থেকে নদীর দিকে ঝুলে পড়ল পরিচারকদের পাগড়ি দিয়ে তৈরি একটা দড়ি—দড়ি বেয়ে সরসর করে মেয়েলি-প্রকৃতির একজন মানুষ নেমে গেল নিচের একটা নৌকোর ওপর, নদী তাকে নিয়ে চলে গেল নদীর অপর পারে।

আর ঠিক তখনি নতুন এক অভিপ্রায় আশ্রয় করল আমার তনু-মন-আত্মাকে। বিপুল তেজে বেশ কয়েকটা কথা বলে গেলাম আমার সঙ্গীদের—কথার জাদু দিয়ে বশ করে ওদেরই জনাকয়েককে আমার ফন্দীমত চলতে রাজী করালাম—পরক্ষণেই ক্ষিপ্তের মত ধেয়ে বেরিয়ে গেলাম সামিয়ানা ছাওয়া মণ্ডপ থেকে। প্রাসাদের দিকের জনতার দিকে তেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরাই ঘিরে ধরল আমাদের। কিন্তু পেছিয়ে গেল আমাদের বেপরোয়া আক্রমণে। ফিরে এসে ঘিরে ধরল আবার। পিছু হটে গেল তারপরেই। এই করতে করতেই আমরা গলিঘুঁজির গোলকধাঁধার মধ্যে ঠিকরে যাওয়ায় মাথা গোলমাল করে

ফেলেছিলাম। অজস্র বাড়ির গাদাগাদি ভিড়ে আর সংখ্যাহীন ঝুলন্ত বারান্দার নিচে সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখতে না পেয়ে দিশেহারা হয়ে গেলাম। মারমুখি জনতা আমাদের ঘিরে ফেলল সবদিক থেকেই—ঝাঁকে ঝাঁকে ছোরার মতই মারাত্মক দর্শন এই তীর শূন্য পথে ছুটে এল কুটিল সর্পিল ভঙ্গিমায়—অবিকল কালকেউটের মতন। এদের তৈরি করা হয়েছে সাপের কিলবিলে শরীরের অনুকরণে—যেমন লম্বা, তেমনি মিশমিশে কালো—ফলায় মাখানো বিষ। একটা তীর ঢুকে গেল আমার ডান রগে। পাকসাট মেরে আছড়ে পড়লাম তক্ষুণি। ভয়াবহ মুমূর্ষায় আচ্ছন্ন হলাম সঙ্গে সঙ্গে। ছটফটিয়ে উঠে খাবি খেতে খেতে মারা গেলাম নিমেষ মধ্যে।"

হেসে বললাম আমি—"গোটা অ্যাডভেঞ্চারটা যে স্রেফ স্বপ্ন নয়—এখনো কি তাই বলবেন? বলবেন কি এখনও আপনি মরেই রয়েছেন?"

ভেবেছিলাম তেড়েমেড়ে জবাব দেবেন বেডলো—কিন্তু উনি যেন কেমন হয়ে গেলেন। থর থর করে কেঁপে উঠলেন, মড়ার মত বিবর্ণ হয়ে গেল মুখ, টুঁ শব্দ বেরোলো না মুখ দিয়ে।

চাইলাম টেম্পলটনের দিকে। শিরদাঁড়া শক্ত করে বসে আছেন। দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগছে। কোটর থেকে চক্ষুগোলক কামানের গোলার মতন ঠিকরে আসতে চাইছে। অনেকক্ষণ পরে অতিকষ্টে ভাঙা গলায় বললেন বেডলোকে—"তারপর?"

বেডলো বললেন—"মিনিট কয়েক আমার চেতনা ছেয়ে রইল মৃত্যুর উপলব্ধিতে। অন্ধকার। নেই কোনো অস্তিত্ব। এছাড়া ওই কটা মিনিটে আর কিছুই অনুভব করতে পারিনি। অনেকক্ষণ পরে আচমকা আমার আত্মার মধ্যে দিয়ে একটা ভয়ানক ধাক্কা বয়ে গেল—যেন একটা তড়িৎপ্রবাহ। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে পেলাম আলো আর নড়াচড়ার অনুভূতি। আবার বলছি—আলোকে শুধু অনুভব করলাম—দেখতে পেলাম না। মুহূর্তের মধ্যে মনে হলো জমি ছেড়ে উঠে যাচ্ছি শূন্যে। আমার কিন্তু এমন কোনো অস্তিত্ব নেই যাকে চোখে দেখা যায়, যাকে কানে শোনা যায়, বা যাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে টের পাওয়া যায়। ভিড় কমে গেছে। অট্টরোল থেমে গেছে। অনেক শান্ত হয়েছে শহর। নিচে পড়ে রয়েছে আমার কলেবর—রগে ঢুকে রয়েছে তীর—গোটা মুণ্ডটা ভীষণভাবে ফুলে উঠে বিকৃত হয়ে গেছে। এ সবই কিন্তু আমি শুধু অনুভব করলাম—দেখতে পেলাম না। কোনো কিছুতে আসক্তিও অনুভব করলাম না। আমার নশ্বর দেহটাও আমার কাছে নিরর্থক পঞ্চভূতের সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই মনে হল না। ইচ্ছে-অনিচ্ছের ঊর্ধ্বে ছিলাম—সেই অবস্থাতেই গতিশীল হয়েছি বুঝতে পারলাম—যে সব অলিগলি ঘুরে শহরে প্রবেশ করেছি—সেই সবের মধ্যে দিয়ে শূন্য পথে ভেসে বেরিয়ে এলাম। গিরিসংকটের যেখানে হায়নার মুখোমুখি হয়েছিলাম, সেখানে আসতেই আবার যেন গ্যালভানিক ব্যাটারির শক্ খেলাম। নিমেষে ফিরে এল ভারবোধ, ইচ্ছে-অনিচ্ছে বোধ, বাস্তববোধ। যা ছিলাম, হয়ে

গেলাম তাই। দ্রুত পা চালিয়ে ফিরে এলাম বটে—কিন্তু যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে এলাম, তার একবিন্দুও স্বপ্ন বলে মনে হয়নি আসবার পথে—এখনও হচ্ছে না।"

"নয় তো বটেই," বললেন টেম্পলটন, কণ্ঠস্বর বিলক্ষণ ভাবগম্ভীর—"অথচ স্বপ্ন ছাড়া এর অন্য কোনো ব্যাখ্যা বের করাও তো কঠিন। একটা কথাই শুধু বলব—মানুষের আত্মার স্বরূপ আজও অনাবিষ্কৃত—যেদিন তা পুরোপুরি জানা যাবে—সেদিন জানব সবচেয়ে বড় আবিষ্কার ঘটে গেল এই পৃথিবীতে। আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকা যাক এই ব্যাখ্যা নিয়েই। উপ-ব্যাখ্যাও বলতে পারেন। ব্যাখ্যা হিসেবে আরও ক'টি কথা নিবেদন করতে পারি। এই দেখুন একটা ছবি। জলরঙে আঁকা। আগেই দেখাবো ভেবেছিলাম। ভয়ে দেখাতে পারিনি।"

দেখলাম ছবি। অসাধারণ কিছু নেই। অথচ ছবি দেখেই বেডলো যেন মূর্ছা যাওয়ার মত নেতিয়ে পড়লেন। খুবই ক্ষুদে প্রতিকৃতি ছবির মানুষটার সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে বেডলো-র আকৃতির। আমার অন্তত তাই মনে হয়েছিল।

টেম্পলটন বললেন—"ছবির তারিখটা যদিও দেখা মুস্কিল, তাহলেও, ঠাহর করলে দেখতে পাবেন কোণের দিকে লেখা রয়েছে—১৭৮০। ছবি আঁকা হয়েছিল ওই সালে। এ ছবি আমারই এক প্রিয় বন্ধুর। ওয়ারেন হেস্টিংস যখন ভারত শাসন করছেন, তখন কলকাতায় এর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। সে সময়ে আমার বয়স ছিল কুড়ি। মিস্টার বেডলো, সারাটোগা-য় প্রথম যেদিন আপনাকে দেখেছিলাম—সেদিনই ছবির সঙ্গে আপনার আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করে আপনার কাছে ঘেঁষেছিলাম—আপনার বারোমাসের বৈদ্য হয়েছিলাম। কারণ ছিল দুটা : এক, মৃত ব্যক্তিকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারিনি গত পঞ্চাশ বছরে; দুই, আপনার সম্বন্ধে কৌতূহল—সে কৌতূহলে কিছুটা অস্বস্তি থাকলেও একেবারেই ছিল না আতঙ্ক।

"পাহাড়ের অভিযান প্রসঙ্গে যা-যা বলে গেলেন, তার মধ্যেই রয়েছে ভারতবর্ষের শহর বেনারসের নিখুঁত আর চুলচেরা বর্ণনা। গঙ্গাপাড়ের কাশীধাম, দেবাদিদেব শিবের পীঠস্থান—শিবের বাহন ষাঁড়দের বিচরণ ক্ষেত্র। দাঙ্গা, লড়াই, গণহত্যা—সবই ঘটেছিল চৈৎ সিং-এর বিদ্রোহের ফলে—১৭৮০ সালে—প্রাণ যেতে বসেছিল হেস্টিংস-এর। পাগড়ি দিয়ে তৈরি দড়ি বেয়ে যে লোকটা পালিয়ে ছিল প্রাসাদ ছেড়ে—সে চৈৎ সিং নিজে। শামিয়ানা-মণ্ডপে যারা ঠাঁই নিয়েছিল, তারা সিপাই আর ব্রিটিশ অফিসার—নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হেস্টিংস নিজে। সে দলে ছিলাম আমিও। একজন বাঙালির বিষ মাখানো তীর বিঁধেছিল যে অফিসারের রগে—তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেও পারিনি। আমার প্রাণের বন্ধু সেই অফিসারটির নাম ওলডেব। এই পাণ্ডুলিপিটা পড়লেই সব বুঝবেন," (বলে, পকেট থেকে নোটবই বের করলেন ডাক্তার—দেখালেন সদ্য লেখা কয়েকটা পাতা)— "পাহাড়ের অভিযানে বেরিয়ে আপনার অ্যাডভেঞ্চার আমি বাড়ি বসে আগে থেকেই লিখে রেখেছিলাম।"

এক সপ্তাহ পরে চার্লটসভিলের একটা দৈনিক কাগজে বেরোলো নিচের এই কটা লাইন :

"দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, মিস্টার অগাস্টাস বেডলো ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এই শহরের মানুষের কাছে ইনি পরমপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তাঁর অনেক গুণ আর অমায়িক আচরণের জন্যে।

"বছর কয়েক ধরেই স্নায়ুরোগে ভুগছিলেন মিস্টার বেডলো। প্রাণ সংশয়ও ঘটেছিল বেশ কয়েকবার। বলা যায়, মারাও গেলেন এই ব্যাধিতে। মূল কারণটা কিন্তু অসাধারণ। দিন কয়েক আগে র‍্যাগড্ মাউন্টেনে বেড়িয়ে এসে ইস্তক সামান্য ঠাণ্ডা লেগেছিল। জ্বরের প্রকোপে মাথায় রক্ত উঠে গেছিল। রক্তচাপ কমানোর জন্যে রগে জোঁক বসান ডক্টর টেম্পলটন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা যান মিস্টার বেডলো। তখন দেখা গেল, যে-বয়েম-এর মধ্যে জোঁক ধরে আনা হয়েছিল, তার মধ্যেই ছিল একটা বিষধর কিলবিলে Sanguses—যাকে দেখতে অবিকল জোঁকের মতই। রক্তচোষা এই বিষ-পোকাই ডান রগের সরু ধমনীতে চেপে বসে মৃত্যু ঘটিয়েছে মিস্টার বেডলো-র।

"বিশেষ দ্রষ্টব্য। ডাক্তারি জোঁক আর বিষধর Sanguses-এর তফাৎটা এইঃ Sanguses বেশি কালো, নড়াচড়া অবিকল সাপের মতনই সর্পিল ভঙ্গিমায়।"

পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে আশ্চর্য এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ আমার চোখে পড়েছিল বেডলোর নামের বানানে।

বলেছিলাম—"বানান ভুল ছাপলেন? Bedloe-র বদলে Bedlo? কেউ কি বলেছিল এই বানান লিখতে?"

"ছাপার ভুল।" বলেছিলেন সম্পাদক—"বললেই বা কে শুনছে? Bedloe বানান কেনা জানে? এ নামের শেষে e থাকে—সবাই জানি।"

"আশ্চর্য ভুল তো! উপন্যাসেও এরকম অদ্ভুত ঘটনা দেখা যায় না।"

"কেন?"

"Bedlo নামটা উল্টো দিক থেকে পড়ুন। কি "দাঁড়াচ্ছে? Oldeb! তবু বলবেন ছাপার ভুল? আশ্চর্য!"

মেজেনগার্সটিন

[মেজেনগার্সটিন]

বিভীষিকা আর ভবিতব্যতা যুগে যুগে দেখিয়ে গেছে তাদের নিষ্ঠুর নৃত্য। তাই জানতে চাইবেন না কবে কখন ঘটেছিল এই কাহিনী। শুধু বলব, হাঙ্গেরির কোনো এক জায়গার মানুষ পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করে—যুগ যুগ ধরে তাদের বদ্ধ বিশ্বাস—দেহান্তর গ্রহণ অসম্ভব কিছুই নয়। এই মতবাদের অসত্য বা সম্ভাবনা নিয়ে আমি কিন্তু একটা কথাও বলব না। তবে হ্যাঁ, পুরো ব্যাপারটা যে বিলকুল অবিশ্বাস্য, তাতে নেই তিলমাত্র সন্দেহ।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিরোধ জেগেছিল মেজেনগার্সটিন আর বার্লিফিজিন পরিবারের মধ্যে। এ রকম মারাত্মক পারিবারিক দ্বন্দ্ব কোথাও দেখা যায় না। দুটো ফ্যামিলিই বিলক্ষণ স্বনামধন্য; অথচ শতাব্দীসঞ্চিত ঘৃণা আর বিদ্বেষের বিষ বিষিয়ে দিত প্রতিটি বংশধরকে। নিষ্পাপ শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে রক্তের মধ্যে উগ্র বিদ্বেষের বীজ নিয়ে। আত্যন্তিক ঘৃণার সূত্রপাত একটা প্রাচীন ভবিষ্যৎবাণী থেকে : বার্লিফিজিন-এর অমরত্বকে সেদিনই টেক্কা মারবে মেজেনগার্সটিন-এর মরণশীলতা, যেদিন অশ্বারূঢ় থাকবে ঘোড়সওয়ার, পতন ঘটাবে একটা আকাশচুম্বী নামের।

কথাগুলোর কোনো মানেই হয় না। কিন্তু এর চাইতেও ছোট্ট উৎস থেকে অনেক বড় পরিণাম তো ঘটেছে অতীতে। তাছাড়া, দুটো ভূসম্পত্তিই ছিল

লাগোয়া। প্রজা-প্রশাসন সম্পর্কিত ব্যাপারে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তীব্র রেষারেষি আর উগ্র তিক্ততা বিষাক্ত করেছে দুই প্রতিবেশীকে। এটাও তো সত্যি যে, কদাচিৎ বন্ধুত্ব দেখা যায় খুব কাছের প্রতিবেশীদের মধ্যে। বার্লিফিজিন কেল্লাবাড়ির বাসিন্দারা সুউচ্চ বুরুজ থেকে সোজা তাকিয়ে থাকত মেজেনগার্সটিন প্রাসাদের প্রতিটি জানালার দিকে। মেজেনগার্সটিন-দের মত বনেদী আর বড়লোক ছিল না বার্লিফিজিন-রা; ধনসম্পদ আর প্রাচীনত্ব—এই দুটোই মেজেনগার্সটিন-দের বেশি থাকায় ঈর্ষায় জ্বলে যেত বার্লিফিজিন-রা। সামন্ততান্ত্রিক জাঁকজমকের বাড়াবাড়ি ঘটিয়ে বার্লিফিজিনরা প্রশমিত করতে চাইত ঈর্ষার এই জ্বলুনিকে। প্রাচীন ভবিষ্যৎবাণী ইন্ধন জুগিয়ে গেছিল উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পরশ্রীকাতরতাকে। ধনগর্বে স্ফীত আর প্রাচীনত্ববোধে মত্ত মেজেনগার্সটিন-রা কিন্তু বিশ্বাস করত ভবিষ্যৎবাণী একদিন অক্ষরে অক্ষরে ফলবে।সব দিক দিয়ে দুর্বল আর স্বল্প প্রতিপত্তির অধিকারী বার্লিফিজিনদের রুধিরে আতীব্র বৈরিভাব ধিকিধিকি জ্বলে গেছে পুরুষানুক্রমে—শুধু এই প্রাচীন ভবিষ্যৎবাণীর প্রভাবের ফলেই।

এ কাহিনী যখন শুরু হচ্ছে, তখন উইলহেম কাউন্ট বার্লিফিজিন-এর বয়স হয়েছিল বিলক্ষণ; বার্ধক্য তাঁকে অশক্তও করে তুলেছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবারের প্রতি নিঃসীম ব্যক্তিগত ঘৃণাবোধ ছাড়া আর কোনো অসাধারণ গুণ তাঁর মধ্যে ছিল না। নিজেও অসাধারণ হতে পেরেছিলেন শুধু এই বিদ্বেষ-বহ্নির অহর্নিশ বিকাশ ঘটিয়ে। ভয়ানকভাবে অশ্ব-প্রেমিক ছিলেন; ঘোড়ায় চড়ে মৃগয়া করা ছিল প্রচণ্ডতম নেশা। শরীর ছিল দুর্বল, মন ছিল অক্ষম, বয়স হয়েছিল অনেক—তা সত্ত্বেও এর কোনোটাই তাঁর দৈনন্দিন মৃগয়ার অন্তরায় হয়ে উঠতে পারেনি।

পক্ষান্তরে, ফ্রেডরিক ব্যারন মেজেনগার্সটিন তখন প্রাপ্তবয়স্কই নয়। যুবাবয়সেই দেহ রেখেছিলেন তার পিতৃদেব মন্ত্রী জি—। মা মেরি-ও বাবার কাছে চলে গেছিলেন ঠিক তার পরেই। ফ্রেডরিকের বয়স তখন মোটে আঠারো। শহরের পরিবেশে আঠারোটা বছর দীর্ঘ সময় নয় মোটেই; কিন্তু অরণ্য-পর্বত-প্রান্তরময় ধু-ধু-প্রকৃতির অঙ্কে এই সময়ের মধ্যেই দোলক ঘনঘন কাঁপে, গভীরতর অর্থ বহন করে।

বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিল কিশোর ব্যারন। ব্যবস্থাপত্র ছিল সেই রকমই। এর আগে হাঙ্গেরীর কোনো সম্ভ্রান্ত পুরুষ এভাবে এত ঐশ্বর্য পায়নি। কেল্লাবাড়ি ছিল অনেক—গুনে শেষ করা যেত না। সবচেয়ে জমকালো ছিল 'মেজেনগার্সটিন প্রাসাদ'। জায়গাজমির সীমানা-রেখা ঠিক কোথায়, তা কোনো দিনই নির্দিষ্ট করা যায় নি। পঞ্চাশ মাইল বেড় ছিল শুধু খাস উদ্যানের।

ভূস্বামীর বয়স যখন এত কম, চরিত্রের চেহারা যখন কারোরই অজানা নয়, ধনসম্পত্তি যখন অপরিমেয়, তার আচরণ যে কোন পথে বয়ে যাবে—সে সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে হয়নি কাউকেই। মাত্র তিন দিনেই নতুন ওয়ারিশ নিষ্ঠুরতার

দিক দিয়ে ম্লান করে দিল কুখ্যাত রাজা হেরোড-কে। ইহুদিদের বংশবৃদ্ধি রোধ করার জন্যে পিশাচসম এই নৃপতি হুকুম দিয়েছিল বেথেলহেম-এর সমস্ত শিশুপুত্রদের যেন জবাই করে ফেলা হয়। কশাইগিরির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেল 'নয়া হেরোড' কর্তৃত্ব পাওয়ার প্রথম তিনটি দিবসেই। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল স্তাবকরা। প্রজারা ভয়ে কাঠ হয়ে গেছিল নির্লজ্জ লাম্পট্য, বেপরোয়া বিশ্বাসঘাতকতা, অনশ্রুতপূর্ব নিমর্মতা প্রত্যক্ষ করে; মর্মে মর্মে বুঝেছিল বহুযুগ পেরিয়ে এসে নতুন করে জন্ম নিয়েছে রোম-সম্রাট ক্যালিগুলা; অসুখে ভুগে উন্মাদ হয়ে গিয়ে বর্বরের মত যে শাসন করেছিল প্রজাদের; সুশ্রী কিশোর এই নতুন ক্যালিগুলার পা জড়িয়ে ধরে বশ্যতা স্বীকার করলেও যে তার উৎকট পৈশাচিকতার নিরশন ঘটবে না—হাড়ে হাড়ে তা উপলব্ধি করেছিল ভয়ার্ত প্রজাগণ। কেউই আর নিজেকে নিরাপদ মনে করেনি পর-পর তিন দিনের নারকীয় ক্রিয়াকলাপের পর। চতুর্থ দিবসের রাতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল বার্লিফিজিন কেল্লাবাড়ির আস্তাবল। নিমেষে বুঝে নিয়েছিল প্রত্যেকেই, অকস্মাৎ এই অগ্নিকাণ্ডের মূলেও রয়েছে কদাকার মনের অধিকারী কিশোর ব্যারন।

বাইরে যখন তমুল হইচই চলছে, কিশোর সম্ভ্রান্তপুরুষটি তখন যেন ধ্যানস্থ হয়ে বসে রয়েছে মেজেনগার্সটিন প্রাসাদের একদম ওপর মহলে একটা বিরাট নির্জন কক্ষে। দেওয়ালে বিষণ্ণভাবে ঝুলছে মহার্ঘ কিন্তু বিরঙ পর্দা; পূর্বপুরুষদের কীর্তিকাহিনী বিধৃত রয়েছে পর্দায় পর্দায় আঁকা অজস্র ছায়াচ্ছন্ন ছবির মধ্যে।

আস্তাবলের হট্টগোল যখন বেড়েই চলেছে, কিশোর ব্যারন বোধহয় তখন বিভোর হয়ে ছিল নতুন আর এক অত্যাচারের পরিকল্পনায়। আচমকা চোখ আটকে গেল একটা প্রকাণ্ড আর অস্বাভাবিক রঙে রঙিন ঘোড়ার দিকে। মস্ত পর্দায় আঁকা হয়েছে মস্ত ঘোড়াকে। একদা এ পর্দার মালিক ছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবারের এক আদি পুরুষ—ধর্মে সারাসেন; মধ্যযুগের খ্রিস্টানরা মুসলমান শত্রুদের সারাসেন নামেই ডাকত।

নিস্পন্দ স্ট্যাচুর মতই বিশাল এই ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে সবার আগে—পেছনে তার সওয়ার লুটিয়ে রয়েছে ঘাসজমিতে—বুকে বিঁধে রয়েছে এক মেজেনগার্সটিনের ছুরিকা।

পৈশাচিক হাসি ক্রূরতম করে তোলে কিশোর ব্যারনের মুখমণ্ডলকে। কিছু না ভেবেই আচমকা তাকিয়েছিল পর্দার দিকে। এখন আর চোখ সরাতে পারল না কিছুতেই। যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছে। যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে। চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে। ঘোর কেটে গেল হট্টগোলের দামামা মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায়। চোখ ঘুরে গেল জানলার দিকে—যেখানে এসে পড়েছে প্রজ্বলন্ত আস্তাবলের আগুনের লাল আভা।

ক্ষণেকের জন্যে চাহনিকে সরিয়ে নিতে পেরেছিল লোহিতাভ বাতায়ন; পরমুহূর্তেই যেন চুম্বকের অদৃশ্য আকর্ষণে চাহনি আবার ঘুরে গেছিল পর্দার বুকে।

একি ! একটু আগেই বিশাল ঘোড়া যেন পরম সমবেদনায় তাকিয়েছিল ভূলুণ্ঠিত গতায়ু মনিবের দিকে। কিন্তু এখন ঘাড় সোজা করে সটান তাকিয়ে আছে ব্যারনের দিকে। এখন তার চোখ দেখা যাচ্ছে; সে চোখে ভাসছে যেন মানুষের চাহনি; রক্তরাঙা গনগনে চোখে চেয়ে আছে ব্যারনের দিকে; ঠোঁট ঝুলে পড়েছে কঠোর ক্রোধ—তাই প্রকট হয়েছে সমাধি-সাদা ঝকঝকে নিষ্ঠুর দাঁতগুলো।

শিউরে উঠে দরজার দিকে ছিটকে গেছিল কিশোর ব্যারন। চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছিল আগুনের আভা তার ছায়াপাত ঘটিয়েছে থরথর কম্পমান পর্দার বুকে। ছায়াটা আশ্চর্যভাবে খাপে খাপ খেয়ে গেছে সারাসেন বার্লিফিজিন-এর অনুশোচনাহীন জয়দৃপ্ত হত্যাকারীর আকৃতির সঙ্গে।

খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে গিয়ে মনমেজাজ ঠিক করে নিতে চেয়েছিল কুপথের পথিক কিশোর ব্যারন। মূল তোরণে দেখা হয়ে গেল তিন অশ্বপালের সঙ্গে। ঘেমে নেয়ে গেছে তিনজনেই। প্রাণ যেতে বসেছিল একটিমাত্র ঘোড়াকে টিট করতে গিয়ে। আগুন রঙের বিরাট ঘোড়াটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসেও সামলাতে পারছে না তিন পুরুষ।

শিহরণের ঢেউ বয়ে গেছিল কিশোর ব্যারনের শিরদাঁড়া দিয়ে। একটু আগেই অবিকল এই ঘোড়াটাকেই তো দেখে এল পর্দার বুকে। নাকি, আঁকা ঘোড়ার আদল সর্বাঙ্গে এঁকে নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে দামাল এই অশ্ব!

ভাঙা গলায় শুধিয়েছিল ব্যারন—"কার ঘোড়া? কোথায় পেলে?"

"আপনার ঘোড়া, জনাব," জবাব দিয়েছিল একজন অশ্বপাল—"এ ঘোড়া এখন আপনারই সম্পত্তি। রাগে পাগল হয়ে ফুঁসতে ফুঁসতে ছিটকে এসেছিল বার্লিফিজিনের জ্বলন্ত আস্তাবল থেকে। বুড়ো কাউন্টের বিদেশী ঘোড়া নিশ্চয়। এই ভেবে ফিরিয়ে নিয়ে গেছিলাম আস্তাবলে। কিন্তু সহিসরা বললে, এ ঘোড়া তাদের নয়। খুবই আশ্চর্য কথা! কেন না, আগুন টপকে বেরিয়ে আসার সমস্ত চিহ্নই দেখা যাচ্ছে এর গায়ে।"

দ্বিতীয় অশ্বপাল বললে—"কপাল দেখুন। শিক পুড়িয়ে ছেঁকা দিয়ে লেখা রয়েছে উইলিয়াম ফন বার্লিফিজিন নামের প্রথম তিনটে অক্ষর। অথচ কেল্লাবাড়ির প্রত্যেকেই বলছে, এ ঘোড়া নাকি কেল্লাবাড়ির আস্তাবলেই ছিল না।"

যেন নিজের মনেই বলে গেল কিশোর ব্যারন—"খুবই আশ্চর্য! কেউই যখন দাবি করছে না—তখন ঘোড়া থাকুক আমার কাছে। ওর তেজ আমি ভাঙব। বার্লিফিজিন আস্তবলের শয়তান যদি হয় পাহাড়ের মত বিরাট এই ঘোড়া—মেজেনগার্সটিনের ফ্রেডরিক তার দর্পচূর্ণ করবে—ঘাড় নিচু করাবে—বশ মানিয়ে ছাড়বে।"

"জনাব, এ ঘোড়া যদি কাউন্ট বার্লিফিজিনের হতো, তাহলে কখনোই আপনার সামনে নিয়ে আসতাম না।"

"তাতো বটেই," বলেছিল কিশোর ব্যারন।

আর ঠিক তখনি প্রাসাদের ভেতর থেকে দৌড়ে এসেছিল একজন ভৃত্য। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ফিসফিস করে ব্যারনকে জানিয়েছিল একটা আশ্চর্য সংবাদ। এইমাত্র ওপর তলার ঘরের একটা পর্দার খানিকটা উধাও হয়ে গেছে।

একটু আগে সেই ঘরেই তো ছিল ব্যারন। পর্দার ঘোড়ার ঘাড় ফিরোনো দেখেই পালিয়ে এসেছিল নিচে।

দাঁতে দাঁত পিষে শুধু বলেছিল ভৃত্যকে—"যাও, তালা লাগাও ও ঘরে—চাবি থাকুক আমার কাছে।"

প্রাসাদ থেকে মেজেনগার্সটিন আস্তাবলের দিকে যাওয়ার সময়ে দীর্ঘ ঝাউবীথির আগুন রাঙা অন্ধকারে দেখা হয়ে গেল একজন অনুগত প্রজার সঙ্গে। উত্তেজিত গলায় সে নিবেদন করে গেল পুলকিত হওয়ার মত একটা সংবাদ।

বৃদ্ধ কাউন্ট আস্তাবলের ঘোড়াদের বাঁচাতে গিয়ে নিজেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছেন। দেহ পর্যন্ত নিপাত্তা!

শুনে মুখ সাদা হয়ে গেল কিশোর ব্যারনের।

সেদিন থেকে যেন পাল্টে গেল কিশোর ব্যারন ফ্রেডরিক ফন মেজেনগার্সটিন। আগের মত আচরণ তো রইল না—পাঁচজনের সাথে মেলামেশাও ছেড়ে দিল। হিসেবের অঙ্ক মিলছে না দেখে হতাশ হল সব্বাই। হতাশ হল মায়েরাও। এমন ছেলেকে কি জামাই করা যায়? একেবারের অসামাজিক। কারোর সঙ্গে মেশে না। নিজের এলাকা ছেড়ে একদম বেরোয় না। সঙ্গী শুধু ওই বিরাট ঘোড়াটা। সব সময়ে চড়ে রয়েছে আগুনে অশ্বের পিঠে।

অজস্র আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করেছে কিশোর ব্যারন একই জবাব দিয়ে—মেজেনগার্সটিন আর মৃগয়ায় বেরোয় না!

কাঁহাতক আর প্রত্যাখ্যানের অপমান সওয়া যায়? নিমন্ত্রণ পত্র কমতে লাগল একটু একটু করে। তারপর বন্ধ হয়ে গেল একেবারেই। কাউন্ট বার্লিফিজিন-এর বিধবা তো বলেই বসলেন—"ছোঁড়াকে কি আর মানুষ বলা যায়? ঘোড়ার সমাজই তো ওর সমাজ!"

মা-বাপ মরা ছেলেটার ওপর সহানুভূতি জেগেছিল অনেকেরই তার আচরণে অকস্মাৎ পরিবর্তন আসায়। ডাক্তার কিন্তু বলেছিল—"বংশের রোগ ধরেছে—বিষাদ-ব্যাধিতে ভুগছে।" অন্যান্যদের কথায় ছিল অন্য ইসারা—অদৃশ্য লোকের কারসাজি নাকি কাজ করছে কিশোর ব্যারনের অস্থিমজ্জায়।

অতিকায় একটা ঘোড়ার প্রতি এহেন বিকৃত আসক্তি ভাবিয়ে তুলেছিল সবাইকেই। দিন দুপুরে অথবা মাঝরাতে, জরাক্রান্ত অবস্থায় অথবা সুস্থ শরীরে, প্রকৃতি যখন প্রফুল্ল অথবা যখন ঝড়বাদলায় উদ্দাম—সব সময়েই শয়তান-সদৃশ ক্রূরমেজাজী ঘোড়ার পিঠে সওয়ার থেকেছে কিশোর ফ্রেডরিক—অষ্টপ্রহর অশ্বখুরধ্বনির উৎপাতে অতিষ্ঠ করে তুলেছে এলাকার প্রত্যেককে। সামান্য একটা ঘোড়ার প্রতি এত ন্যাওটা হওয়া কদাকার মনোবৃত্তির পরিচয় নয় কি?

অস্বস্তির মূলে রয়েছে বেশ কয়েকটা ঘটনা। সওয়ার আর তার বাহনের ক্ষমতা যুগপৎ অপার্থিব হয়ে দাঁড়াচ্ছে— আসন্ন অমঙ্গলের অস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করছে দুজনেরই ক্রিয়াকলাপ। মেপে দেখা হয়েছিল এক লাফে এ ঘোড়া যায় কতটা। স্তম্ভিত হতে হয়েছে প্রত্যেকেই। আশ্চর্য অশ্ব যেন অবলীলাক্রমে শূন্যপথে উড়ে গিয়ে পেরিয়ে গেছে দীর্ঘ জমি—ভেঙেছে অতীতের অশ্ববাদদের সব রেকর্ড। এমন অশ্বের একটা নাম তো থাকা উচিত? কিশোর ব্যারনের আস্তাবলের প্রত্যেক অশ্বের একটা করে নাম আছে। কিন্তু মহাকায় এই অশ্বের নাম দেয়নি ফ্রেডরিক। কোনো অশ্বপালের হাতেও ছেড়ে দেয়নি এই নামহীন আতঙ্ককে। নিজেই দলাই-মলাই করে দানাপানি দেয়। এ ঘোড়ার ঠাঁই সাধারণ আস্তাবলে নয়—অন্যত্র। সেখানেও কোনো সহিস ঢুকতে পারে না। যে তিন অশ্বপাল জলন্ত আস্তাবল থেকে ঠিকরে আসা ঘোড়াকে লোহার চেন পরিয়ে সামলাতে পারেনি—তারাই বলেছে, ফ্রেডরিক টুসকি পর্যন্ত মারে না তার এই দুর্দান্ত ঘোড়ার গায়ে—চাবুক মারা তো দূরের কথা। ঘোড়াদের অদ্ভুত বুদ্ধি হতবাক করেছে অতীতে অনেককে, কিন্তু বিচিত্র এই অশ্ব যখন চুলচেরা চোখে ফ্রেডরিককে দেখতে থাকে, তখন মনে হয় যেন কোটরে বসানো মানুষের একজোড়া চোখ নির্নিমেষে দেখছে তাকে। বিশেষ এই চাহনির সামনে প্রতিবারেই কেঁচোর মত কুঁচকে গুটিয়ে যায় দুরন্ত কিশোর ফ্রেডরিক। আর যখন অধীর উত্তেজনায় পা ঠুকতে থাকে আশ্চর্য অশ্ব, আশপাশের মানুষ আতঙ্কে কাঠ হয়ে দূরে সরে যায় তৎক্ষণাৎ।

এ ঘোড়াকে ফ্রেডরিক বড় বেশি ভালবাসে, এইটাই সবাই মেনে নিয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে প্রতিবারেই ঘোড়ার পিঠে বসবার সময়ে শিউরে ওঠে কেন সে? কেনই বা ঘোড়া ছুটিয়ে আসবার পর দেখা যায় জয়দৃপ্ত অথচ উৎকট বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে মুখের পরতে পরতে? এ খবর দিয়েছে প্রায় হাবাগোবা জড়ভরত টাইপের একটি ছেলে—যার কথা কেউ ধর্তব্যের মধ্যে ধরে না।

তারপর একরাতে প্রভঞ্জনের প্রবল প্রতাপে মেদিনী যখন কাঁপছে, আকাশ বাতাস যখন দিশেহারা—তখন বায়ুগ্রস্ত রুগীর মত ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে, অতিকায় অশ্বের পিঠে চেপে, ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অরণ্যে উধাও হয়ে গেল ফ্রেডরিক। তার এহেন আচরণের সঙ্গে ইদানিং সবাই পরিচিত বলেই কেউ আর তা নিয়ে ভাবেনি। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরেও যখন রহস্যময় তুরঙ্গ আর তার সওয়ারের প্রত্যাবর্তন ঘটল না—অথচ রহস্যজনকভাবে আচমকা লেলিহান শিখায় আবৃত হয়ে গেল মেজেনগার্সটিন প্রাসাদের অজেয় কেল্লা—যখন ভিত পর্যন্ত নড়ে উঠে কাঁপিয়ে দিল বিশাল ইমারতের পর ইমারত—তখন টনক নড়ল বইকি।

অনেক চেষ্টা করেও আগুনের করাল খপ্পর থেকে সৌধশ্রেণীর কোনো অংশই যখন বাঁচানো গেল না, তখন হাল ছেড়ে দিয়ে প্রতিবেশীরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল অগ্নিশিখার উন্মত্ত নৃত্য। আর ঠিক তখনি দূরায়ত অশ্বখুরধ্বনি শুনে চকিত হলো

প্রত্যেকেই। হুতাশনের হুহুঙ্কারে ছাপিয়ে টগবগ টগবগ শব্দ প্রচণ্ড গতিবেগে এগিয়ে আসছে এদিকেই। তারপরেই দেখা গেল আগুনে অশ্বকে। অরণ্য থেকে যে পথ এসে পৌঁছেছে মেজেনগার্স্টিন প্রাসাদের সিংহতোরণ পর্যন্ত—সুপ্রাচীন ওক গাছ ছাওয়া সেই পথেই ঝড়কেও টেক্কা মেরে ধেয়ে আসছে অতিকায় অশ্ব। সওয়ার লুটিয়ে রয়েছে তার পিঠে—মাথায় নেই টুপি। এক-এক লাফে আশ্চর্য দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, স্ফীত নাসারন্ধ্রে যেন আগুনের হল্কা ছড়িয়ে, আবির্ভূত হলো বুঝি খোদ শয়তান—অরণ্যই যার আসল এলাকা, প্রভঞ্জন যার ক্রীতদাস।

অশ্বারোহীর অবস্থা অতীব শোচনীয়, তা বোঝা গেল ঝলক দর্শনেই। নিঃসীম যাতনায় বিকৃত হয়ে রয়েছে মুখ, গোটা শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে তেউড়ে যাচ্ছে মুহুর্মুহু আক্ষেপে, অতিমানবিক প্রচেষ্টা প্রয়োগেও কিশোর ব্যারন আর নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারছে না। ফেটেফুটে কেটেকুটে যাওয়া দুফাঁক ঠোঁটের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে এল শুধু একটা আর্তীব্র হাহাকার—পাঁজরা গুঁড়িয়ে চূর্ণ হয়ে যাওয়ার মত একটা মর্মান্তিক আর্তনাদ—আতঙ্কঘন সেই আর্তনাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল প্রত্যেকেরই।

আর তারপরেই আগুন, ঝড় আর আর্তনাদের হাহাকারকে টিটকিরি দিয়েই যেন আরও মুখর হয়ে উঠল অশ্বখুরধ্বনি—একটি মাত্র লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল পরিখা আর তোরণ পথ, বিষম বেগে তেড়ে গেল ভগ্নপ্রায় সোপানশ্রেণীর দিকে, ভয়ানক লাফে জ্বলন্ত সিঁড়ি পেরিয়ে ঢুকে গেল সর্বনাশা আগুনের ঘূর্ণির মধ্যে, যুগপৎ অন্তর্হিত হল বিকট অশ্ব আর তার বিবশ সওয়ার।

তুফানের তাণ্ডব কমে এল একটু পরেই। শবাগারের শান্তি নেমে এল সঙ্গে সঙ্গে। পুরো প্রাসাদ ঘিরে শবাচ্ছাদন বস্ত্রের মত সাদা আগুন জ্বলতে লাগল ধিকিধিকি। সুদূর আকাশ পর্যন্ত ধেয়ে গেল অস্বাভাবিক, অতিপ্রাকৃত এক দ্যুতি; আর দেখা গেল একটা ধোঁয়ার মেঘ; ধীরে ধীরে চেপে বসেছে গোটা প্রাসাদের ওপর—সুস্পষ্ট হয়ে উঠল একটা অতিকায় মূর্তি জমাট ধোঁয়ার মধ্যে থেকে। সে মূর্তি একটা অশ্বের।

নিরুদ্ধ নিশ্বাস

[লস অফ ব্রিদ]

গলা ফাটিয়ে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছিলাম বউকে। বিয়ের ঠিক পরের সকালে। মুখপুড়ি, ডাইনি, ছুঁচোনি, হাড় হাবাতে, ইত্যাদি ইত্যাদি বলতে বলতে শেষকালে বউয়ের গলাও টিপে ধরেছিলাম। মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জুৎসই আরও একটা গালাগাল সবে দিতে যাচ্ছি, (যা শুনলে বউয়ের তিলমাত্র সন্দেহ থাকত না নিজের অপদার্থতা সম্বন্ধে), এমন সময়ে আমার নিশ্বাস আটকে গেল।

দম ফুরিয়ে যাওয়া, নিরুদ্ধ নিশ্বাসে থাকা, শ্বাসরোধ ঘটা—এমনি অনেক দমবাজি-শব্দমালা শুনেছি। কিন্তু সত্যি সত্যিই যে তা ঘটতে পারে, তা তো জানতাম না। এ যে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে ঘটে যাওয়া! তাহলেই কল্পনা করুন, সেই মুহূর্তে আমি কি পরিমাণ হতভম্ব আর হতাশ হয়েছিলাম।

আমার একটা বিশেষ প্রতিভা আছে। মহা বিপদেও যা আমার কাছ ছাড়া হয় না। মেজাজ যখন বাগে নেই, তখনও দেখেছি মাথা বেশ ঠাণ্ডা থাকে। হুঁশ হারাই না—কক্ষনো না।

বউকে বুঝতেই দিলাম না কি বিপাকে পড়েছি। শুধু একটা মজার মুখভঙ্গি করলাম। এক গালে টোকা মেরে, আরএক গালে টুক করে চুমু খেলাম। তারপর বউকেই হতভম্ব অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে গটগট করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম।

ভাবুন আমার তখনকার অবস্থাটা। বেঁচে আছি, অথচ লক্ষণ রয়েছে মরে যাওয়ার; মরে গেছি—অথচ ঘুরছি ফিরছি জ্যান্ত লোকের মতো। খুবই শান্ত, অথচ শ্বাসপ্রশ্বাস বিলকুল বন্ধ। এরকম বেয়াড়া ব্যাপার পৃথিবীতে কখনো ঘটেনি।

দম একদমই ফুরিয়ে গেছিল। এক্কেবারে বলতে এক্কেবারে। এক ফোঁটা বাতাসও আর বইছিল না নাকের ফুটো দিয়ে—নিশ্চিত ছিলাম এ ব্যাপারে। সেই সময়ে যদি পাখির পালকও এনে দিতেন সামনে—সারা জীবন দিয়ে দম মারার চেষ্টা করেও নাকের হাওয়ায় তাকে নড়াতে পারতাম না। এমনকি আয়নার বুকেও নিশ্বাসের হলকা ছেড়ে বাষ্প জমাতে পারতাম না। সে এক বিদিগিচ্ছিরি অবস্থা মশায়।

বুকফাটা এই দুঃখের মধ্যেও স্বস্তি পাচ্ছিলাম শুধু একটি ব্যাপারে। কথা বলতে পারছিলাম। অবাক হচ্ছেন? কিন্তু সে কি কথার কথা! গলার পেশির এক ধরনের খিঁচুনির ফলে ফিসফিস করে কোনও রকমে বোল ফোটাতে পারছিলাম। সুড়ঙ্গর তলা থেকে ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরলে যে রকম বিটকেল শোনায়—ঠিক সেই রকম, বউকে মুখ নাড়া দিতে গিয়েই তো এই হাল আমার। সেই মুহূর্ত থেকে ভেবেছিলাম, ইহজন্মে আর বুঝি ফুসফুসের কেরদানি গলা চিরে বের করতে পারব না। কিন্তু ফুসফুস 'ফেল' করলেও গলার 'মাস্‌ল্'গুলো সে যাত্রা কোনওরকমে মুখ রক্ষে করেছিল আমার। দইয়ের সাধ ঘোলে মেটানোর মতো ব্যাপার বলতে পারেন।

যাইহোক, দড়াম করে বসলাম একটা চেয়ারে। গুম হয়ে বসেই রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ ধরে শুধু ভেবেই গেলাম আমার এহেন বিচিত্র বিপাক নিয়ে। হাজার খানেক করুণ কল্পনায় মাথা আবিল হয়ে রইল—প্রতিটি কল্পনাই চোখের জলের বন্যা বইয়ে দেওয়ার মতো হৃদয় বিদারক। এমনকি সুইসাইডের ইচ্ছেও কিলবিল করে গেল ব্রেনের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু মানুষের একটা অদ্ভুত স্বভাব আছে; যা অবশ্যম্ভাবী আর নাগালের মধ্যেই রয়েছে—সেদিকে না গিয়ে ধেয়ে যায় দূরের দিকে—জানে, তা পেতে গেলে জান কয়লা হয়ে যাবে—তবুও ছোটে সেইদিকেই।

আমারও হলো সেই দশা। সুইসাইডের প্ল্যান বিদেয় করলাম ব্রেন থেকে। ও কথা ভাবতেই এমনই শিউরে উঠেছিলাম যা কহতব্য নয়। এদিকে পরমানন্দে দুটি প্রাণি ঘরে বসে গলাবাজি করে চলেছে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে—নিশ্চয় আমার আকস্মিক অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে টিটকিরি দিয়ে চলেছে এক নাগাড়ে। এদের একজন হলো বেড়াল— সে ব্যাটাচ্ছেলে কার্পেটে বসে গোঁফ ফোলাচ্ছে; আর একজন ধুমসো কুকুর—তিনি ল্যাজ আছড়াচ্ছেন টেবিলের তলায় বসে।

হতাশায় ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছি যখন, ঠিক তখন পায়ের শব্দ শুনলাম সিঁড়িতে। নেমে যাচ্ছে আমার বউ—যাকে গলার কাজ দেখাতে গিয়ে আমার এই অবস্থা। পায়ের আওয়াজ নেমে যেতেই নিশ্চিন্ত হলাম। যাক, এখন আমি একা।

যদিও বুক ধুকপুক করছিল বিষম উদ্বেগে, এবার জোর করে মন ফিরিয়ে আনলাম বর্তমান দুরবস্থায়—বিশ্রী এই পরিস্থিতির একটা হিল্লে তো করা দরকার।

পা টিপে টিপে উঠে গিয়ে দরজায় তালা এঁটে দিলাম এতটুকু শব্দ না করে। তারপর ঘর তল্লাসি শুরু করলাম বিপুল উদ্যমে। যা খুঁজছি, তা নিশ্চয় খুব যত্ন করে লুকিয়ে রাখা হয়েছে দেরাজ বা ড্রয়ারের কোনও এক কোণে। তা বাম্পের আকারে থাকতে পারে, নিরেট চেহারা নিয়েও থাকতে পারে। অনেক দার্শনিককেই দেখেছি দর্শনের বিস্তর ব্যাপারে ভয়ানক অ-দার্শনিক। উইলিয়াম গডউইন সাধে কি বলেছেন তাঁর 'ম্যানডিভিল' কেতাবে ঃ 'অদৃশ্য বস্তুই একমাত্র বাস্তব বস্তু'। যে প্যাঁচে পড়েছি এখন, ওঁর এই বাক্যই শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়ে না দাঁড়ায়। পাঠক-পাঠিকা দয়া করে মুখ বেঁকাবেন না, অবিশ্বাস্য একটা উক্তিকে বিশ্বাসের খোলস পরানোর চেষ্টা করছি বলে, আমার অবস্থাটা ভেবে দেখুন। গেরোয় না পড়লে দার্শনিকদের আপ্তবাক্যর মর্মার্থ উপলব্ধি করা যায় না। অ্যানাক্সাগোরাস কি বলেননি, সব তুষার-ই সাদা? এটা একটা ঘটনা—পরে তা জেনেছিলাম।

তল্লাসি চালিয়েছিলাম অনেকক্ষণ ধরে। মেহনত আর অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ হাতে এসেছিল এক সেট নকল দাঁত, এক জোড়া নকল নিতম্ব, একটা নকল চোখ আর কয়েক প্যাকেট মিঠাই—আমার স্ত্রীকে দাতব্য করেছিলেন মিঃ উইনডেনাও নামে এক ভদ্রলোক। এতক্ষণে বুঝলাম, ভদ্রলোকের ওপর আমার বউয়ের পক্ষপাতিত্বের মূল কারণ। খুবই অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল মনের মধ্যে। আমার সঙ্গে যে জিনিসের তিলমাত্র সাদৃশ্য নেই, আমার গিন্নী তার তারিফ করবে—এ যে ভাবাই যায় না। এর চাইতে জঘন্য কাজ আর হয় না। কে না জানে, চেহারায় আমি গাঁট্টাগোট্টা হলেও দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কিঞ্চিৎ মর্কটাকৃতি। মিঃ উইনডেনাও-এর চেহারা আর চালবাজি তো এখন প্রবাদ-প্রবচনের স্তরে উঠে গেছে—কথায় কথায় লোকে এই লোকটার উপমা তুলে ধরে। আমার বউ-ও যে সেদিকে ঢলেছে, তাতে আর আশ্চর্য কি। যাক সে কথা।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও যা খুঁজছিলাম তা পেলাম না। দেরাজের পর দেরাজ, ড্রয়ারের পর ড্রয়ার, কোণ-কানাচ—সবই দেখলাম তন্ন তন্ন করে—কিন্তু বৃথাই। প্রসাধনের একটা বাক্স পেয়েছিলাম। হাঁচড়-পাঁচড় করে হাতরাতে গেছিলাম। ভেঙে ফেলেছিলাম একটা শিশি। আতরের গন্ধে ঘর ভরে গেছিল। বউয়ের রুচির তারিফ না করে পারিনি—এত কাণ্ডর পরেও।

তারপর গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলাম। মন খুবই বিষণ্ণ। বুকে যেন পাথর ঝুলছে। সে কি অস্বস্তিকর অবস্থা। দেশ ছেড়ে পালাবই ঠিক করলাম। আতরের শিশি ভেঙেছি—বউ যখন জানতে পারবে—আমি তখন অন্য দেশে। সেখানে জীবন শুরু করব নতুন করে। যে মানুষের গলা দিয়ে কথা বেরয় না—শুধু ঘড়ঘড়ানি বেরয়—তাকে এক আজব জীব হিসেবেই মেনে নেবে নতুন দেশের

নতুন মানুষরা। এই সময়ে একটা নাটকের কথা মনে পড়ে গেল। নায়কের গলা দিয়ে শুধু ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরত এবং বিকট বেসুরো ঘড়ঘড়ানি দিয়েই নাটক জমিয়ে দিয়েছিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। আমিও পারব। পারতেই হবে। কণ্ঠস্বরের একঘেয়েমিও তো একটা আকর্ষণ হতে পারে—স্বদেশে না হলেও বিদেশে হবে। ঘরে বসেই রিহার্সাল দিয়ে নিলাম। দেখলাম নাটক বেশ জমে উঠেছে। বউকে ভড়কি দিতে অসুবিধে হবে না। আমি যে নাটকের হিরো হয়ে বিরামবিহীন রিহার্সাল দিয়ে যাচ্ছি—বোকা বউ তা বুঝবে। মঞ্চের আকর্ষণ তো কম নয়। আচমকা খেয়াল চেপেছে মাথায়—এটা মাথায় ঢুকিয়ে দিতে পারলেই কেল্লা মেরে দেব।

কেল্লা মারতে গিয়ে অবশ্য আমাকে নানান প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়েছিল। বউ যত প্রশ্ন করেছে, আমি ততই অঙ্গভঙ্গি করেছি। কখনও ব্যাঙের মতো কটর-কটর করে বিয়োগান্তক সেই নাটকের সংলাপ আউড়ে গেছি, কখনও দাঁত খিচিয়েছি, কখনও হাঁটুর নৃত্য দেখিয়েছি, কখনও পা ঘষটেছি। নাটকের সেই নায়ক যা-যা করে হাততালি কুড়িয়েছে—তার সবই করে গেছি। ফলে, কেউই বুঝতে পারেনি আমি বাকশক্তি হারিয়েছি।

এইভাবে ঘরসংসার সামাল দেওয়ার পর একদিন ভোর রাতে উঠে বসলাম একটা ডাক-গাড়িতে। কোথায় যাচ্ছিলাম, তা আর বলব না। বাড়ির লোকজন আর পরিচিতদের জানিয়ে দিয়েছিলাম, জরুরী কাজে যেতে হচ্ছে অমুক শহরে।

লোক গিজগিজ করছিল মেল-গাড়ির সেই কামরায়। মুরগি-ঠাসা অবস্থা বলতে যা বোঝায়। ভোররাতের আধো-অন্ধকারে আর ওই রকম গাদাগাদি অবস্থায় আমার মুখ কারও নজরে আসেনি। আমিও কাউকে চিনতে পারিনি। কোনও রকমে ঠেলেঠুলে শুয়ে পড়েছিলাম বেঞ্চিতে। আমার দু'পাশে শুয়েছিল অতিকায় দুই পুরুষ—হাতি বললেই চলে। চিঁড়ে চ্যাপ্টা অবস্থায় দুজনের ফাঁকে নিজেকে শোয়াতে না শোয়াতেই আরও ভারি গতরের আরও বিশালকায় একটা লোক ধড়াম করে সটান শুয়ে পড়ল আমার গোটা শরীরটার ওপর এবং নাক ডেকে চলল তৎক্ষণাৎ। ভয়ানক চাপে আমার ঘাড় বেঁকে গেছিল—আঙুল নাড়ানোর ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছিলাম। লোকটা নিশ্চয় আমাকে দেখতে পায়নি, বুঝতেও পারেনি শুয়ে আছে আরও একটা লোকের ওপর।

দেখতে পেল ভোরের আলো ফুটতে। আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসে কলার ঠিক করে নিয়ে যখন দেখল মা কালীর পদতলে শায়িত শিবঠাকুরের মতো লম্বমান রয়েছি নিস্পন্দ নিশ্চুপভাবে—তখন অনেক 'আহা-আহা', অনেক ধন্যবাদ-টন্যবাদ দেওয়ার পরেও যখন লক্ষ্য করল, আমার বেঁকা ঘাড় সিধে হচ্ছে না, মুখে বোল ফুটছে না—তখন গলার শির তুলে কামরার সবাইকে ডেকে দেখিয়ে দিল—মড়া পাচার হচ্ছে চলন্ত গাড়িতে। আমি যে মড়া ছাড়া কিছুই নয়, তা প্রমাণ করার জন্যে দুম করে ঘুসিও মেরে বসল আমার ডান চোখে।

আমি তো তখন একেবারে কাঠ। শরীর নড়ছে না, গলা বাজছে না। অতএব,

কামরার প্রত্যেকেই একে একে আমার কান টেনে প্রমাণ করে ছাড়ল, বাস্তবিকই আমি মড়া ছাড়া কিস্‌সু না।

অতএব, এককাট্টা সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো—এখুনি মড়া ফেলে দেওয়া হোক গাড়ির বাইরে।

গাড়ি তখন যাচ্ছিল 'দাঁড়কাক' নামক সরাইখানার পাশ দিয়ে। সহযাত্রীরা খোলা দরজা দিয়ে আমাকে ছুঁড়ে দিলে সেইদিকেই। পেছন পেছন উড়ে এল আমার সবচেয়ে ভারি তোরঙ্গ।

ফলে, ডবল অ্যাকসিডেন্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হলো আমাকে। ভাঙল দুখানা হাত—গাড়ির পেছনে লেগে; ভাঙল মাথার খুলি—তোরঙ্গ খুলির ওপর পড়ায়।

সরাইখানার মালিক ছুটে এসে আগে দেখল তোরঙ্গর মধ্যে কি আছে। টাকা-পয়সা দেখে খবর দিল ডাক্তারকে। দশ ডলার নগদ আর আমার বডি তার হাতে তুলে দিয়ে ঝেড়ে দিল তোরঙ্গভর্তি সমস্ত মালকড়ি।

ডাক্তার আমাকে লাশকাটার টেবিলে শুইয়ে প্রথমেই কাটল দু'খানা কান। কান কাটা গেলে একটু সজীবতা দেখাতেই হয়। আমিও না দেখিয়েপারিনি। সার্জন লোকটা তখন ডেকে এনেছিল পাড়ার এক বিশেষজ্ঞ শল্য চিকিৎসককে।

তিনি এসে যখন দেখলেন, ছুরির কোপ পড়লেই মড়া প্রাণপণে পা ছুঁড়ছে, আর ভাঙা হাত নাড়ছে, তেউড়ে বেঁকে যাচ্ছে—তখন রায় দিলেন, এ এক নতুন ধরনের গ্যালভানিক ব্যাটারি। কাটা প্যাঁচার মাস্‌লও থরথর করে কাঁপে, কান কাটা মানুষ পা তো ছুঁড়বেই, ভাঙা হাতও নাড়বে, শরীরও দুমড়ে মুচড়ে যাবে।

এই বলে, ফ্যাঁস করে চিরলেন আমার পেট; কিছু নাড়িভুঁড়ি কেটে সরিয়ে রাখলেন প্রাইভেট এক্সপেরিমেন্টের জন্যে। তারপর কাটলেন নাক। বড্ড বেশি নড়ছি আর পা ছুঁড়ছি দেখে একদম অবাক হলেন না। হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন আরও মাতব্বরদের ডেকে আনার জন্যে।

ইতিমধ্যে দুটো বেড়াল ঢুকল ঘরে। তারা হাইজাম্পের খেলা দেখিয়ে গেল আমার কাটা নাকের ওপর দিয়ে। তারপর খুবলে খেল মুখের খানিকটা মাংস।

এরপর মড়াও স্থির থাকতে পারে না। আচমকা ঝটকান মারতেই বাঁধন ছিটকে গেল—আমিও ছিটকে গেলাম খোলা জানলার সামনে—লাফিয়ে বেরিয়ে গেলাম জানলা দিয়ে·····

ঠিক সেই সময়ে জানলার তলা দিয়ে যাচ্ছিল একটা কয়েদী গাড়ি। কুখ্যাত চোর শুয়েছিল গাড়িতে। বুড়ো, দুর্বল, মরো-মরো। কাজেই রক্ষীরা মদ খেয়ে বেহুঁশ। চালক আধ-ঘুমন্ত। কারোরই নজর ছিল না গাড়ির ভেতরে।

ছাদ ছিল না গাড়িতে। আমি দড়াম করে এসে দাঁড়ালাম কয়েদীর পাশে। বুড়ো ভারি ধড়িবাজ। চক্ষের নিমেষে শোয়া অবস্থা থেকেই এক লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়ির বাইরে—গলিতে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

আওয়াজ শুনে টনক নড়েছিল রক্ষীদের। উঁকি দিয়ে তারা যখন দেখল কয়েদী দাঁড়িয়ে আছে (ডাক্তাররা আমাকে যে পোশাক পরিয়ে লাশকাটা টেবিলে শুইয়েছিল, তা অবিকল কয়েদী-পোশাকের মতোই)—বন্দুকের বাঁট দিয়ে দমাদম করে মাথায় মেরে ফের শুইয়ে দিল মেঝেতে।

বধ্যভূমিতে গাড়ি পৌঁছোতেই ফাঁসির দড়িতে লটকে দেওয়া হলো আমাকে। তাতে একটা উপকার হলো আমার। বেঁকা ঘাড়টা এক ঝটকানে সিধে হয়ে গেল। দম আটকে মরার কোনও প্রশ্নই ওঠে না—দম তো আটকেই ছিল। তবে খুব পা ছুঁড়েছিলাম। গোটা বডিটায় অদ্ভুত পাকসাট দেখিয়েছিলাম। তাই দেখে 'আবার হোক', 'আবার হোক' বলে হাততালি দিয়েছিল জনতা, কিছু মহিলার ফিটের ব্যায়রাম শুরু হয়ে গেছিল, একজন আর্টিস্ট 'ফাঁসির মড়া' ছবিটায় 'ফিনিশিং টাচ' দিয়ে খুশিতে ডগমগ হয়েছিল।

আমাকে কিন্তু ঝটপট সরিয়ে ফেলা হলো ফাঁসির মঞ্চ থেকে। কেননা, আসল কয়েদী ধরা পড়েছিল এইটুকু সময়ের মধ্যেই।

গোর দেওয়া হলো পাতাল গোরস্থানে। সব অন্ধকার হয়ে যেতেই রেগেমেগে কফিনের ডালা ভেঙে বেরিয়ে এলাম বাইরে। সারি, সারি কফিনের প্রত্যেকটা ডালা ভেঙে ভেতরে ভাঙা হাত ঢুকিয়ে দেখতে লাগলাম কি ধরনের মড়া শুয়ে আছে ভেতরে।

একটা কফিনে দেখলাম, হাতির মতো পেল্লায় একটা মড়া। সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ঘড়ে গলায় বক্তৃতা দিলাম তার হস্তি-বপুর অসহায়তা নিয়ে। আহারে, জীবদ্দশায় কত অসুবিধেই না ভোগ করেছে।

তারপরের কফিনটায় পেলাম আধাখ্যা লম্বা আর বেশ চওড়া একটা মড়াকে। তার নাকের ফুটোয় দু'আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে অতিকষ্টে টেনে বসিয়ে দিলাম। তারপর ঘড়ঘড়ে গলায় যেই বিশাল দেহর বিদিগিচ্ছিরি নিয়ে বক্তৃতা দিতে গেছি, অমনি····

লোকটা ধাঁ করে দু'হাত তুলে ছুঁড়ে ফেলল মুখের বাঁধন। আর তারপরেই শুরু হলো আমাকে ঝেড়ে কাপড় পরানো।

কি বলব মশায়, আমি যতবার ঘড়ঘড়ানি দিয়ে প্রতিবাদ করতে গেছি, ততবারই ধমকে থামিয়ে দিয়েছে আমাকে। মুখ খুলতেই দিল না। কেন তার নাকের ফুটোয় আঙুল ঢুকিয়েছি—এই হলো তার রাগ। আর কত অত্যাচার হবে তার ওপর? তারপরেই যখন আমাকে 'মিস্টার নিরুদ্ধ নিশ্বাস' বলে টিটকিরি দিয়ে উঠল, তখনই ঘোর সন্দেহ হলো আমার। কান খাড়া করে শুনে গেলাম বক্তৃতার বাকি অংশ (যদিও কান নেই—কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় যেন আরও তেজিয়ান হয়ে গেছিল অস্ত্রোপচারের পর থেকেই)।

কি বুঝলাম জানেন? যে লোকটা তোয়াজ করার জন্যে জিনিসপত্র দিয়েছিল আমার নতুন বউকে—এই সেই লোক : মিঃ উইনডেনাও!

বউকে যখন মুখ নাড়া দিচ্ছি, হারামজাদা তখন জানলার তলায় দাঁড়িয়ে

শুনছিল আর রাগে ফুলছিল। আমার সব দমটা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরোটাই ওর ফুসফুসে ঢুকে আটকে রয়েছে! তেড়েমেড়ে কথা বলে যাচ্ছে তারপর থেকেই। কিন্তু আটকানো হাওয়া আর বেরিয়ে আসছে না। তার বকবকানির ঠেলায় অতিষ্ঠ হয়ে পাড়ার লোক মুখ বেঁধে কবর দিয়ে গেছে এখানে।

এখন একমাত্র আমিই বাঁচাতে পারি তাকে। আমার হারানো দম যদি ফিরিয়ে নিয়ে ঢুকিয়ে রাখি নিজের ফুসফুসের খাঁচায়—হাল্কা হয় মিঃ উইনডেনাও।

রাজি হলাম। শর্ত হয়ে গেল ওইখানেই। আমি মিস্টার নিরুদ্ধ নিশ্বাস যে কি সাংঘাতিক লোক, তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে বাতাস খেকো মিস্টার উইনডেনাও। অতএব আর কোনওদিন আমার ছায়া মাড়াবে না।

ফিরিয়ে নিলাম আমার দম। ফিরে পেলাম গলাবাজি। দুজনে মিলে চেঁচিয়ে গেলাম গলা ফাটিয়ে। দমাদম লাথি ঘুসি মেরে গেলাম পাতাল কবরখানার লোহার দরজায়। আওয়াজ শুনে ভড়কে গিয়ে দারুণ লেখালেখি হয়ে গেল স্থানীয় খবরের কাগজে। খোলা হলো ভল্টের দরজা। পাওয়া গেল এই দুই মূর্তিকে।

অসম্ভব? যা বলেন! □

দ-এ পড়েছেন দার্শনিক

[বন-বন]

ছোট্ট এই রেস্তোরাঁয় যাঁরা ঢুঁ মেরেছেন, তাঁরাই জানেন বন-বন মানুষটা ভয়ানক রেস্তোরাঁবাজ। না, এ ব্যাপারে কারো মনে দ্বিমত নেই।

একই সঙ্গে বন-বন ভদ্রলোক যে মস্ত দার্শনিক, তা নিয়েও কেউ কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবেন না।

যে কোনো পণ্ডিতের চেয়ে উনি অনেক বই পড়েছেন, সমস্ত লাইব্রেরি চষে ফেলেছেন, লিখেছেনও কাঁড়ি কাঁড়ি; সে সব লেখার সবই যে শুদ্ধ জাতের— তা যেমন একবাক্যে বলা যায় না— ঠিক তেমনি বলা যায় না, তাঁর সব লেখা পড়লেই মাথায় ঢুকে যায়। ওঁর নীতিকথা-টথাগুলো বুঝে ওঠা বেশ কঠিন। দুর্বোধ্য বলা হয় নিশ্চয় এই কারণেই। প্লেটো, অ্যারিসটটল, লিবনিজ প্রমুখ বড় বড় দার্শনিকের সঙ্গে বন-বন'এর তুলনাই হয় না। বন-বন নিজেই একটা জ্যান্ত দর্শন।

বন-বন যে মস্ত রেস্তোরাঁবাজ, তা আগেই বলেছি। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে বন-বন'এর এই যে প্রতিভা, তা নিয়ে ভদ্রলোক অহঙ্কারে মটমট করেন সর্বক্ষণ। খোলাখুলিই বলেন, ধীশক্তির মূলে রয়েছে পাকস্থলির শক্তি। এ ব্যাপারে চিনের মানুষদের সঙ্গে তাঁর মতামতের খুব একটা ফারাক আমি দেখি না। চিনের লোক বলে, আত্মা জিনিসটা থাকে পেটে। গ্রীকরা যা বলে, তাই ঠিক; তাদের মতে,

আত্মা থাকে মনে আর উদরের খাঁচায়। পণ্ডিতদের পেটুক বলছি, দয়া করে তা যেন ভাববেন না। সব মনীষীই ভুল করেন। বন-বন'এরও ভুল হবে না, তা কি হয়? ওঁর একটা ভুলের কথাই শুধু বলব এই ইতিহাস লিখতে বসে ঃ সুযোগ পেলে দর করতে উনি ছাড়েন না।

তাই বলে যে উনি অর্থলিপ্সু ছিলেন, তাও নয়; কোনো দার্শনিক কোনোদিনই অর্থের লিপ্সা নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারেন না। উনি দর কষাকষি করেন শুধু নিজের কোলে ঝোল টেনে নেওয়াটা ঠিকমত হল কিনা, তা খতিয়ে দেখবার জন্যে। আর সেটা হলেই, অনির্বচনীয় মৃদু হাসি তাঁর মুখমণ্ডল ভরিয়ে রাখে বেশ কয়েকটা দিবস। তাঁর পাণ্ডিত্য যে অপরিসীম— এই স্মিত আস্য-ই তার বিজ্ঞাপন।

বদন জুড়ে এই কৌতুক-হাসি ফুটিয়ে রাখার জোরেই তাঁর আর একটা মার্কামারা হাসি অনেকে ততটা খেয়াল করেননি। এ হাসি অবশ্য স্রেফ দাঁত খিঁচিয়ে হাসি। উড়ো খবর যা কানে এসেছে, তা থেকে জানা গেছে, বন-বন যখন দাঁত দেখিয়ে হাসেন, তখন তাঁর দর কষাকষির মূলে থাকে বদ চাহিদা— অবশ্যই তা নিজের মঙ্গলের জন্যে। তখন নাকি অব্যাখ্যাত ক্ষমতা, অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা আর অস্বাভাবিক প্রবণতা প্রকট হয়ে ওঠে তাঁর দর কষাকষির মধ্যে।

বিখ্যাত এই দার্শনিকের আরও অনেক দোষ অথবা দুর্বলতা আছে। যদিও সে সব নিয়ে তলিয়ে দেখার কোনো দরকার নেই। যেমন ধরা যাক, জগতে এমন কোনো অসাধারণ ধীমান ব্যক্তি আছেন কি, বোতলে যাঁর আসক্তি নেই? বোতলকে কেউ ভালবাসেন— একথাও বলতেও তাই ভাল লাগে। কারণ, তাহলেই বুঝতে হবে তাঁর মেধাও আছে; অথবা দারুণ একটা উত্তেজনাকে খাটিয়ে পাঁচজনের মঙ্গল করার জন্যেই বোতল-বন্দনার দরকার। বন-বন'এর কথাই বলা যাক। তিনি বোতল দেবীকে আবাহন করতেন মওকা বুঝে। অথবা, বিশেষ বিশেষ বোতল তাঁকে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা জুগিয়ে যেত। ধরুন, উনি 'সেন্টপিরে' সুরার স্বাদ যখন গ্রহণ করছেন, তখন যদি কোনো পণ্ডিত-মূর্খ তাঁর সামনে ন্যায়-অন্যায়ের তর্ক-ঝড় তোলেন, তাহলে সেই পণ্ডিত-মূর্খকে সেই ঝড়েই উড়ে যেতে হবে— তুফান ছুটিয়ে ছাড়বেন-বন বন; আবার ধরুন, 'ক্লজ ডি ভোগো' মদ্যে মাতাল হয়েছেন বন-বন, তখন তাঁর সঙ্গে যুক্তির প্যাচ কষতে গেলে নিজেকেই প্যাচে পড়তে হবে; অথবা ধরুন 'চেম্বারলেন' সুরায় রঙীন হয়ে আছেন বন-বন—খবরদার! তখন তাঁর সঙ্গে তত্ত্ব নিয়ে কথার কচকচি মারতে যাবেন না— তুলোধোনা করে ছাড়বেন-বন .বন!

এই হল বন-বন। রেস্তোরাঁ-জিনিয়াস। শহরের প্রত্যেকটা রেস্তোরাঁর প্রতিটি ভুঁড়িবিলাসী জানে বন-বন একটা খাসা প্রতিভা। সরেশ মেধা। জানে তাঁর নিজের পোষা বেড়াল-ও। প্রতিভাবানের সামনে কক্ষনো তাই ল্যাজ নাড়ে না। জানে তাঁর পোষা কুকুরও। মনিব মহা-মেধার সামনে তাই দু'কান নেতিয়ে ফেলতে দ্বিধা করে না— নিচের চোয়াল পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখে— যার চাইতে

অবমাননাকর আর কিছুই নেই কুকুর জাতে। এটাও অবশ্য ঠিক যে শরীরের বিশেষ বিশেষ প্রত্যঙ্গের এইভাবে কুঁকড়ে যাওয়ার মূলে শ্রদ্ধা যতটা না আছে, তার চাইতে বেশি আছে বন-বন'এর নিজের শরীরের প্রভাব। বিখ্যাত এই দার্শনিকের বাহ্যিক আকৃতি আর পাঁচটা মানুষের মতো নয় মোটেই— নির্দ্বিধায় বলতে পারি— বিচিত্র সেই আকৃতির সঙ্গে জানোয়ারের মিল আছে বিলক্ষণ— বনমানুষের সঙ্গে যতটা মিল না আছে তার চাইতে বেশি আছে চার পেয়ে জানোয়ারের সঙ্গে। বন-বনকে দেখলেই কেন না জানি না চতুষ্পদ জীবের ছবি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। অদ্ভুত একটা রাজা-রাজা ভাব ফুটে উঠেছে মানুষটাকে ঘিরে। শুধু আকৃতির জন্যে এটা অবশ্যই নয়— আকৃতি যে বস্তুটাকে ঢেকে রেখে দিয়েছে— অদৃশ্য সেই সত্তার অবদান নিশ্চয় আছে। মাথায় তিনি মোটে তিনফুট লম্বা হলে কি হবে, মুণ্ডুটা তো ধড়ের অনুপাতে এইটুকু— আয়তনের অভাব মিটিয়ে দিয়েছে তাঁর বিরাট জালা পেট— এ জীবনের যা কিছু কৃতিত্ব আর স্বীকৃতি, সবই তো ওই পেটের খাঁচার জোরে— অমন একটা ধীশক্তির আত্মার থাকবার উপযুক্ত জায়গা।

জিনিয়াস বন-বন'এর পোশাক-আশাক নিয়ে দুটো কথা বলা দরকার। বিখ্যাত দার্শনিকের বাহ্য ব্যক্তিত্বের মূলে তাঁর পরিচ্ছদের অবদান কিন্তু নেহাত কম নয়। মাথার চুল তিনি ছোট করে কাটেন বটে, এবং সেই খাটো চুলকে চিরুনি দিয়ে লেপটে রেখে দেন খাটো কপালের ওপর, শঙ্কুর মতো অথবা বলা যায় আইসক্রীমের গড়নে একটা ডগা-ছুঁচোলো সাদা ফ্লানেলের টুপি লাগিয়ে রাখেন মাথায়; অনেক ঝালর ঝলঝল করে ঝোলে সেই টুপির চারদিক ঘিরে; গায়ে দেন সবুজ কড়াইশুঁটি রঙের এমন একটা ফতুয়া যা তাঁর আমলের কোনো রেস্তোরাঁবাজদের মধ্যে চালু নেই; হাতা দুটো একটু বেশি লম্বা তো কি হয়েছে, গুটিয়ে তো রাখেন বর্বর কায়দায়; আস্তিন গুটিয়ে মারমুখো যেন সর্বদাই! পায়ের চটিজোড়ার রঙ অবশ্য টকটকে লাল, কিন্তু তাতে সোনা রুপোর কিম্ভূত কারুকাজ দেখলে চক্ষু চড়কগাছ হবেই— নিশ্চয় জাপান দেশেই তৈরি চটিজুতো! শুধু যে রঙের জন্যেই খোলতাই তা নয়— আশ্চর্য রকমের ছুঁচোলো শুঁড় দেখলে আক্কেল গুড়ুম তো হবেই সেই সঙ্গে থ হয়ে যেতে হবে হলুদ সাটিনের প্যান্টের সেলাই আর ছুঁচের কাজ দেখলে। তাক লেগে যায় তাঁর আকাশনীল আলখাল্লা দেখলে (তার ওপর লাল পুঁতির জবরজঙ্গ কারুকাজ); বেঁটে বনমানুষের মতো কাঁধে এই আলখাল্লা ঝুলিয়ে যখন হাঁটেন তখন কিন্তু মনে হয় ঘোড়সওয়ারের পিঠে ভোরের কুয়াশা উড়ে যাচ্ছে! এই সব দেখেই লোকে কানাকানি করে— বন-বন কি স্বর্গের পাখি, না, নিজেই নিখুঁত স্বর্গ! আমি কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু বলি না— বলবোও না— কোনো মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোটা ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের কাজ— নেহাতই তুচ্ছ ব্যাপার।

বন-বন যে রেস্তোরাঁয় থাকেন এবং বারোমাস আড্ডা মারেন, সে জায়গাটায়

ঢুকলেই মনে হবে যেন মনীষী মহাপ্রভুদের আড্ডাখানায় ঢুকলাম। যাতে এই ভাবটা মনের মধ্যে আগে থেকেই ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাই দোরগোড়াতেই মাথার ওপর ঝোলে একটা পেল্লায় বই আর একটা মস্ত বোতল। পেছনে বিরাট থালায় লেখা থাকে জব্বর এই নাম 'বন-বন'এর বিবর'! এ হেন সাইনবোর্ড একবার দেখলেই কারোরই আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, কার বিবরে প্রবেশ করতে হচ্ছে এবং কি ধরনের মগজ সেখানে বিরাজ করছেন!

সিঁড়ির ধাপে পা দিলেই এ বাড়ির ভেতর পর্যন্ত সমস্ত দেখা যায়। প্রাচীন আমলে তৈরি একখানা মাত্র টানা লম্বা ঘরই এ-রেস্তোরাঁর আসল জায়গা। নামেই রেস্তোরাঁ— কিন্তু বাজারি খানাঘর নয়। এখানেই মগজ চর্চা এবং মদ্যসেবন করেন প্রবাদপ্রতিম দার্শনিক বন-বন। এক কোণে থাকে তাঁর শোবার খাট। নানা রকমের আর ডিজাইনের পর্দা ঝোলে চারদিকে, খাটের ওপর ঝোলে চাঁদোয়া— সব মিলিয়ে একটা ধ্রুপদী পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে গোটা ঘরখানায়। চ্যাংড়ামির জায়গা যেন এটা নয়। যে কোণে খাট পাত্য আছে, ঠিক তার উল্টো দিকের কোণে রয়েছে রান্নাবান্নার আয়োজন আর বইয়ের গাদা। বাসনকোসনের ওপরেই পৃথিবীবিখ্যাত দার্শনিকদের কেতাব— মাঝেমধ্যে উঁকি দেয় কাঁটাচামচ, হাতা, খুন্তি। মগজ এবং উদরের এহেন সহাবস্থান চিত্ত পুলকিত করার পক্ষে যথেষ্ট। দরজার সামনের দেওয়ালে মস্ত ফায়ারপ্লেস— যেন হাঁ করে ঘরখানাকেই গিলতে চাইছে আগুন-দৈত্য। ফায়ারপ্লেসের ডানদিকে থরে থরে সাজানো কত রকমের যে মদিরা, তার হিসেব লিখতে গেলে এই আখ্যান বিলক্ষণ দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে।

এইখানেই এক মধ্যরাতে গ্যাঁট হয়ে চামড়া বাঁধানো হাতল চেয়ারে বসেছিলেন বন-বন। পাশেই দাউ দাউ করে জ্বলছে চুল্লির কাঠ। আগুন জ্বলছে তাঁর মাথার মধ্যেও, বাইরে কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। একে শীতকাল, তার ওপর রাত বারোটা। হাড় পর্যন্ত কেঁপে কেঁপে উঠছে, এতক্ষণ স্তাবকদল ঘিরে বসেছিল সুবিখ্যাত অধিবিদ্যার পণ্ডিতপ্রবরকে। মস্তিষ্কের প্রশস্তি শুনেছেন অনেকক্ষণ ধরে। এইমাত্র গালাগাল দিয়ে সবাইকে খেদিয়ে দিয়ে দরজায় তালা দিয়েছেন।

একশ বছরে এরকম ভয়ানক রাত একবার কি দুবারের বেশি দেখা যায় না। তুষার ঝরে চলেছে ঝরঝর করে প্রবলবেগে— ঝড় বইছে কিন্তু গোঁ গোঁ করে কানের পর্দা ফাটিয়ে দিয়ে। দানব-বাতাসের ধাক্কায় গোটা বাড়িটা কাঁপছে ঠকঠক করে, চিমনির মধ্যে দিয়ে হাওয়া নেমে আসছে হু-হু করে, দেওয়ালের ফুটোফাটা দিয়েও বাতাস ঢুকছে সোঁ সোঁ করে। ফলে, দার্শনিকের খাটের চারধারে ঝোলানো সবকটা পর্দা নাচছে, দুলছে, উড়ছে যেন একদল ভূতের টানাটানিতে। বাসনকোসন উদ্দাম নৃত্য জুড়েছে ঝনঝনাঝন শব্দে— কাগজপত্র উড়ে যাচ্ছে খসখস খড়মড় শব্দে— দমাস ধপ ধপাস করে বইপত্তর ঠিকরে পড়ছে মেঝের ওপর। দরজার মাথায় ঝোলানো সাইনবোর্ড গুঙিয়ে উঠছে ঝড়ের মাতনে— ওক কাঠের ফ্রেম গেল বুঝি টুকরো টুকরো হয়ে— বোতল আর বই দুটোকেই

নিয়ে লোফালুফি খেলছে পাতালা ঝড়।

কাজেই বন-বন'এর মেজাজ টং তো হবেই। মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্যে সব দার্শনিকরাই এরকম অবস্থার আগুনের চুল্লির কোণ ঘেঁষে বসে যান। বন-বন'ও বসেছেন। শুধু ঝড়ের জন্যেই তাঁর মাথা গরম হয়নি— আরও অনেক হতবুদ্ধিকর ঘটনা সারাদিনে ঘটেছে বলে তুমুল দাপাদাপি চলছে তাঁর ছোট্ট করোটির মধ্যে। শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে প্রবলভাবে। বিশেষ একটা সুরা খাচ্ছেন মনে করে ভুল করে ওমলেটে কামড় বসিয়েছেন। বিশেষ একটা নীতিসূত্র আবিষ্কার করতে গিয়ে ঝোলের বাটি উল্টে ফেলেছেন। গোদের ওপর বিষফোড়া হয়েছে, বিশেষ একটা দর কষাকষির ব্যাপারে গুবলেট করে ফেলায়; দর কষাকষিতে স্বনামধন্য হয়েও তিনি ল্যাজেগোবরে হয়েছেন। বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো জুটেছে দামাল রাতের ভয়াবহতা; প্রচণ্ড উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে বন-বন'এর স্নায়ু— নার্ভ আর সইতে পারছে না। সবাই যেন ষড়যন্ত্র করে আজ চড়াও হয়েছে তাঁর নার্ভের ওপর। ওঁর কাছেই গুটিসুটি মেরে শুয়ে রয়েছে পোষা কুকুরটা; অনেক মানুষ ভয় পেলে গান গায়; বন-বন শিস দিচ্ছেন— কুকুরটাকে শুনিয়ে শুনিয়ে; উদ্বেগমাখা ভয়-ভয় চোখে তাকাচ্ছেন মস্ত ঘরের দূরের কোণগুলোর দিকে— যেখানে আগুনের লাল আভা পৌঁছোচ্ছে না— সেখানকার ছায়াকালো ভয়-জমাট আঁধারকে ঠেলে ঠেলে তাড়াতে পারছে না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই কোণগুলোর তাল তাল অন্ধকারকে তিনি কেন যে অমন করে দেখে গেলেন— তা শুধু জানেন বন-বন নিজেই। অন্ধকারের ভেতরে কি আছে, তা বোধহয় দর্শন করতে চেয়েছিলেন। ব্যর্থ হলেন। তখন তিনি হাতল চেয়ারে ঠেসেঠুসে বসলেন, একটা টেবিল চেয়ারের সামনে টেনে আনলেন, কাগজ কলম নিয়ে একটা সারগর্ভ বৃহদায়তন পাণ্ডুলিপির খসড়া রচনা করতে বসলেন— লেখাটা ছাপা হবে আগামীকাল।

মিনিট কয়েক এই কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তার পরেই ঘরের মধ্যে শুঁই শুঁই শব্দে ধ্বনিত হল একটা কণ্ঠস্বর— 'মঁসিয়ে বন-বন, আমার তাড়া নেই।'

চমকে লাফিয়ে উঠলেন এই কাহিনীর নায়ক; ফলে, ছিটকে গেল টেবিল। বিষম বিস্ময়ে চারদিকে গুলি গুলি চোখ পাকিয়ে, দাঁতে দাঁতে ঘষে বললেন বন-বন— 'শয়তান কোথাকার!'

'হক্‌ কথা,' উত্তরটা এল প্রশান্ত স্বরে— একই কণ্ঠ থেকে।

'হক্‌ কথা মানে! কিসের হক কথা! —কে তুমি? ঘরে ঢুকলে কি করে?' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠেই থমকে গেলেন দার্শনিক। কারণ এখন তাঁর চোখ পড়েছে বিছানার দিকে। দেখতে পাচ্ছেন, লম্বামতন কি একটা লম্বমান হয়ে রয়েছে তাঁরই খাটে।

বন-বন'এর প্রশ্নবৃষ্টির তোয়াক্কা না রেখে বললে আগন্তুক— 'আমি যা বলতে চাইছি, তা এই ঃ সময় ফুরিয়ে গেলেও আমি ধড়ফড় করি না; যে কাজের জন্যে এসেছি, তা ভয়ানক জরুরী আর গুরুত্বপূর্ণ বলেও আমি মনে করি না; সংক্ষেপে,

তোমার হাটে হাঁড়ি ভাঙার রচনা-লেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবুর করতে পারি অনায়াসেই।'

'হাটে হাঁড়ি ভাঙার রচনা! আরে গেল যা! তুমি জানলে কি করে, হাটে হাঁড়ি ভাঙতে বসেছি আমি!'

'আস্তে!' তীক্ষ্ণ চাপা গলায় হিসহিসিয়ে ওঠে আগন্তুক। পরক্ষণেই তড়াক করে উঠে বসে একবার মাত্র পা ফেলেই এসে দাঁড়ায় নায়কের সামনে— মূর্তিমান অপচ্ছায়াকে আসতে দেখেই যেন মাথার ওপরকার লোহার লম্ফটা শিউরে উঠে মুচড়ে গিয়ে হটে গেল পেছন দিকে— আগন্তুকের আসার পথে থাকবার সাহসও যেন হল না।

বিলক্ষণ বিস্মিত হলেন বিখ্যাত দার্শনিক। তারই মধ্যে আগন্তুকের জামাকাপড়ের ছিরি আর আকাট আকৃতিটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না দেখেও পারলেন না। অসম্ভব লিকলিকে আর অ-সাধারণ লম্বা— জ্যান্ত সুপুরি গাছ বললেই চলে; বিদিগিচ্ছিরি তালঢেঙে আকৃতিটাকে মুড়ে রাখা হয়েছে ভীষণ আঁটসাঁট কুচকুচে কালো কাপড়ের জামাপ্যান্টে, যে পোশাকের কাটছাঁট চালু ছিল একশ বছর আগে। এই জামা আর এই প্যান্ট দর্জি বানিয়েছিল যার জন্য তার আকৃতি ছিল নেহাতই ছোটখাট— কিন্তু গায়ে দিয়ে এসেছে সুপুরি বৃক্ষের মতো এই আগন্তুক। ইঞ্চি কয়েক বেরিয়ে আছে গোড়ালি আর কব্জি। জামা কাপড়ের গরিবিয়ানার বিপরীত লক্ষণ কিন্তু দেখা যাচ্ছে জুতোয়; বেজায় চকচকে একজোড়া দামি বাক্‌ল্ ঝকঝকিয়ে তুলেছে পাদুকাযুগলকে। মাথায় চুলের বালাই নেই বললেই চলে; সামনে আর দুপাশে মসৃণ টাক— শুধু পেছন দিক থেকে সাপের মত লটপট করছে মস্ত লম্বা একটা বেণী। চোখ ঢাকা রয়েছে সবুজ চশমায়; অদ্ভুত সেই চশমার দুপাশেও রয়েছে সবুজ কাঁচ; আলো যাতে কোনোরকমেই চোখে না পোঁছোয়, তারই ব্যবস্থা; বন-বন কিন্তু এর ফলে আগন্তুকের চোখের রঙ দেখতে পেলেন না— চোখের গড়নও দেখতে পেলেন না। গলায় বাঁধা একটা বিরাট গলবন্ধ; সেটা আলখাল্লার মত ঝলমল করছে শরীরের দুপাশে— হঠাৎ দেখলে তাই মনে হয় যাজক বা আচার্য হলেও হতে পারে আগন্তুক। হাবভাব আর কথাবার্তা থেকেও অবিশ্যি সেরকম সম্ভাবনাটাই মাথায় আসে সবার আগে। বাঁ কানের ফাঁকে গোঁজা একটা লেখনী— কেরানীরা যেভাবে কানে কলম রেখে দেয় লেখার ফাঁকে ফাঁকে— ঠিক সেইভাবে। লেখনী বললাম বটে— তবে সেটাকে লেখনী না বলে লেখনীর মতো যন্ত্রবিশেষ বলাই সঙ্গত। কোটের বুকপকেটে রয়েছে একটা ইয়া মোটা বই। কালো বই। ইস্পাতের ক্লিপ দিয়ে আটকানো। বইটা এমন ভাবে ঠেলে বেরিয়ে আছে পকেট থেকে (সেটা ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় বলা মুস্কিল) যে পেছনের মলাটের সাদা রঙে 'ক্যাথোলিক ধর্মানুষ্ঠান' নামটা যেন চোখের ওপর আছড়ে আছড়ে পড়ছে। বিচিত্র এই ব্যক্তির মুখ-টুখ চেহারা-চরণ সবই শয়তান-শয়তান ধরনের— এমনকি গায়ের চামড়া পর্যন্ত মড়ার মত বিবর্ণ। কপালটা ঢিবির মতো উঁচু—বেশ

চওড়াও বটে— অজস্র গভীর বলিরেখায় মানচিত্র আঁকা সেখানে। ঠোঁটের কোণ গুটিয়ে ঢুকে আছে ভেতর দিকে— বৈষ্ণব বিনয়ে যেন মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পারলে বাঁচে। দু'হাতের দশ আঙুল একটার সঙ্গে একটা পেঁচিয়ে ধরে নায়ক অভিমুখে এক পা এগিয়ে আসতেই শরীর ঘিরে যেন ছড়িয়ে পড়ল পরম বিশুদ্ধতা; দেখেই রাগের চিহ্ন মুছে গেল বন-বন'এর মুখমণ্ডল থেকে। আগন্তুকের আগাপাশতলা তন্নতন্ন করে দেখাও সাঙ্গ হল। হাত বাড়িয়ে হৃদ্যতার সঙ্গে করমর্দন করে নিয়ে তাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন বসবার জন্যে।

এইভাবে আচমকা দার্শনিকের মন ঘুরে যাওয়ার মূলে হয়তো আগন্তুকের বিদঘুটে হাবভাব, চেহারাচরণ আর বিনয়বচনের প্রবল প্রভাব ছিল অথবা বন-বন মারাত্মক ভুল করে বসেছিলেন। আমি অন্ততঃ যদ্দূর জানি, বাহ্যিক ব্যক্তিত্ব দিয়ে বন-বন দার্শনিককে কখনো কেউ ঘায়েল করতে পারেনি—পারে না। তাছাড়া, যে কোনো মানুষ অথবা জিনিসকে যাঁরা তন্নতন্ন করে খুঁটিয়ে দেখেন আর চুলচেরা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান—তাঁদেরই একজন হয়ে বন-বন আগন্তুকের আসল চরিত্র ধরতে পারেননি—তা তো হতে পারে না। বেশি কথার দরকার কি, অদ্ভুত আগন্তুকের অসাধারণ পায়ের গড়ন একবার দেখলেই তো বোঝা যায়, বিকট এই পায়ের অধিকারী কোন্ জন!

আরও আছে! আরও আছে! বেজায় বেখাপ্পা একটা লম্বা টুপি মাথায় পরেছিল আগন্তুক। একে তো ওই সুপুরিবৃক্ষ বপু—তার ওপর সিড়িঙ্গে টুপি—কেন? তলায় শিং-টিং নেই তো? ঢেকে রেখে দেওয়ার জন্যে বেধড়ক লম্বা টুপি?

প্যান্টের পশ্চাৎপ্রদেশ অমনভাবে ঠেলে উঠেছিল কেন? কেনই বা ঠেলে-ওঠা-জায়গাটা থির-থির করে কেঁপে কেঁপে উঠছিল? ল্যাজওলা কোটের পেছনের দিকও নেচে নেচে উঠছিল কিসের কাঁপুনির ঠেলায়? একটু অন্তর্দৃষ্টি থাকলেই যে সন্দেহটা মাথায় আসে, তা নেহাত আজগুবি হলেও সত্যি না হয়ে যায় না। আগন্তুকের পশ্চাত প্রদেশের ল্যাজের জন্যেই কি কাঁপছিল কোট আর প্যান্ট?

এ হেন যে ব্যক্তিটি সম্পর্কে বন-বন দার্শনিক চিরকালই অসঙ্গত সম্ভ্রম পোষণ করে এসেছেন মনের একান্ত প্রদেশে—আচমকা সেই ব্যক্তির আবির্ভাবে তাই তিনি যে বিলক্ষণ তুষ্ট হয়েছিলেন—তাতে নেই তিলমাত্র সংশয়। তবে কি, কথা বলতে হয় কি করে—এ ব্যাপারে মহাতুখোড় দার্শনিক সব জেনেও আগন্তুককে টের পেতে দিলেন না যে তিনি বিগলিত হয়ে পড়েছেন এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবে যার সাক্ষাৎ পাওয়া বড়ই সম্মানের ব্যাপার। বিলকুল ন্যাকার ভান করে তাই তিনি কথার মার প্যাঁচে আগন্তুকের পেট থেকে বেশ কিছু নতুন তথ্য আর তত্ত্ব বের করে নিতে চেয়েছিলেন—যা হয়তো কাজে লাগবে নতুন এই রচনায়। হাজার হোক, আশ্চর্য এই আগন্তুকের বয়স তো কম নয়, বিবেক-বিজ্ঞান আর নীতি-জ্ঞানের ব্যাপারে তার কাণ্ডজ্ঞান বিশ্ববিদিত ঘটনা; এ

হেন লোকের মগজ থেকে খানকয়েক সৃষ্টিছাড়া আইডিয়া যদি ছিনতাই করে নেওয়া যায়, তাহলে তা মানবজাতির কাজে তো লাগবেই, একই সঙ্গে গ্রেট বন-বন'কেও অমর করে তুলবে।

ধুরন্ধর দার্শনিক সব বুঝেও তাই খাতির করে বসতে দিয়েছিলেন প্যাঁকাটি আগন্তুককে যার মাথার আর পশ্চাতের বিশেষ প্রত্যঙ্গ ঢাকনি নাড়িয়ে জানান দিয়ে যাচ্ছে নিজেদের অস্তিত্ব!

কথার প্যাঁচ শুরু করার আগে চুল্লিতে খানকয়েক লম্বা চ্যালাকাঠ গুঁজে দিলেন বন-বন, খানকয়েক নতুন 'মোসো' মদের বোতল এনে রাখলেন টেবিলে, তারপর চেয়ার টেনে নিয়ে আগন্তুকের মুখোমুখি বসে চেয়ে রইলেন বচন-বর্ষণ শুরু হওয়ার প্রতীক্ষায়। কিন্তু গোটা প্ল্যানটাই ভণ্ডুল হয়ে গেল খ্যাঁটকেল লোকটার উদ্বোধনী বক্তৃতায় প্রথম ধাক্কাতেই।

'সাবাস্! চিনে ফেলেছো তাহলে।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল অদ্ভুত হাসি, বিকট হাসি, বিচ্ছিরি হাসির প্রপাত। 'হা! হা! হা!— হি! হি! হি!— হে! হে! হে!'

মাথার চুল খাড়া করা বিদিগিচ্ছিরি সেই অট্ট-অট্ট হাসির সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটো পিলে-চমকানো ঘটনা ঘটে গেল।

এক, হাবভাবের সৌজন্য নিমেষে ঝেড়ে ফেলে বিকশিত-দন্ত হয়ে গেল শয়তান। কুকুরে-দাঁতের মতন সারি সারি এবড়ো-খেবড়ো দাঁত বেরিয়ে পড়ল একান থেকে সেকান পর্যন্ত। পেছনে মুণ্ডু হেলিয়ে কড়িকাঠের পানে বিকট হাসি দমকে দমকে নিক্ষেপ করে যেতে না যেতেই তালে তাল মিলিয়ে কোরাস গেয়ে গেল কালো কুকুরটা সামনের দু'পায়ের ওপর শরীরটাকে খাড়া করে ধরে; বেড়ালটাও আচমকা লম্বা এক লাফ মেরে সাঁ করে ঘরের কোণে ছিটকে গিয়ে পেছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে গলার শির তুলে চেঁচিয়ে গেল অট্ট-নিনাদকে শতগুণে বাড়িয়ে দিয়ে।

দুই, ভোজবাজির মতন রঙ আর লেখা পালটে গেল শয়তানের বুক পকেট থেকে ঠেলে ওঠা বইখানার। লেখাটা ছিল কালোর ওপর সাদা রঙের। চক্ষের নিমেষে তা হয়ে গেল টকটকে লাল রঙের—শুধু লাল নয়— আগুনে লাল— যেন জ্বলছে দাউ দাউ করে। নামটা ছিল 'ক্যাথোলিক ধর্মানুষ্ঠান'— পালটে গিয়ে হয়ে গেল 'অভিশাপের খাতা!'

একই সঙ্গে এই দুটি কাণ্ড আচম্বিতে ঘটে যাওয়ায় বন-বন'এর মত কড়া ধাতের মানুষের নার্ভ ছেড়ে গেছিল। বিমূঢ় হয়ে জবাব দিতে গিয়ে আরও ল্যাজেগোবরে হয়ে গেলেন।

'ইয়ে..... মানে...... আমি কিন্তু স্যার...... সামান্য আন্দাজ করেছিলাম..... আমার পরম সৌজন্য......'

'ব্যস, বুঝেছি, আর মুখ নাড়তে হবে না' বলেই এক ঝটকান দিয়ে চশমা জোড়া খুলে কোটের হাতায় কাঁচ মুছে নিয়ে পকেটে চালান করে দিল অন্ধকারের অধীশ্বর।

প্রথম দুটো ঘটনায় চোয়াল ঝুলে পড়েছিল বন-বন'এর এবারকার ঘটনায় চোখ উঠে গেল কপালে।

শয়তানের চোখ নিয়ে অনেক ভাবনা তিনি ভেবেছিলেন, কিন্তু হদিশ পাননি। চোখের চেহারা কিরকম জানতে পারেননি; চোখের রঙ কি ধরনের, তাও আন্দাজ করতে পারেননি। চশমা উধাও হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাই তিনি বিষম কৌতূহলে প্যাট প্যাট করে চেয়ে চোখের রঙ আর চেহারা দেখতে গিয়ে এমন মানসিক চোট খেলেন যে নিজেরই চোখ গিয়ে ঠেকল প্রায় কপালে!

শয়তানের চোখের রঙ কালো নয় (বন-বন যদিও তা আন্দাজ করেছিলেন), ধূসর নয় (সে ভাবনাও ভেবেছিলেন বন-বন), পিঙ্গল নয়, নীল নয়, হলদে নয়, লাল নয়, বেগুনি নয়, সাদা নয়—আকাশের কোনো রঙ নয়, পাতালেরও কোনো রঙ নয়।

চোখের বালাই-ই নেই শয়তানের (স্পষ্ট দেখতে পেলেন বন-বন); চোখ বলে কোনো পদার্থ ছিলও না কোনোকালে চোখের জায়গায়; যা রয়েছে, তাকে স্রেফ মড়াচামড়া ছাড়া আর কিছু বলা যায় না!

অত্যদ্ভুদ এ হেন কাণ্ড দেখলে তার কারণ নির্ণয় করার সহজাত অনুসন্ধিৎসাকে নিবৃত্ত করাটা দার্শনিক মশায়ের কোষ্ঠীতে লেখা নেই। অতএব তিনি মুখ খুলেছিলেন। জবাবটা এসেছিল সপেটা। এবং নিঃসন্দেহে সন্তোষজনক।

'বন-বন, বড় আশা ছিল তোমার, আমার চোখ দেখবে? লক্করমার্কা অনেক আর্টিস্ট আমার চোখের চেহারা কল্পনা করে নিয়ে একগাদা রাবিশ বাজারে ছেড়েছে বটে—হাসি গুলগুলিয়ে ওঠে সে সব দেখলে। চোখ! আমার চেহারায় চোখের বর্ণনা বেশ খানিকটা মিথ্যে জায়গা জুড়ে রেখেছে প্রত্যেকটা রদ্দিমার্কা ছবিতে! চোখ! বন-বন, তোমারও ধারণা তো চোখ থাকবে চোখের জায়গায়—মানে, মাথায়— পোকার চোখ যেমন থাকে—যেমন রয়েছে তোমার! চোখ! চোখ জিনিসটা নাকি দারুণ দরকারি—চোখ ছাড়া কারুর চলে না! ছোঃ! বন-বন, তোমার চোখ আছে, আমার চোখ নেই। অথচ, তোমার চেয়ে আমার চাহনি অনেক অন্তর্ভেদী। প্রমাণ চাই? ওই যে বেড়ালটা ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে তুমিও দেখছো, আমিও দেখছি। কিন্তু তুমি যা দেখতে পাচ্ছো না, আমি তাও দেখতে পাচ্ছি। —চিন্তা···· চিন্তা···· ভাবনার চেহারা······ চিন্তার প্রতিফলন ঘটছে ওর চোখের তারায়···· স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সেই ছবি! পেলে দেখতে? জীবনে পারবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি····· ও ভাবছে, আমরা যেন শুভ বুদ্ধির তারিফ করি, ওর মনের গভীরতার প্রশংসা করি; আর ওর লম্বা ল্যাজের জয়গান গাই। আরও একটা সিদ্ধান্তে এল এক্ষুণি; সেটা এই : ওর ধারণায়, আমি হলাম গিয়ে খানদানি পুরুৎ, আমি তুমি হলে গিয়ে ওপর-চালাক দার্শনিক। এ থেকেই বোঝা যায়, আমি মোটেই অন্ধ নই। আমার এই পেশায় চোখ প্রত্যঙ্গটাই বরং একটা বিশ্রী বোঝা—যখন-তখন গরম লোহা দিয়ে কেউ

ছ্যাকা দিয়ে দিতে পারে। আমি তাই তোমাদের মতো বাইরের চোখ দিয়ে দেখি না—ভেতরের সত্তা দিয়ে দেখি।'

এই বলেই নিজেই মদের বোতল টেনে নিয়ে বড় গেলাস ভর্তি করে বন-বন'এর দিকে ঠেলে দিল শয়তান, কথা না বাড়িয়ে গিলে নিতে বলে, বোতলের বাকি মদ ঢেলে নিল নিজের গলায়।

নিষ্ঠার সঙ্গে অতিথির হুকুম তামিল করে গেলাস নামিয়ে রাখলেন বন-বন। শয়তান তখন তাঁর কাঁধে টোকা মেরে বললেন—'বইটা লিখছো ভালই। একেই বলে সেয়ানা লেখক। তবে কি জানো, তোমার ধ্যানধারণাগুলোকে আর একটু গুছিয়ে নিলে পারতে। যা লিখছো, তা তোমার মনের কথা ঠিকই— তবে একটু মেজে ঘষে নিলে আরও ভালো হত। অ্যারিস্টটলের চিন্তার চেহারার সঙ্গে তোমার ভাবনাচিন্তার বেশ মিল আছে। যে কজন দার্শনিকের সঙ্গে দহরম মহরম ছিল আমার— এই ভদ্রলোক তাদের একজন। লিখেছে গাদাগাদা, কিন্তু সত্যি কথা লিখেছে একটাই। কথাটা নিতান্ত উদ্ভট বলেই ধরিয়ে দিতে হয়েছিল আমাকেই। বুঝেছো কি বলতে চাইছি?'

'না বোঝার কি আছে?'

'ঠিক! ঠিক! আমিই তো বলেছিলাম অ্যারিস্টটলকে—হাঁচলেই বাড়তি আইডিয়াগুলো তেড়েমেড়ে বেরিয়ে যায় নাকের ছ্যাঁদা দিয়ে।'

'তা তো বটেই!—হিক!' বলে, বন-বন আর এক বোতল 'মোসো' মদ ঢালতে লাগলেন বড় গেলাসে। নস্যির কৌটোটা গুঁজে দিলেন অতিথির আঙুলের ফাঁকে।

সবিনয়ে কৌটো ফিরিয়ে দিয়ে বললে অন্ধকারের অধীশ্বর—'প্লেটো লোকটাও ছিল আমার প্রাণের বন্ধু। চেনো তো? ঠিক আছে, ঠিক আছে, এক হাজার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। প্লেটোকে একটা খাঁটি সূত্র ধরিয়ে দিয়ে আমি পিরামিডে গিয়ে বসলাম। তারপরেই মনটা খচখচ করতে লাগল। বন্ধুকে সাহায্য করতে গিয়ে এত বড় খাঁটি কথাটা বলাটা কি ঠিক হল? ফিরে এলাম এথেন্সে। ও তখন গ্রীক ভাষায় লিখতে শুরু করেছে। আমি আঙুলের টুসকি মেরে গ্রীক 'লাম্বডা', মানে, রোমান 'এল'কে দিলাম উল্টে; ফলে, যা দাঁড়ালো, সেটাই হয়ে গেল ওর দর্শনের মূল সূত্র।

'রোমে গেছিলেন?' 'মোসো' শেষ করে আলমারি থেকে 'চেম্বারলেন'-এর বোতল বের করতে করতে বললেন বন-বন।

'একবারই গেছিলাম,' যেন বই থেকে গর গর করে পড়ে গেল শয়তান—'গণতন্ত্রের নামে যখন বছর পাঁচেক ধরে দেশের লোক অনাচার করে বেরিয়েছিল—তখন একবার গেছিলাম। ফলে, তখনকার দর্শনের সঙ্গে কোনো পার্থিব পরিচয় আমার ঘটেনি।'

'হিক!—এপিকিউরাস-কে কিরকম মনে হয়?'

'যাচ্চলে! আমিই তো এপিকিউরাস। আমিই সেই দার্শনিক। লিখেছিলাম

তিনশ রচনা।'

'মিথ্যে কথা!' মদের আগুন ততক্ষণে বন-বন'এর মাথায় সেঁধিয়েছে।

'বটে! বটে! বটে!'

'মিথ্যে বলছেন!—হিক! —ডাহা মিথ্যে ঝাড়ছেন। হিক!'

'যা তোমার মনে হয়।' শান্তভাবেই বললে শয়তান। বন-বন ভাবলেন, তাহলে এক টক্কর জেতা গেল। অতএব 'চেম্বারলেন'-এর দ্বিতীয় বোতল খোলা যাক।

শয়তান কিন্তু পুরোনো কথার খেই তুলে নিয়েছে ততক্ষণে—'তোমার লেখাটা একটু মাজাঘষা দরকার হে। আত্মা বলতে বোঝো কি?'

'আত্মা—হিক!—আত্মা মানে......' পাণ্ডুলিপির ওপর ঝুঁকে পড়লেন বন-বন।

'থাক, থাক, আত্মার ছ-খানা ব্যাখ্যা শোনাবে তো? কোনোটাই ঠিক নয়।'

হেরে গিয়ে বন-বন ঠিক করলেন, 'চেম্বারলেন'-এর তৃতীয় বোতল খোলার এই হল উপযুক্ত সময়।

পরাজয়ের জ্বলুনি একটু কমতেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন—'হিক!—তাহলে কি?'

'বলাটা সহজ নয়, অনেক দুরাত্মা তো দেখলাম,' বলতে বলতে বুকপকেটের বইতে হাত বুলিয়ে নেয় শয়তান—একই সঙ্গে প্রবল হাঁচির দমককে গিলে নেয় কোঁৎ করে। হাঁচিকে ঠেকিয়ে রাখার মতলবেই ঝড়ের বেগে বলে চলে অতীতের অজস্র দার্শনিকের নাম আর তাদের কীর্তিকাহিনী। কথার তোড়ে ভেসে গিয়েও বন-বন কিন্তু চালিয়ে যান মদ্যপান। নামতে থাকে নতুন নতুন বোতল। অন্ধকারের অধীশ্বরও আসবপানে মত্ত হয়ে ওঠে তালে তাল মিলিয়ে—সেই সঙ্গে শুরু হয় ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ হাঁচি। বড্ড স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় থাকার জন্যেই নাকি ঠাণ্ডা লেগে এই হাল হয়েছে শয়তানের। মড়া ঘেঁটে ঘেঁটে আত্মাদের টেনে আনা তো কম ধকলের কাজ নয়। আত্মা জিনিসটা খাসা জিনিস। অপূর্ব! ছায়া-ছায়া পদার্থ—জ্যান্ত অবস্থাতেই তো কতজনে শয়তানের কাছে আত্মা বাঁধা রেখে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়—তাদের নামধাম লেখা আছে বুকপকেটের এই খাতায়—শয়তান তাদের ঢের..... ঢের উপকার করে দেয়....., ফ্যাঁচ... ফ্যাঁচ... ফ্যাঁচ...

হাঁচির এই শয়তানি রুখতে ঘনঘন মদ্যপান করতে গিয়ে আরেকটা বিড়ম্বনায় পড়ে শয়তান। ঢেউ... ঢেউ করে ঢেকুর উঠতে থাকে বুক-পেট ফাটিয়ে। এই সুযোগে দর কষাকষির ক্ষমতাটাকে কাজে লাগাবে ভেবেও অন্য লাইনে চলে গেলেন ধুরন্ধর বন-বন। বোতল বোতল মদ উড়িয়ে টং হয়ে গিয়েও তিনি যুক্তির লাইন থেকে সরে গেলেন না।

বললেন—'আত্মা জিনিসটা ছায়া-ছায়া পদার্থ বলছেন?'

'তাই তো বললাম। ফ্যাঁচ!'

'আমার তা মনে হয় না। হিক!'

'তবে কি মনে হয়?—ঢেউ!'

'আত্মা মানে চাটনি!'

'চাটনি!'

'আত্মা মানে কাটলেট।'

'কাটলেট!'

'আত্মা মানে সসেজ।'

'সসেজ!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।' বলেই সোল্লাসে শয়তানের পিঠ চাপড়ে দিলেন বন-বন।

উৎকট গম্ভীর মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো শয়তান। গুচ্ছের কথা না বাড়িয়ে বললে—'হিক! তোমার কথাবার্তা—ফ্যাঁচ!—শোভন নয়—ঢেউ! —অসভ্য বর্বর!'

বলেই বাতাসে মাথা ঠুকে কিভাবে যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অন্ধকারের অধীশ্বর, বন বন তা কিছুতেই বুঝতেই পারলেন না। তবে অনেকক্ষণ থেকেই কুকুরটার ল্যাজ নাড়ার অসভ্য আওয়াজটাকে এবার বরদাস্ত করতে না পেরে ঠেসে লাথি কষালেন তার পেটে এবং আস্ত একটা বোতল ছুঁড়ে দিলেন শয়তানের উদ্দেশে—সেই বোতল ঠকাং করে গিয়ে লাগল ঝুলন্ত লম্ফের সরু শেকলে। শয়তান যখন চলে যাচ্ছে, তখন দুমড়ে মুচড়ে নৃত্য জুড়েছিল লৌহ লম্ফ—এখন শেকল ছিঁড়ে যেতেই দমাস করে এসে পড়ল বন বন-এর মাথায়।

কুপোকাৎ হলেন মস্ত দার্শনিক। □

শয়তানের বাচ্চা

[ইম্প অফ দ্য পারভার্স]

মানুষের মনের কলকব্জা মাঝেসাঝে বিগড়ে যায়। তখন সে অনেক কুকাজ করে বসে। আমরা বলি, লোকটা মানসিক বিকৃতিতে ভুগছে। আসলে, শয়তানের বাচ্চা নিজেই এই কাণ্ডটা ঘটায়। অদ্ভুত অঘটন ঘটে যাওয়ার পর অনেক সময়ে দেখা যায়, লোকটার ভালই হয়েছে।

এবার বলি আমার কথা।

খুন করবার মতলব মাথার মধ্যে ঘুরছিল অনেকদিন ধরেই। সাহসে কুলোচ্ছিল না। ডিটেকটিভরা যদি ধরে ফেলে?

তারপর একটা ফরাসি কেতাব পড়লাম। তাতে এক ভদ্রমহিলাকে খুন করা হয়েছিল আশ্চর্য এক পন্থায়। একদম মৌলিক পরিকল্পনা। মোমবাতিতে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মোমবাতি পুড়েছে, বিষ-গ্যাস ভদ্রমহিলার নাকে গেছে, মারাত্মক রোগে পড়েছেন, যথাসময়ে পটকেছেন।

ঠিক করলাম, পদ্ধতিটাকে আমিও কাজে লাগাব। যাকে মারব ঠিক করেছিলাম, তার বদভ্যেস ছিল অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে বই পড়া; ঘুপসি ঘরে জানলা দরজাও বন্ধ থাকত ভেতর থেকে। নিজের তৈরি বিষযুক্ত মোম দিয়ে বানানো মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলাম সেই ঘরে। পরের দিন সকালে দেখা গেল, মরে কাঠ হয়ে পড়ে রয়েছে বিছানায়। ডাক্তার রিপোর্ট লিখে দিলে : ঈশ্বর সন্দর্শনে মৃত্যু ঘটেছে।

আপদ বিদেয় হতেই তার বিষয় সম্পত্তির মালিক হলাম। বেশ কয়েক বছর বেশ ফুর্তিতে কাটালাম। ডিটেকটিভরা আমার চুলের ডগাও ছুঁতে পারবে না—এ বিশ্বাস ছিল মনে। ও নিয়ে মাথাও ঘামায়নি। মোমবাতির শেষ অংশটুকু আমিই লোপাট করে ফেলে দিয়েছিলাম—কোথাও কোনও চিহ্ন রাখিনি। ক্রাইম করেছি অনেক ভেবেচিন্তে, সূত্রও রাখিনি কোথাও। সুতরাং আমাকে ধরবে কে? তাই ছিলাম বহাল তবিয়তে। আমার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাবোধ নিয়ে দিবারাত্রি মশগুল হয়ে থাকতাম। খুন করেও আমি গোয়েন্দাদের নাগালের বাইরে—সবসময়ে তা ভাবতাম আর অদ্ভুত উল্লাসে ফেটে পড়তাম।

একদিন রাস্তায় হাঁটছি আর এই কথাই ভাবছি। আমি নিরাপদ! আমি ধরাছোঁয়ার বাইরে! আমি সব সন্দেহের উর্ধ্বে! নিজে কবুল না করলে ধরবে কে আমাকে?

মনের মধ্যে এই যে নিরন্তর নিরাপত্তাবোধের গান, কখন যে তা মুখ দিয়েও বেরিয়ে এসেছে, তা খেয়াল করিনি। হঠাৎ টের পেলাম, আপন মনেই বকে চলেছি—ধরবে কে? প্রমাণ নেই, সূত্র নেই, সন্দেহও নেই! ধরবে কে? ধরবে কে? নিজে থেকে কবুল না করলেই হলো!

টের পেলাম যে মুহূর্তে, সেই মুহূর্তেই কলজে আমার ডবল ডিগবাজি খেয়ে থেমে গেল কিছুক্ষণ। খুবই অল্পক্ষণ অবশ্য। নইলে তো টেঁসেই যেতাম।

সর্বনাশ! শয়তানের বাচ্চা ভর করেছে দেখছি। ফিটের ব্যায়রাম ধরলেই তো মানুষ এমনি ভাবে বকে! খুন করেছি, বেশ করেছি। মনের মধ্যেই তা চেপে রেখেছি এতদিন। এখন তো দেখছি নিহত মানুষটার প্রেতাত্মা আমাকে দিয়ে কথা বলাচ্ছে!

দ্রুত হাঁটতে শুরু করলাম। এ-গলি সে-গলি দিয়ে হন হন করে হাঁটবার পর দৌড়োতে লাগলাম। দৌড়োচ্ছি আর ভাবছি, পাগলের মতো চেঁচাই না কেন? চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে বলে দিই—দ্যাখো, দ্যাখো, আমি খুন করেও দিব্বি ঘুরে বেড়াচ্ছি—আমার চুলের ডগাও কেউ ছুঁতে পারেনি!

উন্মত্ত ইচ্ছেটা যতবার জলোচ্ছ্বাসের মতো আমার মনের আগলের ওপর আছড়ে পড়েছে—ততবারই নিদারুণ আতঙ্কে সিঁটিয়ে গিয়ে সামলে নিয়েছি নিজেকে। আরও জোরে দৌড়েছি। দৌড়োতে দৌড়োতে ভিড়ের জায়গায় চলে এসেছি—লোকজনকে ছিটকে ফেলে দিয়েছি—কিন্তু কিছুতেই দৌড় থামাতে পারিনি।

এ রকম ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো দৌড়োলে লোকজন তো পাছু নেবেই। তারাও হৈহৈ করে তাড়া করেছে আমাকে।

বুঝলাম, নিয়তি আমায় কোথায় নিয়ে চলেছে। যদি তখন জিভটা টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারতাম, নিশ্চয় বেঁচে যেতাম। কিন্তু জিভ কেটে ফেলার ইচ্ছেটা মাথায় আসতে না আসতেই কড়া গলায় কে যেন ধমকে উঠেছিল কানের গোড়ায়—খবরদার! কে যেন আমার কাঁধ খামচে ধরেছিল লোহার মতো শক্ত মুঠোয়।

আমি আর নড়তে পারিনি। খাবি খেতে খেতে দাঁড়িয়ে গেছিলাম। দম আটকে আসছিল, চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না, কানে কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না, আর ঠিক তখনি যেন এক অদৃশ্য পিশাচের প্রবল রদ্দা পড়ল আমার ঘাড়ে। এতদিন যে গুপ্তকথা লুকিয়ে রেখেছিলাম মনের গোপনতম কন্দরে—হুড় হুড় করে বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

আমি নাকি স্পষ্ট উচ্চারণে, অথচ খুব তাড়াতাড়ি সব বলেছিলাম—পাছে বাধা পড়ে, কথা আটকে যায়—তাই এতটুকু বিরতি দিইনি। কথা শেষ করেই জ্ঞান হারিয়ে আছড়ে পড়েছিলাম রাস্তায়।

জেলের খাঁচায় বসে এখন ভাবছি, হাত-পায়ের এই শেকল না হয় খসে যাবে আমি মরে গেলেই—কিন্তু তারপর আমার কি হবে? আজ আছি শ্রীঘরে—কাল থাকব কোন ঘরে?

শয়তানের বাচ্চা তা জানে! □

প্রসঙ্গে কথা বলতে পারতাম না। মৃত্যু চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে থাকতাম সর্বক্ষণ। এমন কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নও দেখতাম মরণকে।

আমার গৃহস্বামী আত্মীয়টি অবশ্য অন্য ধাতের মানুষ। আমার মত সহজে উত্তেজিত হয়ে পড়তেন না। রোজ রোজ চেনাজানাদের চলে যাওয়ার খবর শুনতে শুনতে বেশ মুষড়ে পড়লেও ভেঙে পড়েননি। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যেই তিনি মেধাবী বলে নাম কিনেছিলেন—তাই বলে অবাস্তবতাকে পাত্তা দিতেন না। আতঙ্ক যখন কায়া গ্রহণ করতো, তখন তিনি তার মোকাবিলা করার জন্যে কোমর বেঁধে লেগে যেতেন—কিন্তু বিচলিত হতেন না আতঙ্কর ছায়া দেখলে।

আমার গুম-মেরে-থাকা অবস্থাটা কাটিয়ে দেওয়ার অনেক চেষ্টাই উনি করেছিলেন। কিন্তু পারেননি। পারবেন কি করে? ওঁকে না জানিয়ে ওঁরই লাইব্রেরি থেকে এমন কয়েকখানা বই এনে রোজ পড়তাম—যা আমার মনের আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকা কুসংস্কারের বীজগুলোকে পরম পুষ্টি জুগিয়ে চলেছিল। দিনরাত এত উদ্ভট কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকতাম সেই কারণেই। কারণটা উনি ধরতে পারেননি।

আমার বাতিক ছিল অনেক। তার মধ্যে একটার কথা বলা যাক। অশুভ ঘটনার পূর্বলক্ষণে আমি বিশ্বাস করতাম। এই সংকেত আসে আচমকা এবং তারপরে সত্যি সত্যিই তা ঘটে যায়। এই কটেজে আসবার পর এইরকমই একটা অশুভ পূর্বলক্ষণ আমি দেখেছিলাম যুক্তি দিয়ে যার ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি। ঘটনাটার মধ্যে ভাবী অমঙ্গলের স্পষ্ট ইঙ্গিত লক্ষ্য করেছিলাম বলে তাকে ভিত্তিহীন কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে পারিনি। ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতাম সর্বক্ষণ; মাথার মধ্যেও যেন সব ঘোঁট পাকিয়ে গেছিল। ব্যাপারটা নিয়ে অষ্টপ্রহর থ হয়ে থাকতাম বলে আত্মীয় বন্ধুকে এ বিষয়ে বলবার মুরোদও হয়নি।

সেদিন খুব গরম পড়েছিল। বিকেল নাগাদ কোলের ওপর একটা বই রেখে খোলা জানলা দিয়ে দেখছিলাম দূরের পাহাড়; নদীর টানা পাড়ের ওপারে এই পাহাড়ের গায়ে ধস নামার ফলেই বোধহয় গাছপালার বালাই আর নেই। একদম ন্যাড়া হয়ে রয়েছে। বইয়ের পাতায় চোখ রেখেও আমি ভাবছিলাম শহরের কথা—মৃত্যুরাজ সেখানে রোজই নৃত্য করে চলেছেন—মন থেকে তা কিছুতেই তাড়াতে পারছিলাম না। তাই চোখ উঠে গেছিল বইয়ের পাতা থেকে—দৃষ্টি মেলে ধরেছিল নদীর পাড়ের ওপর দিয়ে দূরের নগ্ন পাহাড়ের দিকে।

কদাকার চেহারার একটা জীবন্ত দৈত্যকে দেখতে পেয়েছিলাম ঠিক সেই সময়ে। পাহাড় চুড়ো থেকে সরসরিয়ে নেমে এসে নিচের ঘন জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছিল মিনিট কয়েকের মধ্যে।

বিকট সেই জীবকে প্রথমে দেখেই ভেবেছিলাম বুঝি পাগল হয়ে গেছি নির্ঘাৎ। অথবা চোখের গণ্ডগোল হয়েছে—ভুল দেখছি নিশ্চয়।

বেশ কয়েক মিনিট ঠায় সজীব আতঙ্ককে নজরে রাখবার পর বিশ্বাস ফিরে
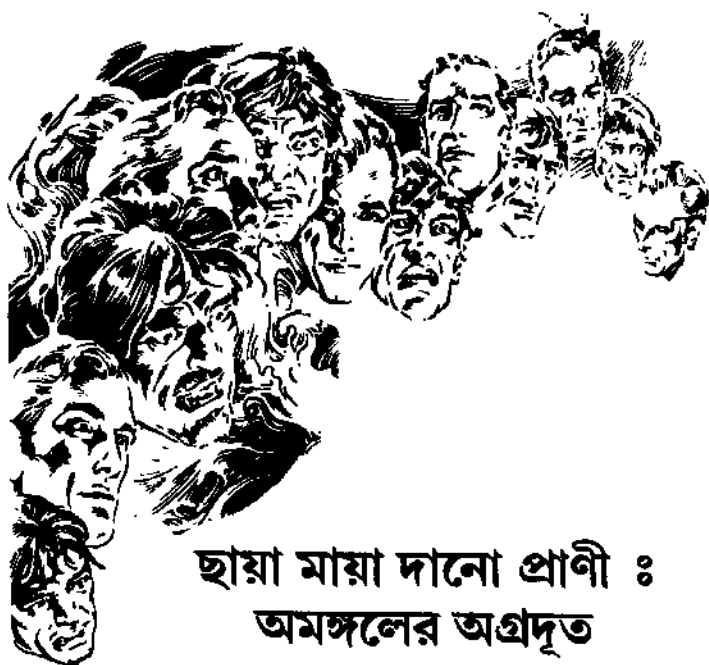
ছায়া মায়া দানো প্রাণী ঃ অমঙ্গলের অগ্রদূত

[দ্য স্ফিংক্স]

নিউইয়র্কে যখন ভয়াবহ কলেরার মড়ক চলছে, তখন আমার এক আত্মীয়ের নেমন্তন্ন রাখতে তাঁর বাড়ি গিয়ে দিন পনেরো কাটিয়ে এসেছিলাম। বাড়িটা কটেজ প্যাটার্নের। হাডসন নদীর পাড়ে।

গ্রীষ্মাবকাশ কাটানোর সমস্ত আয়োজনই মজুদ ছিল সে অঞ্চলে। ইচ্ছেও ছিল হেসেখেলে ছুটির দিনগুলো কাটিয়ে দেব। চারপাশের জঙ্গল দেখা, বসে বসে ছবি আঁকা, নৌকো নিয়ে অভিযানে বেরোনো, ছিপ ফেলে মাছ ধরা, সাঁতার কাটা, গান গাওয়া আর বই পড়া—গ্রীষ্মাবকাশ পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে যেত এতগুলো মজার মধ্যে থাকলে।

কিন্তু তা তো পারছিলাম না। রোজই লোক-গিজগিজ শহর থেকে গা-কাঁপানো খবর পৌঁছোচ্ছিল কটেজে। চেনা জানাদের মধ্যে কেউ না কেউ পরলোকে চলে যাচ্ছেন রোজই—এ খবর কানে শুনলে আর স্থির থাকা যায়? মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনই খবর পেতাম, একজন না একজন বন্ধু মায়া কাটাচ্ছেন।

এরপর থেকে খবর নিয়ে কাউকে আসতে দেখলেই শিউরে উঠতাম। দক্ষিণের বাতাসেই যেন মরণের বিষ ঢুকে বসে আছে। মৃত্যু ছাড়া আর কোনো

এসেছিল চোখ আর মাথার সুস্থতায়। আমি পাগলও হইনি—দৃষ্টিবিভ্রমেও ভুগছি না। যা দেখছি সত্যি। কুৎসিত সেই দানোর বর্ণনা শোনবার পর পাঠক অবশ্য আমাকে পাগলই বলবেন—অথবা বলবেন স্বপ্ন দেখেছি নিশ্চয়। অথচ বিকটাকারকে অনেকক্ষণ ধরে ধীরস্থির শান্তভাবেই চোখে চোখে রেখেছিলাম—উত্তেজনাকে প্রশ্রয় দিইনি। সুতরাং ভুল দেখার প্রশ্নই ওঠে না।

জঙ্গলের সব গাছ তো ধস নামার ফলে উৎখাত হয়নি—কয়েকটা মহীরুহ মাথা তুলে ছিল রাজার মতই। এদের পাশ দিয়ে চলমান দুঃস্বপ্ন অদৃশ্য হয়েছিল বলেই তার সাইজটা আন্দাজ করে নিতে পেরেছিলাম। সমুদ্রের সবচেয়ে বড় জাহাজের চেয়েও অনেক বড় তার কলেবর। জাহাজের উপমা দেওয়ার কারণ আছে। জাহাজের খোলের সঙ্গে অনায়াসেই তুলনা করা যায় সেই ভয়ঙ্করকে। তার মুখখানা বসানো রয়েছে ষাট সত্তর ফুট লম্বা একটা শুঁড়ের ডগায়—হাতির গতর যতখানি মোটা, শুঁড়ের ব্যাসও তাই। শুঁড়ের গোড়ায় থুকথুক করছে বিস্তর কালো চুল—এক কুড়ি মোষের গা থেকেও অত কালো লোম পাওয়া যায় না। লোমশ অঞ্চল থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসে মাটি মুখো হয়ে রয়েছে দুটো প্রকাণ্ড দাঁত—বুনো শুয়োরের দাঁতের চেয়েও অনেক বড় আর নৃশংস। পড়ন্ত রোদ ঠিকরে যাচ্ছিল এই গজাল দাঁত থেকে। প্রকাণ্ড শুঁড়ের সমান্তরালে সামনের দিকে এগিয়ে রয়েছে ঝকঝকে, স্বচ্ছ কৃস্টাল দিয়ে তৈরি দুটো অদ্ভুত জিনিস; রয়েছে শুঁড়ের দু'পাশে—ঠিক যেন দুটো প্রিজম্—খাঁটি কৃস্ট্যাল দিয়ে তৈরি। লম্বায় প্রতিটা তিরিশ থেকে চল্লিশ ফুট। পড়ন্ত রোদ তা থেকে ঠিকরে এসে এত দূরেও চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে আমার। ধড়খানা তৈরি হয়েছে গোঁজের মতো—গোঁজের মাথা রয়েছে মাটির দিকে। দু'পাশ দিয়ে বেরিয়েছে দু'জোড়া ডানা। রয়েছে ওপর-ওপর। ধাতুর আঁশ দিয়ে ছাওয়া প্রতিটা ডানা। প্রতিটা আঁশের ব্যাস দশ থেকে বারো ফুট। শক্ত শেকল দিয়ে আটকানো রয়েছে ওপরের আর নিচের ডানা।

লোমহর্ষক এই জানোয়ারটার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তার বুকজোড়া একটা ছবি। মড়ার মাথার ছবি। চোখ ধাঁধানো সাদা রঙ দিয়ে যেন নিপুণভাবে আঁকা হয়েছে মস্ত কালো বুক জুড়ে। বাহাদুরি দিতে হয় শিল্পীকে।

বীভৎস জীবটাকে মিনিট কয়েক দেখবার পর, বিশেষ করে বুকজোড়া মড়ার খুলি আমার গা-হাত-পা ঠাণ্ডা করে দেওয়ার পর—আতঙ্কে আমি হিম হয়ে গেছিলাম। সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করছিলাম, খুব শিগগিরই একটা অকল্পনীয় বিপদ আসছে। যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে অমূলক আশঙ্কাটাকে মন থেকে তাড়াতে তো পারিই নি—উল্টে আমাকে স্থাণু করে রেখেছিল ওই কয়েকটা মিনিট।

বিমূঢ় চোখে বীভৎস সেই আকৃতি দেখতে দেখতে আর একটা ঘটনা ঘটে গেল। আচমকা হাঁ হয়ে গেল শুঁড়ের ডগায় বসানো দানো-মুখের দুই চোয়াল—ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল এমনই একটা বিকট নিনাদ যা নিরতিসীম শোকবিষণ্ণ—যে শব্দের তুলনীয় হাহাকার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কোথাও কেউ

শুনেছে বলে আমার জানা নেই।

ওই একখানা অপার্থিব হাহাকারই যেন গজাল ঠুকে বসিয়ে দিল আমার বিকল স্নায়ুমণ্ডলীর গোড়ায়। জঙ্গলের আড়ালে তার দানব-দেহ বিলীন হতে না হতেই জ্ঞান হারিয়ে আমি লুটিয়ে পড়লাম মেঝের ওপর।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর প্রথমেই ভেবেছিলাম—যা দেখেছি, যা শুনেছি—সবই বলব বন্ধুকে। কিন্তু তারপর ঠিক করলাম—দরকার নেই।

দিন তিন চার পরে আর এক বৈকালে জানলার ধারে একই চেয়ারে বসে ন্যাড়া পাহাড়ের দিকে চেয়েছিলাম আমি। পাশে আমার প্রিয় বন্ধু। পরিবেশ আর সময়ের প্রভাব আগল খুলে দিয়েছিল আমার মনের। বলেছিলাম, কি দেখেছি কি শুনেছি ক'দিন আগে। শুনে অট্ট হেসেছিল বন্ধুবর। তারপর বড্ড বেশি গম্ভীর হয়ে গেছিল। নিশ্চয় ভাবছিল, নির্ঘাৎ গোলমাল দেখা দিয়েছে আমার মাথায়।

আর ঠিক তখনি ভয়াবহ সেই প্রাণীটাকে আবার দেখতে পেলাম ল্যাংটা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে নিচের জঙ্গলের দিকে। ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম। আঙুল তুলে বন্ধুকে দেখতে বলেছিলাম। সে কিন্তু কিছুই দেখতে পায়নি। শুধু আমিই দেখেছিলাম, একই রকম রক্ত জমানো গতিভঙ্গিমায় মূর্তিমান আতঙ্ক এগিয়ে চলেছে নিচের মহীরুহগুলোর দিকে।

কি ভয় যে পেয়েছিলাম, তা ভাষা দিয়ে লিখে বোঝাতে পারবো না। স্পষ্ট বুঝেছিলাম, বিকট বিভীষিকা পর-পর দুবার আমাকেই চেহারা দেখিয়ে গেল শুধু একটা আসন্ন ঘটনারই পূর্বাভাষ দিতে। আমার মৃত্যুর আর দেরি নেই। অথবা বেঁচে থেকেও মরে যাওয়ার চাইতে বেশি যন্ত্রণা পাব পাগল হয়ে গিয়ে। এ তারই দানবীয় সংকেত! এলিয়ে পড়েছিলাম চেয়ারে। দু'হাতে মুখ ঢেকে ধরে করাল সংকেতকে আর দেখতে চাইনি। চোখ থেকে একটু পরে হাত সরিয়ে নেওয়ার পর তাকে আর দেখতেও পাইনি—বনতলে বিলীন হয়েছে অমঙ্গলের আগন্তুক।

আমার বন্ধু কিন্তু আরো শান্ত হয়ে গেল এই ঘটনার পর। খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল, বিকট জীবটাকে দেখতে কিরকম। হুবহু বর্ণনা দিয়েছিলাম। তারপর আমাকেই শুনতে হলো তার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা। যার সারবত্তা এই ঃ সব মানুষই এক জায়গায় ভুল করে বসে; দূরের জিনিসকে কাছে এনে আর কাছের জিনিসকে দূরে রেখে দেখার তফাৎ ধরতে পারে না। হয় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ধারণা করে নেয়—না হয় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বসে। বর্তমান গণতন্ত্রই তার প্রমাণ।

বলতে বলতে উঠে গিয়ে বুককেস থেকে একটা বই নামিয়ে এনেছিল বন্ধু। 'প্রাকৃতিক ইতিহাস'-এর বই। পড়তে সুবিধে হবে বলে, এসে বসেছিল আমার চেয়ারে—আমাকে বসিয়েছিল ওঁর সোফায়। জানলার ধারে পড়ন্ত আলোয় বই খুলে ধরে প্রথমেই লেকচার দিয়েছিল এইভাবে ঃ 'তোমার বিশদ বর্ণনা না শুনলে, দানবটা আসলে কি—তা কোনোদিনই আঁচ করতে পারতাম না। যাক সে কথা, আগে শোনো একটা পোকার শরীরের বর্ণনা। স্ফিংক্স প্রজাতির পোকা, 'ইনসেক্টা' শ্রেণীর, 'লেপিডোপটেরা' গোষ্ঠীর, 'ক্রিপাসকিউলেরিয়া' ফ্যামিলির

এই পোকার কথা সব স্কুলের বইতেই আছে। শোনো :

'চারটে ডানা ধাতু রঙের আঁশ দিয়ে ছাওয়া; চোয়াল লম্বা হয়ে গিয়ে শুঁড়ের আকার নিয়েছে—মুখ আছে তার ডগায়; এর দু'পাশে আছে ম্যানিব্‌ল্ আর প্যাল্‌পি-র দুটো অবশিষ্টাংশ; নিচের ডানার সঙ্গে ওপরের ডানা লেগে থাকে একটা লম্বা চুলের মাধ্যমে; অন্তেনা দেখতে লম্বাটে গদার মতন—ঠিক যেন একটা প্রিজম্; উদর ছুঁচোলো।; বুকে আঁকা মড়ার খুলি দেখে আর করুণ কাতরানি শুনে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ ভয় পায়।'

এই পর্যন্ত পড়ে, বই মুড়ে রেখে, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল বন্ধুবর—ঠিক যেভাবে যে কায়দায় বসে একটু আগে আমি দেখেছি লোমহর্ষক ভয়াবহকে।

সোল্লাসে বললে তারপরেই—'এই তো···· স্পষ্ট দেখছি····· পাহাড় বেয়ে ফের উঠছে আশ্চর্য প্রাণী ঠিকই—তবে যতটা বড় আর যত দূরে আছে বলে মনে করেছিলে—কোনোটাই ঠিক নয়। জানলার কাঁচে ঝুলছে মাকড়শার জালের সুতো। সুতো ধরে ওপরে উঠছে। আমার চোখের কনীনিকা থেকে তার এখনকার দূরত্ব এক ইঞ্চির ষোলভাগের একভাগ; গোটা শরীরটাও লম্বায় এক ইঞ্চির ষোলভাগের একভাগের বেশি নয়।' □

এ কি গেরোয় পড়লাম রে বাবা!

[দ্য প্রেডিকামেন্ট]

প্রশান্ত এক নিথর অপরাহ্নে মনোরম এডিনা শহর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলাম। শহর কিন্তু হট্টগোলে আর অট্টরোলে ফেটে ফেটে পড়ছে। জগাখিচুড়ি আওয়াজ আর হাজারো দৃশ্য মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে। কী ভয়ঙ্কর! চিল-চেঁচানি চেঁচিয়ে চলেছে মেয়েগুলো। খাবি খাচ্ছে বাচ্চাগুলো। শিস মারছে শুয়োরগুলো। গাড়ি চলছে গড়গড়িয়ে। হাম্বাহাম্বা নিনাদ ছেড়ে যাচ্ছে গাভীর দল—তালে তালে গজরে চলেছে গণ্ডায় গণ্ডায় ষণ্ড। চিঁহি চিঁহি ডাক ছাড়ছে অশ্বগণ। মিউ মিউ ডেকে ঐকতান সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রাশি রাশি বেড়াল। নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছে অজস্র কুত্তা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কুকুর নাচছে! দিব্বি নাচছে! যদিও অসম্ভব, তবুও সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে হারামজাদারা তুরুক তুরুক নেচেই চলেছে। সে দৃশ্য দেখে মন আমার হু-হু করে উঠছে! কেননা, আমার নাচের দিন তো কোন কালে লোপাট হয়ে গেছে। মস্ত প্রতিভার দিন যখন ফুরিয়ে যায়, তখন তার মনে অতীতের কত কথাই না ঠেলাঠেলি করে দাঙ্গা শুরু করে দেয়। আমার মনের মধ্যেও এখন চলছে তুমুল কাণ্ড! কম জিনিয়াস নই আমি। কিন্তু আমারও দিন ফুরুক হয়েছে। নৃত্যের দৃশ্য দেখে তাই ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যেতে বসেছি। আহা! আহা! আমিও একদিন নাচতাম এইভাবে ঘুরে ফিরে। সে সব দিন কোথায় গেল গো! কুকুর নাচছে! কুকুর নাচছে! নাচতে পারছি না শুধু আমি! ওরা তিড়িং মিড়িং করছে—আর আমি সশব্দে ফোঁপাচ্ছি। এরকম একখানা খোলতাই দৃশ্য সরস

চৈনিক নভেল 'জো-গো-ব্রো' তে পেয়ে যাবেন। বড় উপাদেয় কাহিনী।

নগর পরিক্রমায় বেরিয়ে সঙ্গে রেখেছি বিনীত আর বিশ্বস্ত দুই অনুচরকে। এদের একজনের নাম ডায়না; এই সেই কুত্তা যাদের লোম হয় লম্বা, রেশমী, কোঁকড়ানো আর সাদা রঙের। এ দুনিয়ায় এমন মিষ্টি জীব আর হয় না! এর আবার একটা চোখ চুলের ভারেই চাপা পড়ে গেছে—গলায় জড়ানো সৌখিন ফাঁসের নীল সিল্কের ফিতে। হাইট পাঁচ ইঞ্চির বেশি নয়। মুণ্ডুটা কিন্তু ধড়ের চেয়ে একটু বেশিই বড়। ল্যাজটা অতিশয় খাটো হওয়ায় মনে হয় ল্যাজকাটা কুত্তা—না-জানি জখম হওয়া ইস্তক কত কষ্টই না পাচ্ছে—তাই সমবেদনায় মন কেঁদে ওঠে সকলেরই।

আর একজনের নাম পম্পি—মিষ্টি পম্পি—জাতে নিগ্রো! পম্পি রে পম্পি—তোকে তো মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছি না! আমি হাঁটছি পম্পির ঘাড় ধরে। মাথায় সে তিন ফুটের বেশি নয় (হিসেবটা বললাম কিন্তু কড়ায় গণ্ডায়), বয়স সত্তর কি আশি। পা দু'খানা ধনুকের মত বেঁকা—গোটা বডিটা মাংস আর চর্বিতে থসথসে। তার মুখবিবরকে ছোট বলা যায় না—কর্ণ যুগলকেও খাটো বলা যায় না। দাঁতগুলো অবশ্য মুক্তোকেও হার মানায়, আর বড় বড় চোখ দুটোর সাদা রঙ যে কোনো সাদা ফুলকেও লজ্জা পাইয়ে দেয়। ভগবান তাকে ঘাড় বলে কোনো বস্তু দেয়নি—গোড়ালিকে তুলে রেখেছে পায়ের পাতার ওপর দিকে মাঝখানে—যা ওর জাতের সকলেরই আছে। পরনের বসনটা কিন্তু বড়ই সাদাসিধে। একটাই তো বসন। ন'ইঞ্চি হাইটের একটা ওভারকোট। স্বনামধন্য ডক্টর মানিপেনি-র বাতিল করা ওভারকোট। প্রায় নতুন, নিখুঁত কাটছাঁটের বাহারি কোট দিয়ে গোটা দেহটাকে মুড়ে রেখেছে পম্পি—দু'হাতে তুলে ধরে রেখেছে তলদেশ—ছেড়ে দিলেই মাটি ঝেঁটিয়ে যাচ্ছে।

তিনজনেই রয়েছি এই পার্টিতে। দুজনের সম্বন্ধে বিশদ মন্তব্য আগেই করা হয়ে গেছে। তৃতীয় প্রাণীটি এই অধম। আমার নাম সিগনোরা সাইকি জেনোবিয়া। তেলেভাজা চেহারা আমার নয়। রীতিমত কর্তৃত্বব্যঞ্জক কলেবরের অধিকারী আমি। স্মরণীয় যে দিনেক ঘটনা আমি লিপিবদ্ধ করতে বসেছি, সেদিন আমার শ্রীঅঙ্গের ভূষণ ছিল টকটকে লাল সাটিনের এক পোশাক—সবার ওপরে আকাশি-নীল রঙের আরব্য-কোর্তা। গোটা পোশাকটাতেই সবুজ ঝালর বসানোর ফলে বিলক্ষণ ঝলমলে—কানের কাছে আছে সাত-সাতটা চোখ জুড়োনো পালক-বাহার।

পম্পির ঘাড়ে ভর দিয়ে এডিনার একটা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ল একটা মস্ত গথিক গির্জে। চুড়ো গিয়ে ঠেকেছে আকাশে। জানি না হঠাৎ মাথাটা কেন খারাপ হয়ে গেল। প্রবল ইচ্ছে হল, চুড়োয় উঠে—শহর দেখবো। নিয়তি যেন ঠেলে নিয়ে গেল আমাকে খোলা দরজার দিকে। কানের পালকে চোট না লাগিয়ে, দরজা গলে, চলে এলাম বারান্দায়। তারপর পা দিলাম

ঘোরানো সিঁড়ির ধাপে।

সিঁড়ি যেন আর ফুরোতেই চায় না। ঘুরছে তো ঘুরছেই। শেষই হয় না। পম্পির কাঁধে ভর দিয়ে উঠতে উঠতে জিভ বেরিয়ে গেল আমার। মাঝেমাঝে মনে হচ্ছিল, এ সিঁড়ির শেষই হয় তো নেই—শেষের ক'টা ধাপ নিশ্চয় উড়ে গেছে শূন্যে!

দম নেবার জন্যে যেই একটু দাঁড়িয়েছি, অমনি একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটে গেল। অ্যাকসিডেন্টই তো! নইলে ডায়না ইঁদুরের গন্ধ পাবে কেন?

পম্পিও বললে, তোবা! তোবা! ইঁদুরের গন্ধ পেয়েছে ডায়না! প্রুসিয়ান আইসিস নামে একটা ভারি মিষ্টি অথচ বেজায় কড়া গন্ধ অনেককেই বুঁদ করে তোলে আবার অনেকে টেরই পায় না। এ ঘটনাটাও তাই!

যাক, সিঁড়ি তাহলে শেষ হলো। আর তো মোটে তিন-চারটে ধাপ। তড়বড়িয়ে উঠে গেলাম। আগে উঠলো পম্পি—কোট লটপটিয়ে। তারপর আমি। আমার পা গিয়ে পড়লো ওর ঝাঁট-দেওয়া কোটের ওপর—সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে মুখ থুবড়ে পড়লাম ঘন্টাঘরের মেঝেতে। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে খামচে ধরলাম পম্পির চুলের গোছা। গোড়াশুদ্ধ কালো কোঁকড়া পশম উঠে এল হাতে। ঘেন্নায় ছুঁড়ে দিলাম ঘন্টার দড়ির দিকে। কী আশ্চর্য! দড়ির গায়ে দিব্বি সেঁটে গিয়ে পশম-কেশ দুলতে লাগল অল্প-অল্প। চেয়ে দেখি রোষকষায়িত লোচনে দুই চোখে বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে পম্পি ব্যাটাছেলে চেয়ে আছে আমার দিকে। তারপরেই পাঁজর-গুঁড়োনো এমন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো যে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল আমার। দড়িতে লেগে থাকা পশম-চুলকে ফিরিয়ে আনারও উপায় নেই—রয়েছে নাগালের বাইরে—জাভাদ্বীপের আদিবাসীরা এইভাবেই ভালুকের চুল ঝুলিয়ে রাখে কড়িকাঠে বাঁধা ঝুলন্ত দড়িতে—বছরের পর বছর, সেদিকে তাকিয়ে তোফা রাখে মেজাজ।

বিবাদ মিটে যাওয়ার পর এবার তৎপর হলাম যুৎসই জায়গার খোঁজে—যেখান থেকে দেখা যাবে এডিনা শহরের দিক দিগন্ত। এরকম একটা ঘুলঘুলি রয়েছে বটে গম্বুজ ঘরে—কিন্তু নাগালের বাইরে। পম্পিকে হুকুম করলাম তার নিচে দাঁড়িয়ে এক হাত মেলে ধরে সিঁড়ির একটা ধাপ বানাতে। সেই ধাপে পা দিয়ে উঠে তারপর দাঁড়ালাম ওর ঘাড়ে। এবার মুণ্ড গলে গেল ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে। দেখতে পেলাম এডিনার আকাশ।

মুণ্ডটা পুরোপুরি গলিয়ে দেওয়ার আগে হুকুম দিলাম ডায়নাকে—দেওয়াল ঘেঁষে যেন চুপচাপ বসে থাকে। হুকুম দিলাম পম্পিকেও—একদম নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু অবস্থায় থাকা চাই।

তারপর দেওয়ালের বাইরে মুণ্ডটাকে পুরো বের করে দিয়ে দেখলাম এডিনার অপূর্ব দৃশ্য। সে দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়ার দরকার নেই। এডিনবরা শহর যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই জানেন, এডিনা শহর কত সুন্দর।

আমি দেখলাম আর একটা অদ্ভুত সুন্দর জিনিস। আমি যে ঘুলঘুলি দিয়ে

মাথা গলিয়েছি, আসলে সেটা একটা প্রকাণ্ড ঘড়ির ডায়ালের ফোকর—নিচ থেকে দেখলে মনে হবে যেন চাবি ঢুকিয়ে ঘড়িতে দম দেওয়ার ফুটো। আসলে সেখান দিয়ে গলে গিয়ে ঘড়িওলা হাত বাড়িয়ে ঘড়ির কাঁটা ঠিক করে দেয়। কাঁটা দুটোকেও দেখতে পাচ্ছি—মুণ্ড ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। লম্বায় এক-একটা দশ থেকে বারো ফুট। চওড়ায় এক থেকে দেড় ফুট। ধারগুলো ছুরির মতো ধারালো—ইস্পাত জাতীয় কিছু দিয়ে তৈরি।

অতিকায় সেই ঘড়ি দেখে আমি হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলাম তো তাকিয়েই রইলাম। কতক্ষণ যে এইভাবে হতভম্ব (এবং মুগ্ধ) হয়েছিলাম—সে হিসেব আপনাকে দিতে পারবো না। তবে একবারই সম্বিৎ ফিরেছিলো পম্পি রাসকেলের গোঙানি শুনে। আমার ভার আর সে সইতে পারছে না—এবার নেমে এলে হয় না? মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে গেছিল সঙ্গে সঙ্গে। যা মুখে এসেছিল, তাই বলে গেছিলাম। সে সব কথা লিখলে পাঠককে কুশিক্ষা দেওয়া হবে বলে লিখলাম না। গালাগাল খেয়ে পম্পি একদম বোবা মেরে যেতে আমি আবার মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইলা· এডিনার দিকে। এত উঁচু থেকে শহরের সব কিছু এক নজরে দেখবার সৌভাগ্য ক'জনের হয়?

হঠাৎ চমক ভাঙল ঘাড়ের ওপর শীতল স্পর্শে। এত উঁচুতে ঘুলঘুলির বাইরে আমার গলায় হাত দেয় কে রে?

তারপরেই অবাক হয়ে গেলাম কাঁটার কাণ্ড দেখে! অতিকায় ঘড়ির দানবিক কাঁটা-যুগলের একটি টিকটিক করতে করতে এসে ধারালো কিনারা ছুঁইয়েছে আমার গলায়!

আপদ কোথাকার! দিল আমার 'মুড' নষ্ট করে। একটা হাত ঘুলঘুলির বাইরে এনে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করলাম—কাঁটা কিন্তু টিকটিক করতে করতে আর একটু চেপে বসলো চামড়ার ওপর। এবার লাগালাম দু'হাত। নিষ্ফল চেষ্টা। কাঁটা টিকটিক করতে করতে ধারালো ফলা দিয়ে চামড়া ফেটে ঢুকে গেল ভেতরে।

এরকম নচ্ছার কাঁটা তো দেখিনি। দু'হাত দিয়ে যতই ঠেলি, আসুরিক শক্তির পাল্টা ঠেলা দিয়ে কাঁটা ততই চেপে বসতে থাকে গলার ওপর।

এত চাপ আমার চোখ সইতে পারবে কেন? একটা চোখ কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে গিয়ে ডায়ালের খাঁজে আটকে গিয়ে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইল আমার দিকে! আমারই চোখের এহেন ধৃষ্টতা সইতেও পারছি না—কিছু করতেও পারছি না। এতদিন যে কাজ একই সঙ্গে করে গেছে দু'চোখ—এখন তার ঘটছে ব্যতিক্রম। একটা চোখ চেয়ে আছে আর একটা চোখের দিকে। অসহ্য!

চোখাচোখির এই বিড়ম্বনায় বুঁদ হয়েছিলাম বলেই টের পাইনি—সময়-খড়্গ মানে ঘড়ির কাঁটা আমার গলার আধখানা কেটে দিব্বি গ্যাঁট হয়ে বসে গেছে।

বড় পুলক জাগল মনে। গান ধরলাম মনের সুখে। দামি দামি কবিতাও আবৃত্তি করে ফেললাম। তারপর অবশ্য চুপ করে গেলাম আর একটা চোখ চাপের চোটে কোটর থেকে ছিটকে গিয়ে ঘড়ির খাঁজে আটকে যাওয়ায়।

এখন আমারই একজোড়া চোখ আমার দিকে প্যাটপ্যাট করে চেয়ে আছে নির্লজ্জের মতো! বেহায়া কোথাকার!

আধকাটা গলা সমেত মুণ্ডটাকে নিচ থেকে টেনে বের করে নেওয়ার জন্যে হুকুম দিলাম পম্পিকে। সে বললে, একটু আগে অনেক গালাগাল খেয়ে একচুলও নড়বে না প্রতিজ্ঞা করেছে—সুতরাং নড়বে না কিছুতেই।

ডাকলাম ডায়নাকে। সে-ও জানালে, মনিবের হুকুম ছিল দেওয়ালের ধার ঘেঁষে বসে থাকা। তাই সে আছে। থাকবেও!

যাচ্চলে! এদিকে কাঁটা-কৃপাণ পড়পড়িয়ে গলা প্রায় দু'টুকরো করে এনেছে। টিকটিক করতে করতে পুরোপুরি দু'খানা করে দিয়ে বেরিয়ে যেতেই ভারি মুণ্ডটা গড়িয়ে গিয়ে আটকে গেল চোখ দুটোর ওপর।

যা! মুণ্ড গেলে রইল কি! এবার তাহলে ফেরা যাক। সুরুৎ করে মুণ্ডহীন কবন্ধ গলিয়ে আনলাম ঘুলঘুলির মধ্যে থেকে।

পম্পি হারামজাদা আমার মুণ্ড নেই দেখেই পড়পড়িয়ে পালিয়ে গেল ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে। নেমকহারাম কোথাকার!

ডায়নার দিকে তাকিয়ে দেখি, কোথায় ডায়না! ও তো ডায়নার ভূত! লম্বা চুল আর হাড়ের স্তূপের পাশ থেকে সুট করে সরে গেল ইঁদুর!

ডায়না মনিবের হুকুম তামিল করেছে—এখনও করছে। ইঁদুরের খাদ্য হয়েছে, ভূত হয়েছে, এখন চেয়ে আছে আমার দিকে।

এই ঘণ্টাঘরে! [ ]

মরার আগেই মড়ার দলে

[দ্য প্রিম্যাচিওর বেরিয়াল]

কিছু বিষয় আছে যা মানুষকে আবিষ্ট করে রাখে, কিন্তু সেগুলো এমনই ভয়াবহ যে তাদের নিয়ে গল্প-উপন্যাস ফাঁদা যায় না। ইতিহাসে অবশ্য লোমহর্ষক ঘটনা আছে বিস্তর; যেমন, লণ্ডনের প্লেগমহামারী, লিসবনের ভূমিকম্প, কলকাতার অন্ধকূপ হত্যা (১২৩ জন দম আটকে মরেছিল)—তবে এ সব ঘটনা বিষম বিতৃষ্ণায় সরিয়ে রাখাই বাঞ্ছনীয়।

তবে জ্যান্ত কবরস্থ হওয়ার মত দুর্দৈব মানুষের কপালে যেন না ঘটে। অথচ তা ঘটেই চলেছে। চিন্তাশীল মানুষরা সে খবর রাখেন বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতেও পারেন না। জীবন আর মরণের মাঝখানের দেওয়ালটা তো আজও ছায়াচ্ছন্ন, আবছা ধারণা দিয়ে তৈরি। ঠিক কোনখানে শেষ হয়েছে একটা, শুরু হয়েছে আর একটা—কেউ তা ঠিকভাবে জানে না। এমন সব রোগের খবর আমরা জানি যারা প্রাণের কলকব্জা এমনভাবে বিগড়ে রেখে দেয়—বাইরে থেকে দেখে মনে হয় যেন পুরো যন্ত্রটাই গেছে বরবাদ হয়ে। অথচ কলকব্জার এহেন বৈকল্য সাময়িক ছাড়া কিছুই নয়। দুর্বোধ্য যন্ত্রপাতি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে থাকে কিছুক্ষণের জন্যে। তারপরেই রহস্যময় কি এক কানুন ফের তাদের চালু করে দেয়, চাকায় চাকা লেগে যায়, জাদু-যন্ত্র ঘুরতে শুরু করে। রুপোর সুতোয় বাঁধা আত্মা শরীরের খাঁচা থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যায় না ঠিকই—কিন্তু কলকব্জা বন্ধ

থাকার সময়ে আত্মা মহাশয় থাকে কোথায়? প্রশ্ন তো সেইটাই। জবাবও মেলেনি আজ পর্যন্ত।

এরকম একটা ঘটনার কথা বলা যাক। বাল্টিমোরের এক নামী আইনবিদের বউ হঠাৎ অদ্ভুত এক রোগে ভুগে মারা গেলেন—লক্ষণ দেখে মৃত্যু বলেই মনে হয়েছিল। চোখ নিষ্প্রভ, ঠোঁট মার্বেল পাথরের মত সাদা, গায়ে তাপ নেই, নাড়িও বন্ধ। ডাক্তাররা তো বলবেনই, রুগী আর বেঁচে নেই। তিনদিন মড়া পড়েছিল। সারা শরীর পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছিল। তারপর পচনের পূর্বাভাস দেখা দিতেই তাঁকে গোর দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

এই ফ্যামিলির নিজস্ব গোরস্থান ছিল পাতাল ঘরে। সেখানকার একটা উঁচু তাকে কফিন শুইয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসেন সবাই। বন্ধ হয়ে যায় লোহার দরজা। তিন বছর পরে আর একটা শবাধার ঢোকানোর জন্যে লোহার দরজা টেনে খুলতেই খড়মড় কড়মড় শব্দে সাদা চাদর জড়ানো আস্ত একটা নরকঙ্কাল এসে পড়ে বিপত্নীক সেই আইনবিদের দু-বাহুর মধ্যে। কঙ্কালটা তাঁরই মরা বউয়ের!

বউকে তো কফিনে পুরে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল উঁচু তাকে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে লোহার দরজায় ঝুলছেন কি করে? জবাবটা জানবার পর মাথার চুল খাড়া হয়ে গেছিল প্রত্যেকেরই।

কবর দেওয়ার দিন দুই পরেই নিশ্চয় মড়ার মতো দেহতে প্রাণের চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। হাত-পা ছুঁড়তেই নিশ্চয় উঁচু তাক থেকে কফিন নিচে গড়িয়ে পড়ে ভেঙে গেছিল। একটা জ্বলন্ত লম্ফ ভুল করে রেখে যাওয়া হয়েছিল পাতাল-ঘরে। ভদ্রমহিলা সেই লম্ফ নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে কফিনের কাঠ দিয়ে লোহার পাল্লা ঠুকে পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন; কেননা কফিনের ভাঙাচোরা কাঠ ছড়িয়ে পড়েছিল সিঁড়ির ওপর। তারপর নিশ্চয় জ্ঞান হারিয়েছিলেন বিষম আতঙ্কে, অথবা শেষ পর্যন্ত মারাই গেছিলেন—সাদা বস্ত্র লোহার পাল্লার খোঁচায় আটকে যাওয়ায় বস্ত্রাবৃত দেহ তিন বছর ধরে ঝুলে থেকে সাদা কঙ্কাল হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েই ছিল এতদিন!

ইংরেজিতে অত্যাশ্চর্য ঘটনাকেই বলা হয় Truth is stranger than fiction; এই রকমই একটা সত্যি ঘটনা না লিখেও পারছি না। 1810 সালে ফ্রান্সের এক ডানাকাটা পরীর দেহ গ্রামের গোরস্থানে কবর দেওয়া হয়। পরমাসুন্দরী এই তরুণী বিয়ের আগে ভালবাসত এক গরিব সাহিত্যিক-সাংবাদিককে। কিন্তু সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে তো আর লেখক বিয়ে করে বংশের নামে কালি ছিটোতে পারে না—তাই বিয়ে করেছিল সমাজ-শিরোমণি এক ধনকুবেরকে। কিন্তু বরের কাছে আদর তো দূরের কথা, অসম্মান আর নির্যাতন ছাড়া কিছু পায়নি। মারাও যায় মনে অনেক কষ্ট নিয়ে। তাকে গোর দেওয়া হয় শহর থেকে অনেক দূরে।

প্রেম-পাগল এই যুবকটি রাত্রি নিশীথে গেছিল সেই গোরস্থানে। কবর খুঁড়ে প্রেমিকার মাথার চুল কেটে নিয়ে নিজের কাছে রাখার মতলব ছিল। কিন্তু চুল

কাটতে যেতেই দু'চোখ খুলে তাকিয়ে ছিল ডানাকাটা সেই পরী!

ভীষণ ভড়কে গিয়েও চম্পট দেয়নি দুঃসাহসী লেখক। মেয়েটিকে এনে তোলে গ্রামের সরাইখানায়—নিজের ঘরে। পাঁচন-টাচন খাইয়ে প্রেমিকাকে চনমনে করে নিয়ে দুজনে মিলে পালায় আমেরিকায়।

মেয়েটি হিসেবী হতে পারে—হৃদয়হীনা নয়। যে বর তাকে জ্যান্ত কবর দিয়েছে, তার সঙ্গে ঘর করতে আর চায়নি। কুড়ি বছর ঘর করেছে লেখকের সঙ্গে। তারপর ভেবেছিল, এবার ফেরা যাক ফ্রান্সে—কুড়ি বছরে চেহারা অনেক পালটেছে—খানদানী বর এখন দেখলেও চিনতে পারবে না।

কিন্তু প্রথম দর্শনেই মরা বউকে চিনে ফেলেছিল ধনকুবের ভদ্রলোক। বউ বলে দাবিও জানিয়ে ছিল।কিন্তু কোর্ট তা গ্রাহ্য করেনি। কুড়ি বছরে আইনগতভাবেই চলে গেছে স্বামীর অধিকার।

গায়ে কাঁটা-দেওয়া আর একটা ঘটনা এসে যাচ্ছে কলমের ডগায়। ভদ্রলোক ছিলেন গোলন্দাজ বাহিনীর অফিসার, পেটাই স্বাস্থ্য। অবাধ্য, দুরন্ত এক ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে গেছিলেন। প্রচণ্ড চোট লাগে মাথায়। অজ্ঞান হয়ে যান সঙ্গে সঙ্গে। মাথার খুলি সামান্য ফেটে গেছিল। কিন্তু প্রাণ নিয়ে টানাটানির কোনো ভয় সেই মুহূর্তে অন্ততঃ ছিল না। রক্তমোক্ষণ করা হয়েছিল খুলি ফুটো করে। আরও অনেক স্বস্তির ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও ভদ্রলোক একটু একটু করে নেতিয়ে পড়ছিলেন, শেষকালে যখন একেবারেই ন্যাতা হয়ে গেলেন, তখন ধরে নেওয় হল—তিনি মারা গেছেন।

আবহাওয়া তখন বেশ উষ্ণ।তড়িঘড়ি তাঁকে কবর দেওয়া হলো সাধারণ সমাধিক্ষেত্রে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়ে গেল বেস্পতিবার। পরের রোববার স্বাভাবিক ভাবেই লোকজনের ভিড় হয়েছিল গোরস্থানে। এমন সময়ে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল এক চাষী। সে বেচারী বসেছিল সদ্যগোর দেওয়া গোলন্দাজ অফিসারের কবরের মাটিতে। স্পষ্ট শুনেছে, মাটির তলায় কে যেন ধস্তাধস্তি করছে। প্রথমে কেউ তার কথায় কর্ণপাত করেনি। তারপর চাষীর ভয়ানক আতঙ্ক দেখে খটকা লাগে। কোদাল আনা হয়। তড়িঘড়ি গোর দেওয়া হয়ে ছিল বলে গর্ত বেশি গভীর করা হয়নি। অল্প খুঁড়তেই দেখা গেল কফিনের ডালা। কিন্তু একী! ডালা যে আধখোলা—খানিকটা উঁচু হয়ে রয়েছে! অফিসার ভদ্রলোকও শুয়ে নেই—আধবসা অবস্থায় রয়েছেন, ঠেলেমেলে ডালা তুলেছেন নিশ্চয় তিনি—মাটি আলগা ছিল বলেই তা পেরেছেন। কিন্তু জ্ঞান নেই।

না থাক। তক্ষুনি তাকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। জানা গেল, ভদ্রলোক মোটেই মরেননি—শুধু দম আটকে রয়েছে। ঘণ্টাকয়েক পরে নিঃশ্বেস-টিশ্বেস নিয়ে তিনি পরিচিতদের চিনতে পারলেন, ভাঙা ভাঙা কথায় বললেন, কবরবাসের যন্ত্রণা।

কবর দেওয়ার সময়ে তাঁর নাকি ঘণ্টাখানেক টনটনে জ্ঞান ছিল। তারপর আর কিছু মনে নেই। কফিনের ওপর ঝুরো মাটি চাপা দেওয়ায় অনেকটা বাতাসও

থেকে গেছিল ভেতরে। সেইটাই বাঁচোয়া। অনেক লোকের হুটোপাটি চলছে মাথার ওপর, এইটা যখনি টের পেয়েছেন—অমনি ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে গেছেন। কফিনের ডালায় মাথা আটকে যেতেই গায়ের জোরে ডালা তুলেছিলেন ওপর দিকে।

একটু একটু করে এই রুগী সম্পূর্ণ সুস্থহয়ে উঠলেও শেষকালে কিছু হাতুড়ের পাল্লায় পড়েছিলেন, নানারকম ডাক্তারি এক্সপেরিমেণ্ট চালানো হয় ভদ্রলোকের ওপর। গ্যালভানিক ব্যাটারির প্রয়োগও ঘটে। মাঝে মাঝেই তড়কা দেখা দিত এই অবস্থায়। এই রকমই এক প্রচণ্ড খিঁচুনিতেই প্রাণবিয়োগ ঘটে অফিসারের।

গ্যালভানিক ব্যাটারির কথা লিখতে গিয়ে লণ্ডনের এক অ্যাটর্নির কথা মনে পড়ছে। দুদিন তাঁকে কফিনের মধ্যে কবরখানায় ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল। গ্যালভানিক ব্যাটারি তাঁর দেহে প্রাণের সাড়া এনে দিয়েছিল। এ ঘটনা ঘটে ১৮৩১ সালে। হইচই পড়ে যায় বিভিন্ন মহলে।

ভদ্রলোকের নাম এডোয়ার্ড স্টেপলটন। মারা গেছিলেন টাইফাস জ্বরে। কিন্তু বিশেষ কয়েকটা অনামা লক্ষণ দেখে কৌতূহলী হয়েছিলেন চিকিৎসক মহল। তাই পোস্টমর্টেম করার অনুমতি চেয়েছিলেন স্টেপলটনের বন্ধুদের কাছে। অনুমতি পাওয়া যায়নি। ডাক্তাররা তখন ঠিক করলেন, সোজা আঙুলে যখন ঘি উঠল না, তখন আঙুল বেঁকিয়ে ঘি তুলবেন; অর্থাৎ কাকপক্ষীকে না জানিয়ে কবর থেকে মড়া তুলে আনবেন।

কবরচোরের অভাব ছিল না লণ্ডন শহরে। তারাই ডেডবডি এনে শুইয়ে দিয়ে গেল একটা প্রাইভেট হাসপাতালের অপারেটিং চেম্বারের টেবিলে। কবরস্থ হওয়ার তৃতীয় রাত্রে কফিনস্থ ব্যক্তির পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল টেবিলে।

তলপেটের চামড়া চিরে ফেলা হয়েছিল গ্যালভানিক ব্যাটারির চার্জ দেওয়া হবে বলে। শরীরে যখন পচনের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না—তখন তো চার্জ দেওয়াই দরকার। ইলেকট্রিক চার্জে মড়াও ধড়ফড়িয়ে ওঠে—এক্ষেত্রে ধড়ফড়ানিটা যেন অনেকটা জ্যান্ত ধড়ফড়ানি বলে মনে হয়েছিল।

রাত গভীর হলো। তারপর ভোরের আলো দেখা দিল। ধৈর্য ফুরিয়ে এল পরীক্ষকদের। এক ছোকরা ডাক্তার তখন নিজস্ব একটা পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়েছিল। বুকের কাছে মাংস খানিকটা চিরে, তার মধ্যে গ্যালভানিক ব্যাটারির চার্জ দিতেই, স্টেপলটন আর ধড়ফড় না করে সোজা উঠে বসেছিলেন, টেবিলে থেকে নেমে এসে ছোকরার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্পষ্ট কিন্তু জড়িত গলায় কি যেন বলেই ধড়াস করে মেঝেতে পড়ে গেছিলেন।

থ হয়ে গেছিল ঘরশুদ্ধ লোক। তারপরেই শুরু হল হুটোপাটি। স্টেপলটনকে ফের শোয়ানো হল টেবিলে। দেখা গেল, তিনি দিব্বি বেঁচে রয়েছেন। তবে জ্ঞান নেই। ইথার শুঁকিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে এনে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল আত্মীয়স্বজনের কাছে—শুধু বলা হয়নি, কিভাবে তাঁর পুনর্জন্ম ঘটেছে।

এ ঘটনার সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অংশ এইটা : স্টেপলটন আগাগোড়া

জানতেন তাঁকে নিয়ে কি-কি করা হয়েছে। পুরো জ্ঞান হারাননি একেবারেই। কিন্তু মাথার মধ্যে যেন সব তালগোল পাকিয়েছিল। আবছাভাবে টের পাচ্ছিলেন, ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে গেলেন, মহাসমারোহে তাঁকে কবরস্থ করাও হল, কবরে শুয়ে রইলেন দুদিন দুরাত, তারপর উঠিয়ে এনে শোয়ানো হল লাশকাটা টেবিলে। বুকে তড়িৎপ্রবাহ বয়ে যেতেই তাঁর মুহ্যমান অবস্থা চকিতে কেটে গেছিল। নেমে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—'আমি তো বেঁচে আছি!'

এই ঘটনাগুলো থেকেই বিশ্বাস হয়, বহু ক্ষেত্রেই মানুষকে কবর দেওয়া হয়েছে মরে যাওয়ার আগেই। কবর খুঁড়ে অনেক সময়ে দেখাও গেছে, কঙ্কালদেহ যেভাবে থাকার কথা—সেভাবে নেই। ব্যাপারটা অতীব সন্দেহজনক নয় কি? জ্যান্ত কবরে শুয়ে টনটনে জ্ঞান নিয়ে একটা মানুষ যখন বুঝতে পারে, ছোট্ট এই কালো ঘর থেকে ইহজীবনে সে আর বেরোতে পারবে না, ভিজে মাটির গন্ধ শুঁকতে হবে আরও কিছুক্ষণ, তারপর পোকা এসে কুরে কুরে ভোজ শুরু করবে তার জ্যান্ত দেহটা নিয়ে—তখন যে বিভীষিকা জাগে সেই মানুষটার মনের মধ্যে—তার চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছু কি হতে পারে?

এবার বলি, ঠিক এই রকমই ঘটনা আমারই জীবনে ঘটেছিল কোথায়, কিভাবে।

আমার একটা অদ্ভুত ব্যায়রাম বেশ কয়েক বছর ধরে, ধোঁয়ার মধ্যে রেখেছিল ডাক্তারদের। সঠিক রোগের হদিশ ধরতে না পেরে তাঁরা উৎপাতটার নাম দিয়েছিলেন মূর্চ্ছারোগ। মূর্চ্ছারোগের উৎস আর সঠিক নিদান আজও রহস্যে ঢাকা থাকলেও রোগের চরিত্রটা বিলক্ষণ সুস্পষ্ট। মাত্রাভেদেই কেবল রোগের তারতম্য ধরা যায়, রুগী কখনও একদিন, কি তারও কম সময়, গোঁফ-খেজুড়ে কুঁড়ের মত শুয়েই কাটিয়ে দেয়; জ্ঞান থাকে না বটে, বাহ্যিক নড়াচড়াও থাকে না; কিন্তু হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণ ধুকপুকুনি টের পাওয়া যায়; গায়ের উষ্ণতা সামান্যভাবেও বোঝা যায়; দু'গালের ঠিক কেন্দ্রস্থলে ঈষৎ লালচে আভাও লেগে থাকে; ঠোঁটের কাছে আয়না ধরলে ধরা যায় এলোমেলোভাবে হলেও মৃদুমন্দ ভাবে ক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে ফুসফুসজোড়া। আবার হয়তো দেখা যায় ঘোর চলছে সপ্তাহের পর সপ্তাহ—কখনো মাসের পর মাস ধরে; নিপুণ চিকিৎসকও তখন নিশ্চিত মৃত্যু আর প্রাণময় জীবনের মাঝের বস্তুগত ব্যবধানটুকু ধরতে অক্ষম হন। শরীরে পচন ধরছে না বলে, আর আগেও এরকম মৃত্যুসম অবস্থা দেখা গেছে বলে বন্ধুবান্ধব আত্মীয় পরিজনরা রুগীর জীবন্ত কবর কোনমতে ঠেকিয়ে রেখে দেয়। কপাল ভালো, এ রোগের মাত্রা বৃদ্ধি পায় ধাপে ধাপে—প্রথম আক্রমণ থেকেই বিচিত্র এই ব্যাধি রুগীকে পুরোপুরি মৃতবৎ করে তোলে না—একটু একটু করে এক-একবারে বাড়তে থাকে উগ্রতা; কিন্তু যে অভাগার ক্ষেত্রে প্রথম চোটেই রোগের আক্রমণ হয় চূড়ান্ত রকমের—বহু ক্ষেত্রেই তা ঘটেও—রুগী তখন আচমকা মৃতবৎ জড় পদার্থে পরিণত হয়—তখন তাকে জীবন্ত কবর দেওয়াই হয়।

ডাক্তারী পুস্তকে লেখা রোগের বৃত্তান্ত যেরকম, আমার নিজের রোগও ছিল হুবহু সেইরকম। মাঝেমাঝেই ঝিম মেরে আধা-অচৈতন্যের মত পড়ে থাকতাম প্রাণোচ্ছল বন্ধুবান্ধব পরিবৃত অবস্থায়---তারপরেই আচমকা জ্ঞান টনটনে হয়ে উঠত। রোগের প্রকোপ দেখা দিত একটু একটু করে---ছেড়ে যেত হঠাৎ। আবার হয়তো আসতো হঠাৎ, শরীর ধুঁকতো, ঠাণ্ডায় কাঁপতাম, মাথা ঘুরতো---লম্বমান হতাম তৎক্ষণাৎ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমার সমগ্র সত্তা যেন নিঃসীম নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হয়ে থাকত---ব্রহ্মাণ্ড বলে তখন আর কিছুই থাকত না আমার চেতনায়---চেতনা ফিরতো ধীরে ধীরে.... ধীর পদক্ষেপে যেন অতিকষ্টে আড়মোড়া ভেঙে নিতান্ত অনিচ্ছুকভাবে বিদায় নিত বিচ্ছিরি ব্যাধি---তমিস্রা থেকে আলোয় ফিরে আসত আমার আত্মা বেচারা।

সমাধিস্থ হয়ে যাওয়ার এহেন প্রবণতা ছাড়া, আমার সাধারণ স্বাস্থ্য ছিল ভালোই। শুধু যা ঘুম ভাঙার পর চট করে কিছু মনে করতে পারতাম না, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকতাম মিনিট কয়েক, অনুভূতি-টনুভূতিগুলোকে বাগে আনতেই যেত কিছুটা সময়।

শরীরে কিন্তু যন্ত্রণা বোধ করতাম না, তবে মনটা নির্যাতিত হত সীমাহীনভাবে। মড়াখানার কল্পনায় বুঁদ হয়ে থাকতাম। কবর, পোকা আর সমাধিফলক নিয়ে ভাবতাম। জ্যান্ত কবরে যাওয়ার চিন্তা সব সময়ে কিলবিল করত মগজের মধ্যে। বীভৎস এই মৃত্যুর বিপদাশঙ্কা আমাকে দিবারাত্র তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়েছে। ঘুমোতে গিয়ে ভেবেছি, ঘুম ভাঙার পর দেখব নিশ্চয় কবরে শুয়ে আছি। যদিও বা ঘুমিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে রাশি রাশি ছায়াকালো দুঃস্বপ্ন আমাকে সারারাত আধপাগল করে রেখেছে।

অসংখ্য দুঃস্বপ্নের একটাই শুধু এখানে লিখে রাখি। সমাধিস্থ হওয়া পর ঘোর কেটে যায় এক শীতল হাতের ছোঁয়ায়---কপালে হাত রেখে অসহিষ্ণু জড়িত কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে ওঠে কানের কাছে---'ওঠো!'

সিধে হয়ে বসি তৎক্ষণাৎ। অন্ধকার এত নিরেট যেন ছুঁচ ফোটাতে গেলেও ঢুকবে না। যার হুকুমে ঘোর ছুটে গেছে, তাকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। ঘোর শুরু হয়েছিল কখন, কতক্ষণ ছিলাম ঘোরের মধ্যে---কিছুই আর মনে করতে পারছি না। এমন কি আছি কোন চুলোয়, সে খেয়ালও নেই। নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে স্মৃতিকে জাগ্রত করার চেষ্টা যখন করছি, হিমশীতল সেই হাত এবার কব্জি চেপে ধরল নিষ্ঠুরভাবে, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে বললে---'ওঠো! কথাটা কানে গেল না?'

তেড়ে উঠেছি আমিও---'কে হে তুমি?'

নিমেষে বিষাদমগ্ন হয়ে যায় কণ্ঠস্বর---'যে অঞ্চলে আমার নিবাস---সেখানে আমার নেই কোনো নাম। মরলোকে ছিলাম, এখন আমি পিশাচ। ছিলাম নির্মম, এখন আমি মরমী। বুঝতেই তো পারছো, কাঁপছি ঠকঠক করে। ঠোকাঠুকি লাগছে দাঁতে দাঁতে---অথচ এ শিহরণ সীমাহীন এই রজনীর নিঃসীম শৈত্যের জন্যে নয়। তবে অসহ্য এই শ্রীহীন কদাকার রূপ। এত প্রশান্তি নিয়ে ঘুমোচ্ছো

কি করে? এত মর্মবেদনার হাহাকারের মধ্যে আমার তো কই ঘুম আসছে না। যা দেখছি, তা তো সহ্য করতে পারছি না। ওঠো! এসো বাইরের রাতে। খুলে দিই কবরের দ্বার তোমার সামনে। দেখো! দেখো! এর চেয়ে অসহ্য দুঃখের দৃশ্য আর দেখেছো?'

দেখলাম। অদৃশ্য সেই হস্ত আমার মণিবন্ধ খামচে ধরে রেখেই মানুষ জাতটার সমস্ত কবরের দ্বার খুলে দিয়েছে এক লহমায়। প্রতিটি কবরের মধ্যে থেকে উঠে আসছে পচনের ক্ষীণ ফসফরাস দ্যুতি। তাই দেখতে পাচ্ছি ভেতর পর্যন্ত—দেখতে পাচ্ছি পোকায় পরিবৃত শ্বেতবস্ত্রে আবৃত বিষণ্ণ মূর্তির পর মূর্তি। চিরনিদ্রায় শায়িত প্রত্যেকেই। লক্ষ লক্ষ এই শবের সবাই কিন্তু ঘুমোচ্ছে না। আড়ষ্ট দেহগুলোকে কফিনে যেভাবে শোয়ানো হয়েছিল—এখন আর সেভাবে শুয়ে নেই অনেকেই। নড়াচড়ার চাপা খসখস শব্দও কানে ভেসে আসছে। আমি যখন বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে দেখে যাচ্ছি এই দৃশ্য, তখন কানের কাছে আবার ধ্বনিত হল সেই কণ্ঠস্বর ঃ

'বলো···· বলো····· করুণ এই দৃশ্য কি সহ্য করা যায়?' এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, আমার কব্জি খসে পড়ল তার শক্ত শীতল মুঠো থেকে—আচমকা একযোগে প্রচণ্ড শব্দে বন্ধ হয়ে গেল সব ক'টা সমাধি দ্বার—কানের কাছে হাহাকার রয়ে গেল শুধু অন্তহীন হতাশার মতন ঃ 'বলো···· বলো····· করুণ এই দৃশ্য কি সহ্য করা যায়?'

রাতের এই কল্প-বিভীষিকার রেশ গড়িয়েছে দিনেও। নার্ভের এমনই দফারফা ঘটেছে যে জাগ্রত অবস্থায় নিরন্তর নিমজ্জিত থাকতাম বিভীষিকা-পঙ্কে। বাড়ি থেকে বেশি দূর যেতে চাইতাম না। যারা আমার মৃগীরোগের বৃত্তান্ত জানে, তাদের কাছছাড়া হতে চাইতাম না এই কারণে যে যদি রোগ আমাকে বেহুঁশ করে ফেলে—তাহলে যেন এদের কৃপায় জ্যান্ত কবরস্থ না হই। সর্বক্ষণ ভয় হত, রোগটা এমন বেঁকা পথে আচমকা এসে যেতে পারে যখন লক্ষণ দেখে মনে হবে আমি বুঝি মরেই গেছি—রোগ আর বিদায় নেবে না ইহজীবনে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়পরিজন এই সুযোগে আমার মত মূর্তিমান একটা উপদ্রবকে কবরে ঢুকিয়ে দিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও তো করতে পারে। ভয়টা যে অমূলক, সে ব্যাপারে বৃথাই আমাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে গেছে সবাই। প্রত্যেককে দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছিলাম—এরকম নিঝুম অবস্থায় যদি কখনো পড়ি—তাহলে শরীর বেশ পচে যাওয়ার আগে যেন আমাকে কবরে ঢোকানো না হয়। তা সত্ত্বেও আমার ভয় কমেনি। তাই কয়েকটা ব্যবস্থাও করে রেখেছিলাম। ফ্যামিলি সমাধিক্ষেত্র যাতে ভেতর থেকে খোলা যায়—সে ব্যবস্থা করেছিলাম। লম্বা একটা ডাণ্ডায় সামান্য চাপ দিলেই যাতে লোহার দরজা দড়াম করে খুলে যায়—সেইভাবে ডাণ্ডাটাকে সমাধির ভেতরে অনেকটা ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল। আলো আর বাতাসের যাতে অভাব না ঘটে, সেদিকে নজর দিয়েছিলাম। যে কফিন আমার জন্যে বানিয়ে রেখেছি, তার মধ্যে থেকে হাত বাড়ালেই যাতে

খাবারের পাত্র আর পানীয় জলের আধারে হাত ঠেকে, সে আয়োজনও করে রেখেছিলাম। কফিনের ভেতরটা নরম গদী দিয়ে মোড়া হয়েছিল, একটু নড়লেই যাতে স্প্রিং-য়ে চাপ লেগে ডালা খুলে যায়। সমাধিক্ষেত্রের ছাদ থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল একটা ঘণ্টার দড়ি—দড়ির প্রান্ত ছিল কফিনের মধ্যে—ব্যবস্থা হয়েছিল শবের কব্জিতে বাঁধা থাকবে সেই দড়ি। কিন্তু নিয়তি এমনই নিষ্ঠুর যে এত ব্যবস্থা সত্ত্বেও মরণাধিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল আমাকেই।

ঘোর কেটে যাচ্ছে, চোখের পাতা মেলতে পারছি না, কিছু মনে করতে পারছি না—এই সব অনুভূতি পাথরের মত ভারি মগজে একটু একটু করে জেগে উঠতেই এইটুকু শুধু বুঝেছিলাম—রোগ ফের জাঁকিয়ে বসেছিল—নইলে এমন অবস্থা হবে কেন।

সভয়ে জোর করে চোখ মেলেছিলাম। তমাল কালো তমিস্রা ছাড়া কিছুই দেখতে পাইনি।

চেঁচাতে গেছিলাম—গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয়নি। ঠোঁট আর জিভ শুকিয়ে গেছিল। বুকের মাঝে যেন পাহাড় চেপে বসেছিল। নিঃশ্বেস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল।

গলা ফাটিয়ে চেঁচানোর চেষ্টা করতেই চোয়াল নাড়তে হয়েছিল। তখনি বুঝলাম, পটি দিয়ে বাঁধা রয়েছে চোয়াল—শবের চোয়াল যেভাবে বাঁধা থাকে। শুয়ে রয়েছি শক্ত বস্তুর ওপর—দু'পাশেও রয়েছে সেই শক্ত বস্তু—দু'হাত আড়াআড়িভাবে রাখা ছিল বুকের ওপর—সজোরে ওপরে তুলতে গিয়েই ধাক্কা খেল মাত্র ইঞ্চি ছয়েক ওপরে থাকা সেই একই শক্ত বস্তুতে। এবার আর কোনো সন্দেহ রইল না। কফিনেই শোয়ানো হয়েছে এই অধমকে!

এরকম একটা সম্ভাবনার কথা ভেবেই তো তৈরি হয়েছি এতদিন। এবার কাজে লাগানো যাক ব্যবস্থাগুলোকে। নিরাশ হইনি মোটেই। জোরে ধাক্কা মেরেছিলাম কফিনের ডালায়। স্প্রিং কাজ করেনি—ডালা খোলেনি। হাতড়ে হাতড়ে খুঁজেছিলাম ঘণ্টার দড়ি—দড়ি পাইনি। ঠিক এই সময়ে নাকে ভেসে এসেছিল ভিজে মাটির গন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত হিম হয়ে গেছিল আমার। নিমেষে বুঝেছিলাম—রোগটা চড়াও হয়েছিল অচেনা মানুষদের মাঝে—তারা ভেবেছে আমি মরেই গেছি—তাই পাঁচজনের গোরস্থানে মাটির তলায় কফিন ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।কিন্তু কোন জায়গায় এ ঘটনা ঘটল, তা মনে করতে পারলাম না কিছুতেই।

এবারের আতঙ্ক আমার গলার মধ্যে দিয়ে হৃদয়বিদারক চিৎকার হয়ে বেরিয়ে এসেছিল—পাতালের মাটিও বুঝি শিউরে শিউরে উঠেছিল আমার সেই বিরামবিহীন আর্ত হাহাকারে। প্রথমবারে চেঁচাতে গিয়ে পারিনি—দ্বিতীয়বারের চেঁচানি বন্ধ করতেও পারিনি।

কর্কশ এক দাবড়ানি শুনেছিলাম কানের গোড়ায়—'আরে গেল যা! চেঁচায় কে?'

'ভূত দেখেছে নাকি?' দ্বিতীয় জনের মন্তব্য।

'বেরোও বাইরে!' তৃতীয় জনের হাঁক।

'রাত বিরেতে এমন চেঁচানি কেন?' চতুর্থ জনের মন্তব্য শেষ হতে না হতেই অনেকগুলো হাত আমাকে ধরে ঝাঁকিয়ে মাথার ঘিলু পর্যন্ত নড়িয়ে দিতেই সব মনে পড়ে গেল।

এ ঘটনা ঘটেছিল ভার্জিনিয়ার রিচমণ্ডের কাছে। জেমস নদীর পাড় বরাবর বন্দুক নিয়ে শিকার করতে বেরিয়েছিলাম আমার এক বন্ধুর সঙ্গে। রাত নামতেই ঝড় এসেছিল। পাড়ে নোঙর করা একটা সালতি নৌকোর ছোট্ট কেবিনে মাথা গোঁজার জায়গা পেয়েছিলাম। বাগানের মালমশলায় ঠাসা নৌকো। পাটাতনে ঘুমিয়ে পড়েছিল প্রত্যেকেই—আমি ঘুমিয়েছিলাম নৌকোর দুটি মাত্র বার্থের একটিতে। এটুকু নৌকোর বার্থ কি রকম হয়, তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। বিছানা ছিল না। মাত্র দেড়ফুট চওড়া জায়গায় চিৎ হয়ে শুয়েছিলাম বুকের ওপর দু'হাত আড়াআড়িভাবে রেখে—দু'ইঞ্চি ওপরে ছিল নৌকোর পাটাতন। ঘুমিয়েছিলাম অকাতরে। ঘুম ভাঙার পর অনেকক্ষণ কিছু মনে করতে না পারার ফলে আর জীবন্ত কবরস্থ হওয়ার নিরন্তর শঙ্কার ফলে মনে হয়েছিল কফিনেই শুয়ে আছি। নড়া ধরে নাড়িয়েছিল নৌকোর খালাসিরা। মালপত্তরের গন্ধ-কে মনে হয়েছিল ভিজে মাটির গন্ধ। চোয়ালে বাধা পটিটা আমারই সিল্ক রুমাল—নাইটক্যাপ না থাকায় তাই দিয়ে মাথা মুখ জড়িয়ে নিয়েছিলাম।

অকথ্য এই যন্ত্রণার ফলটা হল আশ্চর্যরকমের। ডেকে উঠে গিয়ে বেশ করে ব্যায়াম করে নদীর জলে স্নান করে নিতেই শরীর আর মন ঝরঝরে হয়ে গেল। যখন-তখন না-মরে-কবরে-যাওয়ার ভয় মন থেকে একেবারেই পালিয়ে গেল ডাক্তারি বই-টইগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পর থেকে। মড়াখানা নিয়ে আজেবাজে চিন্তাও ছেড়ে দিলাম। কিছুদিনের মধ্যেই আমি নতুন মানুষ হয়ে গেলাম। বিচিত্র ব্যাধি চম্পট দিয়েছে সেই থেকে—আর আমার কাছেও ঘেঁষে না। □

মড়ার মৃত্যু

[মেসমেরিক রিভিলেশন]

সম্মোহন ব্যাপারটা আর উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। উড়িয়ে দিতে যাঁরা চান, সব কিছুকেই বুজরুকি বলাটা তাঁদের স্বভাব। নিজের ইচ্ছাশক্তি একজন আর একজনের ওপর খাটাতে পারে—এই সত্যিটাকে প্রমাণ করতে যাওয়াটাও এখন সময়ের অপচয়। মনের জোর প্রয়োগ করে একজন আর একজনকে এমন একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসতে পারে, যে-অবস্থায় তাকে নিছক মড়া বলেই মনে হবে। মড়ার মতো শুয়ে থাকা মানুষটার ভেতরে তখন অদ্ভুত ক্ষমতা এসে যায়। শরীরের বাইরের অনুভূতি কমে আসে ঠিকই, কিন্তু অনেক সূক্ষ্ম, ধারালো আর জোরদার হয়ে ওঠে মনের ক্ষমতা। আশ্চর্যভাবে বেড়ে যায় ধীশক্তি। শরীরের যন্ত্রগুলোর ক্ষমতায় যা কুলোয় না—মন তখন তাই করে যায়—কিভাবে যে করে, তা আজও আমরা জানি না।

সম্মোহন ব্যাপারটায় বিশ্বাস আনানোর জন্যে কলম খুলে বসিনি। সম্মোহিত একজনের সঙ্গে আমার যা-যা কথা হয়েছিল, সেইটুকুই শুধু লিখে জানাবো পাঠকদের।

মিঃ ভ্যানকার্ক নামে এক ভদ্রলোককে প্রায় সম্মোহন করতাম। যক্ষ্মারোগে সম্মোহিত অবস্থায় আরাম পেতেন। এ মাসের পনেরো তারিখে, বুধবার, রাত্তির বেলা ডেকে পাঠালেন আমাকে।

খাট ছেড়ে নড়বার ক্ষমতা নেই ওঁর বেশ কয়েক মাস ধরে। আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন বুকের কষ্টটা আরও বেড়েছে।লক্ষণগুলো কিন্তু সবই হাঁপানি রোগের। যে দাওয়াই দিলে অন্য সময়ে কষ্ট কমতো, এখন আর তাতেও কাজ হচ্ছে না।

শরীরে এত যন্ত্রণা নিয়েও আমাকে কিন্তু অভ্যর্থনা জানালেন প্রফুল্ল হাসি হেসে। বুঝলাম, শরীর বজ্জাতি করলেও মনটাকে মুঠোর মধ্যে রেখেছেন এখনও।

বললেন—'শরীরটাকে আরাম দেওয়ার জন্যে আপনাকে ডেকে পাঠাইনি। আমার এই মনটার বাড়তি ক্ষমতা আমাকে যেমন অবাক করেছে, তেমনি উদ্বেগেও ফেলেছে। আপনি জানেন, আত্মা অমর কিনা, এই সম্পর্কে বিস্তর বই পড়ে ফেলেছি। দেখেছি, বইগুলো যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা নিজেরাও ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছেন। আপনি যখন আমাকে সম্মোহন করেন, তখন দেখেছেন মন অস্বাভাবিক রকমের তুখোড় হয়ে ওঠে। বেড়ে যায় বুদ্ধি, যুক্তি, জ্ঞান। যখন সম্মোহিত থাকি না, তখনও তার রেশ থেকে যায় মনের মধ্যে। তাই ঠিক করেছি, সম্মোহনের ঘোরে কঠিন কিছু প্রশ্নের জবাব দেবো—দেখা যাক কী উত্তর দিতে পারি।'

এক্সপেরিমেন্টে রাজি হলাম। হস্তচালনা করে সম্মোহনের ঘুম এনে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সহজ হয়ে এলো মিঃ ভ্যানকার্কের শ্বাসপ্রশ্বাস। শরীরে যেন আর কোনো যন্ত্রণা নেই। তারপর ওঁর সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হলো, তা লিখছি নিচে। 'ভ' মানে উনি, 'প' মানে আমি।

প : ঘুমোচ্ছেন?

ভ : হ্যাঁ—না; আরও গভীর ঘুম ঘুমোতে চাই।

প : [আরও কয়েকবার হস্তচালনার পর] এবার ঘুমোচ্ছেন তো?

ভ : হ্যাঁ।

প : আপনার এই রোগভোগের পরিণাম কী হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

ভ : [বেশ কিছুক্ষণ দ্বিধা করার পর কথা বললেন খুব কষ্ট করে] মারা যাবো।

প : মারা যাবেন জেনে কি আপনি বিচলিত?

ভ : [ঝটিতি] না—না।

প : তবে কি খুশি?

ভ : জেগে যদি থাকতাম, মরতেই চাইতাম। কিন্তু সম্মোহনের এই ঘুম মৃত্যুর সামিল। তাইতেই আমি খুশি।

প : আরও একটু খুলে বলুন।

ভ : বুঝিয়ে বলতে গেলে আপনার প্রশ্নটা ঠিকমত হওয়া দরকার।

প : তাহলে বলুন প্রশ্ন করবো কিভাবে?

ভ : শুরু থেকে শুরু করুন।

প : শুরু! কিন্তু শুরু-টা কোথায়?

ভ : ভগবান। সেই হলো শুরু। আপনি নিজেও তা জানেন। [খুব ধীরে, খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে গেলেন মিঃ ড্যানকার্ক]

প : তাহলে বলুন, ভগবান মানে কী?

ভ : [অনেক দ্বিধার পর] জানি না।

প : ভগবান-ই কি আত্মা?

ভ : জেগে যখন ছিলাম, তখন 'আত্মা'র এই মানে বুঝতে পারতাম তখনকার জ্ঞান দিয়ে। এখন শুধু একটা শব্দ-ই মাথায় আসছে। সত্য বা সৌন্দর্য—নিছক গুণ ছাড়া যা কিছুই নয়।

প : তবে কি ভগবান অ-বস্তু?

ভ : অ-বস্তু জিনিস বলে কিছু থাকলে তো! অবস্তু শব্দটা নেহাৎই একটা শব্দ। যা বস্তু নয়—তা কিছুই নয়—যতক্ষণ না গুণগুলোকে বস্তু বলা যায়।

প : ভগবান কি তাহলে বস্তু?

ভ : না। [জবাবটা চমকে দিলো আমাকে।]

প : তাহলে তিনি কী?

ভ : [বেশ কিছুক্ষণ বিরতি, তারপর বিড়বিড় বকুনি।] বলা মুসকিল। [আবার অনেকক্ষণের বিরতি।] উনি আত্মা নন, কারণ ওঁর অস্তিত্ব আছে। উনি বস্তুও নন, আপনি নিজেও তা বোঝেন। বস্তুর বহু স্তরভেদ আছে—মানুষ তার কিছুই জানে না। স্থূল ভেদ করে রয়েছে সূক্ষ্মকে—সূক্ষ্ম ছেয়ে রয়েছে স্থূলকে। যেমন ধরুন, বায়ুমণ্ডল ভেদ করে রয়েছে বিদ্যুৎ সূত্রকে—আবার বিদ্যুৎ সূত্র ছেয়ে রয়েছে বায়ুমণ্ডলকে। বস্তু যত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম হতে থাকে—ততই তার স্তরভেদ বেড়ে যেতে থাকে। তারপর বস্তুর এমন একটা অবস্থা আসে যখন আর তাকে ভাঙা যায় না—তা থেকে আর বস্তু বের করা যায় না—বস্তুকণাহীন বস্তু—অবিভাজ্য—এক; ভেদ করে থাকা আর ছেয়ে থাকার নিয়মও তখন পাল্টে যায়। এক এবং বস্তুকণাহীন বস্তু শুধু যে সব বস্তুকে ছেয়ে থাকে, তা নয়—সব বস্তুকে ভেদ করেও থাকে। সব বস্তুই তখন ভেতরে ভেতরে একই বস্তু হয়ে থাকে। ভগবান-ই এই বস্তু। মানুষ যাকে 'চিন্তা' বলে, তা এই বস্তুরই গতিময় অবস্থা।

প : দার্শনিকরা বলেন, সব ক্রিয়া-ই শেষ পর্যন্ত গতিবেগ পায় এবং চিন্তা হয়ে দাঁড়ায়; শেষেরটা প্রথমটার উৎস।

ভ : তা ঠিক; ধারণাটা কিভাবে গুলিয়ে রয়েছে, এখন তা বুঝলাম। গতিময়তা মনের ক্রিয়া—চিন্তার নয়। বস্তুকণাহীন বস্তু অথবা ভগবানকে মানুষ তার বোঝবার শক্তি দিয়ে বলে—মন। বস্তুকণাহীন বস্তু যেহেতু এক এবং সর্বত্র বিরাজমান, তাই তা স্বয়ং-চল। নিজেই নিজেকে গতিময় রাখে কিভাবে, তা জানি না—কোনোদিন জানতেও পারবো না। বস্তুকণাহীন বস্তু যখন নিজগুণে নিয়মে

সচল থাকে,তখন তা চিন্তা।

প : বস্তুকণাহীন বস্তুটা কী, তা আর একটু বুঝিয়ে বলতে পারবেন?

ভ : মানুষ যে বস্তুগুলো সম্পর্কে অবহিত, যদি সেইগুলোকেই স্তরভেদ করতে করতে অতি-সূক্ষ্ম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে তা অনুভূতি-ইন্দ্রিয়দের নাগালের মধ্যে আর থাকবে না। যেমন ধরুন, ধাতু, কাঠ, জল, বাতাস, গ্যাস, বিদ্যুৎশক্তি, ইথার। সবগুলোই বস্তু, এবং একটা সাধারণ সংজ্ঞা অনুযায়ী জড়িয়ে মড়িয়ে রয়েছে সব বস্তুই; অথচ ধাতু বলতে যা বুঝি, ইথার বলতে তা বুঝি না। দুই বস্তু সম্বন্ধে আমাদের দু-রকম ধারণা একেবারেই আলাদা। ইথারকে মনে করি আত্মার মতো কিছু একটা, অথবা, কিছুই না। থমকে যাই শুধু পরমাণুর কথা মাথায় এলেই। পরমাণুর গঠন আমরা জানি। ধরে নিয়েছি পরমাণু অত্যন্ত সূক্ষ্ম, নিরেট এবং তার একটা ওজন আছে। পরমাণু সংগঠনের এই যে ধারণা, একে নস্যাৎ করে দিলেই কিন্তু ইথারকে আর কোনো অস্তি বা বস্তু বলে মেনে নেওয়া যায় না। যুৎসই নামের অভাবে বড়জোর তাকে বলা যায় আত্মা। ইথারের চাইতেও সূক্ষ্মবস্তুকে এবার কল্পনা করুন—পাবেন বস্তুকণাহীন বস্তুকে—এক পদার্থ। পরমাণু যত ছোট হচ্ছে, তাদের মধ্যের ফাঁকও তত কমছে। তারপর একটা অবস্থা আসবে যখন পরমাণুদের মাঝে আর ফাঁক থাকবে না। সব একাকার হয়ে যাবে। এই পদার্থ হবে পিচ্ছিল, চলমান। আত্মা বলতে আমরা তাই বুঝি। জিনিসটা কিন্তু বস্তু-ই থেকে যাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি, আত্মাকে ধারণায় আনা কঠিন—যা নেই তাকে ধারণায় আনা যায় না। আত্মা কি জিনিস, এটা বুঝেছি বলে যখন আত্মতুষ্টিতে থাকি, তখন বুঝতে হবে নিরতিসীম সূক্ষ্ম বস্তুকেই বুঝিয়েছি।

প : পরমাণুদের মধ্যে যদি কোন ফাঁক না থাকে, সব যদি একাকার হয়ে যায়—তাহলে সেই নিরেট অস্থির একটা নিরেট ঘনত্ব-ও থাকবে। নক্ষত্ররা তা ঠেলে এগোবে কী করে?

ভ : আপত্তির যে-জবাব দেবো, তা না-জবাবের সমতুল্য। নক্ষত্ররা ইথারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, না, ইথার নক্ষত্রদের মধ্যে যাচ্ছে? ঘষাঘষির ফলে গতিবেগের খুব সামান্য হেরফের নিয়ে কি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ভেবে আকুল হচ্ছেন না?

প : বস্তু যদি ভগবান হয়, তার মধ্যে একটু অশ্রদ্ধার ভাব থেকে যাচ্ছে না?

ভ : মনের চাইতে বস্তুকে কম শ্রদ্ধা করা হবে কেন বলতে পারেন? ভুলে যাচ্ছেন, সব দার্শনিকই যে 'মন' বা 'আত্মা'র কথা বলেছেন, চরম বস্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠে সব গুণ নিয়ে হাজির হচ্ছে সেই অবস্থায়—এক কথায় যা ভগবান।

প : বস্তুকণাহীন বস্তু যখন চলমান অবস্থায় থাকছে, তখন তা চিন্তা—এই কথাই তাহলে বলতে চাইছেন।

ভ : মোটামুটিভাবে, এই চলমানতা-ই বিশ্ব-মনের বিশ্ব-চিন্তা। এই চিন্তা সৃষ্টি করে, যা কিছু সৃষ্টি হয়, তা ভগবানেরই চিন্তা।

'প : আপনি কিন্তু বললেন, 'মোটামুটিভাবে।'

ভ : হ্যাঁ, তাই বললাম, বিশ্ব-মনই ভগবান। নতুন ব্যক্তিসত্তা ক্ষেত্রে বস্তু নিতান্তই প্রয়োজন।

প : 'মন' আর 'বস্তু' সম্পর্কে দার্শনিকরা যা বলেন, এখন কিন্তু আপনি তাই বলছেন।

ভ : যাতে গুলিয়ে না যায়, সেই কারণে বলছি, 'মন' বলতে বোঝাচ্ছি বস্তুকণাহীন বস্তু বা চরমবস্তু; 'বস্তু' বলতে বোঝাচ্ছি বাকি সব কিছু।

প : একটু আগেই বলছিলেন, 'নতুন ব্যক্তিসত্তা ক্ষেত্রে বস্তু নিতান্তই প্রয়োজন।'

ভ : মন-ই ভগবান। ব্যক্তিসত্তা অর্থাৎ চিন্তাশীল সত্তা সৃষ্টি করতে গিয়ে ঐশ্বরিক মন-এর টুকরো টুকরো অংশকে মূর্ত করার প্রয়োজন হয়েছিল। এইভাবেই ব্যক্তিসত্তা পেয়েছে মানুষ। শরীরী সত্তা না থাকলে সে ভগবান। বস্তুকণাহীন বস্তুর অংশবিশেষ যখন শরীরী হয়ে গতিশীল হয়, তখন তা মানুষের চিন্তা। ভগবানের চিন্তাও তাই—সমগ্র বস্তুকণাহীন বস্তুর গতিশীলতা।

প : আপনি তাহলে বলছেন, শরীর বাদ দিলে মানুষই ভগবান?

ভ : (বিলক্ষণ দ্বিধার পর) তা কি বলতে পারি? এ যে রীতিমত উদ্ভট ভাবনা।

প : আপনি বলেছেন, 'শরীরী সত্তা না থাকলে সে ভগবান।'

ভ : তা তো বটেই। মানুষ তো এইভাবেই ভগবান হতে পারে—ব্যক্তিসত্তা হারিয়ে এক হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এইভাবে অ-শরীরী হলেই সে সরাসরি ভগবান হতে পারে না। হলে কল্পনা করে নিতে হবে, ঈশ্বরের এই ক্রিয়া উদ্দেশ্যহীন এবং নিষ্ফল। প্রাণী তো ঈশ্বরেরই চিন্তার ফল। চিন্তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না। চিন্তার ধর্ম তা নয়।

প : বুঝলাম না। আপনি বলতে চাইছেন, মানুষ কখনোই শরীর ত্যাগ করতে পারবে না?

ভ : আমি বলতে চাই, মানুষ কখনোই শরীরহীন হবে না।

প : বুঝিয়ে দিন।

ভ : শরীর দু'রকমের—প্রাথমিক এবং সম্পূর্ণ। কীট এবং প্রজাপতির দুই অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়। আমরা যাকে 'মৃত্যু' বলি, তা একটা যন্ত্রণাময় রূপান্তর। আমাদের এই বর্তমান মূর্ত অবস্থাটা ক্রমশ উন্নত হয়ে চলেছে, নিজেকে প্রস্তুত করে চলেছে এবং তা ক্ষণস্থায়ী, সাময়িক। আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ, চূড়ান্ত এবং অমর। চরম অবস্থাই ঈশ্বরের পুরো পরিকল্পনা।

প : কীট-এর রূপান্তর আমরা বুঝি।

ভ : আমরা বুঝি ঠিকই—কীট বোঝে? যে বস্তু দিয়ে আমাদের প্রাথমিক দেহ গড়া হয়েছে, প্রাথমিক দেহযন্ত্রগুলো সেই বস্তুর সঙ্গে বেশি খাপ খায়। কিন্তু চরম অবস্থা যে-বস্তু দিয়ে গড়া, তার সঙ্গে খাপ খায় না। চরম দেহটার অস্তিত্ব তাই প্রাথমিক অনুভূতিদের নাগালের বাইরে থেকে যায়।

প ঃ প্রায়ই আপনি বলেন, সম্মোহিত অবস্থায় মানুষ মৃত অবস্থার কাছাকাছি চলে যায়। কেন বলেন?

ভ ঃ সম্মোহিত হলে প্রাথমিক জীবনের অনুভূতি দিয়ে বাইরের সব কিছু টের পাই—দেহযন্ত্রদের সাহায্য ছাড়াই।

প ঃ কীভাবে?

ভ ঃ অনুভূতিগুলো তো দেহযন্ত্রদের খাঁচায় বন্দী—বিশেষ বস্তু বিশেষ পরিপার্শ্বকে টের পাওয়ার জন্যে তৈরি। তার বাইরের মুক্ত জীবনকে নাগালের মধ্যে আনতে পারে না। সম্মোহন প্রায় মৃত্যু অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়ে সেই ক্ষমতা জাগায়।

প ঃ মানুষ ছাড়া চিন্তাশীল সত্তা কী আর আছে?

ভ ঃ ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তারা রয়েছে। আমাদের চেনাজানা দেহযন্ত্র তাদের নেই—দেহ থাকার দরকারও নেই। মানুষের প্রাথমিক সত্তা বলতে যা বোঝালাম—তাদেরও তাই। মৃত্যুর পর এরা এক হয়ে যায় মহাশূন্য সত্তায়।

প ঃ যন্ত্রণা আর আনন্দ শুধু জৈব বস্তুর মধ্যেই আছে?

ভ ঃ আছে।

প ঃ কেন আছে?

ভ ঃ যন্ত্রণা আছে বলেই আনন্দকে আনন্দ বলে বোঝা যায়। চরম জীবনে প্রবেশের আগে এই বাধাগুলোই রাখা হয়েছে প্রাথমিক জীবনে। ক্রমশ উন্নতির জন্যে।

প ঃ চরম জীবনে তাহলে কি রইল?

ভ ঃ সুখ দুঃখের ওপারে যা—শান্তি।

এ কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য প্রশান্তি ঝলমলিয়ে উঠলো মিঃ ভ্যানকার্কের সারা মুখ জুড়ে। চমকে উঠে তাঁকে সম্মোহন মুক্ত করলাম। সেই মুহূর্তেই উনি মারা গেলেন। এক মিনিট যেতে না যেতেই পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল সর্বাঙ্গ—স্বাভাবিক অবস্থায় যা হয় না।

শেষ কথাগুলো কি তাহলে ছায়াচ্ছন্ন পরলোক থেকে শুনিয়ে গেলেন? □

জায়া আমি, কন্যা আমি, আমি মোরেল্লা

[মোরেল্লা]

অদ্ভুত এক কাহিনী লিখছি। হাত কাঁপছে। তবুও লিখব।

মোরেল্লা আমার বান্ধবী। দৈবাৎ ছিটকে এসেছিলাম ওর সমাজে। প্রথম দর্শনেই আগুন লেগেছিল আমার মনে। ধিকিধিকি সেই আগুনের স্বরূপ বুঝতে পারিনি, বাগে আনতে পারিনি; জ্বলে পুড়ে মরেছি—প্রেমের দেবতা ইরোজ এমন আগুন তো জ্বালেন না।

তারপর একদিন বিয়ে-হয়ে গেল আমাদের।

বিয়ের পর দেখলাম, বই পড়ার প্রচণ্ড বাতিক রয়েছে মোরেল্লার। মামুলি বই নয়। দুষ্প্রাপ্য পুঁথি। নানা ভাষায় লেখা। বই ছাড়া ওর জগতে আর কিছু ছিল না। মাঝেসাঝে কথা যখন বলত, তখন তার মধ্যে গানের সুর থাকত—সে সুর বড় বিচিত্র—মনে হতো যেন আমার মনের ভেতর পর্যন্ত পুড়িয়ে দিচ্ছে। অথচ কথা বলত খুব আস্তে আস্তে। বড় বড় চোখ মেলে যখন চেয়ে থাকত, তখন স্পষ্ট বুঝতাম, চামড়া ফুঁড়ে আমার ভেতর পর্যন্ত দেখছে।

এইভাবে গেল ক'টা বছর। এল মোরেল্লার মৃত্যুর দিন।

শেষ শয্যায় শুয়ে আমাকে বললে—"আমি মরেও মরব না—আমি থাকব।"

শেষ নিশ্বাস বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সদ্য ভূমিষ্ঠ কন্যা এতক্ষণ নিশ্বাস ফেলেনি—ফেলল এখন। মেয়ে বিয়োতে গিয়েই মারা গেল মোরেল্লা।

অনেকদিন নাম দিতে পারিনি মেয়ের। শুধু লক্ষ্য করতাম, হুবহু মায়ের মতোই হয়ে উঠছে মেয়ে। সেই হাসি, সেই চাহনি। অত্যন্ত বাড়ন্ত গড়ন। যতই বাড়ছে, ততই মায়ের চেহারা যেন কেটে বসে যাচ্ছে শরীরের সব জায়গায়। আর কথা? তাও মায়ের মতো। সেই রকম গানের সুরে—আস্তে আস্তে। বই পড়ার বাতিকও মায়ের মতো—একই ধরনের বই। আমার দিকে চাইলে মনে হতো, চামড়া ফুঁড়ে আমাকে দেখছে। পাকা চাহনি। কথাও পাকা। অনেক অভিজ্ঞতার ছাপ তাতে।

তখন থেকেই এক অসম্ভব কল্পনায় কাঠ হয়ে থেকেছি আমি।

তারপর এল তার নামকরণের দিন। কত ভাল নাম এঁচে রেখেছিলাম—কিন্তু কি এক পৈশাচিক তাড়নায় পুরুৎ ঠাকুরের কানে কানে বলে ফেললাম—'মোরেল্লা'।

খুব আস্তে বলেছিলাম। কিন্তু মেয়ে তা শুনতে পেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কাচের মতো চোখ আকাশের দিকে তুলে আছড়ে পড়েছিল। বলেছিল শেষ কথা—"এই তো আমি।"

আমার সামনেই, একই মোরেল্লা, মারা গেল পর-পর দু'বার। □

দেহ নেই, আমি আছি

[এলিওনোরা]

আমি যে প্রজাতির মানুষ, সেই প্রজাতির মানুষরা কল্পনার উদ্দামতা আর ভাবাবেগের প্রচণ্ডতার জন্যে মার্কামারা। লোকে আমাকে পাগল বলে। কিন্তু পাগলামি জিনিসটা প্রখরতম ইনটেলিজেন্সের লক্ষণ কিনা সে প্রশ্নের জবাব এখনও মেলেনি। গরিমা যেখানে প্রায় সবটুকুই জুড়ে রয়েছে, তুরীয় যেখানে প্রায় সব কিছুই—তা চিন্তার ব্যায়রাম থেকে উদ্ভূত কিনা, নাকি ধীশক্তির দৌলতে মনের নানারকম অবস্থা—তা কে বলবে? দিনের আলোয় যারা স্বপ্ন দেখে, তারা এমন অনেক কিছু ব্যাপারে ওয়াকিবহাল থাকে—যা রাতের স্বপ্ন বিভোরদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যায়। ধূসর দৃশ্য কল্পনায় তারা অনন্তের আভাসও পেয়ে যায়, পায় রোমাঞ্চকর উপলব্ধি, জেগে ওঠার পর বুঝতে পারে মহা-সিক্রেটের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। যে মহাজ্ঞানের মধ্যে রয়েছে শুভ আর অশুভ দুটোই—তারও উপলব্ধি ঘটে। এদের কাছে মাস্তুল-পাল-কম্পাস কিছুই থাকে না—তা সত্ত্বেও এরা অ্যাডভেঞ্চার করে আসে আলোর অন্তহীন সমুদ্রে—যে আলো মুছে যাবে না কোনওদিন।

তাহলে ধরেই নেওয়া যাক, আমি উন্মাদ। স্বীকারও করে নিচ্ছি, আমার মনে রয়েছে দুটো স্তর। একটা স্তর অকাট্য যুক্তি দিয়ে গড়া—এ স্তরে ছেয়ে রয়েছে আমার জীবনের প্রথমদিকের মধুরতম স্মৃতি; দ্বিতীয় স্তরটা ছায়াময় সংশয়ে

ঠাসা—এখানে রয়েছে আমার বর্তমান, আমার সত্তার দ্বিতীয় পর্বের স্মৃতিকথা। সুতরাং, আগে যা কিছু বলব, তা বিশ্বাস করবেন; দ্বিতীয় পর্বের কাহিনী শুনে যতটুকু বিশ্বাস করতে পারেন করবেন, না পারলে স্রেফ সন্দেহ করবেন, সন্দেহও যদি করতে না পারেন তো ইতিহাসের প্রহেলিকা হিসেবেই ধরে নেবেন।

তরুণ বয়েসে যাকে ভালবেসেছিলাম, যার সম্বন্ধে লিখতে বসে আঁকাপা কলম ধরেছি ঠাণ্ডা মাথায়—সে ছিল আমার মাসীর একমাত্র মেয়ে। মাসী অবশ্য অনেকদিন আগেই পরলোকে গেছেন। এলিওনোরা আমার মাসতুতো বোনের নাম, ছেলেবেলা থেকেই দুজনে একসঙ্গে বড় হয়েছি রোদ্দুরে ধোওয়া 'বহুরঙা ঘাস-উপত্যকা'য়। চিনিয়ে না দিলে কেউ সেখানে যেতে পারে না —কারণ সে উপত্যকাকে ঘিরে রয়েছে আকাশছোঁয়া পাহাড়ের পর পাহাড়। দানব-পাহাড়দের গা ছেয়ে থাকে অজস্র মহীরুহ। পাতার দঙ্গল ঠেলে আর ফুলের পাহারা এড়িয়ে সে অঞ্চলে ঢোকা খুবই অসম্ভব ব্যাপার। এই কারণেই আমরা দুটিতে নিঃসঙ্গ পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছি মনোরম সেই উপত্যকায়—দেখাশুনোর জন্যে ছিল শুধু আমার মা।

পাহাড়ের ঘেরাটোপের অনেক উঁচু থেকে নেমে এসেছিল ঝকঝকে একটা নদী। যে অঞ্চল থেকে নেমেছে—সে অঞ্চল এত উঁচুতে যে চোখ যেত না তার আবছা অন্দরে—অথচ এরই ভেতর-মহল থেকে নেমে এসে আমার এলিওনোরার চোখের ঔজ্জ্বল্যকেই শুধু ম্লান করতে পারেনি আশ্চর্য সেই নদী—আর সবই নিষ্প্রভ মনে হতো তার বিস্ময়কর ঝিকিমিকির পাশে। বিচিত্র এই জলধারা অস্পষ্ট পর্বতচূড়া থেকে নেচে নেচে নেমে এসে মিলিয়ে যেত আরও অস্পষ্ট খাদের মধ্যে। উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে এত তোড়ে বয়ে গিয়েও কাঁপন ধরাত না কোনও নুড়িখণ্ডে, আওয়াজও করত না। ছলছলানি শোনা যেত না বলেই, সরু অথচ গভীর এই স্রোতস্বিনীর নাম দিয়েছিলাম 'নৈঃশব্দ নদী'।

এঁকেবেঁকে নেমে আসার সময়ে আরও অনেক ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীকে বুক পেতে নিয়ে উপত্যকার উপলকীর্ণ ভূমিতে আছড়ে পড়েছিল 'নৈঃশব্দ নদী'। আর এই সবকিছুর ওপরেই পাতা ছিল অপরূপ কার্পেটের মতো নরম সবুজ ঘাসের গালিচা; সবুজের মধ্যে মণিরত্নের মতোই ঝিকমিক করত হলদে-সাদা-বেগুনি-লাল ফুল। ঢেউ খেলানো অজস্র রঙের সেই উৎসবে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা যেত প্রেমের গান আর ভগবানের মহান রূপকে।

সুন্দর সবুজ এই ঘাসের কার্পেটের মধ্যে থেকেই বড় বড় গাছ মাথা উঁচিয়ে একটু ঝুঁকে থাকত উপত্যকার মাঝের দিকে—যেদিকে সূর্যদেব ঢেলে দিতেন তাঁর কিরণ ধারা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে। দীর্ঘকায় মহীরুহদের নিবিড় পাতার রাশি ঝুলে থাকত অগুন্তি সরীসৃপের মতো—দূর থেকে দেখে মনে হতো যেন নাগ-নাগিনীরা দুলে দুলে খেলা করছে গাছে গাছে, ডালে ডালে।

পনের বছর আমরা, আমি আর এলিওনোরা, হাতে হাত মিলিয়ে ঘুরেছি এই উপত্যকায়। ভালবাসা তখনও পাপড়ি মেলে ধরেনি আমাদের হৃদয়-কন্দরে।

যেদিন তার প্রথম পদধ্বনি শুনলাম শিরায় উপশিরায়, সেদিন আমরা দুজনেই আর কথা বলতে পারিনি। বসেছিলাম দুজনে দুজনের কোমর জড়িয়ে বিশাল মহীরুহদের সরীসৃপসম পাতাদের তলায়, নিবিড় নয়নে শুধু চেয়েছিলাম 'নৈঃশব্দ নদী'র শব্দহীন জলের দিকে; আর তখনি দেখেছিলাম আশ্চর্য অদ্ভুত মাছেরা জলের মধ্যে থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে যেন আমাদের দেখেই লজ্জায় পালিয়ে যাচ্ছে; দেখেছিলাম আস্তে আস্তে পালটে যাচ্ছে লাল-সাদা-বেগনি-হলুদ ফুলেদের আসল বর্ণ—আনন্দের ঝিলিক যেন উজ্জ্বলতর করে তুলেছে প্রত্যেককে; দেখেছিলাম সবুজ ঘাসের কার্পেটেও এসেছে গভীর হর্ষের ছোঁয়া—দুলে দুলে উঠে বর্ণের বিকিরণ ঘটিয়ে চলেছে মুহুর্মুহু; আর দেখেছিলাম অপরূপ রক্তরঙা এক মেঘরাশি—আচমকা গোটা উপত্যকার বুক নিংড়ে তা যেন মাথার ওপর উঠে গিয়ে ভেসে ভেসে চাঁদোয়া রচনা করেছিল আমাদের মাথার ওপর; অনেকদিন পর একটু একটু করে ফের নেমে এসে মিলিয়ে গেছিল উপত্যকারই বুকে।

এলিওনোরা ছিল অপরূপা। কিন্তু ছিল না চতুরা। ফুলের পরিবেশে মানুষ হয়ে ফুলের মতোই ছিল সহজ সরলা—ছলনার ছোঁয়াও লাগেনি তার অন্তর-পুষ্পে। দুজনে হাত ধরাধরি করে উপত্যকায় ঘাস মাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে কতবার শুধু ভেবেছি আর পরস্পরকে বলেছি উপত্যকা জুড়ে আচমকা অভাবনীয় পরিবর্তনের কথা। 'বহুরঙা ঘাস উপত্যকা' নীরবে অভিনন্দন জানিয়েছিল আমাদের ভালবাসাকে। আমরা তা টের পেয়েছিলাম। অবশেষে একদিন চোখের জলের মধ্যে দিয়ে এলিওনোরা জানাল সব পরিবর্তনের মতো ওর জীবনেও আসছে পরিবর্তন। আসছে মৃত্যু। অণু-পরমাণুতে শুনতে পেয়েছে তার চরণধ্বনি।

আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে এক সন্ধ্যায় 'নৈঃশব্দ নদী'র পাড়ে বসে এ কথা সে শুনিয়েছিল আমাকে। আতঙ্কটা তার মৃত্যুর জন্য নয়—মরণের পর এই উপত্যকার মাটিতেই শয্যা পেতে সমাহিত থাকবে পরম সুখে। কিন্তু সুখ থাকবে না যদি আমি বিয়ে করি অন্য মেয়েকে। আতঙ্কটা এই নিয়েই।

প্রকৃতিকে সাক্ষী রেখে আমি কথা দিয়েছিলাম—বিয়ে আর করব না।

বাতাসের সুরে, এলিওনোরা তখন বলেছিল—মৃত্যুর পর পরপার থেকে ফিরে আসা যদি সম্ভব নাও হয়—নানাভাবে সে জানান দিয়ে যাবে, সে আছে আমার পাশে; কখনও সুরভিত বাতাস হয়ে বইবে, কখনও মৃদু বাতাস হয়ে হাত বুলিয়ে যাবে কপালে। ক্ষীণ ইশারার সঙ্কেত আমি যেন টের পাই।

পেয়েছিলাম বইকি। কথা দিয়েছিলাম, বিয়ে করব না, করিওনি যতদিন ছিলাম মনোরম সেই উপত্যকায়। কিন্তু নিরালা সেই পাহাড় আর বন, ঘাস আর ফুলের সঙ্গ একদিন যখন আমার মস্তিষ্কের কোষে কোষে নিঃসঙ্গতা ঘুচিয়ে দিতে পারল না—চিরকালের মতো 'বহুরঙা ঘাস-উপত্যকা' ছেড়ে চলে এলাম শহরে।

চোখ ধাঁধিয়ে গেল চাকচিক্যে। ঘোরের মধ্যে রইলাম তখন থেকেই। স্বপ্নের

শুরুও তখন থেকে, একদিকে শান্ত স্মৃতি। আর একদিকে অশান্ত হাতছানি। একদিকে প্রশান্ত প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্মৃতি। আর একদিকে চঞ্চল বৈভব আর সুন্দরীদের আকর্ষণ। যে রাজার সভায় কাজ করছিলাম, একদিন সেখানেই দেখা পেলাম এক অনিন্দ্য সুন্দরীর। পাগলের মতো ভালবাসলাম তাকে। বিয়েও করলাম।

কিন্তু তার চোখের দিকে তাকালেই আমি যেন দেখতে পেতাম আমার এলিওনোরাকে। এক রাত্রে গবাক্ষ দিয়ে ভেসে এল মিষ্টি সুবাস, হাল্কা হাওয়া স্নিগ্ধ ছোঁয়া দিয়ে গেল আমার উত্তপ্ত ললাটে, বাতাস যেন ফিসফিসিয়ে উঠে দীর্ঘশ্বাসের সুরে বলে গেল আমার কানের গোড়ায়—"আমি আছি, আমি থাকব। প্রেম সবার ওপরে। এই প্রেম এনে দিক তোমার শান্তি, তোমার রাতের ঘুম। যে কথা দিয়েছিলে, তার নিগড় থেকে মুক্তি দিয়ে গেলাম। কেন দিয়ে গেলাম, তা বুঝবে স্বর্গে যখন ফের দেখা হবে।" □

অঘটনের ঘটক

[দ্য অ্যাঞ্জেল অফ দ্য অড]

কনকনে শীত। নভেম্বরের বিকেল। পেট ঠেসে খেয়ে খাবার ঘরেই বসে আছি আগুনের পাশে। সামনে রেখেছি একটা টেবিল। তার ওপর আচার আর মদের বোতল। সকাল থেকে হাবিজাবি অনেক বই পড়েছি বলে মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। তাই খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছি মাথা পরিষ্কার করার জন্যে। অদ্ভুত একটা খবর পড়ে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। সংবাদদাতা লিখেছেন :

মরণের পথ অসংখ্য এবং অদ্ভুত। এক ভদ্রলোক এই সেদিন মারা গেলেন মামুলি একটা খেলা খেলতে গিয়ে। এ খেলায় ফুঁ দিয়ে নলের মধ্যে থেকে ছুঁচ উড়িয়ে দেওয়া হয়—ছুঁচে গলানো থাকে পশম। ভুল করে ভদ্রলোক ছুঁচের ফলা রেখেছিলেন মুখের দিকে, তারপর জোরসে ফুঁ দেবেন বলে দম টানতে গেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ছুঁচ গলা দিয়ে গলে সটান বিঁধে যায় ফুসফুসে। দিন কয়েক পরেই পরলোকে চলে যান ভদ্রলোক।

খবরটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন যে রেগে টং হয়ে গেলাম, বলতে পারবো না। দাঁত কিড়মিড় করে নিজের মনেই বলেছিলাম—'গুল মারবার আর জায়গা পায়নি! বানিয়ে বানিয়ে লিখে 'অদ্ভুত ঘটনা' বললেই যেন সবাই গিলে খাবে! রাবিশ! আমার মত বিচক্ষণ ব্যক্তি অন্তত এসব ননসেন্স কক্ষনো বিশ্বাস করবে না—কখ্খনো না।'

'রাম বোকা তুমি, তাই এ কথা বলতে পারলে!'

চমকে উঠে তাকালাম ঘরের এ কোণে সে কোণে ওপরে নীচে। কার এত বড় স্পর্ধা আমারই ঘরে বসে টিটকিরি মারে আমাকে। উচ্চারণটাও অদ্ভুত—বোকা মুস্কিল। কাউকেই কিন্তু দেখতে পেলাম না। তবে কি সকাল থেকে হাবিজাবি পড়াশুনো করার ফলেই মাথার মধ্যে আপনা থেকে আওয়াজ হচ্ছে?

অমনি খুব কাছ থেকে শোনা গেল সেই খোনা কণ্ঠস্বর—'অত মদ গিললে কি হুঁশ থাকে? অন্ধ নাকি! দেখতে পাচ্ছো না পাশেই বসে আছি।'

পাশে! কেউ তো নেই পাশে। সামনে চোখ ফেলেই চমকে উঠলাম। কিম্ভূত একটা জীব বসে রয়েছে টেবিলের ওদিকে। তার ধড়খানা অবিকল মদের পিপের মতো, মুণ্ডুটা নস্যির ডিবের মতো। মুণ্ডু থেকে দুটো বোতল বেরিয়ে আছে দুদিকে। ডিবের তলার দিকে একটা দাবানো জায়গা থেকে অদ্ভুত আওয়াজ বেরোচ্ছে—খোনা খোনা আর বিকৃত। পিপের তলায় রয়েছে শুধু দুটো কাঠের পায়া।

ছানাবড়া চোখে আজব সেই মূর্তি দেখতে গিয়ে আবার খেলাম ধমক—'আচ্ছা আহাম্মক তো। ছাপার অক্ষরে যে ঘটনা বেরোয়, তাকে অবিশ্বাস করতে আছে। সব সত্যি—স-ব!'

ঘাবড়ে গিয়েও গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করলাম। ভারিক্কি গলায় বললাম—'কে হে তুমি? ঘরে ঢুকলে কি করে?'

'আমি কে, সেটা দেখাবার জন্যেই ঘরে এসেছি।'

এটা একটা উত্তর হলো। গলা চড়িয়ে তাই বললাম—'মাতলামির জায়গা পাওনি। দূর করে দেবো ঘর থেকে।'

খলখল হেসে আজব মূর্তি বললে—'সে ক্ষমতা তোমার নেই।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়েছিলাম ঘণ্টার দড়ির দিকে—চাকর ডেকে আপদ তাড়াবো বলে।

কিন্তু তা আর হলো না। আজব মূর্তি তার বোতল-হাত বাড়িয়ে ঠকাং করে আমার মাথায় মারতেই আমি বেকুব হয়ে বসে পড়লাম চেয়ারে।

কি করা উচিত এখন?

আজব মূর্তি বললে—'চুপ করে বসে থাকা উচিত। দেখেও চিনলে না আমাকে। আমিই অঘটনের ঘটক—অদ্ভুত দেবদূত।'

'দেবদূত! ডানা কই?'

'আমার ডানার দরকার হয় না।'

'খুব ভালো কথা। এসেছো কেন? কাজটা কি?'

'কাজ! আমি হলাম গিয়ে দেবদূত—আমার আবার কাজ কি?'

'তবে বিদেয় হও।' বলেই টেবিল থেকে নুনের শিশি নিয়ে ছুঁড়ে মারলাম মূর্তির মাথা টিপ করে—কিন্তু অদ্ভুতভাবে শিশিটা মাথা টপকে গিয়ে গুঁড়িয়ে দিল ম্যান্টলপিসের ঘড়ির কাঁচ। ঘড়ির চেহারা দেখতে গিয়েই মাথায় পড়ল

বোতল-হাতের পর-পর তিনটে ঘা। এলিয়ে পড়লাম চেয়ারে। মার খেয়ে কেঁদেও ফেললাম।

আজব মূর্তি অমনি গলা নরম করে বললে—'কেঁদো না, কেঁদো না। নির্জলা মদ খেলে কষ্ট তো হবেই। এই নাও—জল মিশিয়ে পাতলা করে দিচ্ছি।'

বলেই, বোতল-হাত বাড়িয়ে আমার গেলাসে একটু তরল পদার্থ ঢেলে দিল অঘটনের ঘটক। পাতলা সুরা খেয়ে একটু ধাতস্থ হলাম। কান খাড়া করে শুনে গেলাম কিম্ভূতের কাহিনী। মাথায় সব ঢুকলো না। শুধু বুঝলাম, এই দুনিয়ায় অদ্ভুত অঘটন ঘটিয়ে নাস্তিকদের আস্তিক বানিয়ে তোলাটাই তার একমাত্র কাজ। দু'চারবার বাধা দিতে গিয়ে দেখলাম চটে যাচ্ছে মূর্তি। মার খাওয়ার আর ইচ্ছে ছিল না। তাই চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ মুদে বাদাম খেতে লাগলাম—খোলাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলতে লাগলাম ঘরময়। সেটাও খুব অপমানকর মনে হল আজব মূর্তির। তাই ঝাঁ করে কেঠো পায়ে দাঁড়িয়ে কটর মটর করে কি যে ছাই বলল, কিচ্ছু বুঝলাম না। হুমকি বলেই মনে হল। 'দেখে নেবো, হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেব' জাতীয় কথা নিশ্চয়। পরক্ষণেই উধাও হয়ে গেল ঘর থেকে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমি। ম্যান্টলপিসের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বাজে সাড়ে পাঁচটা। পঁচিশ মিনিট ঘুমোবো, পাঁচ মিনিট হাঁটবো। তাহলেই ঠিক ছ'টায় পৌঁছে যাবো বীমা কোম্পানীর অফিসে—বসতবাড়ির ইনসিওর‍্যান্স পলিসি রিনিউ করা দরকার—মেয়াদ ফুরিয়েছে গতকাল।

আরও দুঢোক মদ গিলে নিয়ে তাই চোখ বন্ধ করেছিলাম। দিবানিদ্রায় আমি দারুণ চোস্ত; যেটুকু ঘুমোবো মনে করি, ঠিক সেইটুকুই ঘুমোই—ঘুম ভাঙে কাঁটায় কাঁটায়।

আজ কিন্তু এ কি অঘটন ঘটল! চোখ মেলে দেখলাম, ঘুমিয়েছি মাত্র তিন মিনিট! আরও সাতাশ মিনিট বাকি ছ'টা বাজতে।

তাই ফের ঘুমোলাম। ফের জাগলাম। ঘড়িতে তখনও সাতাশ মিনিট বাকি!

পকেট ঘড়ি বের করতেই হলো! সে ঘড়িতে বাজে সাতটা।

ম্যান্টলপিসের ঘড়ি কিন্তু পাঁচটা বেজে তেত্রিশ মিনিটে থেমে রয়েছে। কেন এমন হলো দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, ভাঙা কাঁচের মধ্যে দিয়ে একটা বাদামের বোঁটা চাবির ফুটোয় ঢুকে গিয়ে এমনভাবে উঁচু হয়ে রয়েছে যে সেকেণ্ডের কাঁটাটা গেছে আটকে।

বাদামের বোঁটাশুদ্ধু খোসা তো আমিই ছুঁড়ছিলাম একটু আগে।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট যখন রাখতে পারলাম না, তখন ঠিক করলাম—কাল সকালে গিয়ে ক্ষমা-টমা চেয়ে পলিসি রিনিউ করে নেব।

ঘুমোলাম যথাসময়ে। মাথার কাছে টেবিলের ওপর জ্বলতে লাগল মোমবাতি।

স্বপ্নে দেখলাম অঘটনের ঘটক সেই বিটকেল দেবদূতকে। আমার মশারি

তুলে ভেতরে ঢুকেছে, বিদ্‌ঘিচ্ছিরি আওয়াজ করছে, হুড় হুড় করে মদ ঢালছে নাকেমুখে। অসহ্য।

এ স্বপ্ন দেখলে কার না ঘুম ভাঙে। আমারও ভেঙেছিল। উঠে বসতে না বসতেই দেখলাম, এক ব্যাটাচ্ছেলে ইঁদুর আমার জ্বলন্ত মোমবাতিটা কামড়ে ধরে চম্পট দেবার ফিকির খুঁজছে। তাড়া খেয়েই রাস্কেলটা মোমবাতির আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল ঘরের নানা জায়গায়। দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল ঘরে—জ্বলতে লাগল পুরো বাড়িটাই। ধোঁয়ায় দম আটকে আর আগুনে ঝলসে মরতে মরতেও বেঁচে গেলাম জানলায় মই আটকানো হয়েছে দেখে। পড়শিরা মই তুলে দিয়েছে। পড়ি কি মরি করে মই বেয়ে যখন নামছি, ঠিক তখনি এক ব্যাটাচ্ছেলে কাদামাখা শুয়োর কোত্থেকে এসে গা ঘষতে লাগল মইয়ের গোড়ায় (দেখতে তাকে প্রায় অঘটনের ঘটক বিটকেল দেবদূতের মতো)। মই গেল হড়কে, আমি পড়লাম নীচে, ভাঙল একটা হাত।

অঘটনের পর অঘটন! বীমা নবীকরণ না করার ফলে বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেল—আমি বসলাম পথে। আগুনে চুল ঝলসে যাওয়ায় মাথা জোড়া টাক নিয়ে কাউকে মুখ দেখানোর উপায়ও রইলো না।

কিন্তু আমি হলাম সেই জাতের মানুষ যারা ভাঙে তবুও মচকায় না। অঘটন-ফঘটন আর অদ্ভুত-কিম্ভূত ব্যাপার-স্যাপারকে বিশ্বাস যখন করি না—করবোও না।এইভাবে মন শক্ত করে ঠিক করলাম, এবার একটা বিয়ে করা যাক। বিত্তবতী বিধবা বিয়ে করে ভাগ্য ফিরিয়ে নেব, এই মতলবে খুঁজে পেতে সেরকম একজন বিধবাও জোগাড় করে ফেললাম। সদ্য বিধবা। সপ্তম স্বামী স্বর্গে যাওয়ায় বড্ড ভেঙে পড়েছে। আমি আমার টাকমাথা কালো পরচুলায় ঢেকে তাকে এমন সান্ত্বনা বাক্য শোনালাম যে, সে আপ্লুত হৃদয়ে হেঁট হয়ে তার কালো চুলের খোলা রাশি এলিয়ে দিল আমার কালো পরচুলার ওপর (আমি বসেছিলাম সদ্য বিধবার পদতলে)।

অঘটনটা ঘটে গেল তখুনি। অদ্ভুত অঘটন! মাথায় মাথায় লাগিয়ে চুল ঝাঁকিয়ে ওপর তুলে নিয়েছিল সদ্য বিধবা। আমার পরচুলা তার কালো লম্বা চুলে জড়িয়ে উঠে গেল ওপরে। আমার পোড়া মাথা নিয়ে পাঁই পাঁই করে পালালাম তল্লাট ছেড়ে।

কিন্তু হাল ছাড়িনি আমি। আবার জুটিয়েছিলাম এক বিত্তবতীকে। ভিড়ের মধ্যে তাকে আসতে দেখেই দৌড়ে যাচ্ছিলাম দুটো প্রাণের কথা বলে মন ভিজোবো বলে। কিন্তু তা আর হলো না। কোত্থেকে কি এক আপদ এসে ঢুকলো চোখে। চোখ বন্ধ করতে হলো তক্ষুনি। তারপর যখন চোখ খুললাম, ভাবী বউ উধাও হয়ে গেছে। রেগেমেগেই চলে গেছে। ভেবেছিল, আমি গিয়ে সুধাবচন ঝাড়বো। তার বদলে চোখ বন্ধ করে তাকে না দেখার ভান করেছি! আর সে কাছে আসে?

মনটা হু-হু করে উঠেছিল এই নতুন অঘটনে। অমনি দেখেছিলাম অঘটনের

ঘটক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বোতল-হাত বের করে আমার চোখে এক ফোঁটা 'জল' দিতেই চোখ পরিষ্কার হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

এরপর ঠিক করলাম, আত্মহত্যা করব। নদীর পাড়ে গিয়ে প্যান্ট খুলে ফেললাম। দিগম্বর হয়ে এসেছি পৃথিবীতে, দিগম্বর হয়েই চলে যাবো পৃথিবী থেকে—এইটাই ছিল আমার প্ল্যান।

কিন্তু তাও ভণ্ডুল হয়ে গেল হতচ্ছাড়া এক কাকের জন্যে। গম খাচ্ছিল নিজের মনে। আমার প্যান্ট পড়ে আছে দেখেই তাই খামচে ধরে উড়ে গেল শূন্যে। ভুলে গেলাম আত্মহত্যার প্ল্যান। প্যান্ট ফিরিয়ে আনতে দৌড়োলাম ঊর্ধ্বমুখে কাকের পেছন পেছন। আচমকা পিছলে গেল পা—কিনারা থেকে ছিটকে পড়তে পড়তে হাতে ঠেকলো একটা দড়ি। একখানা আস্ত হাতে সেই দড়ি চেপে ধরতেই এক ঝটকান খেয়ে উঠে গেলাম আরও উঁচুতে। চেয়ে দেখলাম, তাজ্জব ব্যাপার। দড়ি ঝুলছে বেলুন থেকে। গণ্ডোলার রেলিংয়ে বোতল-হাতের ভর দিয়ে পাইপ টানছে অঘটনের ঘটক।

আমি চেঁচিয়ে বললাম—'বাঁচাও।'

সে বললে—'তাহলে বিশ্বাস হয়েছে অঘটনে?'

'হয়েছে।'

'বিশ্বাস হয়েছে অঘটন ঘটাতে পারি আমি?'

'হয়েছে।'

'বিশ্বাস হয়েছে, আমিই অঘটনের অদ্ভুত দেবদূত?'

'হয়েছে! হয়েছে! হয়েছে! বাঁচাও!'

'তাহলে আমার চ্যালা হও।'

'কি করে হবো?'

'ডান হাত প্যান্টের বাঁ পকেটে ঢোকাও।'

কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। বাঁ হাত ভেঙেছি মই থেকে পড়ে গিয়ে। ঝুলছি ডান হাতে। সবচেয়ে বড় কথা, প্যান্ট তো পরে নেই—কাকে নিয়ে গেছে।

অঘটনের ঘটককে তা বললেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। বিচ্ছিরি গলায় বললে—'তবে যাও চুলোর দোরে!'

বলেই, ছুরি বের করে ঘ্যাঁচ করে কেটে দিল বেলুনের দড়ি। সটান নেমে এলাম নীচে—ঢুকে গেলাম আমারই নতুন করে তৈরি বাড়ির চিমনি দিয়ে খাবার ঘরের মধ্যে। দমাস করে পড়েই জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান ফিরল ভোর চারটের সময়ে। দেখলাম শুয়ে রইছি ছাইয়ের গাদায়। সামনের টেবিলে মদের বোতল আর খবরের কাগজ যেমন তেমনি রয়েছে।

বাড়তি বোতল রয়েছে একটা। অঘটন ঘটকের নিজস্ব সাদা মদের বোতল!

এত কাণ্ডর মূলে যে সে—তারই প্রমাণ। □

মানুষের গড়া স্বর্গ

[দ্য ডোমেন আর্নহিম অর দ্য ল্যান্ডসকেপ গার্ডেন]

আমার বন্ধু এলিসন জন্মে ইস্তক বড়লোক। আরও বড়লোক হয়ে গেল অদ্ভুত একটা সম্পত্তির মালিক হয়ে বসায়।

এলিসনের যে দিন একুশে পা দেওয়ার কথা, তার ঠিক একশ বছর আগে ওর এক পূর্বপুরুষ বিচিত্র এক ইচ্ছাপত্র বানিয়ে যান। তাঁর ছিল রাজঐশ্বর্য, কিন্তু ছিল না কোনো ওয়ারিশ। খেয়ালি এই ভদ্রলোক তাই ঠিক করলেন, রাজঐশ্বর্য একশ বছর ধরে সুদে আসলে বেড়ে চলুক। তারপর তার মালিক হবে এমন একজন নিকট আত্মীয় যার নাম এলিসন।

ভদ্রলোকের নিজের নামও যে ছিল এলিসন! সিব্রাইট এলিসন!

আমার বন্ধু এলিসন যে দিন একুশে পা দিল, সেই দিনই এই বিপুল বৈভব এসে পড়ল তার হাতে। ৪৫ কোটি ডলার হাতে পেয়েও কিন্তু তার মাথা ঘুরে গেল না।

কারণ ও ছিল মনে প্রাণে কবি। কিন্তু কবি বা গায়ক হতে চায়নি। এই দুই সৃষ্টিই কিন্তু স্রষ্টার আসল সৃষ্টির সমান হতে পারেনি। প্রকৃতি পৃথিবীটাকে সাজিয়েছেন সুন্দরভাবে। সে সৌন্দর্যে ঘাটতি নেই কোথাও। ও চেয়েছিল এই সৌন্দর্যের সঙ্গে মানুষের স্বপ্নের সৌন্দর্য জুড়ে দিতে। তার ফল যা দাঁড়াবে, তা ভগবানের তৈরি স্বর্গকে ডিঙে না গেলেও আশ্চর্য এক স্বর্গ হয়ে উঠবে।

বছরের পর বছর অনেক ঘুরে এমন একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছিল এলিসন। জায়গাটার নাম আর্নহিম। শহর থেকে দূরে নয়। যেতে হয় জলপথে। যাওয়ার পথে দু'পাশের পাহাড় মাথার ওপর ঝুঁকে পড়ে শ্যাওলা ঝুলিয়ে যেন একটা

সুড়ঙ্গ বানিয়ে দেয়—সূর্যরশ্মি আসতে পারে না। জল টলটলে, ময়লা নেই, নেই ঝরা গাছের পাতা, তলদেশ দেখা যায় স্পষ্ট। অনেক ঘুরে, অনেক বেঁকে স্রোতস্বিনী জলযানকে নিয়ে যায় গোলাকার এক হ্রদের কিনারায়।

এখানেই জাহাজ ছেড়ে দিয়ে উঠে বসতে হয় হাতির দাঁতে তৈরি একটা ক্যানো নৌকোয়। একটিমাত্র দাঁড় পড়ে থাকে পায়ের কাছে। চালক থাকে না—পর্যটক একা বসে চেয়ে থাকে অস্তমিত সূর্যের দিকে—চারদিকের উঁচু পাহাড়ের মাথার ওপর ঝিলমিল করছে সোনালি রোদ।

তারপর যখন পর্যটকের ইচ্ছে হয় কোথাও যাওয়ার, হাতির দাঁতের ছিপ-নৌকো আপনা আপনি চলতে থাকে। ছলছল শব্দে জল ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার সময়ে মিষ্টি বাজনা বাজতে থাকে। সে বাজনার উৎস কোথায়, এদিকওদিক তাকিয়েও ধরতে পারে না পর্যটক।

তারপর অনেক আশ্চর্য নিসর্গ দৃশ্য দেখবার পর ছিপ-নৌকো এসে পৌঁছোয় পাহাড়ের গায়ে একটা সোনা-তোরণের সামনে। এবারও নিজেই পাল্লা মেলে ধরে বিশাল তোরণ—আবার শোনা যায় অদৃশ্য হাতের সেই বাজনা—বিচিত্র সঙ্গীতের সুর।

মুগ্ধ পর্যটকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক অপূর্ব আর অবিশ্বাস্য দৃশ্য। ফল ফুল গাছ পালা পাহাড় পর্বত—সবই যেন স্বর্গের বাগান থেকে তুলে এনে বসানো হয়েছে আশেপাশে দূরে কাছে। কিন্তু সব কিছুর ওপরে যেন শূন্যে ভাসছে মানুষের গড়া ইমারত, বুরুজ, মিনার। সে এক অপরূপ মায়াময় পরিবেশ। যেন ভৌতিক কারিগরের হাতে সৃষ্টি দেবদূতের নকশার রূপায়ন, পরীহুরীদের কল্পগল্পের বাস্তব রূপ।

এলিসন আজ আর নেই। কিন্তু তার বাগানটা আছে। সে বলত, আসল সুখ মুক্ত জায়গার মনোরম পরিবেশেই পাওয়া যায়। নিজের হাতে গড়ে সেই সুখের সন্ধান দিয়ে গেছে মানুষকে। □

মুণ্ডু বাজি রেখো না শয়তানের কাছে

[নেভার বেট দ্য ডেভিল ইওর হেড]

গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-কবিতা-গান—যাই লেখা হোক না কেন, প্রত্যেকটার মধ্যে একটা না একটা নীতিকথা থাকা উচিত, এরকম একটা রেওয়াজের কথা বলেন কিছু কিছু জ্ঞানী সমালোচক। আমার কোনো লেখাতেই নাকি নীতি-ফিতি থাকে না—এমন কথাও বলেন।

অতএব সেই গল্পটা বলা যাক। পাঠক তার মধ্যে পাবেন দারুণ একটা নীতি কথা।

এ গল্প আমার প্রাণের সখা টবি ড্যামিটকে নিয়ে। ড্যামিট অর্থাৎ 'ড্যাম ইট' পদবীটার মধ্যেই অভিশাপের গন্ধ পাচ্ছেন তো? নরকে যাওয়ার পরিষ্কার ইঙ্গিত। যার নামেই নরকবাসের অভিশাপ—তার গল্প কিরকম হওয়া উচিত কল্পনা করে নিন।

আর এই পদবীর মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে বন্ধুবরের গোটা চরিত্র এবং ওর সমস্ত ভোগান্তির মূল কারণ। ব্যাপারটা এবার খোলসা করা যাক।

টবি এখন মর্ত্যে নেই; মানে বেঁচে নেই। কিন্তু যদ্দিন ধরাধামে বর্তমান ছিল, ততদিন কোনো কুকাজ বাকি রাখেনি। অসম্ভব গরিব ছিল বলেই যে বদ কাজের বদনাম হয়েছিল, তা যেন ভাববেন না। ওকে বদমাস হতে হয়েছিল ওর নিজের গর্ভধারিণীর জন্যে। জন্মে ইস্তক বেধড়ক মার খেয়েই গেছে মায়ের কাছে। চোর বদমাসকেও এরকমভাবে কেউ মারে না। কুকর্ম না করেই যদি কুকর্মের পুরস্কার

পাওয়া যায়—তাহলে তো পুরস্কারের যোগ্য হয়েই থাকতে হয়। টবি তাই কুকাজের ধাড়ি হয়ে উঠেছিল বড় হয়ে। আরও একটা কারণ আছে বলে আমি মনে করি। পৃথিবীটা ঘুরছে ডানদিক থেকে বাঁদিকে। জাগতিক ব্যাপার-টাপারগুলো তাই ডানদিকে থেকে বাঁদিকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়—তাহলেই জগতের নিয়মে তাল কেটে যায় না।

টবির মা ছিল ল্যাটা। ছেলেকে পিটিয়েছে বাঁ হাতে। বাঁদিক থেকে ডানদিকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পিটুনি খেতে খেতে জগতের নিয়মের উল্টো দিক দিয়ে গড়ে উঠেছে টবি ড্যামিট। হয়েছে মহাশয়তান।

তাই কথায় কথায় দিব্যি গালতো খোদ শয়তানের নাম ধরে। ছেলেবেলা থেকেই মার খেয়ে খেয়ে মেজাজটাও সপ্তমে উঠে যেত একটুতেই। রাগলে চণ্ডাল। গণ্ডারের মতো জেদী। বাজি ধরাটা কথার মাত্রা হয়ে দাঁড়াতো ঠিক এই সময়ে। হাজারো বাজি ধরার মধ্যে শেষকালে যেটা কথায় কথায় মুখে এসে যেত, সেটা এই : মুণ্ডু বাজি রাখছি শয়তানের কাছে!

কত বকেছি, কত গাল্যগাল দিয়েছি, কত ঝগড়া করেছি। টবির গোঁ কমেনি। ড্যাম ইট তো ড্যাম ইট। শয়তানের কাছে মুণ্ডু বাজি ধরে ঝুঁকি নিতে সে এক পায়ে খাড়া।

এরকম বদ অভ্যেস অনেকেরই আছে। কেউ বলে 'অমুকের মরা মুখ দেখবো', কেউ বলে 'অমুকের দিব্যি'। কিন্তু সেই 'অমুক' ব্যক্তিটি যদি ধারে কাছে ঠিক সেই সময়ে হাজির থাকে এবং শাপ-শাপান্তকে লুফে নিয়ে ফলিয়ে দেয়? বাজির বস্তু ছিনতাই করে নিয়ে চলে যায়? অদৃশ্য লোকের সণ্ডাদের সঙ্গে এরকম গা-ঢালা ইয়ার্কি মারাটা ঠিক নয়।

মুণ্ডু নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলার মতো কথায় কথায় শয়তানকে ডাক দেওয়া, শয়তানের কাছে মুণ্ডু বাজি রাখার কথা বলা—এসব যে ভালো নয়—তা টবি যেদিন বুঝতে পেরেছিল—সেদিন আর কিছু করার ছিল না। শয়তানের নাম জপ করলে শয়তান তো আসবেই। কিভাবে এসেছিল, টবির মুণ্ডুর পরিণামটা কি হয়েছিল—তাই নিয়েই এই গল্প।

একটা ব্রীজ পেরোচ্ছিলাম দুই বন্ধু। রাত হয়েছে। ধনুকের গড়নে ব্রীজটা ওপর দিকে ছাওয়া বলে সুড়ঙ্গের মতো মনে হয়। ব্রীজের অপর প্রান্তে রয়েছে একটা ঘোরানো গেট। আমি গেট ঘুরিয়ে বেরিয়ে গেলাম। কিন্তু ছায়ামায়া পরিবেশে টবির মাথা গরম হয়ে গেছিল অনেক আগে থেকেই। গেট ঘুরিয়ে বেরোতে হবে দেখেই শয়তানি জেদ চাপলো মাথায়। ব্যাপারটা তুচ্ছ—কিন্তু চিরকালই তো তুচ্ছ ব্যাপারেও শয়তান-আবাহন করে এসেছে। এখনও তার অন্যথা ঘটল না। এ গেট সে ঘুরিয়ে বেরোতে যাবে কোন দুঃখে? টপকে বেরোবে। এক লাফে ডিঙে যাবে। 'মুণ্ডু বাজি শয়তানের কাছে—'।

রেগেমেগে আমি মুখ খুলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই গেটের ওপাশে ছায়াপুঞ্জ থেকে গলা খাঁকারির মত একটা শব্দ ভেসে এল। আমার কানে কিন্তু

শব্দটা বেজে উঠলো এইভাবে—'তাই হোক!'

থমকে গিয়ে চোখ পাকিয়ে দেখতে গিয়ে নজরে এলো বক্তাকে। দীর্ঘকায় এক বয়স্ক পুরুষ। মেয়েদের ঢঙে সিঁথি রয়েছে চুলের মাঝখানে। সম্ভ্রান্ত আকৃতি। বেশবাস ভদ্রোচিত। শুধু যা একটা মিহি আলখাল্লা জড়ানো সারা গায়ে। সারা অঙ্গে নিতান্তই বেমানান শুধু এই আলখাল্লা।

লোকটা সামান্য খোঁড়া। অন্ধকারের মধ্যে থেকে পা টেনে বেরিয়ে আসতেই তা টের পেলাম। মিষ্ট বচনে আবার সে বললে গলা খাঁকারির সুরে—'তাই হোক!'

টবি নিশ্চয় শুনতে পায়নি ওর জিগিরের জবাব—তাই হেঁকে বললাম—'কানে কালা হয়ে গেলে নাকি? ভদ্রলোক তো বলছেন, তাই হোক।'

'বলছেন নাকি!' মুখখানা কিরকম যেন হয়ে গেল টবির। বর্ণালীর সব ক'টা রঙ মুখের ওপর ফুটে উঠল পর-পর। যুদ্ধ জাহাজের মুখোমুখি হলে আকৃতি দাঁড়ায় যেরকম, মুখখানাকে প্রায় সেইরকম করে তুলে ও বললে—'বেশ! বেশ! তবে তাই হোক!'

ব্যস, অন্ধকারের আগন্তুক তক্ষুনি লেংচে লেংচে আরও এগিয়ে এসে টবির হাত ধরে খুব আদর করে নিয়ে গেল ঘোরানো গেটের সামনে।

বললে—'যেই বলব, এক-দুই-তিন-ছোটো'—তুমি ছুটবে। পায়রা ডানা মেলে উড়ে যায় যেভাবে, ঠিক সেইভাবে দু'হাত নাড়বে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

'এক-দুই-তিন-ছোটো!'

ছুটলো টবি। গেটের কাছাকাছি গিয়েই উঠে গেল শূন্যে। যেন বাতাসের ওপর দিয়ে ছুটছে। দু'হাত নাড়ছে পায়রার ডানার মতো। গেটের ঠিক মাথা পর্যন্ত গিয়েই কিন্তু ধপ করে আছড়ে পড়লো গেটের ওপরেই। দীর্ঘকায় লোকটা তীরের বেগে দৌড়ে গিয়ে কালো আলখাল্লা মেলে ধরতেই শূন্য থেকে কি যেন এসে পড়লো আলখাল্লার মধ্যে। মিহি কাপড়ের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে সাঁৎ করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল অন্ধকারের আগন্তুক।

দৌড়ে গিয়ে দেখলাম, ভয়ানক জখম হয়েছে টবি। শূন্যপথে উড়ে যাওয়ার ফলে গিয়ে পড়েছিল একটা চ্যাপ্টা ধারালো লোহার পাতে—খাঁড়ার মতোই এক কোপে ধড় থেকে আলাদা করে দিয়েছে মুণ্ডু!

সেই মুণ্ডুই নিচ থেকে লুফে নিয়ে কাপড়ে মুড়ে নিশ্চয় চম্পট দিয়েছে ল্যাংচা আগন্তুক। কেননা, অনেক খুঁজেও আশপাশে মুণ্ডুটা পেলাম না।

টবিকে নিয়ে এলাম হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছে। ওষুধে কাজ হলো না। টবি বোধহয় নরকেই চলে গেল—যেখানে আগেই চালান হয়েছে তার মুণ্ডু।

ল্যাংচা লোকটা কে, তা কি আর বলতে হবে? □

নাক-সুন্দরের নামের মোহ

[ল্যাওনাইজিং]

নামী লোক আমি; ছিলামও তাই। আমি লেখক নই, মুখোশধারীও নই। নাম আমার রবার্ট জোন্স। জন্মেছিলাম ফুম-ফুজ শহরে।

ধরায় অবতীর্ণ হয়েই আমি নাকি দু'হাতে আমার নাক খামচে ধরেছিলাম। তাই দেখে মা আমাকে জিনিয়াস বলেছিল। আনন্দে কেঁদে ফেলে বাবা উপহার দিয়েছিলেন একটা বিজ্ঞানের বই। রসিক পুরুষ তিনি। বইটার নাম Nosology; হঠাৎ পড়লে মনে হবে বুঝি, নাক নিয়ে বিজ্ঞানের কথা। কিন্তু Nosology মানে, নানারকম রোগের শ্রেণীবিভাগ; কোন্ রোগ কোন্ শ্রেণীতে পড়ে—তাই নিয়েই নোজোলজি।

প্যান্ট পরা শেখার আগেই নোজোলজি কণ্ঠস্থ করে ফেললাম।

তারপর আর একটু বিজ্ঞানচর্চা করলাম—সে বিজ্ঞান অবশ্য নাক নিয়ে। কারণ নাকই আমার সব। এমন নাক ভূভারতে কারও নেই। নাক-সুন্দর নাম হওয়াই উচিত ছিল আমার। যাক সে কথা। বাবার দেওয়া নাম নিয়ে তো নাম কিনতে পারব না। তাই ঠিক করলাম ভগবানের দেওয়া নাক নিয়ে নামী লোক হবো। আমার পড়াশুনোটা হলো সেই দিকেই—মানে, নাকের দিকে। অচিরেই আবিষ্কার করলাম, যার পাঁচজনকে দেখানোর মতো খাসা নাক আছে—সে শুধু নাক দেখিয়েই নাম কিনতে পারে। তাই রোজ সকালে দু'বার নাক মলতাম আর

ছ-ঢৌক মদ গিলতাম। উদ্দেশ্য, নাকের ব্যায়াম। নিছক থিওরি মুখস্থ করে নিরস্ত থাকার বান্দা আমি নই।

বড় হলাম এইভাবে। নাকের সাইজটা তখন কিরকম দাঁড়িয়েছিল, তা অনুমান করে নিন। বাবা একদিন আমাকে ডাকলেন। পড়ার ঘরে বসালেন। জিজ্ঞেস করলেন—আমি বেঁচে আছি কি জন্যে?

আমি বললাম—'নাকের জন্যে। নাক নিয়ে গবেষণা করার জন্যে।'

'সেটা আবার কি?'

'একটা বিজ্ঞান।'

'কি নাম বিজ্ঞানটার?'

'নোজোলজি।'

'নোজোলজি মানে নাকের বিজ্ঞান! বেরো বাড়ি থেকে।'

বাবা আমাকে তাড়িয়ে দিলেন। তাতে ভালোই হলো। নাকের দলাই মলাই করে নিয়ে লিখে ফেললাম নাকের ওপর একটা পুস্তিকা।

সেই পুস্তিকা হইচই ফেলে দিল কাগজ-মহলে। দারুণ প্রশংসা বেরোলো সব কটা পত্রপত্রিকায়। আমার হদিশ বের করার জন্যে সবাই যখন ক্ষেপে উঠেছে, আমি তখন হাজির হলাম এক শিল্পীর কামরায়। সেখানে অনেক মান্যগণ্য খানদানি মানুষ ছিলেন। তাঁরা আমার নাক দেখে বর্তে গেলেন। শিল্পী আমার নাকের ছবি আঁকতে চাইলেন। আমি মোটা টাকা চাইলাম। পেয়েও গেলাম। সেই টাকায় ঘর ভাড়া নিয়ে আমার নাসিকা-বিজ্ঞান বইখানার নিরানব্বইতম সংস্করণ লিখে ফেলে দেশের রানিকে পাঠিয়ে দিলাম—তাতে এঁকে দিলাম আমার খাসা নাকের একটা ছবি। দেখে নিশ্চয় তাজ্জব হয়েছিলেন দেশের রাজা। নইলে আমাকে খেতে ডাকবেন কেন!

জ্ঞানীগুনীদের সঙ্গে খেতে বসে কত জনের কত রকম বড়াই যে শুনলাম। অতীতের নামী লোকগুলো এদের কাছে যেন নস্যি ছাড়া কিছুই নয়। একজন তো বলেই দিলেন, সব দার্শনিকই মূর্খ—আর মূর্খরাই হয় দার্শনিক! ফুম-ফুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি জানালেন, চাঁদকে থ্রাস, ঈজিপ্ট, রোম আর গ্রীসে কি-কি নামে ডাকা হতো। আর একজন পণ্ডিত জ্ঞান দিলেন, পরী মানেই হলো ঘোড়া, মোরগ আর ষাঁড়; ষষ্ঠ স্বর্গে কার নাকি সত্তর হাজারটা মুণ্ডু আছে; পৃথিবীটাকে মাথায় তুলে রেখেছে একটা আকাশি-নীল গাভী যার মাথার অসংখ্য শিংগুলো সবুজ রঙের। নানান বৈজ্ঞানিক বলে গেলেন বিজ্ঞানের নানান খবর।

আর আমি বললাম শুধু নাসিকা-বিজ্ঞানের আবির্ভাব আর আবিষ্কারের কাহিনী।

শুনে আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেল প্রত্যেকেরই। তারিফের ঝড় বয়ে গেল ঘরময়। সেই সঙ্গে ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ। বিশেষ করে একজন বিচ্ছিরি গালাগাল দিতেই তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলাম। গুলি ছুঁড়ে তার নাক উড়িয়ে দিলাম।

তাতেও আমার নাম হলো না। উল্টে গালাগাল দিয়ে সবাই ভূত ছাড়িয়ে দিল আমার।

মনের দুঃখে বাবার কাছে গিয়ে সব কথা বললাম।

বাবা বললেন—'চালিয়ে যা নাসিকা-বিজ্ঞানের চর্চা। শুধু মনে রাখিস, যার যে জিনিসটা নেই—তাকে সেই জিনিসটা দেখাতে যাসনি। তাতে নাম করা যায় না—দুর্নামই হয়।'

তাই আর নাক দেখাতে যাই না কাউকে—তবে নোজোলজি নিয়ে আদাজল খেয়ে লেগেছি। □
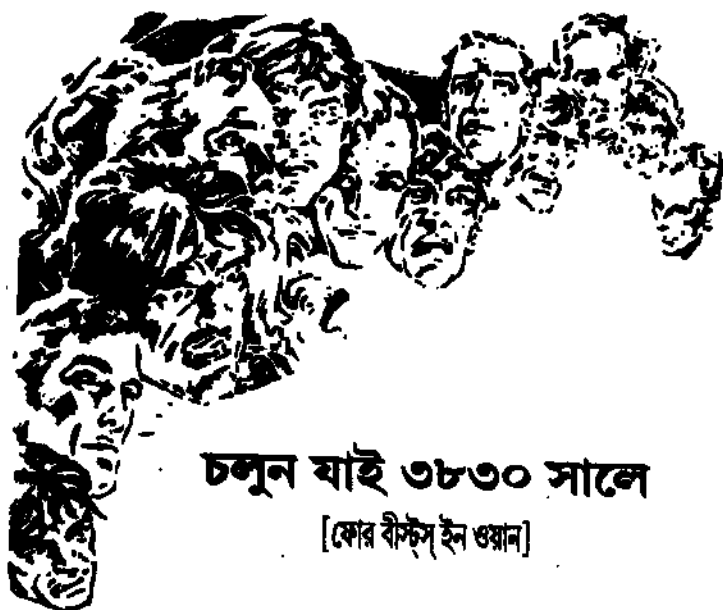
চলুন যাই ৩৮৩০ সালে

[ফোর বীস্ট্স্ ইন ওয়ান]

যিশুখ্রীষ্ট ধরায় অবতীর্ণ হওয়ার ১৭১ বছর আগে সিরিয়া দেশে এপিফানেস নামে এক নরপশু রাজাকে নিয়ে ঐতিহাসিকরা অনেক গালভরা কথা লিখে গেছেন। রাজা হলেই তাদের প্রশস্তি গাইতে হয়। ঐতিহাসিকদের চাকরি নইলে থাকে না।

কিন্তু ইতিহাস তো ঘুরে ফিরে চলে আসে। এই এক আশ্চর্য ব্যাপার! যত গালগল্পই লেখা হোক না কেন (সত্যি ঢাকবার মতলবে), হাজার হাজার বছর পরে দেখা যায়—আসল ব্যাপারটাই নতুন করে ঘটে যাচ্ছে।

তাই যদি হয়, তাহলে চলুন আজ থেকে হাজার দুই বছর পরের সত্যি ইতিহাসে! দেখা যাক, নরপশু এপিফানেস আর ক'রকমের পশু হতে পেরেছে।

খেয়াল রাখবেন, এই কল্পকাহিনী লিখছি ১৮৪৫ সালে বসে। আমরা দেখবো উল্টো ইতিহাসের ভাবী চেহারা। নইলে তো সত্যিটা জানতে পারবেন না!

বিদঘুটে শহরটার নাম থাকছে একই—অ্যানটিয়োক। আশ্চর্য এই শহরের কিম্ভূত কাণ্ডকারখানার কিছুটা মিনিট কয়েকের জন্যে দেখবার জন্যে মনটাকে শক্ত করুন।

চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন অরন্টেস নদী। অসংখ্য ঝর্ণা আর প্রপাত নিয়ে বহমান অপূর্ব নদী। কখনো বয়ে চলেছে পাহাড় ফুঁড়ে, কখনো বাড়ি ঘরদোরের জঙ্গল ভেদ করে। দক্ষিণ দিকে বারো মাইল দূরে ওই যে আয়নার মত

নীল জল দেখতে পাচ্ছেন, ওই হল ভূমধ্যসাগর। আর এদিকে এই যে [illegible] অরণ্য দেখতে পাচ্ছেন—এ সব কিছু ৩৮৩০ সালেই গড়ে উঠেছে। উল্টো ইতিহাসের ধারা ধরে আপনি ১৮৬৫ সালে এসে দেখবেন, সবই ধ্বংসস্তূপ। এখন এই সুন্দর শহরের শোভা দেখে আপনার যদি শেক্সপীয়র আওড়াতে ইচ্ছে হয়, তাহলেও খেয়াল রাখবেন, আবার আপনাকে পেছিয়ে আসতে হবে অনেকগুলো বছর উল্টো ইতিহাসের সড়ক ধরে—কেননা শেক্সপীয়র তো এখনো জন্মানই নি!

অবাক হচ্ছেন? এমন একটা মজবুত শহর ধ্বংসে হয়ে গেছিল? কিন্তু মশায়, এইটাই তো হয়। তিন-তিনটে ভূমিকম্প যে শহরের ভিত পর্যন্ত নড়িয়ে দিয়ে তাকে ধূলিসাৎ করেছিল, সেই শহরকেই প্রকৃতি এখন কত আগলে রেখে দিয়েছে দেখছেন তো! ছাইয়ের গাদাতেই ফুল ফোটে। ধ্বংসস্তূপেই সৌধ গজায়! প্রাকৃতিক নিয়ম নিশ্চয়!

যাচ্চলে! নিজের কথাতেই সাতকাহন হচ্ছি। কি বলছেন? নর্দমা, আবর্জনা, ধোঁয়া, দুর্গন্ধ? পুতুল পুজোর আখড়া যে এখানে। ধূপের ধোঁয়া তো দেখবেনই। তাল ঢ্যাঙা বাড়িদের লম্বা লম্বা থামের আড়ালে আবডালে সরু সরু গলি তো থাকবেই—জঞ্জাল সেখানে জমবে না! নর্দমায় গন্ধ থাকবে না! কি যে বলেন।

হাসবেন না! হাসবেন না! ওই যে হাফ-ন্যাংটো লোকগুলো মুখে রঙ ঘষে হাত-পা তুলে চেঁচাচ্ছে—ওরা কিন্তু কেউই পাগল নয়। ওরা দার্শনিক। পাঁচজনকে জ্ঞানদান করছে। ওদের মধ্যে দেদার ভণ্ডও আছে। নীতিবাক্য ভণ্ডরাই বেশি আওড়ায়—তাই না!

ওদিকে দেখুন! নিরীহ লোকদের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে একদল লোক কিরকম মজা পাচ্ছে! রাজা মশায়ের ধামাধরা ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী। ভাঁড় বলতেও পারেন। রাজা খুশি থাকলেই এদের পোয়া বারো।

ভয় পেলেন মনে হচ্ছে? গোটা শহরে বুনো জানোয়ার গিজগিজ করছে তো আপনার কি? ওরা তো মানুষের সেবা করে চলেছে। কারুর গলায় দড়ি—কারুর গলায় নেই। বাঘ, সিংহ, চিতা পর্যন্ত দেখুন কিরকম স্বাধীনভাবে মালিকদের পেছন পেছন চলেছে। ওদের প্রত্যেককে শেখানো হয়েছে কখন কি কাজ করতে হবে। মাঝে মধ্যে অবশ্য শিক্ষাদীক্ষাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে আদিম বন্য হয়ে ওঠে। অস্ত্রধারীকে খেয়ে নেয়, বন্দদের রক্তপান করে ফেলে—কিন্তু এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। সব জীবই প্রকৃতির দাস—মানুষ প্রকৃতির আহ্বানকে ঠেকাতে পারে? ওরা পারবে কি করে?

কান খাড়া করে কি শুনছেন? সোরগোলটা কিসের, সেটা আমার মুখেই শুনে নিন—দেখতে চাইবেন না। ধাতে সইবে না। আমোদপ্রিয় রাজা নতুন রঙ্গ দেখতে চেয়েছে। হিপোড্রোমে নিশ্চয় মরণ-পণ কুস্তি চলছে; নয়তো সিদিয়ান কয়েদীদের পাইকারি হারে খুন করা হচ্ছে; অথবা হয়তো রাজা তার নিজেরই নতুন তৈরি প্রাসাদে আগুন লাগিয়ে দিয়ে নকলকে আগুনের শিখা দেখতে

দেখতে তূরীয় হয়ে আছে; কিম্বা খুব সম্ভব চোখ-জুড়োনো কোনো দেবালয়কে ভেঙে মাটিতে ফেলা হচ্ছে। অট্টরোল বেড়েই চলেছে কেন? ইহুদিদের পুরো একটা দলকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার জন্যেই নিশ্চয় হাহাকার আর হাসির ঐকতান গগনভেদী হয়ে উঠছে। কত রকমের বাজনা বাজছে শুনেছেন? আকাশ বাতাস যেন ফালাফালা হয়ে যাচ্ছে—লক্ষ কণ্ঠের অট্টরোল বিকট করে তুলেছে এত বাজনার হট্টগোলকে।

আরও মজা যদি দেখতে চান, নেমে আসুন আমার সঙ্গে—এইদিক দিয়ে আসুন! হুঁশিয়ার! বড় রাস্তায় এসে পড়েছেন। কাতারে কাতারে মানুষ যাচ্ছে যাক—আপনি একটু সরে দাঁড়ান। এরা আসছে রাজপ্রাসাদের দিক থেকে। তার মানে শোভাযাত্রার মাঝে আছে স্বয়ং রাজামশায়। ওই শুনুন চিৎকার—নকিব চলেছে চেঁচাতে চেঁচাতে—হট যাও! হট যাও! রাজা আসছেন! চলুন গিয়ে গা আড়াল দিয়ে দাঁড়াই ওই মন্দিরটায়।

ও কি মশায়! বিগ্রহ দেখে থমকে গেলেন কেন! দেবতা আশিমাহ্-কে চিনতে পারছেন না! ভবিষ্যতের সিরিয়ানরা কিন্তু এই না-মানুষ, না-ছাগল, না-ভেড়া জীবটাকেই একদা ভগবান বলে পুজো করেছিল।

চশমাটা চোখে লাগান। যা দেখছেন, তা বেবুন-ই বটে। বেবুন-বিগ্রহ! গ্রীক শব্দ 'সিমিয়া' থেকে এর নামকরণও হয়েছে সেইভাবে। অথচ উনি খুব বড় মাপের দেবতা। এ থেকেই বোঝা যায়, দেশের পুরাতত্ত্ববিদগুলো কত গণ্ডমূর্খ!

তূরি ভেরি কাড়ানাকাড়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন? বাচ্চাকাচ্চাদের চেঁচানি আর লাফানির মানে বুঝছেন? রাজা আসছেন! রাজা আসছেন! এইমাত্র তিনি এক হাজার ইজরায়েলবাসী নিধন সমাপ্ত করেছেন—নিজের হাতেই হাজার জনকে বলি দিয়েছেন! মহাবীর সেই রাজা এখন বিজয়-মিছিল নিয়ে বেরিয়েছেন। আকাশ চৌচির হয়ে যাওয়া ওই যে গলাবাজি—ওতো রাজার পারিষদদের গলা থেকেই বেরোচ্ছে—মহাবীর (অথবা মহাখুনে)-এর জয়গানে গলা ফাটিয়ে ফেলছে! জানোয়ার কোথাকার! সৈন্যগুলো পর্যন্ত কুচকাওয়াজ করে আসছে-আর ল্যাটিন গানে রাজার জয়গান গাইছে। দেশবাসীদের মুখের রঙ লক্ষ্য করুন। টকটকে লাল! প্রশংসায় আর শ্রদ্ধায়। শিবনেত্র হয়ে রাজবন্দনা করে চলেছে। ননসেন্স!

এসে গেছে রাজা। দেখতে পাচ্ছেন না? কি মুশকিল। ওই তো ওই বিদঘুটে জানোয়ারটাই এদেশের রাজা! আদ্ধেক বাঘ, আদ্ধেক উট। খুর ছুঁড়ে লাথাচ্ছে তাদেরই যারা খুরে চুমু খেতে যাচ্ছে। চার পায়ে দিব্বি হাঁটছে। লম্বা ল্যাজটাকে দু'পাশ থেকে দুই খাস উপপত্নী তুলে ধরে রেখেছে। এমন রাজাকেও চিনতে কষ্ট হয়? আসলে কি জানেন, লগ্ন অনুসারে রাজবেশ পরে আমাদের এই রাজামশাই। পয়লা নম্বরের স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী, উন্মাদ এই রাজন্যটি যে এইমাত্র স্বহস্তে হাজার ইজরায়েলি বধ করে এসেছে। জয়োল্লাস-মিছিলে তাই তো চাই পশু-বেশ। তাই পশু-চর্মের আড়ালে পথে বেরিয়েছে নর-পশু। দুটো পশুর

চামড়া দেখতেই পাচ্ছেন, নর-পশুটা রয়েছে ওদের তলায়, চার নম্বর পশুটা কে বলতে পারেন?

মানুষ! মানুষ। সব মানুষই আসলে পশু!

আরে! আরে! আরে! হট্টগোল বেড়ে গেল কেন? কেন এত ছুটোছুটি! সর্বনাশ! ক্ষেপেছে বাঘ সিংহ চিতার দল। তারা সইতে পারছে না ভেকধারী রাজার নষ্টামি। কিম্ভূত এই জীব তারা জীবনে দেখেনি—তাই দল বেঁধে তাকে নিধন করবে ঠিক করেছে—ওই দেখুন রাজা পালাচ্ছে—উপপত্নী দুজন ল্যাজ ধরে পালাচ্ছে··· দে চম্পট! দে চম্পট! দে চম্পট! সোজা হিপোড্রোম! নিষ্কৃতি পেয়েও উল্লাসটা দেখেছেন। গলা ছেড়ে গান গাইছে স্তাবকের দল। রাজা নাকি দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে গেছে! হেরে গেছে বাঘ সিংহ চিতার দল!

আর দেখতে চান না? একাধারে চার পশু দেখেই শখ মিটে গেল? খেয়াল রাখবেন, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে এইভাবেই! □

ঘণ্টাঘরের শয়তান

[দ্য ডেভিল ইন দ্য বেলফ্রি]

গ্রামটার নাম উচ্চারণ করতে গেলে দাঁত খসে পড়তে পারে। লিখতে বাধা নেই। শুধু পড়ে যান।

ভনডারভিট্টিমিট্টিস। পড়তে পেরেছেন? ওলন্দাজদের বড় প্রিয় গ্রাম। পৃথিবীর সুন্দরতম গ্রাম—'ছিল' একদা; এখন আর নয়। আশ্চর্য সুন্দর এবং নিতান্তই অভিনব এই গ্রামের সৌন্দর্য হানি ঘটল কিভাবে, নিজ দায়িত্বে লিখতে বসেছি সেই ইতিহাস। লিখব নিরপেক্ষভাবে—যেভাবে আমি লিখি।

যেদিন থেকে এই গ্রামের পত্তন, সেইদিন থেকে এই অঘটনের আগে পর্যন্ত একইভাবে রয়ে গেছিল—ভনডারভিট্টিমিট্টিস। একটুও পালটায়নি। ধরাপৃষ্ঠে তার আবির্ভাব কবে, সেটা অবশ্য দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে জানা যায়নি। খটমট নামটা এল কিভাবে, তাও অনেক গবেষণা করেও জানা যায়নি। তবে শুরুর মুহূর্ত থেকে অঘটনের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ভনডারভিট্টিমিট্টিস যে একই চালে আর একই চেহারায় চলেছে, তা দিব্যি গেলে বলবে গ্রামের প্রবীণতম পুরুষ।

এ গ্রাম গড়ে উঠেছিল ছোট্ট এক উপত্যকায়। বৃত্তাকার উপত্যকা। সিকি মাইল তার বেড়। ঘিরে আছে নরম চেহারার পাহাড়। সেই পাহাড়ের পাঁচিল টপকে কেউ কক্ষনো গ্রামে ঢোকেনি। গ্রামের লোকেরও তাই বিশ্বাস, পাহাড়ের ওপারে কিছুই নেই।

ছোট্ট এই উপত্যকা একেবারে চ্যাটালো। আগাগোড়া চ্যাপ্টা টালি দিয়ে

বাঁধানো। উপত্যকা ঘিরে বৃত্তের ওপর তৈরি হয়েছে ষাটটা ছোট্ট বাড়ি। সব বাড়িরই পেছন দিক রয়েছে পাহাড়ের দিকে—সামনের দিক মুখ ফিরিয়ে রয়েছে উপত্যকার ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে। কেন্দ্রবিন্দুর দূরত্ব প্রতিটা বাড়ির সদর দরজা থেকে ঠিক ষাট গজ দূরে—এক ইঞ্চিও কম বেশি নয়। প্রতিটা বাড়ির সামনে রয়েছে ছোট্ট একটা বাগান। বাগান ঘিরে রয়েছে বৃত্তাকার পথ। বাগানের মধ্যে রয়েছে একটা সূর্যঘড়ি আর চব্বিশটা বাঁধাকপি। সব বাড়িই হুবহু একরকম—একই প্যাটার্ন—একটা থেকে আর একটার তফাৎ ধরা যায় না। বিলক্ষণ প্রাচীন বলেই স্থাপত্য কৌশল একটু কিম্ভূত মনে হতে পারে, তাতে কিন্তু বাড়িদের সৌন্দর্য বিন্দুমাত্র বিঘ্নিত হয়নি। পুড়িয়ে-ঝামা লাল-কালো খুদে খুদে ইঁট গেঁথে তৈরি প্রতিটা বাড়ি—ফলে, দাবার ছকের মতো দেখতে হয়েছে দেওয়ালগুলো। ঢালু ছাদ দিয়ে ঘেরা দেওয়ালের ওপরদিক; কার্নিশ বেরিয়ে আছে চারদিকেই—দরজার ওপরেও। জানলাগুলো খুব সরু আর দেওয়ালের ভেতরে ঢোকানো—প্রচুর কাঁচ দিয়ে ঢাকা। টালি দিয়ে মোড়া ছাদ—সব টালিদেরই কান দুমড়ে তোলা ওপর দিকে। কাঠের রঙ গাঢ়। কারুকাজ খুবই সেকেলে—কারণ, বাড়ি তৈরির পর থেকে নতুন করে কাঠ-খোদাই আর হয়নি। তবে যেখানে পেরেছে, সেখানেই টাইমপিস আর বাঁধাকপি কাঠ খুদে এঁকে রেখেছে গ্রামের মানুষ। বাটালি জানে যেন শুধু এই দুটি বস্তুকেই কাঠের গায়ে ফুটিয়ে তুলতে।

বাড়িদের বাইরেগুলো যেমন একইরকম, ভেতরগুলোও তাই। আসবাবপত্র তৈরি হয়েছে একই নকশায়, চৌকো টালি বসিয়ে বানানো হয়েছে মেঝে; কালো রঙের কাঠ কেটে তৈরি হয়েছে চেয়ার আর টেবিল—তাদের প্রত্যেকের পায়া বেঁটে আর বাঁকা। ম্যান্টলপিস অতিকায়—আগাগোড়া কাঠের—তার ওপরে এন্তার টাইমপিস আর বাঁধাকপির খোদাই কাজ—সেই সঙ্গে সত্যিকারের প্রকাণ্ড একটা টাইমপিসও কান ঝালাপালা করা শব্দে নিরন্তর টিকটিক করে যাচ্ছে ম্যান্টলপিসের ঠিক ওপরেই—দু প্রান্তে দুটো ফুলদানিতে বসানো দুটো বাঁধাকপি। এ ছাড়াও, প্রতিটা বাঁধাকপি আর টাইমপিসের ফাঁকে একটা করে পেটমোটা চিনেম্যান—তার নাদা পেটের গহ্বরে দেখা যাচ্ছে একটা ঘড়ির ডায়াল।

ফায়ার প্লেস বিশাল আর সুগভীর। কুটিল-দর্শন ভয়ানক হিংস্র আগুন-কুকুর দাঁত খিঁচিয়ে রয়েছে তার মধ্যে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে সর্বক্ষণ। আগুনে বসানো মস্ত একটা গামলা। তাতে ফুটেই চলেছে শুওরের মাংস। বাড়ির গিন্নি অষ্টপ্রহর মাংস নাড়তে ব্যস্ত। মোটাসোটা ক্ষুদ্রকায়া মহিলা। নীল চোখ। লাল মুখ। লম্বাটে পাঁউরুটির গড়নে মস্ত টুপি আঁটা মাথায়। তাতে আবার লাল আর হলদে ফিতের কতই না কাজ। পোশাক-আশাক কমলা রঙের উলের কাপড় কেটে বানানো। পিঠের দিকে কাপড় বেশি, কোমরের কাছে কম, হাঁটু পর্যন্তও ঝোলে না—এত খাটো। পা তাঁর গোদাগোদা, গোড়ালি যুগলও তাই—তবে

সবুজ মোজা-ঢাকা থাকে বলে অতটা বোঝা যায় না। জুতো গোলাপি চামড়ার—হলদে ফিতে দিয়ে বাঁধা—ফিতের গিট বাঁধা হয়েছে বাঁধাকপির ডিজাইনে। বাম মণিবন্ধে পরে থাকেন ছোট্ট কিন্তু বেজায় ভারি একটা ওলন্দাজ ঘড়ি; ডান হাতের হাতা দিয়ে নেড়েই চলেন শূকর মাংসের ঝোল। পাশে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ে স্থূলকায় একটা পোষা বেড়াল, টিং টং ডিং ড্যাং ঢ্যাং ঢ্যাং করে বাজতে থাকে ছোট্ট একটা খালি টিনের কৌটো—যে কৌটোকে তার ল্যাজের সঙ্গে সযত্নে বেঁধে রেখেছে বাড়ির দস্যি ছেলেরা 'ধাঁধা' খেলার মতলবে।

ছেলে বলতে তো মোটে তিনজন। বাগানে শুয়োর দেখাশুনো করা তাদের পয়লা ডিউটি। প্রত্যেকেই মাথায় ঠিক দু'ফুট লম্বা। মাথার তিনকোণা টুপির কোণ তিনটে উঁচিয়ে আছে ওপর দিকে। বেগনি রঙের ওয়েস্টকোট ঝুলে পড়েছে উরু পর্যন্ত। হাঁটুতে চামড়ার আচ্ছাদন। পায়ে লাল উলের মোজা আর রুপোর বাকল লাগানো ভারি জুতো। লম্বা কোটের সামনে লাইন দিয়ে নেমে গেছে মুক্তোর বোতাম। প্রত্যেকের মুখে একটা পাইপ আর ডান হাতে একটা ঘড়ি। হুস করে পাইপ টেনে তাকাচ্ছে চারপাশে—তাকিয়েই আবার পাইপ টানছে হুস করে। শুয়োর মহাশয় বিলক্ষণ স্থূলকায় এবং অতিশয় অলস। বাঁধাকপি থেকে খসে পড়া হলদেটে পাতা খেতে এই মুহূর্তে সে বড়ই ব্যস্ত। খেতে খেতেই লাথি মারছে ল্যাজে বাঁধা খালি টিনের কৌটোতে—পাজি ছেলের দল তার ল্যাজেও বস্তুটা বেঁধে দিয়ে গেছে বেড়ালের মতোই তারও সৌন্দর্য বৃদ্ধির অভিলাষে।

সদর দরজার ঠিক সামনেই চেয়ার পেতে বসে রয়েছেন বাড়ির কর্তা। পিঠ উঁচু হাতলওলা চামড়া বাঁধানো এই চেয়ারের পায়াগুলোও ঘরের টেবিলের পায়ার মতো বেঁটে আর বাঁকা। কর্তা মহাশয়কে দেখলে মনে হবে যেন হাওয়া-ঠাসা বেজায় ফুলো একটা জ্যান্ত বেলুন। বড় বড় গোল গোল চোখ। প্রকাণ্ড থুৎনিতে চর্বি আর চামড়ার ডবল ভাঁজ। জামাকাপড় ছেলেদের মতোই। সুতরাং তা নিয়ে আর লিখতে চাই না। তফাৎ শুধু এক জায়গায়। ঐর মুখের পাইপটা সাইজে অতিকায় এবং ধূমপানও করেন ছেলেদের চেয়ে বেশি। ছেলেদের মতো ঐরও কাছে ঘড়ি আছে, তবে সে ঘড়ি থাকে পকেটে। ঘড়ি দেখার চাইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁকে মন দিতে হয়—সে কাজটা কি, একটু পরেই তা বলব। ইনি বসে থাকেন ডান পা বাঁ হাঁটুর ওপর তুলে দিয়ে, উৎকট গম্ভীর করে রাখেন মুখখানাকে, এবং যতক্ষণ এখানে বসে থাকেন, ততক্ষণ দুই চক্ষুর একটা চক্ষুকে নিবদ্ধ রাখেন সমতল ভূমির কেন্দ্রস্থলের অতীব আশ্চর্যজনক একটি বস্তুর ওপর।

বস্তুটা রয়েছে টাউন কাউন্সিল ভবনের গির্জা-চূড়ায়। ভনডারভিট্টিমিক্রিস-কে গ্রাম বলা চলে, আবার নগরও বলা চলে। টাউন কাউন্সিলের সদস্যদের প্রত্যেকেই খুব খুদে চেহারার, গোলগাল, তেলচুকচুকে, বুদ্ধিসমুজ্জ্বল পুরুষ; প্রত্যেকেরই চোখ থালার মতো গোল, চিবুকে ডবল ভাঁজ; সাধারণ বাসিন্দাদের

জামার চেয়ে এঁদের জামা অনেক বেশি লম্বা, জুতো অনেক বেশি ভারি, জুতোর বাক্‌ল্‌-এর সাইজও বড়। আশ্চর্য এই গ্রামে আমার অভিযানের পর ঐরা পর-পর কয়েকটা অধিবেশনে বসে তিনটে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঃ—

"আগে থেকে চলে আসা ভালো ভালো ব্যবস্থাগুলো পালটে দেওয়াটা ঠিক হবে না ঃ"

"ভনডারভিট্রিমিট্রিস-এর বাইরে এমন আর কিছুই নেই যা সহ্য করে টিকে থাকা যায় ঃ"—

"কপি আর ক্লক-আমাদের সঙ্গেই থাকবে—ছাড়ব না কক্ষনো।"

কাউন্সিলের অধিবেশন-কক্ষের ঠিক ওপরেই রয়েছে গির্জা-চূড়া। গির্জা-চূড়ায় রয়েছে ঘণ্টাঘর। স্মরণাতীতকাল থেকে এই ঘণ্টা ঘরেই রয়েছে ভনডারভিট্রিমিট্রিস গ্রামের মহা-গর্বের বস্তু—প্রকাণ্ড সেই ঘড়ি—যার দিকে নিষ্পলক চাহনি নিক্ষেপ করে গদি আঁটা বাঁকা-পায়া চেয়ারে গ্যাট হয়ে বসে ধূমপান করে চলেছেন বাড়ির মালিক।

বিশাল এই ঘড়ির সাত দিকে সাতটা মুখ লেপটে রয়েছে চূড়ার সাতটা চ্যাটালো ঢালের ওপর—যাতে বৃত্তাকার উপত্যকার সব দিক থেকেই ঘড়ি দেখা যায় যে কোনও মুহূর্তে। প্রতিটা ডায়াল যেমন বিরাট তেমনি সাদা—কাঁটা আর সংখ্যাগুলো কিন্তু কুচকুচে কালো আর ওজনে গুরুভার। ঘণ্টা ঘরে একজন রক্ষক মোতায়েন থাকে বটে ঘড়ি চালু রাখার জন্যে, কিন্তু কাজটা ভারি আরামের—বসে বসেই মাইনে পাওয়া যায়। কেননা, ভনডারভিট্রিমিট্রিস-এর ঘড়ি মাথা খারাপ করে দেওয়ার মতো কাণ্ড কখনও ঘটায়নি। এই সেদিন পর্যন্তও এই জাতীয় কল্পনাও ছিল নিতান্তই অধার্মিক চিন্তাধারা। সুদূর অতীত থেকে (যদ্দূর পর্যন্ত নাগাল পাওয়া গেছে দস্তাবেজখানার কাগজপত্র ঘেঁটে) এ-ঘড়ি কখনও বেগড়বাঁই করেনি—ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘড়ি বাজিয়ে গুণে গেছে প্রহরের পর প্রহর। একই ব্যাপার ঘটেছে উপত্যকার প্রতিটি হাতঘড়ি আর ক্লক-এর ক্ষেত্রে। সঠিক সময় রক্ষা করে গেছে শুধু এই গ্রামটাই—ধরণীর আর কোথাও নয়। বড় ঘড়ি যখন গলা বাজিয়ে বলেছে—'এই বাজলো বারোটা'—ছোট ঘড়িরা তক্ষুণি সুরে সুর মিলিয়ে কোরাস গেয়ে উঠেছে—'বারোটা··· বারোটা··· বারোটা!' ঠিক যেন পরম অনুগতদের নিখুঁত প্রতিধ্বনি। ভনডারভিট্রিমিট্রিস-এর বাসিন্দারা শুওরের ঝোলের যতখানি ভক্ত—ঠিক ততখানি গর্বিত তাদের ঘড়িদের সম্পর্কেও।

আরামের চাকরি যারা করে, তাদেরকে সব্বাই খুব সম্মানের চোখে দেখে। ঘণ্টাঘরের রক্ষকের ক্ষেত্রেও কথাটা অক্ষরে অক্ষরে খেটে যায়। পরম আয়েশে থেকে থেকে তার গতর গ্রামের প্রবীণতম বাসিন্দার গতরের চাইতেও বিরাট, জামাকাপড়ও বিরাট, জুতোর বাক্‌ল্‌-এর সংখ্যাও বেশি, এমনকি চিবুকে ডবল ভাঁজের বদলে আছে তিন-তিনটে ভাঁজ। গ্রামের শুয়োররা পর্যন্ত সসম্ভ্রমে তাকিয়ে থাকে তার নাদাপেট আর মস্ত পাইপের দিকে—কেননা, এই দুটি জিনিসও

গ্রামের সব পেটি আর পাইপের চেয়ে বড়।

ভনডারভিট্রিমিট্রিস গ্রামের সুখময় দিনের ছবি এইভাবেই আঁকলাম। হায়রে! সেদিন আর রইল না! উল্টে গেল ছবি।

এ গ্রামের সবচাইতে বিজ্ঞ পুরুষরা অনেকদিন ধরেই বলে এসেছেন একটা কথা : 'পাহাড়ের মাথা থেকে কক্ষনো শুভ কিছু নেমে আসতে পারে না।' সুদূর অতীত থেকে প্রবাদটা চালু থাকার ফলে কথাটা যেন একটা ভবিষ্যৎবাণীর রূপ নিয়েছিল। তাই পরশু দুপুরে, বেলা বারোটার একটু আগে, পূবের পাহাড় থেকে একটা বস্তুকে গ্রামের দিকে নেমে আসতে দেখে প্রতিটি বাড়ির কর্তামশায়েরা ভুরু কুঁচকে একটা চোখ নিক্ষেপ করেছিলেন সেইদিকে—অপর চক্ষুটিকে কিন্তু ঠায় নিবদ্ধ রেখেছিলেন ঘণ্টাঘরের ওপর—বসেও ছিলেন একইভাবে খাটখানা ঘরের সামনে পাতা খাটখানা গদিমোড়া চেয়ারে।

দুপুর বারোটা বাজতে যখন পাঁচ মিনিট, তখন প্রথম দৃশ্যমান হয়েছিল আজব বস্তুটা। দুপুর বারোটা বাজতে যখন তিন মিনিট বাকি, তখন আরও স্পষ্ট দেখা গেল পুবের বিস্ময়কে অত্যন্ত পুঁচকে-বপু এক বিদেশী পুরুষ ভয়ানকবেগে নেমে আসছে পাহাড় বেয়ে। এরকম খুঁতখুঁতে রুচির মানুষকে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি ভনডারভিট্রিমিট্রিস গ্রামে। মুখখানা তার গাঢ় নস্যি রঙের। লম্বা নাকটা আঁকশির মতো বেঁকানো। চোখ দুটো মটরদানার গোল আর ছোট্ট। চওড়া মুখবিবরে ঝকঝক করছে লাইন দেওয়া দাঁত। কান এঁটো করা দ্যাখন-হাসি হাসার ফলে দাঁতের এহেন শোভা আরও প্রকট হয়ে উঠেছিল গ্রামবাসীদের বিস্ফারিত একটি চক্ষুর সামনে (অপর চক্ষুটি নিমীলিত ছিল ঘণ্টাঘরের দিকে)। বিশাল গোঁফ আর জুলপির জঙ্গলে ঢাকা পড়ে গেছিল মুখের বাদবাকি অংশ। মাথায় টুপি না থাকায় দেখা যাচ্ছিল টেনে আঁচড়ানো চুলের শোভা—ঠিক যেন খোঁপা হয়ে এঁটেছিল পেছন দিকে। মস্ত কালো কোটের পেছন দিকটা চড়ুই-এর ল্যাজের মতো উঁচিয়ে থাকায় মনে হচ্ছিল যেন বিকট কৃষ্ণপক্ষী বায়ুবেগে অবতীর্ণ হচ্ছে অম্বর থেকে মর্ত্যে; পকেট থেকে বেরিয়ে ধুলোয় লুটোচ্ছিল বিশাল একটা সাদা রুমাল। কালো মোজার ওপর চামড়ার হাঁটু-আচ্ছাদন গোলগাল পা দুটোকে ঢেকে রেখে দিয়েছে বটে—কিন্তু ঢাকতে পারেনি পদযুগলের বিদ্যুৎগতিকে। গলায় বাঁধা কালো সাটিন ফিতের ফাঁস উড়ছে হাওয়ায়। বাঁ হাতে উঁচিয়ে রয়েছে পেল্লায় একটা নস্যাধার—যা থেকে পরম পুলকে নস্য গ্রহণ করে চলেছে মুহুর্মুহু বিপুল লম্ফে পাহাড় বেয়ে নেমে আমার তালে তালে। অহো! অহো! ভনডারভিট্রিমিট্রিস-এর কোনও পুঙ্গব এমন জীব, এমন হৃষ্ট মুখচ্ছবি কখনো দেখেনি!

হৃষ্ট তো বটেই। মুখখানা তার যতই শয়তানিতে, ঔদ্ধত্যে আর দেঁতো-হাসিতে ভরা থাকুক না কেন—হৃদয়-ভর্তি পরিতৃপ্তি তো ভুস ভুস করে ঠেলে উঠছিল মুখের সব জায়গা দিয়ে। পায়ে তার পাতলা সোলের নাচিয়ে জুতো। এই জুতো পরেই নাচিয়েরা ফাটিয়ে দেয় নৃত্য মঞ্চ। এই লোকটা কিন্তু

চক্ষু চড়কগাছ করে ছেড়েছিল গ্রামের প্রত্যেকের তার অপরূপ নৃত্য গ্রামের মধ্যেই দেখিয়ে। কখনো নাচছিল তাল ঠুকে, ছন্দচটুল স্পেনীয় নৃত্য—কখনো গোড়ালির ওপর লাটুর মতো পাক খেয়ে মুসলিম নৃত্য। বদমাস লম্বা পায়রার মতো সেই ফুলবাবুর এত নাচের মধ্যেও একটি জিনিস দেখা যাচ্ছিল না বলে বড়ই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন ভনডারভিটিমিটিস গ্রামের বাটজন কর্তামশায়। জিনিসটা সময় মিলিয়ে পদক্ষেপ না করা। ঘড়ি ধরে পা না ফেলা। এমন অবাক কাণ্ড কক্ষনো দেখা যায়নি এ গ্রামে—সুদূর অতীতকাল থেকে।

হতবাক গ্রাম বাসিন্দাদের চক্ষু যুগল পুরোপুরি বিস্ফারিত হওয়ার আগেই ঝটিকাবেগে তাদের মাঝে এসে পড়েছিল বিচিত্র সেই আগন্তুক। দুপুর বারোটা বাজতে আধ মিনিট বাকি, আশ্চর্য নৃত্য-পরম্পরা ঘটিয়ে নিমেষ মধ্যে পৌঁছে গেছিল ঘন্টা ঘরে। আয়েশি লোকটা তখন বিষম বিস্ময়ে ভীষণ বিমর্ষ হয়ে লাঞ্ছিত মুখে শুধু চেয়েছিল। বিচ্ছিরি আগন্তুক খপ করে ধরেছিল তার লম্বা নাক, আর এক হাতে ঝপ করে ঘন্টা টেনে এনে টুপির মতো চেপে বসিয়ে দিয়েছিল মাথার ওপর দিয়ে তিন-থাকওলা চিবুক পর্যন্ত। পরমুহূর্তেই ফাঁপা ডাণ্ডা তুলে নিয়ে দমাদম পিটে গেছিল ঘন্টা। একে তো ফাঁপা ডাণ্ডা, তার ওপর রক্ষকের ওই রকম ফোলা বপু—ঘন্টার শব্দ এই দুইয়ের সম্মিলনে অবিশ্বাস্য বিকট শব্দলহরী হয়ে, গোটা গির্জা-চূড়ার মধ্যে দিয়ে প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি তুলে ধেয়ে গেছিল গোলাকার উপত্যকার দিকে দিকে।

বারোটা বাজতে যখন আধ সেকেণ্ড বাকি, তখন রক্ষকের নাক মুচড়ে তার মাথায় ঘন্টার টুপি পরিয়েছিল আগন্তুক বদমাস। কাঁটায় কাঁটায় যখন বারোটা—তখন বিকট ঘন্টাধ্বনি নিনাদিত হলো উপত্যকাময়।

পরদেশীর এহেন অভব্য আচরণের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করার আর সময় পায়নি কর্তামশায়, গিন্নিরা আর ছেলেরা চিরকালের অভ্যেস মতো সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দিয়েছিল ঘড়ি মেলানো।

এক-একটা ঘন্টার আওয়াজ শোনা গেছে, উপত্যকা ফাটিয়ে সমস্বরে বলেছেঃ এক···দুই···তিন··· চার···

এইভাবে বারোবার বিকট আওয়াজ হয়েছে। নিরুদ্ধ নিশ্বাসে ঘড়ি মেলানোর গুরুদায়িত্ব সাঙ্গ করে যেই সবাই ঘন্টা ঘরের দিকে চোখ তুলতে যাচ্ছে অমনি····

ঘন্টাধ্বনি হলো আবার!

তেরোর ঘন্টা দুপুর বারোটায়!

হৈহৈ করে উঠলেন কর্তামশায়রা। একি অনাচার! যা কক্ষনো হয়নি—তাই হয়ে গেল! সময় নিয়ে এতবড় নষ্টামি! পাইপ খসে পড়ল প্রত্যেকের মুখ থেকে। গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে গেলে মুখে পাইপ কি রাখা যায়? রেগে কাঁই হয়ে এক দফা চেঁচিয়ে নিয়েই কর্তামশায়রা ফের গ্যাঁট হয়ে বসলেন যে-যার চেয়ারে, ফের তুলে নিলেন পাইপ এবং এত ঘন ঘন টান মারতে লাগলেন যে ঘন ধোঁয়ায় ঢেকে গেল গোটা উপত্যকা।

মধ্যে যেন লজ্জায় আর অপমানে রক্তলাল হয়ে গেছে প্রতিটা বাঁধাকপি। রেগে লাল ঘড়িগুলো তেরোটা বাজিয়ে চলেছে বাটখানা বাড়িতে—ক্লকগুলো শয়তানি-নাচ নাচছে ম্যান্টলপিসে—পেণ্ডুলাম এত জোরে দুলছে যেন খোদ শয়তান ঢুকেছে প্রত্যেকের অন্দরে। সবচেয়ে খারাপ কাণ্ড করে চলেছে শুওর আর বেড়ালগুলো। এতবছরের সু-অভ্যেস ভুলে গিয়ে তারা প্রতিটা ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে খালি টিনের কৌটো আছড়ে আছড়ে না ফেলে, এলোপাতাড়ি বাজিয়ে যাচ্ছে একনাগাড়ে পাগলের মতো ল্যাজ নেড়ে নেড়ে—ফলে ভয়ানক অনৈক জগঝম্পর তানে কানের সব পোকা বেরিয়ে না গিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ছে মানুষগুলোর মাথার মধ্যে।

তামাকের ধোঁয়ায় ঢেকে গেলেও এরই মধ্যে দেখা গেল ঘণ্টাঘরের শয়তানের আর এক শয়তানি। দাঁতে কামড়ে ধরেছে ঘণ্টার দড়ি, বসে রয়েছে চিৎপাত রক্ষকের বুকের ওপর, মাথার ঝাঁকুনি দিয়ে দড়ি টেনে টেনে, ফোঁপরা ডাণ্ডাকে কোলের ওপর রেখে দুহাতে তার ওপর বাজনা বাজিয়ে গিটকিরি দিয়ে গাইছে নরকের গান।

তেরোটা বাজার গান! ভনডারভিট্রিমিট্টিস গ্রামের তেরোটা বাজিয়ে দেওয়ার গান! যে সময় নিষ্ঠার শক্ত বনেদের ওপর দাঁড়িয়েছিল গোটা গ্রামটার হালচাল আর জীবনধারা—সেইটাকেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল শয়তান তেরোটার ঘণ্টা বাজিয়ে!

এমতাবস্থায় ওই গ্রামে থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। পিঠটান দিয়েছি তৎক্ষণাৎ। অনুরোধ জানাচ্ছি সবার কাছে—চলুন, সবাই গিয়ে ভনডারভিট্রিমিট্টিস গ্রামের সুব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা যাক। আর ওই হাড়বজ্জাৎ লোকটাকে ঘাড় ধরে বিদেয় করা যাক। □

ভবিষ্যতের বেলুনযাত্রীর বকবকানি

[মেলোনটা টৌটা]

'স্কাইলাক' বেলুনের দোলনা থেকে,
পয়লা এপ্রিল, ২·৮·৪৮

প্রিয় বন্ধু, অনেক পাপ করেছেন বলেই পাচ্ছেন আমার এই চিঠি। এই চিঠি শুধু বেধড়ক লম্বা-ই হবে না, এর ছত্রে ছত্রে থাকবে বিস্তর বকবকানি—আপনার মাথা ধরিয়ে ছাড়বে। আপনি নিজে একটা মস্ত অপদার্থ, এই চিঠি তার শাস্তি। গোদের ওপর বিষফোড়া আমার বর্তমান অবস্থান। শ'দুয়েক ইতর জীবের সঙ্গে বেরিয়েছি প্রমোদ-অভিযানে। কম করেও এক মাসের আগে ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করবার সম্ভাবনাও দেখছি না। কেউ নেই যে দুটো কথা বলব। কোনও কাজও নেই যে খানিকটা সময় কাটাবো। এ রকম অবস্থাতেই তো বন্ধুকে চিঠি লিখতে হয়। আপনার কর্মফল আর আমার একঘেয়েমি—এই দুইয়ের সম্মিলনে জন্মাচ্ছে এই পত্র—বুঝেছেন নিশ্চয়?

চশমা ঠিক করে নিন। বিষম বিরক্তিতে কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করার জন্যে প্রস্তুত হোন। অতিশয় বিরক্তিকর, এই অভিযানের প্রতিটি দিবসে একটি করে পত্রাঘাত করবার জন্যে আমি কিন্তু প্রস্তুত।

আঃ, কি উঁচু! হাই তুলতে তুলতেই যে চোয়াল ব্যথা হয়ে গেল। বলিহারি যাই মানুষদের মস্তিষ্ক করোটিগুলোকে! ভাল ভাল আবিষ্কার মাথায় খেলে না কেন বুঝি না! বেলুন চাপার হাজার ঝকমারি থেকে পরিত্রাণের পথ কি আর বেরোবে না? আরও তাড়াতাড়ি পথ পরিক্রমার আইডিয়া কেন যে মানুষদের মাথায় আসছে না! ঝাঁকুনি মেরে মেরে চলেছে বেলুন—এ কি কম অত্যাচার।

বাড়ি থেকে রওনা হওয়ার পর একশ মাইলের বেশি পথ পাড়ি দিয়েছি বলে তো মনে হয় না! পাখিরাও তো দেখছি টেক্কা মেরে যাচ্ছে—বিশেষ করে কয়েক জাতের পাখি। বাড়িয়ে বলছি ভাববেন না যেন। যতটা জোরে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে যেন তার চেয়েও কম স্পীডে যাচ্ছি—আশেপাশে তেমন কোনও বস্তু থাকলে বেলুনের গতিবেগ টের পাওয়া যেত। কোনও জিনিসই নেই। ভেসে যাচ্ছি হাওয়ায়। তবে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে দু-একটা বেলুনের সঙ্গে মোলাকাত যখন ঘটছে, শুধু তখনই বোঝা যাচ্ছে, যাচ্ছি কতখানি স্পীডে। তখন অবশ্য খুব এতটা খারাপ লাগছে না। এধরনের পর্যটনে আমার অভ্যেস আছে বলেই মাথার ওপর দিয়ে যখন বোঁ-বোঁ করে অন্য-বেলুন উড়ে যাচ্ছে, তখন মাথায় চর্কিপাক লাগছে না। শুধু মনে হচ্ছে যেন বিশালদেহী শিকারি পাখি ধেয়ে আসছে ছোঁ মারবার ফিকিরে—থাবার নখে গেঁথে তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলতে চায় নিজের ডেরায়। আজ সকালেই তো একটা সাঁ-সাঁ করে বেরিয়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে; দড়িতে বাঁধা ঝোলানো নোঙর ঘষটে গেল আমাদের বেলুনের জাল—যে জাল থেকে ঝুলছে দোলনা। আতঙ্কে কাঠ হয়ে থাকতে হয়েছে সেই সময়টা। ক্যাপ্টেন বললেন, পাঁচশ কি হাজার বছর আগে যে ধরনের চটকদার ভার্নিশ করা সিল্ক দিয়ে জাল তৈরি হতো, সেই জাল যদি থাকত এই বেলুনে, তাহলে জালের দফারফা হয়ে যেত এতক্ষণে। সেই জাল নাকি তৈরি হতো কেঁচো জাতীয় এক পোকার নাড়িভুঁড়ির তন্তু দিয়ে। তুঁতফল খাইয়ে এদের মোটা করিয়ে নিয়ে কলে ফেলে থেঁতো করা হতো। এই মণ্ডকেই 'প্যাপিরাস' বলা হতো প্রথম পর্যায়ে; তারপর নানান কাণ্ডকারখানার পর তার নাম দাঁড়াতো 'সিল্ক।' মেয়েদের মনোরম পোশাক তৈরি হতো নাকি এই জিনিস দিয়ে শুনেই তো আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছিল আমার! বেলুনও তৈরি হতো এই একই জিনিস দিয়ে। দুধ-গাছ নামে এক জাতীয় উদ্ভিদ থেকে এর চাইতেও ভাল জিনিস তৈরি হয়েছিল পরে। যেহেতু বেশি টেকসই, তাই এর নাম দেওয়া হয়েছিল সিল্ক-বাকিংহ্যাম; রবার-সলিউশন দিয়ে ভার্নিশ করার পর জিনিসটাকে দেখতে হতো এ যুগের গাটা-পার্চা'র মতো। বিশেষ এই রবার-কে ইণ্ডিয়ান রবার-ও বলা হতো—আমার তো মনে হয় অসংখ্য ছত্রাক ছাড়া তা আর কিছুই নয়।

দড়িতে ঝোলানো নোঙরের কথাতেই ফিরে আসা যাক। আমাদের বেলুন থেকে যেটা ঝুলছিল, এবার তার কথা বলছি। এক্ষুনি এক বেচারিকে ম্যাগনেটিক প্রপেলার থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়েছে সমুদ্রে। খুবই ছোট ম্যাগনেটিক প্রপেলার। এরকম নৌকো ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরছে নিচে। যেটার কথা বলছি, তা ছ'হাজার টন-এর বেশি নয়। লোক পিল পিল করছে ওইটুকু নৌকোয়। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। গরু-শুয়োরের মতো লোকে এভাবে যেতেও পারে! নিয়ম করে এই ব্যাপারটা বন্ধ করা উচিত। নৌকো যখন এত খুদে, তখন তাতে গুণে গুণে যাত্রী তোলা উচিত—একটা লোকও বেশি থাকবে না।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ব্যক্তি-মানুষের বলি হওয়া
দরকার—সমষ্টির মঙ্গলের জন্যে। জনগণের জন্যেই মানবতা—ব্যক্তি-মানুষের জন্যে নয়। পণ্ডিত বলছিল, এই রেওয়াজ নাকি হাজার বছর আগেও ছিল। কে এক হিন্দু দার্শনিকও নাকি বলেছেন, যুগে যুগে এই একই পদ্ধতি ফিরে এসেছে সমাজে; দু-একজনকে যমালয়ে না পাঠালে সবাই ভাল থাকবে কি করে?

দোসরা এপ্রিল।—আজ সকালে ম্যাগনেটিক জাহাজের টেলিগ্রাফে কথা বলেন নিলাম। ভাসমান টেলিগ্রাফ তারের মাঝের অংশের তদারকি করে যাচ্ছে এই জাহাজ। এক সময়ে নাকি লোকে ভেবেছিল, টেলিগ্রাফ তার ভাসানো যাবে না সমুদ্রে। অদ্ভুত কথা বটে! পণ্ডিতের কাছে শুনে অব্দি হাসি পাচ্ছে আমার। ফট করে বলে দিল—তার ভাসানো যাবে না! আরে বাবা, কেন ভাসানো যাবে না, সে কারণটা কেউ কি ভেবে দেখেছিল? যত্তোসব!

অনেক খবর পেলাম। শুনে পুলকিত হলাম। আফ্রিকায় গৃহযুদ্ধ লেগেছে। ইউরোপ আর এশিয়ায় প্লেগ নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। সুখবর নিঃসন্দেহে। যত লোক মরবে মড়ক আর যুদ্ধে—ততই ভাল থাকবে বাকি লোক। সহজ এই দার্শনিক মতবাদটাই ভাবতে পারত না সেকালে উজবুকরা। মন্দির-মসজিদ-গির্জায় গিয়ে হত্যে দিতে ঠাকুরের কাছে—মড়ক আর লড়াই বন্ধ হলেই নাকি মঙ্গল হবে মানুষের! অজ্ঞ আর বলে কাকে!

তেসরা এপ্রিল।—বেলুনের ছাদে উঠে বসেছি। চারদিক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দোলনায় বসে এত ভাল দেখা যায় না। এভাবে ভাবাও যায় না। লিখছি ছাদে বসেই। কল্পনা এখন দৌড়োচ্ছে। যে-কল্পনাকে বিজ্ঞানীরা ভাল চোখে দেখে না। চিরকালই তাই হয়েছে। কলাশিল্প-কে উন্নত হতে দেয়নি তথাকথিত বিজ্ঞানের মানুষরা। অথচ কল্পনা থেকেই এসেছে থিওরি, থিওরি থেকে সত্য। গ্র্যাভিটি একটা পরম সত্য। নিউটন তার অস্তিত্ব আঁচ করেছিলেন। থিওরি বানিয়েছিলেন। তিনটে কানুন রচনা করেছিলেন। পরে দেখা গেল, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। এই ভুল চিরকাল করেছে যুক্তিবাদী মানুষরা। ধাপেধাপে যুক্তির পথ ধরে এগিয়েছে—তাই অগ্রগতি হয়েছে শামুকের গতির মতো। কিন্তু আত্মা যখন কল্পনা করে, তখন তা এক লাফে শেষটুকু দেখতে পায়। রাম যেমন দেখেছিলেন। তাঁর জানা সত্যকে ধরতে হলে গুটিগুটি এগোতে হবে। কল্পনা আর উপলব্ধির এই ক্ষমতাকে যুক্তিনিষ্ঠ কিছু দার্শনিক আর পণ্ডিত কোনোকালেই আমোল দেননি—বেলুনের ছাদে বসে আমার কল্পনা খুলে যাওয়ায় এমনি অনেক স্ব-প্রতিষ্ঠিত সত্য ভিড় করে আসছে মাথায়—চিরসত্যদের প্রমাণ করার দরকারটা কি? চৌঠা এপ্রিল—গ্যাস কাজ দিচ্ছে ভালই। গাটা-পার্চা জিনিসটাকে ঘষে মেজে আরও ভাল করে তোলা-হয়েছে—তার সঙ্গে মিলেছে এই গ্যাস।

ফলে, বেলুন এগিয়ে চলেছে তরতরিয়ে। তারিফ না করে পারছি না আধুনিক বেলুন ব্যবস্থাকে। হাত-পা ছড়িয়ে বসা যায়, দুর্ঘটনার ভয় একেবারে নেই, চালানো ব্যাপারটাও জলের মতো সোজা (চালানো মানে বেলুনকে খুশিমত উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া)। গতকালের চিঠিতে বৈজ্ঞানিকদের উন্নাসিকতা নিয়ে দু'কলম লিখেছিলাম মনে আছে? প্রথম যখন বেলুন আকাশে উড়েছিল—সে প্রায় হাজার বছর আগে—তখন বেলুন-পরিচালক বেলুনকে স্রেফ ওপরে উঠিয়ে বা নিচে নামিয়ে হাওয়ার স্রোত পেলেই বেলুন ভাসিয়ে নিয়ে যেত সেইদিকে; অথচ তখন তাকে পাগল বলা হয়েছিল। কেন? না, সেই সময়কার দার্শনিকরা বলেছিলেন, এমন কাণ্ড নাকি একেবারেই অসম্ভব। দার্শনিকদের খোঁচা মেরে গেছি গতকালের চিঠিতে এই কারণেই। অনুমান আর কল্পনা এত ঘেন্নাপিত্তির ব্যাপার হতে যাব কেন? এই যেমন মডার্ন বেলুন। এইমাত্র একটা প্রকাণ্ড বেলুন হু-হু করে এগিয়ে আসছে আমাদের বেলুনের দিকেই ঘণ্টায় প্রায় দেড়শ মাইল স্পীডে। যেহেতু আমাদের বেলুন ঘণ্টায় যাচ্ছে মাত্র একশ মাইল স্পীডে—তাই আগুয়ান বেলুনের তিন-চারশ' যাত্রী বিলক্ষণ তাচ্ছিল্যের চোখে চেয়ে আছে এদিকে। আমরা যাচ্ছিও ওদের অনেক নিচ দিয়ে—ওরা যাচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় এক মাইল উঁচু দিয়ে; তাই রাজামহারাজার মতো গাম্ভীরি চালে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আমাদের। ছোঃ! আজকাল দু-শ মাইল স্পীডে যাওয়াও কোনও ব্যাপার নয়। কানাডা মহাদেশে রেলগাড়িতে চাপার কথা মনে পড়ে? ঘণ্টায় তিনশ মাইল স্পীড়ে ট্রেন ছুটছিল। তাকেই বলে স্পীড! কামরার জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য জুড়েমুড়ে গিয়ে একাকার হয়ে গেছিল। ছুটন্ত কামরার মধ্যে নাচ-গান করা গেছিল পরমানন্দে। দশ বছর আগে অবশ্য এই কানাডাতেই ট্রেন ছুটত মোটে দুটো রেল লাইনের ওপর দিয়ে—থাকতও খুব কাছাকাছি। আর এখনকার রেলগাড়ি ছোটে বারোটা রেললাইনের ওপর দিয়ে—পঞ্চাশ ফুট ফাঁক থাকে দুটো লাইনের মধ্যে—এরকম আরও চারটে লাইন পাশে বসানোর তোড়জোড় চলছে। পণ্ডিত বলছে, সাতশ বছর আগে যখন উত্তর আর দক্ষিণ কানাডা একসঙ্গে যুক্ত ছিল, তখন নাকি ওই দু'লাইনের রেলগাড়িতে চেপেই মানুষ যেত মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। ভাবতেও আশ্চর্য লাগছে।

পাঁচুই এপ্রিল।—একঘেয়েমি আর সইতে পারছি না। একমাত্র পণ্ডিতের সঙ্গেই কথা বলা যাচ্ছে। ওর কথা তো সবই প্রাচীন যুগের কথা—কত আর শোনা যায়? সারাদিন ধরে আমাকে বিশ্বাস করতে চাইছে—প্রাচীন আমেরিকানরা নাকি নিজেই নিজেদের শাসন করত!—এ রকম উদ্ভট কথা কেউ কখনও শুনেছে?—প্রত্যেকেই নাকি একটা করে সংঘ গঠন করে ফেলেছিল! উত্তর আমেরিকার ঘাস ছাওয়া প্রান্তরের কুকুররা যা করে—প্রায় তাই—অবশ্য এ-কথা পড়েছি রূপকথা আর উপকথায়। পণ্ডিতের কথা শুনে কিন্তু তাজ্জব বনে গেছি; সেকালের আমেরিকানগুলো নাকি অদ্ভুত এক বদ্ধ বিশ্বাসে ভুগতো—সব

মানুষই নাকি স্বাধীন আর সমান হয়ে জন্মেছে! কারও সঙ্গে কারও তফাৎ নেই! অথচ প্রাকৃতিক বিশ্ব আর নৈতিক জগতেও দেখছি কত রকম স্তর বিন্যাস রয়েছে—সবই এক আর সমান—এই উদ্ভট আইডিয়ার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে কি? প্রত্যেক মানুষই ভোট দিত—নামটা বেরিয়েছিল ওদেরই মাথা থেকে— উদ্দেশ্য পাবলিক ব্যাপারে মাথা গলানো; তারপর একটা সময় এল যখন দেখা গেল, কেউই কারোর কাজে নেই; 'রিপাবলিক' নামক উদ্ভট বস্তুটারও ('রিপাবলিক' নামটাও ওদেরই ব্রেন থেকে বেরিয়েছিল) কোনও শাসনকর্তা নেই। যে দার্শনিকরা জন্ম দিয়েছিলেন 'রিপাবলিক' নামক উদ্ভট জিনিসটার, গভর্ণমেণ্টই নেই দেখে বেশ ফাঁপড়ে পড়েছিলেন। গভর্ণমেন্ট না থাকায় প্রথম যে ব্যাপারটা ঘটছিল (যা দার্শনিকদের মাথার চুল খাড়া করে ছেড়েছিল), তা প্রবঞ্চনার প্রশ্রয়। সহসা দেখা গেছিল, 'ভোট' দেওয়া যায় যত খুশি নির্বাচন নামক প্রহসনের নলচে চাপা দিয়ে, কেউ তা রুখতে পারে না, ধরতেও পারে না—যে পার্টি তা করে, সেই পার্টি যত বড় ভিলেন-ই হোক না কেন, জোচ্চুরি করার জন্যে পস্তায় না বা লজ্জায় মরে যায় না। বিরাট এই আবিষ্কার যেদিন নজরে এসেছিল, সেইদিন থেকেই বিকট এই বদমাসি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে গিয়ে দেখা গেল—রিপাবলিকান গভর্ণমেণ্ট নিজেই বদমাস বলেই টিকে থাকবে এই বদমাসি। মুখ চুন করে দার্শনিকরা যখন ভাবছেন, কিভাবে এই প্রহসন বন্ধের নতুন তত্ত্ব মাথা খাটিয়ে বের করা যায়—ঠিক সেই সময়ে আচমকা পুরো গণ্ডগোলটাকেই খতম করে ছেড়েছিল একটা লোক—তার নাম MOB। লোকটা বিদেশী, অতিকায়, উদ্ধত, নোংরা লোলুপ আর লুঠেরা। তার মগজ ময়ূরের মগজের মতো, হৃদয় হায়নার মতো, স্বভাব ষাঁড়ের মতো। রিপাবলিকের নষ্টামি সে একদিনেই ঘুচিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু এনার্জি বেশি খরচ করতে গিয়ে নিজেই অক্কা পেয়েছিল। লোকটা যত বদই হোক না কেন, মানুষ জাতটাকে শিখিয়ে দিয়ে গেছিল যে-শিক্ষা, আজও তা কেউ ভুলে যায়নি। প্রকৃতির মধ্যে যে জিনিসের সাদৃশ্য পাওয়া যায় না—তা করতে যেও না। অর্থাৎ, প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেও না। পৃথিবী পৃষ্ঠের কোথাও রিপাবলিকজম বা প্রজাতন্ত্রের প্রাকৃতিক সদৃশতা খুঁজে পাওয়া যাবে না—'প্রান্তরের কুকুর'দের কেস ছাড়া এবং তা নেহাতই ব্যতিক্রম—যা থেকে মনে হতে পারে গণতন্ত্র জিনিসটা খুবই উপাদেয় এবং প্রশংসনীয় গভর্ণমেণ্ট হয়ে দাঁড়াতে পারে সেই চতুষ্পদ প্রাণিদের কাছে, যাদের নাম—কুকুর।

ছউই এপ্রিল।—কাল রাতে ক্যাপ্টেনের স্পাই-গ্লাস নিয়ে আলফা-লিরা নক্ষত্র দেখলাম। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলাম, নির্বোধ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল একটা মহা-সত্য : আমাদের সূর্য আর আলফা-লিরা আসলে যুগল-নক্ষত্র—মহাশূন্যে ঘুরছে একই ভার-কেন্দ্র ঘিরে।

সাতুই এপ্রিল।—কাল রাতেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চায় বেশ খানিকটা সময়ে বেশ মজায় কাটালাম। নেপচুনের পাঁচটা গ্রহাণু ছাড়াও চাঁদের বুকে মন্দির

[illegible]

আটই এপ্রিল —পণ্ডিত আজ আনন্দে নাচছে। কানাডা থেকে একটা বেলুন মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময়ে অনেক কথা বলে গেল, এক বোঝা পত্র-পত্রিকাও ফেলে গেল। এ থেকে জানা যাচ্ছে, কানাডায় এককালে ছিল বিরাট এক সাম্রাজ্য। সম্রাটের বাগান-বাড়ির নাম ছিল "স্বর্গ।" ন'মাইল লম্বা এই দ্বীপে এককালে ছিল বিশ তলা উঁচু বাড়ির পর বাড়ি আটশ বছর আগে। জমির দামও ছিল অনেক। ২০৫০ সালের ভূমিকম্পে সব মাটিতে মিশে যায়। সেই জায়গায় গড়ে ওঠে এক আদিম সভ্যতা। তারা শুধু 'টাকা' আর 'ফ্যাশন'-এর মন্দির বানাতো। যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে গিয়ে মেয়েদেরও দৈহিক বিকৃতি ঘটেছিল—ল্যাজের মতো একটা বস্তু ঠেলে বেরিয়েছিল পেছনে—যদিও সেইটাই ছিল সবচেয়ে সুন্দরী হওয়ার লক্ষণ।

আর লিখব না। বেলুন চুপসোচ্ছে। বোতলে ভরে ছিপি এঁটে চিঠি ফেলে দিচ্ছি সমুদ্রে।

তোমার চিরপ্রিয়
পণ্ডিতা

ম্যাগাজিনে লেখার মন্ত্রগুপ্তি

[হাউ টু রাইট এ ব্ল্যাকউড আর্টিকল]

আমার নাম নিশ্চয় আপনার অজানা নয়। সিগনোরা সাইকি জেনোবিয়া। শত্রুরাই শুধু আমাকে সুকি সুবস্ নামে ডাকে। সাইকি শব্দটার ইতর রূপ হলো সুকি। সাইকি একটা গ্রীক শব্দ। এর মানে, আত্মা। আমার গোটা শরীরটাই তো আত্মা। সুকি বা সাইকি-র আর একটা মানে আছে। প্রজাপতি, আমার রঙচঙে জামাকাপড়ের জন্যে প্রজাপতি নামটা খাপ খেয়েও যায়। স্নবস্ নামটা মাথা খাটিয়ে বের করেছে একটা হিংসুটে মেয়ে। আমি নাকি উঁচু অর্থাৎ উন্নাসিক। ভয়ানক চালবাজ। মেয়েটার নাম মিস শালকপি। যদি কখনও দেখা হয়, শাল-কপির নাক ধরে টেনে দেখবেন। বুঝবেন, শালকপি নাম যার, তার কাছ থেকে উঁচু নাকের চেয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় না। আমার বাপ-মা'য়ের দেওয়া পদবী জেনোবিয়া। গ্রীক পদবী। বাবা তো গ্রীক ছিলেন। জেনোবিয়া শব্দটার মানে রানি। আমিও রানি। খেয়াল রাখবেন। মিস শালকপির কথায় কান দেবেন না। আমার আসল নাম সিগনোরা সাইকি জেনোবিয়া—এইটুকু মনে রাখলেই চলবে।

ডক্টর টাকাকড়ি আমাকে একটা সোসাইটির সেক্রেটারি বানিয়ে দিয়েছিলেন বলেই হু-হু করে আমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। আপনার কানেও পৌঁছেছে। সমিতিটার নাম পেল্লায়। শুধু প্রথম অক্ষরগুলো আমরা লিখি। সেটা এই : **PRETTY BLUE BATCH**। গোটা নামটা লিখতে গেলে নামের ডাকে গগন ফাটবে। থাকগে।

প্রত্যেক শনিবারে সদস্যরা একটা করে লেখা পড়ে শোনান। সে সব লেখার মাথামুণ্ডু হয় না। না ভেবে, না পড়ে লেখা। জ্ঞানের গভীরতা নেই, বিজ্ঞানের ছোঁয়া নেই, দর্শনের সৌরভ নেই। জঘন্য!

সোসাইটির সেক্রেটারি হওয়ার পর ঠিক করলাম, ভাল ভাল লেখা পড়াতে হবে। এর জন্যে ভাল ভাল ভাবনা চিন্তারও দরকার। ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিনটায় যে ধরনের লেখা বেরোয়—চাই ওই ধরনের লেখা। সব্বাই জানে, এই ম্যাগাজিনের লেখার ধরনটাই আলাদা। জাতের লেখা। আদর্শ লেখা। পলিটিক্যাল লেখা ছাড়া। ডক্টর টাকাকড়ি কারণটা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। মিস্টার ব্ল্যাকউড একখানা কাঁচি আর তিনজন অ্যাপ্রেনটিসকে সামনে রেখে তিনখানা নামীদামী কাগজ নিয়ে বসেন। প্রতিটা কাগজ থেকে একই বিষয়ের খবরের কিছুটা করে কেটে নেন। তারপর তিন টুকরো খবরকে জুড়ে একটা খবর করেন ওপর নিচে সাঁটিয়ে দিয়ে। ক, খ, গ যদি কাগজ তিনটের নাম হয়, তাহলে খবর সাজানো হয় এইভাবে : ক গ খ, খ গ ক, গ ক খ, ইত্যাদি। একই খবর বিশেষ বৈচিত্র্য ধারণ করে, মার মার কাট কাট করে, বাজার জমিয়ে দেয়। জবর ট্রিক্‌স্ বটে!

ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিনের মূল আকর্ষণ কিন্তু 'কিম্ভূতকিমাকার' শিরোনামে প্রকাশিত আজব প্রবন্ধমালা। প্রতিটি প্রবন্ধ নাকি এমন তীব্র যে লোমকূপের গোড়ায় গোড়ায় আগুন ধরিয়ে দেয়। সোসাইটির কর্তারা আমাকে ব্ল্যাকউড সম্পাদকের কাছে পাঠিয়েছিল এই জাতীয় লেখার মুন্সিয়ানা শিখে আসতে। আমি গেছিলাম। সম্পাদক খুব খাতির করে আমাকে বসতে বলেছিলেন। তারপর অপূর্ব লেখাগুলোর রচনাকৌশল নিয়ে বিশদ বক্তৃতা ঝেড়েছিলেন।

যেহেতু আমি রীতিমত রামধনু পোশাকে নিজেকে চলমান রামধনু বানিয়ে তাঁর সামনে হাজির হয়েছিলাম, তাই তিনি আমাকে গালভরা সম্বোধনও করেছিলেন। বলেছিলেন—"মাই ডিয়ার ম্যাডাম, লিখবেন খু-উ-ব কালো কালি দিগে, খু-উ-ব বড় কলম দিয়ে, খু-উ-ব মোটা নিব দিয়ে। মোক্ষম সিক্রেটটা এবার ফাঁস করছি। মোটা নিব থেবড়ে গেলেও কক্ষনো তাকে সরু করতে যাবেন না। জগতে যত জিনিয়াস আছেন, তাঁদের কেউই খুব ভাল লেখা খুব ভাল কলম দিয়ে লেখেন না। পাণ্ডুলিপি পড়বার সময়ে যেন মনে হয়, পড়বার উপযুক্তই নয়। লোমকূপের গোড়ায় যদি তীব্রতার হলকা বইয়ে দিতে চান—সফলতার এই পয়লা কৌশলটা রপ্ত করবেন সবার আগে। মিস সাইকিয়া জেনোবিয়া, যদি তাতে অমত থাকে, খুলে বলুন—আলোচনা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি।"

উনি থামলেন। আমিও সায় দিলাম। বিশেষ এই কৌশলটার গুজব আমার কানেও পৌঁছেছিল। তাই সাগ্রহে বসে রইলাম তাঁর সম্পাদনা-কৌশলের পরবর্তী অংশ শোনবার জন্যে। হৃষ্ট কণ্ঠে উনি নির্দেশের নামাবলী শুনিয়ে গেলেন এইভাবে :

"আদর্শস্থানীয় দু-একটা লেখার কথা বলা যাক। 'জ্যান্ত মড়া' লেখাটা পড়লে মনে হবে যেন লেখক কফিনের মধ্যেই জন্মেছে, কফিনের মধ্যেই মরতে মরতে

লিখেছে। এক ভদ্রলোকের নিশ্বেস আটকে গেছিল। শেষ নিশ্বেসটা বেরিয়ে যাওয়ার আগেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়েছিল। এই তো ব্যাপার। কিন্তু লেখার গুণে গোটা ব্যাপারটা ভয়ানক তীব্র হয়ে উঠেছিল। লোমকূপের গোড়া আক্রমণ করেছিল। ফলে, লোমকূপ খাড়া হয়ে গেছিল। আপনিও যখন লিখতে বসবেন—নজর থাকবে লোমকূপের গোড়ার দিকে। চাঞ্চল্যকর ব্যাপারটাকে যেভাবেই হোক লেখার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। তবেই লোমকূপের গোড়া আক্রান্ত হবে। লোমকূপ দাঁড়িয়ে যাবে। আপনার জয়জয়কার হবে। বুঝেছেন? বেশ, বেশ। আর একটা লেখার কথা বলি। নাম : 'আফিম-খেকোর জবানিতে'। ফাইন! ভেরি ফাইন! কি উজ্জ্বল কল্পনা দেখুন! সুগভীর দর্শন, চুলচেরা পর্যবেক্ষণ, আগুন আর উত্মার সঙ্গে হাবিজাবি একগাদা কথার মশলা—পাঠক বুঝুক আর না বুঝুক, কিস্‌সু এসে যায় না—কিন্তু গিলে তো খায় কড়া মদের মতো—জানে, নেশা হবে, তবুও। এই লেখাটা পড়ে 'বাহবা' দিয়ে পাঠকরা বলেছিল, কবি কোলরিজ-ই এমন লেখা লিখতে পারেন। আসলে লিখেছিল আমার বেবুন। তাকে জল মিশিয়ে কড়া মদ খাইয়ে দিয়েছিলাম (মিস্টার ব্ল্যাকউড খবরটা দিলেন বলেই বিশ্বাস করলাম—নইলে করতাম না)। তারপর ধরুন, 'অনিচ্ছুক গবেষক' লেখাটা। উনুনের মধ্যে আধপোড়া হয়েও বেঁচে ফিরে এসেছিলেন যে বৈজ্ঞানিক, তাঁকে নিয়ে রক্ত-গরম-করা লেখা। পড়তে পড়তে মনে হবে, অপানি নিজেই উনুনের মধ্যে ঢুকে বসে রয়েছেন। লেখককে তাই করতে হয়। অকুস্থলে প্রবেশ না করলে গা-গরম-করা লেখা বেরোয় না।

'লোকান্তরিত ডাক্তারের ডাইরি' লেখাটা পড়েছেন? বলুন, গা ছমছম করে না? অথচ স্রের গ্রীক শব্দ আর ফালতু বকুনি দিয়ে রুগিদের মাথা মুড়িয়ে গেছিল লোকটা। 'ঘণ্টা ঘরের সেই লোকটা, লেখাটা যদি না পড়ে থাকেন, তাহলে পড়বেন না। সহ্য করতে পারবেন না। গির্জের ঘণ্টা ঘরে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছিল এক যুবক। ঘুম ভাঙল ঘণ্টা বাজার আওয়াজে। ঘন ঘন গমগমে আওয়াজ তার কানের মধ্যে দিয়ে মাথার মধ্যে ঢুকে লণ্ডভণ্ড করে ছাড়ল মাথার কোষগুলোকে। পাগল হয়ে গেল ছোকরা। হয়ে গিয়েও লিখল তার অসহ্য উপলব্ধির ধারাবাহিক বিবরণ। গায়ে কাঁটা দেবে, মিস... মিস সাইকিয়া জেনোবিয়া। পাঠককে যেভাবেই হোক চঞ্চল করে তুলতে হবে। যদি কোনও দিন সুযোগ পান জলে ডুবে মরার অথবা ফাঁসির দড়িতে অক্কা পাওয়ার—সুযোগটা ছাড়বেন না। তখন যে লেখা বেরোবে—প্রতিটা সেকেণ্ডকে কাজে লাগাবেন—সাড়া পড়ে যাবে। চাঞ্চল্যকর রস-ই কাগজের লেখার পয়লা মসলা।"

"কথা দিচ্ছি, এমন সুযোগ পেলে লুফে নেব, সায় দিলাম তক্ষুনি।"

"উত্তম সিদ্ধান্ত," বললেন মিস্টার ব্ল্যাকউড—"আপনার মতো মানুষই খুঁজছিলাম। তবে আরও একটু তালিম দেওয়া দরকার। তবেই তো ব্ল্যাকউড স্ট্যাম্প পড়বে আপনার লেখায়—যে স্ট্যাম্পের মানে একটাই—চাঞ্চল্যকর। এর জন্যে আপনাকে গাড্ডা খুঁজতে হবে এবং নিজেই সেই গাড্ডায় পড়বেন—চুটিয়ে

লেখবার জন্যে। এই মুহূর্তে যদি জ্বলন্ত উনুন অথবা বিশাল ঘণ্টা হাতের কাছে না থাকে, অথবা যদি বেলুন থেকে লাফিয়ে পড়বার সুযোগ না পান, অথবা ভূমিকম্পে চৌচির মাটির মধ্যে দিয়ে পাতাল প্রবেশ না করতে পারেন। অথবা গরম চিমনিতে আটকে যেতে না পারেন—তাহলে এই ধরনেরই নিদারুণ পিলে-চমকানো মিস-অ্যাডভেঞ্চার আপনাকেই মাথা খাটিয়ে বের করতে হবে। কল্পনা করুন, মাথা খাটান—সদা সর্বদা জানবেন, যা সত্যি, তা চিরকালই অদ্ভুত—এমনই অদ্ভুত যে গপ্পোকেও হার মানিয়ে দেয়। মাথা খাটিয়ে আপনাকেই ঢুকে যেতে হবে এই ধরনের মার-কাটারি মিস-অ্যাডভেঞ্চারে—লেখার খাতিরে।"

বললাম—"খুব মজবুত রবারের ফিতে আছে কাছেই—বলেন তো এখুনি গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়তে পারি।"

"সে তো ভালই। ঝুলুন—এখুনি ঝুলুন। তবে কি জানেন, দড়িতে বা রবারের ফিতেতে ঝুলে পড়ার মধ্যে নতুনত্ব নেই—বড্ড একঘেয়ে। তার চাইতে বরং এক বোতল ঘুমের বড়ি খান। ঘুম-ঘুম অবস্থাটা যেই এসে যাবে, লিখে যাবেন আপনার উপলব্ধির জ্বলন্ত বৃত্তান্ত—মরার আগে পর্যন্ত। পাঠকদের লোমকূপে নির্ঘাত আগুন লেগে যাবে। একেই বলে চাঞ্চল্যকর সংবাদ। অথবা, এই অফিস থেকে বেরোতে না বেরোতেই পাগলা কুকুরের কামড় খেতে পারেন, বাসের ধাক্কায় খুলি ফেটে যেতে পারে, অথবা চলন্ত গাড়ির চাকার তলায় চলে যেতে পারেন। দুষ্প্রাপ্য এই সুযোগগুলোর কোনটাকেই নষ্ট হতে দেবেন না। ভোঁতা কলম আর কাগজ রেডি রাখবেন। সময় পাবেন কম, কিন্তু লিখবেন বেশি। আপনার লেখা পড়ে যেন মড়াও নড়ে ওঠে—"

আমি গদগদ গলায় বললাম—"এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে বলুন। আমি মরে গেলাম, অথচ আমার লেখা পড়ে একটা মড়া নড়ে উঠল—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইরকমই হয়। হতেই হবে, তবেই না লেখা সার্থক হয়, একেই বলে ব্ল্যাকউডের স্ট্যাম্প। হাঃ! হাঃ! কি বলছিলাম? লেখা! এতক্ষণ যা বললাম, তা হলো লেখার উপকরণ আর পরিবেশ সম্পর্কে। ভোঁতা কলম আর মারাত্মক গাড্ডা। এরপর কি আসছে? লেখার সুর, লেখার কায়দা, লেখার বর্ণনা। লেখার সুর হবে স্বাভাবিক—জলের মতো টলটলে—অথচ তার মধ্যে থাকবে নীতিকথার ভোল আর উৎসাহ উদ্দীপনার কড়া ডোজ। মনে হবে যেন ঘরে বসে লেখা নিজে কথা কইছে পাঠকের সঙ্গে। লেখার ঢঙটা হবে কিন্তু কাট-ক্যাট। ছোট ছোট কথা। এই ঢঙটাই আজকাল খুব চলছে। যাচ্ছি। যাব। খাচ্ছি। খাব। এন্তার দাঁড়ি মেরে যাবেন। প্যারাগ্রাফ এড়িয়ে যাবেন।

"তারপরেই আসছে সুর উঁচু নিচু, ফিকে-কড়া, ঝাঁকি-মারানোর কায়দা। বেশ কজন সেরা নভেলিস্ট এই সুরটা বড্ড পছন্দ করেন। শব্দগুলো ঘূর্ণিপাকের মতো ঘুরবে, ঘুরন্ত লাট্টুর মতো বোঁ-বোঁ আওয়াজ ছাড়বে, যার অনেক মানে দাঁড় করানো যাবে—কিন্তু আসল অর্থটা বোঝা যাবে না—অর্থ থাকলে তো বোঝা

যাবে। আপনি কি বুঝেছেন? গুড! গুড! লেখক যখন ভাববার সময় পায় না, অথচ ছটোপুটি করে লিখতে বসতে হয়—তখন জানবেন, এর চাইতে ভাল লিখনশৈলী আর হয় না।

"আধিভৌতিক সুরের লেখাও অতি উত্তম লেখা। লেখবার সময়ে যদি মাথায় এসে যায় ভারি মোটা গিধড় কোনও শব্দ—(স-শব্দ কাজে লাগানোর এই হলো মোক্ষম সুযোগ) মাথায় যা আসে, তাই লিখে যান। বচনের পর বচন ঝেড়ে যান। অমুক-তমুকের নাম করে যান। কারোর ওপর রাগ থাকলে, এই সুযোগে ঝাল ঝেড়ে নিন। লিখতে লিখতে যদি দেখেন উদ্ভট কিছু লিখে ফেলেছেন, অথবা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে—ভুলেও তা কাটিতে যাবেন না। ফুটনোটে লিখে দেবেন দাঁতভাঙা একটা সূত্র—যেখান থেকে এই সব ধার করা হয়েছে বলে ধরে নেবে পাঠক—কোনওদিন যাচাই করতে যাবে না—ফাঁকতালে আপনি পণ্ডিত বনে যাবেন তাদের কাছে।

আরও অনেক রকম সুরে লেখা যায়। আমি কিন্তু আর দুটোর বেশি বলব না। একটা হলো, উচ্চমার্গের সুর; আর একটা জগাখিচুড়ি সুর।

"উচ্চমার্গের সুরের লেখক অতি সামান্য ঘটনার আড়ালে অতি-মহান বিষয় যেন দেখতে পায়। অতি-নগণ্যকে অতি উচ্চ করে তোলে। তৃতীয় নয়নের এ-এক আশ্চর্য কেরদানি। তবে ঠিকভাবে ম্যানেজ করতে হয়—নইলে গুবলেট হয়ে যাবে। কক্ষনো কিন্তু ধরাছোঁয়ার মধ্যে যাবেন না। যা বলতে চান, তা সরাসরি লিখবেন না—ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে একটা আবছা মানে দাঁড় করাবেন। সব সময়ে মনে হবে প্রতীকের মাধ্যমে অবাঙমানসগোচর কিছু একটা তুলে ধরতে চাইছেন। 'রুটি' যদি বলতে চান, লিখবেন, আটা বা পিঠে, কেক বা গম—ভুলেও লিখবেন না 'রুটি'। এ এক বড় কায়দার স্টাইল। আঁতেল স্টাইল। বুদ্ধু পাঠক তখন নিজে থেকেই হাজার হাজার প্রতীক কল্পনা করতে বসে—যা আপনিও ভাবেননি। মাঝখান থেকে আপনার হয় পোয়াবারো—হুহু করে নাম ছড়াতে থাকে।"

আমি কথা দিলাম, যতদিন বাঁচব, এইভাবে লিখব। শুনে উনি আমাকে একটা চুমু খেলেন।

বললেন—"এবার শুনু জগাখিচুড়ি সুর কাকে বলে। এ দুনিয়ায় যত রকমের সুর আছে, সব সুরেরই খানিকটা করে সমান ভাগে নিয়ে, হিসেব করে মিশিয়ে, এমন এক পঞ্চরঙ্গ সুর সৃষ্টি করা, যা একাধারে সুগভীর এবং কিম্ভূত, অর্থবহ অথচ অস্পষ্ট, সূচীতীক্ষ্ণ আর সুন্দর। কি করে এই সুর মাথার মধ্যে আনতে হয়, তাও দেখিয়ে দিচ্ছি," বলেই খান কয়েক মোটা মোটা কেতাব তাক থেকে টেনে নামালেন মিস্টার ব্ল্যাকউড, খচড়-মচড় করে প্রতিটা বইকে যেখান থেকে হয় খুলে মেলে ধরলেন এবং বললেন—"এই যে দেখছেন, নানা সুরে, নানা লেখা ছড়িয়ে রয়েছে নানা বইতে—সাঁ-সাঁ করে চোখ বুলিয়ে যাবেন সবগুলোর ওপর দিয়ে, কলম নিয়ে বসে যাবেন (ভোঁতা কলম হওয়া চাই)—দেখবেন সাঁ-সাঁ করে

জগাখিচুরি সুরের লেখা আপনার নিবের ডগা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। সংস্কৃত, চৈনিক, আরব্য, স্পেনীয়, ইতালীয়, জার্মান, ল্যাটিন, গ্রীক—সবই হুড় হুড় করে মিলেমিশে অনবদ্য এক সুর সৃষ্টি করবে—যা এই ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিনের পরম সম্পদ। ফরাসীরা একই কথা বার বার আউড়ে যায়—ভাষাটা যদি জানা না থাকে—সুরটা তুলে নেবেন। মন্দ না।"

এই পর্যন্ত শুনেই বুঝলাম, এবার আমি ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিনের উপযুক্ত লেখা লিখতে পারব। কিন্তু যেই শুনলাম, লেখার জন্যে পাতা পিছু পাব মোটে পঞ্চাশ গিনি, ঠিক করলাম লেখা দেব সোসাইটিতে। মিস্টার ব্ল্যাকউড একটু ক্ষুণ্ণ হলেও খুবই শিষ্টাচার দেখালেন। শেষ বিদায় জানাতে গিয়ে চোখে জলও এনে ফেলেন।

বললেন—"আপনার জন্যে কিছুই করতে পারলাম না, এজন্যে বুক আমার ফেটে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে ভূমিকম্প ঘটছে না যে আপনি পাতালে প্রবেশ করবেন, গলায় দড়িও দিতে পারছেন না, ডুবেও যাচ্ছেন না, কুকুরের কামড়ও—দাঁড়ান! দাঁড়ান! একটা সুযোগ আছে। বাগানে তিনটে বুলডগ আছে। পাঁচ মিনিটেই আপনার চোখ পর্যন্ত খেয়ে ফেলবে। পাঁচ মিনিট কম সময় নয়। কলম আর কাগজ বাগিয়ে নিন।—এই কে আছো! টম! পিটার! ডিক! শয়তানের বাচ্চা কোথাকার! দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? ছেড়ে দে··· ছেড়ে দে তিন কুত্তাকে!—আসুন, মিস··· মিস সাইকি জেনোবিয়া—চৌকাঠ পেরিয়েই লেখা শুরু করে দেবেন—"

আমি আর দাঁড়াইনি। পাল্টা শিষ্টাচার দেখানোর সময়ও পাইনি। তবে মিস্টার ব্ল্যাকউডের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার চেষ্টা করছি। শহরে শহরে চক্কর দিচ্ছি মিস-অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে। সঙ্গে রেখেছি কুকুর ডায়না আর নিগ্রো চাকার পম্পি-কে। যে সুরে লিখব ঠিক করেছি—সেটা জগাখিচুড়ি সুর। □

যে সপ্তাহে তিন রবিবার

[থ্রি সানডেজ ইন এ উইক]

"পাষাণ-হৃদয়, গোবর-মাথা, গোঁয়ার-পাঁঠা, ছ্যাতলা-পড়া ভ্যাপসা-ধরা বাতিল যুগের বদ্ধ পাগল; আদ্দিকালের আইডিয়ার ঘৃণ্য পোকা তুই—ওরে! ওরে! বুড়ো বর্বর!"

একদিন অপরাহ্ণে ফাঁকা ঘরে দাঁড়িয়ে শূন্যে ঘুসি মারতে মারতে নিঃশব্দে কথাগুলো আওরে গেলাম আমার গ্র্যাণ্ড-কাকার উদ্দেশে। এটা গেল আমার মহড়া। কল্পনায় দৃশ্যটা দেখলাম এবং বড়ই প্রীত হলাম।

কল্পনায় তো বটেই। মনে মনে বলে, মনের চোখে দেখে মনটা তো ঠাণ্ডা হল। মুখে বলার সাহস যখন নেই—তখন এই ভাল।

তারপর খুললাম বৈঠকখানার দরজা। ম্যান্টলপিসের ওপর দুই ঠ্যাং তুলে দিয়ে মৌজ করে বসেছিল বুড়ো গুগুক—থাবায় ধরে রয়েছে পোর্ট মদের বিশাল মগ, দু লাইনের একটা ছড়া-গান গাইতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে। হেঁড়ে গলা থেকে বেসুরো বিকট আওয়াজ বেরোচ্ছে :

রঙিন গেলাস শূন্য করো!
শূন্য রঙে গেলাস ভরো!

দরজাটা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দিলাম। চোখে মুখে নম্র ভব্য স্নিগ্ধ স্বর্গীয় হাসি ভাসিয়ে তুললাম। বিনয়ের অবতার হয়ে গলায় সুধা ঝরিয়ে আধো আধো গলায় বললাম—"কাকা, ও কাকা!"

বন্ধ হল হেঁড়ে গলার গিটকিরি। রক্তাভ চোখে নিরীক্ষণ পর্ব শুরু হতেই প্রায় তোৎলাতে তোৎলাতে বলে গেলাম এই ক'টি কথা।

"কাকা, আমার প্রাণপ্রিয় কাকা, আমার পরম পূজনীয় কাকা, অতীতে কতবার তো আমাকে কৃপা করেছেন, কত···কত···কত রকম ভাবে আপনার উদার হৃদয়ের বর্ষণ দিয়ে আমার তাপিত হৃদয়কে শীতল করেছেন, আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছেন, মনে এনেছেন পুলকের পালাজ্বর—ইয়ে—খুশির জোয়ার—না চাইতেই আকাশ খসিয়ে এনে ধরিয়ে দিয়েছেন আমার হাতে—মুখ ফুটে চাইলে তো কথাই নেই, বুক দিয়ে পড়ে মনের পিপাসা মিটিয়ে দিয়েছেন—সেই ভরসাতেই আমার এই ছোট্ট নিবেদনটা আপনার চরণে আবার নিবেদন করতে চাই—আপনার সম্মতির সবুজ সংকেতের দুরাশায়—ইয়ে—প্রত্যাশায়।"

"হুম! তারপর? ভালই লাগছে শুনতে," বৃদ্ধ বর্বরের জবাবটা যেন কেমনতর! হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল।

"কাকা গো, জানেন তো আমার চোখে আপনি কতখানি? সাক্ষাৎ নরদেবতা! (গোল্লায় যা তুই বুড়ো বদমাস।) আর এটাও মনেপ্রাণে জানি, কাঠি-র সঙ্গে আমার শুভ-পরিণয় বিঘ্নিত হোক—এটা আপনি মনে-প্রাণে কখনোই চান না—আমাদের মিলন-পথের অন্তরায় হওয়া দূরে থাকুক, আমি জানি··· আমি জানি··· হা! হা! হা!—এমন ঠাট্টা করেন মাঝে মাঝে··· মনে হয় যেন সত্যিই বাগড়া দিতে চান বিয়েটায়··· মাঝে-মাঝে তাই তো আপনাকে রসের ভাঁড় বলতে ইচ্ছে যায় আমার···"

"ভাঁড়?"

"রসিক পুরুষ! কত মজাই যে করেন! হা! হা! হা! বিয়েটা তাহলে দিয়ে দিন কাকামশাই!"

"হা! হা! হা! জাহান্নম এখান থেকে কতদূর রে? শর্টকাট হলো এই বিয়ে! অর্বাচীন ছোকরা কোথাকার!"

"ঠাট্টা! ঠাট্টা! আবার ঠাট্টা করছেন কাকামশাই! মস্ত রসের ভাঁড় আপনি। কি বলছিলাম? হ্যাঁ, হ্যাঁ··· বিয়েটা··· মানে, বিয়ের তারিখটা··· শুভ তারিখটা আপনিই যদি ঠিক করে দেন এখুনি, ড্যাডাং ড্যাং করে আমি আর কাঠি বেরিয়ে পড়ব পুরুতের খোঁজে। তারপর আর ভাববেন না কাকামশাই, আমি সব ঠিক করে নেব··· ইয়ে··· কাঠি আর আমি···আপনাকে জুগিয়ে যাব ভাঁড়···"

"ভাঁড়!"

"পিপে! পিপে পিপে পোর্ট!—দিনটা কবে ফেলব?"

"স্কাউন্ড্রেল!"

"আশীর্বাদ করুন যেন ভালোয় ভালোয় শেষ হয়ে যায় দু'হাতের মিলন।"

"শুরু আগে হোক—তারপর তো হবে শেষ।"

"হা! হা! হা!—হে! হে! হে!—হি! হি! হি!—হো! হো! হো! —হু! হু!

হ!—চমৎকার বলেছেন তো! কী রসিকতা! কী বিচক্ষণতা! শুরু আগে হোক!—আপনি শুধু রাজি হয়ে গিয়ে যেই তারিখটা বলে দেবেন—অমনি দেখবেন শুরু হয়ে গেছে—মাত্র দুটো হাতের মিলন তো—বেশি সময় লাগবে না কাকামশাই—কবে?"

"কবে?"

"সামনের সপ্তাহেই ফেলে দিই?"

"ফেলে দিবি! কি ফেলে দিবি?"

"বিয়ের দিনটা।"

"ফেলবি! সামনের সপ্তাহেই ফেলবি? পাকাপাকিভাবেই ফেলবি?"

"একদিনেই পাকিয়ে দেব বিয়ে—আপনি শুধু বলুন—"

"পাকাপাকিভাবে বলব?"

"কাকামশাই···কাকামশাই··· আমি তো আছিই আপনার এক চরণে—কাঠিও আসতে চায় আর এক চরণে—তারিখটা শুধু বলে ফেলুন। আপনার মেয়ে, আমার তুতো-বোন—রাজযোটক হবে কাকামশাই!"

"ববি···ছোট্ট খোকা ববি···সত্যিই হিরের টুকরো ছেলে তুই··· কখনো কোনো ব্যাপারে কাঁচাকাঁচি তুই করতে চাস না···পাকাপাকি সব ব্যাপারেই! ···কাঁচিয়ে ফেলার পাত্র যখন নস তুই—পাকিয়েই ফেলবি ঠিক করেছিস—তখন তো তোর বায়না আমাকে রাখতেই হবে।"

"বাজে বায়না নয়, কাকাবাবু—বিয়ের বায়না।"

"পাকাপাকিভাবে বিয়ের বায়নার তারিখ।"

"কাকা গো!"

"চোপরাও! [আমার কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল কাকার রাসভ গলাবাজিতে]—বায়না রাখব···নিশ্চয় রাখব···জন্মের মতো রাখব···বিয়ের পাকাপাকি তারিখ এই তো?···যৌতুকটাও কিন্তু চাই ওইদিনে··· নগদ এক লাখ···ভুললে চলবে না···তারিখ তো দিতেই হবে··· সবেধন নীলমণি একটাই তো ভাইপো···মেয়ে একটা··· বিয়ে হবে—"

"কাঠি-র সঙ্গে।"

"চড়িয়ে গাল ফাটিয়ে দেব রাস্কেল কোথাকার! কেট-কে কাঠি বলা! বিয়ের আগেই কনের নামবদল। ওসব চলবে না।"

কক্ষনো চলবে না··· কেট···কাঠি নয়।"

"কেট-এর সঙ্গে বিয়ের তারিখ বলতে হবে···পাকাপাকিভাবে বলতে হবে···হুম্··· হাম···হুম! আজ তো রোববার, তাই না? "পেয়েছি···তারিখ পেয়েছি।"

"কবে? কবে কাকাবাবু?"

"যে সপ্তাহে তিন রবিবার!"

"তিন রবিবার—এক সপ্তাহে!"

"খাসা ছেলে তো তুই···হিরের টুকরো! ঠিক ধরেছিস। যে সপ্তাহে একটা নয়, দুটো নয়—তিনটে রবিবার ঠাসাঠাসি থাকবে—সেই সপ্তাহেই হবে তোর বিয়ে। হাঁ করে দেখছিস কি? কি বললাম কানে ঢুকেছে? এক কথার মানুষ আমি—তারিখ চেয়েছিলিস, তারিখ দিলাম—যে সপ্তাহে পাবি পাশাপাশি তিনখানা রবিবার—সেই সপ্তাহেই টুক করে বিয়ে করে নিবি কেট-কে—লাখটাকার যৌতুকসমেত কিন্তু—এবার গোল্লায় যা! লক্ষীছাড়া বাঁদর! গুবলেটবাজ বোকচন্দর!সব কাজেই ল্যাজেগোবরে হওয়ার রেকর্ড নিয়ে করগে যা আর একখানা রেকর্ড—বিয়ের রেকর্ড—যে সপ্তাহে পাশাপাশি পড়ছে পর-পর তিন-তিনখানা রবিবার। হা! হা! হা! হো! হো! হো! হি! হি! হি! হুম! হুম! হুম!"

এই বলেই মগ তুলে গলায় ঢালতে লাগলেন আমার গ্র্যাণ্ড-কাকা। আমি ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

'শতকরা একশ ভাগ খাঁটি ফাইন বুড়ো ইংলিশম্যান' বলতে যা বোঝায়, আমার এই গ্র্যাণ্ড-কাকা রামগাজন্ কিন্তু আদতে তাই। কিন্তু ওঁর ওই ছড়া-গানের মত উনি নিজেও কিন্তু নিখুঁত নন। অনেক খামতি ওঁর মধ্যেও আছে। একটু খিটখিটে, একটু বাগাড়ম্বর বিলাসী, একটু কোপনস্বভাব—সব মিলিয়ে যেন আধখানা বৃত্তের একটা মানুষ; যাঁর নাকের ডগা টকটকে লাল, খুলির হাড় বেজায় মোটা, টাকার থলি মস্ত লম্বা, এবং নিজের দৌড় কদ্দূর— সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। দুনিয়া ঢুঁড়ে এলেও এমন দরাজ হৃদয় আর একটাও পাবেন না; অথচ এমনই খামখেয়ালী যে যখন তখন নিজেই নিজের কথা নাকচ করে উল্টো কথা বলছেন; এই সবের ফলে ওঁর কৃপণ বদনাম ছড়িয়ে গেছে তাদের কাছেই যারা ওঁকে চেনে ওপর-ওপর। বহু উৎকৃষ্ট মানুষের মতই প্রলোভনের দোলক অন্যের নাকের সামনে দুলিয়ে বড় মজা পান; প্রথম-প্রথম তা স্রেফ কুচুটেপনা বলেই মনে হতে পারে। যে কোনো অনুরোধ করলেই সপেটো 'না!' বলা ওঁর স্বভাব; কিন্তু পরে—অনেক···অনেক পরে—দেখা যায় রাখেননি, এমনি অনুরোধের সংখ্যা অতিশয় কম। ওঁর টাকার ঝুলির ওপর কেউ যদি পাকে-প্রকারেও চড়াও হয়—সঙ্গে সঙ্গে 'মার! মার!' করে উঠবেন উনি। কিন্তু শেষের দিকে দেখা যাবে, যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা গেল তাঁর থলি থেকে অনুপাতে তা তাঁর বিষম জেদ আর নিরন্তর 'না!' বলার সমান সমান যায়। দান ধ্যানে তিনি মুক্তকচ্ছ—কিন্তু বাপান্ত করার ব্যাপারেও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

ফাইন আর্ট আর রম্যরচনা ওঁর দু'চোখের বিষ। গ্রীক কিংবদন্তীর কাব্যে আমার আসক্তি তাই ওঁকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। ব্যঙ্গ বিদ্রূপের রোমান কবি হোরেস-এর একটা নতুন বই কিনতে চেয়েছিলাম বলে উনি টিটকিরি দিয়েছিলেন—'যত্তো সব বস্তাপচা সস্তা অনুবাদ'। আমি তা হজম করতে পারিনি—হাড়পিত্তি জ্বলে গেছিল। প্রাচীন গ্রীস আর রোমের বই যারা পড়ে, ইদানীং তাদের পাত্তা দেন না একেবারেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ওপর দৈবাৎ

আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায়। উনিই নাকি হাতুড়ে পদার্থবিদ ডক্টর ডাবল্ এল ডী, এই ভেবে রাস্তার একটা লোক একদিন ওঁর সঙ্গে দু-পা হেঁটে গেছিল—সেই থেকেই মাথা গেছে ঘুরে। এই কাহিনীর সূচনাতেই তাই বলে রাখি, কাকার কাছে ঘেঁষতে হলে, তাঁকে ঠাণ্ডা মেজাজে রাখতে হলে ওঁর মনের মত সখ আর বাতিকের কথা বলতে হতো—তাহলেই যেন বেলপাতা পড়ত শিবের মাথায়। তখন তিনি অন্য মানুষ। চার হাত পা ছুঁড়ে হেসেই গড়িয়ে পড়তেন। রাজনীতির ব্যাপারেও তাঁর একরোখা মতবাদকে সমঝে চলত হত—কেননা, ওঁর মতে, 'আইন তৈরি হয়েছে মেনে চলার জন্যে—দলাই-মলাইয়ের জন্যে নয়।' সারা জীবন তো কাটিয়ে দিলাম এই মানুষটার সঙ্গে। মরবার সময়ে বাবা আর মা আমাকে গ্র্যাণ্ড-কাকার কাছে সঁপে দিয়ে গেছিলেন—বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসেবে। আমার তো মনে হয়, বুড়ো শয়তান নিজের সন্তানের মতনই ভালবাসেন আমাকে। ভালবাসেন মেয়ে কেট-কেও। আমাকে কিন্তু মানুষ করেছেন বাড়ির কুকুরকে মানুষ করে তোলার মতন। চাবকে গেছেন এক বছর বয়স থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত। পাঁচ থেকে পনেরো পর্যন্ত ঘণ্টায়-ঘণ্টায় শাসিয়েছেন—শোধন-কারাগারে ঢোকাবেনই আমাকে। পনেরো থেকে বিশ বছরের এমন একটা দিন বাদ যায়নি, যেদিন তিনি আমাকে সম্পত্তিচ্যুত করার হুমকি দেননি। বিষণ্ণ কুত্তার জীবন কাটিয়ে এলেও এটাও তো ঠিক যে আদর্শ কুকুরের মতন আমিও বড় প্রভুভক্ত। আমার স্বভাবই যে তাই।

তবে হ্যাঁ, বন্ধু পেয়েছিলাম বটে কেট-এর মত মেয়েকে। বড় ভাল মেয়ে। মিষ্টি মিষ্টি কথায় কত বুঝিয়েছে আমাকে। কাকার মত যেদিনই আদায় করতে পারব, সেইদিন সে হবে আমার বউ (যৌতুক সমেত)। বেচারা! বয়স তো মোটে পনেরো। আরও পাঁচটা বছর শম্বুকগতিতে কাটবে, তবেই তো সম্মতি দেবেন কাকা—তবেই না যৌতুক-প্রাপ্তি-যোগ ঘটবে! আমারও বয়স এখন বিশ। পাঁচটা বছর তো আমাদের দুজনের কাছেই পঁচিশ বছরের সমান। কেন যে কাকা ইঁদুর ধরা বেড়ালের মত দু-দুটো ক্ষুদে ইঁদুর নিয়ে খেলে যাচ্ছেন! কেননা, আমি তো জানি ওঁর মনের একদম ভেতরকার খবর। সবচেয়ে খুশি হবেন আমাদের বিয়েটা হয়ে গেলে। শুরু থেকেই এ ব্যাপারে তিনি মনস্থিরও করে রেখেছেন। কেট-এর যৌতুক কেট-এর কাছেই থাকবে—আরও লাখ টাকা উড়িয়ে দেবেন নিজের পকেট থেকে পাঁচজনকে জানান দিয়ে আমাদের বিয়ে দেওয়ার জন্যে। তা সত্ত্বেও, বাগড়া দেওয়ার জন্যেও কতরকম ফন্দী ভেবে চলেছেন রোজ-রোজ। ভুল আমরাও করেছি। নিজেদের বিয়ের কথা নিজেরাই বলতে গেছি। 'না!' বলা ছাড়া ওঁর উপায় কি? 'হ্যাঁ!' বলার কোনো উপায় কেউ বাতলে দিলে কিন্তু আনন্দে আটখানা হতেনই কাকামশায় নিজেই।

আগেই বলেছি, অনেক খুঁত আছে ওঁর মধ্যে—আছে দুর্বলতা। নেই শুধু কাঠগোঁয়ার কথায়। যা বলবেন তা থেকে একচুলও নড়বেন না। অক্ষরে অক্ষরে তা রাখবেন। মূল সুর যদি পাল্টে যায়, তাতে বয়ে গেল। পুরুষের কথা হাতির

দাঁতের মত্ত দামি। দুর্বলতা আরও আছে। বুড়িদের মতন উদ্ভট কুসংস্কারে বড্ড বিশ্বাসী। ছোটখাট ব্যাপারে আত্মসম্মান জ্ঞান একটু বেশি রকমের টনটনে। ওঁর এই সর্বশেষ চারিত্রিক দুর্বলতাটাকেই চতুরা কেট কাজে লাগিয়েছিল কিভাবে—সেই নিয়েই এই ছোট্ট উপাখ্যান ফাঁদতে বসেছি।

বৈঠকখানায় উনি আমাদের বিয়ের তারিখ পাকাপাকি করে দেওয়ার তিন সপ্তাহ পরের কথা। কেট-এর দুই আত্মীয় ভদ্রলোক দীর্ঘকাল বিদেশ সফর শেষ করে সবে ইংল্যান্ডে ফিরেছিলেন। দশই অক্টোবর রবিবার বিকেলে তাঁদেরকে নিয়ে আমি আর তুতো-বোন কেট ঢুকলাম গ্র্যাণ্ড-কাকার বৈঠকখানা ঘরে। আধঘণ্টা মামুলি কথাবার্তার পর—কথার স্রোতকে ঘুরিয়ে নিয়ে এলাম যেখানে, সেখান থেকেই শুরু করা যাক :

ক্যাপ্টেন প্রাট—মিস্টার রামগাজ্‌ন্, মনে পড়ে, ঠিক একবছর আগে দশই অক্টোবর আপনার সঙ্গে খোশ গল্প করে গেছিলাম এই ঘরে? তারপর একবছর ছিলাম দেশের বাইরে।

স্মিদারটন—আমিও তো প্রায় একবছর কাটিয়ে এলাম বাইরে। মনে পড়ে, মিস্টার রামগাজ্‌ন্, ক্যাপ্টেন প্রাট-এর সঙ্গে ঠিক একবছর আগে এই দিনটিতে দেখা করে গেছিলাম আপনার সঙ্গে?

কাকা—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ—স্পষ্ট মনে পড়ে—কী আশ্চর্য! একই দিনে দুজনেই এলেন, দুজনেই ঠিক একবছরের জন্যে বাইরে গেলেন। আশ্চর্য কাকতালীয় বটে! ডক্টর ডাবল্ এল ডী যখন শুনবেন—

কেট (বাধা দিয়ে)—কিন্তু বাবা, পুরো ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত। ক্যাপ্টেন প্রাট আর ক্যাপ্টেন স্মিদারটন তো এক রুট ধরে বেরোননি—সেটা তো জানো?

কাকা—অতশত জানি না। তবে ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত। ডক্টর ডাবল্ এল ডী—

কেট—ক্যাপ্টেন প্রাট গেছিলেন কেপ হর্ন ঘুরে, ক্যাপ্টেন স্মিদারটন গেছিলেন কেপ অফ গুড হোপ-এর পাশ দিয়ে।

কাকা—সত্যিই তো। একজন পুবদিকে, আর একজন পশ্চিমদিকে। দুজনেই কিন্তু চক্কর দিয়ে এলেন পৃথিবীটাকে। ডক্টর ডাবল্ এল ডী—

আমি (খুব তাড়াতাড়ি)—ক্যাপ্টেন প্রাট, কাল সারাদিন কাটিয়ে যান এখানে—ক্যাপ্টেন স্মিদারটন, আপনিও আসুন—গল্প শোনা যাবে, চুটিয়ে তাস খেলা যাবে—

প্রাট—তাস খেলব কি হে? কাল না রবিবার?

কেট—কি যে বলেন! রোববার তো আজকে।

কাকা—ঠিক! ঠিক!

প্রাট—মাপ করবেন। এত ভুল হয় না আমার। রোববার পড়ছে কালকে, কারণ—

স্মিদারটন (ভীষণ অবাক হয়ে)—কি বলছেন! রোববার গেছে গতকাল।

সবাই—গতকাল গেছে রোববার। মাথা খারাপ নাকি?

কাকা—রোববার আজকে। আমি জানি না আজ কি বার?

কেট (লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে)—বাবা, আজ তোমার বিচারের দিন। ভগবানের রায় মাথা পেতে নাও। বলছি, বলছি, রহস্যের ব্যাখা এখুনি আমি করে দিচ্ছি। ক্যাপ্টেন স্মিদারটন বলছেন, রোববার ছিল গতকাল, ছিল বইকি—ঠিকই বলেছেন। ববি, আমি আর কাকা বলছি, রোববার আজকে—আমরাও ঠিক বলছি। ক্যাপ্টেন প্রাট বলছেন, রোববার পড়বে কালকে—উনিও ঠিক বলছেন। ফলে, একই সপ্তাহে এসে গেল পর-পর তিনটে রবিবার।

স্মিদারটন (একটু বিরতি দিয়ে)—প্রাট, কেট কিন্তু আমাদের টেক্কা মেরে গেল। আচ্ছা বোকা বটে আমরা! মিস্টার রামগাজন্, ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম : আপনি তো জানেন পৃথিবীর পরিধি চব্বিশ হাজার মাইল। লাট্টুর মত পাক খাচ্ছে চব্বিশ ঘন্টায় একবার। পশ্চিম থেকে পুবে। ঘন্টায় হাজার মাইল। বুঝলেন?

কাকা—ঠিক। ঠিক! ডক্টর ডাবল্ এল ডী—

স্মিদারটন (চেঁচিয়ে কাকার গলা চাপা দিয়ে)—ঘন্টায় হাজার মাইল। ধরুন যদি ঠিক এইখান থেকে পুবদিকে জাহাজে চাপি—ঠিক হাজার মাইল যাই—তাহলে লণ্ডনে যখন সূর্যোদয় দেখা যাবে—আমি দেখব তার একঘন্টা আগে; চব্বিশ হাজার মাইল একই দিকে গিয়ে ঠিক এই জায়গায় ফিরে এসে—আপনাদের হিসেবের চব্বিশ ঘন্টা আগের সূর্যোদয় দেখব। অর্থাৎ একদিন এগিয়ে থাকব। বুঝলেন?

কাকা—কিন্তু ডাবল্ এল ডী—

স্মিদারটন (ভীষণ চেঁচিয়ে)—ঠিক উল্টো দিকে, মানে, পশ্চিমদিকে গিয়ে প্রতি হাজার মাইলে এক ঘন্টা করে পেছিয়ে গেছেন ক্যাপ্টেন প্রাট—চব্বিশ হাজার ঘুরে এসে দেখছেন চব্বিশ ঘন্টা পরের সূর্যোদয়। আমার কাছে তাই গতকাল গেছে রবিবার, ক্যাপ্টেন প্রাটের কাছে আগামীকাল হবে রবিবার। আমরা সব্বাই ঠিক বলছি। কারোর বিশ্বাসই প্রাধান্য পেতে পারে না।

কাকা—চোখ খুলে গেল আমার! কেট—ববি—ভগবানের রায় মাথা পেতে নিচ্ছি। কথা যখন দিয়েছি। কথা রাখব। এগিয়ে যা—যৌতুকের কথাটা যেন খেয়াল থাকে। যাচ্চলে! এক সপ্তাহে—তিন-তিনটে রবিবার! যাই, ডাবল্ লে ডী-র মতামতটা জেনে আসি।

অভিসার

[দ্য অ্যাসিগনেশন]

মানুষ, তুমি বড় দুর্ভাগা, কিন্তু অতীব রহস্যময়! —নিজের কল্পনাশক্তির চোখ ধাঁধানো দীপ্তিতে তুমি বিমূঢ়., নিজেরই যৌবনের অগ্নিশিখায় দাহ হয়ে চলেছো! বারেবারে আমি তোমাকে দেখি আমার কল্পনার চোখ দিয়ে! দেখি তোমার আকৃতির ঔজ্জ্বল্য!—যেভাবে রয়েছো—সেভাবে কিন্তু দেখি না। প্রাসাদে ভরা বাতায়ন-উজ্জ্বল নক্ষত্রসম ভেনিসের উচ্ছলতায় অথবা হিমশীতল উপত্যকা আর ছায়াকালোর মধ্যে তোমার দিবসরজনী যেভাবে অতিবাহিত হচ্ছে—আমি কিন্তু সেভ াবে তোমাকে দেখি না; আমি দেখি তোমার ধ্যান সমাহিত মূর্তির অনন্ত আনন্দ-উজ্জ্বল আকৃতি; দেখি আর ভাবি, ধ্যানের আর কল্পনার দিব্য আনন্দকে কিভাবে অপচয় করে চলেছো দিবানিশির তুচ্ছ নশ্বর আনন্দ-আহরণের মাধ্যমে; চিন্তার যে জগৎ নিয়ে তুমি মত্ত, তার বাইরে আছে চিন্তার আরো অনেক জগৎ; মত্ত কু-তর্কীর পাণ্ডিত্যচ্ছটার চেয়েও আছে অনেক দর্শন। হে মূঢ় মানুষ, তুমি যদি সেই ধ্যানের জগতে ডুবে গিয়ে দিব্য দর্শনের চ্ছটায় আপ্লুত থাকো—তোমার আচরণ নিয়ে তখন কি কেউ প্রশ্ন করবার সাহস পাবে? সময়ের অপচয় করছো, জীবনটাকে নষ্ট করছো—এই অপবাদ কারো মুখে আসবে? পক্ষান্তরে, তখনি কিন্তু তুমি তোমার উপরে ওঠা প্রাণশক্তিকে বইয়ে দেবে সঠিক খাতে।

যে ব্যক্তির কথা লিখতে বসেছি, তাকে তিন চারবার দেখেছিলাম এই ভেনিস

শহরেই। তখনকার সেই বিমূঢ় মানসিক অবস্থার ছবি আঁকতে গিয়েও কলম আমার থেমে থেমে যাচ্ছে। চোখের সামনে ভাসছে মধ্যরাতের মোহিনী দৃশ্য, দেখতে পাচ্ছি 'দীর্ঘশ্বাস-সেতু'কে, অপরূপার রূপের রাশি, সঙ্কীর্ণ খালের ওপর দিয়ে ধেয়ে যাচ্ছে যেন অদৃশ্য রোমান্সের দুর্নিবার প্রবাহ।

অস্বাভাবিক বিষাদমাখা সেই রজনী আমার মনের পটে বড় গভীর ছাপ ফেলে গেছে। ইটালিয়ান সন্ধ্যার সময় ঘোষণা করে গেল মস্ত ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি। চত্বর এখন নিস্তব্দ—জনমানবশূন্য। সুপ্রাচীন ডুকাল প্রাসাদের আলো নিভছে একে-একে। গ্র্যাণ্ড ক্যানাল ধরে বাড়ি ফিরছি আমি। সান মারকো ক্যানালের মুখে এসেছে আমার গণ্ডোলা নৌকো—এমন সময়ে নিথর রজনী শিউরে উঠল রমণীর আর্ত হাহাকারে; বুকচেরা সেই চিৎকার বিরামবিহীনভাবে নিমেষে ছিন্নভিন্ন করে দিল শীতার্ত রাতকে।

বামাকণ্ঠের আচমকা সেই আর্তধ্বনি আমাকে যেন সপাং করে চাবুক মেরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল গণ্ডোলার মাঝে—নৌকো দুলে উঠতেই গণ্ডোলা-চালকের হাত থেকে ঠিকরে গিয়ে একমাত্র হালখানা জলে পড়ে হারিয়ে গেছিল অন্ধকারে—হালহীন নৌকো স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে ঢুকে গেছিল বড় খাল থেকে ছোট খালের মধ্যে। উপকথার দানব-পক্ষীর পালকের মতো আমরা যখন হু-হু করে ভেসে চলেছি দীর্ঘশ্বাস সেতুর দিকে, ঠিক সেই সময়ে ঝপাঝপ জ্বলে উঠল ডুকাল প্রাসাদের সমস্ত আলো—আলোকিত হল জানলা আর সিঁড়ি—বিষণ্ন তমিস্রা ধড়ফড়িয়ে পলায়ন করল অতিপ্রাকৃত দিবসের অকস্মাৎ আবির্ভাবে।

মায়ের কোল থেকে এক শিশু খসে পড়েছে প্রাসাদের উঁচু জানলা থেকে নিচের করাল কালো জলে। প্রশান্ত বদনে জলরাশি তৎক্ষণাৎ তাকে ঠাঁই দিয়েছে তলদেশে—আমার গণ্ডোলা কাছে থাকা সত্ত্বেও বহু ব্যক্তি জল তোলপাড় করে খুঁজছে শিশুকে। জল থেকে কয়েক ধাপ ওপরে চওড়া কালো পাথরের সোপানে পাথরের মতই দাঁড়িয়ে আছে এক সুন্দরী—ভেনিসের সবচেয়ে বড় সুন্দরী—ষড়যন্ত্রী বৃদ্ধ মেনটোনি-র তরুণী স্ত্রী মারচেসা অ্যাফ্রোডাইট। জলমগ্ন শিশুটি তার প্রথম সন্তান—কোলজোড়া সেই রত্নর নাম ধরে বারেবারে ডেকে যাচ্ছে পাথরের মত ঠোঁট নেড়ে।

দাঁড়িয়ে আছে সে একা। রজতশুভ্র নগ্ন ছোট্ট চরণযুগলের প্রতিবিম্ব ঝিকমিক করছে পায়ের তলার কালো মারবেলের দর্পণে। এইমাত্র বল-রুম নাচ নেচে এসেছে বলেই এখনো চুলের রাশ পুরো এলিয়ে দিতে পারেনি; গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ সুরূপা হায়াসিন্থ পুষ্পের অজস্র কোরকের মতই সুঠাম মাথা ঘিরে রয়েছে অসংখ্য হিরের মাঝে। তুষার-শুভ্র মাকড়সার জালের মতো অতি মিহি একটা চাদর ঘিরে রয়েছে তার শ্রীঅঙ্গ; কিন্তু এই মধ্য-গ্রীষ্ম আর মধ্য-রাতের তপ্ত, বদ্ধ বাতাস এমনই গুম মেরে রয়েছে যে পাতলা এই বস্ত্রাবরণও নড়ছে না—নিস্পন্দ প্রস্তরমূর্তির গায়ে প্রস্তর-চাদরের মতই অনড় হয়ে রয়েছে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! নয়নের মণি যেখানে তলিয়ে গেছে—বিশাল উজ্জ্বল দুই নয়নের চাহনি তো সেদিকে নিবদ্ধ নয়। বুকজোড়া মাণিকের কবর তো নিচের দিকে। অপরূপা কিন্তু অপলকে চেয়ে আছে ওপর দিকে।

উদভ্রান্ত সেই চাহনির প্রান্তে রয়েছে ভেনিস শহরের সবচেয়ে জমকালো প্রাসাদ—প্রবীণ গণতন্ত্রের কয়েদখানা।

বুকজোড়া ধন যখন জলের তলায়, তখন তার মা এই প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কেন? এ প্রাসাদ তো তার নিজস্ব বাতায়নের বিপরীত দিকে। জানলায় দাঁড়িয়ে প্রাসাদ শোভা সে নিশ্চয় দেখেছে হাজারবার। তাহলে এখন আবার, ঠিক এই সময়ে, প্রাসাদ অবলোকনের এত ইচ্ছে জাগ্রত হল কেন?

ননসেন্স! বিষম শোকে চোখের আয়না যখন ফেটেফুটে চৌচির হয়ে যায়, এক কষ্টের অসংখ্য প্রতিফলন ভাঙা আয়নার অসংখ্য টুকরোয় ফুটে ওঠে—তখন তো চোখ কাছের কষ্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বহু দূরের দিকেই নিবদ্ধ থাকতে চায়!

মারচেসার পেছনে, অনেক ধাপ ওপরে, জল-তোরণের তলায়, দাঁড়িয়ে আছে একটি অর্ধ-পশু অর্ধ-নর আকৃতি। স্বয়ং মেনটনি। অঙ্গে তার পূর্ণসজ্জা। টুংটাং করে বাজাচ্ছে হাতের গীটার। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে শিশুর মরণ তার কাছে বড়ই বিরক্তিজনক আর একঘেয়ে লাগছে। বাজনার ফাঁকে ফাঁকে নির্দেশ দিচ্ছে অনুচরদের ঝটপট উদ্ধারকার্য সেরে নিতে।

স্তম্ভিত হয়েছিলাম আমি। ঘৃণায় গা রি-রি করছিল। অথচ কিছুই করতে পারছিলাম না। হালহীন নৌকো ভেসে চলেছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি অজস্র মানুষের বিদ্বেষভরা চাহনির মাঝে।

বিফলে গেল সব চেষ্টা। জল তোলপাড় করেও যখন পাওয়া গেল না নিমগ্ন শিশুকে, তখন একে একে উদ্ধারকারীরা যখন উঠে আসছে, যখন গভীর বিষাদে স্তব্ধ হয়ে এসেছে চারিদিক—তখন প্রাচীন জেল প্রাসাদের অন্ধকারময় এক কুলঙ্গি থেকে বেরিয়ে এল আলখাল্লা-আচ্ছাদিত এক মূর্তি—অন্ধকার থেকে আলোয় আবির্ভূত হয়ে ক্ষণেকের জন্যে অনেক উঁচু থেকে চেয়ে দেখে নিল নিচের জলরাশি···· পরক্ষণেই সোজা ঝাঁপ দিয়ে নেমে গেল জলের তলায়।

অপরূপা কিন্তু নিমেষহীন নয়নে চেয়েছিল অন্ধকার এই কুলঙ্গির দিকেই!

ক্ষণপরেই জল ছেড়ে উঠে এল সেই মূর্তি। এখন সে দাঁড়িয়ে আছে কালো মার্বেল সোপানে—অপরূপার ঠিক সামনে—গায়ের জলঝরা আলখাল্লা খসে পড়েছে পায়ের গোড়ায়। তাই তাকে এখন চেনা যাচ্ছে। সুঠাম সুন্দর এই তরুণকে চেনে সকলেই—চেনে গোটা ইউরোপের প্রতিটি মানুষ।

তার প্রসারিত দুই হাতে ধরা রয়েছে জল থেকে তুলে আনা শিশুটি—বেঁচে রয়েছে তখনো—বইছে শ্বাসপ্রশ্বাস!

হাত বাড়িয়ে শিশুকে সে দিচ্ছে বটে, কিন্তু নিজে কোনো কথা বলছে না। এবার তো হাত পেতে কোলজোড়া ধনকে কোলে টেনে নিতে হবে অপরূপা

জননীকে। কিন্তু তার আগেই পাশ থেকে ছোঁ মেরে শিশুকে টেনে নিয়ে গেল অন্য দুটো হাত—উধাও হল প্রাসাদের ভেতরে।

থির থির করে কেঁপে উঠল মারচেসার দুই ঠোঁট, জল টলটলিয়ে উঠল বিশাল দুই চোখে, একই সঙ্গে রক্তিম হয়ে উঠল পাথরের মত সাদা দুটি গাল।

আশ্চর্য! এ সময়ে লজ্জারুণ হচ্ছে মারচেসা! কেন? তাড়াহুড়োয় পায়ে পাদুকা গলাতে ভুলে গেছে বলে? ভেনেশীয় বস্ত্রাবরণে গা ঢাকতে বিস্মৃত হয়েছে বলে? উদভ্রান্ত চক্ষুযুগলেই বা অমন চকিত চাহনির বিচ্ছুরণ ঘটে গেল কেন? কেনই বা নরপশু মেনটনি প্রাসাদে ঢুকে যেতেই মুহূর্তের জন্যে কাঁপা হাতে তরুণের দু'হাত চেপে ধরে অর্থহীন অস্ফুট স্বরে বলে গেল এই কটি কথা : 'তুমিই জিতলে। সূর্য ওঠার একঘন্টা পর দেখা হবে আমাদের।'

সূর্য উঠেছিল পরের দিন। আমি তখন তরুণের কক্ষে বসে আছি। অদ্ভুতভাবে সাজানো সেই কক্ষের বর্ণনা দেওয়ার ভাষা আমার নেই। অজস্র পর্দার একটা পর্দা টেনে সরিয়ে আমাকে একটা ছবি দেখিয়েছিল তরুণ। ছবিটি মারচেসার। একহাত সামনে প্রসারিত। দেহবল্লরী ঘিরে যেন জ্যোতির্বলয়। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে দুটি ডানা।

আসবপান করতে করতে স্বরচিত কবিতা দেখিয়েছিল আমাকে। ইংরেজিতে লেখা প্রেমের কবিতা। তারিখের জায়গায় লেখা ছিল 'লন্ডন'। পরে তা সযত্নে কাটা হয়েছে। আমি যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, লন্ডনে কখনো গেছে কিনা—অস্বীকার করেছিল তরুণ। লন্ডন সে কখনো দেখেনি।

অনেক ভাষায় দক্ষ এই তরুণ যে জাতে ইংরেজ—আমি কিন্তু তা জানতাম। তার নাম আমি এখনও লিখতে পারছি না।

আমি জানি আরও একটা সংবাদ। নরপশু স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে আসার আগে লন্ডনেই স্বনামধন্য এই তরুণের সঙ্গে পরিচয় ছিল ভেনিসসুন্দরী মারচেসার।

যে মারচেসার প্রথম সন্তানকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে অসমসাহসিক অসাধ্যসাধনকারী এই তরুণ।

সুরাপানের ফাঁকে ফাঁকে কান পেতে কি যেন শুনছিল তরুণ—যে শব্দ আমি কিন্তু শুনতে পাইনি। কথা বলে যাচ্ছিল আপন মনে—কিন্তু কান ছিল অন্যদিকে।

আচমকা নতুন একটা মদিরাপাত্র তুলে নিয়ে একচুমুকে তা শেষ করে দিয়ে অটোমান সোফায় আছড়ে পড়েছিল তরুণ। আর ঠিক সেই মুহূর্তে শুষ্কমুখে বিস্ফারিত চোখে দৌড়ে এসে পরিচারক জানিয়েছিল—এইমাত্র বিষ পান করলেন মারচেসা!

ছিটকে গেলাম অটোমানের পাশে। তরুণের দেহে প্রাণ নেই। শেষ মদিরা পাত্রে ছিল গরল।

সূর্য ঠিক একঘণ্টা আগেই উঠেছে বটে। □

অপমৃত্যুর সংকেত

[দাউ আর্ট দ্য ম্যান]

গ্রীক কিংবদন্তীর রাজা ঈদিপাস না জেনে নিধন করেছিল তার জনককে। র‍্যাটল্‌বরো প্রহেলিকায় ঈদিপাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছি আমি। এ অঞ্চলে যে অলৌকিক কাণ্ডটা সম্প্রতি ঘটে গেল, তার কলাকৌশলের গুপ্ত রহস্য জানি শুধু আমি—এখুনি তা ফাঁস করব আপনাদের কাছে। নিখাদ এই মির‍্যাকল্ র‍্যাটলবরোর' সমস্ত বিশ্বাসঘাতকদের দফারফা করে দিয়েছে, ইন্দ্রিয়-বিলাসী অতীন্দ্রিয়-অবিশ্বাসীদের ঠানদিদের মত গোঁড়া কুসংস্কার-বিশ্বাসী করে তুলেছে। হোতা কিন্তু এই শর্মা—যে নিজেই হাটে হাঁড়ি ভাঙতে বসেছে অবশেষে।

কিছু মনে করবেন না, ঘটনাটা আমি একটু হালকা চালেই নিবেদন করে যাব। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৮ সালের গ্রীষ্মকালে। বেশ কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ হয়েছিলেন র‍্যাটল্‌বরো-র সবচেয়ে নামী, ধনী আর সম্মাননীয় ব্যক্তি—মিস্টার বার্নাবাস শাটল্‌ওয়ারদি। নিছক নিরুদ্দেশের ব্যাপার যে এটা নয়, নিশ্চয় এর পেছনে আছে কারও নষ্টামি—সন্দেহের এহেন কালো ছায়া ঘনিয়ে উঠছিল সবারই মনের মধ্যে।

এক শনিবারের ভোরে ঘোড়ায় চেপে মাইল পনেরো দূরের এক শহর অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন ভদ্রলোক—কথা ছিল ফিরে আসবেন সেই রাতেই। দু'ঘণ্টা পরে ফিরে এল তাঁর ঘোড়া—তিনি কিন্তু নেই ঘোড়ার পিঠে—নেই তাঁর জিন-ব্যাগ, যা রওনা হওয়ার সময়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ঘোড়ার পিঠে।

ঘোড়া নিজেও জখম হয়েছিল মারাত্মকভাবে, কাদা লেপটে ছিল সবাঙ্গে। ফলে, নিখোঁজ মানুষটার জন্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা তল্লাটে। রবিবার সকালেও যখন তিনি ফিরে এলেন না—তখন আর কেউ হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারল না। শহরের সবাই দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ল তাঁর নশ্বর দেহের সন্ধানে।

এ ব্যাপারে সবার আগে এগিয়ে এসে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখিয়েছিলেন মিস্টার শাটল্‌ওয়ারদি-র প্রাণের বন্ধু মিস্টার চার্লস গুডফেলো। সবাই অবশ্য তাঁকে 'চার্লি গুডফেলো' অথবা 'ওল্ড চার্লি গুডফেলো' নামেই ডাকত। ভদ্রলোক অত্যন্ত খোলামেলা স্বভাবের। পুরুষোচিত। সৎ। দিলদরিয়া মেজাজ। কথা বলতেন পষ্টাপষ্টি। বিবেক অমলিন বলেই চোখে চোখ রেখে কথা বলে যেতে পারতেন এবং তা থেকেই বোঝা যেত এ লোকের পক্ষে হীন কাজ কখনোই সম্ভব নয়—দুনিয়ায় কাউকে উনি ভয় করেও চলেন না। মন তো পরিষ্কার।

এ শহরে তিনি এসেছিলেন মাত্র মাস ছয়েক আগে। এসেই শহরশুদ্ধ লোকের মন জয় করেছিলেন সোজা কথা আর সরল মুখচ্ছবির দৌলতে। ছমাস আগে ছিলেন কোথায়, সে খবর কারও জানা না থাকলেও মানুষটার অকপট চাহনি আর কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়েছিল আবালবৃদ্ধবনিতা। মেয়েরা বর্তে যেত তাঁর হয়ে যে কোনো কাজ করে দিতে পারলে।

মিস্টার শাটল্‌ওয়ারদি ছোট ভাইয়ের মত দেখতেন মিস্টার গুডফেলো-কে। থাকতেন পাশাপাশি দুই বাড়িতে। প্রথম জন দ্বিতীয় জনের বাড়িতে কখনো না গেলেও, দ্বিতীয় জন প্রথম জনের বাড়িতে দিনে চার-পাঁচবার আসতেন খোঁজ খবর নিতে, চা-ব্রেকফাস্ট খেতেন, মদের গেলাস নিয়েও হুল্লোড় করে যেতেন। এক কথায়, সৌহার্দ্য আর সম্প্রীতির তিলমাত্র অভাব ছিল না দুজনের সম্পর্কে।

মিস্টার গুডফেলো 'শ্যাটো মার্গো' সুরাপান করতে খুব ভালবাসতেন। একদিন দুজনে এই সুরাপানে এমনই মত্ত হয়েছিলেন যে মিস্টার শাটল্‌ওয়ারদি উল্লসিত কণ্ঠে কথা দিয়েছিলেন—দু বাক্স ভর্তি 'শ্যাটো মার্গো' উপহার দেবেন প্রিয়বন্ধুকে খুব শিগগিরই—কোম্পানীকে খবর দেবেন—তারাই বাক্স পাঠিয়ে দেবে 'চার্লি গুডফেলো'র বাড়িতে—পাবেন ঠিক তখনই যখন মদ তাঁর খুবই দরকার।

এ ঘটনার উল্লেখ করলাম শুধু একটাই কারণে—দুই বন্ধুতে কতখানি হরিহর-আত্মা ছিলেন—তা বোঝানোর জন্যে।

রোববার সকালের কথা এবার বলা যাক। মিস্টার শাটল্‌ওয়ারদি নিশ্চয় অপঘাতে মরেছেন, এ বিষয়ে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়ার পর সবচেয়ে ভেঙে পড়তে দেখলাম 'ওল্ড চার্লি গুডফেলো'কে। বন্ধুর ঘোড়া ফিরে এসেছে গুলিবিদ্ধ, কর্দমাক্ত, রক্তমাখা অবস্থায়, পিঠে নেই সওয়ার আর তাঁর জিন-ব্যাগ—এই সব শোনবার পর সমস্ত রক্ত নেমে গেল তাঁর মুখ থেকে। ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন—কম্পজ্বর এলে যা ঘটে। সব মিলেয়ে তাঁর যা

অবস্থা দাঁড়ালো তা একমাত্র ভাই বা বাবা মারা গেলেই দেখা যায়।

গুলি খেয়েও ঘোড়াটা ফিরে এসেছিল স্রেফ কড়াজানের জোরে। পিস্তলের গুলি বুকের মধ্যে ঢুকেও বেরিয়ে গেছে শরীর ফুঁড়ে।

শোকে গুঁড়িয়ে গেছিলেন বলেই মিঃ গুডফেলো তক্ষুনি দলবল নিয়ে বন্ধুর মৃতদেহ খুঁজতে বেরোতে চাননি। বুঝিয়েছিলেন, আরও দিন কয়েক বা একটা হপ্তা দেখা যাক না কেন। মিঃ শাটল্ওয়ারদি নিজেও তো ফিরে আসতে পারেন। তিনিই এসে বলবেন, কেন গুলি-খাওয়া ঘোড়াকে ছেড়ে দিতে হয়েছে, তিনিই বা কোথায় শুয়েছিলেন এই ক'টা দিন।

এইরকমই হয়। চরম দৃশ্যটা এড়িয়ে যেতে চায় শোকাহত মানুষ। সর্বনাশ হয়ে গেছে জেনেও সর্বনাশের প্রমাণ খুঁজতে মন চায় না। মন যেন তখন পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে যায়। করণীয় কোনো ব্যাপারে স্পৃহা থাকে না।

শহরের বেশির ভাগ মানুষই কিন্তু সায় দিয়েছিলেন মিস্টার গুডফেলোর কথায়। কি দরকার এখন খামোকা হইচই করার? দুটো দিন অপেক্ষা করা যাক না।

রুখে দাঁড়িয়েছিল একজনই। খুবই বদ স্বভাবের এক ছোকরা। সম্পর্কে সে মিস্টার শাটল্ওয়ারদি-র আপন ভাইপো। থাকে কাকার সঙ্গে একই বাড়িতে।

এই ছোকরা তেড়ে উঠে বলেছিল, সবুর করার কি আছে? চুপচাপ থাকতে যাবো কেন? নিহত মানুষটার লাশ খোঁজা হোক এখুনি।

ছোকরার নাম পেনিফেদার। তার গোঁ দেখে সন্দেহ জেগেছিল বেশ কিছু লোকের মনে। মিস্টার গুডফেলো তো বিড়বিড় করে বলেই ফেলেছিলেন—'আশ্চর্য কথা বটে—আর কিছু বলতে চাই না!'

আশ্চর্য নয় কি? কাতারে কাতারে মানুষদের মধ্যেই তৎক্ষণাৎ গুঞ্জন শোনা গেছিল। ঠিকই বলেছেন মিস্টার গুডফেলো। পেনিফেদার জানছে কি করে যে, সত্যিই খুন হয়েছেন তার কাকা? লাশ খোঁজার কথা তার মাথায় আসছে কেন?

ফলে, হাতাহাতি না হোক, কথা কাটাকাটি হয়ে গেল পেনিফেদার আর 'চার্লি গুডফেলো'র মধ্যে। দুজনের মধ্যে সম্পর্ক খুব একটা মধুর ছিল না গত মাস তিন চার ধরে। কাকার বাড়িতে এত আনাগোনা, এত খানাপিনা, বড়লোক কাকার সঙ্গে এত মাখামাখি পছন্দ হয়নি পেনিফেদারের। হাজার হোক, সে-ই তো কাকার একমাত্র উত্তরাধিকারী। সেই জোরেই শুধু কথায় না মেরে, হাতেও মেরে বসেছিল 'চার্লি গুডফেলো'কে।

কিন্তু অসীম সহিষ্ণুতা বটে ভদ্রলোকের। খাঁটি খ্রীস্টান। মারের চোটে মাটিতে ঠিকরে পড়েও উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে 'সময় বুঝে সুদে আসলে প্রতিহিংসা নেওয়া' জাতীয় কি সব বলতে বলতে বেরিয়ে গেছিলেন বাড়ি থেকে—পালটা মার দেওয়া তো দূরের কথা—দুদিনেই পেনিফেদারকে একেবারে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। মার খেয়ে যা বলেছিলেন, তার কোনো মানেই হয় না—ও রকম অবস্থায় এ জাতীয় কথাই তো তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে

আসে মুখ দিয়ে।

সমবেত জনতা কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোঁয়ার পেনিফেদারের কথামতই তক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিল ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে—যাতে আশপাশের সমস্ত অঞ্চল তন্নতন্ন করে দেখা হয়ে যায়। কিভাবে জানি না, এ মত ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন 'চার্লি গুডফেলো'। ভাগাভাগি হওয়ার দরকার কি? একসঙ্গেই দল বেঁধে বেরোনো হোক। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছিল অভিযান যাবে সমবেত ভাবে—সবাই থাকবে একই দলে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন 'চার্লি গুডফেলো' নিজে।

যোগ্য লোককেই নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল সেদিন। পথঘাটে খানাখন্দের এরকম হদিশ 'চার্লি গুডফেলো' ছাড়া আর কেইবা জানে। তাছাড়া, তাঁর দুটো চোখই যেন লিংক্স বেড়ালের চোখের মতন অতীব শাণিত—দেখতে পায় নিরন্ধ্র অন্ধকারেও। যেসব গর্ত আর রন্ধ্রপথের কথা কারো জানাই ছিল না—সবই দেখা গেল ওঁর নখদর্পণে—যাতায়াতের পথে এসব কস্মিনকালেও পড়ে না—তাই কেউ খবর রাখেনি—উনি কিন্তু রেখেছেন। এত অলিগলি কাণাগলি যে এ তল্লাট ঘিরে রয়েছে, তাও কেউ ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি। সাতদিন সাতরাত ধরে বিরামবিহীন ভাবে এসবের প্রতিটি তন্নতন্ন করে দেখার পরেও মিস্টার শাটল্‌ওয়ারদির চুলের ডগার সন্ধানও মিলল না।

আক্ষরিক অর্থে তাই বটে, কিন্তু কিছু চিহ্ন পাওয়া গেছিল সাতদিন সাতরাতের তদন্ত-অভিযানে। মিস্টার শাটল্‌ওয়ারদি যে অশ্বে আরূঢ় হয়ে অগস্ত্য যাত্রা করেছিলেন তার খুর ছিল বিশেষ ধরনের। মাটিতে ছাপ এঁকে যেত অদ্ভুতভাবে। সেই ছাপ অনুসরণ করা হয়েছিল। দেখা গেছিল, শহর থেকে নিক্রান্ত হয়ে ভদ্রলোক মূল সড়ক ধরে গেছিলেন তিন মাইল দূরে, আধমাইল পথ বাঁচানোর জন্যে ঢুকেছিলেন একটা জঙ্গলে, জঙ্গুলে-পথ আবার এসে পড়েছিল মূল সড়কে।

ঘোড়ার খুরের ছাপ এই জঙ্গুলে-পথ বেয়ে কিছুটা গিয়ে যেন আকাশে উড়ে গেছে। যে জায়গা থেকে ছাপ হয়েছে নিশ্চিহ্ন, তার ডানদিকে রয়েছে কাঁটাঝোপে ভরাট একটা কাদা ডোবা।

ঠিক এই জায়গায় যেন একটা বিরাট শস্তাধস্তি হয়ে গেছে—মৃত্তিকায় রয়েছে তার স্বাক্ষর। মানুষের দেহের চাইতে ভারি আর বড় একটা বস্তুকে যেন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কাদা ডোবার দিকে।

দু-দুবার জাল ফেলা হয়েছিল কাদা ডোবায়। কিস্‌সু পাওয়া যায়নি। রিক্ত হস্তে তাহলে কি ফিরে যেতে হবে?

ঈশ্বর সদয় হয়েছিলেন 'চার্লি গুডফেলো'র ওপর। বুদ্ধিটা ঝলসে উঠেছিল তো তাঁরই মগজে। তিনিই বলেছিলেন—ছেঁচে বের করা হোক কাদা ডোবার সমস্ত কাদা।

হুল্লোড় করে উঠেছিল তদন্ত পার্টি। শতমুখে তারিফ করেছিল 'চার্লি

গুডফেলো'র উপস্থিত বুদ্ধির। বিচক্ষণতা আর দূরদর্শিতা আছে বলেই তো সর্বজনপ্রিয় হতে পেরেছেন ভদ্রলোক।

কোদাল এনেছিল অনেকেই—যদি মিস্টার শাটল্‌ওয়ারদি-র মৃতদেহ মাটির তলায় চাপা থাকে—খুঁড়ে বের করতে হবে তো। সেই সব কোদালই এখন কাজে লাগল। ঝপাঝপ তুলে ফেলা হল সমস্ত কাদা। ডোবার ঠিক মাঝখানকার কাদা তোলবার সময়ে দেখা গেল মিস্টার শাটল্‌ওয়ারদির কালো সিল্ক-ভেলভেটের ওয়েস্টকোট।

ওয়েস্টকোট কিন্তু আস্ত নেই—ছিঁড়েখুঁড়ে তো গেছেই, রক্তও লেগেছে বেশ কয়েক জায়গায়।

কিন্তু এই ওয়েস্টকোট সত্যিই কি মিস্টার শাটল্‌ওয়ারদির? তাঁর ভাইপোর নয় তো?

তদন্ত-পার্টির অনেকেই বললে—তারা নিজের চোখে দেখেছে শনিবারের কাকডাকা ভোরে হন্তদন্ত হয়ে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন মিস্টার শাটল্‌ওয়ারদি, তখন বিশেষ এই পরিধেয়টি ছিল তাঁর শ্রীঅঙ্গে। ওয়েস্টকোট যে তাঁর ভাইপোর নয়—তারও অনেক সাক্ষী জুটে গেল তৎক্ষণাৎ। শনিবার অথবা রবিবার—মানে, বাড়ি ছেড়ে কাকা বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে ক্ষণেকের জন্যেও তো কালো কুচকুচে এই ওয়েস্টকোটকে ভাইপোর গায়ে দেখা যায়নি।

কালো ওয়েস্টকোটই কিন্তু সঙিন করে তুলল ভাইপোর অবস্থা। প্রথম থেকেই সন্দেহ দানা বেঁধেছিল তাকেই ঘিরে, এখন পাওয়া গেল সন্দেহের সমর্থন। ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল পেনিফেদার। এ বিষয়ে তার মতামত কি জানতে চাওয়া হয়েছিল। মুখ দিয়ে একটা কথাও বের করতে পারেনি।

পেনিফেদার বদ, বাউণ্ডুলে আর উঞ্ছ প্রকৃতির ছোকরা বলে তার মোসাহেব যেমন ছিল; শত্রুও তেমনি ছিল। কিন্তু এই দুটো দলই সেই মুহূর্তে একজোট হয়ে ধিক্কার জানিয়েছিল ছোকরাকে। জিগির তুলেছিল—আর দেরি কেন? খুড়ো-খুনের অপরাধে এখুনি গ্রেপ্তার করা হোক ভাইপোকে।

'চার্লি গুডফেলো'র উদার মন আর পরোপকারী স্বভাবের আর একটা নমুনা পাওয়া গেছিল সেই মুহূর্তে। দরাজ গলায় তিনি শান্ত করেছিলেন রাগে-পাগল তদন্ত পার্টিকে। বলেছিলেন—'কাকার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী পেনিফেদারের পক্ষে এ কাজ কখনোই সম্ভব নয়। আমার সঙ্গে পেনিফেদারের সংঘর্ষ লেগেছিল ঠিকই—কিন্তু আমি তো তাকে অন্তর থেকে ক্ষমা করেছি। এখনও সর্বশক্তি দিয়ে তাকে রক্ষা করে যাবো এই মিথ্যে অপবাদের খপ্পর থেকে।'

পেনিফেদারের নির্দোষিতার সমর্থনে আরও আধঘণ্টা উদাত্ত গলায় কথা বলে গেছিলেন 'চার্লি গুডফেলো'। কিন্তু শরীর আর মনের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ধকল খাওয়ার সময়ে, কথাবার্তাও একটু লাগামছাড়া হয়ে যায়। মাঝে মাঝে খেই

হারিয়ে ফেলে উল্টোপাল্টাও বকে যাচ্ছিলেন মিস্টার গুডফেলো। ফলটা হল উনি যা চাইছিলেন, ঠিক তার উল্টো। তদন্তপার্টির ঘোর সন্দেহ জন্মেছিল পেনিফেদারের ওপর—বক্তৃতার প্রগলভতায় দেখা গেল সন্দেহ ঘোরতর হয়ে উঠেছে। জনতাকে তখন রোখে কে—পেনিফেদারকে ছিঁড়ে ফেলতে পারলে যেন বাঁচে।

মিস্টার শাটল্‌ওয়ারদি-র তিনকুলে কেউ আর নেই—গুণধর এই ভাইপো ছাড়া। তাই উইলে তিনি লিখে রেখেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি পাবে ভাইপোই। তবে কিছুদিন আগে রেগে টং হয়ে গলাবাজি করে বলেছিলেন ভদ্রলোক—উঞ্ছ ভাইপোকে এক পয়সাও দেবেন না—নতুন উইল লিখবেন শিগগিরই। কিন্তু রাগের মাথায় যা বলা যায়, ঠাণ্ডা মাথায় তা করা যায় না। তাই উইল আর পালটাননি মিস্টার শাটল্‌ওয়ারদি।

তোড়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে এই সব কথাই বলে ফেলেছিলেন মিস্টার গুডফেলো। এইটাই হয়েছিল তাঁর ভয়ানক ভুল। রুষ্ট তদন্তপার্টি সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল—উইল আর পালটানো হয়নি ঠিকই—কিন্তু একবার যখন হুমকি দেওয়া হয়েছে—তখন ভবিষ্যতে আবার কোনো দুর্বল মুহূর্তে উইল তো পালটেও যেতে পারে। ভয়টা থেকেই যাচ্ছে। কাজেই, উইল পালটানো চিরতরে বন্ধ করার মোক্ষম দাওয়াই হচ্ছে খুড়োকে খুন করে লাশ নিপাত্তা করা।

তদন্তপার্টির এহেন সিদ্ধান্তের পেছনে আইনের সমর্থনও ছিল পুরোপুরি। ল্যাটিনে আইনের দুটো শব্দ আছে ঃ 'কুই বোনো', মানে, লাভটা কার? এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, লাভটা পেনিফেদারের।

অতএব ডোবার ধারেই গ্রেপ্তার করা হল পেনিফেদারকে।

আরও কিছুক্ষণ তদন্ত চালিয়ে কিছু না পেয়ে সবাই যখন ফিরে যাচ্ছে শহরের দিকে, তখন উৎসাহী 'চার্লি গুডফেলো' হঠাৎ দৌড়ে গেছিলেন একদিকে। এমনিতেও উত্তেজনার চোটে উনি যাচ্ছিলেন সবার আগে—তাই আচমকা জঙ্গলের মধ্যে ছুটে গেলেন কেন—তা দেখতে পেছনে দৌড়োলো বেশ কয়েকজন। তারাই দেখতে পেয়েছিল, বিড়াল-চক্ষু 'চার্লি গুডফেলো' কি যেন একটা তুলে নিলেন ঘাসের ওপর থেকে। উল্টেপাল্টে দেখেই লুকিয়ে ফেললেন নিজের কোটের পকেটে। সঙ্গে সঙ্গে তদন্তপার্টি পৌঁছে গেছিল তাঁর পেছনে। কি লুকোলেন? দেখান এখুনি।

কাঁচুমাচু মুখে জিনিসটা বের করেছিলেন মিস্টার গুডফেলো। একটা স্প্যানিশ ছুরি। ফলায় লেগে রক্ত। এ ছুরি যে পেনিফেদারের, অনেকেই তা জানে। তার চেয়েও বড় কথা, বাঁটের ওপর খোদাই করা রয়েছে পেনিফেদারের নাম।

এরপর আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে কি? 'চার্লি গুডফেলো' চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলেন না ছোকরাকে। শহরে পৌঁছেই তাকে তুলে দেওয়া হল ম্যাজিস্ট্রেটের হাজতে।

সেখানে কিন্তু কেস আরও গুবলেট করে ফেললেন সদাশয় 'চার্লি

গুডফেলো' নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে। হাউহাউ করে বলে ফেললেন—'অনেক চেষ্টা করলাম পেনিফেদারকে আড়ালে রাখতে। জানি আমার সঙ্গে খুবই দুর্ব্যবহার করেছিল ছেলেটা—কিন্তু আমি তো ক্ষমা করেছিলাম। তাই বানিয়ে বানিয়ে অনেক গল্প শোনাচ্ছিলাম বেচারাকে বাঁচানোর জন্যে। কিন্তু পারলাম না। কি করে পারবো? ওর কাকাই তো খড়্গহস্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, শহরে গিয়েই একগাদা টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেবেন বলে। দিয়েই ছুটলেন উকিলের বাড়ি। উইল পালটে তবে বাড়ি ফিরবেন—কাণাকড়িও দেবেন না ভাইপোকে। শুক্রবার রাতেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মিস্টার শাটল্‌ওয়ারদি যখন তাঁর ইচ্ছের কথা শোনাচ্ছিলেন পেনিফেদারকে, তখন পাশের ঘর থেকে সব শুনেছিলাম। শনিবার সকালে কাকা গেলেন শহরে, ভাইপো রাইফেল নিয়ে গেল জঙ্গলে হরিণ শিকার করতে।' বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন 'চার্লি গুডফেলো'।

জেরার মুখে সবই সত্যি বলে মেনে নিয়েছিল পেনিফেদার। তক্ষুনি তার ঘর সার্চ করা হয়েছিল। সেখানে পাওয়া গেছিল ইস্পাত আর চামড়া দিয়ে বাঁধানো মিস্টার শাটল্‌ওয়ারদির নোটবুক—যার পাতায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লেখা থাকে বলে জানে পাড়াপড়শী সবাই। এ নোটবই কখনো তিনি কাছ ছাড়া করতেন না। অথচ এখন তা রয়েছে ভাইপোর ঘরে—খানকয়েক পাতাও নেই।

পেনিফেদার কিন্তু নোটবই-এর ব্যাপারে কোনো অভিযোগ মেনে নিতে পারেনি। কাকার নোটবই তার ঘরে গেল কেন? সে জানে না। কাকার একটা রুমাল আর শার্ট রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে রয়েছে কেন ভাইপোর ঘরে বিছানার পাশে? পেনিফেদার এই কথারও কোনো জবাব দিতে পারেনি।

ঠিক এই সময়ে খবর এসেছিল, আহত অশ্ব স্বর্গে চলে গেছে। মিস্টার গুডফেলো তখনও হাল ছাড়েননি। সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, তাহলে ময়না-তদন্ত করা হোক মরা ঘোড়ার ওপর। গুলির ফুটো যেখানে আছে, বুকের সেই জায়গাটায় নিজেই হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন উনি—হাত টেনে বের করে শুকনো মুখে চেয়েছিলেন মুঠোর দিকে।

মুঠোয় রয়েছে একটা রাইফেলের গুলি। এতবড় বুলেট তো এ শহরে ব্যবহার করে শুধু পেনিফেদার। বুলেটের গায়ে একটা বিশেষ খাঁজ ছিল। ছাঁচের দোষের জন্যেই এরকম খাঁজ দেখা যায় বুলেটে। পেনিফেদার নিজেই স্বীকার করেছিল—এ বুলেট তার নিজের।

এরপর আর তদন্তের দরকার মনে করেননি ম্যাজিস্ট্রেট। পেনিফেদারকে কাঠগড়ায় তোলার হুকুম দিয়েছিলেন—জামিন পর্যন্ত নাকচ করেছিলেন। 'চার্লি গুডফেলো' তা সইবেন কেন? নিজে জামিন হতে চেয়েছিলেন—বাড়ির ছেলে বাড়িতেই থাকুক—এইটাই ছিল তাঁর ইচ্ছে। উত্তেজনায় ভুগছিলেন বলে খেয়ালই ছিল না—তাঁকে জামিনদার হিসেবে মেনে নিতে পারে না আদালত। কেননা, তাঁর কাণাকড়ি দামের জমিজায়গাও নেই এই পৃথিবীর কোথাও।

যথা সময়ে বিচার হল পেনিফেদারের। 'চার্লি গুডফেলো' এতই সরল মানুষ যে, কোর্টে গিয়ে এমন অনেক বেফাঁস কথা বলে ফেললেন যার প্রতিটি আরও জোরদার করে তুললো পেনিফেদারের কেস। ফলে, আদালত তার মৃত্যুদণ্ডের রায় দিলে এবং তাকে জেলে ঢুকিয়ে রাখল মৃত্যুদণ্ড না হওয়া পর্যন্ত।

গোটা শহরের কাছে কিন্তু এরপর থেকেই চোখের মণি হয়ে উঠলেন 'চার্লি গুডফেলো'। দশগুণ বেড়ে গেল তাঁর খাতির আর গুণগান। হাজার চেষ্টা করেও প্রিয় বন্ধুর ভাইপোকে জেলবাস আর আসন্ন মৃত্যু থেকে বাঁচাতে না পেরে বেসামালও হয়ে গেলেন। অভাবের দরুন স্বচ্ছলভাবে থাকার উপায় ছিল না ইচ্ছে থাকলেও। এখন যখন তখন বাড়িতে বসাতে লাগলেন খানাপিনা আর সুরাপানের মজলিশ। শোচনীয় ঘটনাটা ভুলে থাকার চেষ্টা করেও পারতেন না—মাঝে মাঝেই উদাস হয়ে যেতেন, বিমর্ষ হয়ে যেতেন।

ঠিক এই সময়ে একটা চিঠি পেয়ে যেন আকাশ থেকে পড়লেন ভদ্রলোক। চিঠিটা এই :

চার্লস গুডফেলো,
র‍্যাটল্‌বরো,
সবিনয় নিবেদন,

আমাদের সম্মাননীয় খরিদ্দার মিস্টার বারনাবাস শাটল্‌ওয়ারদি মাস দুয়েক আগে অর্ডার দিয়েছিলেন, দু'বাক্স 'শ্যাটো মার্গো' মদ্য আপনার বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে। দেরি হওয়ার জন্যে দুঃখিত। আজ সকালেই একটা বাক্সের মধ্যে দু'বাক্স 'শ্যাটো মার্গো' পাঠানো হল। এই চিঠি যখন পাবেন, তার পরের দিনই ওয়াগনে বাক্স পৌঁছে যাবে আপনার দোরগোড়ায়।

নমস্কার।

ভবদীয়—

হগস্‌, ফ্রগস্‌, ব্রগস্‌ অ্যাণ্ড কোম্পানী

বন্ধুর অপঘাতে মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিশ্রুত উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা ছেড়েই দিয়েছিলেন 'চার্লি গুডফেলো'। তাই আনন্দে নেচে উঠেছিলেন প্রিয় সুরার আসন্ন আবির্ভাবের সংকেত পেয়ে। বন্ধুর উপহার একা সাবাড়ও করতে চাননি—দিলদরিয়া মেজাজ তাঁর—দিয়ে থুয়ে সবাইকে নিয়ে মজা করতেই ভালবাসতেন। তাই পরের দিন প্রচুর বন্ধুবান্ধবকে আমন্ত্রণ করেছিলেন একরাতেই দু'বাক্স 'শ্যাটো মার্গো' উড়িয়ে দেওয়ার মতলবে—কিন্তু মূল্যবান এই আসব যে তাঁর প্রয়াত বন্ধুর পয়সায় আসছে—এ কথাটা কাউকে বলেননি। কেন যে বলেননি, আজও তা বুঝিনি। যাঁর মন এত উদার তিনি এই গোপনীয়তার মধ্যে না গেলেও পারতেন।

'শ্যাটো মার্গো'র নাম শুনলেই হোক, কি, 'চার্লি গুডফেলো'র সুনামের জন্যেই হোক—পরের দিন আধখানা শহর চলে এসেছিল তাঁর বাড়ি। সবচেয়ে

গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই হাজির ছিলেন সেদিন। ছিলাম আমিও। কিন্তু মদের বাক্স আসতে এত দেরি হবে কে জানত। ভাল ভাল খাবারের আয়োজন করেছিলেন গৃহস্বামী—দেরি দেখে সবই চেটেপুটে মেরে দিলাম। তারপর রাত বাড়লে এসে পৌঁছোলো বিশাল বাক্স।

শুধু বাক্স না বলে তাকে দানবের বাক্সই বলা উচিত। ঘরের মধ্যে টেনে আনতেই হিমসিম খেয়ে গেলাম এতজনে। তর সইছে না কারোরই। বিশেষ করে 'চার্লি গুডফেলো'র। তিনি টেবিলের মাথায় বসে ডিক্যান্টার ঠুকতে ঠুকতে জজসাহেবের গলায় সুরামত্ত স্বরে হুকুম দিলেন—'আর দেরি কেন? উদ্ধার ঘটুক কবরের সম্পদের।' বাক্স তুলে ফেলা হল টেবিলের ওপর—রাখা হল তাঁর সামনে। সবার আগে হাত লাগালাম আমি।

তারপরেই শ্মশান-নীরবতা নেমে এল গোটা ঘরে। 'শ্যাটো মার্গো'র দেরি দেখে নিজের ভাঁড়ার থেকেই সবাইকে গেলাস গেলাস মদ গিলিয়ে দিয়েছিলেন 'চার্লি গুডফেলো'। নিজে খেয়েছিলেন সব চাইতে বেশি। তাই আজকের মজলিশের মধ্যমণি 'শ্যাটো মার্গো'কে সহসা 'কবরের সম্পদ' এর সঙ্গে তুলনা করায় সবাই যেন থিতিয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে।

নিস্তব্ধ ঘরে কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর কে যেন আমাকেই বললে বাক্সটা এবার খুলে ফেলার জন্যে।

সঙ্গে সঙ্গে ছেনি, বাটালি, হাতুড়ি নিয়ে লেগে গেলাম আমি। ঠকাং ঠকাং করে পেরেকগুলো আলগা করে দিতেই দড়াম্ ধুম্ করে ডালা খুলে সটান উঠে গেল আপনা হতেই—বাক্সর ভেতর থেকে ডালা ঠেলে মাথা তুলে পিঠ খাড়া করে বসলেন নিহত মিস্টার শাটল্ওয়ারদির ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত, প্রায়-গলিত শবদেহ; গৃহস্বামীর মুখোমুখি বসে, চোখে চোখে চেয়ে, বলে গেলেন কাটা কাটা স্পষ্ট গলায়—'তুমিই সেই লোক!' বলেই, গলিত, নিষ্প্রভ চোখের পাতা না ফেলে শরীর এলিয়ে দিলেন বাক্সের পাশের দিকে—থরথর কাঁপতে লাগল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

এর পরের দৃশ্য বর্ণনার অতীত। উল্কাবেগে অনেকেই ছিটকে গেল দরজা আর জানলার দিকে। পুরুষসিংহ বলে যারা বড়াই করে এসেছে এতদিন, তাদের বেশির ভাগই পত্রপাঠ জ্ঞান হারিয়ে আছড়ে পড়ল মেঝের ওপর। বিভীষিকার অকস্মাৎ বিস্ফোরণে মুহ্যমান অবস্থাটা একটু পরেই কেটে যাওয়ার পরেই জোড়া জোড়া চক্ষু কোটর থেকে প্রায় বেরিয়ে এসে নিবদ্ধ হয়েছিল স্বয়ং গৃহস্বামীর ওপর।

অবর্ণনীয় ভাবান্তর এসেছে তাঁর চোখেমুখে চেহারায়। হাজার বছরও যদি আমার পরমায়ু হয়, আয়ুষ্কালের শেষ রজনী পর্যন্ত আমি ভুলতে পারব না তাঁর সেই মুখচ্ছবি। মড়ার মত বিবর্ণ হয়ে গেছিলেন, আত্যন্তিক মানসিক যন্ত্রণা প্রকট হয়ে উঠেছিল প্রতিটি লোমকূপ-রন্ধ্রে। একটু আগেই যে মুখ সুরা আর উল্লাসে সূর্যের মতই ভাস্বর হয়েছিল—এখন তা যেন অন্ধকারময় বিবর। বেশ কয়েকটা

মিনিট পাথরের মূর্তির মত বসে রইলেন তো রইলেনই, শূন্য চাহনি দেখে বোঝা গেল—উনি আর বাইরের জগৎ দেখছেন না—দেখছেন নিজের খুন-কলুষিত বিবেককে। অনেকক্ষণ পরে বুঝি প্রাণ সঞ্চার ঘটল প্রস্তরমূর্তিতে—যেন একটা বিদ্যুতের ঝলক বয়ে গেল প্রতিটি অণু পরমাণুতে—নিমেষে চাহনি ফিরে এল বাহ্যজগতে। ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। প্রায় উপুড় হয়ে পড়লেন টেবিলের ওপর। শবদেহের হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে গড়গড় করে বলে গেলেন কিভাবে নিজের হাতে পিটিয়ে মেরেছেন প্রিয় বন্ধুকে—নিরপরাধ পেনিফেদারকে কৌশলে দোষী সাজিয়ে সরিয়ে দিতে যাচ্ছেন ধরাধাম থেকে।

হ্যাঁ, তিনি শনিবার কাকডাকা ভোরে গেছিলেন মিস্টার শাটল্‌ওয়ারদির পেছন পেছন। ডোবার ধারে পৌঁছে পিস্তল ছুঁড়েছিলেন ঘোড়ার দিকে, তারপর কুঁদো দিয়ে পিটিয়ে খতম করেছিলেন প্রাণের বন্ধুকে। ঘোড়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছে মনে করেই তাকে টেনে হিঁচড়ে ডোবায় এনে ফেলেছিলেন, বন্ধুর লাশ বয়ে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন সেই জঙ্গলেই অনেক দূরে এক পরিত্যক্ত কুয়োয়। বন্ধুর নোটবই তিনিই হাতিয়ে নিয়েছিলেন। ওয়েস্টকোট, নোটবই, ছুরি আর বুলেট উনি নিজেই রেখেছিলেন যেখানে-যেখানে, পাওয়া গেছে ঠিক সেই-সেই জায়গা থেকেই। রুমাল আর শার্টও পেনিফেদারের ঘরে রেখেছিলেন উনিই। উদ্দেশ্য ছিল একটাই ঃ পেনিফেদারের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া।

শেষের দিকে, রক্ত জমানো স্বীকৃতির কথাগুলো জড়িয়ে আসছিল, শূন্যগর্ভ হয়ে যাচ্ছিল। কথা শেষ হওয়ার পর মাথা সিধে করে নিয়ে টলে টলে পিছু হাঁটতে গিয়ে চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেলেন মেঝেতে।

সে দেহে তখন প্রাণ ছিল না।

লোমহর্ষক এই নাটকের স্রষ্টা কিন্তু এই শর্মা স্বয়ং। মিস্টার গুডফেলোর পেট থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করার অভিনব এই ফন্দীর ফলেই 'চার্লি গুডফেলো' এখন নরকের গরম তেলে ভাজা-ভাজা হচ্ছেন, পেনিফেদার কাকার সম্পত্তি পেয়ে তোফা আছে—স্বভাবচরিত্র পাল্টে ফেলেছে—কুপথে আর কক্ষনো যাবে না।

প্রথম থেকেই 'চার্লি গুডফেলো'র অতিরিক্ত অকপটতা আমার মনে বিলক্ষণ বিরক্তির সঞ্চার ঘটিয়েছিল। পেনিফেদার যখন ঘুসি মেরে শুইয়ে দেয় ভদ্রলোককে, ভাগ্যক্রমে আমি তখন হাজির ছিলাম দুজনেরই সামনে। মার খাওয়ার পর ভদ্রলোকের মুখের পরতে পরতে যে পৈশাচিক মনোবৃত্তির অভিব্যক্তি দেখেছিলাম—তার বিচার করেই বুঝেছিলাম, আক্রোশ ইনি পুষে রেখেছিলেন মনের মধ্যে—বদলা নেবেন সময় এলেই। এই ধারণা আমার মনের মধ্যে গেঁথে ছিল বলেই, 'চার্লি গুডফেলো'কে শহরের সবাই যে চোখে দেখেছে, আমি সে চোখে দেখতে পারিনি। সবাই তাঁর কথাকে যেভাবে নিয়েছে, আমি সেভাবে নিতে পারিনি। পদে পদে আমি লক্ষ্য করেছিলাম, উনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কখনো সোজাসুজি, কখনো বেঁকিয়ে অপরাধের প্রত্যেকটা প্রমাণ পেনিফেদারের

বিরুদ্ধে খাড়া করে যাচ্ছেন। সন্দেহটা দৃঢ়মূল হল ঘোড়ার বুকে বুলেট আবিষ্কারের পর। শহরশুদ্ধ লোক ভুলে গেলেও আমি কিন্তু ভুলিনি—ঘোড়ার গায়ে এফোঁড় ওফোঁড় ছেঁদা দেখা গেছিল। বুলেট যদি বেরিয়েই গিয়ে থাকে তো 'চার্লি গুডফেলো' তা পেলেন কি করে? নিশ্চয় নিজে রেখে দিয়েছিলেন। একই ভাবে পেনিফেদারের শোবার ঘরে রক্তমাখা শার্ট আর রুমালও ইনি রেখেছিলেন—পরে পরীক্ষা করে দেখেছিলাম—রক্ত নয়—দাগগুলো ক্লারেট মদের। এই সব ভেবে নেওয়ার পর যখন দেখলাম, হঠাৎ টাকা ওড়াতে শুরু করেছেন 'চার্লি গুডফেলো'—তখন ঠিক করলাম ওঁর মুখ দিয়েই বের করতে হবে কুকীর্তির স্বীকারোক্তি।

তাই গোপনে তদন্ত চালিয়ে খুঁজে বের করেছিলাম মিস্টার শাটলওয়ারদির শবদেহ। বেশি খাটতে হয়নি। 'চার্লি গুডফেলো' যে-যে জায়গাগুলো তদন্তের আওতা থেকে বাদ দিয়েছিলেন—আমি গেছিলাম ঠিক সেই-সেই জায়গায়। একটা শুকনো পরিত্যক্ত কুয়োর মুখে একগাদা কাঁটা ঝোপের আড়াল দেখেছিলাম। তলদেশে পেয়েছিলাম মিস্টার শাটলওয়ারদির মৃতদেহ।

মৃত ব্যক্তি যখন তাঁর খুনে বন্ধুকে দু'বাক্স 'শ্যাটো মার্গো' খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন—আমিও ছিলাম সেখানে। মাতালের এই অঙ্গীকারকেই আমি কাজে লাগিয়েছি। একটা তিমির হাড় জোগাড় করেছিলাম। গেদে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম মৃতদেহের গলার মধ্যে দিয়ে। দু'ভাঁজ করে চেপেচুপে মদের বাক্সের মধ্যে মৃতদেহ ঢুকিয়ে পেরেক ঠুকে লাগিয়ে দিয়েছিলাম ডালা। আমি জানতাম, ডালা খুললেই তিমির হাড় বেঁকা অবস্থা থেকে সোজা হতে চাইবে—এক ঝটকায় সোজা করে দেবে মৃতদেহকেও। হয়েছিলও তাই।

বাক্স পাঠিয়েছিলাম আমারই লোক দিয়ে। মদের কোম্পানীর নাম দিয়ে চিঠিও লিখেছিলাম আমি।

মড়া কথা বলে গেল কিভাবে? আরে মশাই, আমি তো ভেনট্রিলোকুইস্ট—ঠোঁট না নাড়িয়ে গলার মধ্যে কথা বাজিয়ে যেতে পারি অনায়াসেই। অস্বাভাবিক সেই কণ্ঠস্বরকেই মড়ার বচন বলে মনে হয়েছিল খুনির, ঘরশুদ্ধ লোকের এবং আপনার! □

অদ্রীশ বর্ধন অনূদিত
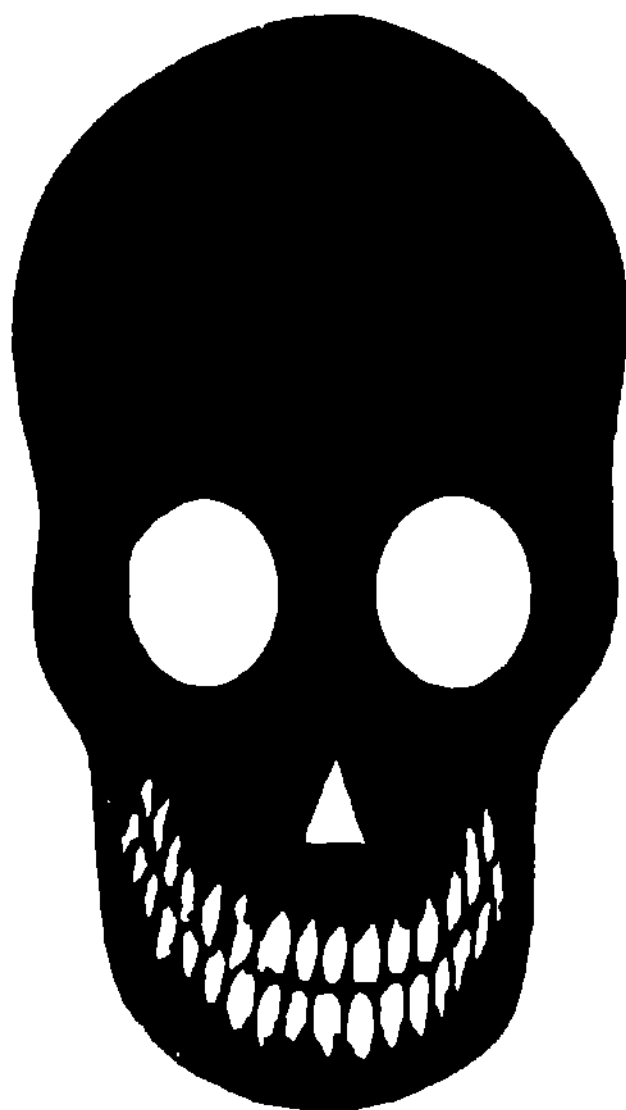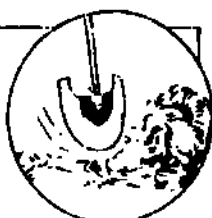
এডগার অ্যালান পো

রচনাসংগ্রহ

ভয়াল রসের গল্প-উপন্যাস আজও বিশ্বশ্রেষ্ঠ

৩
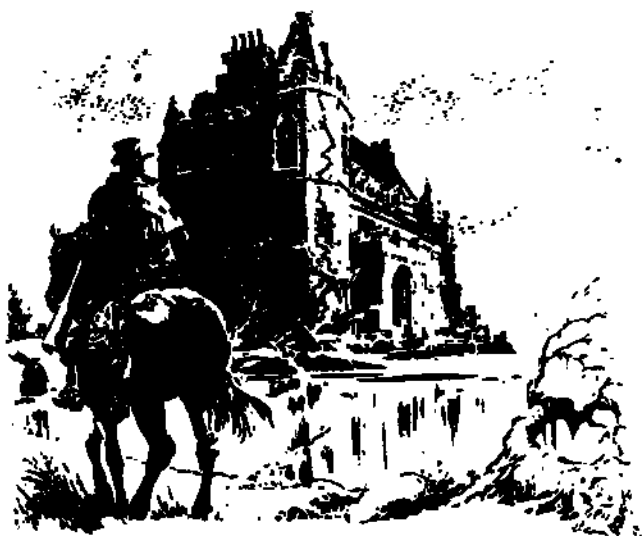
সূচিপত্র

এডগার অ্যালান পো রচনাসংগ্রহ

৩য় খণ্ড

প্রাক্তন সম্পাদকের সাহিত্যিক জীবন

[দ্য লিটারারি লাইফ অফ থিংগাম বব, এসকোয়ার]

বয়স কম হল্যো না, শেক্সপিয়রও যখন দেহ রেখেছেন, আমাকেও যেতে হবে, তাই ভেবে দেখলাম, সাহিত্যের জগৎ থেকে এবার সরে পড়া ভাল—সম্মান-টম্মান যা পেয়েছি, তাই নিয়েই কাটিয়ে দেব বাকি জীবনটা। কিন্তু ভবিষ্যতের সাহিত্য-সাধকদের জন্যে কিছু সাধনা-কৌশল রেখে যেতে চাই। আমার সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকের চিত্রটা তুলে ধরলেই সে কাজ নিষ্পন্ন হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমার নাম পাবলিকের চোখের সামনে রয়েছে অনেক দিন ধরে। আমাকে ঘিরে তাদের কৌতূহলের শেষ নেই। অনেক উত্তেজনার সঞ্চার ঘটিয়েছে এই নাম তাদের মনের মধ্যে। তাই তো আমার উচিত, যে পথ বেয়ে শিখরে আরোহণ উঠেছি, সেই পথের কিঞ্চিৎ চিহ্ন পরের পথিকদের সুবিধের জন্যে রেখে যাওয়া। তবেই না আমি মহান।

যে কোনও মানুষেরই অতি-দূর পূর্বপুরুষদের নিয়ে ধানাইপানাই করাটা একটা বাড়াবাড়ি হয়ে দাঁড়ায়। আমি বলব শুধু আমার বাবার কথা। বাবা ছিল নাপিত। স্মাগ শহরের নামী নাপিত-ব্যবসায়ী। চুল দাড়ি কাটার কারখানায় ভিড় করতো শহরের মান্যগণ্য ব্যক্তিরা—বেশি আসত পত্র-পত্রিকার সম্পাদকরা—যাদের দেখলেই ভয়ে বুক কাঁপত আর সমীহ করতে ইচ্ছে করত। আমার চোখে তারা ছিল সাক্ষাৎ ভগবান। দাড়িতে সাবান ঘষবার সময়ে যখন

অনর্গল দেববাক্য ঝেড়ে যেত—আমি হাঁ করে শুনতাম আর গিলতাম। 'গ্যাড-ফ্লাই' কাগজের সম্পাদক ভুড়িভুড়ি প্রশংসা করে যেত 'নির্ভেজাল বব-তৈল'র। জিনিসটার আবিষ্কারক আমার বাবা। সম্পাদকের প্রশংসা পেয়ে এই তেলের কাটতি বেড়ে গেছিল। সম্পাদককেও এক পয়সা দিতে হতো না চুল-দাড়ি কাটার জন্যে।

ভাল কথা, আমার বাবার নাম টমাস বব। কোম্পানীর নাম 'টমাস বব অ্যাণ্ড কোম্পানী।' আমার নাম পরে শুনবেন।

'বব তৈল' নিয়ে 'গ্যাড-ফ্লাই'এর সম্পাদক ছড়া বানিয়ে আবৃত্তি করত দাড়িতে সাবান ঘষার সময়ে। শুনে আমি পুলকিত হয়েছিলাম। একদিন যেন দৈববাণী ধ্বনিত হলো মাথার মধ্যে। স্বর্গীয় ঝলক বলতে পারেন। বিখ্যাত হওয়ার পথ পরিষ্কার দেখতে পেলাম। বাবার চরণে গিয়ে পড়লাম।

বললাম—"বাবা গো, সাবানের ফেনা তৈরির জন্যে আমি জন্মাইনি। আমি হতে চাই সম্পাদক, কবি—'বব-তৈল' নিয়ে কবিতা আর প্রবন্ধ রচনা করে যেতে চাই। বিখ্যাত হওয়ার সুযোগ করে দাও বাবা।"

বাবা বলল—"বৎস কি-যেন-নাম—তোমার (এই হলো গিয়ে আমার নাম; আমার এক বড়লোক আত্মীয় এই নামে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছিল)," কান ধরে পায়ের কাছ থেকে আমাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিতে দিতে বলেছিল—'বৎস কি-যেন-নাম—তোমার, হয়েছো ঠিক বাবার মতোই। মাথাটা যখন প্রকাণ্ড, মগজও আছে যথেষ্ট। তাই ঠিক করেছিলাম তোমাকে উকিল বানাবো। ও ব্যবসা এখন আর ভদ্রলোকের ব্যবসা নয়। পলিটিশিয়ানদের পয়সা জোটে না। সবদিক ভেবে দেখলে, সম্পাদকের কারবারে লাভ আছে। সেই সঙ্গে যদি কবি-ও হয়ে যেতে পারো—বেশির ভাগ সম্পাদকই তাই—তাহলে তোমাকে রোখে কে। একই ঢিলে দু'পাখি মারা হয়ে যাবে। কাগজ, কলম, কালি, একটা ঘর আর এক কপি 'গ্যাড-ফ্লাই' দিচ্ছি—লেগে যাও। আর কিছু চেয়ো না।"

"বাবা গো, আমি অকৃতজ্ঞ নেই। জানি তুমি উদারহস্ত, কিন্তু আর কিছুই যাজ্ঞা করিনা—তবে হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি, তোমাকে এক জিনিয়াসের বাবা বানিয়ে ছাড়ব।"

এই বলে লেগে গেলাম কবি হওয়ার সাধনায়—কবি থেকেই হবো সম্পাদক, এই ছিল আমার প্ল্যান।

'বব-তৈল' ছড়াগুলো নিয়ে বসেছিলাম—হুবহু ওইরকম খান কয়েক লিখে ফেলব বলে। কিন্তু কালঘাম ছুটে গেল। মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারলাম না। এ জিনিস আমার কলম দিয়ে বেরোবে না বুঝতে পেরে যে ফন্দীটা আঁটলাম—সেরকম ফন্দী দুনিয়ার সব জিনিয়াসের মাথাতেই কখনো সখনো এসে যায়। শহরের একদম শেষের দিকে একটা পুরোনো বইয়ের দোকানে গিয়ে জলের দরে কিনলাম কিছু বস্তা পচা সস্তা বই। সে সব বই যে কত যুগ আছে ছাপা হয়েছিল, তার কোনও হিসেব নেই—তাদের নামও কেউ শোনেনি, কেউ

পড়েওনি। একটা বই দান্তে নামে একটা লোকের লেখা 'ইনফারনো' থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। এর বেশ খানিকটা অংশ পরিষ্কার হরফে নকল করে নিলাম। কপি করতে গিয়েই জানলাম, 'আগোলিনো' নামে একটা লোকের নাম—নানান কাণ্ডকারখানার হোতা। আর একটা বইয়ের লেখকের নাম ভুলে গেছি; তাতে ছিল বেশ কিছু পদ্য। সেখান থেকেও বিস্তর লাইন কপি করে নিলাম। ভূত, পরী, দানো ইত্যাদি বিষয়ে যেখানে-যেখানে পদ্য ফাঁদা হয়েছে—তুলে নিলাম শুধু সেই জায়গাগুলোই। তেসরা বইটার লেখক আবার চোখে দেখতে পায় না—স্রেফ অন্ধ—জাতে গ্রীক-ট্রিক হবে; তার বই থেকে ঝেড়ে দিলাম খান পঞ্চাশেক পদ্য। চৌঠা বইটাও লিখেছে এক অন্ধ পুরুষ; শিলাখণ্ড, পবিত্র আলো—এই সব কথা যেখানে-যেখানে দেখলাম, টুকে নিলাম। অন্ধ কিভাবে আলো দেখতে পায়, তা নিয়ে অবাক হলেও দেখেছিলাম কবিতাগুলো মন্দ নয়—পাতে দেবার মতো।

টুকলিফায়েড কবিতাগুলোকে চারখানা লেফাপায় ভরে সযত্নে পাঠিয়ে দিলাম চার বিখ্যাত পত্রিকায়। 'অপ্পোডেলডো'—এই ছদ্মনামে সই করে চিঠি পাঠালাম চার সম্পাদককে।

তারপর যে কাণ্ড ঘটলো, তা আর কহতব্য নয়। চার সম্পাদকই নিজের নিজের কাগজে আমার কবিতাগুলোর পিণ্ডি চটকালো, আমার প্রতিভা নিয়ে ঠেস দিয়ে গাদা গাদা কথা লিখে গেল—আমি যে ঝাড়তিস্ কবিতা পাঠিয়েছি এবং ছদ্মনামে পাঠিয়েছি—তাও চোখা চোখা শব্দ প্রয়োগ করে ফাঁস করে দিল।

মাথা হেঁট হয়ে গেল আমার। টুকলিফাই করে কবি হওয়ার সাধও ঘুচে গেলাম। তবে এই ধাক্কা খেয়ে একটা জিনিস শিখলাম। সততাই সবসেরা নীতি। দু'নম্বরি করে কিছু হবে না—মৌলিক লেখা লিখতে হবে।

এবার বাপ-বেটায় বসলাম 'বব-তৈল' পদ্য সামনে নিয়ে। মাথার চুল ছিঁড়েও ওইরকম অনবদ্য ছড়া যখন কলম দিয়ে বেরোলো না—তখন দাঁতে দাঁত দিয়ে লিখে ফেললাম মাত্র দুটো লাইন :

"বব-তৈল নিয়ে পদ্য লেখা।
বড্ড ঝকমারি!—চালিয়াত"

যেহেতু 'বব-তৈল' আডিয়াটা গ্যাড-ফ্লাই পত্রিকা সম্পাদকের—তাই দু'লাইনের কবিতা পাঠিয়ে দিলাম প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা 'মিছরি-মিঠাই' পত্রিকার সম্পাদকের কাছে। কোথায় যেন পড়েছিলাম, লেখার আয়তনের সঙ্গে ধীশক্তির আয়তন মাপে সমান হয় না। লেখা ছোট্ট হোক—প্রতিভা গগনস্পর্শী হতে পারে।

'মিছরি-মিঠাই'-এর সম্পাদক জহুরী বটে। ঠিক রত্ন চিনলেন। আমার দু'লাইনের কবিতাটা অক্ষরে অক্ষরে ছাপিয়ে দিয়ে তার তলায় ছ'লাইনে সম্পাদকীয় মন্তব্যে যা লিখলেন, তার মর্মার্থ এই : কে এই নবীন প্রতিভা 'চালিয়াত?' বাজার মাৎ করে দিলেন প্রথম আবির্ভাবেই। 'গ্যাড-ফ্লাই' কাগজে

'চালিয়াত' ছদ্মনামটা যে এইভাবে সম্পাদককে নাড়া দেবে, তা ভাবিনি। উনি যখন আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন, তখন তাঁকে কৃতার্থ করা দরকার। গেলাম একদিন। উনি বাড়িতেই ছিলেন, জামাই-আদর করলেন। ওঁর নাম মিস্টার কাঁকড়া। 'গ্যাড-ফ্লাই' কাগজটাকে সংক্ষেপে বলেন 'মাছি।' 'মাছিকে যখন ঠুকেছি, তখন মাছি'র সম্পাদক এক হাত নেবে আমাকে। তাতে আমি যেন না ঘাবড়াই। মিস্টার কাঁকড়া নিজেই তার জবাব দেবেন—ব্যক্তিগত কারণে। 'মাছি' আর 'মিছরি-মিঠাই'তে বেশ বিরোধ আছে বুঝলাম। অথচ মাখো-মাখো সম্পর্ক থাকাই উচিত ছিল।

সুযোগ বুঝে সম্মান-দক্ষিণার কথা তুলেছিলাম। শুনেই শ্রীযুক্ত কাঁকড়া চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন, দু'হাত অবশ হয়ে ঝুলে পড়ল দু'পাশে, সেই সঙ্গে প্রকাণ্ড হাঁ হয়ে গেল মুখবিবর—অবিকল হাঁস-এর মতো; এই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকবার পর তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই ছুটলেন ঘণ্টার দড়ির দিকে (ঘণ্টা বাজিয়ে কাউকে ডাকতে যাচ্ছিলেন নিশ্চয়—কিন্তু কেন, তা বুঝিনি); মাঝপথেই সামলে নিলেন, ফিরে এসেই ধাঁ করে ঢুকে গেলেন টেবিলের তলায়, বেরিয়ে এলেন একটা মোটা রুল নিয়ে, সেই রুল তুললেন মাথার ওপর (উদ্দেশ্যটা আজও অপরিষ্কার আমার কাছে); আবার সামলে নিলেন; রুল রাখলেন টেবিলে; আবার প্রকাণ্ড হাঁ করলেন—অনেকটা হাঁসের মতোই প্যাঁক-প্যাঁক করতে করতে এসে চেয়ারে বসে যা বললেন তোৎলাতে তোৎলাতে, সাদা কথায় তা এই :

'মিছরি-মিঠাই' পত্রিকায় যারা লেখে, তার মোটা সম্মান-দক্ষিণা সম্পাদকের হাতে গুঁজে দিয়ে যায়—চায় না। আমার ক্ষেত্রে সামান্য ব্যতিক্রম দেখাতে পারেন শ্রীযুক্ত কাঁকড়া। প্রথম কয়েকটা লেখার জন্য ওঁকে সম্মান-দক্ষিণা না দিলেও চলবে।'

বলতে বলতে আবেগে চোখে জল এনে ফেললেন শ্রীযুক্ত কাঁকড়া।

অভিভূত হলাম আমি। কথা দিলাম আরও লিখে যাব। এরকম দাক্ষিণ্য এরকম সম্মান কপালে তো কখনও জোটেনি। না বুঝে মনে ঘা দিয়ে ফেলেছি দেখে খুব কষ্টও হলো। তাই নিয়ে নিটোল একটা বক্তৃতাও দিলাম। তারপর উঠে এলাম।

এর দিন কয়েক পরেই আর এক পকেট সুনাম পেলাম। 'পেঁচা' কাগজে আমার কবিতা নিয়ে সেকি প্রশংসা! দু'দিন যেতে না যেতেই নতুন করে তারিফ ছাপা হয়ে গেল 'ব্যাঙ' কাগজে। তারপর ঘেয়োলো 'ছুঁচো' পত্রিকায়।

হু-হু করে সুনাম ছড়িয়ে পড়তেই জানা গেল আরও একটা খবর। 'মিছরি-মিঠাই' কাগজের কাটতি নাকি ধাপে ধাপে বেড়ে গিয়ে এখন পাঁচ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। লেখকদের বড্ড বেশি সম্মান-দক্ষিণা দিচ্ছে। হিংসের চোটেই এসব

খবর ফাঁস করে দিল 'পেঁচা', 'ছুঁচো' আর 'ব্যাঙ' কাগজ।

শ্রীযুক্ত কাঁকড়া এবার বললেন, আমি যেন মিস্টার টমাস হক-কে কিছু টাকা পয়সা দেওয়া শুরু করি। আমি বললাম—"সেটা আবার কে?"

উনি আবার সেইভাবে হাঁ করলেন। যেন আকাশ থেকে পড়লেন। টমাস হক একটা ছদ্মনাম। ওঁর নিজেরই নাম। ছোট করে বলা হয়, টম্যাহক্; আদিম আমেরিকাবাসীদের সেই রণ-কুঠার—সাহিত্যের জগতে টম্যাহক্ মানে অবশ্য নিষ্ঠুরভাবে সমালোচনা করা।

শুনে আমি তো বসে পড়লাম।

তাই দেখে শ্রীযুক্ত কাঁকড়া বললেন—" পয়সাকড়ি এখন ছাড়তে না পারেন, লেখা ছাড়ুন। টম্যাহক্ ছদ্মনামে আপনিই ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিন 'মাছি'র সম্পাদককে। আপনার প্রতিভায় এ তো ছেলেখেলা।"····

গ্যাস খেয়ে চলে এলাম আমার লেখার ঘরে। আগেই বলেছি, প্রথম ধাক্কাতেই টুকলিফাই বর্জন করেছিলাম—মৌলিকতার দিকে ঝুঁকেছিলাম। এবারও তাই করলাম। ওই ঘরে বসেই ভেবে নিলাম রণকুঠার কোপ মারবে কিভাবে।

নিলাম-দোকানে গিয়ে সস্তায় কিছু বই কিনলাম। ঝড়ের বেগে পাতা উল্টে গেলাম। কিছু কিছু অংশ কাঁচি দিয়ে কেটে নিলাম। লাইনগুলোকে ফালি ফালি করে কাটলাম। একটা জলপাই তেলের টিনের ঢাকনিতে সরু ফুটো করে তার মধ্যে দিয়ে একটা-একটা করে ফালি গলিয়ে দিলাম। খুব ঝাঁকিয়ে নিলাম। কিছু শক্ত শব্দও আলাদা করে কেটে ওইভাবে ভেতরে ঢুকিয়ে আবার ঝাঁকিয়ে নিলাম। ফুলস্‌কেপ কাগজে ডিমের কুসুম আর সাদা অংশ ফেটিয়ে মাখিয়ে নিলাম। তেলের ঢাকনি খুলে উপুড় করে ধরলাম সেই কাগজের ওপর। ছড়িয়ে ছিটিয়ে সাজিয়ে দিলাম লাইন বাই লাইন। জিনিসটা দাঁড়ালো দুর্দান্ত। বিশ্বের বিস্ময়।

এই লেখা ছাপা হলো 'মিছরি-মিঠাই' কাগজে। 'মাছি'র সম্পাদক কাঁদতে কাঁদতে মারা গেলেন। তাঁর নাম এই বিশ্বে আর কেউ শোনেনি।

শ্রীযুক্ত কাঁকড়া এবার আমাকে টম্যাহক্ নামটা দিয়ে দিলেন। কাগজেও চাকরি দিলেন। মাইনে অবশ্য দিলেন না। শুধু উপদেশ দিয়ে গেলেন—বললেন, এই চাইতে মস্ত লাভ আর নেই।

প্রথম উপদেশটা এই : বিরক্তিকর বাবাকে এবার সরিয়ে ফেলা দরকার? নইলে স্বাধীন লেখক হতে পারব না।

তাই করেছিলাম। টমাস বব সরে গেল পৃথিবী থেকে।

তারপর থেকে সত্যিই খুব ভারমুক্ত হয়ে গেলাম। পয়সাকড়ির টানাটানি চলেছিল অবশ্য—কিন্তু চোখ আর এক নাক কাজে লাগিয়ে তাও ম্যানেজ করে নিলাম। চোখে যা দেখেছি, নাকের সামনে যা ঘটেছে—তাই নিয়েই রণকুঠার চালিয়েছি আদিমতম পন্থায়।

জমে উঠল লেখার ব্যবসা। কুঠারকে সবাই ভয় পায়। কুঠারের ভয়ে হাতে পয়সা গুঁজে দেয়। দুদিনেই ফুলে উঠলাম। একটার পর একটা কাগজ কিনে চললাম। যে কটা কাগজ 'বব-তৈল' নিয়ে যাচ্ছেতাই কথা লিখেছিল—আগে কিনলাম সেইগুলো। এখন আমি ছাড়া বাজারে আর কেউ নেই। শ্রীযুক্ত কাঁকড়া কথা দিয়েছিলেন, তিনি পটল তুললে, তাঁর কাগজ হবে আমারই। তাই হয়েছে। তবে বড় ক্লান্ত। বুড়ো হচ্ছি তো। যদিও এখনো দিনের আলোয় আর চাঁদের আলোয় সমানে লিখে যাচ্ছি। আমি ক্লান্ত হলেও রণকুঠার ক্লান্ত নয়।

তার নমুনা পেলেন এখুনি। শিখে নিক আগামী প্রজন্ম। আচ্ছা আসি, নমস্কার। □

মরার পরে ছায়ার কথা

[শ্যাডো- এ প্যারেবল]

আপনি জীবন্ত, তাই এই কাহিনী পড়ছেন; আমি কিন্তু অনেক আগেই ছায়ালোকে চলে গেছি। আমার লেখা এই স্মৃতিকথা মানুষ যখন পড়বে, তার আগেই ঘটবে অনেক অদ্ভুত ঘটনা, জানা যাবে বিস্তর গুপ্ত রহস্য, এবং কেটে যাবে বহু শতাব্দী। পড়তে বসে বেশ কিছু মানুষ বিশ্বাসই করবে না, অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করবে, তাসত্ত্বেও বেশ কিছু ব্যক্তি গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসবে আমার এই লোহার কলমে খোদাই করা চরিত্রদের নিয়ে।

সে বছরটাই ছিল আতঙ্কের বছর, আর ছিল আতঙ্কের চাইতেও তীব্র উপলব্ধি; যে-উপলব্ধির নামকরণ আজও হয়নি এই পৃথিবীতে। অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আর কুলক্ষণের পর মহামারীর কালো ডানা ছড়িয়ে পড়েছিল জলস্থলের ওপর দিয়ে, সাগরপারের দেশগুলোতেও। জ্যোতিষ্ক-জগৎ নিয়ে যারা ধুরন্ধর, তারা অবশ্য জানত আকাশ ছেয়ে রয়েছে অশুভ ইঙ্গিতে। শুধু আকাশের চেহারাই অদ্ভুত হয়নি, মানুষ জাতটার ধ্যান-ধারণাই হয়ে গেছিল অন্য রকম।

টলেমেস নামক নিষ্প্রাণ শহরের একটা জমকাল হলঘরে বসে ছিলাম আমরা সাতজন। রাত নিবিড় হয়েছে। কয়েক ফ্লাস্ক লাল টকটকে চৈনিক সুরা পেটে চলে গেছে। এ ঘরে ঢোকবার পথ একটাই—পেল্লায় একটা দরজা তামা দিয়ে

তৈরি। পাল্লার ওপর অদ্ভুত সুন্দর কারুকাজ। কপাট বন্ধ রয়েছে ভেতর থেকে। ঝুলছে—পর্দা ঘোর কালো রঙের—আঁধার ভরা ঘরে তা মানিয়ে গেছে। মড়ার মতো পাণ্ডুর নক্ষত্র, চাঁদ আর জনহীন রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। কালো পর্দার দৌলতে এদের দেখতে না পেলেও টের পাচ্ছি ঝরঝর ভাসছে অশুভ বার্তা। এমন কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে আশপাশে যাদের সুস্পষ্ট বর্ণনা দিতে আমি অপারগ; সেসব জিনিস বস্তুময় বটে, প্রেতময়ও বটে; বাতাস এত ভারি যেন দমবন্ধ হয়ে আসতে চাইছে; উদ্বেগের পাথর বুকে চেপে বসছে; সব ছাড়িয়ে উঠেছে ভয়ানক সেই সত্তার করাল অস্তিত্ব—অনুভূতি অতিশয় শানানো আর জাগ্রত থাকলেই তাকে টের পাওয়া যায়—চিন্তার শক্তি তখন চাপা পড়ে থাকে। প্রাণহীন সেই গুরুভার ঝুলছে যেন ঠিক শিয়রে। আমাদের প্রত্যেকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও সেই শূন্যস্থিত গুরুভারের অস্তিত্বে অবশ হয়ে আসতে চাইছে। ঘরের প্রতিটি আসবাব, এমন কি যে সুরাপাত্র থেকে এইমাত্র মদ্যপান করলাম—সে সবের ওপরেও প্রাণহীন এই অসহ্য গুরুভার চেপে বসতে চাইছে। দমে আছি আমরা সাতজনেই, দমে আছে ঘরের সব কিছুই—সাতটা লৌহ-লম্ফ ছাড়া—তারা সাতটা অগ্নিশিখা সমানে জ্বালিয়ে রেখে আমাদের পুরোপুরি নিভে যেতে দিচ্ছে না। সরু লম্বা সাতটা শিখা ওপরদিকে নিষ্কম্প মাথা তুলে রেখে পাণ্ডুর বর্ণের প্রভা বিতরণ করেই চলেছে—ঘরজোড়া এহেন গুমোট বুকচাপা পরিবেশকে থোড়াই কেয়ার করে। আমরা বসে আছি আবলুস কাঠের চকচকে গোল টেবিল ঘিরে। এত চকচকে যে, তা আয়নার মতন প্রতিফলন ঘটাচ্ছে সাত-সাতটা আলোক-শিখার। আমরা সাতজনেই মাথা হেঁট করে বসে আছি বলে আবলুস-মুকুরে নিজেদের ফ্যাকাশে মুখ দেখতে পাচ্ছি—সঙ্গীদের অশান্ত চোখের চাঞ্চল্যও দেখতে পাচ্ছি। তা সত্ত্বেও আমরা হেসেই চলেছি। প্রলাপের ঘোরে, বিকারের হাসি ছাড়া তা আর কিছুই নয়। যদিও খুশি ফেটে পড়ছে উজ্জ্বল হাসির মধ্যে। উৎকট হাসি আর খুশির প্রলেপ মাখিয়ে গানও গাইছি—সে গান উন্মাদের গান অবশ্যই; মদ্যপান করছি আকণ্ঠ—টকটকে লাল সুরা লোহিত রুধিরের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—তা সত্ত্বেও বিরতি দিচ্ছি না সুরাপানে। কারণ, আমরা জীবিত সাতজন ছাড়াও এ ঘরের বাসিন্দা রয়েছে আরও একজন—তরুণ জয়লাস। মরে কাঠ হয়ে চাদর চাপা অবস্থায় সে এখন শয়মান মেঝের ওপর। এ ঘরের পৈশাচিক কাণ্ডকারখানার নায়ক সে নিজেই—স্বয়ং পিশাচ এবং একাধারে প্রতিভা-শিরোমণি। আমাদের দুর্ভাগ্য, সেদিনের সেই উল্লাস উল্লাসে অংশগ্রহণ করতে সে পারেনি—কিন্তু প্লেগরোগে বিকৃত তার মুখমণ্ডলে আর মৃত্যুর পরশে অর্ধনিমীলিত নিষ্প্রদীপ চক্ষুতারকায় মহামারীর দাবানলের চিহ্ন না থাকলেও, আমাদের আমোদ-আহ্লাদে যেন অংশ নিয়ে যাচ্ছিল বিরামবিহীনভাবে—মরতে যারা চলেছে, তাদের দেখে মড়াদের চোখে যে ধরনের কৌতুক ভেসে ওঠে—জয়লাসের নিষ্প্রদীপ চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম সেই কৌতুকের আভাস। বিশেষ করে আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম,

মৃত্যুলোক থেকে বন্ধুবর জয়লাস যেন একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে আমার দিকেই—সে চাহনিকে আমোল না দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম গান গেয়ে আর গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে—সবই করছিলাম ঘাড় হেঁট করে আবলুস কাঠের চকচকে মুকুরের মতন টেবিলের পানে তাকিয়ে। জয়লাসের মরা-চোখের কৌতুকের আড়ালে প্রচ্ছন্ন তিক্ততা আমার লোমকূপে শিহরণ জাগিয়ে যাচ্ছিল বলেই ওর মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। আস্তে আস্তে কিন্তু থেমে এল আমার হেঁড়ে গলার গান; পর্দা ঝোলানো বন্ধ ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনি মাথা কুটে মরে গেল একসময়ে। কালো পর্দাদের ঠিক যেখানে শেষ প্রতিধ্বনিটা গেল হারিয়ে—সেখান থেকেই বেরিয়ে এল একটা কৃষ্ণকায় ছায়া। সে ছায়ার কোনও আকৃতি নেই; চাঁদ যখন দিগন্তে ঝুলে থাকে, তখন মানুষের গায়ে সেই চাঁদের মরা আলো পড়লে ছায়া যেভাবে পড়ে—এ ছায়া যেন সেই রকমই। অথচ, সে ছায়াকে মানুষের ছায়া বলা যায় না—ঈশ্বরের ছায়া তো নয়ই। পর্দার ধারে ধারে সেই ছায়া থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে অবশেষে স্থির হয়ে গেল তামার পাত দিয়ে মোড়া কারুকার্যময় দারু-দরজার ওপর, প্রাচীন কোনও দেবতার ছায়া হলে আমি চিনতে পারতাম। মিশরীয় দেবতাদের ছায়া সে নয়—গ্রীসের দেবতা বা চালডি-র দেবতাদের ছায়াও নয়। কাঠের দরজায় তামার চাদরের ওপর স্থির হয়ে লেগে রইল আকৃতিহীন আবছা সেই ছায়া—কথা বলল না, নড়লও না। এ দরজা ছিল মাটিতে শয়ান জয়লাসের পায়ের কাছে—ছায়া কিন্তু একবারও তাকিয়ে দেখল না চাদরে মোড়া মৃতদেহকে—আমরা সাতজনেই মাথা হেঁট করে চেয়ে রইলাম চকচকে আবলুস কাঠের টেবিলের দিকে। ছায়ার চাহনিও যেন এই আবলুস আয়নার দিকেই নিবদ্ধ। অনেক·····অনেকক্ষণ পরে নিরুদ্ধনিঃশ্বাসে নিচু গলায় আমি জানতে চেয়েছিলাম—"ছায়া, তুমি কে? কোথায় তোমার নিবাস? তোমাকে দেখে আতঙ্কে কাঠ হয়ে যাচ্ছি কেন?" ছায়া বললে, "আমি ছায়া, আমার নিবাস প্যাতাল-সমাধির কাছে খালের ধারে প্রান্তরের মাঝে।" আমরা সাতজনেই শিউরে উঠলাম সেই কণ্ঠস্বর শুনে। কেন না, সে স্বর একজনের নয়—বহুজনের। বহু সত্তা যেন মিলেমিশে কথা বলল। ওই একটি স্বরের মধ্যে—আমাদেরই হাজার হাজার প্রয়াত বন্ধুদের পরিচিত স্বরধ্বনি গম গম করে উঠল ছায়ার স্বরধ্বনির মধ্যে। □

পরীর দ্বীপ

[দ্য আয়ল্যাণ্ড অফ দ্য ফে]

সঙ্গীত যিনি রচনা করেন, তাঁর যেমন ধীশক্তি থাকে—যিনি উপভোগ করেন, তাঁরও তেমনি ধীশক্তি থাকে। একটা গানের কাগজে সমালোচক যা লিখেছেন, তাতে মনে হলো, কৃতিত্বটা একতরফাভাবে স্রষ্টাকেই তিনি দিয়েছেন।

আরও একটা কথা। এটা অবশ্য সব প্রতিভার ক্ষেত্রেই খাটে। স্রষ্টার সৃষ্টি নির্জনেই উপভোগ করা যায়—পুরোপরি।

বিশেষ করে উচ্চমার্গের সঙ্গীত। যখন একেবারে একা—তখন তার মাধুর্য মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে, গান গেয়ে যাঁরা ভগবানকে ডাকেন, তাঁরা এই ব্যাপারটা মানবেন।

এর একটা ব্যতিক্রম আছে। শুধু একটাই। নির্জনে থেকেও প্রকৃতির সঙ্গ যদি পাওয়া যায়—গানের সুখ মন ভরিয়ে দেয়। ঈশ্বর বন্দনায় বিভোর হতে গেলে ঈশ্বরের মহান সৃষ্টির সান্নিধ্য ভাল নয় কি?

চারপাশের সবুজের মাঝে শুধু মানুষ কেন, অন্য কোনও প্রাণের উপস্থিতিই যেন এক ধ্যাবড়া দাগ বলে মনে হয় আমার কাছে। অবশ্য আমি ভালবাসি আঁধারভরা উপত্যকা আর ধূসর পাথর, ভালবাসি জলধারার নিঃশব্দ হাসি, ভালবাসি অরণ্যের দীর্ঘশ্বাস—অস্বস্তিকর দিবানিদ্রার মধ্যেও যা আশ্চর্য, আর

ভালবাসি উন্নতশির সদা-সন্ধানী মেমোকি পর্বতদের—যারা অষ্টপ্রহর বহু উচ্চ থেকে নজর রেখে চলেছে নিচের সব কিছুর ওপর, —ভালবাসি এই সব কিছুকেই—এরা যেন এক বিপুল প্রাণময় সত্তা—বিশাল এক গোলকের সঙ্গে মিলেমিশে রয়েছে—যার পথে রয়েছে গ্রহরা, যার বোবা চাকরানি আকাশের ওই চাঁদ, সূর্য যার শাসক; জীবন যার অনন্ত; চিন্তা যার ভগবান; যার আনন্দ শুধু জ্ঞানে; যার নিয়তি অসীমের মধ্যে পথভ্রষ্ট; যার প্রাণময় স্পন্দনের সঙ্গে তুলনা চলে কেবল মস্তিষ্কের প্রাণময় স্পন্দনের—অথচ এই স্পন্দিত সত্তাটাকেই আমরা ধরে নিই নিষ্প্রাণ বস্তু হিসেবে—ঠিক যেভাবে স্পন্দিত প্রাণময় সত্তা অবলোকন করে আমাদের।

টেলিস্কোপ আর গণিতজ্ঞদের দৌলতে আমরা জেনেছি; মহাকাশ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে বস্তুময় জগতের পর জগৎ। যিনি খুব জ্ঞান-গম্ভীর হওয়ার ভান করেন। এ-তথ্য তাঁরও অজানা নয়। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় যখন রয়েছে, অসীম শূন্যতার ফাঁকে ফাঁকে অগুন্তি বস্তুর সমাহার—তখন তিনি শুধু আমাদের চেনা এই বস্তুময় পৃথিবীতেই প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়ে ক্ষান্ত থাকবেন—অন্য বস্তুদের ক্ষেত্রে তাঁর মহান পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকবেন—তা কি হয়?

নিশ্চয় নয়।

কালচক্রের মধ্যে রয়েছে কালচক্র—চক্রনৃত্যের পর চক্রনৃত্য—শেষ নেই—শেষ নেই। সবই কিন্তু আবর্তিত হয়ে চলেছে কেন্দ্রস্থিত পরমপুরুষকে ঘিরে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শুধু আমরাই রয়েছি—এ ধারণাটাই ভুল। বস্তুময় জগতে প্রাণের সঞ্চার ঘটানোটাই তাঁর ইচ্ছে—পক্ষপাতিত্ব তাঁকে মানায় না।

এই ধরনের অতি-কল্পনার জন্যেই আমি পাহাড় আর বন, নদী আর সমুদ্রের সান্নিধ্যে ধ্যানবিভোর হয়ে যাই। যে কোনও মানুষের কাছেই তা নিছক ফ্যানটাসটিক। এই নেশা আমাকে টেনে নিয়ে গেছে দূর দূরান্তে—বহু অজানা প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি—নিজেকে মনে হয়েছে একেবারেই নিঃসঙ্গ। একদম একা।

এইরকমই এক একক অভিযানে বেরিয়ে আমি গিয়ে পড়েছিলাম পাহাড়ঘেরা, এক পাহাড়ি জায়গায়—যেখানে রয়েছে বহমান বিষণ্ণ নদী আর নিস্তরঙ্গ পার্বত্যহ্রদ— যেন অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত। এইখানে পেলাম বিশেষ একটা নদী আর একটা দ্বীপ।

এসে পড়েছিলাম সেখানে এক জুন মাসে—যখন গাছে গাছে সবুজ পাতার উৎসব চলছে। এইখানে এক নামহীন সৌরভময় গুল্মের নিচে, ঘাস সবুজ কার্পেটে এলিয়ে পড়েছিলাম—যাতে তন্দ্রার আবির্ভাব ঘটে—আর সেই তন্দ্রার ঘোরে ভুলতে ভুলতে মায়াময় সেই নিসর্গদৃশ্য অণু-পরমাণু দিয়ে উপভোগ করতে পারি।

শুধু পশ্চিম দিক ছাড়া—যে দিকে সূর্য পাটে নেমেছেন—জঙ্গল তার সুষমাময় দেওয়াল তুলে রেখেছে অন্য তিন দিকে। ছোট্ট নদীটা আচমকা বাঁক

নিয়ে হারিয়ে গেছে এই জঙ্গল-কারাগারে—যে জেলখানা থেকে যেন সে আর কোনও দিনই বেরতে পারবে না। এই দৃশ্য রয়েছে পুবের ঘন সবুজ অরণ্যের দিকে।

ঠিক উল্টো দিকে যেন আকাশ-ফোয়ারা থেকে অস্তমিত সূর্যকিরণে ঝলমলে এক ঝর্ণাধারা সোনালি আর টকটকে লাল ছুঁড়তে ছুঁড়তে নেমে আসছে নিচের দিকে।

স্বপ্নিল চোখে দুপুর নাগাদ দেখলাম ছোট্ট দ্বীপটাকে। আয়নার কাচের মতন জলের বুকে যেন একটা ঘাসছাওয়া সবুজ মরকতখণ্ড। পান্নার টুকরো।

আধশোয়া অবস্থায় দেখতে পাচ্ছিলাম দ্বীপের পুব আর পশ্চিম প্রান্ত একই সঙ্গে। অত্যাশ্চর্য ফারাকটা নজরে এসেছিল তখনই।

পশ্চিম প্রান্ত সবুজে সবুজ হয়ে রয়েছে। উদ্দাম বাগান বিলাসিতা চলছে সেইদিকে। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ঝিকিমিকে হাসি হেসেই চলেছে অজস্র ফুলের দল। ছোট ছোট ঘাস বুঝি চির-বসন্তের ছোঁয়ায় প্রাণময় হয়ে দুলছে তো দুলছেই—মাঝে মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পারিজাত পুষ্পের মতন অতি-মনোহর ফুলের স্তবক। দূর থেকেই মনে হচ্ছে, বিস্তীর্ণ এই ঘাস-মখমল উদ্যানে সৌরভ ম-ম করে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে।

অপরূপ এই তৃণ সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গাছগুলোও ছিপছিপে ঋজু বপু খাড়া করে যেন পরমানন্দে দুলে দুলে উঠছে, ঝকমক করছে প্রতিটি তরু, প্রতিটির অঙ্গে বিধৃত রয়েছে আভিজাত্য—ছিপছিপে অণুর গরবে যেন ফেটে পড়ছে সকলেই। এদের আকৃতি আর পাতাবাহার প্রতীচ্যের খানদানি পাদপদের কথা মনের মধ্যে টেনে আনে; চিত্রবিচিত্র প্রত্যেকের বল্কল, মোলায়েম আর মসৃণ।

সব মিলিয়ে গভীর হর্ষ আর নিবিড় প্রাণময়তার অনুভূতি রচিত হয়ে চলেছে মনের মধ্যে। পুরো তল্লাটটায় বুঝি শুধু আনন্দ আর প্রাণের নৃত্য চলেছে—হাওয়া নেই কোথাও—অথচ নেচে নেচে দুলে দুলে উঠছে প্রতিটি গাছ—পাতায় পাতায় ভিড় করছে আর উড়ে উড়ে যাচ্ছে অজস্র প্রজাপতি—দেখে মনে হচ্ছে নিজক পোকায় নয় ওরা—টিউলিপ ফুল তাদের শ্রীঅঙ্গে একজোড়া ডানা লাগিয়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে গাছে গাছে—আর সেই উদ্দাম নৃত্যের তালে তালে নাচছে গাছ আর পাতা, ফুল আর ঘাস।

অন্য দিকটা, অর্থাৎ খুদে দ্বীপখণ্ডের পুব দিকটা ছেয়ে রয়েছে নিবিড় ছায়ায়। বোবাগম্ভীর অথচ সুন্দর-শান্ত বিষণ্ণ ছায়ামায়া ব্যেপে রেখে দিয়েছে সেদিক। সেখানকার গাছগুলোর রঙ গাঢ়—কৃষ্ণকায় বললেও চলে—আকৃতি আর আচরণে শোকবিধুর, বিষম দুঃখে বুঝি বাক্যহারা, অন্তরের যন্ত্রণায় আকুঞ্চিত মুহুর্মুহু—প্রেতচ্ছায়ার মধ্যে প্রতিভাত যেন মরলোকের পুঞ্জীভূত ত্রিতাপ আর অসময়ের মৃত্যু। শোকের চিহ্ন কালচে করে রেখেছে সেখানকার ঘাস, ঝুঁকিয়ে রেখেছে [illegible]; শোকস্তব্ধ এই ঘেসোজমির এখানে সেখানে অকরুণ দর্পে মাথা

তুলে রেখেছে বেশ কিছু টিলা—উন্নতশির নয় কেউই—সামান্য লম্বাটে—গোরস্থানের কবর বললেই চলে। যদিও কবর নয় কোনটাই। এদের ঘিরে গজিয়েছে গুচ্ছগুচ্ছ রোজমারি পুষ্প—চাপা বেদনার মূর্ত প্রতীক যেন। গাছেদের ছায়া বড় নিবিড়ভাবে চেপে বসেছে জলের ওপর—মনে হচ্ছে যেন ডুবে মরতে চায় এখুনি—জলতলের রন্ধ্রহীন তমিস্রাকে কুটিলতর করে তুলতে চায় নিজেদের আঁধাররাশি তার মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে। আমার মনের মধ্যেকার দুর্বার কল্পনা দিয়ে যেন প্রত্যক্ষ করলাম—সূর্য যতই নামছে নিচের দিকে, প্রতিটি গাছের প্রতিটি ছায়া ততই যেন নিজেদের আলাদা করে নিচ্ছে গাছেদের দেহ থেকে—যে গাছ থেকে তাদের জন্ম—সরে যাচ্ছে সেই জন্মদাতাদের কাছ থেকে একটু একটু করে—মিশে যাচ্ছে জলধারায়। সমাধি বিবরে প্রবেশ করছে যে-সব ছায়া—নতুন করে তাদের জায়গায় এসে পড়ছে সেই গাছেদেরই নতুন ছায়া—তারাও নিজেদের গুলছে নদীর জলে অল্প অল্প করে।

অদ্ভুত এই ধারণাটা আমার মগজে একবার খেলে যেতেই নিজে থেকেই তা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল—আমিও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আধবোজা চোখে ঢুলছিলাম আর কল্পনার ইন্দ্রজালকে লাগামছাড়া করে দিয়েছিলাম। বিড় বিড় করে যাচ্ছিলাম আপন মনে—"তাহলে এই সেই পরীর দ্বীপ —কুহকমায়ার ছোঁয়া লেগেছে এখানেই। পরীরা একদা ছিল—কোমল প্রাণ স্নিগ্ধকায়া রূপসুন্দরীদের সেই প্রজাতি তাহলে নিশ্চিহ্ন হয়নি—তাদেরই জনাকয়েক আজও নিশ্চয় এই বিজন দ্বীপে হেসে খেলে নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছে। মূর্তিমতী ফুলের মতন। সবুজ ঘাস ছাওয়া কবরখানার মতন ঢিবিগুলো কি ওদেরই নিকুঞ্জ? নাকি, মানুষ যেমন সময় ফুরোলে জীবনের মায়া ত্যাগ করে চলে যায়—ওরাও তেমনি চিরঘুম ঘুমোচ্ছে মাটির তলার ঠাণ্ডা কফিনে? গাছেরা যেমন ছায়ার পর ছায়া খসাচ্ছে, জলে জলে দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব একটু একটু বিলীন করে দিতে চলেছে—ঠিক তেমনিভাবে অপরূপা পরীরাও কি অল্প অল্প করে নিজেদের ক্ষইয়ে মিশিয়ে দেয় না ঈশ্বরের সাথে?

পরমসত্তার অঙ্গে এইভাবে নিজেদের সত্তা মিলিয়ে মিশিয়ে দেওয়ার সময়ে হৃদয় কি ওদের মুচড়ে মুচড়ে ওঠে না? জলের অন্ধকারকে গাঢ়তর করে তুলছে গাছের ছায়া, মৃত্যুর আঁধারকে নিকটতর করে নাকি পরীদের জীবনাবসান?

অর্ধ-নিমীলিত চোখে এইসব যখন ভাবছি আর বলে যাচ্ছি নিজের মনে—যখন সূর্য তাঁর সাতঘোড়ার রথ চালিয়ে হু-হু করে নেমে যাচ্ছেন পশ্চিমের দিগন্ত পথে—যখন আলো আর আঁধার মুহুর্মুহু জায়গা পালটাচ্ছে আর সরে সরে যাচ্ছে—যখন ডুমুর গাছের সাদা ছালের ঝিলিক চমকে চমকে উঠছে জলের ওপর—যখন উন্মত্ত বেগে জল ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে চলেছে ছোট্ট দ্বীপখণ্ডকে—তখন ....ঠিক তখনই .... আলোছায়ার মহামায়ার মধ্যে আমি দেখতে পেলাম এক পরীকে। পশ্চিমের আলোর রাজ্য থেকে সে নিঃশব্দ সঞ্চারে আবির্ভূত হলো পুবের তমিস্রা রাজ্যে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল তার হিলহিলে

সরু ছিপ চৌকো। সিধে সটান অবস্থায় তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম নৌকার মধ্যে। নৌকার অবস্থা নিতান্তই সঙীন—ভঙ্গুরতম অবস্থায় পৌঁছেও কোনমতে অটুট অবস্থায় জল কেটে এগিয়ে এসেছে একটি মাত্র দাঁড়ের কৃপায়—এ দাঁড় টানছে ওই পরী।

পরী! পরী! আমার স্বপ্নের পরী। প্রেতলোকের তরণী বাইছে আমার কল্পনার পরী। আলোর যেটুকু ছিটেফোঁটা এখনও ঝলকিত করে তুলেছে তার লাবণ্যময় তনুদেহ—সেই শ্রীঅঙ্গেই যেন ফেটে পড়তে চাইছে আনন্দ আর উল্লাসের অযুত ফোয়ারা—কিন্তু আনন্দময় এই আকৃতি ভেঙে খানখান হয়ে গিয়ে বিকৃত রূপ ধারণ করছে ছায়ার জগতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে।

নিমেষহীন নয়নে চেয়ে রইলাম। ভাসমান সেই আকৃতির দিকে। ধীরে ধীরে····· তরণী হারিয়ে গেল অন্ধকারের জগতে ···· গোটা দ্বীপটাকে প্রদক্ষিণ করে আবার ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল আলোর জগৎ থেকে।

আপন মনে আমি তখন বকে যাচ্ছি—"পুরো একটা বছর কাটিয়ে এল মায়াময়ী পরী····· দ্বীপকে এক পাক খাওয়া মানে ওর জীবন থেকে একটা বছর খসিয়ে দেওয়া····· শীত আর গ্রীষ্মের চক্র পেরিয়ে এল এক পাক দিয়েই। আরও ছোট হয়ে এল ছোট্ট ওই জীবন—এগিয়ে গেল মৃত্যুর দিকে। ছায়ামায়ার এলাকা বেয়ে যাওয়ার সময়ে আমি যে দেখেছি, গা থেকে ছায়া খসে পড়েছে জলে—কালো জল আরও কালো হয়েছে অপরূপা ছায়াকে নিঃশেষে গ্রাস করে নিয়ে।"

অন্ধকারের রাজ্য পেরিয়ে, দ্বীপকে চক্কর মেরে, আবার আলোর রাজ্য থেকে বেরিয়ে এল ছিপছিপে তরণী আর হিলহিলে তরুণী-পরী—শ্রীঅঙ্গে অনিশ্চয়তা বেড়েছে আগের চেয়েও—কমেছে আনন্দ আর উল্লাসের রোশনাই। আলো থেকে বেরিয়ে এসে ভেসে ভেসে অন্ধকারে ঢুকে যেতেই ঝপ করে আরও ঘন কালো হয়ে গেল সেই তমিস্রা—আবার দেখলাম সেই দৃশ্য··· ছায়া খসে পড়ল তার গা থেকে কুচকুচে কালো জলরাশির মধ্যে—বুভুক্ষু আঁধার সেই ছায়াকে গিলে ফেলল নিমেষমধ্যে।

এইভাবেই চলল চক্রাবর্ত। বারে বারে সে ঘুরে এল দ্বীপকে চক্কর দিয়ে, দফায় দফায় ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল তার আনন্দময় আকৃতি, প্রকটতর হতে লাগল মুমূর্ষুর বিষণ্ণতা। অবয়ব হচ্ছে আরও হাল্কা, আরও ফিকে, আরও অস্পষ্ট, আরও সরু—কায়া বলে যেন কিছুই আর থাকছে না—কায়া হয়ে যাচ্ছে ছায়া—ছায়া মিশে যাচ্ছে জলে।

দফায় দফায় আরও তমালকালো হচ্ছে নিকষ জলধারা। তারপর যখন সূর্য একেবারেই ডুবে গেল, আলোর আভাস আর রইল না কোথাও—পরীও চিরকালের মতো ঢুকে বসে রইল অন্ধকারের রাজ্যে। ঢোকবার আগের মুহূর্তে শেষ আলোর ক্ষীণ আভায় দেখেছিলাম তার নিরাসক্ত নির্মোহ নির্বাপিত আকৃতি—আবলুস-আঁধারে সেই যে হারিয়ে গেল·····

আর তাকে দেখিনি।

মড়া সব টের পায়

[দ্য কলকুয়ি অফ মোনোস অ্যাণ্ড উনা]

উনা—ফের জন্মালে?

মোনোস—হ্যাগো, 'ফের জন্মালাম'। কথাদুটোর হেঁয়ালি-মানে নিয়ে আগে ঢের ভেবেছি, পুরুৎদের ব্যাখ্যা নাকচ করেছি, শেষকালে মৃত্যু এসে ফাঁস করে গেল গুপ্ত রহস্য।

উনা—মৃত্যু!

মোনোস—প্রতিধ্বনিটা তোমার গলায় অদ্ভুত মিষ্টি লাগছে! তোমার পদক্ষেপও পাল্টে গেছে—চোখে ভাসছে অশান্ত আনন্দ। শাশ্বত জীবনের গরিমা তোমাকে পীড়িত করছে, সব গুলিয়ে ফেলছ। হ্যাগো, মৃত্যুর কথাই বললাম তোমাকে। একসময়ে মৃত্যু শব্দটাই প্রতিটি বুকে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে—এখন এই অবস্থায় মৃত্যু শব্দটাই আশ্চর্য শোনাচ্ছে!

উনা—মৃত্যু, ভুড়ি ভোজেই যার পরম তৃপ্তি! মৃত্যুর চরিত্র নিয়ে আগে কত জল্পনা-কল্পনাই না করেছি! জীবনের সব আনন্দকে রহস্যময়ভাবে থামিয়ে দিয়েছে এই মৃত্যু—বলেছে, 'আর এগিওনা, থামো এখানে।' মৃত্যুর চিন্তাও শেষ পর্যন্ত কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমাদের ভালবাসার পথে। মৃত্যু এসে আমাদের তফাৎ করে দেবে—এই দুঃসহ ভাবনাটাই দগ্ধে মেরেছে দুজনকে—ভালবাসা তখন যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঘৃণাও বুঝি ভাল ছিল প্রেমের চেয়ে।

মোনোস—এখন তুমি আমারই—চিরদিনের মতন শুধু আমারই—দুঃখের কথা এখন থাক।

উনা—অতীতের দুঃখের স্মৃতি কি আজকের আনন্দ নয়? অনেক কিছুই বলার আছে, সবার আগে শুনতে চাই, কৃষ্ণকালো উপত্যকা আর ছায়াময় জগতের মধ্যে দিয়ে যখন গেছিলে, তখন তোমার অভিজ্ঞতাটা হয়েছিল কিরকম?

মোনোস—উনা যদি জানতে চায়, তখন তা বলবই। কিন্তু শুরু করব কোনখান থেকে?

উনা—তাইতো! কোনখান থেকে?

মোনোস—তুমি বলো।

উনা—বুঝেছি। মৃত্যুর পথে বেড়িয়ে এসে দুজনেই জেনেছি মানুষের বিশেষ একটা প্রবণতার কথা : যার সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায়, তারই সংজ্ঞা বের করতে চায়। জীবন যেখানে স্তব্ধ হয়ে গেল, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই শুরু করতে বলব না। শুরু করো ঠিক সেইখান থেকেই, যখন প্রবল জ্বর চিরকালের মতন ছেড়ে গেল তোমাকে, যখন আমি আমার আবেগমথির প্রেমকোমল আঙুল বুলিয়ে তোমার বিবর্ণ চোখের পাতা টেনে বন্ধ করে দিলাম, হে আমার প্রাণের ঠাকুর মোনোস—তুমি শুরু করো নিরতিসীম বিষাদমলিন সেই মুহূর্ত থেকে।

মোনোস—প্রাণপ্রিয়া উনা, প্রথমেই তাহলে একটা কথা বলা দরকার। কথাটা বিশেষ যুগের মানুষের সাধারণ অবস্থা নিয়ে। মনে পড়ে কি আমাদের জ্ঞানী পূর্বপুরুষরা কি বলেছিলেন? সংখ্যায় তাঁরা দু'একজনের বেশি ছিলেন না—গোটা পৃথিবীর কাছে জ্ঞানী পুরুষ হিসেবে শ্রদ্ধেয়ও ছিলেন না— তা সত্ত্বেও সভ্যতার অগ্রগতি সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপনের দুঃসাহস তাঁরা দেখিয়েছিলেন। তাঁদের কথা কিন্তু পরে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়েছে। সভ্যতার দুরবস্থার ফলে মানবজাতটা যখন নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে—তার আগে, প্রতি পাঁচ ছয় শতাব্দীতে, দু'একজন ভয়ানক ধীশক্তি জোরের সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করে গেছেন অতীতের পুরোধা মনীষীদের কথাগুলোর—তাঁরা বলেছেন, প্রাকৃতিক নিয়মকে নিয়ন্ত্রণ করতে যেও না—প্রাকৃতিক নিয়মের নির্দেশ মেনে চলো। বহু সময় অন্তর মস্ত প্রতিভারা আবির্ভূত হয়েছেন, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, কার্যকরী বিজ্ঞান যতই এগিয়েছে, তার সত্যিকারের কার্যকারিতা ততই কমেছে। কবিগণ মাঝে মাঝে এই সত্যের ওপর আলোর ঝলক ফেলে দেখিয়েছেন, জ্ঞান হলো নিষিদ্ধ ফল—যা মৃত্যুর জন্ম দেয়, আত্মার শৈশবে যা হিতকারী নয় মোটেই। যুগে যুগে মুণ্ডপাত করা হয়েছে এই কবিদের—অথচ এঁরাই প্রাচীন যুগের সহজসরল জীবনের জয়গান গেয়েছেন—যখন সুখ ছিল গভীর—উচ্ছলতা ছিল না মোটেই—যখন মানুষের চাহিদা ছিল কম, কিন্তু আনন্দ ছিল প্রচুর, যখন নীল নদীদের বাঁধ দিয়ে বাঁধা হতো না, তারা মুক্তছন্দে বয়ে যেত প্রশান্ত অরণ্য আর উদার পাহাড়-পর্বতের মধ্যে দিয়ে—আদিম সুগন্ধে মাতোয়ারা হয়ে থাকত দিগ্‌দিগন্ত—

কাজ হলো না তাতেও। অপশাসনের বিরুদ্ধে গর্জাতে গিয়ে প্রবলতর করে দেওয়া হলো অপশাসনকে। চরমতম দুর্দিন গ্রাস করল আমাদের। অবক্ষয় দেখা দিল সবদিকে—নীতিগত এবং দেহগত। মাথা উঁচিয়ে রইল শুধু শিল্পকলা—সিংহাসনে আসীন ধীমানদের আরূঢ় রাখল সিংহাসনেই—শৃঙ্খলের বাঁধনে। প্রকৃতির গরিমা মানুষ কোনদিনই অবহেলা করতে পারেনি—সেদিনও পারল না—বরং মাথা নত করল প্রকৃতির পায়ে। উদ্ভট ধারণারও অনুপ্রবেশ ঘটল তখন থেকেই। সাম্যবাদের স্তুতি শোনা গেল—সব নাকি সমান। অথচ সৃষ্টির শুরু থেকেই তা নেই। স্তরে স্তরে সৃষ্টির বিকাশ যে কানুনের ওপর গড়ে উঠেছে—হুঁশিয়ারি এসেছিল মহান সেই প্রাকৃতিক নিয়মের দিক থেকে। এই পৃথিবী, এই বিশ্ব—সবই অসমান ছন্দে নির্মিত আর বিবর্তিত হয়ে চলেছে—স্রষ্টার নিয়ম তাই—কিন্তু উদ্দাম বেগে ধেয়ে এল গণতন্ত্র। পুরোধা পিশাচ 'জ্ঞান' থেকেই তা বিকশিত হলো। ইতিমধ্যে গড়ে উঠল অসংখ্য ধোঁয়ামলিন শহর। ফার্নেসের তপ্ত নিঃশ্বাসে ঝরে গেল গাছের সবুজ পাতা, যেন জঘন্য ব্যাধির প্রকোপে বিকৃত হয়ে গেল প্রকৃতির নির্মল মুখাবয়ব। রুচির বিকৃতি ঘটায় ডেকে আনলাম নিজেদেরই ধ্বংস। অথচ এই রুচি—যা কিনা রয়েছে ধীশক্তি আর নীতিবোধের মাঝামাঝি জায়গায়—শুধু এই রুচিবোধই ফিরিয়ে দিতে পারত সৌন্দর্যকে, প্রকৃতিকে, জীবনকে। হায় প্লেটো—তাঁর ধ্যানধারণা তখন বিস্মৃত হয়েছিল সকলেই!

দার্শনিক প্যাসকাল-এর উক্তিও অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। প্রকৃতির নিয়মকে পায়ে দলে এগিয়ে গেছিল অঙ্কের নির্মম যুক্তি। নানা দেশের ধ্বংসের ইতিহাস পড়ে আমি দেখতে পেয়েছিলাম ভবিষ্যতের রশ্মিকে। আমি জানতাম—চীন, অসিরিয়, ঈজিপ্ট, নুবিয়াতে মানুষ ধ্বংস হয়েছে পার্থিব ব্যাধির করাল নৃত্যে—কিন্তু সবক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছিল স্থানীয় প্রতিষেধক; সংক্রামিত পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই দাওয়াই কাজ দেবে না—দরকার মৃত্যুর, ভবিষ্যৎবাণী করেছিলাম সেদিনই—পুনর্গঠনের জন্যে চাই মৃত্যু। জাতি হিসেবে মানুষের অবলুপ্তি প্রয়োজন—ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলাম বলেই জানতাম, 'ফের জন্মাবে' মানুষ।

প্রাণাধিকা উনা, ঠিক তাই ঘটেছে। অশুভ জ্ঞানের খপ্পরে পড়ে মানুষ চতুষ্কোণ কদাকার আলয় বানিয়েছিল শিল্পকলার দৌলতে—এখন নতুন করে ফিরে এসেছে পাহাড়ের ঢল আর কলকণ্ঠী নদী—এই হলো মানুষ জাতটার প্রকৃত আলয়। শিল্পকলায় ক্ষতবিক্ষত পৃথিবীর বুকে প্রকৃতির গান আবার শোনা যাচ্ছে প্রাচীন যুগের মতনই—জ্ঞানের বিষ সরে গেছে। মৃত্যু সেই বিষের মোক্ষণ ঘটিয়েছে—নতুন প্রাণ প্রাচুর্য নিয়ে নতুনভাবে গড়ে উঠেছে মানুষ—অমর এখন থেকে সকলেই—যদিও *বস্তুময়* এখনও।

উনা—মনে পড়ছে পুরোনো সেই কথা। হুঁশিয়ার হয়েছিলাম ঠিকই—বিশ্বাসও করেছিলাম দুর্নীতিই শেষ করবে মানুষ জাতটাকে। এই বিশ্বাস নিয়েও তো বেঁচেছিল মানুষ। মারা যাচ্ছিল একে একে। তুমি নিজেই তো রোগে

পড়ে কবরে চলে গেলে। তারপর তোমার কাছে চলে এল তোমারই নিত্যসঙ্গিনী উনা দুদিন যেতে না যেতেই। তারপর কেটেছে গোটা একটা শতাব্দী—আবার এক হতে পেরেছি দুজনে—এই একটা শতাব্দী নিদ্রাচ্ছন্ন ছিলাম বলেই কষ্ট কম পেয়েছি—তবুও সময়টা কম নয়—পুরো একটা শতাব্দী।

মোনোস—অসীম মহাকালের বুকে নিছক একটা পয়েন্ট ছাড়া কিছুই নয়। চারপাশের অবক্ষয় আর অশান্তি প্রচণ্ড উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল আমার ভেতরে—তারপর পড়লাম জ্বরে। খুব যন্ত্রণা পেয়েছিলাম কয়েকটা দিন—মাঝে মাঝে প্রলাপ এসে শক্তির পরশ বুলিয়ে গেছিল—তুমি ভেবেছিলে আরও কষ্ট পাচ্ছি—কিন্তু তোমাকে ঠকাবার ক্ষমতা তো আমার ছিল না—দিন কয়েক পরে এল নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসের নিস্পন্দ ঘোর—যা তুমি একটু আগেই বললে—আমাকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা বললে—এই তো মৃত্যু। —জীয়ন্তদের চোখে মৃত হয়ে গেলাম আমি সেই মুহূর্ত থেকে।

কথা দিয়ে বোঝাতে পারব না তখনকার অবস্থা। সচেতন ছিলাম বিলক্ষণ—বোধক্ষমতা হারাইনি। লম্বা ঘুমের পর মানুষ যেমন নিঝুম হয়ে অনেকক্ষণ পড়ে থাকে মড়ার মতন—আমার অবস্থা তখন ঠিক সেইরকম।

নিঃশ্বেস আর ফেলছি না। নাড়িও চলছে না। ধুকপুক করছে না হৃদ্‌যন্ত্র। ইচ্ছাশক্তি আছে—কিন্তু ইচ্ছারূপায়ণের শক্তি নেই। অনুভূতি অস্বাভাবিক প্রখর—অপ্রকৃতিস্থও বটে। পাঁচটা ইন্দ্রিয় উঠে পড়ে এ-ওর জায়গা নিচ্ছে। জিভ আর নাক সব গুলিয়ে ফেলছে। দুয়ে মিলে এক হয়ে গিয়ে অস্বাভাবিক উগ্র হয়ে উঠেছে। গোলাপজল দিয়ে আমার ঠোঁট ভিজোচ্ছিলে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত—অজস্র আশ্চর্য ফুলের মদির গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে যাচ্ছিলাম আমি—ফ্যানট্যাসটিক সে-সব ফুল ছিল না পুরনো পৃথিবীতে—এখন দেখছি ফুটে রয়েছে আমাদের চারপাশে। নিরক্ত স্বচ্ছ চোখের পাতা ভেদ করে দেখতে পাচ্ছিলাম না কিছুই। ইচ্ছাশক্তি কর্মশক্তি হারিয়েছিল বলে নড়াতে পারছিলাম না চক্ষুগোলক—কিন্তু দৃষ্টিশক্তির গোলার্ধে যা কিছু রয়েছে, তার সবই দেখা যাচ্ছিল একটু কম স্পষ্টভাবে। আলোকরশ্মি পড়ছিল চোখের কনীনিকার বাইরের প্রান্তে অথবা চোখের কোণের দিকে—কাজ হচ্ছিল দারুণ—চোখে সরাসরি আলো পড়লেও এমন স্পষ্টভাবে কিছু প্রতীয়মান হয় না। প্রথম দিকে অবশ্য এই প্রতীতিকেই আমি শব্দ মনে করেছিলাম। পাশের বস্তু যখন আলোকময়, তখন শব্দটাকে মনে হয়েছে মধুর; পাশের বস্তু যখন ছায়াচ্ছন্ন, তখন শব্দটাকে মনে হয়েছে বেতাল। শ্রবণ-ইন্দ্রিয় অতিমাত্রায় প্রখর হয়ে উঠলেও ছন্দহীন হয়নি—কাজে গলতি দেখায়নি—বরং আসল শব্দকে নিখুঁতভাবে বিচার করেছে—একমাত্র অনুভূতির দ্বারাই যা সম্ভব। অদ্ভুত হয়ে উঠেছিল স্পর্শেন্দ্রিয়। স্পর্শের অনুভূতিটা জাগছিল তালগোল পাকানো অবস্থায়, কিন্তু লেগেছিল ছিনেজোঁকের মতন—শেষ হচ্ছিল অতীব দৈহিক আনন্দ দান করে। চোখের পাতায় তুমি যখন আঙুল বুলোচ্ছিলে—প্রথমে টের পেয়েছিলাম দর্শেন্দ্রিয় দিয়ে; তারপর আঙুল যখন

সরিয়ে নিলে—অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার সমস্ত সত্তা ভরে রইল অপরিমেয় ইন্দ্রিয়সুখের চরমানন্দে। হ্যাঁগো, ইন্দ্রিয়সুখের আনন্দ ছাড়া তাকে আর কিছু বলা যায় না। সামান্য ছোঁয়ায় সেকি সুখ। আমার সমস্ত অনুভূতিই তখন ইন্দ্রিয় সুখময় হয়ে উঠেছিল। মড়ার অনুভূতি অনেক বেশি প্রখর আর গভীর জীবিতের ব্রেনের অনুভূতির চেয়ে, যন্ত্রণাবোধ ছিল সামান্যই। হর্ষবোধ ছিল বিপুল, কিন্তু মনের যন্ত্রণা বা আনন্দ বলতে যা বোঝায়—তার লেশমাত্রও ছিল না। তাই তোমার ফোঁপানি আমার কানে পৌঁছলেও নরম সঙ্গীত ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি। গভীর দুঃখবোধ থেকে জন্ম সেই সঙ্গীতের—তার বেশি কিছু নয়। তোমার চোখের জলের বড় বড় ফোঁটা ভাসিয়ে দিচ্ছিল আমার মুখ—দেখে বিহ্বল হচ্ছিল আশপাশের সবাই—আমার সমস্ত সত্তা কিন্তু আপ্লুত হয়ে যাচ্ছিল পুলকানন্দে। আমার কাছে মৃত্যু এসেছিল এইভাবে—আমাকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা অবশ্য ফিসফিস করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে চলেছিল মৃত্যুর চরণে—আর তখনও তুমি সশব্দে কেঁদেই চলেছিলে অঝোর ধারে।

কফিনের কাপড়চোপড় পরানো হলো আমাকে—ব্যস্তভাবে আনাগোনা করতে লাগল তিন থেকে চারটে কালো মূর্তি। আমার দৃষ্টিরেখার সরাসরি সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে তারা মূর্তির আকারে আছড়ে পড়ল আমার সত্তায়। কিন্তু পাশের দিকে থাকার সময়ে তারা শুধু আতঙ্ক আর হাহাকার, হতাশা আর গোঙানির রূপ পরিগ্রহ করেছে আমার সত্তায়। শুধু তুমিই পরেছিলে সাদা পোশাক, শুধু তুমিই সুস্পষ্ট সঙ্গীত আকারে ছেয়েছিলে আমার সমগ্র সত্তাকে।

দিন ফুরিয়ে গেল, আলো ক্ষীণ হয়ে এল, অস্পষ্ট একটা অস্বস্তি আশ্রয় করল আমাকে। ঘুমন্ত মানুষের কানে বিষণ্ণ সুর যখন আছড়ে আছড়ে পড়তে থাকে—তখন যে উদ্বেগ জাগে ঘুমন্ত মানুষটার ভেতরে—ঠিক সেইরকম; খুব দূরে কোথায় খুব আস্তে ঘণ্টা বেজেই চলেছে, অনেকক্ষণ পরে পরে—বাজছে চুপি চুপি, অনেক সমীহ জানিয়ে। বয়ে নিয়ে আসছে কিন্তু বিষাদ মাখানো স্বপ্নরাশি। এল রজনী; সেই সঙ্গে এল ছায়ামায়ার সঙ্গে জড়ানো গুরুভাব অস্বস্তি। পাথর চাপা দিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন কষ্ট পায়—সেইরকম চাপা পড়া বেদনায় স্তব্ধ হয়ে রইলাম। বেদনাটা কিন্তু ধীর ছন্দে ধুকপুকিয়ে চলেছিল আমার সত্তার সর্বত্র। একই সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিল একটা নিচু খাদের গোঙানি—দূরাগত সমুদ্র কান্নার মতন বিরাম দিয়ে দিয়ে নয়—নিরন্তর। শুরু হয়েছিল গোধূলি লগ্নে—উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল রজনী। গাঢ়তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। হঠাৎ আলো ফেটে পড়েছিল ঘরের মধ্যে—আলো আনা হয়েছিল বলেই ঘর আলোয় আলো হয়ে গেছিল—তৎক্ষণাৎ নিরন্তর সেই ধুকধুক গোঙানি বিস্ফোরণের মতন ফেটে ফেটে পড়তে শুরু করেছিল—তত স্পষ্টভাবে নয়—সেরকম একঘেয়ে ভাবে নয়। চাপা পড়ে কষ্ট পাওয়ার সেই অনুভূতি কমে গেল অনেকটা—লম্ফদের শিখা থেকে সঙ্গীতের মূর্ছনা আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল আমার বিচিত্রভাবে সজাগ ইন্দ্রিয়দের ওপর।—বিরামবিহীনভাবে গান

গেয়েই চলল আমার কানের ভেতরে। তারপরেই তুমি এসে বসলে আমার শয্যায়, ঠোঁট ছোঁয়ালে আমার কপালে, অমনি তোলপাড় হয়ে গেল আমার বুকের ভেতরটা—আমার তখনকার সেই আশ্চর্য আবেগের সঙ্গে তোমার ভালবাসা আর দুঃখের কোনও সাদৃশ্যই ছিল না—অর্ধেক সাড়া দিল যেন আমার সত্তা—কিন্তু বিচিত্র সেই অনুভূতি নিমেষে পৌঁছে গেল নিথর হৃদযন্ত্রে—ছায়ার মতন—যেন সত্যি বাস্তব নয়—মিলিয়েও গেল দ্রুত—প্রথমে খুবই সূক্ষ্ম নির্যাসের মতন হয়ে রইল কিছুক্ষণ—তারপরেই তা হয়ে গেল নিখাদ ইন্দ্রিয়সুখ—আগে যা বলেছি।

অস্বাভাবিক এইসব অনুভূতিদের তুমুল পরিক্রমের ঠিক পরেই আমার সত্তার গভীরে উদিত হলো ষষ্ঠ একটি অনুভূতি—যার মধ্যে ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা নেই এতটুকু। বন্য আনন্দে বিভোর হয়ে গেলাম নিমেষমধ্যে—সে আনন্দ কি আনন্দ তা বলে বোঝাতে পারব না—তবে তা দৈহিক তো বটেই। দেহের কাঠামোতো একেবারেই গতিহীন—নিশ্চল। কোনও পেশিই আর কাঁপছে না। কোনও স্নায়ুই রোমাঞ্চিত হচ্ছে না। কোনও ধমনীও রক্তের ধাক্কায় নেচে নেচে উঠছে না। কিন্তু কলরব উপলব্ধি করছি মগজের মধ্যে—মানুষের উপলব্ধি দিয়ে তার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। বলা যাক, মনের পেণ্ডুলামের থিকিথিকি দুলুনি। মরজগতের মানুষ যাকে বলে *সময়* —এ তাই। সময় দোলকের নির্ভুল হিসেবে কাঠামো এখন বাঁধা পড়েছে। ম্যান্টেলপিসের ওপরে রাখা ঘড়ির কাঁটা যে ভুল সময় দিচ্ছে—তা টের পাচ্ছি আমার সত্তা-জোড়া সময়-দোলকের নির্ভুল ছন্দের হিসেবে। আশপাশে যারা ঘড়ি নিয়ে ঘুরছে, তাদের প্রত্যেকের সময়ের ভুল ধরা পড়ে যাচ্ছে—আমার ব্রেনের সময় দোলকের নির্ভুল ধুক-ধুক ছন্দে। অন্য ঘড়িদের ভুলভাল টিকটিকানি বিকট আওয়াজে আছড়ে পড়ছিল আমার কানের পর্দায়। ঘরের কোনও ঘড়িই ঠিক সময় দিচ্ছিল না—প্রত্যেকটা ঘড়ির বেঠিক সময় তালকাটা ধাক্কা মেরেই চলছিল নির্ভুল সময়-দোলকের সময়ের সঙ্গে অনুপাত বজায় রেখে। সময়ের স্রোতে একাত্ম হয়ে যাওয়ার উপলব্ধি পেলাম শুধু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—পা দিলাম অনন্তের প্রথম ধাপে।

তখন মধ্যরাত্রি। তখনও তুমি বসেছিলে আমার পাশে। মৃত্যুর কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেছিল অন্য সকলেই। যাওয়ার আগে আমাকে শুইয়ে দিয়ে গেছিল কফিনের মধ্যে। দপ দপ করে জ্বলছিল লম্ফগুলো, একঘেয়ে অস্বস্তি পীড়া দিয়ে যাচ্ছিল বলেই লম্ফদের দপদপানি টের পাচ্ছিলাম। আচম্বিতে মিলিয়ে গেল সেই পীড়াবোধ—ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হলো অস্বস্তি—পুরোপুরি। সুগন্ধ আর সুখের বার্তা বহন করে আনল না গন্ধেন্দ্রিয়তে। তমিস্রা যে চাপবোধ সৃষ্টি করেছিল বুকের ওপর—আস্তে আস্তে উবে গেল সেই বোঝা। বিদ্যুৎ প্রবাহের মতন একটা চাপা ধাক্কা কাঁপিয়ে দিয়ে গেল আমার সমস্ত দেহটাকে—সেই মুহূর্ত থেকে বহির্জগতের সঙ্গে সংস্পর্শ বিরহিত হলাম একেবারেই। মানুষ যাকে বলে অনুভূতি, সত্তার চেতনায় আর বহমান কালের গর্ভে তা বিলীন হয়ে গেল। পচন

শুরু হলো মরদেহে।

তা সত্ত্বেও রয়ে গেল অলস সহজাত আবেগ আর অনুভূতির কিছুটা। মাংসতে যে ভয়ানক বিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে, তা যেমন টের পাচ্ছিলাম—ঠিক তেমনিই টের পাচ্ছিলাম আমার পাশে তোমার ঠায় বসে থাকাটা। বসেছিলে যেন নিষ্প্রাণ দেহে। এইভাবেই এল দ্বিতীয় দিবসের মধ্যাহ্ন। তোমাকে যে আমার পাশ থেকে উঠিয়ে নেওয়া হলো— তা টের পেলাম। যারা তোমাকে সরিয়ে নিয়ে গেল আমার সান্নিধ্য থেকে, তারাই আমার কফিনের ডালা আঁটল, বয়ে নিয়ে গেল গোরস্থানে, নামিয়ে দিল কবরে, মাটি উঁচু করে দিল কফিনের ওপর, রেখে দিয়ে গেল নিঃসীম অন্ধকার আর ক্ষয়ের মধ্যে—পোকাদের খাদ্য হয়ে ঘুমিয়ে রইলাম বিষণ্ণ ঘুমে।

কবরখানার এই খাঁচাঘরের অনেক গুপ্তরহস্য ফাঁস করা যায় না। এইখানেই কেটে গেল আমার অনেকদিন, অনেক মাস, অনেক সপ্তাহ। প্রতিটি মুহূর্ত কিভাবে উড়ে গেল—তা নিরীক্ষণ করে গেল আত্মা চুলচেরা হিসেবে—সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীনভাবে।

অতীত হলো একটি বছর। সত্তার চেতনা একটু একটু করে অস্পষ্ট হয়ে আসছিল—তার জায়গা দখল করছিল স্থানীয় চেতনা। সত্তার অনন্যতা বিলীন হয়ে যাচ্ছিল স্থানের অনন্যতায়—মুছে যাচ্ছিল প্রথমটার পরিচয়—জাগছিল দ্বিতীয়টার একত্ব। দেহ ঘিরে সঙ্কীর্ণ জায়গা বলে আলাদা কিছু রইল না—সবটাই হয়ে গেল দেহ। ঘুমন্ত মানুষের চোখে আলো পড়লে ঘুমিয়ে থেকেও যেমন সে টের পায়—অথচ তার ঘুম ভাঙে না—আমিও তেমনি ভালবাসার পরশ পেয়েই চললাম কফিনজোড়া দেহর সর্বত্র। তারপর একদিন কফিনের মাটি তুলে নামিয়ে দেওয়া হলো প্রাণাধিকা উনার কফিন।

আবার সেই শূন্যতা। সেইরকম খালি অবস্থা। নীহারিকাসম সেই আলোকপুঞ্জ নিভে গেছে। ক্ষীণ রোমাঞ্চ কাঁপতে কাঁপতে নির্বাসে পরিণত হয়েছে। বাড়তি হিসেবে এসেছে বহু চাকচিক্য। ধুলো মিশে গেছে ধুলোয়। পোকাদের আর নেই কোনও খাদ্য। অস্তিত্বের চেতনা অবশেষে একেবারেই বিদায় নিয়েছে। তার জায়গা দখল করেছে স্বৈরাচারী সময় আর স্থান—এদের দাপট সবার ওপরে—এরা নিরন্তরও বটে—তাই এদের জায়গা ছেড়ে দিল সকলেই। যা কোনদিন ছিল না—যার কোনও চিন্তা নেই—যার কোনও চেতনা নেই—যার কোনও আত্মা নেই—অথচ বস্তু যার কোনও অংশেই নেই—এই পরম শূন্যতা—এই হলো গিয়ে অমরত্ব—সেই তার জন্যে রইল কবর নামক গৃহ—নিত্যসঙ্গী হিসেবে রইল মহাকাল। □
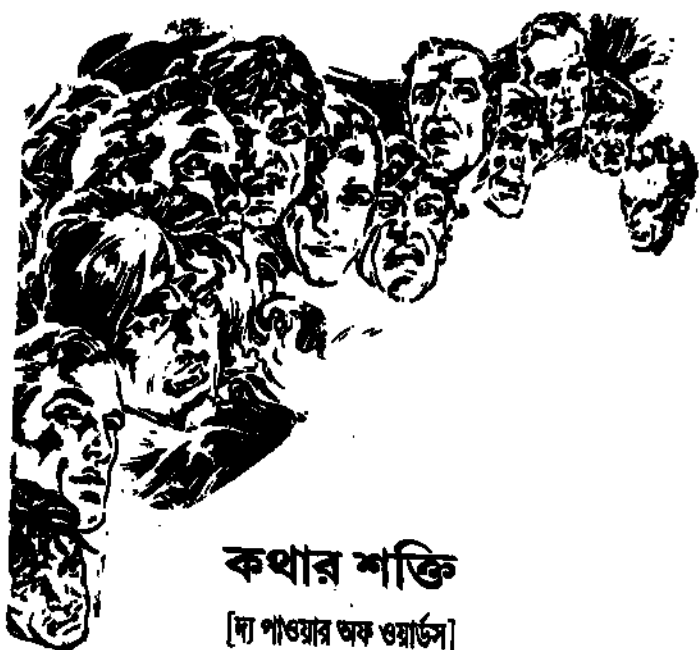
কথার শক্তি

[দ্য পাওয়ার অফ ওয়ার্ডস]

ওইনোস—আগাথস, অমৃত জীবনের সদ্যশক্তিতে ভরপুর এই আত্মার দুর্বলতাকে ক্ষমা করো।

আগাথস—ওইনোস, এমন কিছুই বলোনি যার জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে। জ্ঞান তো সহজাত নয়। বিজ্ঞতা আসে দেবগণের কৃপায়।

ওইনোস—অস্তিত্বের এই অবস্থায় আমি কিন্তু স্বপ্ন দেখেছিলাম, সব ব্যাপারেই ওয়াকিবহাল থাকব—সর্বজ্ঞ হওয়ার ফলে চকিতে সুখী হবো।

আগাথস—জ্ঞান তো আর সুখ নয়—জ্ঞানের আহরণেই আসে সুখ। চিরকাল জ্ঞান অর্জন করতে পারছি বলেই তো চিরকাল সুখী থাকতে পারছি। সব জেনেফেলা তো শয়তানের অভিশাপ।

ওইনোস—কিন্তু পরম পিতা কি সর্বজ্ঞ নন?

আগাথস—সেটা তাঁর কাছে আজও অজ্ঞাত—কারণ তিনি চিরসুখী।

ওইনোস—কিন্তু ঘণ্টায় ঘণ্টায় যখন জ্ঞান আহরণ করেই চলেছি—একসময়ে সবই কি জানা হয়ে যাবে?

আগাথস—তাকাও ওই পাতালস্পর্শী দূরত্বের দিকে! —অযুত নিযুত নক্ষত্ররাশির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি... যাচ্ছি... তাকাও ওই বিপুল সৌন্দর্যের

দিকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডর বিরামবিহীন সুবর্ণপ্রাচীর কি আত্মিক দিব্যদৃষ্টিকেও প্রতি পদে ব্যাহত করছে না? অযুত নিযুত আলোকময় বস্তু কি সংখ্যায় অগণন হওয়ার জন্যেই এক সময়ে একত্বে পরিণত হচ্ছে না?

ওইনোস—বস্তুর অসীমতা যে স্বপ্ন নয়—তা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারছি।

আগাথস—আইডেন-য়ে কোনও স্বপ্ন নেই। তবে কানাকানি শুনি, বস্তুর এই অসীমতা সৃষ্টি করা হয়েছে অসীম ফোয়ারাদের জন্যে—যে ফোয়ারা থেকে জ্ঞানতৃষ্ণা মিটিয়ে যেতে পারবে আত্মা—কারণ, আত্মার জ্ঞানের স্পৃহা মেটে না কখনই—তৃষ্ণা মিটে গেলেই তো আত্মারও নিভে যাওয়া। সুতরাং, প্রশ্ন করে যাও নির্ভয়ে, মুক্ত মনে। চলো, এবার বাঁয়ে মোড় নিয়ে সিংহাসনের এখতিয়ার ছেড়ে নক্ষত্রময় ময়দানে নেমে যাই—ওদিকেই রয়েছে তেরশো তিন সূর্যময় জগৎ।

ওইনোস—যেতে যেতে শিখিয়ে যাও পৃথিবীর চেনা সুরে। মর্ত্যজীবনে স্রষ্টাকে যে পন্থায় চিনতে শিখেছিলাম—সেই পন্থায় তোমার কথার ইঙ্গিত আমি ধরতে পারলাম না, কি বলতে চাও? স্রষ্টা কি ঈশ্বর নন?

আগাথস—আমি বলতে চাই, ঈশ্বর সৃষ্টি করেন না।

ওইনোস—বুঝিয়ে দাও।

আগাথস—শুরুতেই শুধু তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। এখন যে অগণন প্রাণি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে রয়েছে, এরা ঈশ্বরের সৃজনী শক্তির সরাসরি সৃষ্টি নয়—মাধ্যম মাত্র।

ওইনোস—মানুষ কিন্তু এহেন ধারণার নাম দেবে বংশগতি।

আগাথস—দেবগণ বলবে, এই হলো পরম সত্য।

ওইনোস—এই পর্যন্ত তোমার কথা বোঝা গেল। প্রকৃতির কিছু পদ্ধতি সৃষ্টির *চেহারা* নিয়েছে। পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার ঠিক আগে সফল এক্সপেরিমেন্টের পর কিছু জ্ঞানী-পুরুষ জীব-কণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আগাথস—সেসব ঘটনা দ্বিতীয় স্তরের সৃষ্টি—প্রথম কথায় প্রথম যে আইন তৈরী হয়েছিল—তারপর যে সৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে—দ্বিতীয় স্তরের ওই সৃষ্টিগুলো তার মধ্যেই পড়ে।

ওইনোস—অনস্তিত্ব থেকে কি নক্ষত্রময় এই জগতেরা সৃষ্টি হচ্ছে না? নক্ষত্ররা কি পরম রাজার হাতে গড়া নয়?

আগাথস—ধাপে ধাপে বোঝানোর চেষ্টা করা যাক আমার ধারণাকে। জানোই তো, কোনও চিন্তার যেমন ধ্বংস নেই, কোনও কাজও তেমনি অসীম ফল ছাড়া হয় না। পৃথিবীতে যখন বসবাস করেছি, তখন হাত নাড়ালেই বাতাসে বিশেষ কম্পন সৃষ্টি হতো। এই কম্পন সীমাহীনভাবে বাড়তে বাড়তে বাতাসের প্রতিটি বস্তুকণায় তাড়না জাগিয়েছে—সেই থেকেই *চিরটাকাল* প্রতিটি হাত নাড়া সেই তাড়নাকে আরও ভাড়িয়ে নিয়ে গেছে। আমাদের এই গোলকের গণিতবিদরা জানতেন এই তত্ত্ব। সাধক হিসেবে তাঁরা তরল পদার্থে বিশেষ

তাড়না দিয়ে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলেন—জানতে পেরেছিলেন কোন তাড়না কতখানি সময়ে গোলক ঘিরে থাকা আবহমণ্ডলের প্রতিটি পরমাণুকে প্রভাবিত করতে পারে। পিছুহাঁটা অঙ্কের হিসেবে অতি সহজেই মূল তাড়নায় ফিরে আসতেও পেরেছিলেন—সেই তাড়নার মূল্যায়নও করেছিলেন। গণিতবিদরা আরও দেখেছিলেন, যে কোনও তাড়নার ফল প্রকৃতই সীমাহীন—এটাও দেখেছিলেন, বীজগাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সব ফলের একটা অংশের শুরুতেও ফিরে যাওয়া যায়। আরও দেখেছিলেন, পেছিয়ে আনার এই পদ্ধতি জেনে যাওয়ার ফলে, ফলের প্রতিক্রিয়াকে অনন্তভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় বীজগাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই এবং তার প্রয়োগ ঘটানও সম্ভব শুধু তাঁদের ধীশক্তিতেই, যাঁরা এই পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ঠিক এই পয়েন্টেই থমকে গেছিলেন গণিতবিদরা।

ওইনোস—এগোতেনই বা কেন?

আগাথস—দূর প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিবেচনার দরকার হয়ে পড়েছিল বলে। যা জেনেছিলেন, তা থেকে সিদ্ধান্ত গড়ে নিতে পেরেছিলেন—বীজগাণিতিক বিশ্লেষণ নিখুঁত নির্ভুল হওয়ার ফলে, অনন্ত সময়ের বুকে যে কোনও পয়েন্টে যে কোনও পরিণামে পৌঁছোনো সম্ভব বাতাস বা ইথারের মধ্যে দিয়ে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন, বাতাসে যে কোন তাড়নাই সৃষ্টি করা হোক না কেন—*অস্তিমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে* যা কিছু আছে—তার প্রতিটির ওপর সেই তাড়নার প্রভাব পড়বেই। সীমাহীন জ্ঞানের অধিকারী সেই তাড়নাকে ধরে পিছু হেঁটে মূলে তো পৌঁছোবেই—সেখান থেকেও আদি মূল অর্থাৎ ঈশ্বরের মুকুটের সন্ধানও পেয়ে যাবে। ধূমকেতুর উৎস কোথায়, পিছু হাঁটা পদ্ধতিতে তাও তারা বের করে ফেলবে। এই ক্ষমতা দিব্য ধীশক্তিতেই থাকে—শুরু যেখানে, সেখানে পৌঁছে যাওয়া যায়।

ওইনোস—তুমি কিন্তু বলছিলে শুধু বাতাসে তাড়না সৃষ্টির কথা।

আগাথস—পৃথিবীর সম্পর্কেই তা বলেছিলাম। সাধারণভাবে এই তাড়না ধেয়ে যায় ইথারের মাধ্যমে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ডুবে রয়েছে তো ইথারেই। সৃষ্টির সেরা মাধ্যম এই ইথার।

ওইনোস—সব গতিই তাহলে সৃষ্টি করছে?

আগাথস—করতেই হবে! প্রকৃতজ্ঞান কিন্তু শিখিয়ে দিয়েছে, সব গতিরই উৎস হলো চিন্তা—আর সব চিন্তারই উৎস হলো—

ওইনোস—ঈশ্বর।

আগাথস—যে পৃথিবী সম্প্রতি ধ্বংস হয়ে গেল, তার আবহমণ্ডলে তাড়নার কথা এইমাত্র বললাম তোমাকে—তুমি ছিলে সুন্দরী এই পৃথিবীরই সন্তান।

ওইনোস—তা বলেছো।

আগাথস—তখন কি বোঝো নি *কথার বাহ্যিক ক্ষমতা* অবশ্যই আছে? প্রতিটি কথাই কি বাতাসে তাড়না সৃষ্টি করছে না?

ওইনোস—তাহলে কেন কাঁদছ? সুন্দর এই নক্ষত্রর ওপরে উড়তে উড়তে কেন ঝুলে পড়ছে তোমার ডানা? এমন সবুজ অথচ এমন ভয়ঙ্কর গোলক তো আসবার পথে আর চোখে পড়েনি? এর ঝকমকে পাপড়ি শুধু স্বপ্নেই দেখা যায়—কিন্তু ভয়ানক আগ্নেয়গিরিগুলো যেন উত্তাল হৃদয়ের তুমুল ক্ষোভ।

আগাথস—ঠিক তাই। —ঠিক তাই। —তিন শতাব্দী আগে জোড়হস্তে অশ্রুসজল চোখে শুধু কয়েকটা কথা আউড়ে এর জন্ম দিয়েছি। ঝকমকে পাপড়িগুলো অপূর্ণ স্বপ্ন—দুরন্ত আগ্নেয়গিরিগুলো ক্ষুব্ধ হৃদয়ের আবেগ।□

ব্যবসার আত্মা

[বিজনেসম্যান]
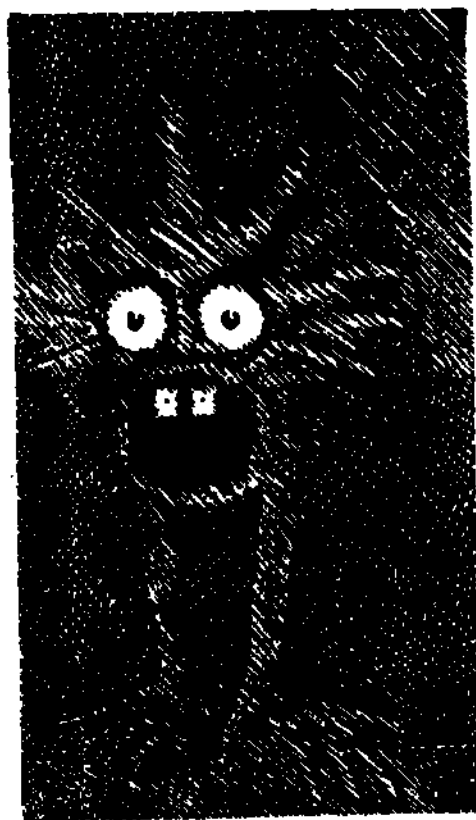
আমি একজন ব্যবসাদার। আমি পদ্ধতির ভক্ত। আমার কাছে পদ্ধতিই ধর্ম, পদ্ধতিই কর্ম, পদ্ধতিই পরমং গুরু। পদ্ধতি না মেনে আমি কুটো-গাছটাও নাড়ি না। পদ্ধতিই আমার প্রতি পদ্ধতিই আমার পাথেয়। পদ্ধতিই আমার ধ্যান, পদ্ধতিই আমার ধারণা। পদ্ধতি বিহনে আমি একটা শূন্য।

আসলে কি জানেন, পদ্ধতিটাই তো মোদ্দা ব্যাপার—আর সব ফক্কা। পদ্ধতিই হলো ব্যবসার আত্মা। কিন্তু এই সংসারে বেশ কিছু ব্যক্তি আছে, তাদের আমি অন্তর থেকে ঘৃণা করি। আপনাদের মধ্যে যারা পয়লা নম্বর মূর্খ এবং কিঞ্চিৎ ছিটগ্রস্ত—তাঁরা এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের যতটা ঘৃণা করেন—আমি করি তার চাইতেও বেশি।

কেন জানেন? এই লোকগুলো পদ্ধতিকে ঠিকমত সমাদর জানাতে জানে না। পদ্ধতিমাফিক কাজকর্ম করে ঠিকই, কিন্তু পদ্ধতি বলতে আসলে কি বোঝায়, সেটাই বোঝে না। এরা পদ্ধতিকে মেনে চলে আক্ষরিকভাবে—ভাবগতভাবে নয়। পদ্ধতির অক্ষর চেনে—পদ্ধতির উদ্দেশ্য বোঝে না। নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীবরা অত্যন্ত অ-গতানুগতিক কাজ করেও বলে কি না পদ্ধতিটা কিন্তু নেহাৎই গতানুগতিক—একেবারে ছকে বাঁধা।

আমার সঙ্গে ওই মূর্খদের কারাক তো এই খানেই। ছক। ছক বলে পদ্ধতির ডিক্সনারিতে কিছু আছে নাকি? করলা লুটতে গেলে যে পথ নিতে হবে—সেটাই সেই কয়লা লোটার পদ্ধতি। কাকে বোঝাই বলুন। 'আলেয়া ভূত' কখনো ছক বাঁধা পদ্ধতিতে জ্বলে নেভে? যত্তোসব গোমূর্খ!

পুরো ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার মাথা এখন যতটা পরিষ্কার, ততটা পরিষ্কার কোনকালেই হতো না, যদি না খুব কচি অবস্থায় একটা বিদঘুটে দুর্ঘটনায় আমি পড়তাম। সহৃদয় এক আইরিশ নার্স (আমার শেষ ইচ্ছাপত্রে তার নাম আমি লিখে যাবই) একদিন আমার গোড়ালি ধরে শূন্যে তুলে ধরেছিল—(কারণ, যতখানি চেঁচালে চলে যায়, আমি চেঁচাচ্ছিলাম তার চেয়ে বেশি)—বার দু'তিন দুলিয়ে নিয়ে দুই চোখে দুই থাবড়া মেরে মুণ্ডুখানা ঠেসে দিয়েছিল খাটের বাজুতে ঝোলানো একটা খড়ের লম্বা টুপির ভেতরে।

এই একটি ঘটনাতেই সাঙ্গ হয়ে গেল আমার ভাগ্যলিখন, নির্দিষ্ট হয়ে গেল নিয়তি। সৌভাগ্যসূচক এই দুর্ঘটনার ফলে তৎক্ষণাৎ গজিয়ে উঠল একটা গোল্লায় নিটোল আব—চাঁদি আর কপালের মাঝের জায়গা জুড়ে। এরকম সুষমাময় পদ্ধতিমাফিক দেহযন্ত্র কেউ কখনও দেখেনি—কারও সৌভাগ্য রচনাও এভাবে করেনি।

সেই থেকে পদ্ধতি ছাড়া আমার জীবন অচল। পদ্ধতি-ক্ষুধায় আমি ছটফটিয়ে মরি। মনের মতন পদ্ধতি পেলেই তার মধ্যে মাথা গলাই—সব ব্যবসার যা মূলমন্ত্র—সঠিক পদ্ধতি। আমি তা মাথা খাটিয়ে বাৎলাতে পারি বলেই সফল ব্যবসাদার হিসেবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি।

একটা জিনিসকে আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি। প্রতিভাকে। প্রতিভাবান যাদের বলেন, তারা প্রত্যেকেই এক-একটা সাত জন্মের গাধা—যে যত বড় প্রতিভাবান, সে তত কুখ্যাত গাধা। এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম নেই—একদম না।

বিশেষ করে একটা সারকথা সদাসর্বদা খেয়াল রাখবেন। প্রতিভাবানকে হাজার নিংড়োলেও তা থেকে ব্যবসাদার তৈরি হবে না। ইহুদিকে নিংড়ে যেমন কাণাকড়ি পাওয়া যায় না—সেইরকম ব্যাপার আর কি। প্রতিভাবান নামধারী প্রাণিরা সবসময়েই জানবেন দারুণ সম্ভাবনাময় মওকা হাতে পেয়েও, সে সবের কিনারা ঘেঁষে ছিটকে যায়, নয়তো পেটে-খিল-ধরিয়ে দেওয়ার মতন হাসির প্রস্তাবনা ঘটিয়ে বসে, অথবা যা মানায় ঠিক তার উল্টো, একেবারে বেমানান—এমন হঠকারিতা করে বসে যে, মওকা তখন ফুটো বেলুনের মতন চুপসে যায়—ব্যবসা বলতে যা বোঝায়, তার নামগন্ধও আর থাকে না।

তাই বলছিলাম, এই ধরনের চরিত্রদের দেখলেই চিনতে পারবেন; প্রতিভার চমক দেখাতে গিয়ে যে-কাজ নিয়ে ধাষ্টামো করছে আর ল্যাজেগোবরে হয়ে মরছে—সেই কাজ অনুসারে বিচিত্র এই জীবদের নামকরণও করতে পারেন।

কাজের ধরন দেখলেই বুঝে যাবেন। ধরুন, জিনিস কেনাবেচা করে আঙুল ফুলে কেউ কলা গাছ হয়েছে; অথবা মস্ত কারখানা বানিয়ে উদয়াস্ত হরেক বস্তু

উৎপাদন করে চলেছে; কিংবা তুলো বা তামাকের ব্যবসা চুটিয়ে করছে; নয়তো এই জাতীয় যে কোনও বাতিকগ্রস্ত ব্যবসা নিয়ে আধ-পাগল অবস্থায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে; নতুবা শুকনো জিনিস নিয়ে কারবার ফেঁদেছে, বা সাবান ফুটিয়ে মরছে, বা ওই ধরনের কিছু একটা নিয়ে মেতে রয়েছে; নচেৎ আইনবিদ বা কামার বা ডাক্তার হবার ভান করে যাচ্ছে—স্বাভাবিক পন্থার বাইরে কোনও কিছু একটা হলেই হলো—তাহলেই তাকে প্রতিভাবানের ছাপ মেরে দেবেন তৎক্ষণাৎ, আর তারপরেই, তৃতীয় সূত্র অনুসারে, এহেন জীবদের নাম দেবেন—গাধা।

এবার তাহলে আমার কথা বলা যাক। প্রতিভাবান আমি কস্মিনকালেও নই। খাঁটি বিজনেসম্যান বলতে যা বোঝায়—আমি তাই। নিখাদ ব্যবসাদার। আমার রোজকার কাজের ডাইরি আর আয়ব্যয়ের খাতা দেখলেই তা মালুম হবে চক্ষের নিমেষে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—নিজেই বলছি—কি আর করা যায়। সময়জ্ঞান আমার প্রখর। এক সেকেণ্ডের এদিক ওদিক হয় না—ঘড়ি হার মেনে যায় আমার এই সময়নিষ্ঠার কাছে। ঘড়ির কাঁটা আমি নিজেই—তাই কাঁটায় কাঁটায় খাপ খাইয়ে চলি আশপাশের মানুষগুলোর অভ্যেস-টভ্যেসের সঙ্গে—আমার কারবার তো ওদেরকে নিয়েই। এই একটি ব্যাপারে আমি অপরিসীম ঋণী আমার নিরতিসীম দুর্বলমনা মাতা এবং পিতার কাছে; নিয়তি সহায় না হলে ওঁরা আমাকে নির্ঘাৎ প্রতিভাবান বানিয়ে ছাড়তেন। কাঁটায় কাঁটায় হাজির হয়েছিলেন নিয়তিঠাকরুণ—বিষম বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছিলেন চকিতে। জীবনী নামক কিম্ভূত গ্রন্থে যা লেখা হয়, তা আরও বেশি সত্যি বলেই সবাই জানেন। তা সত্ত্বেও আমার পিতৃদেবের প্রকৃত বাসনাটা নিয়ে আজও আমার মন খচখচ করে। আমার বয়স যখন মোটে পনেরো—কৈশোরের কিশলয়—তখন উনি আমার ঘাড় ধরে সম্মানজনক একটা পেশায় ঢুকিয়ে দিতে গেছিলেন; পেশাটায় লোহা কিনে বেচতে হয় এবং কমিশন পাওয়া যায় ভালই; অর্থাৎ আমাকে উনি একাধারে লোহার কারবারি আর কমিশন এজেন্ট বানাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধারণায় এটাই নাকি উচ্চমার্গের বিজনেস।

উচ্চমার্গ না কচু। এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে করতে হয়েছে তিনদিনের মধ্যে। প্রবল জ্বর নিয়ে যখন বাড়ি ফিরেছি, তখন যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে আমার গোলালু আব—বিরল সেই দেহযন্ত্র—আমার পদ্ধতি-দেবালয়—যা এই অত্যাচার আর অনাচার সইতে পারেনি। ভয়ঙ্কর আর বিপজ্জনক সেই দপদপানি দেখে ঘাবড়ে গেছিলেন আমার পিতৃদেব এবং মা-জননী। পুরো দেড়টি মাস যমে মানুষে লড়াই চলেছে আমাকে নিয়ে। প্রাণটা ঝুলেছিল সুতোর ডগায়। হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন ডাক্তাররা।

ভুগে ভুগে কাঠি হয়ে গিয়েও যমকে কলা দেখিয়েছিলাম। মাথার গোলালু আব বা গোল শিং উজ্জ্বলতর হয়েছিল। নিয়তির নির্দেশ তার মধ্যে প্রোজ্জ্বলতর হয়েছিল। অতীব সম্মানজনক লোহার কারবারি হওয়ার সুবর্ণ ফাঁদ থেকে বেঁচে গেছিলাম। দিবারাত্র কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছিলাম সহৃদয়া সেই নার্স

মহিলাকে—যার অসীম কৃপায় সুবৃহৎ এই গোলালু আবের আবির্ভাব ঘটেছে আমার শিরদেশে—যার দূরদর্শিতার দৌলতে লোহার কারবারি আর কমিশন হওয়ার ফাঁড়া কেটে গেল অবশেষে। দশ কি বারোয় পা দিয়েই বেশির ভাগ বালক চম্পট দেয় পিত্রালয় থেকে। আমি কিন্তু সবুর করেছিলাম ষোল বছর বয়স পর্যন্ত। হয়তো আরও কয়েকটা বছর টিকে যেতাম—যদি না স্বকর্ণে আড়ি পেতে শুনতাম আমার মা-জননীর পৈশাচিক পরিকল্পনা—আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে।

আমার মনোমত কাজেই মা বনবাসে পাঠাতে চায় আমাকে। অর্থাৎ, মা চায় মুদির দোকান খুলে বসি।

মুদি হবো। সেই আমার মনের মতন কাজ।

ঠিক করলাম আর নয়। এবার হাওয়া হওয়া যাক। বাতিকগ্রস্ত এই বুড়োবুড়ি তফাতে থাকুক—আমাকে প্রতিভাবান বানানোর স্বপ্নেও ছাই পড়ুক।

খোলামেলা দুনিয়ায় আমি হবো আমার নিজের মতন। আমার নাকে দড়ি নিয়ে কেউ ঘোরাতে পারবে না—আমি কি পুতুল নাচের পুতুল?

চুটিয়ে চালিয়ে গেলাম আমার খেয়ালখুশির বিবিধ ব্যবসা—পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েই অবশ্য। নিত্যনতুন পদ্ধতি। এন্তার সাপ্লাই এলো আমার গোলালু দেহযন্ত্র থেকে। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত বেরিয়ে গেলাম মার-মার কাট-কাট করে। তারপর নামলাম 'দরজির-হাঁটিয়ে-বিজ্ঞাপন' লাইনে। এ ব্যবসায় বাজার বড়, পয়সাও বেশি।

পেশাটা বেজায় কর্তব্য কঠিন—কিন্তু আমার কাছে জলভাত—শুধু আমার পদ্ধতি প্রেমের দৌলতে। পয়সাটা এখানে বড় নয়—বড় হলো কাঁটায় কাঁটায় কঠিন কাজগুলো করে যাওয়া নিখুঁত নিষ্ঠায় আমি কর্তব্যপালন করেছি—হিসেবপত্র রেখেছি কড়ায় গণ্ডায়—প্রতিভাবানরা হেদিয়ে যাবে মশায়।

যে দরজির কাজ নিয়েছিলাম, ব্যবসায় সে পয়সা কামিয়ে থাকতে পারে বিস্তর—কিন্তু পদ্ধতি জিনিসটার কদর বোঝেনি। আমি বুঝেছিলাম বলেই তো কাজে লেগে গেছিলাম।

ঘড়ি ধরে সকাল ন'টায় পেরোতাম তার চৌকাঠ— সেইদিনের জামাকাপড় বুঝে নিতাম। কোন কোন পোশাক বিজ্ঞাপিত হবে সেদিন— দরজি তা গেঁথে গেঁথে দিত আমার মগজে— তালে তাল মিলিয়ে পদ্ধতির উদ্ভাবন করে যেত আমার চৌষট্টি কলাকলার ডিপো— মানে, আমার উপ-মস্তিষ্ক—গোলালু সেই আব। নব নব পদ্ধতি কিলবিল করতে থাকত মগজে—সবই বিজ্ঞাপনের পদ্ধতি— এক-একটা পোশাককে এক-একরকমভাবে লোকের চোখের সামনে তুলে ধরার কায়দা। ফ্যাশন প্যারেড যেন কত রকম হতে পারে—আমার উপ-মস্তিষ্কে যে তার কারখানা বসে যেত তৎক্ষণাৎ।

পুরো একটা ঘণ্টা চলত এইভাবে।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজতে না বাজতেই আমি হাজির হয়ে যেতাম শহরের এমন সব জায়গায় যেখানে ঘুর ঘুর করছে শৌখিন মানুষ, অথবা যেখানে

চলছে জনসাধারণকে আমোদপ্রমোদ দিয়ে ভুলিয়ে রাখার ঢালাও আয়োজন। লোকের গায়ে গা লাগিয়ে চলতাম আমি—নজর ছাড়া হতাম না কিছুতেই—যেদিকেই তাকাক না কেন, দেখতে পেত আমার আহামরি সুরৎ আর পিঠে ঝোলানো রকমারি পোশাক। এই যে কায়দা এবং লোকের চোখে চোখে থাকার নিষ্ঠা—এ ব্যবসায়ে যারা নেমেছে—তাদের অন্তরে ঈর্ষার আগুন জ্বালানো পক্ষে যথেষ্ট।

দুপুর প্রায়ই পেরোত না—একজন না একজন খদ্দেরকে বগলদাবা করে নিয়ে আসতাম দরজি মহল্লায়—পাচার করে দিতাম আমার মনিবের করকমলে—'কচুকাটা এবং আবার আসবেন' কোম্পানীর দোকান ঘরে।

বুক ফুলিয়ে এ-কাজ করে বেরিয়েছি। কতজনকে যে কচুকাটা করেছি, তার হিসেব কড়ায়-গণ্ডায় লিখে রেখেছি আমার খাতায়। কিন্তু আমার বুক ফেটে যেতে বসেছিল সেইদিনই—যেদিন 'কচুকাটা এবং আবার আসবেন' কোম্পানীর হৃদয়হীন নীচমনা মালিক আমাকেই কচুকাটা করে ছেড়েছিল কড়ায় গণ্ডায় আমার প্রাপ্য না মিটিয়ে দিয়ে। কথায় বলে, হিসেবের কড়ি বাঘেও খেতে পারে না কিন্তু কচুকাটার মালিক বেমালুম তা আত্মসাৎ করেছে—আমার চোখে জল এনে দিয়েছে। বুক আমার ফেটে গেছিল সামান্য দুটো পেনি নিয়ে ঝগড়া করে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু পেনি দুটো তো আমার ভোগে লাগাইনি। একটা কাগজে তৈরি সাদা কলার কিনে শার্টে লাগিয়েছিলাম ময়লা কলারের বদলে—'কচুকাটা···' কোম্পানীরই ইজ্জৎ বাড়ানোর জন্যে। প্রকৃত ব্যবসার মানুষ মাত্রই বুঝবে বিশেষ এই পদ্ধতির মহিমা— বোঝেনি শুধু 'কচুকাটা···' কোম্পানীর মালিক। সে কিনা এক পেনি দিয়ে এক তা ফুলস্কেপ কাগজ কিনে দেখানোর চেষ্টা করছিল—ওই কাগজে কি সুন্দর শার্টের কলার হয়। ধান্দাবাজি নয়? এক পেনি বাঁচানো মানেই আমার প্রাপ্য এক পেনি কেড়ে নেওয়া। শতকরা পঞ্চাশ ঠকিয়ে নেওয়া। এর নাম ব্যবসা? পদ্ধতির গোড়ায় কোপ নয় কি? এহেন লোকের সঙ্গে আমার বনিবনা হবে না বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ ইস্তফা দিলাম চাকরিতে। চাকরির খাতিরে পদ্ধতি বিসর্জন দেওয়া যায় না।

এরপর শুরু করলাম 'দৃষ্টিকটু' ব্যবসা। একেবারে নিজের ব্যবসা । নিজেই মালিক, নিজেই কর্মচারি। ভারি লাভজনক ব্যবসা মশায়, বিলক্ষণ সম্মানজনকও বটে। সেইসঙ্গে আছে ঢালাও স্বাধীনতা—অষ্টপ্রহর কানের কাছে খিচির-খিচির করার কেউ নেই।

আমার নিখাদ সততা, মিতব্যয়িতা আর কঠোর ব্যবসায়িক অভ্যেস—এই তিনগুণের সব কটাই কাজে লেগে গেল অভিনব এই ব্যবসায়ে। পশার জমে গেল দুদিনেই এবং দাগীও হয়ে গেলাম।

'দৃষ্টিকটু' ব্যবসার গোড়াপত্তনটা দু'লাইনে বুঝিয়ে দেওয়া যাক। এই পৃথিবীতে কেল কিছু হঠাৎ বড়লোক অথবা উড়নচণ্ডে-ওয়ারিশ, অথবা লালবাতি-জ্বলা কোম্পানী আছে—যারা পেল্লায় প্রাসাদ বানিয়ে যেতে থাকে।

প্রাসাদ যখন অর্ধেক তৈরি হয়, তখন ধারে কাছে অথবা একেবারে ঢোকবার মুখে কাদা দিয়ে জঘন্য কিছু বানিয়ে রাখতে হয়। সেটা প্যাগোডা হতে পারে, এস্কিমোদের ইগলু হতে পারে, নয়তো হটেনটটদের কিম্ভূত ছাউনিও হতে পারে। এমন একটা কিছু হওয়া চাই—যা দেখলেই চোখ কড়কড় করবে, মেজাজ সপ্তমে উঠবে—তখুনি তাকে মাটিতে মিলিয়ে মিশিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে মনে জাগবে।

ইচ্ছেটা জাগার সঙ্গে সঙ্গে ভুঁইফোড় অধিদেবতার মত আবির্ভূত হতে হয় আমাকে সাদামাটা পোশাকে অতিশয় নিরীহ নিপাট ভালমানুষের মতন। জঘন্য জিনিসটাকে চোখের সামনে থেকে সারিয়ে দেওয়ার নোংরা দায়িত্বটা কাঁধে তুলে নিই তৎক্ষণাৎ।

বিনিময় চাই সামান্য দক্ষিণা। অতি সামান্য। নগদ নারায়ণ। এরমধ্যে দোষ কোথায় বলুন? পেয়েও যাই।

কশাই প্রকৃতির একটা লোক কিন্তু তা বুঝল না। দক্ষিণা দেওয়া দূরে থাক—ঘাড় ধরে আমাকে ঢুকিয়ে দিল শ্রীঘরে। বেরিয়ে যখন এলাম, 'দৃষ্টিকটু' বিজনেস সেভাবে আর জমাতে পারলাম না—ব্যাপারটা বড্ড জানাজানি হয়ে গেছিল বলে।

যাক গে, পদ্ধতিটার তারিফ করছেন তো? করতেই হবে।

এরপরেই নেমে পড়ালমা নতুন এক বিজনেসে—'লেঙ্গি-মেরে খোলাই-খাওয়া-ব্যবসা।

নাম শুনেই ভড়কে গেলেন মনে হচ্ছে। দূর মশায়! এত 'লেটে' বোঝেন কেন? ধরুন, অমুক ব্যক্তির পা মাড়িয়ে দিলাম ইচ্ছে করে। তিনি হাতুড়ি-ঘুসি ঝাড়লেন আমার নাকের ওপর। রক্তঝরা নাক নিয়ে চলে গেলাম উকিলের কাছে। খেসারৎ দাবি করলাম হাজার ডলার—রফা করে পাওয়া যাবে পাঁচশ। উকিলকে দক্ষিণা দিয়ে যা থেকে যাবে তা কম নয় নিশ্চয়।

অথবা, আগে থেকে চিনে রাখলাম মারকুটে এক খানদানি ছোঁড়াকে ডাইরিতে লিখে রাখলাম তার নামাধাম—আমার পদ্ধতিই যে তাই, তারপর তার পেছন নিয়ে গেলাম থিয়েটারে। দেখলাম, সে ওপরের 'বক্সে' বসে আছে দু'পাশে দুই তরুণীকে নিয়ে। একজন থমথমে, আর একজন লিকলিকে। নিচ থেকে 'অপেরা-গ্লাস' ঘুরিয়ে বারেবারে তাকাতে লাগলাম থসথসে তরুণীর দিকে। মুখ লাল হয়ে গেল তার। ঘাড় বেঁকিয়ে ফিসফিস করে নালিশ ঠুকলো মারকুটে ছোঁড়ার কাছে। খুশি হয়ে উঠে গেলাম 'বক্সে'। নাম বাড়িয়ে ধরলাম ছোকরার ডান মুঠোর কাছে, সে ফিরও তাকালো না—যেন আমি কীটনানুকীট। এবার জোরে নাসক ঝেড়ে, নাম ঘষে দিলাম হাতে। হাত সরিয়ে নিল ছোকরা। এবার দিলাম মোক্ষম দাওয়াই। চোখ টিপলাম লিকলিকে তরুণীকে লক্ষ্য করে।

আর যায় কোথা! মারকুটে ছোকরা আমার কলার খামচে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল একতলায়। ঘাড়ের হাড় খুলে গেল, ডানপায়ের হাড় ভেঙে গেল।

অত্যন্ত সন্তোষজনক ফললাভ করে লেংচে লেংচে ফিরলাম বাসায়। মনের আনন্দে পুরো এক বোতল শ্যাম্পেন ঢাললাম গলায়, পরেরদিনই পাঁচ হাজার ডলারের খেসারৎ ছুটে দিলাম উকিল মারফৎ।

প্রতিটা ঘটনা খুঁটিয়ে লিখে রেখেছি ডাইরিতে। কত খরচ হয়েছে আর কত লাভ হবে তার কড়ায়গণ্ডায় হিসেব পর্যন্ত। পদ্ধতি আমার প্রাণ পদ্ধতি আমার ব্যবসার আত্মা—ভুলচুক হবার নয়।

এই ডাইরিতেই লেখা আছে, যতটা খেসারৎ আশা করেছিলেন—প্রতিক্ষেত্রেই পেয়েছি তার চেয়ে অনেক কম। যেমন, যে পাষণ্ড আমার নাক ভেঙেছিল—সে দিয়েছে মোটে পঞ্চাশ সেন্ট। যে রাস্কেল ভেঙেছে আমার কাঁধ আর পা—সে দিয়ে পাঁচ ডলার—চার ডলার পঁচিশ সেন্ট খরচ করেছি নতুন একটা সুট কিনতে—নেট লাভ পঁচাত্তর সেন্ট। মন্দ কী?

এই ব্যবসা নির্বিবাদে বেশ কিছুদিন চালিয়ে যাওয়ার পর একটাই ব্যাপারে অসুবিধে দেখা দিয়েছিল। মারের চোটে আমার খোল-নলচে একটু করে পালটে যাচ্ছিল। এ আমি আর এক আমি হয়ে যাচ্ছিলাম নিছক বাইরের পরিবর্তন। লোকে তাই চিনতে পারছিল না। তাই একদিন অনেক ভেবেচিন্তে মাথার উপ-মস্তিষ্ক থেকে বের করলাম নতুন এক বিজনেসের আইডিয়া—অভিনব পদ্ধতিও জন্ম নিল তৎক্ষণাৎ—এই সুযোগে তাই আর একবার কৃতজ্ঞতা জানাই দয়াময়ী সেই নাম মহিলাকে— কচি অবস্থাতেই যে আমার মাথা ঠুকে দিয়ে পদ্ধতি মাস্টার বানিয়ে দিয়ে গেছে। মরণকালে তাকে আমি স্মরণ করবই—উইলে কিছু দিয়েও যাব।

এবার আমি আমার নয়া ব্যবসার কাহিনীতে। না, মধ্যেও কোন ছক নেই। ছকে বাঁধা ব্যবসা এই শর্মা কখনো করেন না।

নতুন এই ব্যবসার নাম দিয়েছিলেন 'কাদা-মাখানো' ব্যবসা। লক্কাপায়রা টাইপের ফকোবাবুদের গায়ে একটু কাদা ছুঁইয়ে দেওয়ার ভড়কি দিয়ে মাথাপিছু ছপেনি আদায়? খুচরো ব্যবসা নিঃসন্দেহে। কিন্তু মোটের ওপর আয় কম হচ্ছিল না। দাঁড়িয়ে থাকতাম চৌমাথায়—যেখানে আশেপাশে বিস্তর ঝলমলে দোকানে আর ব্যাঙ্ক। কাছেই দেখে রাখতাম একটা কাদা পুকুর। লেখানো-পড়ানো একটা লোমশ কুকুর থাকত একটু দূরে। দোকান বা ব্যাঙ্ক থেকে ফুলবাবু বেরলেই ইসারা করতাম কুকুরকে। চট করে কাদাপুকুরে ডুব দিয়ে সে চলে আসত ফুলবাবুর সামনে—পটরপটর করে কাদা ছিটিয়ে কাছাকাছি এলেই আঁৎকে উঠে আশেপাশে লাঠিসোঁটা সন্ধান করত ফুলবাবু।

অকুস্থলে তক্ষুণি হাজির হতাম আমি। আমার এক হাতে থাকত লাঠি আর এক হাতে বুরুশ। তেড়ে যেতাম কর্দমাক্ত কুকুরকে লক্ষ্য করে। সে ভাগলবা হলেই তৎক্ষণাৎ আমি আদায় করে নিতাম আমার দক্ষিণা।

ব্যবসাটা চলছিল ভালই। ছ পেনির অর্ধেক খরচ করে খাবার কিনে দিতাম কুকুর স্যাঙাৎকে। তার বেশি দাবি করাটা তার অন্যায় হয়েছে। পদ্ধতি আমার

অর্ধেক ভাগ আমি পাব না? তিতিবিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিলাম এই ব্যবসা।
প্রায় এই ধরনের আর একটা ব্যবসা করেছিলাম ঠিক তার আগে। এক্ষেত্রে চৌমাথা ছিল কর্মস্থল। হাতে থাকত ঝাঁটা। কাছেই কাদা পুকুরের বদলে থাকত একটা জলপুকুর। ঝাঁট দিতে দিতে ফুলবাবু দেখলেই ধুলোকাদা ছিটিয়ে দিতাম সাদা পাৎলুনে—নিজেই পুকুর থেকে জল এনে ধুইয়ে দিতাম—বিনিময়ে বখশিস নিতামমাত্র এক পেনি। ব্যবসা চলছিল ভালই—আমি পাকড়াও করতাম ব্যাঙ্কেরবাবুদের। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলো একে একে লাটে ওঠায় লাটে উঠল আমার ব্যবসাও। ব্যাঙ্কের প্রতারণা লালবাতি জ্বালিয়ে ছাড়ল আমার সৎ ব্যবসায়ে।
'জগঝম্প বাজনা' ব্যবসাটার মধ্যে রীতিমত মৌলিক পদ্ধতির প্রকাশ ঘটিয়েছিলাম। জলের দরে ভাঙা বাদ্যযন্ত্র কেনা যায়, নিশ্চয় জানেন। এই দুনিয়ার সমস্ত সুর আর বেসুর তা থেকে বেরয়। আমিও একটা কিনেছিলাম 'বাজনার কারখানা'। কেনবার পর হাতুড়ি মেরে ঠুকঠুকে আরও বারোটা বাজিয়েছিলাম যাতে গমকের ঠেলায় শ্রোতার গঙ্গালাভ ঘটে ঝট করে। তারপর সেই আজব 'বাজনা-কারখানা' ঘাড়ে নিয়ে যেতাম শহরের খুব নিরিবিলি জায়গায় যেখানে শুধু শান্তি, শান্তি, শান্তি। ঘাড় থেকে নামাতাম কলের গান। বাজাতাম পুরো দমে, অতিশয় নিবিষ্টমনে, যেন মোহিত হয়ে গেছি পুরোমাত্রায় এবং বাজনা থামাব না ব্রহ্মাণ্ডের শেষ মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত। অচিরেই খুলে যেত একটা না একটা জানলা—নিক্ষিপ্ত হতো সামান্য কিছু মুদ্রা—সেই সঙ্গে ভর্ৎসনা—'বিদেয় হও।'
আমি পত্রপাঠ বিদেয় হতাম। গানের ইন্দ্রজাল রচনা করতাম আর এক জায়গায়।
চলছিল ভালই। কিন্তু হাতছাড়া এই আমেরিকার শহরগুলোয় যে অনুপাতে বাঁদরের অভাব, সেই অনুপাতে বজ্জাৎ ছোকরার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে বড্ড বেশি। একটা বাঁদরও যদি সঙ্গে থাকত....।
যাই হোক, আমার সপ্তম ব্যবসাতেও চৌকস পদ্ধতি লাগিয়েছিলাম বলেই তো শহর জোড়া নাম কিনে ফেলেছিলাম। নাম অবশ্য অনেকরকমের সবগুলোই রহস্যময় কখনো টম ডবসন, কখনো ববি টমকিন—এক এক নামে এক একখানা চিঠি লিখতাম—সবই আগড়ুম-বাগড়ুম অর্থহীন প্রলাপোক্তি—যা পড়লেই গা ছমছম করবে অথবা অকারণ উত্তেজনায় মাথার চুল।
খাড়া হয়ে থাকবে। তারপর পরম নিষ্ঠার সঙ্গে চিঠিগুলোকে খামে ভরতাম। বিশেষ বিশেষ বাড়ির সামনে লাগানো নেমপ্লেট দেখে নামধাম লিখতাম, হন্তদন্ত হয়ে চিঠির তাড়া নিয়ে সেই সেই বাড়ি গিয়ে চিঠি বিলি করতাম। উপযুক্ত ডাকটিকিট লাগানো নেই বলে ডবল ডাকখরচ আদায় করতাম— দিতে কার্পণ্য করত না। কেউই। তারপর অবশ্য চিঠি পড়ে মাথায় হাত দিয়ে বসত, ভয়ে মরত, অথবা মূর্চ্ছা যেত। গোটা শহরে যখন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল এবং টম ডবসন অথবা ববি টমকিনকে দেখলেই ক্যাক ধরে ধরবার জল্পনাকল্পনা শুরু হয়ে

গেল—তখন ভাল ভালয় সাধের এই ব্যবসাও পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় মনে করলাম, বলতে ভুলে গেছি, রহস্যময়, এই ব্যবসার নাম দিয়েছিলাম অবধর—'জাল ডাকঘর!'

অষ্টম ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছি এখনও। আছি তোফা। নাম দিয়েছিল 'বেড়াল আইন'। বুঝলেন? শহরে বেড়াল এত বেড়ে গেছে যে শহরের কর্তারা আইন করেছেন—একটা করে বেড়াল ধরে আনো—নিয়ে যাও চারটে করে পেনি। গোটা বেড়াল নয়—শুধু মাথাটা আনলেই চলবে। তারপরেই আইন শোধরানো হয়েছে—মাথা নয়, শুধু ল্যাজ আনলেই চলবে।

এক-একখানা ল্যাজের জন্যে চার-চারটে পেনি! কম কথা? আমি এখন রাজ্যের বেড়াল জুটিয়েছি আমার আস্তানায়। প্রথমে খুব সস্তান খাওয়া খাইয়েছি—শুধু ইঁদুর। ল্যাজ ভালই হচ্ছে দেখে রাজসিক খানার ব্যবস্থা করেছি গেঁড়ি, গুগলি, শামুক—এইসব। মাথা খাটিয়ে একটা ল্যাজকে বছরে তিন চারবার কেটে চালান দিচ্ছি একটু খরচ অবশ্য বেড়েছে। 'ম্যাকাসার' নামক কেশ তৈল কিনতে সামান্য খরচ হচ্ছে। কিন্তু তেলের মহিমা নিশ্চয় বেড়ালরাও বুঝেছে। একই ল্যাজ তিন চারবার কাটা গেলে আর আপত্তি করছে না—বিলক্ষণ সইয়ে নিয়েছে— তিনচারবার না কাটলেই বরং মিঞাও মিঞাও করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

ব্যবসা এখন জমাট। হাডসন নদীর পাড়ে জায়গা জমি কেনার জন্যে দালাল লাগিয়েছি। □

রহস্যময়তা

[মিসটিফিকেশন]

ব্যারন রিজনার ফন ইয়ুং-এর আবির্ভাব খানদানি হাঙ্গেরিয়ান পরিবারে। এ পরিবারের প্রায় সকলেই কিছু না কিছু কিম্ভূত প্রকৃতির। বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গেলে আরও আশ্চর্য বৃত্তান্ত জানা যেত। কিন্তু সুদূর অতীতের ঊর্ধ্বতন পুরুষদের হাঁড়ির খবর জোগাড় করা সম্ভব হয়নি।

আমার সঙ্গে ব্যারন সাহেবের আলাপ হয়েছিল অতি-জমকাল একটা প্রাসাদে—বিশেষ একটা অ্যাডভেঞ্চার উপলক্ষে—সে অ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চ-কাহিনী জনসমক্ষে হাজির করা সম্ভব নয়।

সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল, ১৮—খ্রিস্টাব্দ। ব্যারন সাহেবের দৌলতেই এই প্রাসাদে পা দেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি মনের আগল খুলেছিলেন বলেই তাঁর মনের ভেতর পর্যন্ত দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিন বছর ছাড়াছাড়ির পর আবার যখন তাঁর সান্নিধ্য ফিরে পেলাম—তখন আমাদের অন্তরঙ্গতা হলো নিবিড়তর এবং খুঁটিয়ে বুঝলাম তাঁর চরিত্র।

জুন মাসের পঁচিশ তারিখটা আমার মনে গেঁথে রয়েছে। রাত হয়েছে। কলেজ ভবনে উনি এসেছেন, এই খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই উত্তেজনায় প্রায় নেচে উঠেছিল প্রতিটি মানুষ। প্রত্যেকেরই মুখে সোচ্চারে ধ্বনিত হয়েছিল একটাই

মন্তব্য : 'এই বিশ্বে এমন অসাধারণ পুরুষ আর দুটি নেই'। স্পষ্ট মনে আছে এতবড় একটা প্রশংসো-বাক্যের বিরুদ্ধে ট্যাঁফুঁ পর্যন্ত কেউ করেনি। উনি যে একমেবাদ্বিতীয়ম—এটা যেমন অনস্বীকার্য, ঠিক তেমনি এহেন সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধাচরণ করাটাও রীতিমত ধৃষ্টতা—এটাও হাড়ে হাড়ে সবাই বুঝে গেছিল।

কিন্তু আপাতত সে প্রসঙ্গ শিকেয় তুলে রাখছি। শুধু এই টুকুই বলব যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দিতে পদার্পণ করা মুহূর্তটা থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি মানুষের ওপর তাঁর প্রভাব বিস্তার শুরু হয়ে গেছিল। আরও খুলে বললে প্রতিটি মানুষের আচার ব্যবহার, অভ্যেস, টাকাপয়সা আর প্রবণতার ওপর তাঁর তদ্বির তদারকিতে তিলমাত্র কার্পণ্য তিনি দেখাননি। যাঁরা তাঁকে ঘিরে ধরেছে, তারাই পড়েছে তাঁর এই সুদূরপ্রসারী প্রভাবের আওতায়—অথচ এই প্রভাব খাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজটাকে কোনও একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাচ্ছেন বলে যেমন মনে হয়নি—ঠিক তেমনি প্রাপ্তিযোগের আশায়, হিসেবের কড়িক্রান্তি মাথার মধ্যে রেখে, প্রভাব বিস্তার করে চলেছেন—এটাও মনে হয়নি।

তাই শুধু বলা যায়, যে, কটা দিন উনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় ছিলেন, ইতিহাস রচনা করে গেছেন। একটা চিত্রময় অধ্যায় সৃষ্টি করে গেছেন। 'ব্যারন রিজনার কন ইয়ুং'-এর যুগ নামে তা চিরকাল জ্বলজ্বল করবে গুণগ্রাহীদের অন্তরে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শুভাগমন করেই উনি আমাকে ধরে নিয়ে গেছিলেন ওঁর থাকবার ঘরে। তাঁর অবয়ব দেখে ধরা মুশকিল বয়স তাঁর কত। সঠিক বলা না গেলেও আন্দাজি করতে তো বাধা নেই। সেই আন্দাজ হিসেবটাও মাথা ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কমের দিকে যদি হয় একুশ বছর সাত মাস তো বেশির দিকে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন।

সুন্দরকান্তি মনোহর পুরুষ তাঁকে বলা যায় না কিছুতেই—বরং বিপরীত। গোটা মুখখানায় মোটামোটা হাড়, মাংস কম, রূঢ়, কর্কশ, সুউন্নত ললাট ময়দানের মতন প্রশস্ত। নাক ভোঁতা। চোখ অতিকায়, কাঁচের মতন স্বচ্ছ; চাহনি অর্থহীন এবং মনের ওপর লোহার মতন চেপে বসে।

তবে হ্যাঁ, চেয়ে চেয়ে দেখা যায় বটে তাঁর ঠোঁটের বাহার। ঠেলে বেরিয়ে থাকা বলতে যা বোঝায়—তাঁর ঠোঁট দুটো অক্ষরে অক্ষরে তাই। খুব দৃষ্টিকটুভাবে না হলেও, মোলায়েমভাবে তো বটেই। কার্নিশের মতন বেরিয়ে এসে একটা ঠোঁট চেপে বসে রয়েছে আর একটা ঠোঁটের ওপর।

ফলে, মানুষটা উৎকট গম্ভীর না মৌনী না স্বল্পবাক—কিছুই চুলচেরাভাবে আঁচ করা যায় না। যত হেঁয়ালি ওই মুখ বিবরেই।

এই পর্যন্ত পড়ে পাঠক নিশ্চয় বুঝে নিয়েছেন, ব্যারন ব্যক্তিটি এই জগতের যাবতীয় অনিয়মের সমন্বয়ে গঠিত। চিরাচরিত বা গতানুগতিকতার নিয়মতন্ত্র ওঁর ধাতে নেই। ওঁর পাণ্ডিত্য আর চর্চা 'রহস্যময়তা' নামক অতীব দুর্ঘট একটা একটা বিষয় নিয়ে। সেখানেও উনি থেমে থাকেননি, পুঁথির বিদ্যে আর মনের চিন্তাকে একই রথের বাহন বানিয়ে গড়ে তুলেছেন নিজের অনবদ্য জীবিকা।

এই বিজ্ঞানের পরম সহায় হয়েছে তাঁর মনের বিচিত্র গড়ন। মন মত্ত তার নিজের খেলায়—ফলে, 'রহস্যময়তা' নামক বিজ্ঞানের অলিগলিও সুস্পষ্ট তাঁর কাছে। হাতে হাত মিলিয়েছে তাঁর অসাধারণ অবয়বের অতি-আশ্চর্য বৈশিষ্ট্যগুলো। বিজ্ঞানটাকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে যুগলবন্দী হয়েছে দেহ এবং মন। বাজি রেখে বলতে পারি, 'ব্যারন রিজনার ফন ইয়ুং'- যুগে তিনি যে বিপুল রহস্যময়তা রচনা করেছিলেন নিজেকে ঘিরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও মক্কেলই সেই রহস্যময়তার আবরণ ভেদ করে তাঁর অনন্য চরিত্রের নাগাল ধরতে পারেনি—চরিত্রের অন্দরে প্রবেশ করা তো দূরের কথা।

আমি ছাড়া।

আরও একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার। তাঁর চরিত্রের একটা প্রায়-অদৃশ্য দিক।

ব্যারন রিজনার ফন ইয়ুং যে ঠাট্টাতামাসায় বিলক্ষণ পারঙ্গম, বিরল এই গুণটির তিনি যে বিশেষ অধিকারী—ইউনিভার্সিটির কোনও ছাত্র তা কল্পনাতেও আনতে পারেনি।

আমি ছাড়া।

একমাত্র আমিই জেনেছি, তাঁর এই পরিহাসপ্রিয়তা শুধু কথার বেড়াজালেই বন্দী থাকেনি—গাড়োয়ানি ইয়ার্কিতেও পর্যবসিত হতে পারে।

আরও বলে রাখি, বাগানের ফটকের বুলডগ কুকুরটা পর্যন্ত ব্যারনকে চিনতে পারেনি অন্তত এই একটি ব্যাপারে।

তাঁর পরিবারের কেউও ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি সদাগম্ভীর সদামৌনী সদাস্বল্পবাক ব্যারন সাহেব মধ্যেমধ্যে হাস্যকর চরিত্রেও অবতীর্ণ হতে পারেন।

এই যে চরিত্র-গুপ্তি—এটাই ব্যারন সাহেবের 'রহস্যময়তা' বিজ্ঞানের মন্ত্রগুপ্তি—এটাই তাঁর শিল্প-কৌশল।

ব্যারনের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে অবশ্য দৈত্যদানবের নৃত্য চলেছিল বললেও চলে। খানাপিনা আর মজা মারার বাইরে আর কিছুরই চর্চা ছিল না বৃহৎ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ঘরে ঘরে বসে গেছিল শুঁড়িখানা—প্রতিটি ছাত্রের ঘরে। সবচেয়ে বড় আড্ডাটা ছিল ব্যারন সাহেবের ঘরে। সেখানেই আমরা দলে দলে জড়ো হতাম, হই-হল্লোড় করতাম। দীর্ঘ সময় অতি-বিচিত্র ঘটনাসমূহে নিজেদের নিমজ্জিত রাখতাম।

এই রকমই আড্ডার আসরে সন্ধে গড়িয়ে এলেও মদ্য পরিবেশন অব্যাহত হয়নি—বরং মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যারন ছিলেন সেই আড্ডায়—আর ছিলাম আমরা জনা সাত-আট। প্রত্যেকেই বড় ঘরের ছেলে, ছোটখাট কুবের, বিপুল ফ্যামিলি-গৌরবের অধিকারী এবং আত্মমর্যাদা বিষয়ে একটু বেশি মাত্রায় সচেতন। অসি যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা যখন তুঙ্গে উঠেছে—তখন মুখ খুললেন ব্যারন। উপস্থিত ছাত্রদের সবাই তলোয়ার দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরম উৎসাহী। আমি কিন্তু জানতাম, ব্যারন সাহেব এই জিনিসটাকে

ঘৃণার চোখে দেখেন। এতক্ষণ তিনি তাঁর মার্কামারা ঠোঁট টিপেই বসেছিলেন। রাত বাড়তেই মুখ খুললেন এবং অপূর্ব বাচনভঙ্গি দিয়ে আড্ডা মাতিয়ে দিলেন।

অবাক কাণ্ড, যা কিছু বললেন, সবই তরবারি দ্বন্দ্বযুদ্ধের মহিমাকীর্তন বিষয়ক।

অসি যুদ্ধের সৌন্দর্য, অসি যুদ্ধের উপকার শ্রবণ করতে করতে উৎসাহে স্ফীত হয়ে উঠেছিল শ্রোতারা।

একজন ছাড়া।

ব্যারন যেন কোলরিজের কবিতা আউড়ে যাচ্ছিলেন শ্রুতিসুখকর ছন্দে—সভার সকলেই তা শুনে উদ্বেলিত হলেও এই একটি ব্যক্তির মুখে দেখলাম অন্য ভাবের প্রকাশ।

ভদ্রলোকটির নাম—ধরা যাক, হারমান। অন্য সব ব্যাপারেই তিনি মৌলিক—একটি বিষয়ে ছাড়া'

সে বিষয়টি তাঁর সীমাহীন মূর্খতা।

এক কথায়, তিনি একটি আস্ত গর্দভ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে যদিও তিনি দার্শনিক চিন্তার অধিকারী হিসেবে নাম কিনেছেন—আমার মতে—সেটা অকারণে নয়, আজব দর্শনের ছিটেফোঁটা তার বুদ্ধির ঘটে নিশ্চয় আছে। অসি যোদ্ধা হিসেবেও বিলক্ষণ নাম করেছেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দিতে এসেও। ক'জনকে স্বহস্তে নিধন করেছেন, সঠিক হিসেবটা মনে করতে আমি অক্ষম, সংখ্যাটা নগণ্য নয়—বিস্তর—এইটুকুই শুধু বলতে পারি।

তবে হ্যাঁ, লোকটার বুকের পাটা আছে বটে। কিন্তু যত বড়াই, তা অসিযুদ্ধ প্রসঙ্গেই। ডুয়েল লড়ার সহবৎ আর নিজের আত্মসম্মানের প্রখরতা—এই দুটি বিষয়ে জ্ঞান তাঁর টনটনে। এই দুই 'হবি'-র দুই বাহনে চেপে তিনি টগবগিয়ে মৃত্যুর কোলেও লক্ষ দিতে প্রস্তুত।

অদ্ভুত এই ব্যক্তির এহেন কিম্ভূত শখ দীর্ঘদিন ধরেই ব্যারন সাহেবের মনের খেলায় ইন্ধন জুগিয়েছে। তাঁর 'রহস্যময়তা' নামক বিজ্ঞান উৎসুক হয়েই ছিল। সেদিনের সেই আড্ডায় এই বিজ্ঞানই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল নিশ্চয়—নইলে অমনভাবে বচনমালার আগল খুলে দেবেন কেন।

সবটাই আমার অনুমান। ব্যারনের মনের গোলকধাঁধায় প্রবেশ করা আমার অসাধ্য। তবে তাঁর চাপা ঠোঁটের ঈষৎ বিকৃতি দেখেই কেন জানি আমার মনে হয়েছিল—মুখ ছুটিয়েছেন তিনি হারমান-কে চাঁদমারি বানিয়ে।

ব্যারন সাহেব যেই তাঁর একতরফা জ্ঞানদান পর্ব শুরু করলেন, আমি লক্ষ্য করলাম হারমান একটু একটু করে উত্তেজিত হচ্ছে। যেই বিশেষ একটা পয়েন্টে চাপ দিলেন, অমনি প্রতিবাদে মুখর হলো হারম্যান। বিস্তার করে ধরল নিজের যুক্তি জাল। জবাব দিলেন ব্যারন—একইরকম সেন্টিমেন্টকে অব্যাহত রেখে—অর্থাৎ ডুয়েল লড়াইয়ের জয়গান অক্ষুণ্ণ রেখে—কিন্তু শেষ করলেন বিদ্রূপ আর ব্যঙ্গের হাওয়া দিয়ে—যা তাঁর পক্ষে নিতান্তই বদরুচির অভিব্যক্তি

বলে মনে হয়েছিল আমার কাছে।

আর ঠিক এই খোঁচাটাকেই যেন দাঁত দিয়ে লুফে নিল হারমানের 'হবি'। শুরু হয়ে গেল লোমহর্ষক বচন-প্রদর্ভঞ্জন। কথার তুফান। চোখা চোখা শব্দ। চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ। শেষ কথাটা আজও পরিষ্কার মনে পড়ছে : 'ব্যারন ফন ইয়ুং, আপনার শেষ মন্তব্যটা আপনার সুনামের হানিকর, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ডোবাবার পক্ষে যথেষ্ট। হাস্যকর এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করাটাও আহাম্মুকি। অপরাধ নেবেন না (এইখানে অমায়িক হাসি ঝরিয়েছিল হারমান), কিন্তু না বলেও পারছি না—কোনও ভদ্রলোকের মুখ থেকে এমন মন্তব্য আশা করা যায় না।'

হারমানের এই শেষ কথাটার মানে দুটো। দুটো অর্থই স্পষ্ট। দুটোই সমান অপমানব্যঞ্জক। তাই কথা শেষ হতে না হতেই ঘরশুদ্ধ লোকের জোড়া জোড়া চক্ষু নিবদ্ধ হলো ব্যারন সাহেবের ওপর।

ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন ব্যারন। বিবর্ণ মুখ রক্তিম হলো পরক্ষণেই। রীতিমত লাল। হাত থেকে ফেলে দিলেন পকেট-রুমাল, হেঁট হলেন কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য, সেই সময়ে আমার নজর গেল তাঁর মুখভাবের দিকে।

আসলে উনি হেঁট হয়ে টেবিলের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ছিলেন—তাই মুখভাবের পটপরিবর্তন কেউ দেখতে পায়নি।

আমি ছাড়া।

আমি দেখলাম এবং হতভম্ব হলাম। গোটা মুখ জুড়ে আচমকা যেন ফেটে পড়ল একটা মস্ত ব্যঙ্গের বোমা।

এহেন বিস্ফোরণ তো পাঁচজনের সামনে উনি দেখান না।

হতভম্ব হলাম সেই কারণেই। যখন নিরালায় থাকি ওঁর সঙ্গে—শুধু তখনই দেখেছি তাঁর মুখের বিচিত্র এই চলচ্ছবি। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, পরিহাস, উপহাসের দ্রুতপরম্পরা সিনেমা। অন্য সময়ে তাঁর নির্ভাস মুখাবয়বে এমন ছবি তো ফোটে না।

চরিত্রবিরুদ্ধ এহেন মুখচ্ছবি দেখা গেল ঝলকের জন্যে।

পরমুহূর্তেই উনি সিধে হয়ে দাঁড়ালেন।

এখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই বাক্য-যোদ্ধা। ব্যারন সাহেবের মুখের পরতে পরতে অনতিপূর্বে যে বিচিত্র উপহাসের বিস্ফোরণ দেখেছিলাম—এখন তার তিলমাত্রও অবশিষ্ট নেই। নিমেষ মধ্যে মুখ ফিরে পেয়েছে স্বাভাবিক অবস্থা—যে মুখ দেখে মনের খবর জানবার ক্ষমতা স্বয়ং দেবতারও নেই।

এইটুকু সময়ের মধ্যে মুখের ভাব কি এইভাবে পালটে যেতে পারে? ভুল দেখিনি তো? এখন দিব্বি স্বাভাবিক—চাপা আবেগে একটু যা ফুঁসছেন। মুখও মড়ার মুখের মতন সাদা।

নীরব রইলেন স্বল্পক্ষণ—যেন পাগলা আবেগের লাগাম টেনে সামাল দিচ্ছেন।

সামনে নেওয়ার পর হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন একটা সুরাপাত্র।

শক্ত মুঠোয় ধরে যা বলে গেলেন, তা এই :

"শ্রীযুক্ত হারমান, আপনার ভাষা অতীব আপত্তিজনক। আমার মেজাজ আর সময়জ্ঞান সম্পর্কে আপনার টিপ্পনী অতিশয় অপমানজনক, আমার মন্তব্য ভদ্রলোকজনোচিত নয়—আপনার এহেন মন্তব্য সরাসরি আঘাত হেনেছে আমার মর্যাদাবোধে। এরপর একটাই কাজ করা উচিত আমার। কিন্তু যেহেতু আপনি আমার অতিথি—এই ঘরে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও আমার অতিথি—তাই কিঞ্চিৎ সৌজন্য আর শিষ্টতা প্রদর্শন না করলেই নয়। আত্মসম্মানে আঘাত লাগলে অন্য ভদ্রব্যক্তিরা যা করতেন—এই মুহূর্তে সেই আচরণ আমি দেখাতে পারছি না বলে ক্ষমা করবেন। আপনার কল্পনাশক্তির ওপর সামান্য চাপসৃষ্টি করতে বাধ্য হচ্ছি বলে কিছু মনে করবেন না—আয়নায় ওই যে আপনার প্রতিচ্ছবি ভাসছে—মনে করে নিন, ওটা প্রতিচ্ছবি নয়—আপনি স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছেন দর্পণের মধ্যে। এইটুকু কষ্টস্বীকার করলেই জানবেন আমার কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। এবার তাহলে অবশিষ্ট কর্মটুকু সাঙ্গ করা যাক। আপনার রক্তমাংসময় শ্রীঅঙ্গে আঘাত হেনে অপমানের বদলা নেওয়ার পরিবর্তে সুরাপাত্রের সুরা আছড়ে ফেলা যাক আপনার মুকুরময় প্রতিবিম্বর ওপর।"

কথা শেষ করেই সুরাপাত্র নিক্ষেপ করলেন ব্যারন সাহেব। আয়নাটা ঝুলছিল হারমানের ঠিক সামনে। নির্ভুল লক্ষ্যে সুরাপাত্র ধেয়ে গেল সেই দিকে—আছড়ে পড়ল প্রতিবিম্বর ওপর।

নিমেষে খান খান হয়ে ছড়িয়ে গেল কাঁচের টুকরো। গড়িয়ে গেল সুরার স্রোত।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে খালি হয়ে গেল ঘর—আমি আর ব্যারন ছাড়া।

হারমান যখন চৌকাঠ পেরচ্ছে, ইঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করতে বললেন ব্যারন। ফিস ফিস করে বললেন, হারমানের সাহায্যে আসার জন্যে আমার উচিত তার সঙ্গে থাকার।

অদ্ভুত এই উপদেশের মাথামুণ্ড না বুঝলেও তা তামিল করলাম তৎক্ষণাৎ। হারমানের ল্যাজ ধরে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

আমি দ্বন্দ্বযোদ্ধা হারমান লুফে নিয়েছিল আমার প্রস্তাব—দ্বন্দ্বযুদ্ধে সহযোগিতা করার জন্যে পেছন পেছন ছুটে এসেছি শুনেই আমাকে সাড়ম্বরে নিয়ে গেল নিজের বাসকক্ষে। মদের পাত্র ছুঁড়ে আয়না গুঁড়িয়ে, প্রতিবিম্বকে মদে স্নান করিয়ে যে ধরনের অপমানটা এক্ষুনি করলেন ব্যারন, তা নাকি রুচি আর সংস্কৃতির দিক থেকে বিলকুল অনন্য—গম্ভীর বদনে এই ব্যাখ্যা যখন শোনাচ্ছিল হারমান—তখন যে কি কষ্টে হাসি গোপন করেছিলাম আমি—তা শুধু ঈশ্বর জানেন আর আমি জানি। কিন্তু যত সূক্ষ্ম আর মার্জিত হোক, অপমান

তো বটে—সুতরাং তা হজম করার মতন পাকযন্ত্র নেই হারমানের। এই ধরনের আত্মম্ভরিতা কিছুক্ষণ শোনানোর পর গটগট করে এগিয়ে গিয়ে বইয়ের তাক থেকে একখানা ধূলিমলিন কেতাব টেনে নামাল অপমানাহত হারমান। সবকটা বই-ই অসি-দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সংক্রান্ত। প্রতিটি বই থেকে স্থান বিশেষ পড়ে শোনাল উচ্চকণ্ঠে—ধৈর্য সহকারে শুনতে হলো ব্যাখ্যা। খানকয়েক বইয়ের নাম আজও মনে আছে—কিন্তু তা লিখে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। শেষকালে শুনতে হয়েছিল একখানা ইয়া মোটা বইয়ের পুরো একটা পরিচ্ছেদ। বইটার লেখক এক ফরাসি—হেলেডিন তাঁর নাম—লিখেছেন কিন্তু অখাদ্য ল্যাটিন ভাষায়। হারমান গড় গড় করে পড়ে গেল বটে—বিন্দুবিসর্গ বুঝলাম না আমি। পড়বার পর বই মুড়ে রেখে গম্ভীর ভাষায় জানতে চাইল, যেহেতু এই বইয়ে বর্ণিত অদ্ভুত আবেগের অধিকারী হারমান নিজেও, এমতাবস্থায় তার কি করা উচিত বলে আমি মনে করি?

আমি সঙ্গে সঙ্গে 'ডিটো' মেরে গেলাম তার প্রতিটি কথায়। সত্যিই তো, তার মতো অদ্ভুত সেন্টিমেন্টের অধিকারী ভদ্রজনের পক্ষে এবম্বিধ লাঞ্ছনা বরদাস্ত করা কি সমীচীন?

প্রশংসাবাক্যে বিলক্ষণ আপ্লুত হয়ে তৎক্ষণাৎ কাগজকলম টেনে নিয়ে ব্যারনসাহেবকে একটা চিরকুট লিখে ফেলল হারমান। চিরকুটটা এই :

"মহাশয়,—এই চিরকুট পাঠাচ্ছি আমার পরম মিত্র শ্রীযুক্ত এম· পি· মারফৎ। আজ সন্ধ্যায় আপনার ঘরে যে ঘটনা ঘটেছে, অবিলম্বে তার বিশদ ব্যাখ্যা জানতে চাই। যদি তাতে অরাজী থাকেন, তাহলে আমার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হোন এবং সেটা কবে, কখন হবে—আমার এই সুহৃদ মারফৎ তা জানিয়ে দিন।

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর,

"আপনার বশংবদ সেবক
"জোহান হারমান"

"প্রতি : ব্যারন রিজনার ফন ইয়ুং,
অগাস্ট ১৮, ১৮—।"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে লিপি বগলে দৌড়োলাম ব্যারনে বাসকক্ষে। বিনম্র অভিবাদন জানিয়ে বার্তা গ্রহণ করলেন তিনি, পড়লেন এবং অতিশয় গম্ভীরমুখে আমাকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন। শিষ্টাচার সমাপনান্তে উনি রচনা করলেন পত্রোত্তর—আমি তা বহন করে নিয়ে গেলাম হারমান-কক্ষে।

মহাশয়,— আমাদের উভয়ের মিত্র শ্রীযুক্ত এম· পি· মারফৎ আপনার লিপিকা পেলাম অদ্য সন্ধ্যায়। যথাবিহিত চিন্তাশক্তি ব্যয়ের পর অকপটে জানাতে চাই, ব্যাখ্যা দাবী করার যোগ্যতা আপনার নেই। কিন্তু যেহেতু অতীব মার্জিত পন্থায়

আমাদের বাক্য সংঘর্ষ ঘটেছে এবং অতিশয় সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে আমার মনোভাব আমি ব্যক্ত করেছি—অতএব এই ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়ে আমার যৎসামান্য আলোকপাত করা দরকার—যা ক্ষমাভিক্ষা করার নামান্তর বলা যেতে পারে। আদবকায়দার নিয়মকানুন আমি বড় বেশি মেনে চলি—এই বিষয়টিতে আমার আস্থা অপরিসীম—আপনার বৈদগ্ধ সমপরিমাণ। তাই আমার ভাবাবেগের স্ফুরণ ঘটানোর পরিবর্তে সবিনয়ে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি সিনর হেলেডিন লিখিত গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদে। যে ব্যাখ্যা অন্বেষণ করেছেন আপনি মদীয় লেখনী মারফৎ—তা অচিরে পেয়ে যাবেন উপরোক্ত লেখকের লেখনীজাত পরিচ্ছেদে।

'যথাবিহিত সুগভীর সম্মানপুরঃসর,

'আপনার একান্ত বিনীত সেবক,

"ফন ইয়ুং"

"শ্রীযুক্ত জোহান হারমান,
আগস্ট ১৮, ১৮—।"

ভুরু এবং ললাট কুঁচকে পত্রের বয়ান পাঠ করেছিল হারমান। পড়া সাঙ্গ হওয়ার পর অসীম আত্মপ্রসাদের নৃত্য দেখেছিলাম তার ভুরু আর ললাটে—তিরোহিত হয়েছিল কুঞ্চনরেখা। অমায়িক হেসে আমাকে বসতে বলে টেনে নামিয়েছিল সিনর হেলেডিন-এর লেখা বইখানা, খুলে ধরেছিল নবম পরিচ্ছেদ। পড়েছিল প্রতিটি লাইন। আমাকে দিয়ে পালটা চিঠি পাঠিয়েছিল ব্যারনকে—ব্যাখ্যা নাকি অতীব সন্তোষজনক এবং সম্মানজনক হয়েছে।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে ফিরে গেছিলাম ব্যারনের কাছে। হারমানের বিনীতপত্র পড়ে নিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন ভেতরের ঘরে হেলেডিন-এর লেখা বইখানা বের করে বিশেষ একটা জায়গা পড়তে বললেন। পড়লাম বটে, কিন্তু মানে বুঝলাম না।

উনি তখন নিজেই জোরে জোরে পড়ে শোনালেন একটা পরিচ্ছেদ।

এইবার আমি আতঙ্কিত হলাম। যা শুনলাম, তা তো দুই বেবুনের মধ্যে তরবারি যুদ্ধের কাহিনী।

রহস্যটা ব্যাখ্যা করলেন তারপরেই। এই পরিচ্ছেদটা আবোলতাবোল ছন্দে লেখা অর্থহীন ছড়ায় গাঁথা হয়েছে। কানে শুনলে মনে হবে না জানি কি অর্থবহ—আসলে কোনও মানেই নেই। স্রেফ কথার মারপ্যাঁচ আর ডিগবাজি। পুরো পরিচ্ছেদটার রহস্যসূত্র এই :

প্রতি দ্বিতীয় আর তৃতীয় শব্দ ছেড়ে পড়ে যেতে হবে। তাহলেই বর্তমান যুগের অসিযুদ্ধের হাস্যকর অসারতা বোঝা যাবে।

পরে বলেছিলেন ব্যারন, ফরাসি লেখকের ল্যাটিন ভাষায় লেখা বইখানা ইচ্ছে করেই এই অ্যাডভেঞ্চারের দু'তিন হপ্তা আগে হারমানের ঘরে রেখে

এসেছিলেন উনি। আলোচনার মোড় নেওয়া লক্ষ্য করেই বুঝেছিলেন—হারমান বইখানা পড়েছে এবং পুঁথির প্রসাদ তাকে নাড়া দিয়েছে। এ-বই যে মূল্যবান তথ্যে বোঝাই—এই ধারণা তার মগজে গেঁথে গেছে।

এইটা বোঝবার পরেই তিনি খোঁচা মেরেছিলেন। অসিদ্বন্দ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে লিখিত কোনও গ্রন্থ পড়ে তার মানে বুঝতে পারেনি—বোকাপাঁঠা আর চালিয়াত চন্দর হারমান তা স্বীকার করতেই পারবে না—

ওর কাছে তা হাজারবার মৃত্যুর সামিল।

রামপাঁঠা আর কাকে বলে! বুঝতেও পারল না, ব্যারন তাকে বেবুন বলে গালাগাল দিলেন। বিজ্ঞ সাজকে গিয়ে তা বেমালুম মেনে নিল হারমান! □

দাবা-খেলুড়ের রহস্যভেদ

[মেলজেল্‌স্ চেস-প্লেয়ার]

মেলজেল-এর দাবা-খেলুড়ে জনসাধারণকে যেভাবে টেনেছে—এরকম বোধহয় আর কক্ষনো দেখা যায়নি। অদ্ভুত অসম্ভব ব্যাপার দেখলেই যাঁরা ভাবতে বসে যান—তাঁরা এই কলের দাবা-খেলোয়াড়কে যেখানে দেখেছেন—সেখানেই গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে গেছেন—ভাবতে ভাবতে মাথার চুলও নিশ্চয় ছিঁড়েছেন।

এত ভেবেও কেউ রহস্যভেদ করতে পারেননি। কি কায়দায় যে এহেন আজব ব্যাপার ঘটছে—কেউ তার হদিশ খুঁজে পান নি। এমন মোক্ষম কিছু লেখাও হয়নি আজ পর্যন্ত, যা থেকে একটা অকাট্য সিদ্ধান্তে আসা যায়। বরং সবাই বলছেন, মেলজেল-এর মেশিন নাকি একটা সাংঘাতিক মেশিন···মেশিন ছাড়া কিছুই নয়··· নির্জলা খাঁটি মেশিন···· মানুষের কারসাজি এর মধ্যে তিলমাত্র নেই···· যন্ত্র তৈরির প্রতিভা আশপাশে আকচার দেখা যাচ্ছে···· অতীব সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশের ভেলকি দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে অনেকেই···· মেলজেল-এর এই মেশিন সবাইকে ম্লান করে দিয়েছে···· স্রেফ একটা যন্ত্র নিজে থেকেই দাবার চাল দিচ্ছে অনেক ভেবেচিন্তে····· এর চাইতে বিস্ময়কর আর কি থাকতে পারে? সুতরাং, এ যুগের সবসেরা, সবচেয়ে বড়, রীতিমত তাজ্জব আবিষ্কার তো এই

মেশিনই। মানুষ আজ পর্যন্ত যত আবিষ্কার করেছে—কিছুই লাগে না এই আশ্চর্য আবিষ্কারের কাছে।

বাহ্‌বা! সত্যিই তাই হতো—অর্থাৎ মেলজেল-এর আবিষ্কারকে নিঃসন্দেহে মানব-সভ্যতার বৃহত্তম আবিষ্কার বলা যেত—যদি তাঁর স্বপক্ষে কলমধারীদের যুক্তিটুক্তিগুলো নিশ্ছিদ্র আর অকাট্য হতো। যা কিছু লেখা হয়েছে, সবই অনুমান ভিত্তিক এবং এযুগের বা বিগত যুগের এই জাতীয় বিরাট আবিষ্কারদের সঙ্গে কলের দাবা খেলোয়াড়ের তুলনা টানাটাই বিলক্ষণ অনুচিত। অনেক ধরনের ওয়ান্ডারফুল অনেক যন্ত্রমানব তৈরি যে হচ্ছে না, তা তো নয়। ব্রুসটার- এর লেখা "স্বাভাবিক জাদুবিদ্যা সম্পর্কিত পত্রগুচ্ছ" বইখানায় অত্যাশ্চর্য এহেন বিবিধ বিবরণ কি আমরা পাইনি। সবসেরা কাহিনীটা চক্ষু ছানাবড়া করার পক্ষে কি যথেষ্ট নয়? চতুর্দশ লুই যখন নেহাতই বালক, তখন তার মনোরঞ্জন করবার জন্যে মঁসিয়ে ক্যামু অভিনব একটা শকট নির্মাণ করেছিলেন। লম্বায়-চওড়ায় চারফুট মাপের একটা টেবিল থাকত ঘরে। ছ'ইঞ্চি লম্বা কাঠের তৈরি একটা গাড়ি থাকত সেই টেবিলে। গাড়িকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘোড়া দুটোও কাঠ দিয়ে তৈরি। গাড়ির একদিকের জানলার খড়খড়ি নামানো থাকায় পেছনের সিটে বসে থাকা ভদ্রমহিলাকেও দেখা যেত। হাতে লাগাম নিয়ে কোচোয়ান বসে থাকত গাড়ির মাথায়, সহিস আর ছোকরা চাকর দাঁড়িয়ে থাকত পেছনের পাদানিতে।

স্প্রিং টিপে দিতেন মঁসিয়ে ক্যামু। সঙ্গে সঙ্গে সপাং করে চাবুক হাঁকড়াত কোচোয়ান—দুই ঘোড়া টগবগিয়ে গাড়ি টেনে নিয়ে যেত টেবিলের কিনারা বরাবর, কোণ পর্যন্ত গিয়েই সমকোণে আচমকা বাঁদিকে বাঁক নিত ঘোড়ারা—সেইসঙ্গে গাড়ি—আবার ছুটত টেবিলেরই কিনারা বরাবর। এইভাবেই বাঁক নিয়ে ছুটতে ছুটতে গাড়ি এসে যেত বালক যুবরাজের ঠিক সামনে। দাঁড়িয়ে যেত তক্ষুনি। ছোকরা চাকর পেছন থেকে নেমে এসে খুলে ধরত দরজা, নেমে আসত ভদ্রমহিলা, একটা দরখাস্ত ধরিয়ে দিত যুবরাজের হাতে, উঠে যেত গাড়িতে, দরজা বন্ধ করে দিয়ে ছোকরা চাকর ফিরে যেত স্বস্থানে, চাবুক হাঁকড়াত কোচোয়ান—গাড়ি ধেয়ে যেত আগের মতনই।

মঁসিয়ে মেলারডেট-এর তৈরি ম্যাজিশিয়ানকে নিয়ে লেখা হয়েছে 'এডিনবরা বিশ্বকোষে'। তাজ্জব সৃষ্টি এই ম্যাজিশিয়ানকে বানানোই হয়েছিল প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্যে। প্রশ্নগুলো অবশ্যই বাঁধা ধরা। দেওয়ালের তলায় বসে থাকত ম্যাজিশিয়ানের পোশাক পরা একটা মূর্তি—তার এক হাতে জাদুদণ্ড, আর এক হাতে একটা খোলা বই। খানকয়েক ডিম্বাকার চাকতির ওপর লেখা থাকত প্রশ্নগুলো; যে-প্রশ্নের উত্তর চান দর্শক, তিনি সেই প্রশ্ন-খোদাই চাকতিটা টেনে নিয়ে রেখে দিতেন টানা ড্রয়ারে—সঙ্গে সঙ্গে স্প্রিংয়ের ধাক্কায় বন্ধ হয়ে যেত ড্রয়ার—জবাব ফিরে না আসা পর্যন্ত আর খুলত না।

এরপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াত ম্যাজিশিয়ান। হাতের জাদুদণ্ড দিয়ে শূন্যে একটা বৃত্ত এঁকে, মন দিয়ে পড়ে যেত বইয়ের খোলা পাতা—যেন প্রশ্নের জবাব

খুঁজছে—চিন্তা-নিবিষ্ট ভঙ্গিমায় বই ঠেকিয়ে ধরত কপালে—প্রশ্ন নিয়ে ভাবনার অবসান ঘটার সঙ্গে সঙ্গে হাতের জাদুদণ্ড তুলে ঠকাং করে মারত দেওয়ালে—দুম করে দুটো পাল্লা খুলে যেত মাথার ওপরে—দরজার মধ্যে দিয়ে দেখা যেত সঠিক উত্তর।

পাল্লা বন্ধ হয়ে যেত এর পরেই। ম্যাজিশিয়ান বসে পড়ত চেয়ারে। খুলে যেত টানা ড্রয়ার—ফিরিয়ে দিত ডিম্বাকার চাকতি।

এরকম ডিম্বাকার চাকতি ছিল কুড়িটা। কুড়িটা আলাদা প্রশ্ন। প্রতিটার সঠিক উত্তর দিত ম্যাজিশিয়ান—প্রতিটা জবাবই পিলে-চমকানো।

চাকতিগুলো পাতলা পেতলের—হুবহু একই মাপের—একটার থেকে আর একটার কোনও তফাৎ নেই। কিন্তু চাকতির দুদিকেই খোদাই করা আছে প্রশ্ন—পর্যায়ক্রমে পিঠেরই জবাব দিয়ে গেছে ম্যাজিশিয়ান।

টানা ড্রয়ারে চাকতি না রেখে যদি ড্রয়ার বন্ধ করে দেওয়া হতো, তাহলে ম্যাজিশিয়ান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াত বটে, কিন্তু হতাশভাবে মাথা নেড়ে ফের বসে পড়ত চেয়ারে—মাথার ওপর দরজার পাল্লাও খুলত না—খুলে যেত শুধু টানা ড্রয়ার—যার মধ্যে নেই কোনও চাকতি।

দুটো চাকতি একই সঙ্গে ড্রয়ারে রাখা হলে জবাব মিলত শুধু একটা প্রশ্নের—যেটা আছে তলায়।

একবার দম দিয়ে যন্ত্র চালু করে দিলে, ঘণ্টাখানেক খেল দেখিয়ে যেত ম্যাজিশিয়ান—জনা পঞ্চাশেক ব্যক্তির কৌতূহল মিটিয়ে যেত এক নাগাড়ে।

রকমারি চাকতির রকমারি জবাব ঠিক মতো দেয় কি করে যন্ত্র? খুবই সহজে—জানিয়েছিলেন মেশিনি নির্মাতা।

ভকানসম ভারা-র রাণি পাতিহাঁস আরও বড় বিস্ময়। সাইজে জ্যান্ত পাতিহাঁসের মতনই। দেখতে অবিকল এক রকম—নকল আর আসলে তিলমাত্র তফাৎ ধরতে না পেরে ঠকে যেতেন প্রতিটি দর্শক। ব্রুসটার লিখেছেন, জ্যান্ত পাতিহাঁস যে কাজটা যেভাবে করে, কলের পাতিহাঁস ঠিক সেই-সেই কাজ সেইভাবেই করে গেছে অতি-নিখুঁতভাবে; প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী হুবহু আসলের মতন; মাথা আর গলার চকিত নড়াচড়া সব পাতিহাঁসেরই বৈশিষ্ট্য—নকল পাতিহাঁস আশ্চর্যভাবে নকল করেছে গলা আর মাথার এই ঝাঁকুনি; পান আর আহারের সময়ে যেন তর সয়না আসল পাতিহাঁসের—নকলও ঠিক তাই; চঞ্চু দিয়ে জল ঘুলিয়ে জলপান করে যায় আসল—নকলও পরিষ্কার জলকে কাদাটে জল করতে ওস্তাদ। আসল পাতিহাঁস ঠিক যেভাবে প্যাঁক প্যাঁক করে যায় নানাবিধ কাজের ফাঁকে—নকল তা থেকে ব্যতিক্রম নয়—ঠিক যেন আসল পাতিহাঁসের প্যাঁকপ্যাঁকানি। শারীরস্থানের গঠনেও সর্বোচ্চ দক্ষতা যে রয়েছে, তা ছবি এঁকে দেখিয়ে দিয়েছেন বেশ ক'জন শিল্পী। আসল হাঁসের যেখানে যে হাড় আছে—কলের হাঁসের শরীরেও রয়েছে ঠিক সেই হাড়টা সেখানেই, ডানাগুলো পর্যন্ত আসল আর নকলে একই রকম—মাপে হেরফের নেই এতটুকু। যেখানে

যেটুকু খোঁদল বা বাঁক—হুবহু তাই রাখা হয়েছে যন্ত্রের হাঁসে, আসলের হাঁড়গের কাজ যেরকম—নকল হাড়গের কাজও সেইরকম, চঞ্চুর সামনে শস্য ছুঁড়ে দিলে আসল যেভাবে খুঁটে খায়—কলের পাতিহাঁসও সেইভাবে খুঁটে খায়, কোঁৎ কোঁৎ করে গেলে।

কিন্তু এই মেশিনগুলোকেই মৌলিক বলে মাথায় তুলে আমরা নাচি যখন, মিঃ ব্যাবেজ-এর অঙ্ককষার মেশিনকে নিয়ে কি করা উচিত বলতে পারেন? কাঠ আর ধাতু দিয়ে তৈরি একটা মেশিন বই কিছু তো নয়—অথচ সেই মেশিন জ্যোতির্বিজ্ঞান আর নৌবিদ্যা-সারণির অঙ্ক কষা ছাড়াও (তা সে যত বড়ই হোক না কেন), ভুল পর্যন্ত শুধরে দেয় নিজে থেকেই—দেখিয়ে দেয় গণিত-প্রক্রিয়া তার কতখানি নির্ভুল। মানুষের মগজের তিলমাত্র সাহায্য না নিয়েই অঙ্কের ফল ছেপে বের করেও দেয়! মেলজেল-এর দাবাখেলুড়ে মেশিনের সঙ্গে অঙ্ককষা মেশিনের তুলনা চলে না—এই কথাই বলবেন অনেকে। তুলনার প্রশ্নই ওঠে না—কেননা, মেলজেল-এর মেশিন তো ষোল আনা মেশিন—খাঁটি যন্ত্র—মানুষের মগজকে খাটাচ্ছে না কোনরকমেই। পাটিগণিত আর বীজগণিতের অঙ্ক স্রেফ বাঁধাধরা ব্যাপার। অঙ্ক কষতে কিছু সংখ্যা দিলে, সেই সংখ্যাদের অঙ্কের ফল যা হবার ঠিক তাই-ই হবে, —তার নড়চড় হবেই না। প্রদত্ত সংখ্যাদের ওপরেই নির্ভর করছে ফলাফল, আর কোনও কিছুর ওপর নয়,—কোনও প্রভাবই থাকে না এই ক্ষেত্রে। অঙ্ককষার ধারা এগোয় বাঁধা ধরা ছকে তার হেরফের ঘটে না। এই যদি হয়, তাহলে এরকম মেশিন গড়া যে সম্ভবপর, তাও ভাবা যায়—যে মেশিন নির্দিষ্ট সংখ্যা বিন্যাসের উত্তর দিতে গিয়ে নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবেই।

কিন্তু দাবাখেলুড়ের ক্ষেত্রে তা একেবারেই নয়, আগে থেকেই ছকে দেওয়া পথে দাবাখেলুড়ে এগোতে পারছে না। দাবা খেলায় একজনের চাল দেওয়ার পর আরেক জনের চাল কি পড়বে—তা কেউ জানে না। খেলার বিশেষ এক সময়ে খেলোয়াড়ের মতিগতি দেখে অন্য একসময়ে তার মতিগতি কি রকম থাকবে, তা আঁচ করা যায় না। বীজগণিতের প্রথম ধাপের সঙ্গে দাবাখেলার প্রথম ধাপের তুলনা করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। বীজগণিতের প্রথম ধাপের পর দ্বিতীয়ধাপ কি হবে তা অজানা থাকে না—নির্দিষ্ট ধাপে তাকে আসতেই হবে। কিন্তু দাবাখেলায় প্রথম চাল দেবার পর দ্বিতীয় চাল যে অমুক রকম হতেই হবে—তার ঠিক নেই। বীজগণিতের ধারাবাহিকতায় এদিক ওদিক হয় না—প্রথমধাপ থেকে শেষ ধাপ পর্যন্ত একেবারে অঙ্ককষা ব্যাপার।

দাবাখেলায় কিন্তু প্রতিটি ধাপ অনিশ্চিত। একটা চাল দেওয়ার পর তার পরের চাল কি হবে—তা কিছুতেই আঁচ করা যায় না। দাবাখেলা যাঁরা দেখছেন তাঁরা প্রত্যেকেই মাথা খাটিয়ে একটা চাল ভাবতে থাকেন—একটার সঙ্গে আর একটার কোনও মিল নেই। সবই তখন নির্ভর করে খেলুড়েদের পাঁচ রকম বিচার বিবেচনার ওপর। যদি ধরে নেওয়া যায় (ধরাটা যদিও অনুচিত হবে), কলের

দাবা-খেলুড়ে ছকে-বাঁধা চাল দিতেই তৈরি হয়েছে—তাহলেই লাগছে গোল; কেননা, তার ছকে বাঁধা চাল অতগুলো প্রতিদ্বন্দ্বীর রকমারি মৌলিক চালের সঙ্গে টক্কর দেবে কি করে? প্রতিদ্বন্দ্বীদের মাথা থেকে কখন কি প্যাঁচ বেরবে—কলের পুতুল আগে থেকে তা জানবে কি করে? সে তো একটা যন্ত্র—যন্ত্রের নিয়মে তাকে বাঁধা গৎ মেনে চলতে হবে। তাই নয় কি?

সুতরাং গোহারান হারতেই হবে কলের দাবা খেলুড়েকে।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, মিঃ ব্যাবেজের অঙ্ক কষার মেশিনের সঙ্গে দাবা-খেলুড়ের তুলনাটা এক লাইনে বসিয়ে করা যায় না কোনমতেই।

তা সত্ত্বেও যদি বলি, দাবা-খেলুড়ে মেশিন ছাড়া কিস্‌সু নয়—শতকরা একশ ভাগ খাঁটি মেশিন—তার মধ্যে ভেজালের গ্যাড়াকল নেই বিন্দু মাত্র?

সেক্ষেত্রে বলতে হয়, মানুষ জাতটা আজ পর্যন্ত যত রকম আবিষ্কার করেছে, দাবা-খেলুড়ে তাদের সবার সেরা—সবচেয়ে তাজ্জব—রীতিমত ওয়াণ্ডারফুল।

খেলুড়ে-মেশিনের মূল আবিষ্কর্তা ব্যারন কেমপেলেন অবশ্য অত লম্বা দাবি করেন নি। তাঁর কথায়, এ মেশিন খুবই সাদাসিধে যন্ত্র—'বাগাটেলি' খেলায় লোহার গুলিগুলো যেমন ঠিকরে গিয়ে কাঁটার বেড়া দেওয়া ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ে—এও তাই; শুধু যা পদ্ধতিটার অভিনবত্বের জন্যে মেশিনের ক্রিয়াকর্ম এমনই চমকপ্রদ যে মুণ্ড ঘুরিয়ে ছাড়ে—মনে হয় যেন ওটা মেশিন নয়—মানুষ। স্রেফ ধোঁকা।

আবিষ্কর্তার এই কথা নিয়ে সাত কাণ্ড রামায়ণ রচনা করার আগে, আসুন দাবা-মেশিনের ইতিহাস শোনা যাক; তার গড়ন আর আচরণের বিশদ বিবরণ শোনা যাক। তাহলেই বুঝবেন, এ মেশিন চলে মনের শাসনে; অর্থাৎ, কলকব্জাকে নিয়ন্ত্রণ করছে মন। অঙ্ক কষে এই সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করার চাইতে দেখাই যাক না 'মানুষের মন' কিভাবে অন্তরালে থেকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যন্ত্রের খেলোয়াড়কে।

মিঃ মেলজেলের প্রদর্শনীতে হাজির থাকবার সুযোগ যাঁদের ভাগ্যে ঘটেনি—আমার এই বিশদ বিবরণ তাঁদের কাজে লাগবে।

কলের দাবা-খেলুড়েকে আবিষ্কার করেছিলেন ব্যারন কেমপেলেন—১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে। ইনি ছিলেন হাঙ্গারি-র প্রেসবুর্গ এলাকার এক সম্ভ্রান্ত পুরুষ। মেশিন চালানোর গোপন রহস্যসমেত পুরো মেশিনটাকে ইনি পরে বেচেছেন মিঃ মেলজেল-কে। মেশিনের খেলা উনি এখন দেখাচ্ছেন আমেরিকার নানা জায়গায়।

যাই হোক, ব্যারন সাহেব মূল মেশিন তৈরি করবার পরেই তার খেল্ দেখিয়েছিলেন প্রেসবুর্গ, প্যারিস, ভিয়েনা ছাড়াও আরও অনেক মহাদেশীয় শহরে।

১৭৮৩ আর ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে মেলজেল সাহেব মেশিন নিয়ে যান লণ্ডন শহরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড়ো বড়ো শহরে মেশিনের প্রদর্শনী হয়ে গেল সাম্প্রতিক কয়েক বছরে। মেশিন যেখানেই গেছে, সেখানেই তার আকৃতি উত্তেজনার সঞ্চার ঘটিয়েছে এবং সর্বস্তরের অসংখ্য মানুষ মেশিন-রহস্যভেদের প্রয়াস চালিয়ে গেছেন।

হপ্তা কয়েক আগে রিচমণ্ড শহরে মেশিন সম্বন্ধে সেই নগরের নাগরিকরা যে চোখে দেখেছিলেন, তার একটা মোটামুটি ছবি হাজির করা হলো ওপরের ছবিতে। ডান হাতটা বাক্সের ওপর আর একটু ছড়িয়ে দেখানো দরকার ছিল, দাবার ছকটাকেও বাক্সের ওপর উপস্থিত করানো উচিত ছিল পাইপ ধরা অবস্থায় কুশনটা যাতে না দেখা যায়—ছবি আঁকা উচিত ছিল সেইভাবে। মেলজেল সাহেব মেশিনের দখল নেওয়ার পর জামাকাপড়ে সামান্য হেরফের ঘটিয়েছেন—তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়; যেমন, শিরোভূষণের পালক—মূল মেশিনে এই বস্তুটি ছিল না।

এগজিবিশন শুরুর ঘণ্টা বাজলেই সরিয়ে নেওয়া হয় একটা পর্দা, অথবা দুম করে খুলে যায় একটা ফোল্ডিং দরজা। গড়গড়িয়ে মেশিন চলে আসে দর্শকের সামনে—থমকে যায় প্রথম সারির দর্শকদের থেকে ঠিক বারো ফুট তফাতে—মাঝে টানা থাকে একটা দড়ি।

দেখা যায়, তুরস্কের মানুষদের মতো সাজগোজ করে একটা মূর্তি বসে রয়েছে একটা কাঠের বাক্সের সামনে—বেশ বড়ো বাক্স—যা আর টেবিলের কাজও করে চলেছে। দর্শকরা যদি চান, মেশিনকে চাকার ওপর গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ঘরের যেখানে খুশি নিয়ে যাবেন প্রদর্শক, যে কোনও জায়গায় রেখেও দিতে পারেন, অথবা খেল চলার সময়ে বার বার জায়গা পরিবর্তনও করতে পারেন।

রোলার-এর ওপর বাক্স বসানো থাকে; তাই পাটাতন থেকে একটু উঠে থাকে বাক্সের তলদেশ—ফাঁক দিয়ে কলের খেলুড়েকে দেখতে পান দর্শকরা।

যে চেয়ারে বসে থাকে মূর্তি, সে-চেয়ার অবশ্য স্থায়ীভাবে লাগানো থাকে বাক্সের সঙ্গে। বাক্সের ওপরে রাখা দাবার ছকটাও স্থায়ীভাবে লাগানো থাকে বাক্সের ওপরে। দাবার ছকের পাশেই থাকে মূর্তির ডান হাত—দেহের সঙ্গে সমকোণে ছড়িয়ে থাকে সামনের দিকে—যেন রেখে দিয়েছে আলগোছে। উপুড় করা থাকে হাত—চেটো থাকে তলার দিকে। দাবার ছক লম্বায় চওড়ায় আঠারো ইঞ্চি। বাঁ হাত বেঁকে থাকে কনুইয়ের কাছে—একটা পাইপ থাকে বাঁ মুঠোয়। সবুজ চাদর ঢেকে রেখে দেয় তুর্কি-মূর্তির পেছন দিক—একই চাদরের খানিকটা ঝুলে থাকে তার দু'কাঁধের ওপর দিয়ে। বাইরে থেকে দেখা যায়, পাঁচটা খুপরি আছে বাক্সে—পাশাপাশি তিনটে কাবার্ড (একই আয়তনের)—এদের নিচে দুটো টানা ড্রয়ার।

কলের খেলোয়াড় প্রথম যখন দর্শন দান করেছিল পাঁচজনের সামনে, তখন তাকে দেখা গেছিল ঠিক এই ভাবে।

প্রদর্শনীর শুরুতেই মেলজেল দর্শকদের জানিয়ে দেন, এইবার তিনি মেশিনের কলকজা দেখাবেন সবাইকে। পকেট থেকে বের করেন এক তাড়া চাবি। ছবিতে ১ লেখা কাবার্ড খুলে ফেলেন চাবি ঘুরিয়ে, পাল্লা পুরো খুলে ধরেন দর্শকদের সামনে। ভেতরে ঠাসা চাকা, দাঁতওয়ালা হুইল, ডাণ্ডা, আরও একগাদা যন্ত্রপাতি—এত ঘেঁষাঘেঁষি যে চোখ চলে না তাদের মধ্যে দিয়ে।

এই কাবার্ডের দরজা খোলা অবস্থায় রেখেই, মেলজেল এবার টেবিল ঘুরে চলে যান মূর্তির পেছন দিকে, সবুজ চাদর তুলে, প্রথম কাবার্ডের ঠিক পেছন দিকের আর একটা কাবার্ডের দরজা খুলে দেন। জ্বলন্ত মোমবাতি ধরেন সেখানে, একই সঙ্গে এদিকে ওদিকে নড়াতে থাকেন পুরো মেশিন—যাতে পিঠোপিঠি দুই কাবার্ডের মধ্যে দিয়ে আলো দেখা যায়; আর সেই আলোকরশ্মির সৌজন্যেই দেখা যায়, কলকব্জা ঠাসা রয়েছে—আর কিছু নেই।

দেখে সন্তুষ্ট হন দর্শকরা—চোখকে ফাঁকি দেওয়ার মতো ব্যাপার নেই সেখানে। মেলজেল তখন পেছনের কাবার্ডের পাল্লা বন্ধ করেন চাবি ঘুরিয়ে, চাবি টেনে নিয়ে মূর্তির পেছনের সবুজ চাদর টেনে নামিয়ে দেন এবং টেবিল ঘুরে এসে দাঁড়ান সামনে।

মনে রাখবেন, ১ নম্বর লেখা পাল্লা কিন্তু এখনও খোলা রয়েছে। মেলজেল সেই পাল্লা খোলা রেখেই, কাবার্ডের নিচের টানা ড্রয়ার টেনে খুলে আনেন; বাইরে থেকে দেখে মনে হয় ওখানে দুটো ড্রয়ার আছে—মনে হয় বটে, আসলে আছে একটাই ড্রয়ার। দুদিকে দুটো চাবির ফুটো আর হাতল রাখা হয়েছে মানানসই অলঙ্করণের জন্যে।

ড্রয়ারটাকে টেনে পুরো খুলে আনেন মেলজেল। তখন দেখা যায়, তার মধ্যে রয়েছে একটা কুশন আর এক সেট দাবার ঘুঁটি; ঘুঁটিগুলো খাড়াইভাবে বসানো রয়েছে একটা ফ্রেমের মধ্যে।

ড্রয়ারটাকে খোলা অবস্থাতেই রেখে দেন মেলজেল, কাবার্ড নম্বর ওয়ানের পাল্লাও খোলা থাকে। এবার তিনি চাবি ঘুরিয়ে খোলেন কাবার্ড নম্বর 2 আর কাবার্ড নম্বর 3 এর পাল্লা।

তখনই দেখা যায়, দুটো পাল্লাই ভাঁজ করা কপাট এবং দুটোর পেছনে রয়েছে একটাই কামরা—দুটো নয়।

এই কামরার ডান দিকে (অর্থাৎ দর্শকদের ডানদিকে) ছ'ইঞ্চি চওড়া ছোট্ট একটা খুপরিকে পার্টিশন দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়েছে—এই খুপরির মধ্যেও ঠাসা রয়েছে বিস্তর কলকব্জা।

মূল কামরার (দু নম্বর আর তিন নম্বর দরজার পেছনে যে-কামরা আমরা তাকে এখন থেকে মূল কামরা বলব) ভেতরে কিছু নেই—বিলকুল ফাঁকা—কলকব্জা একটাও নেই—চারিদিক মোড়া কালো কাপড় দিয়ে—পেছনের ওপরের দুই কোণে লাগানো শুধু দুটো ইস্পাতের রড—সিকি-বৃত্তাকার ভাবে। দর্শকদের বাঁদিক যেদিকে, সেইদিকে মূল কামরার মেঝেতে ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে লম্বায় চওড়ায় আট ইঞ্চি একটা বস্তু—কালোকাপড় দিয়ে মোড়া।

একনম্বর, দু'নম্বর, তিন নম্বর—এই তিন পাল্লাই খুলে রেখে মেলজেল চলে যান মূল কামরার ঠিক পেছন দিকে—খুলে ধরেন একটা পাল্লা এবং মোমবাতির আলো ফেলেন ভেতর দিকে।

পুরো বাক্সটাকে এইভাবে দর্শকদের দেখিয়ে দেবার পর, মেলজেল দরজা আর ড্রয়ার আর খুলে রেখেই, কলের মানুষকে চাকার ওপর গড়িয়ে একেবারে ঘুরিয়ে দেন—যাতে মূর্তির পেছন দিক চলে আসে দর্শকদের চোখের সামনে—চাদর তুলে দেখিয়ে দেন তুর্কির পশ্চাৎদেশ। কোমরের একটা দরজা খুলে দেন—পাল্লার সাইজ লম্বায় চওড়ায় দশ ইঞ্চি—বাঁ উরুর ওপরেও খুলে দেন আর একটু ছোট সাইজের আর একখানা দরজা।

এই দুই দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় মূর্তির অভ্যন্তর।

কি আছে সেখানে?

শুধু মেশিন আর মেশিন। কলকব্জার ঠাসাঠাসি ব্যাপার।

এরপর দর্শকদের মনে ধোঁকাবাজির সম্ভাবনা আর থাকে না। ফাঁকা কামরায় কাউকেই যখন দেখা যাচ্ছে না—তখন ঘাপটি মেরে মানুষে চালাচ্ছে মেশিন—এই সন্দেহও পালাবার পথ পায় না।

ঘঁসিয়ে মেলজেল এবার মেশিনকে ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে আগের অবস্থায় রাখেন। দর্শকদের মধ্যে থেকে যেকোনও একজনকে উঠে এসে দাবা খেলতে বললেন কলের খেলুড়ের সঙ্গে।

খেলার চ্যালেঞ্জ শুনেই লাফিয়ে ওঠেন অনেকেই। একজন চলে আসেন স্টেজে। তাঁর টেবিল আর চেয়ার পাতা হয় দড়ির এদিকে—দর্শকদের দিকে—এমনভাবে যাতে প্রত্যেকটা চাল দর্শকরা দেখতে পান। টেবিলের ড্রয়ার থেকে দাবার ঘুঁটি বের করেন মেলজেল; বেশির ভাগ সময়ে নিজেই ঘুঁটি সাজিয়ে দেন মামুলি দাবার ছকে—সবসময়ে অবশ্য নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী এসে বসেন চেয়ারে। ড্রয়ার থেকে এবার কুশন বের করেন মেলজেল। কলের খেলুড়ের বাঁ হাত থেকে পাইপ সরিয়ে নিয়ে, কুশন রাখেন বাঁ হাতের তলায়—'সাপোর্ট' হিসেবে—যাতে আরামে বাঁ হাত টেবিলে রাখতে পারে যন্ত্রমহাশয়।

এরপর মেলজেল সাহেব কলের দাবা-খেলুড়ের ঘুঁটি বের করেন ড্রয়ার থেকে—সাজিয়ে দেন মূর্তির সামনে।

তারপর বন্ধ করেন সব কটা দরজা, চাবি ঘুরিয়ে তালা এঁটে দিয়ে, চাবির গোছা ঝুলিয়ে রাখেন এক নম্বর দরজায়। ড্রয়ারও বন্ধ করেন। সবশেষে দম দিয়ে চালু করে দেন মেশিন। দর্শকদের বাঁ দিকে বাক্সর একদিকে একটা ফুটো আছে—এই ফুটোয় চাবি ঢুকিয়ে দম দেন মেলজেল।

শুরু হয়ে যায় খেলা। প্রথম দান দেয় কলের খেলুড়ে। খেলার সময়সীমা সাধারণত আধঘণ্টা। কিন্তু খেলা যদি শেষ না হয় আধঘণ্টার মধ্যে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী যদি মনে করেন আর একটু সময় পেলে মেশিনকে তিনি নির্ঘাৎ হারিয়ে ছাড়বেন—মেলজেল খুব একটা আপত্তি জানান না।

আধঘণ্টা খেলার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন মেলজেল একটাই উদ্দেশ্যে—দর্শকরা যেন একঘেয়েমিতে না ভোগেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী নিজের টেবিলে বসে যে-চাল দেন, হুবহু সেই চাল দেন মেলজেল

কলের খেলুড়ের দাবার ছকে—তখন তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিনিধি।

এর ফলে, মেলজেলকে ছুটোছুটি করতে হয় এ-টেবিল থেকে সে-টেবিলে। মাঝে মাঝে যেতে হয় মূর্তির পেছনেও—প্রতিদ্বন্দ্বীর যে ঘুঁটিকে মেরেছে কলের মূর্তি—সেই ঘুঁটিকে দাবার ছক থেকে সরিয়ে রেখে দেন মূর্তির বাঁদিকে—ছকেরও বাঁ দিকে।

কখনো সখনো দেখা যায় দ্বিধায় পড়েছে কলের মূর্তি। কি চাল দেবে ভেবে পাচ্ছে না। তখন মেলজেল গিয়ে দাঁড়ান মূর্তির ডান পাশে—গা ঘেঁষে—আলগোছে প্রায়ই হাত রাখেন বাক্সের ওপর। শুধু হাত রাখা নয়, অদ্ভুতভাবে থপথপ করে পা ফেলতেও থাকেন—যা দেখে সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক; নিশ্চয় কলের মূর্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন পায়ের সঙ্কেতে; এলোমেলো পা ফেলার মধ্যে যেন ধূর্ততার ছাপ রয়েছে বলে মনে করেন অনেকে।

এমনও হতে পারে যে, বেখাপ্পা এই বদভোসগুলো মেলজেলের মজ্জাগত বাতিক বলা যায়; অথবা, ইচ্ছে করেই করেন যাতে দর্শকরা মনে করে নেয় মূর্তিটা নিছক মেশিন ছাড়া কিছুই নয়।

তুর্কি খেলুড়ে দান দিয়ে যান বাঁ হাত দিয়ে। হাতের যা কিছু নড়াচড়া, সবই হয় সমকোণে, অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রী কোণে। হাতের পাঞ্জা নেমে থাকে স্বাভাবিকভাবেই; সমকোণে সেই পাঞ্জা চলে আসে সঠিক ঘুঁটির ওপর (যে ঘুঁটিকে সরাবে বলে মনস্থ করেছে তুর্কি), আঙুল দিয়ে ধরে টুক করে তুলে নেয় সেই ঘুঁটি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, ঘুঁটি ধরতে গিয়ে বেগ পায় না। মাঝে মধ্যে ঘুঁটি যখন যেখানে থাকা দরকার, সেখানে থাকে না, তখন যন্ত্রের আঙুল সেই ঘুঁটিকে পাকড়াও করতে পারে না।

এইরকম ক্ষেত্রে, ঘুঁটি পাকড়াও না করেই, পাঞ্জা চলে যায় দাবার ছকের বিশেষ সেই ঘরের ওপর—যে-ঘরে ঘুঁটিকে সে রাখতে চায়। ঘরটাকে দেখিয়ে দিয়ে হাত ফিরে যায় কুশনের ওপর।

চালটা দিয়ে দেন মেলজেল। মূর্তি তো দেখিয়েই দিয়েছে, কোন ঘুঁটি তুলে কোথায় রাখতে হবে।

মূর্তি যতবার হাত নাড়ায়, ততবারই কলকব্জা চলবার আওয়াজ শোনা যায়। খেলা চলবার সময়ে এমনভাবে চোখ পাকায় যেন দাবার ছককে খুঁটিয়ে দেখছে, মাথার ঝাঁকুনিও দেয়—'কিস্তি' শব্দটাও ঠিকরে আসে মুখ দিয়ে। মুখে উচ্চারণটা মঁসিয়ে মেলজেলের বাড়তি কৃতিত্ব—ব্যারন কেমপেলেনের মেশিন শুধু ডান হাত দিয়ে টেবিলে টোকা মেরে জানিয়ে দিত 'কিস্তি' হয়ে গেল।

মঁসিয়ে মেলজেলের মেশিনও ডান হাতের আঙুল দিয়ে টেবিল ঠোকে—প্রতিদ্বন্দ্বী যদি ভুল চাল দেয়; শুধু টেবিল ঠোকা নয়—ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাতেও থাকে; ভুল চালের ঘুঁটি সরিয়ে দেয় আগের জায়গায়—যেন এবারের চাল চালবে সে নিজেই।

কিস্তিমাৎ করে দিলে আর দেখে কে! মেশিন যেন তখন ফুর্তির ফোয়ারা হয়ে ওঠে। ঘাড় দুলিয়ে বিজয় গৌরবে মাথা ঘুরোয় দর্শকদের দিকে—ভাবখানা যেন : দ্যাখো! দ্যাখো! আমি জিতে গেছি! —সেইসঙ্গে আত্মপ্রসাদে স্ফীত হয়েই যেন বাঁ হাতটা টেনে সরিয়ে নেয় পেছন দিকে—হাতের আঙুলগুলো শুধু থাকে কুশনের ওপর। ঠারে ঠোরে বুঝিয়ে দেয়—এর সঙ্গে আর খেলব কী!

মেশিন মাহাত্ম্য এইভাবেই প্রকাশ পায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে; অর্থাৎ ক্রমাগত জিতেই যেতে থাকে যন্ত্র—হারে কদাচিৎ—মাত্র দু'একবার।

খেলখতম হলেই কেউ যদি কলকব্জা ফের দেখতে চান, বিনা দ্বিধায় মেলজেল তা দেখিয়ে দেন—ঠিক আগের মতন—তারপর মেশিনকে গড়িয়ে পেছনে নিয়ে গিয়ে পর্দা ফেলে দেন সামনে—দর্শকরা আর তাকে দেখতে পায় না।

এই যে 'অটোমেটন' অথবা কলের মানুষ, তার রহস্য ফাঁস করার বিস্তর প্রচেষ্টা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সবচেয়ে চালু রহস্যভেদে বলা হয়েছে—কলের মানুষ কলকব্জা ছাড়া কিছুই নয়, এই গেল এক নম্বর সিদ্ধান্ত।

দু' নম্বর রহস্যভেদে বলা হয়েছে, মেলজেল যখন পা ঘষেন পাটাতনে, তখনই তিনি মেশিন চালান। সাদা কথায়, কলের মানুষ কলকব্জার তৈরি হতে পারে—কিন্তু তার ঘটে দাবাখেলার বুদ্ধি নেই ছিটে ফোঁটাও—তাকে চালাচ্ছেন স্বয়ং চালক।

তিন নম্বর রহস্যভেদ : অবশ্যই ম্যাগনেটের কারচুপি আছে কোথাও।

তিনটে সিদ্ধান্তই কিন্তু নাকচ হয়ে যাচ্ছে এইভাবে :

নিছক মেশিন—এই বিভ্রান্তি তো ইচ্ছে করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। এ নিয়ে যথেষ্ট বলা হয়েছে আগে।

মেলজেল নিজে কি করে চালাবেন মেশিন? মেশিনকে তো ঘরের যেখানে খুশি নিয়ে যান—খেলা চলতে চলতেও নিয়ে যান—যেখানে খুশি রেখে দেন।

ম্যাগনেট? সেই ম্যাগনেট বিকল হয়ে যেতে পারে দর্শকদের পকেটেও যদি ম্যাগনেট থাকে; উপরন্তু, মেলজেল নিজেই যদি ম্যাগনেট ব্যবহার করেন—তার সাইজ আর ক্ষমতাটা আঁচ করুন তো! কত বড় হলে তবে মেশিনের বুদ্ধি খোলতাই থাকবে? বারে বারে কিস্তি মাৎ করবে?

চতুর্থ সিদ্ধান্তটা একটা প্রচার-পুস্তিকার আকারে ছেপে বেরিয়েছিল সবার আগে—১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্যারিস শহরে। তাতে লেখা হয়েছিল : মর্কট আকারের কোনও বামন নিশ্চয় লুকিয়ে থাকে মেশিনের মধ্যে।

কিন্তু লুকিয়ে থাকে কি করে? মেলজেল তো কাবার্ডের দুটো দরজা দুহাট করে খুলে দেখিয়ে দেন।

পুস্তিকার লেখক বলেছেন—শরীরটা থাকে বাইরে—কলের মানুষের আলখাল্লার তলায়—পা দুটো ঢোকানো থাকে এক নম্বর কাবার্ডের দুটো ফাঁপা চোঙার মধ্যে। চোঙা দুটোকে মেশিনের অংশ বলে দেখানো হয় বটে—আদৌ তা নয়।

দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পর বেঁটে বামন সুট করে ঢুকে পড়ে কাবার্ডের মধ্যে। তখন তো দরজা বন্ধ—আর তাকে দেখা যায় না। কলকব্জা ছাড়া সেখানে কিছু নেই—তা তো আগেই দেখানো হয়ে গেছে।

পুরো অনুমিতিটা এমনই উদ্ভট যে এনিয়ে আর কথা না বলাই ভাল।

পঞ্চম রহস্যভেদটা আরও উদ্ভট হলেও লোকের মন টেনেছিল বেশি। কিন্তু মেলজেল নিজেই তা নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন দাবার ছকের নিচের কামরা পুরো খুলে দিয়ে—ড্যাব ড্যাব করে দর্শকরা দেখেছিলেন দাবার ছকের ঠিক নিচে নেই কোনও বাড়তি ড্রয়ার।

উদ্ভট অনুমিতিতে বলা হয়েছিল, খুব রোগা আর খুব লম্বা এক ছোকরা ওই ড্রয়ারে লুকিয়ে থেকে নাকি দাবার চাল দেয়।

আজব এই অনুমিতি লেখা হয়েছিল ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে একখানা সচিত্র বইতে। প্রকাশ করেছিল ড্রেসডেন, লিখেছিলেন ফ্রেহিয়ার।

ষষ্ঠ রহস্যভেদ করা হয়েছে আর একখানা কেতাবে। এখানে-ওখানে অনেক লেখালেখির পর এই বই। তাতে বলা হয়েছে, মেশিনের ভেতরেই থাকে মানুষ। খুদে কামরার পার্টিশানের আড়ালে। দরজা বন্ধ করলেই বেরিয়ে আসে পার্টিশানের আড়াল থেকে। দরজা বন্ধ করার সঙ্গে পার্টিশান সরে যাওয়ার স্প্রিংয়ের যোগাযোগ আছে।

লেখক বিষয়টাকে নিয়ে পাতার পর পাতা জুড়ে বড় বেশি লিখে গেছেন। স্রেফ তাত্ত্বিক আলোচনা—আমাদের আপত্তি সেইখানেই। পার্টিশান সরে যাওয়াটার অনুমানটা উড়িয়ে দেব না—এ নিয়ে পরে আলোচনা করছি। খুলে দেখাব, মেশিনের ভেতর মানুষ থাকলেও তা দর্শকদের চক্ষুর অগোচরে থেকে যাচ্ছে একেবারেই।

তাহলেই আসছে সপ্তম রহস্যভেদ—আমাদের সিদ্ধান্ত।

আগের কিছু কথা আর একবার ঝালিয়ে নিই—বুঝতে সুবিধে হবে।

খেলা দেখানোর ঠিক আগে রুটিন মাফিক কতকগুলো কাজ করে যান মেলজেল—প্রতিবারেই হুবহু একই রকমভাবে—তিলমাত্র বিচ্যুতি ঘটে না কোনবারেই।

যেমন, প্রথমেই খোলেন এক নম্বর দরজা। সেই দরজা খুলে রেখে দিয়ে বাক্সের পেছনে গিয়ে খুলে ধরেন এক নম্বর দরজার ঠিক পেছনের দরজা।

এই পেছনের দরজায় ধরেন একটা জ্বলন্ত মোমবাতি।

এবার বন্ধ *করেন পেছনের দরজা,* তালা দেন, চলে আসেন সামনে, ড্রয়ার টেনে খুলে আনেন—যতটা টানা যায়।

এরপর খোলেন দু'নম্বর আর তিন নম্বর দরজা (ফোল্ডিং পাল্লা), মূল কামরার ভেতরটা দেখিয়ে দেন।

মূল কামরার দরজা, ড্রয়ার আর এক নম্বর কাবার্ডের দরজা খোলা অবস্থায় রেখে দিয়ে ফের চলে যান পেছনে—খুলে দেন মূল কামরার পেছনকার দরজা।

বাক্স বন্ধ করার ব্যাপারে বিশেষ কোনও ছক অনুসরণ করেন না মেলজেল শুধু একটা ক্ষেত্রে ছাড়া : ড্রয়ার টেনে খোলার আগে ফোল্ডিং দরজা বন্ধই থাকে।

এবার, ধরা যাক মেশিনকে যখন গড়িয়ে এনে দর্শকদের সামনে হাজির করা হচ্ছে, তখনই একজন লুকিয়ে রয়েছে তার ভেতরে। এক নম্বর কাবার্ডের ঘনবদ্ধ কলকব্জার আড়ালে সে রয়েছে (কলকব্জার পেছনের অংশ এমনভাবে তৈরি যে দরকার মতো মূল কামরা থেকে এক নম্বর কাবার্ডে পুরোপুরি সরিয়ে আনা যায়), দু'পা ছড়িয়ে রেখেছে সে মূল কামরায়।

এক নম্বর দরজা যখন খুলছেন মেলজেল, তখন দেখা যায় না এই লোককে—অমন ঠাসাঠাসি যন্তরের জঙ্গল ভেদ করে তীক্ষ্ণতম চক্ষুও কিস্সু দেখতে পায়না।

কিন্তু যখন পেছনের দরজা খুলে দিয়ে আলো ধরা হয় সেখানে? তখন তো দেখা যাবে ঘাপটি মেরে থাকা লোকটিকে?

না, তখনও তাকে দেখা যাবে না।

চাবির ফোকরে চাবি লাগানোর আওয়াজটা আসলে একটা সঙ্কেত। এই সঙ্কেত পেলেই ভেতরের মানুষটা নিজেকে ঠেসে ধরে মূল কামরার মধ্যে—হয় পুরোপুরি, অথবা যতখানি সম্ভব। এভাবে সেঁটে থাকা খুবই যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার সন্দেহ নেই। বেশিক্ষণ থাকাও যায় না। তাই দেখি, *পেছনের দরজা বন্ধ করেদেন মেলজেল।*

দরজা বন্ধ হয়ে গেলেই ভেতরের সহচর অনায়াসেই ফিরে যেতে পারে আগেকার পজিশনে—কেননা, কাবার্ড আবার ঘন আঁধারে ঢেকে গেছে—চোখ পাকিয়ে তাকিয়েও কেউ আর তাকে দেখতে পায় না।

এরপর টেনে খোলা হয় ড্রয়ার। ড্রয়ার খোলা হলেই ড্রয়ারের পেছনে অনেকখানি ফাঁক বেরিয়ে পড়ে—এই ফাঁকা জায়গায় ঠ্যাং দু'খানা নামিয়ে দেয় মেলজেল-সহচর।

এই প্রসঙ্গে স্যার ডেভিড ব্রুসটার-এর একটা অভিমত জানিয়ে রাখি। তিনি বলেছিলেন, ড্রয়ারটা এমনভাবে তৈরি যে, বন্ধ অবস্থায় থাকলেও পেছনে ফাঁকা জায়গা থাকে অনেকখানি, অর্থাৎ ড্রয়ারটা 'ফলস্ ড্রয়ার'। বাক্সের পেছন পর্যন্ত পৌঁছয় না, এই আইডিয়া ধোপে টেঁকে না। এই জাতীয় অপকৌশল এত বেশি লোকে জেনে গেছে যে ঘরভর্তি সন্ধানী মানুষদের সামনে তার প্রয়োগ করার মতন হস্তিমূর্খ নন মেলজেল সাহেব। তাছাড়া, ড্রয়ার যখন টেনে বের করা অবস্থায় থাকে, তখনই তো দেখা যায়, তার গভীরতা কতখানি এবং শুধু চোখেই বোঝা যায়—বাক্সের পেছন পর্যন্ত পৌঁছয় কিনা।

তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে, মেলজেল-সহচরের শরীরের কোনও অংশই এখন আর মূল কামরায় নেই। ধড় রয়েছে এক নম্বর কাবার্ডের কলকব্জার আড়ালে, পা জোড়া রয়েছে ড্রয়ারের পেছনকার ফোকরে।

মূল কামরাকে লোকচক্ষুর সামনে খুলে ধরার এই তো সুযোগ। মেলজেল ঠিক তাই করেন। সামনের আর পেছনের দরজা খুলে দেন—কাউকেই দেখা যায় না ভেতরে।

খুশি হয়ে যান দর্শকরা। পুরো বাক্সটাই তো এখন ভেতর পর্যন্ত দেখছেন—একই সঙ্গে সমস্ত অংশ দেখছেন—কারও চুলের ডগাও তো দেখা যাচ্ছে না ভেতরে।

আদতে কিন্তু মোটেই তা নয়। দর্শকরা দেখতে পান না ড্রয়ারের পেছনের দিক আর এক নম্বর কাবার্ডের ভেতর দিক।

এক নম্বর কাবার্ডের সামনের দরজা খোলা থাকলেও তা খোলা না থাকারই সামিল—পেছনের দরজা বন্ধ থাকায়, সামনের দরজা খুললেও যা দেখা যায় —না খুললেও তা দেখা যায়—অর্থাৎ, কিছুই না। অন্তরালে থাকে মেলজেল-সহচর।

মূল রহস্যটা ফাঁস করা গেল তাহলে।

এরপর, মেলজেল মেশিন ঘুরিয়ে ধরেন—পেছনের দিকটা সামনে নিয়ে আসেন, তুর্কির আলখাল্লা তুলে ধরেন, কোমর আর উরুর ছোট দরজা খুলে মূর্তির ভেতরকার কলকব্জা দেখিয়ে দেন, গোটা মেশিনটাকে আগের অবস্থায় ঘুরিয়ে নিয়ে রাখেন, ছোট দরজাগুলো বন্ধ করে দেন।

ভেতরের লোকটা তখনই নড়েচড়ে বসবার সুযোগ পায়। সুরুৎ করে উঠে আসে মূর্তির ভেতরে—দাবার ছক যে লেভেলে রয়েছে—চোখ থাকে সেই লেভেলের একটু ওপরে।

মূল কামরার দরজা যখন খোলা হয়েছিল, তখন সেই কামরার পেছন দিকে একটা চৌকোনা বাক্স দেখা গেছিল। খুব সম্ভব এই বাক্সটাকে সে পিঁড়ের মতন ব্যবহার করে—অর্থাৎ, বসে তার ওপর।

এই অবস্থায় বসলে, মূর্তির ধড়ের মাঝখানে থাকে সহচরের দুই চক্ষু—পাতলা কাপড়ের ফাঁক দিয়ে দেখতে পায় দাবার ছক। নিজের বুকের ওপর দিয়ে ডান হাত টেনে এনে, মূর্তির বাঁ হাতের কলকব্জা নাড়ায়, আঙুল নাড়ায়, ঘুঁটি তোলে, ঘুঁটি বসায়, ঘুঁটি সরায়। বাঁ হাতের এই কলকব্জা থাকে মূর্তির বাঁ কাঁধের ঠিক নিচে—যাতে সহচর মহাশয় ডান হাতটা নিজের বুকের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে এনে টিপে যেতে পারে কলকব্জা।

কলের মানুষের চোখ ঘোরানো, মাথা ঝাঁকানো, মুখ দিয়ে 'কিস্তি' উচ্চারণ—এ সবই হয় অন্য কলকব্জা মারফৎ—সেগুলোকে কন্ট্রোল করে ভেতরের এই লোকই।

পুরো মেশিনটার *আসল কলকব্জা* খুব সম্ভব থাকে মূল কামরার ডানদিকে (দর্শকদের ডান দিকে) ইঞ্চি ছয়েক চওড়া খুদে বাক্সর মধ্যে—পার্টিশান দিয়ে আড়াল করা থাকে যে বাক্স।

সহচরের জন্যে পার্টিশানের সম্ভাবনা তাহলে থাকছে না। এ রকম পার্টিশান গণ্ডায় গণ্ডায় বানাতে পারে যে কোনও ছুতোর নানান প্যাটার্নে—কিন্তু সে

সবের দরকার হলো কী? মেলজেলের প্রদর্শনী বহুবার দেখবার পর এই সিদ্ধান্তে আমরা এসেছি। কিভাবে এসেছি, এবার তা স্তরে স্তরে পাঠকদের সামনে হাজির করা যাক।

১। তুর্কির হাতে দাবার চাল দেওয়া নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ঘটে না। প্রতিপক্ষ যখন চাল দেন, তুর্কির চাল পড়ে ঠিক তার পরেই। সব মেশিনই অবশ্য বেঁধে দেওয়া সময় মেনে চলে; সেই হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়ের চাল দেওয়ার সময়সীমা যদি তিন মিনিটে বেঁধে দেওয়া যেত, তাহলে তার একটু বেশি সময় নিয়ে পাল্টা চাল দিত মেশিন। কিন্তু এরকম কোনও সময়সীমা কোনও তরফেই যখন নেই (যদিও তা মেনে চলাটা অসম্ভব ছিল না মোটেই), তাহলেই দেখা যাচ্ছে সময়সীমা ব্যাপারটা অটোমেটনের ক্ষেত্রে খাটছে না; ঘুরিয়ে বললে—অটোমেটন *নিখাদ মেশিন* নয়।

২। অটোমেটন ঘুঁটি সরানোর ঠিক আগে, তার বাঁ কাঁধের ঠিক নিচের দিকটা স্পষ্ট নড়ে ওঠে; সেখানকার চাদরও নড়ে, নড়ে ওঠার সেকেণ্ড দুই পরেই তার বাঁ হাত এগিয়ে গিয়ে ঘুঁটি সরায়। বাঁ কাঁধের এই নড়াচড়ার ব্যতিক্রম কখনই ঘটে না।

এখন যদি ধরা যায়, প্রতিপক্ষ নিজের ছকে ঘুঁটি সরালেন, তাই দেখে অটোমেটনের ছকে প্রতিপক্ষর ঘুঁটি সরানোর জন্যে হাত বাড়িয়েছেন মেলজেল—এমন সময়ে প্রতিপক্ষ যেন নতুন চাল দেবেন ঠিক করে ফেললেন (অর্থাৎ ঘুঁটি সরানোটা মনোমত হয়নি)—নিজের ছকে ঘুঁটি আগের জায়গায় নিয়ে গেলেন।

প্রতিপক্ষের দিকে পেছন ফিরে থাকায়, মেলজেল তা দেখতে পেলেন না।

কিন্তু অটোমেটনের হাত আর এগোবে না, থমকে যাবে। কেননা, সে দেখতে পেয়েছে প্রতিপক্ষর ঘুঁটির ফিরে যাওয়া।

এই একটা ব্যাপার থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাবে, মূর্তির হাত কেন নড়ল না। কারণ, মূর্তির ভেতর থেকে প্রতিপক্ষর ঘুঁটি পালটানো কেউ দেখেছে।

সে কে? মেলজেলের সহচর।

মেলজেল টের পাওয়ার আগেই সে স্বচক্ষে দেখছে। মনের কাজ চলেছে বলেই কলের কাজ বন্ধ হয়েছে। এই মন সহচরের মন। মেলজেলের একার মন এ-মেশিন চালাচ্ছে না—চালাচ্ছে ভেতরকার লোকটার মন—পাতলা কাপড়ের মধ্যে দিয়ে সবই তো সে দেখছে।

৩। অটোমেটন প্রতিটি খেলায় কিস্তিমাৎ করে না। মাঝে মধ্যে হেরে যায়। অথচ যে মেশিনকে দাবাখেলার জন্যে তৈরি করা হয় এবং কিছু খেলায় জেতানোর মতন কলকব্জা যার মধ্যে থাকে—ইচ্ছে করলে 'সবখেলায় জেতানোর মতন কলকব্জাও তার মধ্যে ঢোকানো যেতে পারে। মেলজেল কি তাহলে ইচ্ছে করে মেশিনে খুঁত রেখেছেন'? কোনও আবিষ্কর্তাই তা করতে চান না। সুতরাং অটোমেটন-কে নিছক মেশিনও বলা যায় না।

৪। খেলা যখন জটিল হয়ে দাঁড়ায়, অটোমেটন কখনও কাঁধ ঝাঁকায় না, চোখ ঘোরায় না। মানুষ-খেলোয়াড় জটিল অবস্থায় পড়লে ধ্যানস্থ হয়ে যায়। মাথা নাড়ানো বা চোখ ঘোরানোর কথা মনে থাকে না। অটোমেটনের ভেতরে যে বসে আছে, জটিল খেলায় সে এমনই তন্ময় হয়ে যায় যে ফল টিপে অটোমেটনের কাঁধ ঝাঁকানো বা চোখ ঘোরানোর কথা মনেই থাকে না। খেলা যখন সহজ, অথবা একটা চাল দেওয়ার পর প্রতিপক্ষের চাল কি হবে যখনই বোঝাই যাচ্ছে—তখনই খেলোয়াড় আর টেনশনে কাঠ হয়ে থাকে না—উৎফুল্ল হয়—নড়েচড়ে; অটোমেশনকেও এইরকম সব অবস্থায় মাথা ঝাঁকাতে বা চোখ ঘোরাতে দেখা যায়—ভেতরকার মানুষটার মাথা যে তখন হাল্কা—মন দেয় কলকব্জার দিকে।

৫। মেশিনকে যখন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানো হয়, যখন তার কোমরের আর উরুর খুপরির ভেতরকার ঠাসা কলকব্জা দেখানো হয়, যখন মেশিনকে গড়গড়িয়ে চারদিকে নিয়ে যাওয়া হয়—তখন আমরা দেখেছি, কলকব্জার স্থানবিশেষ আনুপাতিক হিসেবে বেধড়ক বড়; অঙ্কন বিদ্যায় পদার্থের ঘনত্ব আর প্রকৃত দূরত্ব ও আকার যেভাবে দেখানো হয়—সেভাবে নয়; এককথায়, পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী মোটেই নয়। যেন, আয়নার প্রতিফলন।

বাস্তবিকক্ষেত্রে, আমরা বিশেষ পর্যবেক্ষণ চালিয়ে দেখেছি, ব্যাপারটা তাই ঘটে; আয়না বসিয়ে প্রতিফলন দিয়ে যন্ত্রের জঙ্গল বানিয়ে ফেলা হয়েছে। যাতে দর্শকরা মনে করেন, উফ! এ যে শুধু কলকব্জা—আসলে আছে সামান্যই কলকব্জা।

এ থেকেই আমাদের সরাসরি সিদ্ধান্ত দাঁড়াচ্ছে : মেশিনটা খাঁটি মেশিন নয়। আবিষ্কর্তা একে ধোঁকাবাজি দিয়ে জটিল মেশিন হিসেবে খাড়া করতে চেয়েছেন, সত্যিই জটিল মেশিনই যদি হতো, তাহলে আবিষ্কর্তা চাইতেন—মেশিন চালানোর পদ্ধতিটাকে *সহজতমভাবে* দেখানো।

৬। কলের মানুষের বাইরের চেহারা, তার চালচলন—সবই যেন রক্তমাংসের সজীব মানুষের অনুকরণ—কিন্তু হুবহু নয়—নকল বলে বোঝা যায়। মুখমণ্ডলে নেই মৌলিকতা, মোমের কাজ এতই সুস্পষ্ট যে নরমুণ্ড বলে তাকে চালানো যায় না। চক্ষুকোটরে নয়নের আবর্তন অতিশয় কৃত্রিম—চোখের পাতা আর ভুরু তালে তালে নেচে ওঠে না—কেঁপে যায় না। হাতের নড়াচড়াও রীতিমত আড়ষ্ট—ঝাঁকুনি মেরে মেরে যায় আয়তাকার প্যাটার্নে।

কৃত্রিমতার ছাপ রয়েছে অটোমেটনের সর্বাঙ্গে। একী ইচ্ছাকৃত, না, আবিষ্কর্তার অক্ষমতা? মেলজেল অটোমেটনকে সহজ আর স্বাভাবিক করে তুলতে পারেননি—এটাই বা বিশ্বাস করি কি করে? কারণ, মেশিনকে পারফেক্ট করার ব্যাপারে তিনি তো মনপ্রাণ খাটিয়েছেন।

অবিকল সজীব মানুষের মতন না হওয়াটা তাই নিছক অ্যাক্সিডেন্ট—এমন কথা না বলাই ভাল। অবহেলাটা ইচ্ছাকৃত। ইচ্ছে করেই তিনি মেশিনকে মেশিনের মতনই খটখটে জবড়জঙ্গ করে রেখেছেন।

কেননা, মেলজেলের হাতে তৈরি অন্যান্য অটোমেটন সজীব প্রাণীর নিখুঁত নকল। সেসব অটোমেটন দেখলে আসল কি নকল, বুঝতে সময় লাগে। সেই দক্ষতা তাহলে আছে মেলজেলের।

যেমন ধরা যাক, দাড়ি-নাচিয়ে কাঠের পুতুল। মেলজেলের অনুনকরণীয় সৃষ্টি। ক্লাউন যখন হি-হি করে হাসে, তখন তার ঠোঁট, তার চোখ, তার ভুরু, তার চোখের পাতা—মুখমণ্ডলের সব অংশই হি-হি হাসির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের কাজ করে চলে। একটা নয়—দুটো ক্লাউন, দুজনকেই খেলা দেখানোর আগে দর্শকদের হাতে দিয়ে পরখ করানো হয়। নেহাৎ তারা সাইজে খুদে বামন, নইলে তাদের কাঠের পুতুল বলা যেত না কিছুতেই।

সুতরাং আমরা বলব, দাবা-খেলুড়ে অটোমেটনকে ইচ্ছে করেই মেশিন-চেহারা দেওয়া হয়েছে। মূল আবিষ্কর্তা ব্যারন কেমপেলেনও তাই করেছিলেন—মেশিনের নকশাই ছিল ওইরকম। একেবারে কাঠখোট্টা টাইপের মেশিন—কলের মানুষ বললেই পাঁচজনের চোখের সামনে যে রকম চেহারা ভেসে ওঠে—অবিকল তাই। কিন্তু তা যদি না হতো, অটোমেটন যদি অবিকল মানুষের মতন ভাবভঙ্গী করত, তাহলে মানুষের কথাটাই দর্শকরা আগে ভাবত—অর্থাৎ, ভেতরে আছে মানুষের হাত।

তাই বলব, অটোমেটনের সব কিছুই আড়ষ্ট করে গড়া হয়েছে ইচ্ছে করেই—ভেতরের আসল মানুষের সম্ভাবনা যেন দর্শকদের মনের পর্দায় কখনোই ভেসে না ওঠে।

৭। খেলা শুরুর আগে অটোমেটনকে যখন দম দেওয়া হয়, তখন কান খাড়া করে শুনলে বোঝা যাবে—দম দেওয়ার চাবির সঙ্গে লেগে নেই কোনও ওজন, স্প্রিং বা কলকজা। সিদ্ধান্ত আগের মতনই: দম দিয়ে দর্শকদের উত্তেজিত করা হয়—না জানি কলের পুতুল এবার কি খেল দেখাবে। আসলে, সবটাই ভুল পথে চালনা করা। দম দেওয়ায় মেশিন চলছে না—চলছে মানুষের হাতে। কিন্তু লোকে ভাবছে, কলকজার কারসাজি।

৮। মেলজেলকে যখন খোলাখুলি জিজ্ঞেস করা হয় : 'বলুন, আপনার অটোমেশিন খাঁটি মেশিন কিনা' ওঁর জবাবটা প্রতিবারেই হয় এক রকম : 'কিছুই বলব না এ সম্পর্কে।'

কেন বলবেন না? সবাই জেনে গেছে, তাঁর অটোমেশন একটা মেশিন। সেই মেশিনের খেলা দেখাতেই তো এই প্রদর্শনী। 'হ্যাঁ' বলতে বাধা কী? কারণ, যদি লোকে সন্দেহ করে বসে যে তাহলে নিশ্চয় মেশিন নয়—তাই জোর গলায় ঢাক পিটিছেন।

'না' বলেন না কেন? জবাব : তা কি বলা যায়?

সিদ্ধান্ত একটাই : কথায় ধরা পড়ে যেতে পারেন বলেই কথা বাড়ান না—কাজে দেখান তাঁর অটোমেশন খাঁটি মেশিনই বটে। উনি জানেন, অটোমেশন খাঁটি নয়। জ্ঞানপাপী বলেই বোবা সেজে থাকেন।

৯। বাক্সের ভেতরটা দর্শকদের দেখানোর সময়ে, মেলজেল জ্বলন্ত মোমবাতি ধরেন এক নম্বর দরজার পেছনে এবং গোটা মেশিনটাকে এদিকে ওদিকে নাড়িয়ে দেখাতে চান যে ভেতরে কলকব্জা ছাড়া কিছু নেই। এই সময়ে খুব ধারালো চোখে দেখা গেছে, সামনের দরজার কাছের কলকব্জার অংশ একদম নড়ে না—কিন্তু পেছন দিকের কলকব্জার অংশ খুব অল্পমাত্রায় নড়ে যেতে থাকে মেশিন চালানোর সময়ে। এ থেকেই আগের সন্দেহটা পাকা হয়ে যাচ্ছে; অর্থাৎ, পেছনের কলকব্জা আলগা অবস্থায় আছে এবং পুরোটাই সরিয়ে নেওয়া যায়—ভেতরের লোকের সুবিধে মাফিক।

১০। অটোমেটনের সাইজ নাকি মানুষের সাইজের সমান—একথা বলেছিলেন স্যার ডেভিড ব্রুসটার। কথাটা ভুল। মেলজেল যখন অটোমেটনের কাছাকাছি আসেন, তখনই একটু হিসেব করলে আন্দাজে বোঝা যাবে—মেলজেলের মাথা থাকে অটোমেটনের মাথার প্রায় দেড় ফুট নিচে। এছাড়া অন্যভাবে অটোমেশনের সাইজের সঙ্গে মানুষের সাইজের তুলনা করা যায় না—কেন না, অটোমেশনকে তো মুড়ে-টুড়ে একইভাবে বসিয়ে রাখার জন্যেই তৈরি হয়েছে।

১১। বাক্সটাকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যেন ভেতরে কোনও মানুষের লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। যে বাক্স উচ্চতায় মোটে আড়াই ফুট, লম্বায় মোটে সাড়ে তিন ফুট, আর চওড়ায় মোটে দু'ফুট চার ইঞ্চি—তার মধ্যে মানুষ থাকবে কি করে?

কিন্তু বাক্সর ডিজাইনের কারচুপিটা অনেকেই দেখেন না? ওপরকার 'টপ' মনে হয় তিন ইঞ্চি পুরু কাঠের—কিন্তু ঘাড় বেঁকিয়ে উঁকি দিলেই দেখা যাবে—সেটা একটা পাতলা কাঠ ছাড়া কিস্সু নয়।

কাবার্ডের 'বটম' আর ড্রয়ারের 'টপ'—এই দুইয়ের মাঝে ফাঁক থাকে তিন ইঞ্চি। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ড্রয়ারের 'হাইট'।

সব মিলিয়ে দেখুন, কতখানি জায়গা বেরিয়ে গেল ভেতরে—অথচ 'ফল্‌স্ আইডিয়া' লোকের মাথায় ঢোকানো হয়—জায়গা কোথায় যে মানুষ থাকবে ভেতরে?

১২। মূল কামরার চারদিকে কাপড়ের লাইনিং দেওয়া থাকে। এই কাপড় দু'রকম হতে পারে। টানটান অবস্থায় তা একমাত্র পার্টিশান বলেই মনে হবে : অথচ, ভেতরের মানুষটার জায়গা বদলের সময়ে দিব্বি জায়গা ছেড়ে দেবে। দু'নম্বর উদ্দেশ্য : নড়াচড়ার ক্ষীণতম আওয়াজকেও মেরে দেওয়া।

১৩। প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়কে কখনোই কলের খেলোয়াড়ের টেবিলে বসতে দেওয়া হয় না—আলাদা টেবিলে বসেন। এক টেবিলে মুখোমুখি বসলে নাকি দর্শকরা কলের খেলোয়াড়কে দেখতে পাবে না। কিন্তু এ বাধা দুভাবে কাটিয়ে ওঠা যায়; দর্শকদের বসার জায়গা একটু উঁচুতে রাখলে; অথবা, খেলা চলার সময়ে টেবিল ঘুরিয়ে পাশের দিকটা দর্শকদের দিকে রাখলে।

কিন্তু তাহলেই তো বাক্সর মধ্যেকার লোকটার নিশ্বেসের আওয়াজ শুনতে পেয়ে যাবে প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়।

তাই তাঁকে বসানো হয় তফাতে।

১৪। মেলজেল যদিও মাঝে মধ্যে বাঁধা ধরা রুটিনের বাইরে চলে যান, মেশিনের ভেতর দেখিয়ে দেন,—রুটিনটা কি রকম আগেই তা বলেছি—কিন্তু কখনই রুটিন ছেড়ে বেশি বাইরে যান না—যতখানি গেলে আমরা যে সিদ্ধান্ত দেখিয়েছি, সেই সিদ্ধান্তে চোট লাগে—সেরকম বাড়াবাড়ি করেন না। যেমন ধরুন, ওঁকে দেখা গেছে প্রথমেই খোলেন ড্রয়ার—কিন্তু এক নম্বর কাবার্ডের পেছনের দরজা বন্ধ না করে কখনই খোলেন না মূল কম্পার্টমেন্ট—প্রথমে ড্রয়ার টেনে বের না করে কখনই খোলেন না মূল কম্পার্টমেন্ট—মূল কম্পার্টমেন্ট বন্ধ না করে কখনই বন্ধ করেন না ড্রয়ার—মূল কম্পার্টমেন্ট খোলা থাকলে কখনই খোলেন না এক নম্বর কাবার্ডের পেছনের দরজা—এবং গোটা মেশিন যতক্ষণ না বন্ধ হচ্ছে, ততক্ষণ শুরু করেন না দাবা খেলা। রুটিন থেকে একেবারেই যদি সরে না আসতেন, সেক্ষেত্রে অতিশয় জোরদার হয়ে দাঁড়াত আমাদের সমাধান; কিন্তু উনি ঈষৎ সরে আসার ফলে আরও জোরদার হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের সিদ্ধান্ত।

১৫। যন্ত্রমানুষের বোর্ডে ছটা মোমবাতি থাকে প্রদর্শনী চলবার সময়ে। সেই কারণেই প্রশ্ন জাগে, এত মোমবাতির দরকার কি? প্রদর্শনী ঘরে আলো রয়েছে যথেষ্ট—যেমন থাকে সব প্রদর্শনী কক্ষে; একটা কি দুটো মোম জ্বললেই দর্শকরা তো স্পষ্ট দেখতে পায় বোর্ড; নিছক মেশিন বলেই যদি ধরে নেওয়া যায় কলের খেলোয়াড়কে—তাহলে এত আলো দিয়ে তাকে দেখানোর দরকারটা কি? বিশেষ করে, প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়ের সামনে রয়েছে যখন মাত্র একটা মোমবাতি?

এতগুলো হেঁয়ালি বিচার করলে অবশ্যম্ভাবী একটি কাজ সিদ্ধান্তের আসা যায় : জোর আলো না থাকলে পাতলা স্বচ্ছ বস্তুর মধ্যে দিয়ে ভেতরের মানুষটা বাইরের দৃশ্য দেখবে কি করে? সে তো গ্যাঁট হয়ে বসে রয়েছে কলের মানুষের খোলসের মধ্যে—দেখতে হচ্ছে কলের মানুষের বুকের ফুটো দিয়ে।

মোমবাতিগুলোর সাইজ আর সাজানো-টা যদি খুঁটিয়ে দেখি, তাহলে আরও একটা কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আগেই বলেছি, মোমবাতি আছে মোট ছটা। কলের মানুষের দুপাশে তিনটে তিনটে করে। কোনও মোমবাতিই সমান সাইজের নয়। ধাপে ধাপে ছোট হয়েছে। একপাশের সবচেয়ে লম্বা মোমবাতিটা আর একপাশের সবচেয়ে লম্বা মোমবাতির চেয়ে তিন ইঞ্চি বেশি লম্বা— এইভাবে পাশের মোমবাতিগুলোও একই অনুপাতে খাটো হয়েছে। কিন্তু কেন?

কারণ, চোখের ধাঁধা তৈরি করা। অসমান দৈর্ঘ্যের মোমবাতিদের আলো তো বিশেষ এক জায়গাকে জোরালোভাবে উদ্ভাসিত করতে পারবে না—বুকের ফুটোয় পাতলা বস্তুর মধ্যে দিয়ে ভেতরকার মানুষটার চোরা চাহনিও দর্শকদের নজর আসবে না।

১৬। ব্যারন কেমপেলেনের দখলে যতদিন ছিল কলের দাবা খেলোয়াড় তখন বহুবার দেখা গেছে, ব্যারনের দলের একটি বিশেষ লোক কখনই দাবা খেলার সময়ে উপস্থিত থাকত না। দাবা খেলার আগে বা পরে তাকে দেখা যেত। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে দাবা খেলাও মুলতবি থাকত। বিশেষ এই লোকটি অন্য সব ব্যাপারে অজ্ঞতা স্বীকার না করলেও, দাবা খেলার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আকাট বলে নিজেকে জাহির করত। লোকটা জাতে ছিল ইটালিয়ান। মেলজেল যেদিন থেকে কিনে নিলেন কলের দাবা খেলুড়েকে, সেদিন থেকে ঠিক এইরকমই একটি লোককে দেখা গেল তাঁরও দলে। মাঝারি উচ্চতার এই লোকটি হাঁটত অদ্ভুতভাবে ঘাড় ঝুঁকিয়ে। দাবা খেলার আগে বা পরে তাকে দেখা যেত বটে, দাবা খেলার সময়ে নয়। তার কাজ ছিল শুধু কলের খেলুড়েকে প্যাকিং বাক্সে ঢোকানো আর প্যাকিং বাক্স থেকে বের করা। বছর খানেক আগে রিচমণ্ড শহরে খেলার প্রদর্শনীতে আচমকা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে এই লোকটি—খেলা বন্ধ রাখা হয় তখন। খেলা বন্ধের যে কারণটা দেখানো হয়েছিল—তার সঙ্গে অবশ্য এই লোকটির অসুস্থতার কোনও সম্পর্কই আবিষ্কার করা যায় না—তবে সুধী পাঠক এইসব ঘটনা থেকে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই উপনীত হতে পারবেন।

১৭। কলের খেলুড়ে দাবা খেলে তার বাঁ হাত দিয়ে। খুবই আশ্চর্য ঘটনা—দৈবাৎ ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। আরও আশ্চর্য এই যে এইরকম তাৎপর্যপূর্ণ একটা ঘটনা এতদিন সবার চোখ এড়িয়ে গেছে। *কলের মানুষ আগাগোড়া দাবার চাল দেয় বাঁ হাতে।* এই একটি ঘটনা থেকেই আমার নিখাদ সত্যে পৌঁছে যেতে পারি।

বাঁ হাতে খেলার সঙ্গে মেশিনের কোনও সম্পর্ক নেই। মেশিনকে যদি গড়া হতো ডান হাত দিয়ে চাল দেওয়ার উপযোগী করে, মেশিন তাই করে যেত। কিন্তু কেউ যদি ভেতরে বসে মেশিনের ডান হাতের কলকব্জা টিপে মেশিনের ডান হাতকে চালাতে যায়—তাহলে লোকটাকে দুমড়ে মুচড়ে অতি কষ্টে তুলতে হবে নিজের ডান হাত—কিন্তু যদি নিজের ডান হাতকে নিজের বুকের ওপর দিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে মেশিনের বাঁহাতের কলকব্জা টিপে, মেশিনের বাঁ হাত দিয়ে দাবার চাল দেওয়ায়—কাজটা হবে অতি সোজা।

এবং তাই হয়েছে। কলের দাবা খেলুড়ের রহস্যভেদের ইতিও এখানে। □

অসহ্য নৈঃশব্দ

[সাইলেন্স— এ ফেব্‌ল]

আমার মাথায় হাত রেখে বামন-দানব বলল—"শোনো হে, যে-অঞ্চলের কাহিনী তোমায় শোনাব, একফোঁটা কিন্তু ভয়ানক নিরানন্দ সেই জায়গাটা রয়েছে লিবিয়ায়—জেরি নদীর ঠিক পাশে। সেখানে প্রশান্তি নেই—নৈঃশব্দও নেই।

"সেই নদীর জল গেরুয়া রঙের বটে, কিন্তু কুচ্ছিত। সমুদ্রের দিকেও বয়ে যায় না, চিরকাল ছলছলাৎ করে যায় গনগনে লালসূর্যের চোখের নিচে। গতিবেগ প্রচণ্ড—কিন্তু যেন খিঁচুনি রোগে আক্রান্ত। নদীর দুই পাড়ে বহু মাইল পর্যন্ত প্যাচপেচে ধূসর মরুভূমির ওপর থুকথুক করছে দানবিক জল-পদ্ম। সুগভীর নৈঃশব্দে তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এ-ওর দিকে তাকিয়ে থাকে আর বীভৎস লম্বা ঘাড় আকাশের দিকে তুলে ধরে মাথা নেড়ে যায়। গভীর যে গুঞ্জন ধ্বনি ভেসে আসে ওদেরই দিক থেকে, মনে হয় বুঝি তার উৎস খরস্রোতা ফল্গুনদীর মধ্যে। তবুও তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাহাকার করে যায় একে অপরের দিকে—প্রত্যেকের বুক যেন চৌচির হয়ে যাচ্ছে বলেই বিরামবিহীন এই দীর্ঘশ্বাস ফেলে যাচ্ছে তারা অনন্তকাল ধরে।

"কিন্তু একটা সীমানা আছে এদের এই আশ্চর্য অঞ্চলের। সে সীমানা রচিত হয়েছে গভীর ছায়াচ্ছন্ন, ভয়ানক, সুউচ্চশির অরণ্য প্রদেশ দিয়ে। বিশাল

মহীরুহদের তলার দিকের শাখাপ্রশাখা অবিরল আন্দোলিত হয়ে চলেছে সেখানে (অথচ সেখানকার স্বর্গ থেকে মর্ত্য পর্যন্ত নেই কোথাও বাতাসের এতটুকু প্রশ্বাস), তা সত্ত্বেও দীর্ঘদেহ মহীরুহরা নিরন্তর দুলে দুলে উঠছে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ পুব দিক লক্ষ্য করে। পাতায় পাতায় ডালে ডালে ঘষটানির শব্দ কর্ণপটহবিদারী। প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য বলেই এমন লোমহর্ষক শব্দসৃষ্টি করতে এরা সক্ষম। প্রতিটি বৃক্ষের আকাশছোঁয়া শীর্ষদেশ থেকে নিয়মিত টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা শিশির। শিশির জমার শেষ নেই—শিশির পতনেরও শেষ নেই। শিকড় জুড়ে কিলবিলিয়ে যাচ্ছে অদ্ভুত বিষাক্ত ফুলের গোছা—তারা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত থেকেও সদা সঞ্চরমান—কেননা, তাদের ঘুমে বিঘ্ন ঘটছে অহর্নিশ—সুখনিদ্রা নেই বরাতে। মাথার ওপর দিয়ে হু হু করে ধেয়ে চলেছে গভীর কালো মেঘের দল—পশ্চিমে ছুটতে ছুটতে অবশেষে এক সময়ে তারা পাকসাট দিয়ে রচনা করছে প্রপাত—দুঃস্বপ্নময় দূর দিগন্তের ওপারে। অথচ বাতাস নেই আকাশের কোথাও। জেরি নদীর দুপাড়েও নেই প্রশান্তি, নেইকো নৈঃশব্দ।

"রাত হয়েছে। বৃষ্টি ঝরছে। পড়বার সময়ে বৃষ্টিই বটে, পড়ে যখন যাচ্ছে, তখন তা রক্ত। দীর্ঘবপু জলপদ্মদের পাঁকজমিতে দাঁড়িয়ে ভিজছিলাম আমি, জল পড়ছিল আমার সারা দেহে—ধু-ধু পরিবেশে একে-অপরের দিকে মাথা নেড়ে নেড়ে দীর্ঘশ্বাসের পর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে যাচ্ছিল জলপদ্মরা।

"আচমকা চাঁদ উঠে এলো কদাকার করাল কুয়াশা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে। টকটকে লাল রঙের চাঁদ। আমার চোখ গেল নদীর পাড়ে পড়ে থাকা মস্ত একটা পাথরের দিকে—ধূসর পাথর চাঁদের আলোয় বড় বিচিত্র রূপধারণ করেছে। বীভৎস, মহাকায় সেই শিলাখণ্ডের সামনের দিকে কিসব যেন খোদাই করা রয়েছে। জলপদ্মর জঙ্গল ঠেলে এগিয়ে গেলাম বিকট প্রস্তরের একদম কাছে—যাতে খোদাই করা লেখাগুলো পড়তে পারি। কিন্তু সাংকেতিক হরফগুলোর মানে বুঝে উঠতে পারিনি। তাই ফিরে যাচ্ছিলাম জলপদ্মদের জঙ্গলের দিকে। ঠিক তখনি চাঁদের আলো বেশি করে এসে পড়ল মাথার ওপর। সে আলোর রঙ ঘোর লাল। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, রক্তরঙে ছাওয়া বিকট পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ লেখাটা এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শব্দ একটাই, যার

"উর্ধ্বমুখে চেয়ে দেখলাম, প্রস্তর চূড়োর মাথায় দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। চট করে নিজেকে লুকিয়ে ফেললাম জলপদ্মর জঙ্গলে—লোকটা যাতে আমাকে দেখতে না পায়—আমি কিন্তু আড়াল থেকে দেখে যাব তার গতিবিধি। লোকটা বেজায় লম্বা, আকৃতি রাজকীয়, কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা রোমক পরিচ্ছদে। দেহরেখা তার অস্পষ্ট হলেও দেবত্ব যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে—মুখ তার ঢাকা পড়েনি অন্ধকারে, কুয়াশায়, চন্দ্রকিরণে আর শিশিরে। চিন্তায় কুটিল তার ললাট, উদ্বেগে উত্তাল তার দুই চক্ষু, দুই গালের বেশ

কয়েকটা গভীর রেখার মধ্যে কবরস্থ রয়েছে যেন অনেক চাপা দুঃখ। মানবজাতির প্রতি বিতৃষ্ণা, অপরিসীম ক্লান্তিবোধ আর নির্জনতার সন্ধান উৎকীর্ণ রয়েছে তার মুখের পরতে পরতে।

"প্রস্তরের চূড়ায় বসে পড়ে, হাতের ওপর চিবুক রেখে লোকটা নির্নিমেষে চেয়ে রইল খাঁ-খাঁ জনহীনতার দিকে। হেঁট হয়ে দেখল অশান্ত জলপদ্মদের, চাহনি ঈষৎ উঠিয়ে অবলোকন করল উত্তাল অস্থির গাছগুলোকে, দৃষ্টি চলে গেল এবার আকাশপানে—যেন বুনো ঘোড়ার মতন কেশর ফুটিয়ে ছুটছে কালো মেঘের দল—সবশেষে চেয়ে রইল রক্তলাল চন্দ্রের পানে। থরথর করে কেঁপে উঠল পুরো আকৃতি—খুব কাছেই জলপদ্মর জঙ্গলে বসে সুস্পষ্ট দেখলাম তার থরহরি কাঁপুনি—নিঃসীম নৈঃশব্দের কাঁপুনি—কিন্তু ঠায় বসে রইল সে পাথর চূড়ায়—রাত গড়িয়ে চলল বিরামবিহীনভাবে।

"আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে এনে লোকটা এবার তাকিয়ে রইল নিরানন্দ নদী জেরি-র দিকে, দেখল হলদেটে কুচ্ছিত জলধারা, দেখল দু' পাড়ের মৃত বর্ণময় ধু-ধু অঞ্চল। কান পেতে শুনে গেল জলপদ্মদের নিরন্তর দীর্ঘশ্বাসের হাহাকার—যার মধ্যে মিলেমিশে রয়েছে অদ্ভুত সেই গুঞ্জনধ্বনি—যা কিনা ফল্গুনদীর খরস্রোত থেকে উদ্ভূত বলেই মনে হচ্ছে। খুব কাছ থেকে দেখলাম তার নিঃসীম নৈঃশব্দের থরহরি কাঁপুনি—রাত কিন্তু গড়িয়ে চলল বিরামবিহীনভাবে। সে বসেই রইল পাথর চূড়ায়।

"অভিশাপ বর্ষণ করলাম ঠিক তখনি—ভৌত বস্তুদের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত আমার সেই অভিশাপে তুমুল ঝড় দেখা দিল সুদূর গগনে—অথচ একটু আগেই সে অঞ্চলে ছিল না হাওয়া-বাতাস কিছুই। প্রভঞ্জনের প্রতাপে জীবন্ত হয়ে উঠল গগনমণ্ডল—প্রবল বৃষ্টিধারা আছড়ে পড়ল লোকটার মাথায়—নদী ফুলে উঠে তেড়ে এল বন্যার আকারে—ফেনায় ভরে উঠল নদীর বুক—গলা চিরে বুঝি আর্তনাদ করে গেল জলপদ্মরা যে-যার মাটি আঁকড়ে—মত্ত ঝড়ের চপেটাঘাতে নুয়ে নুয়ে পড়তে লাগল বিপুলাকার মহীরুহরা—বজ্র গড়িয়ে গেল আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে—নেমে এল বিদ্যুতের ঝলক—থরথর করে কেঁপে উঠল বিশাল প্রস্তরের গোড়া পর্যন্ত। খুব কাছে লুকিয়ে থেকে দেখে গেলাম লোকটার কাণ্ড। নিঃসীম নৈঃশব্দ তাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে—রাত বয়ে চলেছে বিরামবিহীনভাবে।

"এবার আমি ক্রুদ্ধ হলাম। নৈঃশব্দের অভিশাপ বর্ষণ করলাম নদী, জলপদ্ম, আকাশ, বজ্র, অরণ্য, বাতাস আর জলপদ্মদের দীর্ঘশ্বাসের দিকে। অভিশপ্ত হয়ে তারা স্থির, অনড়, নিশ্চল হয়ে গেল। গতিরুদ্ধ হলো চাঁদের, মরে গেল বজ্র, বিদ্যুৎ আর চমকাল না—নিস্পন্দ হয়ে ঝুলে রইল মেঘপুঞ্জ—নদীর জল নেমে গিয়ে স্পর্শ করল তলদেশ এবং রয়ে গেল সেইখানেই—স্তব্ধ হলো মহীরুহদের অস্থির আন্দোলন—সেইসঙ্গে জলপদ্মদের দীর্ঘশ্বাস—বিচিত্র গুঞ্জন পর্যন্ত উত্থিত হল না পদ্মজঙ্গল থেকে, দূরবিস্তৃত মরু অঞ্চলের কোথাও শোনা গেল না

এতটুকু শব্দ। চোখ নামিয়ে দেখলাম পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ লেখাটা ঃ শব্দটা পালটে গেছে; এখন সেখানে লেখা রয়েছে 'নৈঃশব্দ'।

"তাকালাম মানুষটার মুখের দিকে। আতঙ্কে পাংশুবর্ণ হয়ে গেছে তার মুখ। ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠে উৎকর্ণ হয়ে শব্দ শোনার চেষ্টা করে গেল বটে, কিন্তু মরু অঞ্চলের কোনও অঞ্চল থেকেই ভেসে এল না কোনও কণ্ঠধ্বনি। পাথরের গায়ে লেখা 'নৈঃশব্দ' যেন আরও বেশি করে খোদাই করা হয়েছে বলে মনে হলো। থরথর করে কেঁপে উঠে পাথর থেকে নেমে এসে চম্পট দিল লোকটা—আর তাকে আমি দেখিনি।"

গল্প শেষ করে কবরের মধ্যে প্রস্থান করেছিল বামন-দানব। অনেক উদ্ভট কাহিনী আমি শুনেছি এবং পড়েছি দেশবিদেশে, কিন্তু এমন কাহিনী কখনও শুনিনি। □
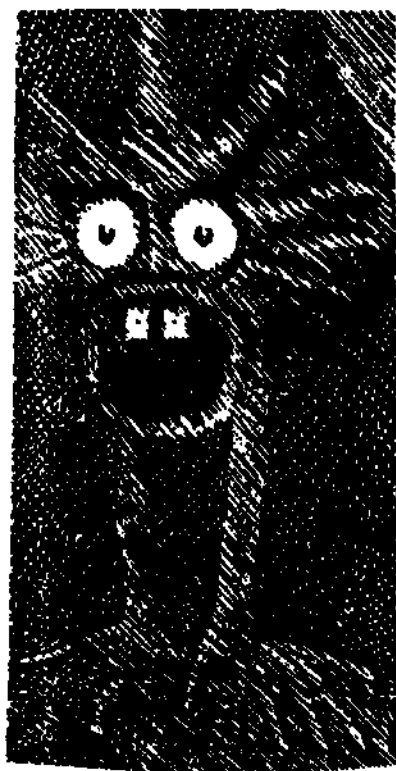
ফার্নিচার দর্শন

[ফিলজফি অফ ফার্নিচার]

ঘরদোর্ সাজানোর ব্যাপারে ইংরেজরা তুলনাবিহীন—বাড়ির বাইরের স্থাপত্যেও তাদের রুচি দেখবার মতো। ইটালিয়ানরা অবশ্য মার্বেল আর রঙের বাইরে আবেগ-উচ্ছ্বাসের একটা ক্ষেত্র আছে বলে মনেই করে না। ফ্রান্সের মানুষ ভাল জিনিসের কদর করতে জানে, ঘর সাজায় সেইভাবে। মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া তাদের ধাতে নেই। চাইনিজ আর বেশির ভাগ প্রাচ্য জাতি মাত্রা ছাড়িয়ে [illegible] এবং সাজসজ্জার মধ্যে একটু গরমভাব এনে ফেলে। স্কটল্যাণ্ডের মানুষ ঘর সাজাতেই জানে না। ওলন্দাজরা একটু অনিশ্চয়তায় ভোগে—ঘরের পর্দা আর বাঁধাকপির মধ্যে তারতম্য কোথায়—সেটা ঠিক করে উঠতে পারে না। স্পেনের সবাই ঝুলতে ভালবাসে—শুধু পর্দা ঝুলিয়ে যায়। রাশিয়ানরা ঘর সাজায় না। হটেনটট আর কিকাপু-রা বেশ আছে নিজেদের কায়দা নিয়ে। চোখ ধাঁধান জাঁকজমকে বিশ্বাসী কেবল ইয়াঙ্কিরা।

কিভাবে যে এটা হয়, আমার কাছে তা পরিষ্কার নয়। আমাদের রক্তে নেই আভিজাত্য। স্বাভাবিক কারণেই তাই ডলারের প্রাচুর্য দেখিয়ে চোখ ঝলসে দিই বিশেষ করে সেইসব দেশে যেখানে রাজবংশদের প্রতাপ চলে আসছে। লোক দেখানো ব্যাপারটা আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এই থেকেই।

ধোয়া-ধোঁয়া ভাবে না বলে পষ্টাপষ্টিই বলা যাক। ইংল্যাণ্ডে টাকার জোর নেই, কিন্তু বংশমর্যাদা আছে। সাধারণ মানুষ আদর্শ খুঁজতে গিয়ে ওপর দিকেই তাকায় এবং ওপর মহলের অন্ধ অনুকরণ করে। কথাবার্তা, আচার-আচরণে রাজকীয় ভাব ফুটিয়ে তোলে। আসবাবপত্তরের মধ্যেও থাকে সহজ সরল রুচিশীল বনেদিয়ানা। আমেরিকার মানুষ ওপর মহলের দিকে আদর্শ খুঁজতে গিয়ে ভেবে পায় না কোন্‌টা অনুসরণ করবে—চালিয়াতি না ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্যের ভার তো সবসময়েই বেশি—ডলারের চাকচিক্য এসে যায় অনিবার্যভাবে—ঘর সাজানোর দৃষ্টিকোণেও গ্যাঁট হয়ে বসে যায় ডলার—পরিণামস্বরূপ দেশজোড়া ত্রুটি চোখে পড়ার মতন।

ছবি জিনিসটাকে যেমন নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়—ঘরসজ্জার ক্ষেত্রেও তেমনি নিয়মিত পরিচর্যার প্রয়োজন। একটা ভাল তৈলচিত্র কখনই ভাল থাকে না, যদি না তার দেখভাল করা হয়।

ফার্নিচারের রঙ চোখকে যেমন পীড়া দেয়, ঠিক তেমনি ফার্নিচারের অবস্থানও চোখে ধাক্কা মারে। কেউ রাখে লাইন বরাবর—ছেদ নেই কোথাও; কেউ রাখে বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে—অতিশয় একঘেয়েভাবে। বহু ঘরের শোভা নষ্ট হয়ে যায় এই কারণে, ফার্নিচার দামি হওয়া সত্ত্বেও। জানালা দরজার পর্দা খুব কম ক্ষেত্রেই সুনির্বাচিত হয়, অথবা যথা জায়গায় ঝোলানো হয় না। দস্তুরমাফিক আসবাবপত্রে পর্দার ঠাঁই নেই। অচথ বিলক্ষণ অসঙ্গতি সৃষ্টি করে গাদা গাদা পর্দা এবং অকারণে দামি পর্দা যেখানে সেখানে ঝুলিয়ে কুরুচি দেখানো হয়।

প্রাচীনকালে কার্পেটের কদর যতটা ছিল, ইদানিংকালে তা বেশ বেড়েছে। তা সত্ত্বেও কার্পেটের প্যাটার্ন আর রঙ বাছতে গিয়ে ভুল করি হামেশাই। কার্পেট হলো গিয়ে ঘরের আত্মা। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্রের আকার, এমনকি তাদের রঙের মধ্যেও কার্পেটের অনুপ্রবেশ ঘটে। ঘরে জায়গা কম থাকলে ছোট কার্পেট লাগে, বেশি জায়গা থাকলে বড় কার্পেট লাগে—এ তথ্য সবাই জেনেও ভুল করে। রঙ ডিজাইন এইসব ক্ষেত্রেও চোখের বিচার না করে দামের বিচারে কার্পেট এনে ঘরে ফেলা হয়—অমুক দূর দেশের খোলতাই কার্পেট হলেই যেন ঘর আলো হয়ে উঠবে। মামুলি আইনে বিচারক হতে পারে যে কোনও সাধারণ মানুষ; কিন্তু ভাল কার্পেটের বিচারককে ধীমান হতেই হবে।

ঘর সাজাতে গিয়ে আমেরিকার মানুষ রুচিবিকৃতির চূড়ান্ত দেখিয়ে ফেলে প্রখর দ্যুতিময় আলো ঝুলিয়ে। সে আলো যত তীব্র হবে, আলো ঘিরে যত দামি কাট-গ্লাসের শেড থাকবে—ততই যেন ঘরের আভিজাত্য বেড়ে গেল মনে করা হয়। কিন্তু কেউ বোঝে না, কাট-গ্লাস নিশ্চয় শত্রুদের আবিষ্কার; আলো-কে অসম, ভাঙা আর বেদনাময় করে তুলতে কাট-গ্লাসের জুড়ি নেই। চোখ ধাঁধানো শেড বলে নয়, দামে বেশি শেড বলেই কাট-গ্লাস কেনার জন্যে এত হুড়োহুড়ি। এই ধরনের আলোয় ঘরের সুষমা তো গোল্লায় যায়, সেই সঙ্গে আকর্ষণীয়া ললনাদের অর্ধেক আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যায়। আলো হবে চাঁদের আলোর মতন।

ঘষা কাঁচের সাদাসিধে শেড দিয়ে ঘেরা থাকবে যেন ইথার দিয়ে গড়া আলোর উৎস। ঘরের প্রতিটি ফার্নিচার তখন চোখ আর মনকে টানবে—পুরো ঘরটাই তখন দেহমনে শান্তি বিলিয়ে দেবে। প্রখর গ্যাসের আলো এই কারণেই ঘরের মধ্যে বর্জনীয়।

ফ্যাশন দুরন্ত বেশিরভাগ ড্রইংরুমেই দেখি ঝুলছে, প্রিজম-কাট কাঁচের বিশাল ঝাড়বাতি—শুধু বেমানান নয়, বদরুচি আর ডলারের দম্ভের এর চাইতে নির্বোধ ঢক্কানিনাদ আর হয় না। গ্যাসের আলোয় যখন জ্বলে ওঠে ঝাড়বাতি, তখন শুধু নির্বোধ আর বালখিল্যরাই উল্লসিত হয়। অস্থির কম্পমান, দ্যুতিময় আলো চোখ ধাঁধিয়ে দেয়—মালিক ভাবে, আহা, কি জিনিসই কিনলাম। চেকনাই-এর প্রতি এই যে প্রবল ঝোঁক এই থেকেই আয়না দিয়ে ঘর সাজানোর উৎকট প্রবণতা এসেছে আমেরিকানদের মধ্যে। ব্রিটিশদের বিশাল আয়না তো বটেই—একটা দুটোয় মন ওঠে না—চাই একের অধিক—খানচারেক মস্ত মুকুর নাহলে যেমন ঘর সাজানোই হলো না। আয়না প্রতিফলন ঘটায়—একই দৃশ্য একঘেয়েভাবে বারেবারে ফুটিয়ে তুলে একঘেয়েমি এনে দেয়—বৈচিত্র্য মাঠে মারা যায়। নিতান্ত গেঁইয়া মানুষও চার-পাঁচখানা মস্ত মুকুর ফিট করা চোখ ধাঁধানো ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারে—কোথায় যেন লটঘট কিছু একটা হয়েছে; আবার এই একই লোক যদি রুচিসুন্দরভাবে সাজানো ঘরে ঢোকে—সে খুশি হবে, অবাক হবে।

গণতন্ত্র দিয়ে গড়া প্রতিষ্ঠানগুলোয় এইভাবেই ছড়িয়ে পড়ছে মহা অমঙ্গল। ডলার উৎপাদকরা রুচির মধ্যে দুর্নীতি এনে ফেলেছে। ডলারের থলি যার যত ভারি, তার আত্মা তত ছোট। মানুষ যত বড়লোক হতে থাকে, ততই মরচে পড়তে থাকে তার আইডিয়ায়। তাই দেখি মোটামুটি বিত্তবান আমেরিকানের ঘরে রুচিসুন্দরী ঘর আলো করে বসে আছে। অনায়াসেই পাল্লা দিতে পারে আমাদের সাগরপারের বন্ধুদের রুচির সঙ্গে। এই রকম একটা ঘরের খসড়া ছবি আঁকা যাক—যে-ঘরে সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছেন ঘরের মালিক, বাতাসে ভাসছে মোলায়েম ঠাণ্ডা, আকাশে রয়েছে চাঁদ, সময়ঃ মধ্যরাত্রি।

ঘরটা আয়তাকার—চওড়ায় প্রায় পঁচিশ ফুট, লম্বায় তিরিশ ফুট। ফার্নিচার সাজানোর পক্ষে অতি উত্তম। লম্বাটে ঘরের একদিকে একটা দরজা—খুব বড় নয়—আর একদিকে দুটো জানলা। দুটো জানলাই মেঝে থেকে ওপরে উঠেছে—জানালার পরেই রয়েছে ইটালিয়ান বারান্দা। জানলার কাঁচ ঈষৎ লাল—ফিট করা রয়েছে বেশ পুরু রোজউড ফ্রেমে। লাল কাঁচের সঙ্গে মানান সই রূপোলি সুতো দিয়ে বোনা পটি ঘিরে রেখেছে কাঠের ফ্রেম। ভাঁজ-ভাঁজ হয়ে রয়েছে অল্পমাত্রায়। মাঝে ঝুলছে গাঢ় লাল সিল্কের পর্দা। তাতে সোনালি আর রূপোলি কারুকাজ। কড়িকাঠ যেখানে দেওয়ালে মিশেছে—পর্দা ঝুলছে সেখান থেকে মেঝে পর্যন্ত। সোনালি দড়ি ঝুলছে পাশেই—যে-দড়ি ধরে টানলে সরে যাবে পর্দা। পর্দার সোনালি আর রূপোলি রঙ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ঘরের

সর্বত্র এবং জানিয়ে দিচ্ছে এ-ঘরের চরিত্র কী। গাঢ় লাল রঙের কার্পেট ঘিরে রয়েছে সোনালি দড়ি (যে দড়ি রয়েছে জানলায়), গোটা কার্পেট জুড়ে এই সোনালি দড়ি-ই এড়োএড়িভাবে এঁকেবেঁকে গিয়ে এমন একটা দৃষ্টিভ্রম সৃষ্টি করছে যেন কার্পেট ঠেলে উঠে রয়েছে মেঝে থেকে অথচ এ-কার্পেট আধ ইঞ্চির বেশি পুরু নয়। রুপোলি-ধূসর বর্ণাভা-সুন্দর চকচকে কাগজ মুড়ে রেখেছে সব কটা দেওয়াল—গাঢ় লালের বিন্দু অল্পমাত্রায় ছড়িয়ে আছে এই কাগজে—অনেকগুলো পেন্টিং-ও রয়েছে কাগজের ওপর—বেশির ভাগই কল্পনারঞ্জিন প্রাকৃতিক দৃশ্য। পরীর মতন সুন্দরী তিন চারজন মহিলার মুখের ছবিও আছে। প্রতিটা ছবিরই মূল সুর উষ্ণ, কিন্তু তরল নয়। জমজমাট তো নয়-ই। সাইজেও ছোট নয়। ফ্রেম বেশ চওড়া, তাতে সূক্ষ্ম কারুকাজ। আগাগোড়া সোনালি ভার্নিশ করা। দড়িতে ঝোলানো নয় কোনও ছবি—সেঁটে লাগানো দেওয়ালে। দড়িতে ঝুলিয়ে রাখলে ছবিটা ভালভাবে দেখা যায় বটে, কিন্তু ঘরের সামগ্রিক চেহারায় চোট লাগে। আয়না চোখে পড়ছে একটা-ই—তাও প্রকাণ্ড নয়। আকারে প্রায় গোল। এই আয়নাটাই কেবল ঝোলানো রয়েছে দেওয়াল থেকে এমনভাবে যাতে ঘরের অন্য সব বসবার জায়গায় বসলে আয়নায় নিজের প্রতিফলন ঘটানো যাবে না। বসবার জায়গা বলতে দুটো নিচু সোফা—রোজউড, গাঢ় লাল সিল্ক আর সোনালি ফুল দিয়ে তৈরি, আর দুটো রোজউডের চেয়ার। রোজউড দিয়েই তৈরি একটা পিয়ানো রয়েছে ডালাখোলা অবস্থায়। একটা সোফার কাছেই রয়েছে আটকোণা একটা টেবিল—মার্বেল-টপে যেন সোনালি সুতো জড়িয়েমড়িয়ে রয়েছে। টেবিলে কিন্তু আবরণ নেই। জানলায় পর্দাই যথেষ্ট। ঘরের কোণগুলো একটু গোল—প্রতি কোণে বসানো একটা করে ফুলদানি—প্রচুর টাটকা ফুল রয়েছে প্রতিটিতে। ঘুমন্ত বন্ধুর মাথার কাছে একটা লম্বা শামাদানে প্রাচীন দীপাধারে পুড়ছে সুগন্ধি তেল। শ'তিনেক সুন্দর-বাঁধাই বই রয়েছে ঝোলানো তাকে—প্রতিটা তাক ঘিরে রয়েছে সোনালি আর গাঢ় লাল রঙের মোটা দড়ি। এছাড়া ঘরে আর ফার্নিচার নেই—একটা ঘষা কাঁচের গাঢ় লাল রঙের শেড ছাড়া; খিলেন-আকারের সিলিং থেকে একটি মাত্র সরু সোনার শেকলে ঝুলছে এই ল্যাম্প—স্নিগ্ধ, জাদুকরি কিরণ বর্ষণ করে চলেছে ঘরময়। □

জেরুসালেম-এর একটি গল্প

[এ টেল অফ জেরুসালেম]

শহর ঘিরে বসে শত্রুপক্ষ। তারা রয়েছে অনেক উঁচু পাহাড়ের ওপর। সেখান থেকে অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা শহর আর দুর্গ। নিচের এই দুর্গ-শহর থেকেই এখুনি ভেট আসবে। নধর ভেড়া। বলি দেওয়ার পর ভেড়ার. মাংসে পেটপুজো করবে শত্রুসৈন্য। এরা সবাই ছিন্নমুষ্ক। নিচের শহরদুর্গের মানুষরা তা নয়—তাই তারা বিধর্মী।

পাহাড়ের ডগায় বসে দম্ভে ফেটে পড়ছে ছিন্নমুষ্ক সেনাপতি—"আমাদের উদারতা লোককে বলে বেড়ানোর মতন। অবরোধ করে বসে আছি শুধ খুঁচিয়ে মারবার জন্যে। তা না করে টাকা চাইলেও পারতাম। কিন্তু কি চাইছি আমরা? নধর ভেড়া—বলির জন্যে—আহারের জন্য।"

ওপর থেকে দড়িতে বেঁধে বাক্স ঝুলিয়ে দেওয়া হলো নিচে। ভারি জিনিস চাপানো হলো নিচে—তাই টান-টান হয়ে গেল দড়ি। অনেক জনে মিলে টেনে তুলল বাক্স।

হেঁট হয়ে প্রথমে যারা দেখেছিল বাক্সের চতুষ্পদ জীবটাকে—সোল্লাসে বসেছিল তারা—"খাসা ভেড়া। বাজাও তুরীভেড়ি, গলা ছেড়ে গাও গান—প্রাণ হোক আটখান্।"

বাক্স ওপরে উঠে আসার মুখ শুকিয়ে গেল প্রত্যেকেরই। বাক্স থেকে তেড়ে বেরিয়ে এল যে চতুষ্পদ জীবটি, দূর থেকে যাকে উত্তম ভেড়া বলে মনে হয়েছিল—আসলে সে একটি অতিকায় ছিন্নমুন্ড শূকর।

যার মাংস অতি পবিত্র—আহারের নামও উচ্চারণ করতে নেই! □

ভাঙল কেন কড়ে আঙুল?

[হোয়াই দি লিটল ফ্রেঞ্চম্যান ওয়্যারস্ হিজ হ্যাণ্ড ইন্ এ স্লিভ]

পাড়ার এক সুন্দরীর অনেক গল্প শুনেছিলাম। একদিন সকালে জানলায় দাঁড়িয়ে আছি আমার ছ'ফুট তিন ইঞ্চি শরীরটা নিয়ে, এমন সময়ে রাস্তার ওপারে জানলায় দেখলাম সেই সুন্দরীকে। আমি হলাম গিয়ে জমিদার মানুষ। খেতাব আমার লম্বা। কিন্তু ভাষাটা একেবারে গেঁইয়া—লণ্ডনের নিচের তলার ভাষা। কিন্তু কিন্তু দূর থেকে তো মুখে কথা বলার দরকার নেই—চোখের ইসারা করলাম। পাড়ার বিশ্বসুন্দরী ভীষণ অবাক হয়ে তক্ষুনি চোখের পাতা পতপত করল এবং এক চোখে একটা আতস কাঁচ লাগিয়ে মন দিয়ে আমাকে দেখে নিয়ে জানলা থেকে সরে গেল। বুক ফুলে উঠল আমার—এক নজরেই লক্ষ্যভেদ করেছি বলে।

পরের দিন সকালে তিন ফুট তিন ইঞ্চি হাইটের এক ফরাসী ভদ্রলোক এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল বিশ্বসুন্দরীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে বলে। আমার ছ'ফুট তিন ইঞ্চি বডিটাকে তক্ষুনি সাজিয়ে নিয়ে চলে গেলাম বিশ্বসুন্দরীর বাড়ি ঘরের একটি মাত্র সোফার মাঝখানে বসেছিল ভুবনমোহিনী। আমি সাড়ম্বরে অভিবাদন-টভিবাদন করে বসলাম তার বাঁ পাশে। অমনি ফরাসীটা ধপ করে বসে পড়ল সুন্দরীর ডান পাশে। ধৃষ্টতা দেখে রেখে টং হলাম। কিন্তু অভিজাত পুরুষ আমি—বাইরে তা প্রকাশ করলাম না।

দু'চারটে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলেই সুন্দরীর বাঁ হাতের কড়ে আঙুল তুলে নিয়ে যেই মোচড় দিয়েছি, অমনি ঝটকান মেরে হাত সরিয়ে নিয়ে দুই চোখে তিরস্কার বর্ষণ করে সে তাকালো আমার দিকে—যার মানে—'ছিঃ! ফরাসীটার সামনে কেন?"

আমি বুঝলাম। তক্ষুণি সোফার পেছনে আমার ডান হাত বাড়িয়ে দিলাম। যা ভেবেছি। ঠিক তাই। সুন্দরী তার ডান হাতের কড়ে আঙুল বাড়িয়ে রেখেছে সোফার পেছনে—ফরাসীর অগোচরে।

মনের আনন্দে কড়ে আঙুল মর্দন করে চলেছি, এমন সময়ে অত্যন্ত অসভ্যভাবে ফরাসীটা সুন্দরীর গায়ে গা ঘষে যেতে লাগল।

আমি খেড়ে উঠতেই সোফা তেড়ে ছিটকে উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সুন্দরী।

তা কি করে হয়! আমি তো ধরে আছি তার কড়ে আঙুল। চেঁচিয়ে বললাম—"কড়ে আঙুল রইল যে!"

সে শুনল না।

আর রাগ সামলাতে পারলাম না। ফিরে দেখি, যে কড়ে আঙুলটা ধরে আছি, সেটা ওই বেল্লিক ফরাসীর।

কড়ে আঙুল ছাড়িনি—ভেঙে দিয়েছিলাম। তারপর অবশ্য বিশ্বসুন্দরীর দারোয়ান এসে আমাদের দুজনকেই লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিল সিঁড়ির ওপর থেকে।

ফরাসী রাস্কেল বাঁ হাত ফেটিতে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে রাখে এই কারণে—কাউকে বলতে পারে না, কারণটা কী। □

স্টিফেন সাহেবের আরব্য কথা

[রিভিউ অফ স্টিফেন্স "অ্যারেবিয়া পেট্রা।"]

বাইবেলের ওপর আলোকপাত করার অভিলাষ নিয়ে দু'খণ্ডে লেখা এই বইটি বাস্তবিকই অনবদ্য। সহজ সরল ভাষায় মনের ভাব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার গুণে এ-বই পড়তে শুরু করলে ছাড়া যায় না।

বাইবেলের ঘটনাবলীর নানারকম ব্যাখ্যা ইদানিং প্রাচ্য দেশে লেখা হচ্ছে। ফলে, ভৌগোলিক বর্ণনা বাইবেলে যে-রকম আছে, তার মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে বর্তমানেও।

এই প্রসঙ্গেই অন্যান্য দু'একটা বিষয় আলোচনা করে নেওয়া যাক।

আজকের শহর আলেকজান্দ্রিয়া-র কথাই ধরা যাক। গত বছর ভয়ানক প্লেগ ছারখার করে দিয়ে গেছে শহরটাকে। তাসত্ত্বেও এখানে রয়েছে পঞ্চাশ হাজার বাসিন্দা—শহরেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে যাচ্ছে নিরন্তরভাবে। লিবিয়ান মরুভূমির মাঝখানে ডেলটা-র ঠিক বাইরেই আলেকজান্দ্রিয়া। একমাত্র এই ডেলটা খাল-ই জলপ্লাবনের সময়ে নীল নদের জল রিজার্ভারে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল এবং আলেকজান্দ্রিয়া যে মিশরের সঙ্গে যুক্ত—তখন তা ভাবা গিয়েছিল। গ্রেট আলেকজাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়া শহরে। উদ্দেশ্য ছিল, প্রাচ্য বিজয় নির্বিঘ্নে রাখা। সিরিয়া অথবা আফ্রিকা বরাবর উপকূলে একমাত্র নিরাপদ

বন্দর তো এখন এই শহরই। অদ্ভুত রকমের বাণিজ্যিক সুযোগসুবিধেও ছিল। ফলে, দেখতে দেখতে বিশাল শহর হয়ে দাঁড়ায় আলেকজান্দ্রিয়া। পনেরো মাইল পরিধি, তিন লক্ষ নাগরিক, প্রায় ততসংখ্যক দাসদাসী, মনোরম একটা রাজপথ—চওড়ায় দু'হাজার ফুট—শহরের এক প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে আর এক প্রান্তে—এক প্রান্তে ভূমধ্যসাগরের বন্দর, আর এক প্রান্তে ম্যারিওটিক হ্রদের বন্দর—সমদৈর্ঘ্যের রাস্তা আছে আর একটা, সমকোণে কেটে গেছে মূল রাজপথকে। আছে বিশাল সার্কাস আর রথ-দৌড়ের জায়গা, ছ'শ ফুটেরও বেশি লম্বা একটা ব্যায়ামাগার; এছাড়াও বিলাসপ্রিয় নাগরিকদের মনের মতন প্রচুর থিয়েটার আর স্নানকক্ষ। সারাসেন সৈন্য এ-শহর দখল করে নেওয়ার পর তাদের সেনাধ্যক্ষ ওমর খলিফকে জানিয়েছিল এখানকার সম্পদ আর সৌন্দর্যের খতিয়ান করা অসম্ভব। তখন নাকি, সেখানে ছিল চার হাজার প্রাসাদ, চার হাজার স্নানকক্ষ, চার হাজার থিয়েটার অথবা গণমিলন ভবন, বারোহাজার দোকান, চল্লিশ হাজার ইহুদি। মুসলমানদের হাতে পড়ার সময় থেকেই নাকি সবই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছিল, ইণ্ডিয়ায় যাওয়ার ঘুরপথ আবিষ্কার করার পর শেষ আঘাত পড়ে আলেকজান্দ্রিয়ার বাণিজ্যিক গৌরবে। এখন এই শহর তুর্ক আধিপত্যের প্রতীক হিসেব খাড়া থেকে ধুলোর মধ্যে থেকে আবার যেন মাথা তুলছে। শাসনব্যবস্থা শক্ত হচ্ছে, বাণিজ্যের আয়োজনও চলছে।

১৮৩৫ সালে আলেকজান্দ্রিয়া গিয়ে ওপরের তথ্যগুলি তুলে ধরেছিলেন স্টিফেন সাহেব। সেবার তিনি গেছিলেন নীলনদ পর্যন্ত। আরও যা লিখেছিলেন, তা পড়ে জানা যায় না মিশরের ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াবে। বাইবেল পাঠকদের কাছে তাঁর লেখার গুরুত্ব অবশ্য আছে। বিশেষ এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎবাণীসমূহ সম্বন্ধে তিনি যা-যা লিখেছেন, তা খুবই পরিষ্কার—ধোঁয়াটে ভাব একেবারেই নেই। পুরাকালের রাজবংশ যখন উন্নতির চরম শিখরে, তখনই ভবিষ্যৎদ্রষ্টারা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, রাজবংশ একেবারে নির্মূল হয়ে যাবে সিংহাসনে আসীন থাকতে থাকতেই। এত স্পষ্টভাবে ভবিষ্যৎবাণী বলা অসম্ভব বলেই মনে হয়, অথচ তা বিস্ময়কর। মোজেস-এর প্লাবন যে-সময়ে ঘটেছিল, তার আগেই যে মিশর প্রকৃতই রাজ্য ছিল, কতজন রাজা প্রত্যেকে কত সময় ধরে রাজত্ব করে গেছে, সে-সবও খুঁটিয়ে লেখা হয়েছে। মিশরে রাজা আর থাকবে না—এই ভবিষ্যৎবাণীর আগের দু'হাজার বছর মিশরের সিংহাসন কখনই রাজা-শূন্য থাকেনি। তাসত্ত্বেও নিখুঁতভাবে ভবিষ্যৎবাণীতে বলা হয়েছে, মিশরে নিজেদের রাজা আর থাকবে না, আগন্তুকদের হাতে মিশর ধুলোয় মিশে যাবে, রাজ্য হিসেবে নীচতম স্তরে মিশর নেমে যাবে, জাতি হিসেবে আর কক্ষনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না, ধু-ধু মরুভূমি ঘিরে থাকবে জনশূন্য আর একটা অঞ্চলকে। দুহাজার বছর ধরে যাচাই হয়ে আসছে দৈববাণীর সত্যতা। দাঁড়িয়ে আছে শুধু পিরামিডের পর পিরামিড—যাদের ক্ষয় নেই, ধ্বংস নেই—রয়েছে কাদায় গড়া পলকা বাসগৃহ—অতীত বা বর্তমানের মিশরের সঙ্গে আরও সুদূর অতীতের

প্রচণ্ড রাজশক্তির দর্প আর গৌরবের নেই কোনও মিল।

এটাও মনে রাখা দরকার যে, এমন অনেক ভবিষ্যৎবাণী আছে এই মিশর সম্বন্ধেই, যা এখনও সত্যি হয়নি। "সারা পৃথিবী হর্ষে ফেটে পড়বে, মিশর চিরকাল নীচস্তরে থাকবে না। ঈশ্বর প্রহারে জর্জরিত করবেন মিশরকে—প্রহার করে নিরাময় করবেন। ইত্যাদি।" মিশরের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি দেখে মনে তো হয়, ভবিষ্যৎবাণী ফলতে চলছে—ফারাওদের আমলের মিশরের ছায়ায় নতুন মিশর গড়ে উঠছে।

বিভিন্ন বই থেকে মিশরের বর্তমান অবস্থার যে-ছবি আমি পেয়েছি, তা এই : দাসপ্রথা এখনও সেখানে আছে। দুটো বড় নৌকো বোঝাই শ-ছয়েক ক্রীতদাসকে নিয়ে যেতেও দেখা গেছে। কিন্তু তুর্ক পরিবারে যে-ক্রীতদাস ঠাঁই পায়; সে অন্যান্য চাকরবারকদের চেয়ে বেশি আদরযত্ন, সম্মান আর বিশ্বাস পায়। স্বাধীনও হয়ে যেতে পারে (যা এখন আকচার হচ্ছে), তখন মালিকের জামাইও হতে পারে।

প্রাচ্যের মানুষদের আদবকায়দা আগের মতনই রয়ে গেছে। কিছু কিছু জিনিস, বাগ্‌ধারা, পোশাক, অনুষ্ঠান প্রাচীনকালের ছবি তুলে ধরে পর্যটকদের সামনে। নিখুঁতভাবে মনে করিয়ে দেয় বাইবেলের ভাষা আর ইতিহাসকে। বাড়ি, বাগান, অভ্যেস—এই সব ব্যাপার ইউরোপে হরদম পালটাচ্ছে—প্রাচ্যে একইরকম থেকে যাচ্ছে। দু'হাজার বছর আগে যা ছিল, এখনও তাই। প্রগতিকে এইভাবে নিরন্তর রুখে দেওয়ার যে প্রবণতা বজায় রয়েছে প্রাচ্যে, তা কিন্তু আশ্চর্যভাবে সীমিত রয়েছে বাইবেল ইতিহাসের অঞ্চলগুলোতেই। সভ্যতার জোয়ার সর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে-ভাবে চলেছে সর্বত্র—এখানে যেন তা বিপরীত দিকে প্রবহমান—মূলখাত থেকে তাই কিছুই নড়ছে না।

স্টিফেন্স সাহেব লিখেছেন, মিশরে জলভ্রমণ দারুণ সস্তা, বড় আরামের, ভারি মজার, আর একদম বিপদশূন্য। জলের দরে সব কিছুই কেনা যায়—নিজের দেশের পতাকা উড়িয়ে নৌকোভ্রমণ করা যায় দশজন মাঝিমাল্লা নিয়ে—মাসে ভাড়া দিতে হয় তিরিশ থেকে চল্লিশ ডলার।

এবার আসা যাক স্টিফেন্স সাহেবের আলোচ্য গ্রন্থের সবচেয়ে কৌতূহলপূর্ণ আর গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়। ওঁর ইচ্ছে ছিল মাউন্ট সিনাই যাবেন, সেখান থেকে পবিত্রভূমি দর্শন করবেন। সোজাপথ বর্জন করে মরুভূমির বিপদসঙ্কুল পথ মাড়িয়েই যাবেন—কেননা, আজও তা অনাবিষ্কৃত এবং দৈববাণীর অভিশাপ আজও সেখানে বহাল রয়েছে। সে জায়গার নাম ইডুমিয়া দেশ। স্টিফেন্স সাহেবকে ভবিষ্যৎবাণী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হয়েছিল তখনই। অনেক ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়—অনেকগুলোর অস্পষ্টতা ইচ্ছে করেই যেন রাখা হয়—প্রেরণা থাকে সর্বাগ্রে; সমগ্র খ্রিস্টান দুনিয়াকে একসূত্রে বেঁধে দেওয়ার জন্যেই যেন ভবিষ্যৎ কথাগুলো রচিত হয়েছে; এটা যখন বুঝতে পারা যায়—অস্পষ্টতা রয়েছে বুঝেও অবিশ্বাসকে কেউ আর মাথা চাড়া দিতে দেয় না—ভবিষ্যৎবাণী ফলে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। কোনও মানুষের পক্ষে

এতখানি ভবিষ্যজ্ঞান যে সম্ভব নয়—তা কি আর বোঝা যায় না।

'ল্যাণ্ড অফ ইডুমিয়া' সম্পর্কে ভবিষ্যকথনের বৃত্তান্তে এবার আসা যাক।

পুরুষানুক্রমে এ যায়গা উষরভূমি হয়ে থাকবে। কোনও কালেই এখান দিয়ে কেউ যেতে পারবে না। লম্বাগলা করমোর‍্যান্ট পাখি আর বকজাতীয় পাখিরা দখলে রাখবে এই দেশ। থাকবে পেঁচা আর দাঁড়কাক। ধু-ধু শূন্যতা, পাথর আর বিভ্রান্তি বিরাজ করবে সর্বত্র। বাইরের সম্ভ্রান্ত মানুষদের ডাকলেও কেউ আসবে না—রাজপুত্র বলেও কেউ এখানে থাকবে না। প্রাসাদে প্রাসাদে গজাবে কাঁটাঝোপ, দুর্গে দুর্গে থাকবে বিছুটি, রাজত্ব করবে শুধু ড্রাগন আর পেঁচা। মরুভূমির বন্য পশুর সঙ্গে সংঘাত লাগবে আশপাশের ভূমির বন্য পশুর। —আকাশবাতাস ফালা ফালা হয়ে যাবে তাদের রণহুঙ্কারে। টহল দেবে শকুনি। ...আমার অভিশাপে সবচেয়ে জনহীন হয়ে থাকবে মাউন্ট সিনাই—সেখানে যেতে গেলে অথবা সেখান থেকে আসতে গেলে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না কেউই।

মরুভূমি যাদের জন্মভূমি আর ঘরবাড়ি, দুর্ধর্ষ সেই আরব মানুষরাও এ-অঞ্চলে পা দিতে ডরায়।

এই অভিশাপ দেওয়ার আগে রোমান রাস্তা ছিল এই অঞ্চলের ওপর দিয়েই। তখন কেউ ভাবতেও পারেনি, একসময়ে এ রাস্তা দিয়ে কেউ আর হাঁটবে না—বিশ্বাস করা তো দূরের কথা। অভিশাপের সাতশ বছর পরের রিপোর্টে জানা গেছে, রাস্তাটার ব্যবহার ছিল তখনও। তীর্থযাত্রীরা অভিশপ্ত দেশ ছুঁয়ে গেছে, পাশ দিয়ে চলে গেছে—কিন্তু ভেতরে ঢোকেনি। আধুনিক পর্যটকদের অনেকেই মাড়িয়ে গেছেন অভিশপ্ত দেশ—মারা গেছেন অন্য কারণে—অভিশাপে নয়। সুতরাং, 'সেখানে যেতে গেলে অথবা সেখান থেকে আসতে গেলে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো না কেউই'—এই অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে মেলেনি।

স্টিফেন্স সাহেব অন্য অর্থ বের করেছেন অভিশাপ থেকে। বাণিজ্য সড়ক হিসেবে ইডুমিয়া-সড়কের ব্যবহার আর থাকবে না। গুরুত্ব কমে গেলে যা হয়।

অভিশাপের সত্যতা নিয়ে বাদানুবাদের মধ্যে না গিয়ে স্টিফেন্স সাহেবের একটা দ্বন্দ্ব নিয়ে আমার মত প্রকাশ করে আলোচনা শেষ করছি। মোজেজ ঠিক কোন জায়গা থেকে দলবল নিয়ে সাগর পেরিয়েছিলেন, তার বর্ণনা বাইবেলে লেখা আছে। সে জায়গার সন্ধান পেয়েও স্টিফেন্স সাহেব আরও এগিয়ে গিয়ে দুই পর্বতশ্রেণীর মাঝের একটা পথ খুঁজে পেয়ে, সেই গিরিপথকেই মোজেসের সাগর পেরোনোর পথ ভেবে নিয়েছেন। কিন্তু পেছনে ফারাও-এর মারমুখী সৈন্যদল নিয়ে ছ'লক্ষ সাঙ্গপাঙ্গ সমেত একরাতে সাগর পেরোনো ওই জায়গা দিয়ে কি সম্ভব? উনি কেন ভাবলেন না, এত বছরে সাগর সরে যেতে পারে, জল তিন ফুট নেমে যেতে পারে? সেই রাতে নিশ্চয় ভাঁটার টানে ঝড়ের প্রতাপে জল আরও নেমে গেছিল বলেই মোজেস রাতারাতি উপসাগরের মুখ বরাবর অল্প জল পেরিয়ে যেতে পেরেছিলেন একরাতেই—ছ'লক্ষ সঙ্গী সমেত।

সবশেষে বলি, স্টিফেন্স সাহেবের দুই ভলুমের এই গ্রন্থ অতিশয় সুখপাঠ্য। □

পিটার স্মুক-এর কাণ্ড শুনুন

[ম্যাগাজিন রাইটিং—পিটার স্মুক]

ম্যাগাজিন সাহিত্য নিয়ে সম্প্রতি একটা লেখা পড়লাম। যদিও ম্যাগাজিন সাহিত্যে ইংরেজ আর ফরাসীরা অনেক এগিয়ে আছে—আমেরিকানদের চেয়ে। আমেরিকায় আমরা শুধু হরফ সাজাই, ছাপি আর পড়ি—ম্যাগাজিনের আত্মাকে বুঝি উঠি না—যার সংজ্ঞা নেই, ব্যাখ্যাও নেই। ম্যাগাজিনের ক্ষমতা যে কতখানি, তা এখনও ধরতে পারিনি। এই শক্তিকে আমরা খর্ব করে রেখেছি, পত্রিকার ক্ষেত্রকেও আমরা সঙ্কুচিত করে রেখেছি—যে-ক্ষেত্রর কিনা কোনও সীমা নেই। বৈচিত্র্য নয়, বিষয় দিয়ে ইংরেজ আর ফরাসীরা তাদের ম্যাগাজিনকে এত শক্তিশালী করে তুলেছে এবং আমাদের টেক্কা মেরে গেছে। আমেরিকান ম্যাগাজিনের লেখা কদাচিৎ আমাদের আবিষ্ট করতে পারে—বিদেশী লেখায় মন মজে যায় সহজেই। ম্যাগাজিনের লেখায় বিশদে যেতে হয়—প্রকৃত আবিষ্কার সেইখানেই। আবেগের তাড়না অথবা প্রেরণার উদ্দামতা কখনই প্রকৃত মৌলিকতা নয়—এর চেয়ে বড় ভুল আর হতে পারে না। মৌলিক সৃষ্টি করতে গেলে খুব বুঝেসুঝে, ধৈর্যের সঙ্গে, অনেক যত্ন নিয়ে লিখতে হয়। বিশদে যাওয়ার চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু আমেরিকান ম্যাগাজিন লেখক বিশদে যেতে পারেন না একটাই কারণে—পত্রিকা প্রকাশকরা এত কম সম্মান দক্ষিণা

দেন যে পড়তায় পোষায় না। এই কারণে এবং আরও অনেক চোখে-আঙুল-দেওয়া কারণের জন্যে সাহিত্যের এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ শাখায় আমরা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছি না। অথচ এই শাখাটি প্রতিদিনই গুরুত্বে বেড়ে চলেছে এবং খুব শিগগিরই সাহিত্যের সব দপ্তরের চইতে বেশি প্রভাবশালী হয়ে উঠবে।

প্রকৃত আবিষ্কারের ক্ষেত্রেই যে শুধু আমরা শোচনীয়ভাবে পেছিয়ে আছি, তা তো নয়; শিল্পকলার ক্ষেত্রেও তো ঘাটতি রয়েছে আমাদের মধ্যে। সমালোচনা লিখতে গিয়ে কোন্ আমেরিকান পাঠকদের শুধু সমালোচনা ছাড়া আরও বাড়তি কিছু দিতে প্রস্তুত থাকেন? সমালোচনা যেন নিজেই একটা শিল্প হয়ে উঠুক—নিরপেক্ষভাবে সমালোচনার দাবি তুলতে পারে—এমন চিন্তাধারা ক'জনের মধ্যে আছে?

আমরা আমাদের অ-দক্ষতার চূড়ান্ত নিদর্শন উপস্থাপন করি গল্প-বাহী ম্যাগাজিনদের ক্ষেত্রে। জনা তিন চার ছাড়া আটলান্টিকের এপারে যে সুদক্ষ লেখক আর কেউ থাকতে পারেন, আমরা তা ভাবতেই পারি না।

গল্প লেখার ক্ষেত্রে ইংরেজ লেখক আর আমেরিকান লেখকের তুলনামূলক আলোচনায় এসেই যখন পড়লাম, তখন জনপ্রিয় সেই ইংরেজ কথাকার-এর 'পিটার স্নুক' গল্পটার বৃত্তান্ত পেশ করা যাক।

বিশপগেট স্ট্রিটে একটা কাপড়ের দোকান আছে। মালিকের নাম পিটার স্নুক। এই গল্পের ইনিই নায়ক। বোকা কিন্তু দাম্ভিক। তবে মানুষ হিসেবে ভাল। অষ্টপ্রহর ভয় পেয়েই আছেন, এইরকম একটা ভাব দেখান। ব্যবসাবাণিজ্য চলছিল ভালই—মিস ক্লারিণ্ডা বডকিন-এর সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগে পর্যন্ত। মেয়েটির বয়স প্রায় তিরিশ; মেয়েদের টুপি, লেস, ফিতে ইত্যাদি সামগ্রী প্রস্তুতের রহস্যে বিলক্ষণ মুন্সিয়ানা আছে। প্রেম আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা একটু টলিয়ে দিল খুদে ভদ্রলোক পিটার স্নুক-কে। ভেবে দেখলেন—'মিস ক্লারিণ্ডা যদি আমার সহধর্মিণী হয়, তাহলে দোকানটাকে দু'ভাগ করে নেব; একভাগে মেয়েদের জিনিসপত্র; তাহলে অন্য ভাগটাও ভাল চলবে। ভাড়া দেব একটাই— বিজনেস হবে ডবল। কাজকর্মও হবে বেশ আরামদায়ক।' এইসব ভেবে প্রেমপর্ব শুরু করে দিলেন আমাদের হিরো। সাড়া দিল মেয়েটি কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্তভাবে। পাঁচজন যে-সব জায়গায় জড়ো হয়, সেইসব জায়গায় হরদম নিয়ে যেতে থাকে মেয়েটিকে। তারপর একদিন মেয়েটিই প্রস্তাব দিলে, মার্গেট ভ্রমণে বেরনো যাক।

ঠিক হলো, মিস ক্লারিণ্ডা আগে রওনা হবে—অপরিহার্য কিছু কাজ সেরে পেছন ধরবেন মিস্টার স্নুক। কাজ চুকোতে জুলাই-এর অর্ধেক গড়িয়ে গেল। তারপর জাহাজে চেপে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলেন ভদ্রলোক। নিরাপদে পৌঁছেও কিছু অঘটন ঘটিয়ে ফেললেন তিনি। যেমন, নতুন যে-বাহারি কোটপ্যান্ট নিয়ে গেছিলেন, প্যাকেটশুদ্ধ সেই কোটপ্যান্ট জলে তলিয়ে গেল জাহাজ থেকে নামবার সময়ে—মিস ক্লারিণ্ডা কিন্তু পই-পই করে বলে দিয়েছিল—পুরোনো

জামাপ্যান্ট পরে যেন তার সামনে না যাওয়া হয়; হোঁচট খেয়ে হিরো মশায় দু'হাঁটুর নিচে ছাল-চামড়া এমনভাবে তুলে ফেললেন যে শল্য চিকিৎসক কোনও কথায় কান না দিয়ে ব্যবস্থা করে দিলেন যাতে বেশ কিছুদিন প্রেমিকার সাথে নাচানাচি না করতে পারেন মিস্টার স্নুক। গোদের ওপর বিষফোড়া আর বলে কাকে—ফট্ করে একটা বোতল-খোলা ছিপি কোত্থেকে উড়ে এসে লাগল স্নুক সাহেবের একটা চোখে এবং সাময়িকভাবে কানা হয়ে রইলেন তিনি; মণিকাঞ্চণ যোগ ঘটল মিস্টার লাস্ট নামক এক ভদ্রলোকের আবির্ভাবে—যিনি কিনা জুতো বানিয়ে পেট চালান, চেহারায় কিন্তু মিলিটারির মতন—বেজায় লম্বা; মিস্টার স্নুক আসতে যেটুকু দেরি করেছিলেন, ওটুকু সময়ের মধ্যেই তিনি চুটিয়ে প্রেম জমিয়ে নিলেন মিস ক্লারিণ্ডার সঙ্গে; নাটকের শেষ অঙ্কে দেখা যাচ্ছে, মিস্টার লাস্ট-এর ঘুসি খেয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখছেন মিস্টার স্নুক এবং মিস ক্লারিণ্ডা দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেওয়ায় পথের ফকির হয়ে জাহাজে চেপে বাড়ি ফিরছেন আমাদের হিরো—যে-জাহাজে এসেছিলেন, ফেরৎ যাচ্ছিন সেই জাহাজেই।

জাহাজ নোঙর ফেলল একটা জায়গায়। বহু আরোহী নেমে গেল ডাঙায় মজা লুটতে। মিস্টার স্নুক-এর ট্যাক খালি। তাই ঠিক করলেন, ঘুমিয়ে কাটাবেন। পরের দিন এক পাওনাদারের টাকা মিটোনোর ব্যবস্থা করতে হবে তো।

কয়েকজন খালাসি কিন্তু পিটারকে নিয়ে মজা করে গেল জাহাজেই। মদ-টদ খাইয়ে জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল জলে।

এরপর দেখা গেল ভোররাতে দোকানে ফিরে এসেছেন পিটার। সহকারীকে বোঝাচ্ছেন, অমুক পাওনাদাবের টাকা মিটোনো দরকার। সহকারী বলছে, ভাববেন না। ক্যাশবাক্সেই তো টাকা রয়েছে। হিসেবপত্র আমি দেখে রেখেছি—টাকায় টান পড়বে না। পিটার কিন্তু যাওয়ার সময়ে বলে গেলেন—'মালপত্তরের অর্ডার দিতে যাচ্ছি। জিনিস এলে গুছিয়ে রাখবে।'

প্রথমে গেলেন ব্যাঙ্কে। সেখান থেকে নিজের টাকার প্রায় সবটাই তুলে নিলেন। তারপর বড় বড় দোকানে রাশি রাশি মদ ইত্যাদির অর্ডার দিলেন—অল্প-অল্প টাকা অগ্রিম দিলেন। অমুক ব্যাঙ্কে টাকা থাকে জেনে কেউ আর আপত্তি করল না। সন্ধ্যে নাগাদ দোকানে ফিরে সহকারীকে দিয়ে জিনিসপত্র আশ্চর্য তৎপরতায় প্যাক করে গেলেন। পরের দিন ভোররাতেই মালপত্র নিয়ে তুললেন জাহাজে। সঙ্গে রয়েছে সহকারী।

এরপরেই দেখা যাচ্ছে, পাওনাদাররা বিল নিয়ে এসেছে। কিন্তু দোকান তো ফাঁকা! ব্যাঙ্কে দৌড়েছে তারা। সেখানেও তো টাকা নেই—আগের দিন তুলে নিয়ে গেছেন পিটার।

শেষপর্যন্ত জাহাজে ধরা গেল পিটারকে। পাওনাদারদের সঙ্গে উকিল দেখে তিনি অবাক। ব্যাপার কী?

সেই জাহাজের খোলের মধ্যে পাওয়া গেল পিটারের সহকারী আর তিনজন দুর্ধর্ষ চেহারার মানুষকে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায়।

একী রহস্য! পিটার কি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে পাগল হয়ে গেছেন? কিন্তু তাঁর ঠান্ডা অমায়িক কথাবার্তা শুনে তো পাগল বলে মনে হচ্ছে না! সাধু মানুষটা হঠাৎ এই জোচ্চুরির পথ ধরলেন কেন?

পিটারের কথা শুনে তাজ্জব প্রত্যেকেই। আইন তাঁকে ছুঁতে পারবে না—যদিও তাঁর কথা সত্যি হয়।

কথাটা কী?

ফিরে যেতে হয় জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলার ঘটনায়। ডুবে যেতে যেতে হঠাৎ তিনি টের পেয়েছিলেন, বগলের মধ্যে একটা দাঁড় ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। দাঁড় চেপে ধরতেই তাঁকে একটা নৌকোয় টেনে তোলা হয়। নৌকো ভেড়ে একটা জাহাজে। জাহাজের ক্যাপ্টেন ভারি ভাল মানুষ। আকারে তাঁর মতন। তিনি পিটারকে আহ্লাদে খানাপিনা করান এবং ফুর্তির চোখে পেটের সব কথা বের করে দিয়েছিলেন পিটার। তারপর নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম থেকে উঠেই দেখছেন উকিল আর পাওনাদারদের। দোষটা তাঁর কোথায়?

মাথা ঘুরে গেল উকিলের। তবে কি খানাপিনা করিয়ে পিটারকে ঘুম পাড়িয়ে, পিটারেরই জামাকাপড় পরে (আকারে পিটারের মতনই যে), ভোররাতের অন্ধকারে আর সন্ধ্যের আঁধারে সহকারীর চোখে ধুলো দিয়ে সেরা জোচ্চুরি করে গেছে এক তঞ্চক-সম্রাট?

কাহিনী এখানেই শেষ। দীর্ঘ কাহিনীতে বিশদবর্ণনা আছে—যেখানে যতটুকু দরকার, ততটুকু—সব মিলিয়ে অতীব সুখপাঠ্য। গল্পের শেষে না পৌঁছোনো পর্যন্ত পাঠককে দমবন্ধ করে রাখতে হয়—শেষ করার পরেও গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে হয়।

এই না হলে গল্প? □

হাতুড়ে সমালোচক

[দ্য কোয়াক্‌স্ অফ হেলিকন—এ স্যাটায়ার]

আজকের যুগে, বিশেষ করে একজন আমেরিকানের হাতে, বিদ্রূপাত্মক কবিতা লেখা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় অভিনবত্ব। এ ব্যাপারে আমরা, আটলান্টিকের এ-পারের বাসিন্দারা, যা করেছি, তার কোনটাই তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। সাহিত্যিক হিসেবে আমরা নিতান্ত অপদার্থ না হলেও, ব্যঙ্গবাক্য রচনায় আমরা সিদ্ধহস্ত নই। এক কথায়, বিদ্রূপ আর উপহাসের চাবুক চালিয়ে সমাজ গড়তে আমরা জানি না।

মিস্টার উইলমার-এর লেখা 'দ্য কোয়াক্‌সয় অফ হেলিকন' হাতে পেয়ে তাই আমরা খুশি হয়েছি। এ দেশের সূর্যতলে এ যেন নতুন সৃষ্টি। খুবই নিষ্ঠা নিয়ে লেখা। সাহিত্য-সমালোচনার যে-সর্বজনীয় দুর্নীতি আর অসংলগ্ন লম্বাচওড়া বাজে বকুনির হাওয়ায় আমাদের দম আটকে আসছে—তার মধ্যে তাঁর সৃষ্টি এনেছে এক ঝলক 'সত্যি'র হাওয়া—অ্যাকসিডেন্ট ছাড়া একে আর কি-ই বা বলা যায়!

কবিতা হিসেবে 'দ্য কোয়াক্‌স্ অফ হিলিকন'-এর অনেক ত্রুটি আছে। মিস্টার উইলমার আমাদের ব্যক্তিগত বন্ধু হলেও দোষগুলি তুলে ধরে আমরা সুখীই হবো; গুণও আছে—আশ্চর্য সেই সদ্‌গুণ না থাকলে বিদ্রূপাত্মক কাব্য হিসেবে

এ-বই একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যেত—যে-গোষ্ঠীদের আঘাত হানবার জন্যে এত আয়োজন সেই গোষ্ঠীরাই বিদ্রূপের হাসি হাসত।

সবচেয়ে বড় দোষটা হলো, অনুকরণ। ড্রাইডেন আর পোপ-এর বিদ্রূপাত্মক রচনার কায়দায় যদি গোটা বইটা লেখা হতো, তাহলে বলতাম উৎকৃষ্ট রচনা হয়েছে। কিন্তু অনুকরণ যে ধরা যাচ্ছে; শব্দগুচ্ছ, ছন্দ, পরিচ্ছেদ-বিন্যাস, বিদ্রূপের মোটামুটি ধরন—সবই ড্রাইডেন-এর। ওই সময়ের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ঠাসা রচনা উৎকর্ষের শিখরে উঠেছিল নিঃসন্দেহে—বর্তমান যুগের কেউ নব-প্রয়াসে মেতে উঠলে সেই উৎকর্ষের শিখর থেকে পতন ঘটবেই এবং মৌলিকতাকেও বিসর্জন দিতে হবে। কপি করে মিস্টার উইলমার যে একটা ভাল নজির রেখে গেছেন, সে ব্যাপারে তো চোখ মুদে থাকতে পারি না। মানসিক চিত্রগুলো তো মিস্টার উইলমার-এর নিজস্ব—কারও 'ইমেজ' তিনি চুরি করেন নি—কিন্তু এ গুলোকেই তিনি যে-সব ছাঁচে ঢেলেছেন—সেই ছাঁচগুলোই যে ড্রাইডেন আর পোপ, রোচেস্টার আর চার্চিলের।

অনুকরণপ্রিয়তার জন্যেই দোষগুলো করে ফেলেছেন মিস্টার উইলমার। সুবুদ্ধি খাটিয়ে অনুকরণ না করলেই পারতেন। সৌন্দর্য মনে করে অনেক সময়ে যা কপি করেছেন, আসলে তা ত্রুটি। যেমন, War শব্দের সঙ্গে declare শব্দ মিলিয়েছেন—পোপ-এর অনুকরণে, কিন্তু খেয়াল করেননি, দুটি শব্দেরই আধুনিক উচ্চারণ সে-যুগের উচ্চারণের মতো নয়।

না বলেও পারছি না, নোংরামির জন্যে 'দ্য কোয়াক্‌স্ অফ হেলিকন' বিলক্ষণ কলুষিত হয়েছে। অথচ এই নোংরামি যে মিস্টার উইলমারের মনের সহজাত, তা বলা যায় না; সুইফট আর রোচেস্টারের লিখন-শৈলীর অন্ধ অনুকরণ মারাত্মক ক্ষতি করেছে উইলমার-সৃষ্টিকে। 'যা বলতে হবে, তা পষ্টাপষ্টি বলা যাক'—হক কথা। কিন্তু যা নোংরা, তা যেন কখনও কল্পনা আর কথনের মধ্যে আনা না হয়।

অনুসরণ হলেও 'দ্য কোয়াক্‌স্ অফ হেলিকন' অনেক অপ্রিয় সত্যি হাজির করেছে; বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যা লেখকের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। এহেন যোগ্যতা আর দুঃসাহস আছে বলেই আমরা মিস্টার উইলমারকে বলব—চালিয়ে যান।

আবার বলছি : উনি যা বলেছেন, তা সত্যি; এবং এই যা বলললাম, তার প্রতিবাদটা করবে কে? সাহিত্যজীবি হিসেবে আমরা সত্যিই তো দমবাজ প্রবঞ্চক—একবার এটা বলছি, আবার সেটা বলছি; দল, উপদল, গোষ্ঠীর যন্ত্রণায় কে না ভুগছে? ছল-চাতুরি-কুতর্ক করে খ্যাতির চুড়োয় ওঠা যে অনেক সহজ—সাহিত্যিক প্রতিভা খাটানোর চাইতে এই ধারণা কি হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে না? বইয়ের সমালোচনার মধ্যে যে দুর্নীতি ঢুকে বসে আছে, এটা কি অস্বীকার করা যায়? সমালোচনার শক্তির হাত কেটে দিচ্ছে তো ঘুষখোর সমালোচকরাই! সমালোচক আর প্রকাশকদের মধ্যে অবৈধ আঁতাত তো এখন সর্বজনীন নোংরামি হয়ে দাঁড়িয়েছে—ব্ল্যাকমেল করে টাকা নিয়ে পকেটে পুরতে

কেউ কি চোখের পাতা কাঁপাচ্ছে? ঘুষ ছাড়া একে কি আর বলা যায়? এতে পাঠকদের, ক্রেতাদের এবং বিক্রেতাদের সমান ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। কেউ যদি অত্যন্ত কুখ্যাতভাবে সত্যি এই ঘটনাকে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন, তাহলে কিন্তু আমরাই হেসে গড়িয়ে পড়ব। এর মধ্যেও কিছু মহৎ ব্যতিক্রম আছে অবশ্য। বেশ কিছু সম্পাদক কারও তাঁবেদার নন—মনেপ্রাণে স্বাধীন—প্রকাশকদের কাছ থেকে এঁরা বই পর্যন্ত নেন না। নিলেও, আগেভাগেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়—সমালোচনা হবে একেবারে নিরপেক্ষ। কিন্তু এঁদের সংখ্যা খুবই কম—পাল্লাভারি করছে অসাধু বই উৎপাদক আর ধারে বই পড়তে দেওয়ার পুস্তক-বিক্রেতারা। এঁরাই মিথ্যে গণমত এমনভাবে তৈরি করে ফেলছেন যে সত্যি কল্কে পাচ্ছে না।

অনেক তিক্ততা নিয়ে এই ভর্ৎসনা করতে হচ্ছে। উদাহরণ তুলে ধরার দরকার দেখি না—প্রায় সব বই খুললেই উদাহরণ পেয়ে যাবেন। ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে দেওয়ার বিজ্ঞাপন-পদ্ধতি বাজার ছেয়ে ফেলেছে। দিনকে রাত, রাতকে দিন বানানো হচ্ছে। বলাবাহুল্য, এ ধরনের বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছেন প্রকাশকরা। ইদানিং আরও একটা প্রক্রিয়া চালু হয়ে গেছে। মাইনে করা লোক দিয়ে মন্তব্য-ঠাসা বিজ্ঞপ্তি বইয়েব পুস্তনিতে সেঁটে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে অগুন্তি পত্র-পত্রিকায়—যাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে প্রকাশকরা। কিছু পত্র-পত্রিকায় এই অসাধুতার প্রতিবাদ বেরচ্ছে। আমরা আশা করব, তাঁরা আরও সোচ্চার হয়ে উঠবেন জনগণের এবং সাহিত্যের কল্যাণ কামনায়।

আমাদের পত্রিকার সঙ্গে যাঁদের যোগাযোগ আছে, তাঁরা প্রত্যেকেই কিন্তু সত্য আর সততার পক্ষে লড়াই করে যাচ্ছেন। ফল ভাল হবেই। গোষ্ঠী-ষড়যন্ত্রের বলি হচ্ছেন যে সব ধীমান সাহিত্যজীবিরা—তাঁরা উপকৃত হবেনই। এঁরা ভুগছেন গোষ্ঠী দলপতিদের সঙ্গে দহরম-মহরম রেখে চলেন নি বলে। এমন একটা দিন আসবেনই, যেদিন ধীমান সাহিত্যজীবিদের মতামত মাথায় তুলে নেওয়া হবে এবং সেই মতামত ধারে কাটবে—ভারে নয়। এখনই তার কিছু-কিছু নিদর্শন পাওয়াও যাচ্ছে।

নতুন বইয়ের মামুলি সমালোচনা-ভরা বিজ্ঞপ্তির ধরন দেখে কি হাসি পায় না? এর চাইতে হাস্যকর আর কিছু আছে কী? বিন্দুমাত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠও যিনি নন, যাঁর সামান্যতম বিদ্যা-নৈপুণ্যও নেই—ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর হয়তো ব্রেন-ও নেই, এবং সদা সময়ের অভাবে ভুগছেন—এইরকম একজন সম্পাদক অক্লেশে জগতের সামনে জাহির করতে চান নিজেকে এইভাবে যে, তিনি নাকি রোজ রাশি রাশি প্রকাশনা পড়ছেন, গিলছেন এবং সমালোচনা ব্যক্ত করে ফেলছেন—এমন সব প্রকাশনা যে-সবের এক-দশমাংশের টাইটেল-পেজ'ও তিনি পড়েন নি, যে-সবের তিন-চতুর্থাংশ বিষয়বস্তু তাঁর কাছে হিব্রু পড়ার মতোই দুর্বোধ্য, যে-সবের পুরো আয়তন মাসে হয়তো দশ কি বারোজন পাঠকের গোচরে আসে! বিশ্বাসযোগ্যতার অভাবটা পূরণ করে নেন হীনভাবে অনুগত

থেকে; সময়ের অভাবটা পুরিয়ে নেন চড়া মেজাজ দেখিয়ে। এ জগতে সবচেয়ে সহজে যে-সব মানুষদের খুশি করে তোলা যায়—ইনি তাঁদের শিরোমণিস্বরূপ; নোয়া ওয়েবস্টারের পাঁজির মতন মোটা অভিধান থেকে আরম্ভ করে টম থাম্ব-এর সুর্বশেষ হীরক সংস্করণ পর্যন্ত তাঁর চিত্তে পুলক তোলে এবং তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। অসুবিধে তাঁর একটাই; আনন্দে আটখানা হয়েও প্রকাশ করবার মতব জিহ্বা তাঁর নেই। তাঁর কাছে প্রতিটা পুস্তিকা একখানা অত্যাশ্চর্য কাণ্ড; বোর্ড বাঁধাই প্রতিটা পুস্তক একটা করে নতুন যুগ; ফলে, দিনকে দিন তাঁর বাক্যগুচ্ছ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হতেই থাকে—গেঁইয়া ভাষায় যাঁকে বলা যেতে পারে—বকমবাজ!

তা সত্ত্বেও সাধারণ পাঠক আর বিদেশীরা সঠিক তথ্য লাভের আশায় হাল্কা ম্যাগাজিন সরিয়ে রেখে ভারি ম্যাগাজিনের দিকে ঝোঁকেন। ত্রৈমাসিকদের অসংলগ্ন লম্বাচওড়া বুকনি যে কতখানি মর্চেপড়া, তা নিয়ে আলোচনার অভিপ্রায় আমাদের নেই। শুধু বলব, প্রবন্ধগুলোয় লেখকের নাম থাকে না। লিখছেন তাহলে কে? লেখা হচ্ছে কার অঙ্গুলি হেলনে? ব্যক্তিগত আক্রোশ অথবা স্তুতিবাদের মতলবে লেখা এই অপবাদময় কিম্বা প্রশস্তিপূর্ণ দীর্ঘ জোরালো বক্তৃতায় গর্দভ ছাড়া আর কেউই আস্থা রাখে কী? সমালোচনার জন্যে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোয় বাগাড়ম্বর ছাড়া আর থাকে কী? পেশাদার সমালোচকরা ভেতরে না ঢুকে ওপর-ওপর লিখতে পোক্ত। তাই তাঁদের শক্তির গোপন উৎস হলো—'শব্দ, শব্দ শব্দ।' নিজস্ব আইডিয়া তো আঙুলে গোনা যায়—বড় জোর দুটো। সেটুকু গুছিয়ে লিখতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলেন। সোজা কথা সরাসরি বলা—এই নীতি এঁদের কাছে দুর্নীতি ছাড়া কিছুই নয়। ধাপে ধাপে এগোনো এঁদের কোষ্ঠীতে লেখা নেই—ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়েন মাঝখানে, নয়তো ঢোকেন খিড়কি দরজা দিয়ে, নতুবা কাঁকড়া কায়দায় আক্রমণ করেন বিষয়বস্তুকে। গুছিয়ে পাণ্ডিত্য জাহির করতে গেলে নিজেদের জ্ঞানের পাহাড়ে এমনভাবে চাপা পড়েন যে বেরিয়ে আসবার পথ খুঁজে পান না। সেকেলেপনা দেখে পাঠক ক্লান্ত হয়ে গিয়ে, অথবা পাণ্ডিত্যের ঘোলাটে জল দেখে ভয় পেয়ে গিয়ে—অবশেষে দমাস করে বইয়ের পাতা মুড়ে রাখেন পাঠক।

পত্র-পত্রিকার সমালোচনাগুলো যদি ধ্রুববাক্য বলে বিশ্বাস করে নিই, তাহলে তো মানতেই হবে যে, আমেরিক্যানদের মতো ঈর্ষণীয় জাত এই পৃথিবীপৃষ্ঠে আর কোথাও নেই। আমাদের অতি-সূক্ষ্ম লেখকরা কিংবদন্তীসম। আমাদের আকাশে-বাতাসে ধীমান ব্যক্তিরা থুকথুক করছেন, সেই বাতাস ফুসফুসে টেনে নিয়ে গোটা আমেরিকান জাতটা হাঁসফাঁস করছে এবং অতিকায় অতি পরিতৃপ্ত বহুরূপী গিরগিটির রূপ ধারণ করছে। অত্যুৎকৃষ্টের মোড়কে আবৃত রয়েছি আমরা। আমাদের সব কবি-ই মিলটন, আমাদের জানা-অজানা সব লেখকই ক্রিকটন অথবা ক্রিকটনের প্রেত।

নিজেদের নিয়ে এইভাবে রঙ্গ-রসিকতা করাটা ঠিক হচ্ছে না। ফুৎকারে ফুলে

ওঠা মোটেই মজাদার বিষয় নয়—গা রি-রি করে ওঠে। নিন্দনীয় এই অভ্যেসটা কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও মাথা চাড়া দিচ্ছে।

মিস্টার উইলমারের গ্রন্থের সমালোচনায় ফিরে আসা যাক। আগেই বলেছি, বিদ্রূপাত্মক এই কবিতায় ত্রুটি আছে বিস্তর। আগে যা বলেছি, তার সঙ্গে আরও কিছু জুড়ে দেওয়া যাক। উদাহরণস্বরূপ, টাইটল্ অর্থাৎ বইয়ের নাম আরও সুস্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। তবে চলে যায়। আমেরিকান হাতুড়েদের নিয়েই শুধু মাতামাতি করেননি—কার্যক্ষেত্রে কিন্তু হাতুড়েদের ধরাশায়ী করেছেন। শেষ দুটো লাইন শেষের কথাকে জোরদার না করে দুর্বল-ই করেছে। এই লাইনদুটো না থাকলে বক্তব্য হতো অতিশয় ঝাঁঝালো। অনুকরণ করতে গিয়েও প্রমাদ ঘটিয়েছেন। যেভাবে কৃপাণ চালিয়েছেন, মনে হবে যেন সমালোচনার ভাঁড়ারে রয়েছে মা ভবানী। সত্যিই কি তাই? কাণ্ডজ্ঞানহীন অনেকেই আছেন ঠিকই, কিন্তু একেবারেই মগজহীন তো আমরা নই—নিখুঁত শয়তানও নই (মিস্টার উইলমারের লেখায় সেই ছবিই কিন্তু ফুটে উঠেছে)। সভ্যদেশে অসত্যের মতো দাপাদাপি করাটা ঠিক নয়। মিস্টার মরিস গান লিখেছেন ভালই। নির্বোধ নন মিস্টার ব্রায়ান্ট। গর্দভ বলা যায় মিস্টার উইলিস-কে। মিস্টার লঙফেলো চুরি করে থাকতে পারেন—কিন্তু চুরি না করেই বা তিনি থাকবেন কিভাবে—বিশেষ করে চুরি ধর্মর কথা আমরা আগেই শুনেছি।

মোদ্দা কথা এই, উচ্ছ্বাসের বশে মিস্টার উইলমার কয়েক জায়গায় মাত্রাবোধ হারিয়ে ফেলেছেন—বিভেদরেখা বিস্মৃত হয়েছেন। লেখনীর আয়না এমনভাবে বেঁকিয়ে ধরেছেন যে, অত্যন্ত স্পষ্ট ছবি-ও বিকৃতভাবে ফুটে উঠেছে। তবে হ্যাঁ, তাঁর প্রতিভা, তাঁর ভয়হীনতা, বিশেষ করে এই বইয়ের ছক-পরিকল্পনার জন্য তিনি ভূরি ভূরি প্রশংসা পাবেন। □

পশুচর্মের কারবার

[অ্যাসটোরিয়া]

জন জ্যাকব অ্যাসটর জন্মেছিলেন জার্মানীর ওয়ালডর্ফ গ্রামে। বড়লোক হবার জন্যে যৌবনে এসেছিলেন আমেরিকায় এবং পশুচর্মের কেনাবেচা যে একটা ব্যবসা হতে পারে এবং সেই ব্যবসায়ে যথেষ্ট ধনকুবের হয়ে গভর্ণমেন্টের নজরে আসা যায়—তা তিনি দেখিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট জেফারসনের সান্নিধ্যে এসে পশুচর্মের কারবারকে ঢালাওভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ভয়ঙ্কর ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে—যাতে জনবসতি বিরল জায়গায় মানুষের বসতি ঘটে; সাম্রাজ্য বাড়ে, দেশের টাকা দেশেই থাকে এবং বিদেশী কারবারিদের বাণিজ্যের মাধ্যমে টাকা দেশের বাইরে চলে না যায়। টাকা তাঁর যথেষ্ট ছিল—কিন্তু টাকার জন্যে এই অসমসাহসিক কাজে তিনি হাত দেননি। আমেরিকার শক্তি বাড়াতে চেয়েছিলেন। তাই দুর্গম অঞ্চলে অভিযান পাঠিয়েছিলেন— জলে এবং স্থলে। নিজের টাকায় কোম্পানী গড়েছিলেন—গভর্নমেন্ট দিতে চাইলেও নেননি। প্রথম পাঁচ বছরে যা লোকসান হবে সব বহন করতে চেয়েছিলেন। গল্প কথা মনে হতে পারে। কিন্তু তাঁরই টাকায় কেনা জাহাজে তাঁর মাইনে করা লোকজনেরা যখন ঝগড়ায় মেতেছে, তখন খুনে ইণ্ডিয়ানরা সবলোক মেরে ফেলেছে—জাহাজ ধ্বংস হয়েছে। এই

অভিজ্ঞতা ভোলেনি স্থল-অভিযাত্রীরা। খুনে ইণ্ডিয়ানদের সর্দারকে ডেকে বলেছিল—গুটি বসন্ত তোমাদের গ্রামকে গ্রাম সাবাড় করে দিয়েছিল, মনে আছে? এই যে বোতলটা দেখছ, এর মধ্যে আটকে রেখেছি গুটি বসন্তকে। ছিপি খুলে দিলেই শেষ করে দেবে তোমাদের সব্বাইকে। ভয়ের চোটে খুনে ইণ্ডিয়ানরা আর নরহত্যায় মাতেনি।

ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকেই পশুচর্ম সংগ্রহের আয়োজন তো করেছিলেন অ্যাসটর। নদীর পাড়ে কিছুদূর অন্তর ঘাঁটি বসিয়ে গেছিলেন। পাল্লা দিয়ে গেছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে।

তারপরেই যুদ্ধ আরম্ভ হলো। নিখুঁত পরিকল্পনাকেও সফল করতে পারলেন না অ্যাসটর। কিন্তু সে দোষ তাঁর নয়। অ্যাডভেঞ্চারের পর অ্যাডভেঞ্চার করে গেছেন আমেরিকার দুর্গমতম অঞ্চল থেকে পশুচর্ম জোগাড় করে চীন দেশ আর ইউরোপে পাঠিয়ে আমেরিকার চোখ খুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। অসীম মনোবল ছিল তাঁর, ছিল উচ্চাশা, দুঃসময়কে সুসময় বানাতে জানতেন, আত্মবিশ্বাস ছিল প্রচণ্ড।

১৮১২ সাল নাগাদ এই সব অভিযানের টুকরোটাকরা নোট থেকে দুঃসাহসিক অভিযানের শ্বাসরোধী বিবরণ লিখে ছাপা হয়েছে দুই খণ্ডের কেতাবে। যাঁরা পড়তে ইচ্ছুক, তাঁদের জন্যেই লিখলাম এইটুকু। বইটার নাম 'অ্যাসটোরিয়া'। □

কী সুন্দর!

[ল্যাণ্ডর্স কটেজ]
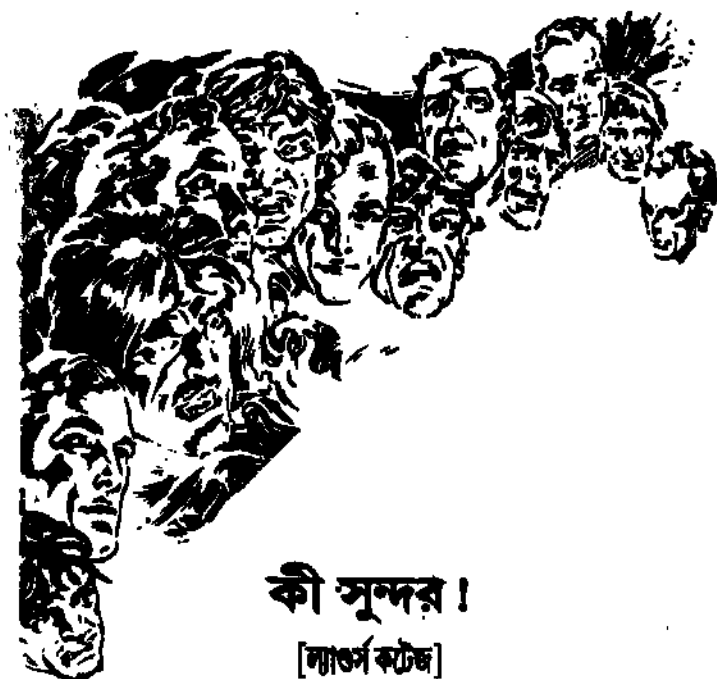
গত গ্রীষ্মে পায়ে হেঁটে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। নদীময় অঞ্চলে, দিন ফুরিয়ে এসেছিল। ফাঁপড়ে পড়েছিলাম, পথ কোথায় যাচ্ছে বুঝতে না পেরে। ঢেউ খেলে যাচ্ছে পায়ের তলার জমি—এক ঘণ্টা হয়ে গেল তরঙ্গায়িত এই আশ্চর্য জমির ওপর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে হাঁটছি তো হাঁটছিই—উপত্যকা বরাবর থাকতে গিয়ে মাথা ঘুরছে—যে-গ্রামে রাত কাটাব বলে বেরিয়েছি, বুঝতেই পারছি না মিষ্টি ছোট্ট সেই গ্রামটা কোনদিকে।

সারাদিনে সূর্যের মুখ দেখিনি বললেই চলে, তা সত্ত্বেও গরমে হাঁসফাঁস করছি। ধোঁয়াশা ঢেকে রেখেছে সব কিছু—সেই কারণেই পথ আরও গুলিয়ে যাচ্ছে। তাতে খুব একটা ঘাবড়াচ্ছি না। কারণ আমি তো জেনেই এসেছি, ছোট্ট মিষ্টি গ্রামটা যদি নাও পাই—ছোটখাট ওলন্দাজ খামারবাড়ি বা মাথা গোঁজবার মতো ঠাঁই একটা পেয়ে যাব। যদিও ধারে কাছে লোকবসতির চিহ্ন তেমন নেই। ক্যাম্বিসের ব্যাগটাকে বালিশ বানিয়ে আর কুকুরটাকে রক্ষী মোতায়েন রেখে খোলা আকাশের নিচে ঘুমোনোর মজার জন্যেও আমি তৈরি। বিনা উদ্বেগে তাই পথ চলছি হেলেদুলে, এমন সময়ে লক্ষ্য করলাম, একটা ঘাসছাওয়া জমি, অন্যান্য ঘাসছাওয়া জমি থেকে যেন একটু পৃথক, এগিয়ে গেছে গাড়ি চলা

রাস্তার দিকে। হাল্কা চাকার চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মাথার ওপর গাছের পাতা ঝুঁকে রয়েছে বটে, কিন্তু পাহাড়ি গাড়িকে রুখে দেওয়ার অবস্থায় ঝুলছে না। রাস্তা দেখলাম বটে গাছপালার মধ্যে, কিন্তু রাস্তা বলতে যা বোঝায়, সেরকম নয়। চাকার দাগ অবশ্য রয়েছে। স্পষ্ট। এখানকার ঘাস ভেলভেটের মতন নরম, পুরু, মসৃণ, উজ্জ্বল। ইংল্যাণ্ডে এমন ঘাস কখনো দেখিনি। গাড়ির চাকা গেছে এই ঘাসের কার্পেটের ওপর দিয়ে—পথে কাঁকর বা ভাঙা ডালের মতন কোনও উৎপাত নেই। পথের পাথর সরিয়ে নিয়ে রাস্তার দু'পাশে গেঁথে বর্ডার তৈরি করা হয়েছে—খুব গুছিয়ে নয়, অথচ অগোছালও নয়—সুন্দর, সঙ্গতি রেখে গাঁথা পাথরের নিয়মিত ব্যবধানে ফুটে রয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, সব মিলিয়ে বুঝি একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি দেখলাম।

মানে বুঝলাম না। যা দেখছি, নিঃসন্দেহে তা শিল্পকর্ম; সব রাস্তাই অবশ্য শিল্পকর্ম। এখানে যা দেখছি, হেলায় গড়ে তোলা হলেও সূক্ষ্মরুচির দৌলতে অবহেলা নেই শিল্পসৃষ্টিতে। মেহনৎ আর খরচ দুটোই কম—অথচ চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। শিল্পাধিক্যের জন্যে নয়—শিল্প-নৈপুণ্যের জন্যে পথের পাশে আধঘণ্টার মতো বসে চোখ সার্থক করে নিলাম। যতই দেখলাম, ততই বুঝলাম, একজন শিল্পীর তদারকিতেই এই সবের সৃষ্টি হয়েছে। সরল রেখায় সজ্জা আছে, আবার রঙের বক্রতাও আছে ছন্দোবদ্ধভাবে; বৈচিত্র্যের মধ্যে সমতা রক্ষা করা হয়েছে—ভারসাম্য নষ্ট হয়নি কোথাও। নিখুঁত সমন্বয়—নিতান্ত খুঁতখুঁতে সমালোচকও খুঁত বের করতে পারবেন না।

ডানদিকে মোড় নিয়ে ঢুকেছিলাম এই পথে। এখন চললাম। যেতে গিয়ে দেখি, সর্পিল ভঙ্গিমায় রাস্তা এঁকে বেঁকে চলেছে—দু'তিন পা গিয়েই বাঁক নিতে হচ্ছে।

মৃদু ঝিরঝির আওয়াজ শুনলাম একটু পরেই। জল পড়ার শব্দ। হঠাৎ বাঁক নিয়ে দেখলাম, রাস্তা সামান্য ঢালু হয়ে নেমে গেছে একটা বাড়ির দিকে। কুয়াশায় নিচের উপত্যকা ঢেকে থাকায় স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম না। সূর্য তখন ডুবছে। মোলায়েম হাওয়া বইতে শুরু করেছে। কুয়াশা পাক খেয়ে খেয়ে ওপর দিকে উঠছে। সামনের দৃশ্য স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

যেন একটা অদৃশ্য ছবির একটু-একটু দেখতে পেলাম। ওদিকে একটা চিমনির ডগা, এদিকে একটা গাছ, সেদিকে জল। আশ্চর্য এক মরীচিকা।

কুয়াশা উঠে গেল, পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবে গেল, গোধূলির রাঙা আলোয় আচমকা চারদিক অদ্ভুত রঙিন হয়ে উঠতেই গোটা দৃশ্যটা বুঝি ম্যাজিক-মন্ত্রে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে তখনও কিরণরেখা ছুটে আসছে, কমলা আর বেগনি রঙের নিচে আশ্চর্য সবুজ ঘাস ওপরের সাদা কুয়াশায় প্রতিফলিত হয়ে এক মায়াময় উপত্যকা সৃষ্টি করেছে।

লম্বায় খুব জোর চারশ গজ সেই উপত্যকা। চওড়ায় কখনও পঞ্চাশ, কখনও দেড়শ কি দু'শ। সবচেয়ে সরু হয়েছে উত্তরপ্রান্তে—সেইখান থেকেই চওড়া

হতে হতে নেমে এসেছে দক্ষিণ দিকে। তবে কোনও নিয়মের মধ্যে নয়। সবচেয়ে চওড়া জায়গাটা রয়েছে দক্ষিণ প্রান্তের আট গজের মধ্যেই। উপত্যকা ঘেরা ঢালু জায়গাকে পাহাড় বলা যায় না কোনমতেই—উত্তরপ্রান্তের জায়গাটা ছাড়া। এখানে প্রায় নব্বইফুট উঁচুতে উঠে গেছে বেজায় খাড়া গ্র্যানাইট স্তূপ। আগেই বলেছি, এই জায়গাটায় পঞ্চাশ ফুটের বেশি চওড়া নয় উপত্যকা। কিন্তু এই উঁচু জায়গা থেকে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলে ডাইনে বাঁয়ে যে-ঢালু অঞ্চল চোখে পড়বে, তা একটু একটু করে কম-পাথুরে, কম-খাড়াই, কম-ঢালু হতে হতে চলেছে। এক কথায়, দক্ষিণ দিকে ঢালু হয়েছে, পেলব-ও হয়েছে। তা সত্ত্বেও, গোটা উপত্যকাকে মালার মতো ঘিরে রেখেছে উচ্চতা—দুটো জায়গায় ছাড়া। একটা দিক রয়েছে পশ্চিমে— সেখানকার গ্র্যানাইটের বুকে দশ গজ চওড়া ফাঁক দিয়ে সূর্য কিরণ ধেয়ে আসছে অধিত্যকার দিকে। এই গিরিপথ যেন আরও চওড়া হয়ে চলে গেছে অজানা অরণ্য আর দুর্গম পর্বতের দিকে। আর একটা ফাঁক রয়েছে দক্ষিণ দিকে। এখানকার ঢাল সামান্য—পুব থেকে পশ্চিমে—খুব জোর দেড়শ গজ। এই দুইয়ের মাঝে অধিত্যকা খানিকটা দেবে রয়েছে—অধিত্যকার মেঝের সঙ্গে একই লেভেলে। গাছপালার ব্যাপারে তো বটেই, সব কিছুর ব্যাপারেই ফুটে উঠেছে কোমলতা—দক্ষিণ দিক বরাবর। উত্তরে কর্কশ খোঁচা-খোঁচা খাড়াই পাথরের একটু তফাতে অপরূপ মহীরুহরা দলে দলে দাঁড়িয়ে মৃদুমন্দ হাওয়ায় ডালপালা নেড়েই যাচ্ছে। কালো ওয়ালনাট, চেস্টনাট—মাঝে মাঝে ওক। বিশেষ করে ওয়ালনাটের বলিষ্ঠ ডালপালা খাড়াই পাথরের মাথা ওপর চাঁদোয়া মেলে ধরেছে। দক্ষিণ দিকে এগোলে চোখে পড়বে একই পাদপ, তবে উচ্চতায় একটু-একটু করে খাটো হয়ে এসেছে—চরিত্রের মধ্যেও নম্রতা প্রকাশ পাচ্ছে। এরপরেই গুঁড়ি সিধে করে দাঁড়িয়ে অন্যান্য মনোহর গাছের দল। দক্ষিণের পুরো ঢালু অঞ্চলে ঝোপ ছাড়া কিছু নেই —মাঝে মাঝে ঝকঝক করছে রুপেলি উইলো অথবা সাদা পপলার। উপত্যকার পায়ের দিকে রয়েছে তিনটে গাছ। অসাধারণ সুন্দর আকৃতির এল্‌ম্ গাছটা যেন উপত্যকার দক্ষিণ তোরণের প্রহরী। হিকরি বাদাম গাছটা পাহারা দিচ্ছে যেন উত্তর পশ্চিমের প্রবেশ পথ; এ গাছটা এল্‌ম্ গাছের চাইতে আকারে বড়, আকৃতিতেও অনেক সুন্দর; পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণে হেলে পড়ে সমস্ত ডালপালা বাড়িয়ে দিচ্ছে অধিত্যকার ভেতরে পড়ন্ত সূর্যালোকের দিকে। এর প্রায় তিরিশ গজ পুবদিকে উজ্জ্বল উদ্দামতা আর অসামান্য সৌন্দর্যে নিজেকে মেলে ধরেছে এ-তল্লাটের অপরূপতম বৃক্ষ—যে-বৃক্ষের অনুরূপ বৃক্ষ ইহজীবনে কোথাও আমি দেখিনি। তিন গুঁড়ির সেই আশ্চর্য টিউলিপ-কে অনায়াসেই বলা যায়, এই উপত্যকার গর্ব। গাছটার তিনখানা গুঁড়ি মাটির তিন ফুট ওপর থেকেই মূল গুঁড়ি থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে একটু একটু করে তফাতে সরেছে—কিন্তু বেশিদূর যায়নি—ফলে, যখন পত্রপুষ্পে ঝাঁকরা হয়ে উঠছে—একটা গুঁড়ি থেকে আর একটা গুঁড়ি রয়েছে চার ফুট ব্যবধানে। মাঝের গুঁড়িটা উঠে গেছে আশি ফুট

উচুতে। তিনটে গুঁড়ির ডালপালা মিশে গেয়ে মগডাল পৌঁছেছে একশ বিশ ফুট উচ্চতায়। টিউলিপ বৃক্ষের এহেন রাজকীয় গাম্ভীর্যর সমতুল্য নজির ধারেকাছে আর কোথাও নেই, পাতা ঝকঝকে সবুজ, এক-একটা পাতা চওড়ায় আট ইঞ্চি, সবুজের এমন গৌরবময় সমারোহও ম্লান হয়ে গেছে ফুলের স্বর্গীয় সুষমায়। কল্পনা করে নিন, প্রায় দশ লাখ টিউলিপ ফুটে রয়েছে ছোট্ট একটু জায়গায় গায়ে-গা লাগিয়ে! প্রতিটি ফুল বিরাট—এমন বিশাল টিউলিপ আমি এর আগে দেখিনি। দৃশ্যটা কল্পনায় যদি আনতে পারেন, হে পাঠক হে পাঠিকা, তাহলেই সার্থক হবে আমার কলম চালিয়ে ছবি আঁকার প্রচেষ্টা। এর সঙ্গে ভেবে নিন খানদানি তিনখানা গুঁড়ির চেহারা—প্রতিটার ব্যাস চার ফুট, মেঝে থেকে বিশ ফুট উঁচুতে। অসংখ্য ফুলের সুরভি মিলেমিশে আরব্য সৌরভে মাতিয়ে রেখেছে গোটা উপত্যকাকে।

রাস্তায় যেরকম সবুজ ঘাস দেখেছিলাম, উপত্যকা ছেয়ে রয়েছে সেই চরিত্রের মনোহর ঘাসে, মখমলের মতো নরম পুরু আর অত্যাশ্চর্য সবুজ। এত রূপ একই সঙ্গে সহাবস্থান করছে কি করে, ভাবাটাই যে কঠিন।

উপত্যকার দুটো প্রবেশ পথের কথা আমি বলেছি। উত্তর-পশ্চিমের যে তোরণ, সেদিক থেকে বেরিয়েছে ছোট্ট একটা স্রোতস্বিনী; নেচে নেচে, কল কল গুঞ্জন ছড়িয়ে, ফেনার মুকুট মাথায় পরে চলে এসেছে পাথর স্তূপের কাছে—যেখান থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে হিকরি বাদাম গাছ। গাছটাকে একপাক দিয়ে জলধারা ছুটে গেছে টিউলিপকে বিশ ফুট দক্ষিণে রেখে—আর এদিকে ওদিকে না গিয়ে সোজা চলে গেছে পুব আর পশ্চিম সীমানার মাঝামাঝি জায়গায়। এখান থেকে একটু ঘুর ঘুর করে নিয়ে গিয়ে সটান পড়েছে ডিম্বাকার অধিত্যকার তলার দিকের ডিম্বাকার ছোট্ট সরোবরে—যা পড়ন্ত সূর্যের আলোয় চকচক করছে ডিম্বাকার আয়নার মতো। খুদে সরোবরের সবচেয়ে চওড়া জায়গাটার ব্যাস এক গজের বেশি নয়। কোনও কৃস্ট্যাল পাথরও এর জলের চাইতে বেশি স্বচ্ছ নয়। তলদেশে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল সাদা নুড়ি। পাড় ঘিরে রয়েছে নীলকান্ত মণির মতো ঘাস ছাওয়া জমি; আকাশও নীলকান্ত মণির মতো সুনীল সুন্দর—তার প্রতিবিম্ব সরোবরের মুকুরে পড়ায়, জল কোথায় শেষ হয়েছে আর ঘাসজমি কোথায় শুরু হয়েছে—তা ঠাহর করেও বোঝা যাচ্ছে না। ট্রাউট মাছ, আরও অনেক রকমের মাছ এমন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে যেন এ-সরোবরে মাছ ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। দেখে তো মনে হচ্ছে, উড়ুক্কু মাছ চর্কি দিচ্ছে সবুজ জলের ওপর দিয়ে। এত দ্রুত জল ছেড়ে উঠছে আর নামছে যে ভ্রম হচ্ছে, জলের ওপরেই বুঝি ভেসে রয়েছে সর্বক্ষণ। শূন্যেই বুঝি ওদের অধিষ্ঠান—জলে নয়। একটা হাল্কা ছিপ নৌকো ভারি শান্তভাবে ভাসছে জলে—তার অবয়বের সূক্ষ্মতম অংশও নিখুঁতভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে পালিশ করা দর্পণে। লেক-এর উত্তর দিক ঘেঁষে ছোট্ট একটা দ্বীপ; একটা মুরগি-বাড়ি রয়েছে দ্বীপে—এত ছোট দ্বীপ যে ওই বাড়িতেই জায়গা মেরে দিয়েছে; ছবির

মতো সুন্দর এই দ্বীপে যাতায়াতের জন্যে গড়া হয়েছে কল্পনাতীত হাল্কা, আদিম গড়নের একটা সাঁকো। একটা মাত্র টিউলিপ-তক্তার সাঁকো। লম্বায় চল্লিশ ফুট। তীর আর দ্বীপের মাঝবরাবর একটা ছোট্ট কিন্তু চোখে পড়ার মতো খিলে তলার দিক থেকে সাঁকোর তক্তাকে ঠেকিয়ে রেখেছে—যাতে নড়বড় না করে। সরোবরের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে বেরিয়ে সরু একটা স্রোতস্বিনী তিরিশ গজ জায়গায় এদিক ওদিকে নেচে নিয়ে অবশেষে প্রপাতের আকার ধারণ করে লাফিয়ে পড়েছে একশ ফুট নিচে উপত্যকার দেখে যাওয়া জায়গায়—যে-জায়গার বর্ণনা দিয়েছি আগেই।

সরোবর বেশ গভীর—কয়েক জায়গায় তিরিশ ফুটের মতো—স্রোতস্বিনীর জল কিন্তু কোথাও তিন ফুটের বেশি গভীর নয়—চওড়াতেও আটফুটের বেশি নয়—সবচেয়ে চওড়া জায়গায়। তলদেশ আর দু'পাড়ও সরোবরের অনুরূপ—হুবহু ছবির মতো নয়—এ-দোষ দেওয়া যায় শুধু একটা ক্ষেত্রে—জল অতিমাত্রায় পরিচ্ছন্ন।

সবুজ পাড়ের সবুজাভা মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ণ হয়েছে বিভিন্ন রঙের এবং নিখুঁত গোলক-আকৃতি ঝোপ থাকায়। জিরেনিয়াম ফুলগাছগুলিকে টবশুদ্ধ মাটির মধ্যে পুঁতে দেওয়ার ফলে মনে হচ্ছে, ধরিত্রীই সেই ফুলঝোপকে নিজের বুক থেকে বের করে দিয়েছে—মানুষের যত্নে লালিত নয়। অধিত্যকার সর্বত্র সবুজ ঘাসের ওপর চরে বেড়াচ্ছে দলে দলে ভেড়া, তিনটে পোষা হরিণ, অগুন্তি ঝকঝকে-পালকের হাঁস। এদের সবাইকে পাহারা দিচ্ছে অত্যন্ত বিশাল আকারের একটা মাসটিফ কুকুর—লৎলৎ করছে তার ঝুলন্ত কান আর ঠোঁট—চোখ ঘুরছে হাঁস, হরিণ, ভেড়া বন্ধুদের ওপর।

পুব আর পশ্চিম প্রান্তের কর্কশ পাথর ঢাকা পড়ে গেছে বিস্তর আইভিলতায়—সমৃদ্ধির দরুন পাথুরে গা প্রায় চোখেই পড়ছে না; একইভাবে উত্তর দিকের খাড়াই পাথর ঢাকা পড়ে গেছে বিরল কান্তি আর টসটসে বাড়ন্ত গড়নের আঙুরলতায়; এদের কিছু সটান গজিয়েছে মাটি থেকে, কিছু বেড়েছে পাথরের খাঁজে খাঁজে।

উপত্যকার নিচের দিকে খুব কম উচ্চতার একটা পাথুরে পাঁচিল টপকে যেতে পারছে না হরিণ তিনটে। বেড়াজাতীয় কিচ্ছু নেই কোথাও। রাখারও দরকার নেই। প্রকৃতিই পাথরের পাঁচিল তুলে রেখেছে, তাদের সামনে রয়েছে লতা-র বাধা—হরিণ বা ভেড়ার পা তাতে আটকাবেই। ঢোকবার পথ একদিকেই—যেদিকে দাঁড়িয়ে এই ভূস্বর্গ-দৃশ্য উপভোগ করছি আমি।

স্রোতাস্বিনীর নেচেকুঁদে এগিয়ে গিয়ে, সোজা হয়ে ধেয়ে যাওয়ার বর্ণনা আগেই দিয়েছি। কিন্তু পশ্চিম থেকে পুবে, ফের উত্তর থেকে দক্ষিণে যাওয়ার পথে একটা ফাঁস রচনা করার ফলে মাঝে তৈরি হয়ে গেছে একটা উপদ্বীপ—যে উপদ্বীপে রয়েছে ভারি সুন্দর একটা বসত-বাড়ি—যেন কবির কলম দিয়ে গড়া।

নিসর্গ-আঁকিয়ে শিল্পী বুঝি তুলি বুলিয়ে অনেক যত্নে ক্যানভাসের বুকে ফুটিয়ে

তুলেছে সেই কটেজ-গৃহ—ছবি···নিখুঁত সুন্দর একটা ছবি।

আমি যেখান থেকে দেখছি, সেই জায়গা থেকেই সুন্দর, সেই কটেজ ভবন সুন্দরতম দেখাচ্ছে।

মূল বাড়িটা লম্বায় চব্বিশ ফুট, চওড়ায় ষোল ফুট—তার বেশি কক্ষনো নয়। মেঝে থেকে ছাদের মোট উচ্চতা আঠারো ফুট ছাড়ায়নি। তলার দিকে লতার বেষ্টনী, সামনে একটা নাশপাতি গাছ; গাছের ডালে ডালে ঝুলছে রকমারি গড়নের খাঁচা—প্রতিটার মধ্যে এক এক জাতের পাখি—তাদের কলগুঞ্জনের ঐকতানে রিমঝিম করছে গোটা উপত্যকা।

লজেন্স-প্যাটার্নের সার্সি দিয়ে ঢাকা জানলা আর টিউলিপের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে রঙকরা বাড়ির দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম আমি আবিষ্টের মতো—চোখ রইল সাদা-কালো পাথরে গড়া চিমনির দিকে। গোটা বাড়িটা যেন মিশরীয় নকশায় তৈরি—তলার দিকে চওড়া, ওপর দিকে সরু।

ব্রিজ পেরিয়ে কাঁকর বিছোনো জমিতে পা দিতেই নিচঃশব্দে বাঘের মতো লাফ দিয়ে এগিয়ে এল মাসটিফ, হাত তুললাম বন্ধুর কায়দায় বন্ধু-পদে বরণ করবে কিনা না জেনেই। সে কিন্তু বুঝল আমার হাতের ইশারা। বন্ধ করল চোয়াল। অভ্যর্থনা জানাল আমার কুকুর পন্টো-কে।

ঘন্টা ছিল না দরজায়। তাই হাতের ছড়ি দিয়ে টোকা দিলাম কপাটে—আধখোলাই ছিল কপাট। তৎক্ষণাৎ পায়ের আওয়াজ শুনলাম ভেতরে। হাসিমুখে এগিয়ে এল প্রায় আটাশ বছর বয়েসের এক মহিলা। হাসছে তার চোখ—ভাসছে নিতল উৎসাহ। এরকম চোখ আর সুগভীর ব্যঞ্জনা কোনও নারীর চোখে আমি দেখিনি। এরই নাম রোম্যান্স—বিশেষ করে এই কোটরা-প্রবিষ্ট দুই নয়নে যে-সুষমা আর গভীরতা লক্ষ্য করলাম—তা এক কথায় তুলনা বিহীন। নারীর নারীত্বই তো শেষ পর্যন্ত ভালবাসে পুরুষ—আমি দেখলাম সেই নারীত্ব তার চোখে, তার চলন ভঙ্গিমায়। আশ্চর্যভাবে আপন করে নেওয়া সেই চাহনি নিমেষে প্রবেশ করেছি আমার হৃদয়ের গভীরে—কেননা, ওই চাহনির উৎস-ই তো অন্তরের অন্তরতম স্থলে। মেয়েটির নাম 'অ্যানি'—ডাক শুনেই বুঝলাম—গৃহকর্তা ডাক দিলেন ভেতর থেকে—'অ্যানি ডার্লিং'। তখনও নিমেষহীন চোখে দেখে যাচ্ছিলাম অ্যানি-র চোখের স্বর্গীয় ধূসরাভা, চুলের হালকা চেনাটি রঙ।

তারপরেই এসে দাঁড়ালাম সৌম্যদর্শন, মিতবাক গৃহকর্তার সামনে। পরে জেনেছিলাম তাঁর নাম মিস্টার ল্যাণ্ডর।

ঘরের আসবাবপত্র একেবারেই আড়ম্বরবিহীন। সাদা পাথরের গোল টেবিলে খানকয়েক বই, চৌকোনা ক্রিস্ট্যাল-কাঁচের শিশিতে আতর, ফুলদানিতে ফুলের গোছা।

এই রচনার লক্ষ্যে আমি পৌঁছে গেছি। বাড়ির বর্ণনা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। □

শয়তানের সঙ্গে কিছুক্ষণ

[দ্য 'ডিউক ডিলা' ওমলেট]

সমালোচনা মস্ত মানুষকেও শুইয়ে দেয়। ওমলেট রাজ্যের রাজার হাল হয়েছিল সেই রকমই। সে রাতে তিনি একা-একা শুয়েছিলেন সোফায়—মাথায় একটা বালিস দিয়ে। এমন সময়ে তাঁর সামনে হাজির করা হলো পেরু দেশের সেই আশ্চর্য পাখিকে সোনার খাঁচার মধ্যে। এতদিন ছিল এক রানির কাছে—এখন তাকে আনা হলো ওমলেটের রাজার সামনে—নিয়ে এল সাম্রাজ্যের ছ'জন জ্ঞানী পুরুষ।

আর সইতে পারলেন না ওমলেট-রাজা। মুখে পুরলেন একটা জলপাই ফল। মুখে দেহত্যাগ করলেন।

মৃত্যুর তিনদিন পরে হা-হা-হা করে হেসে উঠলেন রাজামশাই।

হি-হি-হি করে হেসে জবাব দিল শয়তান। মেজাজ একটু উত্তপ্ত। মড়ার হাসি তার ভাল লাগেনি।

"ইয়ার্কি হচ্ছে?" বললেন রাজা—"পাপ করেছি, বেশ করেছি। কিন্তু এই রকম বর্বর প্রথায় সাজা দিতে আপনাকে কে বলেছে?"

শয়তান বললে—"খোলো প্যান্ট।"

"প্যান্ট খুলব? জানো আমি কে? 'মাজুরকিয়াদ' বই লিখে কত নামডাক করেছি? অ্যাকাডেমির নামকরা সদস্য আমি? তুমি বললেই প্যান্ট খুলব? কক্ষনো না। আমার রাজ্যের সব সেরা ওস্তাগরের তৈরি এই প্যান্ট তো খুলবই না—হাতের দস্তানাও খুলব না।"

শয়তান বললে, "আমি কে, সেটা তোমার জানা নেই দেখছি। আমি খোদ শয়তান। আমারই নাম বাল-জিবাব—মাছিদের অধিপতি। একটু আগেই তোমাকে বের করেছি রোজউড কাঠের তৈরি হাতির দাঁত দিয়ে খোদাই করা কফিন থেকে। তোমার গায়ে ছিল অদ্ভুত সুগন্ধ—লেবেলে লেখা ছিল সব বৃত্তান্ত। তোমাকে পাঠিয়েছে আমারই মাইনে করা গোরস্থান-ইন্সপেক্টর। তোমাকেই যখন কিনে নিয়েছি—তখন তোমার ওই খাসা প্যান্টটাও আমার। খোলো প্যান্ট।"

"মহাশয়," অত্যন্ত রাগত কণ্ঠে বললেন ওমলেটের রাজা—"এই অপমানের বদলা আমি নেব। আপনার ধৃষ্টতা অসহ্য। কড়ায় গণ্ডায় শোধ নেব সময় এলেই। আপাতত আমি চললাম—বিদায়।"

এই বলে শয়তানকে নমস্কার ঠুকে ঘর ছেড়ে বেরতে গিয়েই বাধা পেলেন দোরগোড়ায়। ধাক্কা মেরে রাজাকে ফের ঢুকিয়ে দেওয়া হলো ঘরের মধ্যে—শয়তানের ঠিক সামনে।

চোখ রগড়ে, হাই তুলে, দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভেবে নিলেন রাজামশাই। তিনি যে এখন মড়া, সে বিষয়ে নিশ্চিত হলেন।

এবার চোখ ঘোরালেন চারদিকে। কোথায় এসেছেন, সেটা দেখা দরকার।

ঘরটার চার দেওয়ালে বিশেষ বৈচিত্র্য নেই—রয়েছে মাথার ওপর। কড়িকাঠ বলে কিছু নেই—আগুন-রঙা খুব ঘন মেঘ ঘুরপাক খাচ্ছে কড়িকাঠের জায়গায়। ঘাড় বেঁকিয়ে দেখলেন, অনেক উঁচু থেকে রক্তলাল এক অজানা ধাতু দিয়ে তৈরি শেকল নেমে এসেছে মেঘ ফুঁড়ে। শেকলের ওপরের প্রান্ত বোধহয় আকাশে রয়েছে, তলার প্রান্তে ঝুলছে অতীব দ্যুতিময় একটা চুনিপাথর— তাকানো যাচ্ছে না প্রখর দ্যুতির দিকে—

দেখেই বুঝলেন রাজামশাই—এ-পাথর কেউ কখনও দেখেনি। কেউ কখনও পুজো করেনি, আফিং খেয়েও এ-রত্নকে কেউ কখনও কল্পনাতে আনতে পারেনি। সুতরাং মনে মনে তার প্রশংসাই করলেন।

ঘরের চারকোণে দেখলেন চাররকমের প্রস্তরমূর্তি। আকারে দানবিক। গ্রীসদেশের সৌন্দর্য, মিশর দেশের শারীরিক বিকৃতি আর ফরাসী দেশের সব কিছু দেখা যাচ্ছে তিনটে মূর্তির মধ্যে। চতুর্থ মূর্তিটাকে এমনভাবে বোরখা পরিয়ে রাখা হয়েছে যে সরু হয়ে আসা হাঁটু আর পায়ের চপ্পল ছাড়া কিছু দেখতে পেলেন না রাজামশাই। ওইটুকু দেখেই আবীররাঙা হয়ে উঠল তাঁর মুখ।

হাজার খানেক ছবি ঝুলছে ঘরময়। দেখে তো মনে হলো, শিল্পী

ম্যাকেন-কেও আনা হয়েছিল এ-ঘরে। বাবুয়ানি আর বিলাসিতা, মদালসা আঁখি আর মহব্বৎ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দেওয়ালে দেওয়ালে।

এসব দেখে টলেননি রাজামশাই। আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেলেন, একটি মাত্র পর্দাবিহীন জানলা দিয়ে নারকীয় অগ্নিদৃশ্যটা দেখে। সেইসঙ্গে শুনলেন বিকট আর্তনাদ আর যন্ত্রণা কাতর চিৎকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেজেই চলেছে লোমহর্ষক এক যন্ত্রসঙ্গীত অথবা যন্ত্রণা-সঙ্গীত। যে বাজনার শুরু নেই····· শেষ নেই····· যা ভেসে আসছে জানলার মায়াময় কাঁচে ঝঞ্ঝনা তুলে·····।

মার্বেল স্ট্যাচুর মত স্থির হয়ে সোফায় বসে রইলেন রাজামশায়।

ফরাসিরা চট করে অজ্ঞান হয়ে যায় না। লোক হাসিয়ে জ্ঞান হারানো ব্যাপারটা দু'চক্ষে দেখতে পারেন না রাজামশাই। তাই তিনি নিমেষে সামলে নিলেন নিজেকে। চোখ পাকিয়ে নিয়ে দেখলেন, টেবিলে রয়েছে খানকয়েক তরবারি।

তরবারি যুদ্ধটা ভালই শিখেছেন রাজা। ঝট করে তুলে নিলেন দুটো সোর্ড। ধারালো ডগায় আঙুল বুলিয়ে ধার পরখ করে নিলেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন শয়তানকে।

কিন্তু হায়। শয়তান যে তরবারি-যুদ্ধ জানে না।

তাহলে শুরু হোক তাসের লড়াই।

শয়তান তাতে রাজী। হেরে গেলে মড়া হবে জ্যান্ত—মুক্তি পাবে নরক থেকে।

শুরু হলো তাসের জুয়ো। শয়তান যখন হাই তুলতে তুলতে গলায় সরাব ঢালছে, সেই ফাঁকে হাতসাফাই করলেন রাজা।

হেরে গেল শয়তান। হাসল্ কাষ্ঠহাসি।

উঠে দাঁড়িয়ে, দিগ্‌বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের মতো না হলেও, বৈরাগী ডায়োজিনি-র মতো গটগটিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন রাজামশাই।

তাসের জুয়োর মুক্তিপণ—যমলোক থেকে প্রত্যাবর্তন। □

‘ৎ’ খাঁড়ার কোপ

[এক্সিং এ প্যারাগ্রাব]

['X' ছিল মূল গল্পে —‘ৎ’ হলো বাংলায়]

‘প্রবুদ্ধ ব্যক্তি’দের আগমন যে প্রতীচ্য দেশ থেকে, এ তথ্য কেনা জানে। শ্রীযুক্ত নিরেটমাথা গড্ডালিকা মহাশয়ও পুব থেকে এসেছিলেন। তাহলে তো তিনি প্রবুদ্ধ ব্যক্তিও বটে। অর্থাৎ, জ্ঞানী পুরুষ।

প্রমাণ? এই তো বলছি, শুনুন। নিরেটমাথাবাবু সম্পাদনা করেন। মানে, তিনি কাগজের সম্পাদক। চরিত্রে তাঁর একটাই দুর্বলতা—ভয়ানক কোপনস্বভাব। উনি অবশ্য এই ধাঁ-করে রেগে যাওয়াটাকেই মনে করেন তাঁর সেরা গুণ। সবচেয়ে জোরাল চারিত্রিক দৃঢ়তা। তাঁর তেজসার। লাখো যুক্তি তর্ক দিয়েও তাঁকে বোঝানো যায় না যে ‘ব্যাপারটা অন্যরকমও হতে পারে’।

শ্রীযুক্ত নিরেটমাথা গড্ডালিকা মহাপ্রভু যে বিলক্ষণ বিজ্ঞপুরুষ, এটা তাহলে দেখিয়ে দেওয়া গেল। একটা ব্যাপারেই শুধু উনি অভ্রান্ত এবং একগুঁয়ে থাকতে পারেননি—জ্ঞানীদের দেশ ‘প্রতীচ্য মহাদেশ’ ছেড়ে আসার সময়ে। তাঁর মতন জ্ঞানী পুরুষের পক্ষে কাজটা হয়েছে ভুল। জীবনে এই একটা ভুলই তিনি করেছেন। পুব ছেড়ে তিনি এলেন পশ্চিমে। আস্তানা নিলেন যে-শহরে, তার নামটা শুরু হয়েছে ‘আলেকজান্ডার’ দিয়ে—শেষ হয়েছে ‘পলিশ’ দিয়ে। প্রায়

পুরো একটা লাইন জুড়ে থাকে সেই নাম। গোল্লায় নামটাকে তাই ছেঁটে দিচ্ছি। 'পলিশ' নামই লিখব এখানে। শুধু পলিশ। পালিশ দেওয়ার মতন শহর বটে—পালিশ দিয়ে ছেড়েছিল পরমজ্ঞানী গড্ডালিকাকে—তখন তিনি গড়গড়িয়ে···

শুরু করা যাক শুরু থেকে।

কিন্তু তাঁর জ্ঞানের ঘাটতি ছিল না বলেই তো খুঁজেপেতে এমন একটা শহর বের করে ফেলেছিলেন। যখন তাঁর শুভাগমন ঘটে পলিশ শহরে, তখন নাকি সেখানে দৈনিক পত্রিকা কি জিনিস, তা কেউ জানত না; পত্রিকাটা জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাতবস্তু হওয়ায়—সম্পাদক বস্তুটাও নাকি অজ্ঞাত থেকে গেছিল।

এই সংবাদ সংগ্রহ করবার পরেই তিনি তাঁর পদধূলি দিয়ে ধন্য করেছিলেন পলিশ শহরকে।

জাঁকিয়ে বসেই তিনি তাঁর কাগজ বের করলেন। সেই কাগজের নাম 'চায়ের কাপ'। উনি ভেবেই রেখেছিলেন, চায়ের কাপের তুফান দিয়ে গোটা দেশটাকে মাতিয়ে দেবেন—লণ্ডভণ্ড করে ছাড়বেন। কাগজ বলে একটা কথা—তার ওপরে এই রকম তুখোড় সম্পাদক—নাম যাঁর শ্রীনিরেটমাথা গড্ডালিকা।

এই রকমটাই উনি ভেবে রেখেছিলেন। অর্থাৎ এই ছিল তাঁর প্রত্যাশা।

কিন্তু একটা ভুল হয়ে গেছিল গোড়াতেই। সংবাদসংগ্রহের ভুল। তাঁর মতন বিচক্ষণ সাংবাদিক-শিরোমণি এই ভুলটা যদি না করতেন, তাহলে বাজিমাৎ করতেন নির্ঘাৎ।

পলিশ শহরে জন স্মিথ নামে এক সদাশয় ব্যক্তি বাস করতেন দীর্ঘকাল যাবৎ। তিনি শুধু সদাশয় ছিলেন না—উপরন্তু ছিলেন সম্পাদক এবং তাঁর কাগজটার নাম ছিল 'গেজেট'।

এতবড় (অথবা এত ছোট্ট) সংবাদটা গড্ডালিকার গোচরে আসেনি।

এলে নিশ্চয়ই পলিশ শহরের চৌকাঠ মাড়াতেন না। উনি পুবের আলো দিতে এসেছিলেন পশ্চিমে—পশ্চিমের অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে আসেন নি।

যাক সে ছেঁড়া কথা। উনি, মানে শ্রীযুক্ত নিরেটমাথা গড্ডালিকা, এলেন এবং জাঁকিয়ে বসে গেলেন। পরমোৎসাহে অফিসঘর ভাড়া করলেন—'গেজেট' পত্রিকার ঠিক উল্টো দিকের বাড়িতে। ছাপাখানার, টাইপ, কেস, গ্যালি, র‍্যাক—সমস্ত প্যাকিং বাক্স থেকে বের করে সাজিয়ে গুছিয়ে বসতেই গেল দুটো দিন। তৃতীয় দিবসের প্রত্যুষেই প্রকাশিত হলো 'চায়ের কাপ' এর প্রথম প্রাভাতিক সংস্করণ।

সম্পাদকীয় প্রবন্ধটা হয়েছিল মারাত্মক। কঠোর নিঃসন্দেহে—কিন্তু প্রতিভার প্রভায় উজ্জ্বল। তিক্ত তো বটেই—বিশেষ করে 'গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক অন্তত জন্মাবধি এহেন তিক্ত বস্তুর রসাস্বাদন করেননি এবং গড্ডালিকা তো তাঁকেই টার্গেট বানিয়েছিলেন—জন স্মিথকে ফালি ফালি করে কেটেছিলেন ওই একখানা সম্পাদকীয়তে।

জন স্মিথ সাহেব আজও বেঁচে আছেন। সেই ঘটনার পর থেকে আমি ওঁকে অন্য জীব হিসেবে দেখতে শুরু করেছি। স্যালামাণ্ডার নামে একরকম গিরগিটি আছে। বিশেষ জাতের এই সরীসৃপরা অস্বাভাবিক তাপমাত্রা নিজগাত্রে সইয়ে নিতে পারে।

জন স্মিথ সেই জাতের পুরুষ। গড্ডালিকার গরম সম্পাদকীয় তাঁকে ঝলসাতে পারেনি।

অগ্নিময় সেই সম্পাদকীয় পড়বার আগ্রহ জাগছে, বুঝতেই পারছি। যৎকিঞ্চিৎ পরিবেশন করছি—পুরোটা সম্ভবপর নয়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। বুঝতেই পারছি—হাড়ে হাড়ে। 'O, নিঃসন্দেহে। উল্টোদিকের, Oঃ, ওই সম্পাদক বিষম প্রতিভার অধিকারী নিঃসন্দেহে— Oঃ, হো, কি বলছিলাম? বাচ্চলে—O হ্যাঁ, হ্যাঁ,—ঈশ্বর Oকে বাঁচাবেন—আমি কিন্তু এসে গেছি—এযুগের অবতার আমি… O হো! O হো! O হো!·

এরকম বোমা পলিশ শহরে এর আগে কখনও ফাটেনি। এরকম লাইনে লাইনে উত্তম মধ্যম কেউ কখনও কল্পনাও করতে পারেনি। শব্দ-সম্মার্জনী দিয়ে যেন জন স্মিথের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝেঁটিয়ে দিয়েছেন শ্রীযুক্ত নিরেটমাথা গড্ডালিকা।

সজ্জন সদাশয়, জন স্মিথকে এবার তো তাহলে জবাব দিতেই হয়। তাঁর নিজেরই কাগজে।

গোটা শহর গরম হয়ে রইল সারাদিন। সেকী উন্মাদনা। গলিতে গলিতে, হাটে বাজারে, রান্নাঘরে বৈঠকখানায় শুধু অধীর প্রতীক্ষা।

কি হয়, কি হয় উত্তেজনা। কি লিখবেন জন স্মিথ আগামীকাল? সম্পাদকীয় জবাব তো দেবেন সম্পাদকীয়তেই।

পরের দিন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই শহরময় ছড়িয়ে পড়ল জন স্মিথের জবাব। বেড়ে জবাব। নমুনা দেওয়া যাক নিচে :

'গতকাল 'চায়ের কাপ' পত্রিকার সম্পাদক বড় মজার সম্পাদকীয় লিখেছেন। প্রতি বাক্যেই তিনি 'O' অক্ষরটি ব্যবহার করেছেন। কেন? তিনি কি বুঝে ফেলেছেন, দুনিয়াটা 'O' এর গোল? তাঁর যুক্তিধারা 'O' যে চক্রাকার পথে আবর্তিত হচ্ছে, তাতে আর কোন 'O' সন্দেহ নেই। তিনি ঘুরছেন, ঘুরছেন 'O' এর বদ্ধ ধাঁধায় ঘুরে মরছেন। অতীব কুলক্ষণযুক্ত এই উজবুকলোকটা 'O' বাদ দিয়ে কোন 'O' শব্দই তাহলে লিখতে শেখেননি। 'O' হো। এই কারণেই তাঁর বক্তব্যের শুরু নেই, শেষ নেই—যেখানে কথা শুরু করছেন— ঠিক করে সেখানেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। 'Ö'। 'Ö'। 'Ö'। বেচারি। 'O' রোগে আক্রান্ত এই উন্মাদের এখুনি চিকিৎসা করা দরকার। ভাল কথা, শুনলাম উনি পূবদেশ থেকে ভড়িঘড়ি চলে এসেছেন। দেনা না মিটিয়ে পালিয়ে আসেননি তো? এত

ওঁকার মন্ত্র শুনে মনে হচ্ছে আর-'O' উর্ধ্বগামী হবার মতলবে আছেন।'

এই জাতীয় চরিত্রহানিকর মন্তব্য পড়বার পর শ্রীযুক্ত নিরেটমাথা গড্ডালিকা মশায়ের মুখবর্ণ যে টুকটুকে আপেলের মতন লাল হয়ে উঠেছিল—তা না লিখলেও অনুমান করা যেতে পারে। পাঁকাল মাছের-নীতি অনুসরণ করাই তিনি শ্রেয় মনে করলেন শুধু একটি ব্যাপারে—তিনি যে ঋণভারে জর্জরিত হয়ে দেশত্যাগী হয়েছেন—অত্যন্ত কুরুচিকর এই কটাক্ষ যেন দৃষ্টিগোচর (অথবা কর্ণগোচর) হয়নি—এমনি একখানা দার্শনিক ভাব করলেন। সংক্ষেপে, নীচ খোঁচাটা এড়িয়ে গেলেন। তাঁর সততা নিয়ে যারা সন্দেহ প্রকাশ করে, তাদের তিনি মুণ্ডপাত করবেনই না—

কিন্তু তিনি নাকি 'O' অক্ষরর বাদ দিয়ে শব্দ লিখতেই জানেন না। বলে কি গাড়ল জন স্মিথ। চোখে আঙুল দিয়ে মর্কটটাকে এখুনি দেখিয়ে দেবেন 'O' বাদ দিয়ে কতকগুলো শব্দ তিনি রচনা করতে পারেন—অভিধানের পর অভিধান রচনা করতে হবে তাঁর জ্ঞানের ছটা ছড়িয়ে পড়ার পর।

কিন্তু তাহলে তো বেল্লিকটার ফাঁদে পা দেওয়া হয়ে যাবে। নিরেটমাথার রচনারীতি বদলে দেওয়ার কুচক্র এঁটেছে জন স্মিথ—'O' বাদ দিলে তো স্টাইল-টাই পালটে গেল।

'O' হো! 'O': 'O':! কক্ষন-'O' তা করা চলবে না। নো-O, নো-O, নো-O!

স্বীয় প্রতিজ্ঞায় অবিচল রইলেন নিরেটমাথা অবতার। কলম আঁকড়ে ধরলেন। ভিসুভিয়সের মতন ফুলতে ফুলতে লিখে ফেললেন জ্বালাময়ী খানকয়েক লাইন :

'চায়ের কাপ' পত্রিকার মহামান্য সম্পাদক আগামীকল্য প্রত্যুষেই দেখিয়ে দেবেন 'গেজেট' পত্রিকার অশিষ্ট অখাদ্য সম্পাদককে—'চায়ের কাপ' নিকৃষ্ট পত্রিকা নয় 'গেজেট' পত্রিকার মতন। অসাধারণ স্বরবর্ণ 'O' 'গেজেট' এর গবেট সম্পাদকের ধাত ছাড়িয়ে দিয়েছে—এ যে বিশ্বাস-'O' করা যাচ্ছে না। বিউটিফুল এই স্বরবর্ণ আদিঅন্তহীন ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক—কূপমণ্ডুক 'গেজেট' সম্পাদকের এই কাণ্ডজ্ঞান এখন-'O' জাগ্রত হয় নি! O:! O:! O:!'.

এই পর্যন্ত লেখবার পরেই ছাপাখানার কম্পোজিটর 'ভূত' এসে বললেন, এখুনি 'কপি' দিন, কম্পোজ ধরতে হবে সারারাত কাজ না করলে কাল সকালে কাগজ বেরবে কি করে?

ছাপাখানার 'ভূত'-এর তাড়া খেয়ে তেড়েফুঁড়ে মাঝরাত পর্যন্ত বসে (অনেক মোমবাতি পুড়িয়ে) ভয়াবহ একটা সম্পাদকীয় লিখে ফেললেন শ্রীযুক্ত নিরেটমাথা :

'ওরে, O জন! ওদের মার শেষরাত্রে—Oধিক আর লিখব না। ওলাউঠা লাগুক তোর কাগজে। O-ই বুদ্ধি নিয়ে "O"চা কাগজই তোকে মানায়। আমি

কিন্তু 'O''ৎ পেতে আছি। 'O'-ক! তোর কথা ভাবলেই বমি পাচ্ছে। 'O'কী! চমকে উঠলি কেন? 'O'খানে আমি গেলে তো অক্কা পাবি। 'O'স্কার নিয়ে টিটকিরি? 'O'জন হাল্কা করে ছাড়ব। 'O'জস্বিতা কাকে বলে এখন বুঝছিস? নো-O, নো-O, কোন'O' 'O'জুহাত শুনব না। আমার রচনার 'O'জোগুণ পালটাতে চাস? 'O'টা থাকবেই। 'O'টাই আবার 'O'ম্। 'O'য়াক। 'O'য়াক। 'O'য়াপস করে নে তোর কথা। নইলে তোকে লা-ওয়ারিশ করে ছাড়ব—বুঝলি। 'O'য়ারেন্ট বের করবি? কচু করবি! তোর মতন কাগজ'O'য়ালা ঢের দেখেছি। কোন'O' 'O'য়াস্তা তোর নেই—মরণ আমার হাতে। একেবারে 'O'লট-পালট করে ছাড়ব—কোন'O' 'O'ষুধেই কাজ হবে না—'O'রে আমার শব্দের 'O'স্তাগর রে। 'O'ই তো 'O'ল-এর মত 'O'ষ্ঠ। 'O'রঙ্গা কোথাকার!'

এবম্বিধ পরিচ্ছেদ রচনা করার পর শ্রান্ত ক্লান্ত নিরেটমাথা ঘুমিয়ে পড়লেন—'কপি' চলে গেল ছাপাখানার 'ভূত' এত হাতে। সে কম্পোজ করতে বসে দেখল টাইপকেসের কোথাও 'O' অক্ষরটা পাওয়া যাচ্ছে না!

নিশ্চয় কেউ সরিয়ে রেখেছে!

কিন্তু কাল সকালেই যে কাগজ বের করতে হবে। সম্পাদক তো ঘুমিয়ে কাদা।

ছাপাখানার 'ভূতে'রা জানে, একবার ছাপা হয়ে বেরিয়ে গেলে গোস্তাকি অর্ধেক মাপ হয়ে যায়। খুঁজতে খুঁজতে সে দেখলে একটা টাইপ এক্সার সাপ্লাই দিয়েছে টাইপওলা—যা তারা করে—অদরকারী টাইপ ওজন করে চালান করে দেয়—ছাপাখানার কেস বোঝাই হয়ে পড়ে থাকে।

এখানেই তাই হয়েছে। 'X' টাইপটা রয়েছে অনেক আনকোরা-ঝকমকে কালি পর্যন্ত লাগেনি পনেরো আনা টাইপে।

মুলো দাঁত বের করে হেসে নিল ছাপাখানার ভূত। নিরেটমাথার সম্পাদকীয়তে সবগুলো 'O' পাল্টে সেখানে বসিয়ে দিল 'X'।

[আমরা বসালাম 'ৎ']

এখন দেখা যাক ব্যাপারটা কি দাঁড়াল।

পরের দিন সকালে উদগ্রীব পলিশবাসীরা কাগজ হাতে নিয়ে কিরকম যেন হয়ে গেল। কেউ মাথা ঘুরে পড়ে গেল। কেউ গোঁ গোঁ করে মুখে ফেনা কাটতে লাগল।

বাকী সবাই খাঁড়া মানে রামদা, কুড়ুল, ইত্যাদি নিয়ে দৌড়োলো নিরেটমাথাকে কোপাই করবে বলে।

কিন্তু তাঁকে আর পাওয়া যায় নি। শেষরাতে শেষমার দিয়ে গড়গড়িয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন 'O'স্তাদ! লেখাটা? দেখা যাক পড়া যায় কিনা—

'ৎরে ৎজন! ৎতাদের মার শেষরাত্রে—ৎধিক আর লিখব না। ৎলাউঠা লাগুক তোর কাগজে। ৎই বুদ্ধি নিয়ে ৎচা কাগজই তোকে মানায়। আমি কিন্তু

ইং পেতেই আছি। ংকে। তোর কথা ভাবলেই বমি পাচ্ছে! ংকী! চমকে উঠলি কেন? ংখানে আমি গেলে তো অক্কা পাবি। ংক্কার নিয়ে টিটকিরি? ংজন হাল্কা করে ছাড়ব। ংঅস্মিতা কাকে বলে এখন বুঝছিস? নোং, নোং, কোনং ংজুহাত শুনব না। আমার রচনার ংজোগুণ পাল্টাতে চাস? ংটা থাকবেই। ংটাই আমার ংম্‌। ংয়াক! ংয়াক! ংয়াপস করে নে তোর কথা। নইলে তোকে লা-ংয়ারিশ করে ছাড়ব—বুঝলি? ংয়ারেন্ট বের করবি? কচু করবি? তোর মতন কাগজংয়ালা ঢের দেখেছি। কোনং ংয়াস্তা তোর নেই—মরণ আমার হাতে! একেবারে ংলট-পালট করে ছাড়ব—কোনং ংষুধেই কাজ হবে না—ংরে আমার শব্দের ংস্তাগর রে! ংই তো ংল-এর মতন ংষ্ঠ। ংরম্বা কোথাকার!'

জন স্মিথ শুধু বলেছিলেন, একেই বলে সম্পাদকের খাঁড়া—পাবলিক খেপাতে জানে—আর পাবলিক ক্ষেপে গেলে খাঁড়া হাতেই তো দৌড়োবে। তখন শুধু ঘ্যাচাং! □

ফ্যানট্যাস্টিক

গা-ছমছমে

গল্প-উপন্যাসের জাদুকর-কথাশিল্পী

এডগার অ্যালান পো

আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী

অদৃশ্য দুনিয়ার অলৌকিক বিভীষিকাকে উনি যেন দেখতে পেতেন, অতীন্দ্রিয় আতঙ্ককে উপলব্ধি করতে পারতেন। এই জন্যেই কি বহুমুখী প্রতিভাধর পো জানতেন, উনি উন্মাদ হয়ে যেতে পারেন যে কোনো মুহূর্তে? মাত্র ৪০ বছর বেঁচে ছিলেন সেই সময়ের আমেরিকার শ্রেষ্ঠ এই কবি ও কথাকার—কপর্দকহীন, মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে পাওয়া গেছিল রাস্তার নর্দমায়। নার্ভ যাঁর যথেষ্ট শক্ত, তিনিই আবিষ্ট হবেন পো-র অসাধারণ গল্প-উপন্যাস পড়তে বসে। একটিমাত্র উপন্যাস লিখেছিলেন সারা জীবনে—ভয়াল! ভয়ঙ্কর! বিশ্ববিখ্যাত সেই উপন্যাস এবং রকমারি স্বাদের বেশ কয়েকটি গল্পকে স্বচ্ছন্দ ভাষায় বাংলায় এনে দিলেন

অদ্রীশ বর্ধন

Edgar Allan Poe Rachana Sangraha

Jacket designed by Dhruba Rana